[illegible] অনুবাদগ্রন্থমালা

সমকালীন অসমীয়া গল্প



সম্পাদক

পঙ্কজ ঠাকুর

মুখাবয়ব অনুবাদ গ্রন্থমালা . এক

সমকালীন
অসমীয়া
গল্প

স.ম্পা.দ.ক

পঙ্কজ ঠাকুর

মুখাবয়ব
আগরতলা ত্রিপুরা

Samakalin Asamiya Galpo
a collection of assamese short stories translated into bengali

প্রচ্ছদ
কোরীয় শিল্পী য়ু সঙ পার্ক-এব বালির কাজ
বর্ণসংস্থাপন
নির্মল দত্ত

অনুবাদ
বুলা দত্ত . বাসুদেব দাশ
কথাকলি চৌধুরী কর্তৃক ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স জগন্নাথবাড়ী রোড আগরতলা ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত
এবং মুখাবয়ব কার্যালয় সোমেন সুকান্ত সরণি কৃষ্ণনগর আগরতলা থেকে তৎকর্তৃক প্রকাশিত
মূল্য
দুইশত পঁচিশ টাকা

ভারতীয় সাহিত্যেব
একান্ত পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে

সূ . চী . প . ত্র

প্র. কা. শ. ক. থা

বস্তুত একটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে এই সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৭ সালে। উনপঞ্চাশটি অসমীয়া ছোটগল্পের অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ভাষান্তরের কাজ একা হাতে করেছেন বাসুদেব দাশ। অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ভিন্ন তাঁকে জানাবার আর কী থাকতে পারে এবং উল্লেখ করি, এজন্যে তিনি কোনো পারিশ্রমিকও নেন নি। পঙ্কজ ঠাকুর, একজন নামী অসমীয়া ঔপন্যাসিক ও কথাকার—তিনি আমাদের আমন্ত্রণে এই সংখ্যা, যা বর্তমানে সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে, সানন্দে সেটি সম্পাদনার কাজ নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। এবং অবশ্যই শ্রীযুক্ত হীরেন গোঁহাই, যিনি এই সংখ্যা ও সংকলনের প্রাক্‌কথাটি লিখে আমাদের সম্মান বাড়িয়েছেন—তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ রইলাম। সংখ্যাটি প্রকাশের সময় শ্রীযুক্ত অরিন্দম বরকটকী একটি অত্যন্ত মূল্যবান নিবন্ধের মাধ্যমে অসমীয়া ছোটগল্পের সঙ্গে সুনিপুণভাবে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সেটি এবং গৌহাটি নিবাসী প্রবন্ধকার মানিক দাস মহোদয়ের লেখা অপর একটি একই বিষয়ে লিখিত হলেও ভিন্নধর্মী নিরীক্ষামূলক গদ্যও আমরা এ সংকলনে বর্তমানে অন্তর্ভূক্ত করছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এর দ্বারা পাঠককুল অসমীয়া গল্প সম্পর্কে আরও ঋদ্ধ ধারণা পাবেন। প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি কোরীয় শিল্পী য়ু সঙ পার্ক-এর ভারতীয় বেলাভূমিতে সৃষ্ট বালির রৈখিক শিল্পকলার ফটোগ্রাফ থেকে সংগৃহীত। বিশ্বাস করি বাংলাভাষী পাঠককুলের কাছে সংকলনটি গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রা . ক্ . ক . থ . ন

প্রথমেই পাঠকের কাছে ক্ষমা চাইছি অসমীয়া ছোটগল্পের বিষয়ে বিস্তৃতভাবে লেখার যে পরিকল্পনা আমার মাথায় ছিল, নানা অকেজো কাজে দিশাহারা হয়ে তার রূপায়ণে ব্যর্থতার জন্য। আশা করি পাঠক নিজেই সমস্ত গল্প পড়বেন, এবং নিজের বিবেচনায় প্রত্যেকটিকে যাচাই করবেন। ভালোমন্দ নিয়ে গল্পগুলো সাম্প্রতিক অসমীয়া ছোটগল্পের প্রতিনিধিত্ব করছে, আর শ্রীমান বাসুদেব কখনও অনুপ্রাণিত কখনও গলদ্‌ঘর্ম হয়ে বাঙ্গালী পাঠকের কাছে বাংলা-মাধ্যমে তাদের পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছে।

বাসুদেবের অনুবাদ পড়তে পড়তে মনে হল এত কাছাকাছি এবং ঘনিষ্ঠ দুটো ভাষার মধ্যে আজও অনেকটা ব্যবধান রয়ে গেছে। অসমীয়া সিন্‌ট্যাক্স রক্ষা করতে গিয়ে বাসুদেব বাংলার অভ্যস্ত বাক্যবিন্যাস থেকে কখনও দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এমন সব শব্দ আজও আছে, যাদের বাংলা প্রতিশব্দ দুর্লভ। যেমন ধরুন 'হাজারী খুড়ো' গল্পের 'তাওয়ৈ' শব্দটা—যার বঙ্গানুবাদ 'খুড়ো' ছাড়া হতে পারেনা বলেই আমার ধারণা। আসলে আসামের গ্রামাঞ্চলে দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সন্তানরা পিতৃবন্ধুকে 'তাওয়ৈ' বলে সম্বোধন করে থাকে। হয়ত সংস্কৃত 'তাত' শব্দ থেকেই উদ্ভুত শব্দটি, কিন্তু ঘরোয়া ব্যবহারে কেউ সেটাকে শাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত করে না! বাসুদেবের সমস্যা ভেবে দেখুন। এ যেন অদ্ভুত দৈহিক সাদৃশ্যের দু'জন ভ্রাতৃ বা ভগ্নীকে অপরিচিত লোকের কাছে পৃথক করে বর্ণনা করার চেষ্টা। কিন্তু শ্রীমান বাসুদেব হাল ছেড়ে দ্যায় নি। আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ।

স্বাধীনতার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত পঁচানব্বই শতাংশ নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ সমাজে আবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ অসমীয়া আধুনিক জীবনের আস্বাদ ও সংঘাত প্রথম অনুভব করেছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালের দেশগঠনের সুবাদে। তা-ও আবার কেন্দ্রীভূত ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় নিহিত প্রান্তীয় বৈষম্যে আক্রান্ত হয়ে। ('৪৭-এও উত্তর ভারতের কতগুলো অঞ্চল আসাম থেকে পিছিয়ে ছিল। এখন তাদের সঙ্গে আসামের কোন তুলনাই হয় না। আসাম এমন একটি রাজ্য যেখানে শিল্পায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বারবার গণ-আন্দোলন করতে হয়েছে।)। তাই অসমীয়া ছোটগল্পের কয়েকজন রথী-মহারথী স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের হলেও (কিন্তু তাঁদের প্রায় প্রত্যেকজন অল্পবিস্তর কলকাতার নাগরিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন) অসমীয়া ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ স্বাধীনতার পরবর্তী কালের। গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত 'রামধেনু' নামের পত্রিকায় ছোটগল্পের সেই বিস্ময়কর বিকাশ ঘটে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, আঙ্গিকের নূতন নূতন পরীক্ষায়, দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতা ও জীবনজিজ্ঞাসার সমৃদ্ধিতে ছোটগল্প সমগ্র দেশে এবং বিশ্বে অসমীয়া সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

গ্রাম্যজীবনের ঘনিষ্ঠ ও সঙ্কীর্ণ বন্ধনগুলো ক্রমাগতই ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে, ধনতান্ত্রিক আর মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির প্রসারে পুরনো মূল্যবোধ শুকিয়ে আসছে, জীবনের রূপ ও অর্থ নূতন করে মানুষ খুঁজতে শুরু করছে—এরকম পটভূমিতেই অসমীয়া ছোটগল্পের বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে। এরকম জৈবিক মেটাফর অনেকেরই পছন্দ হবে না, বুঝি। কিন্তু আমার মনে হয় উপমাটা নেহাৎ অর্থহীন নয়। একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্যবসা-বাণিজ্যের সীমিত সম্পর্কের মাঝখানেই গড়ে উঠেছে। তার দৃষ্টিকোণ ও সামগ্রিক জীবনবোধের এক প্রান্তে আছে আধুনিক শিল্পসংস্কৃতি থেকে আহৃত উদার মানবতাবোধ, অন্যদিকে অবস্থিতির তাড়নায় গৃহীত উগ্র এবং অন্ধ জাতীয় চেতনা। সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের দোলায় লেখকের চেতনা আলোড়িত হচ্ছে, ভাবাবেগ স্পন্দিত হচ্ছে স্বকীয় প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে।

সাধারণীকরণ খুবই কষ্টকর। তবে বলা যেতে পারে ব্যক্তিমানসের স্বতন্ত্র অন্তর্মুখী ভাবাবেগ ও ভাবনা, অনিশ্চয়তাবোধ ও উভয়সঙ্কট অনেকগুলি গল্পের কথকতার বহিরঙ্গ। তার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে বিশ্বজনীন আধুনিক মানুষের আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ। স্থিতির অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতা কেবল নাগরিক জীবনের জনসমষ্টিতেই নয়, গোষ্ঠীসংঘাতের ভিতর দিয়েও লেখকরা কখনও-বা প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে যাঁরা গ্রাম থেকে এসেছেন, এবং আজও গ্রামের নিবিড়, নিটোল, সঙ্কীর্ণ জীবন মনের কোণে সযত্নে রেখেছেন, তাঁরা আনকোরা আধুনিক গোষ্ঠীসংঘাত ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন আধুনিকতার ভয়াবহ শূন্যতা এমনকি ফেমিনিস্ট মুক্তির দর্শনও এনে দিচ্ছে একই অস্থিরতা। উদার ধর্মীয় মানবতাবাদী ঐতিহ্যে তাঁরা ঝড়ের মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছেন। সৌরভ কুমার সলিহা (চালিহা লিখিত রূপ হলেও উচ্চারণ এরকমই) নিখাদ নাগরিক চেতনার অধিকারী। তাঁর চিন্তা-চেতনায় আধুনিক বিজ্ঞানের বিমূর্ত সূত্র সতত সঞ্চরণশীল। বাস্তবজীবনে তিনি পদার্থবিদ্যার শিক্ষক। তরুণ বয়সে 'অশান্ত ইলেকট্রন' গল্পে অস্থির ইলেকট্রনের রূপে আধুনিক জীবনের অস্থির আর আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্যহীন গতিশীলতাকে দর্শন করেছিলেন তিনি। আর এখানে সংকলিত গল্পে পরিসংখ্যান গণিতের এক সূত্র ধরে হালকা সুরে মানবীয় সম্পর্ক ও যোগাযোগের অবধারিত প্রয়োজনীয়তার কথা তুলেছেন। কিন্তু যতই হালকা এবং প্রত্যয়জনিত হোক না কেন, সেই আশা কিছুটা Desparate-ও বটে। এটা যেন 'মেলাবেন তিনি, মেলাবেন' গানের বিজ্ঞানসম্মত রিমিক্স। আসলে হালকা কথনভঙ্গী গল্পের অত্যন্ত সিরিয়াস বক্তব্যকে কৌশলে লুকিয়ে রাখছে।

কমলা বরগোহাঞি-র 'আমি একটা সাপ' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, সে তখন নিতান্তই তরুণ লেখক। ম্যাজিক রিয়ালিজমের নাম আমরা তখন কেউ শুনিনি। অবশ্য কাফ্‌কা কেউ-কেউ

পড়েছিলেন। ছোট শহরের সেই পরিবেশে এলিয়েনেশ্যন বা আত্মনির্বাপনের নির্বেদ এমন উদ্ভাবনশীল আঙ্গিক দিয়ে সে ছড়িয়ে দিয়েছিল যে ভাবলে চমৎকৃত হতে হয়। অথচ সমাজটা যুরোপ থেকে ঢের বেশী সরল। আপাত সরল নিরেট সমাজের দেওয়ালে অজস্র দৃশ্য-অদৃশ্য ফাটলের সর্পিল রেখা।

সবগুলো গল্প নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে কিংবা অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু সার্থক গল্পগুলিতে পাঠক অনুভব করে একটা 'সেন্স অব ডিস্‌কভারি'—ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনের এক নূতন উপলব্ধি অথবা অবধান। প্রাত্যহিকতার কুয়াশা ভেদ করে মনে প্রবেশ করে এক আশ্চর্য সংবেদী আলোক। ব্যক্তি ও সমাজের বিচিত্র ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই আমরা লাভ করি, উপযুক্ত টেকনিকের সহায়তায়, অনন্য শৈল্পিক অভিজ্ঞতা—যা চলমান জীবনের অভিনব চৈতন্য।

৩/১১/০৬ হীরেন গোঁহাই

স.ম্পা.দ.ক ক.থা

১৯৯২ সনে অসমীয়া ছোটগল্প একশত বছর অতিক্রম করে দ্বিতীয় শতাব্দীতে পদার্পণ করে। ১৮৯২ সনে 'জোনাকী'-তে প্রকাশিত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া-র 'সেঁউতী'-ই হল প্রথম অসমীয়া ছোটগল্প। কুড়ি শতকের প্রথম চারটি দশকে বেজবরুয়াদেবের নেতৃত্বে সাহিত্য সামগ্রিকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ঘাত-প্রতিঘাত ইত্যাদি বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে ছোটগল্প রচনা করে সাহিত্যের এই বিশেষ ধারাটিকে বেজবরুয়া এক ভিন্ন মাত্রা দান করেছিলেন।

'জোনাকী'-র পরেই ১৯২৯ সনে প্রকাশিত 'আবাহন' অসমীয়া ছোটগল্পের প্রসারণে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগেই জন্মলাভ করা 'জয়ন্তী' একটা যুগ সৃষ্টি করতে সক্ষম না হলেও নতুন চিন্তাধারার সংকেত বহন করে এনেছিল এবং চিরাচরিত চিন্তাধারার উর্দ্ধে মানুষের মুক্তির জন্য নতুন পথের সন্ধানে ব্রতী হয়েছিল। জয়ন্তীতে প্রকাশিত ভিন্ন সুরের গল্প সমূহের অধিক সংখ্যকই ছিল নতুনত্বের বার্তাবাহী এক বিশেষ সাহিত্য সম্পদ।

আবাহনের জন্মমুহূর্তে সমাজজীবন এবং বিশ্বের বৌদ্ধিকজগতে অনেক নতুন ঘটনা এবং তত্ত্বের উন্মেষ ঘটেছিল। এই নতুন চিন্তাচর্চার প্রতিফলন আবাহনের পাতায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পাওয়া গিয়েছিল আর বিশ্বসাহিত্যের বার্তাও 'আবাহন'ই বহন করে এনেছিল।

আবাহন যুগের পরেই অসমীয়া ছোট গল্পের ইতিহাসে অতি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হল 'রামধেনু'

যুগ। পঞ্চাশের দশকে আরম্ভ হওয়া রামধেনু যুগকে অসমীয়া গল্প সাহিত্যের এক সোনালী অধ্যায় বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। মহেশ্বর নেওগের পরে ১৯৫২ সনে বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য রামধেনুর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শ্রী ভট্টাচার্যের সফল এবং সুদীর্ঘ নেতৃত্ব অসমীয়া গল্প সাহিত্যের উত্তরণে এক নতুন মাত্রা লাভ করে। মার্কসবাদ, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, অস্তিত্ববাদ ইত্যাদি নতুন চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক নবীন-প্রবীণ গল্পকার রামধেনুর পাতাতেই তাদের আধুনিকতার বার্তাবাহী বহু উল্লেখযোগ্য গল্প প্রকাশ করেছিলেন।

রামধেনু যুগের মত সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী স্থায়ী সময়ে অনেক গল্পকারের জন্ম হয়েছিল এবং অনেক বিশিষ্ট লেখকের রচনাই এক একটি বিশেষ ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রত্যেক গল্পকারের বিশদ বিশ্লেষণ সম্ভব নয় বলেই আমরা সে ধরণের আলোচনা থেকে বিরত রইলাম।

২.

পঞ্চাশের দশকের আরম্ভে রামধেনু যুগের অনুরণন এই সেদিন পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল বললে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না। কেন না রামধেনু যুগের সক্রিয় প্রভাবের ফলে পরবর্তীকালে এরকম কোন সাহিত্য পত্রিকা প্রাধান্য লাভ করে নি, যাকে কোন সুদূরপ্রসারী বিশিষ্ট চিন্তাধারার বাহক বলে চিহ্নিত করতে পারা যায় অথবা যাকে কোন এক যুগের প্রতিনিধি রূপে অভিহিত করতে পারা যায়।

তবু রামধেনুর পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করা সাহিত্য পত্রিকাগুলির মধ্যে 'মণিদীপ', 'নবযুগ' এবং 'প্রকাশ' অন্যতম। এই তিনটি পত্রিকাই অসমের ছোটগল্পের সম্প্রসারণ এবং উত্তরণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সাম্প্রতিক কালে 'গরীয়সী'-কে গল্পের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক রূপে দেখা যাচ্ছে। তার সঙ্গে নতুন গল্পকার সৃষ্টিতে 'প্রান্তিক' এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। সুখের বিষয় যে সমকালীন অসমীয়া সাহিত্যে কয়েকজন অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিপূর্ণ প্রতিভাবান গল্পকারের পদার্পণ ঘটেছে।

৩

অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতের মত বহুভাষিক দেশে অনুবাদের ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম। 'মুখাবয়ব' গোষ্ঠীর অসমীয়া ছোটগল্পের বাংলা অনুবাদের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের জন্য এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এই সংকলনে সন্নিবিষ্ট গল্পগুলিকেই অসমীয়া সাহিত্যের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক গল্প বলে বিবেচনা করলে ভুল করা হবে। বরং এই সংকলনে সন্নিবিষ্ট গল্পগুলি ছাড়াও অনেক রসোত্তীর্ণ গল্প অসমীয়া সাহিত্যে পাওয়া যাবে। কিন্তু কয়েকজন প্রবীণ লেখক ছাড়া এই সংকলনে নতুন গল্পকারদের অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, আর সেই গল্পকারদের বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন রচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর স্বকীয়তা, আঙ্গিকের নতুনত্ব এবং কথনভঙ্গীর চমৎকারিত্বের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের মধ্যে ছোটগল্পের উপরেই সম্ভবত অধিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। গল্পগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে উল্লেখিত দিকগুলির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই সহৃদয় পাঠকরা কয়েকজন নতুন গল্পকারকেও এই সংকলনে দেখতে পাবেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই সংকলনের সব গল্পই প্রতিনিধিত্বমূলক গল্প বলে দাবী করা হয়নি. কিন্তু প্রতিটি গল্পই বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। বাংলা ভাষার

অনুরাগী পাঠক এই গল্পগুলির মধ্য দিয়ে এক বিশেষ স্বাদের সন্ধান পেলেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

অনুবাদের মত একটা জটিল প্রক্রিয়ায় এতগুলি গল্প একাই অনুবাদ করার যে গুরু দায়িত্ব বাসুদেব দাস মাথা পেতে নিয়েছেন, তার জন্য বাসুদেব দাস প্রশংসার পাত্র। অন্যদিকে 'মুখাবয়ব' গোষ্ঠীর হয়ে দেবব্রত দেব এবং শ্যামল ভট্টাচার্য এই প্রচেষ্টার সফল রূপায়ণে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তার জন্য তারা অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

পংকজ ঠাকুর
গুয়াহাটি
০৮/১১/২০০৬

আ . লো . ক . পা . ত ১

অসমিয়া সাহিত্যের চলমান কালখণ্ডের ছবিটা আশানুরূপ উজ্জ্বল নয়। নানা কারণে সামগ্রিকভাবে অসমিয়া সাহিত্য এখন কিছু হীনদশায় পড়েছে। বিশেষ করে দিক্‌পালদের একে একে বিদায় কিংবা অবসর গ্রহণের পর তাঁদের শূন্যস্থান ভরাট করার জন্য সাহিত্যের আসরে যাঁরা এসেছেন তাঁদের অধিকাংশই পূর্ববর্তীদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো সৃজনশীলতার অধিকারী নন। কি মানে, কি পরিমাণে কোনোভাবেই এঁদের সঙ্গে তাঁদের তুলনা চলে না। সবাই সাধ্যমতো লিখে যাচ্ছেন, পাতা ভরছে, বই ছাপা হচ্ছে কিন্তু প্রতিভার দ্যুতিতে অসমিয়া সাহিত্যে ঝড় তোলার মতো সৃজনক্ষমতা কারোর মধ্যে বিশেষ চোখে পড়ছে না। অনেকের লেখার পরিমাণ কম, অনেকে কিছুদিন ভালো লিখে হাত গুটিয়ে নিচ্ছেন। অনেকে আবার প্রত্যাশিত মান ধরে রাখতে না-পেরে চাহিদা নিম্নগামী হচ্ছে দেখে হতাশায় ভুগছেন, লেখাই ছেড়ে দিচ্ছেন।

আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। অসমিয়া সমাজে প্রতিভার কদর খুব বেশি। নবীন প্রতিভাকে উৎসাহদানে অকৃপণ। বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনো উজ্জ্বল প্রতিভাকে আবির্ভূত হতে দেখলে, তাঁর মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের সম্ভাবনা দেখতে পেলে, সমালোচক, সম্পাদক, সাধারণ পাঠক সবাই বিশাল উৎসাহে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। এর ফল অবশ্য সব সময় ভালো হয় না, অনেক সময় অনেকে আত্মপ্রকাশ করেই সবাইকে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে খ্যাতির শিরোপা পাবার পর নিজের

সীমাবদ্ধ প্রতিভার দরুণ মানসম্পন্ন লেখার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে না-পেরে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। একবার একটি গল্প লিখে এক নবীন গল্পকার এমন সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন যে একটি অসমিয়া দৈনিক কাগজে তা নিয়ে দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। সেই সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল যে এই নবীন গল্পকারের হাত ধরে অসমিয়া সাহিত্য মোড় ফেরাবে—সাহিত্যে নবযুগ আসবে। কার্যত তা হয়নি। কিছুদিন ভালো কিছু লেখার পর সেই গল্পকার আসর থেকে সরে দাঁড়ান এবং ভিন্নতর অর্থকরী বিদ্যায় মনোযোগী হন। তাঁর অবস্থা ফিরলেও অসমিয়া সাহিত্য মোড় ফেরাতে পারেনি।

সে যাহোক, এ সময়ের অসমিয়া সাহিত্যের চিত্রটা আশাব্যঞ্জক মনে না-হলেও দুটি ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক, কবিতায়, আর দুই, ছোটোগল্পে। অসমিয়া ভাষায় ইদানিং খুব ভালো কবিতা লেখা হচ্ছে। কবির সংখ্যাও অনেক। পাঠকসমাজের আনুকুল্য পেয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং উৎসাহী। ভাষান্তরিত হয়ে তাঁদের অনেকে সর্বভারতীয় খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ব্যাপারটা অসমিয়া সাহিত্যের পক্ষে স্বাস্থ্যকর এবং আশা-সঞ্চারক।

অসমিয়া গল্পের ক্ষেত্রেও একই রকমের ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমনিতে অসমিয়া গল্পসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং এর আছে ঐতিহ্যময় ধারাবাহিকতা। আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যের সূচনাপর্বে যে গল্প-ভুবন তৈরি হয়েছিল তার গৌরবময় বিস্তার এখনও অব্যাহত আছে। সেই ভুবনের সমসাময়িক গল্পকাররা খুব ভালো গল্প লিখছেন। তাঁরা ধরে রাখছেন তাঁদের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা।

অসমিয়া সাহিত্যে এখন যাঁরা ছোটোগল্প লিখে অসমিয়া গল্পভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন, অপূর্ব শর্মা, জেহিরুল হুসেইন, মনোরমা দাস মেধি, অরূপা পটঙ্গীয়া কলিতা, রবীন শর্মা, শিবানন্দ কাকতি, বিপুল পাটনিয়ার, নবনীতা গগৈ, ইমরান হুসেইন, প্রণবজ্যোতি ডেকা, মনোজ কুমার গোস্বামী, দেবব্রত দাস, ভূপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, জ্যোতিষ শিকদার প্রমুখ কথাকাররা।

অপূর্ব শর্মা বহুদিন যাবৎ গল্প লিখছেন কিন্তু তাঁর গল্পের পরিমাণ বেশি নয়। বোঝা যায় তিনি পরিমাণের চাইতে মানের প্রতি অধিক মনোযোগী। সম্ভবত এর ফলেই তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গল্প নিটোল শিল্পকর্ম হয়ে অসমিয়া সাহিত্যে স্থায়ী আসন পেয়ে গেছে। লেখক নিজের একটি কথনশৈলী আয়ত্ত করে নিয়েছেন যার জন্য তাঁর গল্পকে আলাদাভাবে চেনা যায়। আঙ্গিক সচেতনতার সঙ্গে সমাজসচেতনতাজাত বিষয় নির্বাচন তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁকে বলা চলে শব্দ আর বাক্যের নিপুণ শিল্পী। তাছাড়া তাঁর মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতাও তারিফযোগ্য। টান টান মেদহীন তাঁর গদ্য, পাঠককে আগাগোড়া মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। চারপাশের সময়-সমাজ-মানুষ-রাজনীতি-অবক্ষয়- বিপর্যয় ইত্যাদির প্রতি তীব্র অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি রাখেন বলে তাঁর গল্পে পাওয়া যায় তার জীবন্ত কিন্তু নির্লিপ্ত ভাষ্য যা পাঠককে ভাবায়, অস্থির করে তোলে। একজন সৎ শিল্পীর সার্থকতা এখানেই। আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের সহাবস্থান তাঁর গল্পে অদ্ভুতভাবে টের পাওয়া যায়। তাঁর অনেক গল্প চিত্রনাট্যের মতো বলা যায় ক্যামেরায় ধরে রাখা দৃশ্যের মতো। চোখের সামনে কাহিনী মূর্ত হয়ে ওঠে পারিপার্শ্বিক বৃত্তান্ত সমেত।

'বাঘে টানুর রাতি'—অপূর্ব শর্মার একটি উৎকৃষ্ট গল্প। (এই নামে লেখকের একটি গল্প সংকলন আছে এবং তার জন্য তিনি ২০০০ সালে 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান)। *'বাঘে টানু'* ব্রহ্মপুত্রের

একটি চরের নাম। এখানে '*প্রকৃতি প্রবল, মানুষ নগণ্য। বিশাল নদ বিশালতর বালিময় প্রান্তর, বাধাহীন আকাশ আর বহমান জলরাশি, প্রকৃতি সবাইকে অভিভূত করে, মানুষের ক্ষুদ্রতা, নীচতা, দৈন্য, দুঃখ, পাপ, পঙ্ক সবার অগোচরে কোথাও পড়ে থাকে।*'

গল্পের নায়ক, বলা ভালো, কেন্দ্রীয় চরিত্রটি চার ক্লাস শেষ করার আগেই অবস্থার চাপে এক ভুঁইফোঁড় স্বর্ণকারের হয়ে মোষ চরাতে এখানে আসে। তার বাপ দাগী চোর। মা, সে পরে জানতে পারে, অন্য একজনের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। বিচিত্র তার অভিজ্ঞতা। দুঃখ, অবহেলা, স্মৃতি, হীনম্মন্যতা, স্বপ্ন ইত্যাদি নিয়ে সে বড় হয়ে ওঠে। এই কেন্দ্রীয় চরিত্রটির মাধ্যমে চেতনাস্রোত পদ্ধতিতে লেখক গড়ে তুলেছেন তাঁর আখ্যান। মানুষের যাপন সমস্যা আর ভয়ংকর নিঃসঙ্গতার এই আখ্যানটি হয়ে উঠেছে চিরকালীন মানুষের চিরকালীন সমস্যার এক বিরল দলিল। প্রকৃতি আর নদীকে তিনি এখানে মমতা আর আশ্রয়ের প্রতীক করে তুলেছেন। গল্পের শেষে নদীর মতো এক নারীকে নিয়ে নায়ককে নদীর আশ্রয়ে অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করতে দেখা যায়। নারী প্রশ্ন করে, 'ওপারে গিয়ে পৌঁছব তো?' ও জবাব দেয়, 'না পৌঁছলেও ক্ষতি নেই।'

হরেকৃষ্ণ ডেকা কবি ও গল্পকার। দু-ক্ষেত্রেই তাঁর সমান খ্যাতি। ১৯৮৭ সালে তাঁকে 'আন এজন' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম 'বন্দিয়ার'। এই গল্পের জন্য তিনি ১৯৯৫ সালে সর্বভারতীয় 'কথা' পুরস্কার পান।

'বন্দিয়ার' (কয়েদি) গল্পটি দীর্ঘ অথচ 'গল্প' সামান্য। এখানে গল্পকার শুনিয়েছেন সন্ত্রাসবাদীদের হাতে পণবন্দি একজন মানুষের কথা। লেখক দেখিয়েছেন দিনের পর দিন মাসের পর মাস বন্দিদশায় থেকে অহরহ স্থান পাল্টাতে পাল্টাতে কী করে বন্দীর মানসিক অবস্থা পাল্টে যায়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে সে ক্রমে বন্দী অবস্থায় নিজেকে নিরাপদ বোধ করে। পুলিশ মিলিটারি এসেছে বা আসছে শুনলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদীদের আচরণও অদ্ভুত লাগে। তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব ঝিলিক দিয়ে ওঠে আবার খুব ঠান্ডা মাথায় নিষ্ঠুরতা করতেও দেখা যায়। একবার সেই বন্দীকে ডায়রিতে মুক্তির অনিশ্চয়তার কথা লিখতে দেখে প্রহরারত ছেলেটি বলে, 'আপনি মুক্তির জন্য ব্যাকুল, তাই না? অথচ দেখুন, আপনার সরকার আপনার কথা একটুও ভাবছে না। আমরা কয়েকটি শর্ত দিয়েছি, সেই শর্তগুলো মেনে নিলেই আমরা আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি।' সে তখন বলে, 'আর যদি শর্তগুলো মেনে না নেয়?' তার কথায় ছেলেটা একটু হকচকিয়ে যায়। সে একটু ভেবে হেসে বলে, 'তখন আপনি আমাদেরই একজন হয়ে থেকে যাবেন। মন্দ কি?' অবশেষে বন্দী তার মুক্তির কথা ভাবাই ছেড়ে দেয়। বন্দিত্বকেই জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা বলে মেনে নেয়। অসাধারণ দক্ষতায় লেখক সন্ত্রাসবাদী আর পণবন্দীর মানসিকতা, সন্ত্রাসবাদী দলের ক্যাডারদের বিশ্বাস, আদর্শনিষ্ঠা, সতর্ক নির্বিকার আচরণ ইত্যাদি এই গল্পে বিধৃত করেছেন।

হরেকৃষ্ণ ডেকার গল্প বহুমাত্রিক। বিস্তর তার পরিধি। তাঁর ভাষা আটপৌরে কিন্তু শৈলী অভিনব, চিত্তাকর্ষক। বিভিন্ন গল্পে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার পসার মেলেছেন তিনি। ব্যক্তিচৈতন্যের জটিলতা বিশ্লেষণে তিনি ব্যতিক্রমী মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। তাছাড়া চলমান ঘটনাপ্রবাহের প্রতি মনোযোগ তাঁর গল্পে সমাজ বাস্তবতা ও সমকাল-মনস্কতা আনতে সাহায্য করেছে। তিনি যথার্থই সমাজ ও শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ কথাশিল্পী।

কথাশিল্পী হিসেবে ড. প্রণবজ্যোতি ডেকা ভিন্ন ঘরানার। তাঁর কথনভঙ্গি সমসাময়িক আর কোনো লেখকের সঙ্গে মেলে না। জীবনবোধের গভীরতা আর প্রথা ভাঙার প্রবণতা তাঁকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য। মানবজীবন ও মনের অতলে ডুবে ডুবুরির মতো তিনি তুলে এনেছেন মূল্যবান মণিমুক্তো। অসমিয়া সাহিত্যের সনাতন গল্পরীতি আর রক্ষণশীলতা ভেঙে তিনি একধরণের পুরুষালি ভাব এনেছেন। প্রান্তিক সমাজের বহুদিনের বহু কথা খুঁটিনাটিসহ তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে। জীবন্ত রূপ পেয়েছে অনেক অচেনা দিক। কিন্তু অজ্ঞাত কোনো কারণে তিনি অসমীয়া সাহিত্যে যথাযোগ্য মর্যাদা পাননি। তিনি উপেক্ষিত কিন্তু ব্যতিক্রমী গল্পকার। তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন এখনও হওয়া বাকী। 'অনির্গম পথ', 'বৈহতা', 'সোধা ন'হল', 'পোহা বাঘ' ড. ডেকার বিখ্যাত গল্প।

'অনির্গম পথ' লেখকের অত্যন্ত উঁচুমানের একটি গল্প। অসমিয়া সাহিত্যে এ-ধরণের গল্প খুব বেশি লেখা হয়নি। তাছাড়া আকারেও গল্পটা বড়—এত বড় গল্প লেখার চল অসমিয়া ভাষায় খুব একটা নেই।

পঞ্চাশের দশকের পটভূমিতে একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারকে নিয়ে লেখা গল্প। আরফান, তার মামা ইমরান আর মামী হাসনা। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আরফান, বয়সে কিশোর। গ্রাম থেকে এসেছে গুয়াহাটি শহরে থেকে লেখাপড়া করে মানুষ হবে বলে। মামা দমকল-মিস্ত্রি, সারাদিন কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়, কাজ করে, যা পায় মদ খেয়ে ওড়ায়। তার একটি সাইকেল সারাইয়ের দোকান আছে। মাঝেমধ্যে সেখানে বসলেও দোকান চালায় মূলত আরফান—স্কুলে যাবার আগে এবং স্কুল থেকে ফিরে দোকান খোলে। আরফানের চোখ দিয়ে আমরা দেখি জগত-সংসারের আসল রূপ।

আরফান স্কুলে যায়। সেখানে পায় অবহেলা আর মানসিক পীড়ন। সহপাঠীরা নিষ্ঠুর। তাদের কেউ কেউ ওকে দেয় নিষিদ্ধ-জগতের খোঁজ। মামার যৌনাঙ্গের রোগ। লোকটা পুরুষত্ব হারিয়ে ক্রমশ ক্ষয়ে যেতে থাকে। মামী নিঃসন্তান, আবেদনময়ী এবং কিছুটা ছিনাল প্রকৃতির। জমি বিক্রি করে সে স্বামীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। গ্রাম থেকে খবর দিয়ে আনে কোনো এক ভাইকে, চিকিৎসা (অপারেশন) অসফল। মামা হাসপাতালে দিন গোনে মৃত্যুর।

এদিকে আরফান পড়া ছেড়ে দেয়। এক সহপাঠীর কল্যাণে সিনেমা হলের টিকিট ব্ল্যাকারের জগতে জড়িয়ে যায়। দেখে সেখানকার জীবন। পাশাপাশি সে অন্য উৎস থেকে শোনে কমিউনিস্টদের কাজকর্মের কথা, সোভিয়েত রাশিয়ার কথা, দুনিয়া যে পাল্টে যাবে, সমাজতন্ত্র আসবে তার কথা। ও সামান্য কিছু কথা বোঝে, অনেকটাই বোঝে না। অনেক কথার উত্তর পায় না, ধাঁধার মতো ঠেকে। তবে তাকে যে সব ভালো ভালো কথা জনৈক কমিউনিস্ট শুনিয়েছিল তার মধ্যে একটি কথা তার বেশ মনে ধরেছিল। কমিউনিস্ট সরকার এলে *'গরিব মানুষের, বিশেষ করে ওর মতো কাজ করে খাওয়া ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ফেল করলে তা স্কুল মাস্টারের দোষ বলে ধরা হবে। মাস্টারকে বিনি পয়সায় ছাত্রের বাড়ি গিয়ে তখন টিউশন নিতে হবে যাতে সে পরের বার পরীক্ষায় পাস করতে পারে। ছাত্র যদি ফেল করে তাহলে তাঁর মাইনে বন্ধ। চমৎকার!'*

আরফান কৈশোরেই জেনে যায় বহু কথা। মানুষের লোভ, নির্মমতা, পাপ, লালসা, যৌন বিকৃতি, নৈতিক স্খলন ইত্যাদি সে অসহায়ের মত্রো দেখে। দেখে ঘরে-বাইরে প্রবঞ্চনা। মামা তাকে সাইকেলের

কাজ শেখানোর কথা ছিল, শেখায়নি। *'সাইকেলের কাজ ও যেটুকু শিখেছে গাঁয়েই শিখতে পারত। মামা ওকে যান মেরামতির কাজও কিছু শেখাল না। আজ শেখাব, কাল শেখাব করতে করতে অসুস্থই হয়ে পড়ল। মামা আজ নয়তো কাল মারা যাবে, তারপর কী হবে?'*

গল্পের শেষে দেখা যায় যে একদিন যখন সে এক দুঃস্বপ্নের মতো অভিজ্ঞতা নিয়ে, প্রথম খাওয়া মদের নেশা আর অভুক্ত পেটে চুপচাপ বাড়িতে এসে শুয়ে পড়ে তখন কানে আসে পাশের ঘরে মামী আর তার ভাইয়ের কথোপকথন। সে জানতে পারে এ-ভাই আসলে ভাই নয়, মামা যখন পল্টনে চাকরি করত, বাইরে থাকত, তখন মামী এর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকত। পরে মামা বাড়ি এলে মামী ফের সতীসাধ্বী সেজে মামার হাত ধরে সংসার করতে এখানে চলে আসে। এখন মামার মৃত্যু সমাগত জেনে মামার সম্পত্তি আত্মসাৎ করে ফের পুরনো জীবনে ফিরে যাবার ছক আঁটছে। ওরা এখন মামার মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে। পাশের ঘরের কথোপকথন শুনে আরফানের মাথায় রক্ত উঠে আসে। লেখক গল্প শেষ করেছেন এইভাবে—

'ডান্ডা, ডান্ডা—বাঁশের ডান্ডা হলেই চলবে, অথবা একটা লোহার রড। আরফার অন্ধকার হাতড়ে বাইরে এল। ও জানে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করাব ডান্ডাটা কোথায় থাকে, সেটা নিয়েই হবে। দুটো বারি মারলেই চলবে। ও অন্ধকারেই হাতড়ে দেখল. আছে—ওটা স্বস্থানেই আছে। আরফান দুহাতে ডান্ডাটা তুলে নিল। অন্ধকারে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল মামীদের দিকে, জমি এত হিলছে কেন? পায়ে কি জোর নেই নাকি? মাথা ঘোরাচ্ছে আরফানের। ও অন্ধকাবে হোঁচট খেল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল। হাত থেকে ডান্ডাটা ছিটকে গেল। মাটি খামচে উঠতে গিয়েও আবার পড়ে গেল পা পিছলে। আরফান কাঁদতে শুরু করল। প্রথম প্রথম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, তারপর হাউ হাউ করে। শুরু হলো বমি। ঝাল-ঝাল, টক-টক বমি!!!'

গল্পের ভাষা অভিনব। সংলাপে দো-আঁশলা ভাষার ব্যবহার বাস্তবসম্মত। সেই সঙ্গে আছে ইতর শব্দের যথাযথ প্রয়োগ। আছে যৌনতার সূক্ষ্ম ও স্থুল উপস্থিতি। অসমিয়া সাহিত্যে এসব সচরাচর চোখে পড়ে না। সমাজ, রাজনীতি ও ব্যক্তিমানুষের সমালোচনা গল্পে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছে।

শিবানন্দ কাকতি নিয়মিত লেখেন না। কিন্তু খুব ভালো লেখেন। স্বাদু ভাষার জন্য তাঁর সব গল্পই উতরে যায়। তাঁর গল্পের কেন্দ্রে থাকে গ্রাম। লোকজীবন ও লোকায়তিক সংস্কার বিশ্বাস ইত্যাদি তিনি তাঁর গল্পে ব্যবহার করেছেন শিল্পকুশলতার সঙ্গে। গল্পের অধিকাংশ চরিত্রই গ্রামীণ মানুষ। সাধারণ দেহাতি মানুষকে তিনি অত্যন্ত দরদ দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। বলেছেন আলো আঁধারের নানা আখ্যান। কাকতির গল্প ট্র্যাডিশনাল—পরম্পরাগত। তিনি গল্পের আঙ্গিক নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নি। তাঁর জোরটা মূলত যথাযথ বিন্যাসের প্রতি। অনেকটা চিত্রনাট্যের ঢঙে তিনি চালচিত্র সমেত তুলে ধরেন জীবনের জীবন্ত উপাখ্যান। মানুষের পাপ-পুণ্য, লোভ-লালসা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, নবীন-প্রবীণের সংঘাত, সামন্তযুগীয় মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক মূল্যবোধহীনতার সংঘর্ষ ইত্যাদির আখ্যান বলে যান নিস্পৃহভাবে।

নাগরিক জীবনের গল্প তিনি কম লিখেছেন কিন্তু যা লিখেছেন তা নির্দিষ্ট মান ছুঁতে পারেনি। কিছু কিছু গল্প তিনি যাদুবাস্তবতার আদলে লিখেছেন। সেখানে বাস্তব আর অবাস্তবের ভেদরেখা মুছে

যায় 'ফ্যান্টাসি' ব্যবহার করার দরুণ। তাতে তিনি বর্তমান পৃথিবীর আধুনিক প্রাকৃতিক ভোগবাদী মানুষের অবক্ষয় আর পতন ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এই রীতির গল্পে তিনি সফল এমন বলা চলে না। তবে তাঁর প্রয়াস অসমিয়া সাহিত্যে ব্যতিক্রমী। 'উড়নীয়া বেলুন' এরকম একটি গল্প। কাকতির জনপ্রিয় গল্পগুলোর মধ্যে আছে 'বরণীয়া আলিবাট', 'সহাবস্থান', 'খরমান', 'সদগতি', 'অর্থভেদ', 'নাইকিয়া', 'সসাগরা' প্রভৃতি।

অসমিয়া সাহিত্যে ইমরান হুসেইন-এর আবির্ভাব একটি ঘটনা। আত্মপ্রকাশ করেই তিনি অনেকের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছেন। বোদ্ধা পাঠক ও কট্টর সমালোচক দু'তরফ থেকেই তিনি সমাদর ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর লেখার পরিমাণ খুব কম। গত দশ বছরে তিনি সাকুল্যে সাত-আটখানা গল্প লিখেছেন। প্রতিটি গল্পই ভালো, শিল্পের শর্তাবলী রক্ষা করে সার্থকতায় পৌঁছেছে। অসমিয়া সাহিত্যে তাঁর গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও একথা বলা যায় যে তাঁর গল্প সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসেনি। তাঁর পরবর্তী রচনাবলীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

ইমরান হুসেইনের গল্প বহুস্তরীয়। স্তরে স্তরে সাজানো থাকে বহু উপাখ্যান, বহু অনুষঙ্গ। পাঠান্তে অনুভব করা যায় লেখকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা আর বাস্তবতাবোধ। আঙ্গিকের প্রতি সচেতনতা তাঁর প্রতিটি গল্পে টের পাওয়া যায়। প্রতিটি গল্পে তিনি আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর গল্পে লোকায়তিক উপাদান যেমন আছে তেমনি আছে নাগরিক উপাখ্যান। প্রচলিত মিথের পুনর্নির্মাণে তিনি অসাধারণ কুশলতা দেখিয়েছেন। অসমিয়া সমাজের একটি জনবিশ্বাসকে তিনি বিস্ময়কর দক্ষতায় ব্যবহার করে নির্মাণ করেছেন তাঁর 'বাঁক' গল্পটি। 'হুকুমদেও' গল্পে এনেছেন লোকাচার, উপকথা ও লোকবিশ্বাসের বিবিধ উপাখ্যান। অন্যদিকে আবার 'বশীকরণ' গল্পে এক বেদেনির ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন বিশ্বায়নের নানা অনুষঙ্গ। কথনরীতি ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের জন্য ইমরান হুসেইনের গল্প স্বভাবত স্বতন্ত্র।

মনোজ কুমার গোস্বামী গত শতকের আশির দশকে আত্মপ্রকাশ করে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। তবে তিনি বেশ কিছুদিন বেশ কিছু ভালো গল্প লেখার পর ইদানীং গল্প লেখা প্রায় ছেড়ে না-দিলেও খুব কমিয়ে দিয়েছেন। তবু এযাবৎ তিনি যা লিখেছেন তার জন্য অসমিয়া সাহিত্য জগতে তিনি লোকপ্রিয়। তাঁর ভাষা ঝরঝরে, গল্প নিটোল। কিছু কিছু গল্পে আভ্যন্তরীণ সংহতি দুর্বল, যদিও পরিস্থিতি পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের ভেতর তিনি যে শ্লেষ আর মৃদু কৌতুকাভাস ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে সেই দুর্বলতা তুচ্ছ হয়ে যায়। সমকালীন সমাজের রাজনৈতিক ও মানসিক সংকট তাঁর গল্পের অনেকখানি জায়গা দখল করে আছে।

'সমীরণ বরুয়া আহি আছে' লেখকের একটি বিখ্যাত গল্প। অসম আন্দোলনের পরিণতি ভালো হয়নি। অসমিয়া যুবমানসে দেখা দেয় হতাশা। অনেকে বিকল্প পথ হিসেবে সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দেয়, স্বাধীন অসমের স্বপ্ন দেখে। অনেকে জনজাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সাব্যস্ত করার আন্দোলনে নামে। এই পটভূমিতে গল্পটার বিস্তার। সমীরণ বরুয়া সমাজ বদলের অঙ্গীকার নিয়ে সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দেয়, হয় নেতা। কিন্তু সেখানে সে সঞ্চয় করে হতাশা, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। লুকিয়ে কাজকর্ম করার শৃঙ্খল, সহযোদ্ধাদের বিশ্বাসঘাতকতা, অনিশ্চয়তা ইত্যাদির পীড়ন সহ্য করে হতোদ্যম ক্লান্ত সমীরণ ঘরে ফিরে আসে। তার প্রত্যাবর্তন সমাজের চোখে বিচিত্র রূপ পায়।

প্রত্যেকের কাছে সে আলাদা আলাদা তাৎপর্যের বাহক। প্রাক্তন প্রেমিকার কাছে সে উদ্বেগের কারণ। পুলিশ অফিসারের কাছে সে পদোন্নতির সোপান। বাবার কাছে সে ত্রাস। তিনি অশুভ সংকেত পাচ্ছেন তার এই প্রত্যাবর্তনে। ইত্যাদি। সন্ত্রাসবাদ বা বিপ্লব এখানে পণ্য। নায়কের ফিরে আসার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের স্বার্থপরতা এখানে নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমীরণ বরুয়া একটা প্রতীক এবং প্রতীকটাকে বহুভাবে ব্যবহার করা যায়। বিপ্লবের শ্লেষটা লেখক সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন ঃ

'...শেষ বাদামটা হাতে নিয়ে বাদাম মোড়া কাগজটা মুচড়ে ফেলতে গিয়ে সমীরণ দাঁড়িয়ে পড়ল। কাগজটাতে খবরের কাগজের টুকরোটাতে স্পষ্ট কয়েকটি ছাপা হরফের সারি। একটা নিউজ হেডলাইন, সমীরণ বরুয়া আসছে ...

'ভেতরে ভেতরে সে কেঁপে উঠল। বিব্রত ভঙ্গিতে কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে। শহরের পথ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে অগুণতি লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া। রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ছে হাসি চিৎকার গান।'

'হাতের কাগজের টুকরোটা ও ছেড়ে দিল। এক ঝাঁক শুকনো বাতাসে উড়ে সেই অমোঘ সংবাদ মহানগরের ব্যস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।'

মনোজ গোস্বামীর সমসাময়িক আরেকজন গল্পকার আশির দশকে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি জ্যোতিষ শিকদার। ইনি মানুষের মনের গহনে আলো ফেলে অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের কেন্দ্রবিচ্যুত আত্মবিচ্ছিন্ন মানুষের বিচিত্র সমস্যা ও আত্মিক সংকটের কানাগলি। তাঁর গল্পের চরিত্ররা মনে হয় যেন আদিভৌতিক জগতেব বাসিন্দা। জাগতিক অসুখ-বিসুখ আর বিকৃতি তাদের ঠেলে দিচ্ছে দূরের দিকে, মানুষ হয়ে পড়ছে বিচ্ছিন্ন, একা এবং দ্রোহী। নিষ্পেষিত নিঃসঙ্গ মানুষকে নিয়েই তাঁর কাজ।

'গান ভাল পোয়া ছোয়ালীজনী', 'কেইটামান মরা মাছ আরু গৃহকন্দলর পাতনির শেষত', 'অনুবীক্ষণ', 'রংবোর কেনিবা গ'ল', 'অবলোকন' ইত্যাদি গল্প মনে রাখার মতো।

দেবব্রত দাস গল্প লেখা শুরু করেন সত্তরের দশকে। 'অচিন চহরত মই অথবা এলিচ' লিখে তিনি রাতারাতি পাঠকমনে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। কলকাতার পটভূমিতে কলকাতাকে কেন্দ্র করে লেখা গল্প। সে সময় গল্পটা বেশ নতুনত্ব নিয়ে অসমিয়া সাহিত্যে হাজির হয়েছিল। কলকাতার দ্বৈত সত্তা—সুন্দর-অসুন্দর, ভালো-মন্দ, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে লেখক তার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। প্রবাসী এক নাগরিকের চোখ দিয়ে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে দেখিয়েছেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অসাম্য, ক্লেদ, গ্লানি। তিনি দোষারোপ করে কলকাতাকে বলেছেন ঃ

'ওহে কলকাতা, মধ্যবিত্তের স্বর্গ, কেরাণিকুলের আরাধ্য কলকাতা! তোমার যদি সত্যিকারের ক্ষমতা থাকে তাহলে এই বাসবোঝাই অফিসযাত্রীদের মধ্য থেকে অন্তত একটি এরকম উজ্জ্বল মুখ দেখাও যার দুই ভুরু কুঁচকে যায়নি, যার অবয়ব সন্তুষ্টিতে এখনও সম্পূর্ণ—এরকম একটি উজ্জ্বল মুখ আমাকে দাও—পারবে দিতে?'

বামপন্থী রাজনীতি প্রভাবিত বলে দেবব্রত দাস-এর প্রায় সমস্ত গল্পে রাজনৈতিক চেতনা প্রকট।

তিনি তাঁর গল্পে মন্তাজ-রীতি ব্যবহার করেন কাহিনীর ধারাবাহিক গতি আটকে তার ফাঁকে নিজস্ব বিচার-বিশ্লেষণ তুলে ধরার জন্য, অনেকের মতে রাজনৈতিক চেতনা জাগানোর জন্য এটা একটা উপযুক্ত কৌশল। মন্তাজ আকারে বিন্যস্ত খণ্ড-কাহিনীগুলো পুরো গল্পের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। অবহেলিত নিন্দিত মূল সমাজবহির্ভূত অনেক চরিত্র তাঁর গল্পে এসেছে এবং তাদের মমতা ও সহানুভূতির সঙ্গে তিনি তাঁর গল্পে ঠাঁই দিয়েছেন। 'অর্পিতার এরাতি', 'দীঘাত দুদিন', 'হয়তোবা ভেশচন', 'আশংকার কবরলৈ' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত গল্প।

প্রশান্ত কুমার দাস উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত সমাজ-সংসারের জীবন ও তার অন্তর্দ্বন্দ্ব, দ্বিধাগ্রস্ততাকে কেন্দ্র করে তাঁর গল্পমালা তৈরি করেন। তিনি লিখছেন অল্প কিছুদিন যাবৎ। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি অসমিয়া সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছেন। উত্তর-আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা, অবসাদ আর অ্যাবসার্ডিটি তাঁর গল্পে তীব্রভাবে অনুভব করা যায়। তাঁর গল্পের অনেক চরিত্র মর্বিডিটি আক্রান্ত এবং তারা সীমাহীন অবসাদ নিয়ে এক মনোরাজ্যে বিচরণ করে। তাঁর গল্প পড়লে মনে হয় মানব জন্মটা একটা দুর্ভাগ্য। জীবনে কোনো উত্তাপ নেই, শুধু ক্লান্তির কাল ক্ষেপন। 'পর্যবেক্ষণ', 'অধিগ্রহণ' ইত্যাদি গল্পে তিনি বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

মৌসুমী কন্দলী নবীন গল্পকার। তিনি খুব যে লিখেছেন তা নয়। তবে যে-কটা গল্প এ-পর্যন্ত তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছে তা পাঠকরা পছন্দ করেছেন। বিশেষ করে 'জোনাকত চেঁকীয়াবোর' অনেকের মনে দাগ কেটেছে। 'লায়াদা নাচর শেষত' গল্পটাও ট্রিটমেন্টের গুণে উতরে গেছে এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছে। মৌসুমীর গল্পেও বিষাদ আর ক্লান্তি, জাগতিক বেদনা আর অর্থহীনতা, গভীর অস্থিরতা আর ব্যর্থতার আখ্যান।

জয়ন্ত চক্রবর্তী, দীপক শর্মা, বিকিরণ বরদলৈ, প্রশান্ত রাজগুরু, অপূর্ব কুমার শইকীয়া প্রভৃতি গল্পকাররাও ইদানীং ভালো গল্প লিখছেন। এছাড়া আরও কয়েকজন আছেন যাঁরা নানাভাবে বিশিষ্টতা অর্জনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলা সাহিত্যের মতো অসমিয়া সাহিত্যেরও একটি সমৃদ্ধ প্রগতিশীল সাহিত্যধারা আছে। প্রগতিসাহিত্য বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় বিশ্বাসী এবং সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন। অন্যান্য শাখার চাইতে এর গল্পশাখা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রগতিশীল গল্পকারদের মধ্যে যাঁরা সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিপুল খাটনিয়ার, রত্নেশ্বর মেধি, মনোরমা দাস মেধি, অরূপা পটঙ্গীয়া কলিতা, রবীন শর্মা, জহিরুল হুসেইন প্রমুখ।

প্রগতিশীল গল্পকারদের ভাবজগৎ মোটামুটি এক। নির্দিষ্ট ছকে গল্প এগোয়। গল্পে থাকে একটা বক্তব্য, আড়ালে কাজ করে একটা মতাদর্শ। ফর্ম বা আঙ্গিক তাঁদের লেখায় ততোটা গুরুত্ব পায় না, যতটা গুরুত্ব পায় বিষয়বস্তু। এর ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের গল্প শিল্পগুণহীন হয়ে বিশুদ্ধ ডকুমেন্টারি হয়ে পড়ে। অনেক সময় তা উদ্দিষ্ট পাঠকরা উপেক্ষা করেছেন। অথবা বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী পাঠকদেরই শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে আবার যে সমস্ত গল্পে আঙ্গিক আর বিষয়বস্তুর সুষম প্রয়োগ ঘটেছে সেসব গল্প দলমত নির্বিশেষে সকল পাঠকের মন জয় করেছে। বামপন্থী সমালোচকদের সুরে সুর মিলিয়ে মূলস্রোতের (বুর্জোয়া) সমালোচকরাও সেই সব গল্পের

প্রশংসা করেছেন।

মনোরমা দাস মেধি বামপন্থী গল্পলেখক। তবে তাঁর লেখায় নারীবাদী চেতনাও প্রবল। বামপন্থায় আস্থাশীল থেকেও তিনি নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর লেখায় নারী জীবনের কথা সেভাবেই এসেছে। তাঁর একটি পরিচিত গল্প 'পৌরুষ'। সাধারণ গল্পের মতোই এর কথনরীতি। উচ্চশিক্ষিত অভিজাত কয়েকটি যুবক সাধ করে একদিন দলবেঁধে অরণ্যে ঢোকে। ওরা প্রকৃতিপ্রেমী। হাতে ক্যামেরা, বাইনোকুলার। প্রকৃতির শোভা উপভোগ করতে করতে ওরা হঠাৎ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। ওদের মনে হলো অস্ত্র থাকলে সুন্দর সুন্দর পাখিদের মেরে পাখির পোড়া মাংস দিয়ে বেশ একটা পিকনিক করা যেত। বাসনা চরিতার্থ করতে না পেরে ওরা শিকার কাহিনী বলে আসর জমিয়ে তুলতে থাকল। এমন সময় কোত্থেকে যেন একটা অপরূপ দর্শন ময়ূর তাদের সামনে এসে হাজির হলো। ময়ূরের সৌন্দর্যে অভিভূত যুবকেরা প্রচণ্ড উত্তেজনা অনুভব করল। উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে ওরা সবাই মিলে পাথর ছুঁড়ে ময়ূরটা ডানা দুটো নষ্ট করে দিল। বেচারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা ময়ূরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল।

ময়ূর এখানে নারী ও প্রকৃতির প্রতীক। নারী ও প্রকৃতিকে ধ্বংস করার মধ্যেই যেন পুরুষের পৌরুষ প্রকাশ পায়। নারী ধর্ষণ আর প্রকৃতি ধ্বংস সমার্থক। শিক্ষিত মানুষের নারীর প্রতি দরদ আর প্রকৃতির প্রতি সচেতনতা যে আসলে এক ধরণের ছল তা লেখক এখানে সুকৌশলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তবে এ-গল্প নিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনাও হয়েছে। সে যাই হোক। মনোরমা দাস মেধি তাঁর শক্তির পরিচয় এখানে রেখেছেন। 'প্রেমগাঁথা', 'সম্ভাব্যকাল', 'বিস্ফোরণের পিছত', 'পরীক্ষাগারত গুণীধর' প্রভৃতি গল্পের মতো এই গল্পটিও পাঠক মনে স্থায়ী আসন পেয়েছে।

রবীন শর্মা প্রকৃতই সমকাল-মনস্ক গল্পকার। সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ এবং মানুষের মূল্যবোধের বিপর্যয় তাঁর গল্পে বিশেষ মাত্রা পায়। যদিও তিনি বামপন্থায় বিশ্বাসী এবং প্রগতিশীল গল্পকার হিসেবেই খ্যাতিমন্ত তা সত্ত্বেও তাঁর গল্প পড়লে বোঝা যায় তিনি মতবাদের শৃঙ্খলে বন্দী নন। ফলে ছকে-বাঁধা বক্তব্য চাপিয়ে দেবার চেষ্টাটা তাঁব গল্পে অনুপস্থিত। গল্প তার আপন গতিতে এগোয়, কথকঠাকুরের মতো কোনো দিকে না-ঝুঁকে তিনি বর্ণনা করে চলেন ঘটনাক্রম। ভাষা ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত যত্নশীল। অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে ধ্রুপদী সংগীতের মতো মন্থর গতিতে তিনি তাঁর কাহিনী এগিয়ে নেন। সঙ্গে থাকে শ্লেষ, বিদ্রূপ আর পরিহাস। মানবমনের জটিলতা নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসেন। আলো ফেলার চেষ্টা করেন বিচিত্র সব মানুষের মনের গহনে। লোকজীবনের নানা অনুসঙ্গ ব্যবহার করে তিনি তাঁর প্রত্যেকটি গল্পে একটা আলাদা মেজাজ আনার চেষ্টা করেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গল্প 'কথা ভগীরথ'।

অজ্ঞাত পরিচয় একজন লোক বহুদিন আগে অজগাঁ রাইডিঙিয়ায় এসে ডেরা বেঁধেছিলেন। তিনি হোমিওপ্যাথ। ডাক্তারখানা খুলে তার নাম দেন—'ভগীরথ হোমি ও হল'। তখন তাঁর পরিচয় নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। তাঁর কাজকর্ম এবং সেবাকেই গুরুত্ব দিত সবাই। তাঁর পসার বাড়তে থাকে। তিনি স্কুল খোলার জন্য টাকা দেন। এক রোগিনীর সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। এদিকে রাইডিঙিয়া পাল্টাতে শুরু করে। লোকসংখ্যা বাড়ে। এটা হয় সেটা হয়। পাশাপাশি জাতি-উপজাতির নামে লোকেদের মধ্যে বিভেদ বাড়ে। আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ নিয়ে তারা গোষ্ঠীবদ্ধ হতে থাকে। অবিশ্বাস

আর হিংসা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপে সবাই সন্ত্রস্ত। এরকম অমানবিক অসুস্থ পরিবেশে ডাক্তার সন্ত্রাসবাদীদের হাতে একদিন শিকার হয়ে যান। গল্প শেষ হয়েছে এইভাবে—

'বেশ রাত হয়েছিল। ডাক্তার রাইডিঙিয়া থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরের এক গাঁ থেকে রোগী দেখে সাইকেল করে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি যখন প্রায় ডাক্তারখানার কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন ঠিক তখনই ঝোপের আড়াল থেকে কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। লোকগুলোর মুখে কালো কাপড় বাঁধা। হাতে রিভলবার। সাইকেলটা হাত থেকে ফেলে ডাক্তার হাত তুলে দাঁড়ালেন, আমতা-আমতা করে বললেন, চরাইমারি গিয়েছিলাম—বাচিরামের ছেলেটার জ্বর, এদিকে পরশু ওর মাধ্যমিক পরীক্ষা। আমি ওষুধ দিয়েছি। তিন পুরিয়া মতো পেটে পড়লে জ্বর ছেড়ে যাবার কথা ... তা আপনারা? ...

তাঁর কথা শেষ হল না। একজন তাঁর মুখে রিভলবারের নলটা ঢুকিয়ে দিল। সে রাতে বোধ হয় জ্যোৎস্না ছিল। ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভগীরথকে জ্যোৎস্নার আলো আলো আরও বেশি ধবধবে করে তুলেছিল। মেলে রাখা হাত দু'খানা তাকে যিশুখ্রিষ্টের আদল দিয়েছিল। তিনি যেন ক্রুশবিদ্ধ যিশু ক্রুশবিদ্ধ ভগীরথ অথবা কথা ভগীরথ।'

এই সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গল্পকারদের মধ্যে জেহিরুল হুসেইন অন্যতম। ইনি নিয়মিত লেখক নন এবং গল্পের পরিমাণও খুব বেশি নয় কিন্তু লেখার গুণে তিনি অনেকের প্রিয় গল্পকার হয়ে উঠতে পেরেছেন। তাঁর 'সরু ধেমালি বর ধেমালি', 'ভাল মানুহর সংজ্ঞা', 'বাঘ মানুহ' প্রভৃতি গল্প বহুল পঠিত এবং সর্বস্তরে উচ্চ-প্রশংসিত।

জেহিরুল হুসেইন দায়বদ্ধ লেখক। তাঁর দায়বদ্ধতা সমাজের প্রতি, শোষিত মানুষের প্রতি। তিনি নিজেই বলেছেন, *"আমার একটিমাত্র গল্পও যদি শোষিত নিষ্পেষিত শ্রমকারী জনগণের জীবনসংগ্রামকে প্রস্ফুটিত করে থাকে বা মধ্যবিত্তের ভণ্ডামি আর কৃত্রিমতার স্বরূপ পাঠকসমাজের সামনে নগ্ন করে দিতে সক্ষম হয়ে থাকে তাহলে বুঝব আমি কিঞ্চিত হলেও সফল হয়েছি।"* ('দুবরি বনর জুই' শীর্ষক গল্পগ্রন্থের ভূমিকা)।

'সরু ধেমালি বর ধেমালি' গল্পের বিষয় আতঙ্কবাদ। নদীর ধারে গ্রামের ছেলেমেয়েরা খেলে। নিজস্ব কল্পনা দিয়ে ওরা কিছু খেলা উদ্ভাবন করেছে সেসব খেলায় প্রকাশ পায় নানা মানবীয় অনুভূতি, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ঝগড়া-ভাব, শুরু আর শেষ ইত্যাদি। এসব সমস্তই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত—আলাদা নয়। শিশুদের এই নিষ্পাপ জগতে পাপ এসে ঢোকে। বড়দের পাপের ছায়া ওদের জগতেও পড়ে। এরা একদিন নদীর জলে ভেসে আসা একটি মৃতদেহ দেখতে পায়। মৃতদেহটি একটি যুবকের। নদী থেকে তুলে এনে তার পকেট হাতড়ে টাকা পয়সা কিছু আছে কিনা খোঁজ করে। মৃতদেহ দেখে তারা বিচলিত হয় না—উল্লাস বোধ করে। কারণ, ওরা জেনে গেছে, এর আগে একদিন গ্রামের এক কাকু নদী থেকে একটি 'ডেডবডি' তুলে তার পকেটে তল্লাসি চালিয়ে পঞ্চাশ টাকার নোটের একটি বান্ডিল পেয়েছিলেন। সেটি নিয়ে পা দিয়ে ঠেলে 'ডেডবডি'টা তিনি ফের নদীর জলে ফেলে দিয়েছিলেন। ওরাও তেমনি উৎসাহের সঙ্গে আশা করেছিল যে এই যুবকটির পকেটেও কিছু টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু না, টাকা ওরা পেল না, পেল একটি ফটোগ্রাফ—মৃত যুবকের মায়ের। সেটি পেয়ে ওরা হকচকিয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ওদের চিন্তা পাল্টে যায়। অবাস্তব (যাদু) জগত আর

বাস্তব জগতের ভেদরেখা ঘুচে যায়। কল্পনায় যুবকের মাকে ভেবে নিয়ে ওরা তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। ওদের মায়েরা চলে আসে, যুবকটিকে কোলে তুলে নেয়। পেলু নামের ছেলেটির সঙ্গে স্বর মিলিয়ে ছেলেমেয়েরা যখন ফুঁপিয়ে চিৎকার করে বলে, 'মা ও মা, এদিকে এস, তোমার ছেলে শুয়ে আছে—একবারটি দেখে যাও' তখন ওদের মনে এই বিশ্বাস কাজ করে যে মায়েরা ছুটে এসে যুবকটিকে জাগালে সে জেগে উঠবে। লেখক এই বিশ্বাসটা পাঠকমনেও ছড়িয়ে দিয়ে আশা করেন যে তাঁদের হৃদয় থেকে উৎসারিত আর্তনাদ মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তুলবে এবং অবসান ঘটাবে ত্রাসসঞ্চারী আতঙ্কময় দিনের।

প্রগতিশীল গল্পলেখক বললে এককালে বিকাশ খাটনিয়ারকেই বোঝাত। বামপন্থীদের সুবর্ণযুগে খাটনিয়ার ছিলেন বহু আলোচিত, বহু পঠিক গল্পকার। তাঁর লেখা ছাড়া প্রগতিশীল পত্রিকার কথা ভাবাই যেত না। তিনি অনেক প্রগতিশীল কুলের সমসাময়িক গল্পকারের আদর্শ ছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করে অনেকে এখনও গল্প লেখার চেষ্টা করছেন। বিশুদ্ধ মার্কসবাদী সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত-প্রাণ বলে সমাজবাস্তবতা তাঁর গল্পে প্রবল। শিল্পমান কতটা রক্ষিত হয়েছে না-হয়েছে সেকথা বিবেচনায় না এনেও বলা যায় সমাজের প্রকৃত স্বরূপ, বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষক-শ্রমিকের জীবনে যে শোষণ-বঞ্চনার বেদনাময় পর্ব তার জীবন্ত ডকুমেন্টেশন হিসেবেও বিপুল খাটনিয়ারের গল্প পাঠক আর সমালোচদের মনে সম্ভ্রমের আসন পেয়েছে।

অরূপা পটঙ্গীয়া কলিতা এই সময়ের প্রধান গল্পলেখকদের মধ্যে একজন। খুবই জনপ্রিয় কথাকার। সমালোচকদের দ্বাবা উচ্চপ্রশংসিত ও বহু আলোচিত। শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতাকে তিনি মান্যতা দেন এবং তাঁর যাবতীয় গল্পই খেটে-খাওয়া, রিক্ত, নিঃস্ব মানুষের বেঁচে থাকার, টিঁকে থাকার বহুমাত্রিক সংগ্রামের কথকতা। তিনি কথা বলেন সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, তাঁদের হয়ে। প্রকৃতি শোষণ আর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ঘুরেফিরে নানাভাবে আসে তাঁর গল্পে। লেখিকার বিখ্যাত গল্পের মধ্যে আছে 'দেওপাহাড়র ভগ্নস্তূপত', 'উত্তরাধিকার', 'দৈবকীর দিন', 'আই', 'ডাঙর নবৌ' প্রভৃতি।

প্রগতিশীল গল্পকার হিসেবে বত্নেশ্বর মেধিও সুপরিচিত। সমাজমনস্ক এবং প্রতিবাদী লেখক বললে মুষ্টিমেয় যে ক'জনকে চেনা যায় তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তবে বিষয়বৈচিত্র্য কম বলে তাঁর লেখার কদর এক বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের মনে সীমাবদ্ধ।

এই আলোচনায় যাঁদের কথা তোলা হল তাঁরা ছাড়া আরও অনেকে এখন অসমিয়া ভাষায় গল্প লিখছেন, তাঁদের কথা বলা সম্ভব হলো না। তাঁদের অনেকে ভালো লিখলেও কাজের পরিমাণ কম এবং সংকলন গ্রন্থ বেরোয়নি, তাঁদের লেখা মূলত পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো। তাঁদের লেখা সম্পর্কে তাই এখনই কিছু বলা অসঙ্গত। তবে একটি কথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের লেখায় পাওয়া যাচ্ছে সমকাল-মনস্কতা আর এই সময়ের অসমকে কেন্দ্র করে যে ঘূর্ণাবর্ত চলছে তার সজীব বিশুদ্ধ বিবরণ। তাঁদের অনেকের লেখা শিল্প হিসেবে অসার্থক বলে প্রশংসিত না-হলেও যুগচেতনার জন্য গুরুত্ববাহী। অসমিয়া সমাজের অস্থিরতা, নিরাপত্তাহীনতা, হীনম্মন্যতা, বিশ্বায়নের প্রভাব, অবক্ষয়, অবিশ্বাস, যৌনতার পণ্যায়ন, ত্রাস, হিংসা, হত্যা, সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়গুলো তাঁদের

লেখায় বেশি করে এন্ট্রি পাচ্ছে। অনেকের লেখায় আবার সস্তা চমক দেখা যাচ্ছে। যা অত্যন্ত সাময়িক প্রয়োজনে লেখা।

'সাময়িক প্রয়োজনে লেখা' ব্যাপারটা ভাববার মতো। অসমিয়া সাহিত্যের কিছু মৌলিক সমস্যা আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে পত্র-পত্রিকার অপ্রতুলতা। লেখকদের লেখালেখি করতে হয় মূলত খবরের কাগজে। খবরের কাগজই সাহিত্যচর্চার প্রধান মাধ্যম। অসমে দৈনিক কাগজের ছড়াছড়ি। সে'সব কাগজের রোববারের বিশেষ ক্রোড়পত্রেই ছাপা হয় অধিকাংশ লেখা। তাছাড়া আছে তাদের 'বিহু' ও 'শারদীয়' বিশেষ সংখ্যা—বার্ষিক ঢাউস সংকলন।

খবরের কাগজে সাহিত্যচর্চা করার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। আছে আনুষঙ্গিক সমস্যা। কাগজের প্রয়োজনে একজন লেখককে নির্দিষ্ট শব্দ সংখ্যার মধ্যে পাঠকরুচিকে মাথায় রেখে ফিচারধর্মী বাণিজ্যিক লেখা লিখতে হয়। গল্পকারের জন্যও বরাদ্দ থাকে নির্দিষ্ট পাতার জন্য নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যা আর জনপ্রিয় সহজ সরল বিষয়বস্তু নিয়ে লেখার চাপ বা আবেদন। এর ফলে কোনো লেখকের পক্ষে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা বা সাহস করে নিষিদ্ধ বিষয় নিয়ে কিছু লিখতে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া খবরের কাগজ যাঁরা পড়েন তাঁরা সাধারণ পাঠক, তাঁদের বেশিরভাগই সাহিত্য-রসবোধ সম্পন্ন নন। তাঁদের মধ্যে বিশুদ্ধ সাহিত্য পছন্দ করেন বা নিজস্ব পাঠরুচি আছে এমন পাঠক সংখ্যায় কম। দেখা গেছে রুচিবান সিরিয়াস পাঠকরা হয় সংবাদপত্র মনোযোগ দিয়ে পড়েন না আর হয়তো পড়লেও সাহিত্য বিষয়ক অধ্যায়টাকে উপেক্ষা করেন অপাঠ্য ভেবে। এর ফলে অনেক লেখকের যত্ন করে লেখা ব্যতিক্রমী গল্প উদ্দিষ্ট পাঠকের কাছে গিয়ে পৌঁছয় না। তাছাড়া খবরের কাগজের জন্য তাড়াহুড়ো করে নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যার মধ্যে লিখতে হয় বলে লেখার প্রতি অবিচার করা হয়। এইজন্য দেখা যাচ্ছে ইদানীংকালের ছোটো গল্পগুলো আকারে খুব ছোট হয়ে পড়ছে, গভীরতা কমে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও অনেকে ভালো লিখছেন এটা খেয়াল করার বিষয়।

সাম্প্রতিক কালের অসমিয়া সাহিত্য সংবাদপত্র নির্ভর হয়ে পড়াতে সিরিয়াস পাঠক কমে যাচ্ছে। উপন্যাস সহ অন্য ধরণের সাহিত্যকর্ম মলিন হয়ে পড়ছে। এ নিয়ে সচেতন মহলে দুর্ভাবনার অন্ত নেই। অনেকে অনেক ধরণের উদ্যোগ নিয়ে পথে নেমেছেন। বিকল্প পথের খোঁজ চলছে। প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিন। 'কথা' ষান্মাসিক সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা, 'কথা গুয়াহাটি' মাসিক পত্রিকা, 'নিবেদন' ষান্মাসিক সাহিত্যপত্র বেরিয়েছে। নিয়মিত বেরোচ্ছে 'দামল', 'নতুন পদাতিক' ও অন্যান্য কিছু কাগজ।

এই সমস্ত পত্র-পত্রিকা লেখকদের উৎসাহ দিচ্ছে সংবাদপত্র নির্ভরতা থেকে মুক্ত হতে। সাধারণভাবে লেখার সুযোগ করে দিচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে অসমিয়া সাহিত্য সাময়িক হীনদশা কাটিয়ে মহত্তর ও বৃহত্তর সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে শুধু ছোটোগল্পে নয়, অন্যান্য শাখায়ও অসমিয়া সাহিত্যের বিপুল ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটাবে।

মানিক দাস
২০০৪

আ . লো . ক . পা . ত ২

অসমীয়া ছোটগল্পের রূপান্তর এবং বিবর্তন পর্বের তেরোজন গল্পকারকে অন্তর্ভূক্ত করে এ নিবন্ধ রচনা করা হয়েছে। গল্পকার হিসেবে এঁরা ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত লেখা অসমীয়া গল্পের সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আলোচ্য নিবন্ধে ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত, এই তিন দশকের সময়সীমায় অসমীয়া গল্পে কী নতুনত্ব এসেছে বা অসমীয়া গল্পকাররা সামাজিক জীবনকে নতুন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সক্ষম হয়েছেন তার পরিচায়ক হিসেবে এই তেরো জন গল্পকারকে নির্বাচিত করা হল। আশা করি এই আলোচনা এসব গল্পকারদের নিজস্বতা এবং মৌলিকতাকে তুলে ধরা ছাড়াও অসমীয়া গল্প সাহিত্যে শেষের এই সমৃদ্ধির বহুধা-বিভক্ত পরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

সৌরভকুমার চালিহার জলসিঞ্চনে আধুনিক চেতনার অসমীয়া গল্পের ধারা-রূপ যে নবাঙ্কুরের সৃষ্টি করেছিল পরবর্তীকালের গল্পকারদের হাতে তা আশানুরূপ বৃদ্ধি লাভ করতে পারেনি। কারণ সেই সময়ের প্রায় প্রত্যেক গল্পাকারই সময়ের দাবীতে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাহসের অভাবে নির্দিষ্ট গণ্ডীর অসমীয়া মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্রায়নেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এসব গল্পলেখকের বর্ণনাভঙ্গিতে জাতীয় মানসের চরিত্র এবং চেতনা সঙ্কীর্ণ মধ্যবিত্ত মানসিকতার গণ্ডিতে ছটফট করছিল। এরই মধ্যে গ্রাম্যজীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত মহিম বরার 'টোপ', 'রস'

এবং 'কাঠনিবাৰী ঘাট' এর মত গল্প মানবায়তন লাভ করে সম্পূর্ণ আধুনিক হয়ে ওঠা পরবর্তীকালের সচেতন পাঠকের কাছে এক অবিশ্বাস্য সৃষ্টি বলেই মনে হয়েছিল। ঠিক তেমনি হোমেন বরগোহাঞির স্বরচিত অসমীয়া সমাজের 'আধুনিক কাঠামো'-র গণ্ডিতে অবস্থান করে লেখা 'ইসমাইল শেখর সন্ধানত' (ইসমাইল শেখের সন্ধানে)-এর মত গল্প বা তার ঠিক বিপরীত বিন্দুর 'হাতী' (হাতি) এবং 'গরখিয়া' (রাখাল)-এর মত গল্প আজকের যুগেও বহু অসমীয়া গল্পকারের সীমাবদ্ধতার নির্দেশক হয়ে আছে। অবশ্য মহিম বরা এবং হোমেন বরগোহাঞি—এই দুজন লেখকের ক্ষেত্রেও জীবন-দর্শন এবং ভাবের সংহতি প্রয়োজন অনুযায়ী নতুনত্বের বাহক হতে পারেনি বলে তাঁদের উৎকৃষ্ট গল্পের সংখ্যাও কম। জনজীবনের সঙ্গে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটিয়ে এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে অসমীয়া গল্পকে অপূর্ব শর্মার আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বিশেষত ১৯৬৭ সালে 'নীলাচল'-এ প্রকাশিত 'নীল পতাকার তলত' (নীল পতাকার নীচে) এবং ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত 'বাহিরলৈ যোয়া বাট' (বাইরে যাবার রাস্তা) নামের গল্প দুটো এই গল্পকারের স্বকীয়তা এবং ভবিষ্যৎ অসমীয়া গল্প-সাহিত্যে তাঁর প্রভাবশালী অস্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিল।

অপূর্ব শর্মার 'বাঘে টাপুর রাতি' (বাঘে টাপুর রাত) গল্পটিতে সূক্ষ্ম পরিবেশজ্ঞান এবং সত্ত্বা সচেতনতার সমন্বয় সাধনে জীবনের আশ্চর্যসুন্দর বিচিত্রময়তা এবং সম্ভাবনা ফুটে উঠেছে। এই গল্পটিতে জীবনের রহস্যময়তা জীবনের বাস্তবতাকে অপার স্বপ্নের সন্ধান দিয়েছে। গল্পটিতে জীবনের রহস্যময়তার কালহীন বিশালতার বিরুদ্ধে চরিত্রগুলোতে আরোপিত সীমিত বর্তমানের সংঘাত চরিত্রগুলোকে পরিশোধিত করা ছাড়াও বিশালতা প্রদান করেছে। এই গল্পটিতে নারীর অস্তিত্ব গতিময়তার প্রতীক স্বরূপ নব্য সম্ভাবনার বাহক হিসেবে বিদ্যমান। গল্পটিতে পরিবেশের স্বাভাবিক গতির সঙ্গে নারীসত্ত্বার দ্বন্দ্বগত অবস্থান সম্ভাব্য ফলাফলকে সকল সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে কাহিনীর বিস্তৃতি প্রদান করেছে। অপূর্ব শর্মার উজ্জ্বল ইঙ্গিতময় বর্ণনাভঙ্গি কাহিনীক্রমকে এবং এর উপকরণসমূহকে জীবন-চেতনার প্রতিফলনরূপে প্রমাণ করে; যে কারণে 'বাঘে টাপুর' স্থানটির অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ মানবীয় এবং জৈবিক বলে ধরে নিয়ে 'বাঘ' শব্দটিকে প্রতীকী সম্ভাবনার মর্যাদা দেওয়া যায়। ' বাঘে টাপুর রাতি' মানুষেরই অস্তিত্বের বার্তাবাহক একটি ঠিকানা, যা হয়তো সাময়িকভাবে সংঘাতময়, কিন্তু এই সংঘাত অপ্রতিরোধ্য নয়। গল্পটিতে বাঘে টাপুর জীবনক্রম এভাবে বর্ণিত হয়েছে—'সবকিছুকে জড়িয়ে থাকা কী একটা মোহ, মোহের মধ্যেও কোথায় যেন একটু ভয়, ভয়ের মধ্যেও বেঁচে থাকার অনির্বার আকর্ষণ—এসবের মধ্যেই একটি দিন কাটিয়ে উঠে আরেকটি দিনের জন্য অপেক্ষা, এটাই বাঘে টাপুর জীবন।' এই ধারাবাহিকতা অবিরত— আর এই 'অবিরত বর্তমান' দ্বন্দ্বগত। সুতরাং এমন এক বর্তমানে মানুষের অস্তিত্বের আশা, উৎসাহ এবং সম্ভাবনাও বিলীন হয়েছে কোনো এক রহস্যময়তায়। অন্ধকারাচ্ছন্ন অপর পারকে দেখতে না পেয়ে বেলি যখন উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করে—'ওপারে পৌছাব তো?' তখন এই প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে এধানের বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকলেও উত্তর দিয়েছিল, 'না পৌছালেও ক্ষতি নেই।' 'বাঘে টাপুর রাতি' গল্পে নদীর সঙ্গে এধানের ঘনিষ্ঠতায় ফুটে উঠেছে এক ধরণের সমর্পণের ভঙ্গি। এ অস্তিত্ব হারাবার ভয় নয়, অস্তিত্ব খুঁজে পাবার আবেগিত নির্যাস। 'বহু বালুচর আর জলস্রোতে ভরা এই বিশাল-বিস্তীর্ণ নদীটিকে সে বড় ভালবাসে, তার মনে হয় সে নদীতে মিশে গেছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে মাঝে মাঝে ভয়ও হয়' এই নদীটির (গল্পকারের বর্ণনায় প্রাণময়) বিশালতা জীবনের বিশালতারই অর্থবাচক। আবার এধানের মতো চরিত্রে ডুব দেবার জায়গাও বেলি নামের চরিত্রে মাধ্যমে ওরকম এক বিশালতাতেই। এখানে নদীর চেতনা প্রাকৃতিক, বেলির অস্তিত্ব জৈবিক। তথাপিও গল্পটিতে এধানের

কাছে বেলি আকাঙ্খিত বাস্তবের প্রতিরূপ নয়। আশা এবং সম্ভাবনার সৌন্দর্যে বাস্তব নামে যে মিথ ঐতিহ্যের ন্যায় যুগের পর যুগ ধরে প্রতিফলিত হয়ে আসছে তারই প্রতিরূপ। প্রাণময় নদীটির মত এখানও একটি সজীব প্রাণী, যে প্রাণের বিস্তৃতির জন্য হাহাকার করে ওঠে আর ওই কারণেই বেলিকে সঙ্গে নিয়ে অনির্দিষ্ট এক যাত্রায় বেরিয়ে জীবনের নির্দিষ্টতার যান্ত্রিকতাকে নস্যাৎ করে। সুতরাং এই গল্পটির কোনো সমাপ্তি নেই। গল্পকার গল্পটিকে শেষ করেছেন আর একটি সম্ভাব্যের মাঝে। অপূর্ব শর্মার প্রথম গল্প সংকলন 'বন্ধুর পথত কেইজনমান ডেকা মানুহ' (বন্ধুর পথে কয়েকনজন যুবক)-এর গল্পগুলোতে পরিলক্ষিত নাগরিক জীবনের রূপ এবং গল্পকারের বৌদ্ধিক দৃষ্টি থেকে সরে এসে তাঁর লেখা পরবর্তী গল্পগুলো জীবনের সরল সত্যের বেশি কাছের। গল্পকার যথার্থই 'বাঘে টাপুর রাতি' সংকলনটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর মায়ের নামে শৈশবকে পুনরাবিষ্কারের যাত্রায়। গল্পটির শেষে একটি বাক্য আছে—'সে একবার তার দিকে তাকাল, তারপর দূরের ঝকমকে আকাশের দিকে, চারদিকের অলৌকিক অন্ধকারময় পৃথিবী এবং তাদের বুকে নিয়ে বয়ে যাওয়া জীবন্ত নদীটির দিকে তাকাল।' যেন একটি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে সে বেঁচে উঠেছে। আমাদের বিশ্বাস এই পর্যায়ের 'mental pictorialism' পরবর্তীকালে তাঁর গল্পে সম্ভব হয়েছে কাহিনীবিন্যাসে অতীতমুখী অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত শিল্পরহস্যের জন্যই। গল্পকার নিজে একজন যশস্বী চলচ্চিত্রবোদ্ধা বলে নয়। 'বাঘে টাপুর রাতি' বা '*হঠাৎ নদীত ঢল*' (*হঠাৎ* নদীতে ঢল) গল্পে আমরা কবি অপূর্ব শর্মাকেই খুঁজে পাই।

> *সময়ে সময়ে রূপ পাল্টানো এই জগতটি তাকে নিজের করে নিয়েছে। অনেক বালুচর আর জলস্রোতে ভরা এই বিশাল বিস্তীর্ণ নদীটিকে সে বড় ভালোবাসে। তার মনে হয় নদীতেই সে মিশে গেছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে মাঝে মাঝে ভয়ও হয়। এদিক ওদিক বেশ ক'টা সোঁতা তার মাঝে মাঝে টাপুর বাঁয়ে উত্তর ঘেঁষে চকচকে বালুচরের সারি আর ক্রমশ বাড়তে থাকা ছোটবড়ো মা শিশুর মোষের পাল- এই পরিবারের সঙ্গেই সে গত দশ-বারো বছর ধরে বড় হচ্ছে। এগুলোই এখন তার নিজের, তার আপন। এখানেই সে ভূত-ভবিষ্যৎ কোনো চিন্তা না করে নিজের বর্তমান কাটিয়ে দিচ্ছে। কারণ তার ভবিষ্যৎ তার চেতনায় অনুপস্থিত আর তার অতীত ধীরে ধীরে তার কাছে অপরিচিত হয়ে উঠছে।*
>
> *এখানে আসার আগের দশ বারো বছরের তার চেনা সব জিনিস, তার আপনজন—কিছুই আর বাকি নেই। সব হারিয়ে গেছে, নয়তো সে-ই নিজের অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার উপস্থিতি ছাড়াই তার অতীতের ছিটেফোঁটা হয়তো কোথাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে—কোথাও রক্ত, কোথাও মজ্জা, কোথাও শুষ্ক ত্বক, কোথাও ঘাম, কোথাও বা চোখের জল। সে আর ওগুলো একসঙ্গে ফিরে পাবে না। অতীতে ফিরে যাবার রাস্তা সে হারিয়ে ফেলেছে। চারদিক থেকে বেত বন তাকে ঘিরে ধরেছে। সে বেরিয়ে আসতে পারবে না।'*
>
> ***(বাঘে টাপুর রাতি—অপূর্ব শর্মা)***

মহিম বরার পর অসমীয়া কবি গল্পকার বলতে হরেকৃষ্ণ ডেকার নামই মনে আসে। হরেকৃষ্ণ ডেকার কবিতার মত তাঁর গল্পের জগৎটিকেও নির্দিষ্ট কোনো সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ করে আলোচনা করা যায় না। গল্পকারের পরীক্ষামূলক অনুসন্ধিৎসা এবং জীবনের বৈচিত্র্যের প্রতি মননশীল দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কবিতা এবং গল্পকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে তাঁর প্রতিটি গল্পসংকলনের গল্পসমূহ এক

একটি নতুন দিকের দিশারী হয়ে উঠেছে। শুরু থেকেই তাঁর গল্পে বোধ এবং প্রজ্ঞার গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। বিষয়বস্তুর বিন্যাসের ক্ষেত্রেও তিনি এক পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন। যে জন্য মহিম বরার গল্পে যে কাব্যানুভূতির অস্তিত্ব দেখা যায় হরেকৃষ্ণ ডেকার গল্পে তার পরিবর্তে হয়ে ওঠে অধিক গদ্যগন্ধ। হরেকৃষ্ণ ডেকার প্রথম সংকলন 'প্রাকৃতিক আৰু অন্যান্য' (প্রাকৃতিক এবং অন্যান্য) -তে দেখা যায় যে অতীতের প্রাকৃতিক স্থিতি বিরক্তিকর কিন্তু তার রোমান্টিক উপলব্ধি অনস্বীকার্য। একই রকম absolute dry prose এর ব্যবহার করে ডেকা সেই রোমান্টিক উপলব্ধিতে এই সংকলন ধরে রেখেছেন। চেতনশীল কথক হলেই এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব এবং হরেকৃষ্ণ ডেকার ক্ষেত্রে লেখক সত্তার পরীক্ষকের দৃষ্টিতে প্রকৃতি-পরিবেশ এবং চরিত্রকে অনুধাবনের চেষ্টা এই চেতনশীলতার নিয়ন্ত্রক। একই সঙ্গে হরেকৃষ্ণ ডেকার গল্পে সবসময়ই একটি নাটকীয় রূপ দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ অসমীয়া গল্পই হয় অন্তর্মুখী নয় বহির্মুখী। কিন্তু ডেকার গল্পগুলো অন্তর্মুখীতা দ্বারা সৃষ্ট কাব্যিকতা এবং বহির্মুখীতা দ্বারা সৃষ্ট দৃশ্যায়িত রূপটি থেকে সরে এসে নতুন এক চেতনা জগতের সৃষ্টি করে। এই গল্পকারের Seeing Self-এর স্বরূপটিতে দৃশ্য এবং দর্শকের মাঝে একটি দূরত্ব থাকে। এই দূরত্বের জন্য সমান্তরালভাবে দু- রকম বর্ণনাই পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। সুতরাং তাঁর গল্পে শিল্প-বাস্তব এবং ইন্দ্রিয়জাত বাস্তবের যোগসূত্র হিসেবে তৃতীয় সূত্র কথক সচেতনভাবে উপস্থিত থাকে। এই ত্রিমাত্রিক চেতনাই তাঁর গল্পকে এক স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছে। হরেকৃষ্ণ ডেকার গল্প পড়ে মনে হয় মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা ভিন্নধর্মী এবং বৈচিত্র্যময়---সুতরাং তা থেকে সৃষ্ট অর্থও একক এবং নির্দিষ্ট হতে পারে না। অর্থের এই Plurality-কে তাঁর গল্পের নির্মাণ-প্রক্রিয়া স্বীকার করে নেয়। জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেওয়া ভিন্ন সুরের অর্থগুলো প্রকৃতপক্ষে একটি কেন্দ্রীয় সূত্রকে আবিষ্কার করারই যাত্রা। সেই অর্থে ডেকার গল্পেও একটি নির্দিষ্ট অর্থ উজ্জ্বল হয়ে থাকে, যদিও গল্পকারের দিক থেকে এই কেন্দ্রীয় অর্থকে অন্বেষণের প্রয়াস বহুরূপী এবং বহুমুখী।

এরকমই এক পথে এগিয়ে গিয়ে হরেকৃষ্ণ ডেকার পরবর্তী গল্পগুলো এক নতুন চরিত্র আয়ত্ব করেছে। এই চরিত্র সম্পূর্ণরূপে এক একটি ধারণার ওপর নির্ভরশীল এবং এই ধারণার ছাঁচে গল্পকার বাস্তবকে পরীক্ষা করেছেন। এবং তা করতে গিয়ে ধারণার সত্যতা বা যোগ্যতাকেও পরীক্ষা করা হয়েছে। এই গল্পকার পরবর্তীকালে কিছু তত্ত্বকে গল্পের বিষয়বস্তুর কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নির্বাচন করেছেন। অবশ্য তাঁর গল্প যে কেবল তত্ত্বসর্বস্ব হয়ে ওঠেনি তার প্রমাণ 'রোমান্টিক', 'জীবন আৰু কলা' (জীবন ও কলা), 'যুধিষ্ঠিরর বাবে এটা গল্প লিখিব নোয়ারি কিয়' (যুধিষ্ঠিরের জন্য একটি গল্প লিখতে পারছি না কেন), 'এটা ডিটেক্টিভ গল্প' (একটি ডিটেকটিভ গল্প) এবং 'ভোক' (ক্ষুধা)-এর মত গল্প। এই সংকলনে সন্নিবিষ্ট 'ভোক' নামের গল্পটিতে আসা যাক। এই গল্পটিতে একই সময়ে ব্যঙ্গ এবং তত্ত্বের Unreality-কে প্রতীয়মান করা হয়েছে 'ভোক' (ক্ষুধা) নামক মানুষের স্বাভাবিক জৈবিক চরিত্রটির প্রতীকী উপস্থাপন দ্বারা। বিভিন্ন তিনটি শতকে দুর্ভিক্ষের তিনটি রূপের প্রসঙ্গ এটাই স্পষ্ট করে তুলেছে যে, প্রকৃতি দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে না, দুর্ভিক্ষ সবসময়ে মানুষের ভুলেই সৃষ্টি হয়। খিদের যন্ত্রণার অন্তরালে একটি প্রতিবাদী স্বরূপও যে লুকিয়ে থাকে গল্পকার তার আভাসও আমাদের দিয়েছেন। গল্পটিতে মালথাস-তত্ত্বের আভাসও পাঠক পেতে পারেন যদিও গল্পকারের চেতনা সে তত্ত্বকে সমর্থন করেনি।

শ্রীনিবাসনের সাহেবী অভ্যাস। কুকুরভক্ত। কিন্তু রাস্তার নেড়ি কুত্তার সঙ্গে শ্রীনিবাসনের সম্পর্ক নেই। সুন্দর চেহারার পেডিগ্রি কুকুর তার সঙ্গী অর্থাৎ তারা উচ্চবংশজাত। শ্রীনিবাসন

একসময় ফৌজে ছিলেন। এখন নাকি নিজের সিকিউরিটি এজেন্সী খুলেছেন। তাঁর দু-দুটো সুন্দর কুকুর (আসলে কুকুরী) আছে। ওদের মসৃণ, কোমল গা-গুলো চকচক করে। সবসময় তিনি ওদের বেড়াতে নিয়ে যান, স্নান করান, খাওয়ান। নদীর পারের ওয়াকওয়েতে কাকভোরে নিয়ে গিয়ে ব্যায়াম করান, নানারকম কসরত শিখিয়ে পোক্ত করেন। শ্রীনিবাসন গর্বিত। তাঁর অভিজাত কুকুরকে তিনি চুমু খান, কোলে নেন, জড়িয়ে ধরেন, 'বেটি বেটি' করে আদরে সোহাগে মশগুল হয়ে থাকেন। সন্ধেবেলা নদীর পারের পার্কে তিনি বেড়াতে যান, সঙ্গে তার সুদৃশ্য পেডিগ্রি কুকুর। সেখানেই শ্রীনিবাসনের সঙ্গে আমার দেখা। লক্ষ্য করেছি, পার্কে যাবার সময় শ্রীনিবাসন খানকয়েক ডগবিস্কুটও নিয়ে যান। তাঁর ডগী রাস্তার এঁটোকাঁটা খায় না, নির্দিষ্ট সুস্বাদু খাবারই তারা খায়। আজও পার্কে শ্রীনিবাসনের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর সঙ্গে তাঁর ডার্লিং নাদুসনুদুস দুই ডগী-ভগ্নী। বল নিয়ে তিনি ওদের খেলাচ্ছিলেন। বলটাকে তিনি দূরে ছুঁড়ে মারেন আর ওরা দৌড়ে গিয়ে ধরে। মাঝে মাঝে ডগবিস্কুটও কুটকুট করে খায় আর প্রভুর কাছে এসে লেজ নাড়ে। দেখতে বেশ লাগে। বল বা বিস্কুটের পেছনে দৌড়ানোর দৃশ্যটি বেশ উপভোগ্য। একবার শ্রীনিবাসন বেশ দূরে দুটো ডগবিস্কুট ছুঁড়ে মারলেন। কুকুর দুটোও দৌড়তে শুরু করল। কিন্তু হঠাৎ কী যেন একটা এসে ছোঁ মেরে ডগবিস্কুট দুটো নিয়ে পার্কের সীমানা ডিঙিয়ে নদীর পারের দিকে চলে গেল। আমি এগিয়ে গিয়ে পার্কের নিচু দেয়ালে ঝুঁকে পড়ে নদীর পারের দিকে তাকালাম। দেখলাম, ছেঁড়াখোড়া-নোংরা কাপড় পরা, হাড় জিরজিরে, জটাচুল, ক্ষুধার অবতার এক ক্ষুদ্র মানব প্রাণী পরম আগ্রহে বিস্কুট দুটো খাচ্ছে। শ্রীনিবাসনও ইতিমধ্যে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। দারুণ ক্রোধে তিনি হুংকার ছাড়লেন, 'শালা কুত্তা'। তবুও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত না হওয়ায় তিনি প্রচণ্ড জোরে এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ ওই ক্ষুদ্র প্রাণীটির প্রতি নিক্ষেপ করলেন, 'শালা কুত্তা! মর যায়।' অর্থাৎ 'শালা কুত্তা! মর!' প্রাণীটির ভ্রূক্ষেপ নেই। তার খিদে পেয়েছে। সে মরবে না।

(ভোক/হরেকৃষ্ণ ডেকা)

১৯৭৩ সালে 'সাপ্তাহিক জনমভূমি'-তে প্রকাশিত একটি গল্পের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করা দেবব্রত দাস এমন একজন মননশীল গল্পকার যিনি গত তিন দশক অসমীয়া গল্পের বিষয় ও আঙ্গিক, দুটো ক্ষেত্রেই অভিনবত্বের পরিচয় দিয়ে আসছেন। অসমীয়া ভাষায় কেউ কখনও লেখেননি এমন একটি ধরণে, সম্পূর্ণ নিজস্ব কথন-ভঙ্গিতে, তিনি গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। মহিম বরার গ্রাম তাঁর গল্পে নেই। কিন্তু মহিম বরার মতই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোতেও সংবেদনশীলতা আছে। তাঁর ভাষা নাগরিক জীবনের কথিত ভাষা নয় বরং নাগরিক জীবনের আবরণের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা অনুভবের ভাষা। এমনই এক দৃষ্টিকোণে স্থিত তাঁর গল্পের চরিত্ররা চলিত পরিবেশের সম্মুখে আলোড়িত হয় যে আলোড়ন পাঠকের সম্মুখেও চলিত বাস্তবতার পরিবর্তে অনুভূতির জগৎটিকে উন্মোচিত করে। গল্পের বিষয়বস্তুকে পরীক্ষা করে দেখবার আগ্রহ এই গল্পকারের বহুমাত্রিক। আমাদের বিশ্বাস দেবব্রত দাসের গল্পের বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখবার পেছনে জীবনের অর্থের অবিরত ধারাবাহিকতার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-ব্যবস্থায় বাহ্যিক জীবনে পরিলক্ষিত পরিবর্তনকেই বিচার করে দেখার প্রচেষ্টা কাজ করে। নাগরিক জীবনকে নিয়ে গল্প লেখা প্রায় সব গল্পকারই নৈসর্গিক সান্নিধ্যের অভাবে জীবনের মধুর এবং অনায়াস অনুপ্রেরণা থেকে সরে আসেন। নারীই সেই মুহূর্তে হয়ে উঠতে পারে একমাত্র আশ্রয়। সৌরভকুমার চলিহার মত দেবব্রত দাসের

অধিকাংশ উৎকৃষ্ট গল্পের কেন্দ্রে এক নারীর উপস্থিতিই দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত সংকলন 'অর্পিতার এরাতি' (অর্পিতার এক রাত্রি)-র 'অর্পিতার এরাতি' ও 'দীঘাত দুদিন' (দীঘায় দু'দিন) নামের গল্প দুটির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। অর্পিতা নামটিতেই একটি সমর্পণের ভঙ্গি লুকিয়ে আছে। গল্পটির ঘটনাক্রমে গল্পটির নায়কের কোন গতিশীল ভূমিকা নেই—সমগ্র পরিস্থিতিটির সঙ্গে আকস্মিকভাবে জড়িয়ে পড়া সে একজন অংশীদার মাত্র। সেই ভূমিকায় নায়কের বদলে আমি-আপনিও হতে পারতাম। দেবব্রত দাসের গল্পের চরিত্র ওইরকমই এক দূরত্বে অবস্থান করে এক সামগ্রিক উপলব্ধির বাহক হয়ে দাঁড়ায়। গল্পকারের পরবর্তী পর্যায়ের কিছু গল্পে এই সামগ্রিক উপলব্ধি গণচেতনার আকার ধারণ করেছে। দেবব্রত দাস অসমের সমাজ জীবনের সর্বাপেক্ষা অস্থির সময়কালটি পেরিয়ে এসে নিজস্ব শিল্পবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। সেই শিল্পবোধের অন্তরালে নিশ্চয়ই শুভবোধ লুকিয়ে ছিল। সেই শিল্পবোধে জড়িত শুভবোধই তাঁর গল্পের চালিকাশক্তিতে পরিণত হওয়ায় অস্থির বিপন্ন সময়ের গল্পকার হয়েও তাঁর গল্প সম্ভাব্য অস্থিরতার অনুশীলন হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। জীবনের জটিলতার সরলীকৃত সমাধান এই গল্পকারের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং তাঁর গল্প জটিলতার মধ্যে দিয়েই জীবনের বহুধাবিভক্ত চরিত্রটিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করে। আর তা করতে গিয়ে **আধুনিক যুগের অস্থিরতা ও বিপন্নতাকে 'গল্পকার দেবব্রত দাস' একজন কথক ও বিষয়ী হয়ে 'ব্যক্তি দেবব্রত দাস' এর কাছ থেকে সরিয়ে আনে এবং ব্যক্তিমানসের সেই বিরোধাভাসই (Paradox) জীবনের বিরোধাভাসকে মর্মভেদীরূপে প্রকট করে তোলে।**

> *একসময় ছাত্রজীবনে পৃথিবী থেকে এ দেশ থেকে দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করবার উৎসাহে এটা-ওটা যথেষ্ট করেছি। বাগানে-বাগানে, কলকারখানায় ঘুরে বেড়িয়েছি। কামরূপ লখিমপুরের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পেরিয়ে দরিদ্র কৃষক মজুরদের কাছে গিয়ে বুঝতে চেয়েছি, এই দুঃখের উৎস কোথায়। এখন সেগুলো ছেলেখেলা মনে হয়। এখন আমি সরকারী চাকুরে। অনায়াসে মন-মজ্জা বিবেক সবকিছু বিক্রি করে আরামে দিন কাটাচ্ছি। তথাপি মাঝে মাঝে দুঃখী, আর্ত-মানবতার জন্য সামান্য কিছু করতে পারলে হত। আত্মসন্তুষ্টি লাভ করতে পারব- -তাই উপরিউক্ত ঘটনার নির্মাণ। দুঃখিনী অর্পিতার আশ্রয়দাতা সান্ত্বনাদাতার আসনে নিজেকে বসিয়ে দেখলাম। কিরণরা বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, গল্পে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে সে রাত্রে তেমন কোন ঘটনা ঘটলে আমি হয়তো অর্পিতাকে সান্ত্বনা দিতে পেরে গভীর প্রশান্তি লাভ করতাম। অবশ্য মাঝরাতে একঘর শুয়ে থাকা মানুষের অনুপস্থিত উপস্থিতিতে একটি যুবতীর সঙ্গে ঠিক ওইরকম ব্যবহার করার সৎসাহসটুকু আমার আছে না নেই তা সন্দেহসাপেক্ষ। আমি হয়তো আত্মহত্যায় উদ্যত অর্পিতার ভুলটুকু, তাব লজ্জাটুকু নীরবে নিঃশব্দে লুকিয়ে না রেখে হুলুস্থুলু বাঁধিয়ে দিতাম আর আমার চিৎকার চেঁচামেচিতে আগুপাছু না ভেবে অর্পিতা হয়তো সত্যি সত্যিই ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ত।*
>
> ***(অর্পিতার এরাতি/দেবব্রত দাস)***

১৯৬৭ সালে 'দৈনিক অসম' পত্রিকায় ভূপেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। একটি সাক্ষাৎকারে গল্পকার তাঁর প্রথম পর্যায়ের গল্প লেখার পেছনে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অথবা আত্মোপলব্ধি কাজ করেছে বলে উল্লেখ করেছেন। অভিজ্ঞতার প্রভাবেই হয়তো শুরুতে ভূপেন্দ্রনারায়ণ গল্পকারের সমাজ সংস্কারকের পরিচয়টির প্রতি অধিক যত্নবান ছিলেন। আর এই

কারণেই এই প্রতিভাশালী গল্পকারের প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলো তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতায়ই আবদ্ধ ছিল। সেই অনুপ্রেরণাকেই সম্প্রসারিত করে পরবর্তী পর্যায়ে এই গল্পকার দার্শনিক বিশ্লেষণে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে অধিক আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন এবং তেমন এক প্রচেষ্টারই ফসল— 'কচুপাতত এজনী কাউরী' (কচুপাতায় একটি কাক), 'হিপক্রেটর সৈতে এজন হতাশগ্রস্ত' (হিপোক্র্যাটের সঙ্গে একজন হতাশাগ্রস্ত) এবং কাউরী কাউরী কাউরী (কাক কাক কাক)-এর মত গল্পগুলো। গল্পলেখক বাস্তব জীবনটিকে ধরে রাখবার জন্য কখনও কখনও ব্যঙ্গাত্মক আচরণের ব্যবহারও করেছেন। তাঁর এই ব্যঙ্গ প্রকৃতপক্ষে সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিই ভ্রূকুটি। 'কাউরী কাউরী কাউরী' গল্পে এক ভণ্ডের সঙ্গে এক ভদ্রলোকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পরিচয় (Identity) এবং স্থিতি (Existance)-র প্রশ্নটিকেই তুলে ধরা হয়েছে। ভূপেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের প্রখর সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর গল্পের মাধ্যমে জীবনকে এক দূরত্ব থেকে দেখবার সুযোগ করে দেয়। যে কারণে তাঁর গল্পে জীবনবোধ আরোপিত নয়, বরং সংশ্লেষিত।

> *পৃথিবীতে আসলে ব্যক্তিগত বলে কোনো কথাই থাকা উচিত নয়। পৃথিবীর প্রতিটি সম্পদই প্রতিটি মানুষের সম্পদ। তোদের বাড়ির পাকা পেঁপেগাছটা থেকে শুরু করে আমাদের বাড়ির জাহাজি কলার কাঁদি পর্যন্ত সব-কিছুকেই সবাই নিজের বলে দাবি করতে পারা উচিত।*
>
> *কথাটা শুনতে ভাল, কিন্তু বাস্তবে?*
>
> *মধ্যবিত্তরা এ কাজে বাধা দিচ্ছে। প্রাচীনকাল থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে , আর চলতে দেওয়া যায় না।*
>
> *সেজন্য তো বিপ্লবই আছে। এই নিয়ম ভাঙার বিপ্লব।*
>
> *তা-ও ওরা হতে দেবে না। মনে নেই, সেই মাছবাজারের বিপ্লব! মাছের বাজারে যেদিন নকল অভাব দেখিয়ে ব্যবসায়ীরা মাছের দাম আগের চাইতে দশ গুণ বাড়িয়ে দিল, সেদিন আমি ওই বাজারেই ছিলাম। সেদিন খদ্দেররা যদি এককাট্টা হয়ে মাছ না কিনত তাহলে ব্যবসায়ীরা আমাদের কথা ভাবতে বাধ্য হত। এমনি করে একদিন দু-দিন তিনদিন সপ্তাহ মাস যদি খদ্দেররা একজোট থাকত। সেদিন আমি সবাইকে হাতজোড় করে বললাম, আসুন, আমরা আজ আর মাছ কিনব না। সবাই প্রায় রাজি ছিল, কিন্তু দোকানের পেছনের দরজা দিয়ে তুই-ই পাঁচ কিলো মাছ কিনে ব্যাগে ভরে ভদ্রলোক হয়ে গেলি। মধ্যবিত্তরা চিরকালই ভদ্রলোক। তারা কখনও মুখ তোলে না। শুধু আড়ালে তাদের উস্কানি আর বিশ্বাসঘাতকতা চলতে থাকে। তারা বৃহত্তর স্বার্থের কথা বলে, ব্যক্তিগত স্বার্থের স্বপ্ন দেখে। কারণ লুটে নেবার জন্য তাদের চাই আইনগত সুরক্ষা।*

(হিপোক্রেটর সৈতে এজন হতাশগ্রস্ত/ভূপেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য)

নব্বইর দশকের গল্পকার শিবানন্দ কাকতির গল্পে যে অন্তর্দৃষ্টি তা অসমীয়া গ্রাম্যজীবনের নিখাদ-সরল মানসিকতা বা চিন্তার ধরণ থেকে উদ্ভূত। আশি এবং নব্বই দশকে আত্মপ্রকাশ করে প্রতিষ্ঠা লাভ করা প্রায় সব গল্পকারই পৌর-বাস্তব, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, আঙ্গিক কৌশল ইত্যাদির প্রতি অধিক আকর্ষিত হয়ে পড়েছিলেন। অপরদিকে শিবানন্দ কাকতির গল্প আজও আংশিক অনাবিষ্কৃত অসমীয়া গ্রাম্য জীবনকে আশ্রয় করে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। শিবানন্দ কাকতির গল্প আধুনিকতার আগমনে গ্রাম্য জীবনে কীভাবে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের সংস্পর্শে মানুষের শুভবোধ বা সরলতার মত বৃত্তিগুলো কীভাবে অধিক মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে তা বিচার

করে দেখবার সুযোগ পাঠককে দেয়। কাকতির লেখা উল্লেখযোগ্য গল্পগুলোর চরিত্রসমূহ লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব জীবনের এই যে দ্বন্দ্ব, এই যে দোটানার যন্ত্রণা তা ওই চরিত্রগুলোকে আমাদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে কারণ আধুনিক মানুষের অস্তিত্বও এরকম এক দোটানায় পড়ে ভারসাম্যহীন হয়ে আছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোতে আবেগিক ভর নেই কিন্তু অনুভূতিগত সরলতা আছে যার ফলে এই চরিত্রগুলো মানবীয় গুণে উজ্জ্বল। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর 'আমৃত্যু অমৃত' নামের গল্পটির কথা বলা যেতে পারে। এই গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র অমৃত উগ্রপন্থী সদস্য বলে চার বছর গ্রাম্য সমাজ জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ছিল। চার বছর পর সে যখন ফিরে এল তখন দেখাসাক্ষাৎ হওয়া প্রতিটি লোকের মুখে সে আন্তরিকতার পরিবর্তে ভয়, সম্ভ্রম ও সমীহ দেখতে পেল। এর ফলে যে অসহজ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তাতে অমৃতকে মানসিক অশান্তি ভোগ করতে হয়েছে আর সেই অশান্তির মূল খুঁজতে গেলে আমরা দেখতে পাব যে অমৃতর জীবন থেকে মানবিক সংবেদনশীলতার ধারাটি তখনও শুকিয়ে যায় নি বলেই তার এই মানসিক যন্ত্রণা। অমৃতর এই সংকট মূল থেকে সরে আসা প্রতিটি আধুনিক মানুষের সংকট।

> *সাঁকোটা পেরিয়ে ট্রাকটা কিছু দূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাষ্ট্রীয় সড়কের ওপরে এই সাঁকোটার দু-মাথায় অনেক দূর পর্যন্ত দু'পাশে টিম টিম করে জ্বলতে থাকা আলোগুলোকে দূর থেকে দীপান্বিতার দু'সারি প্রদীপ মনে হলেও সামনে গেলে কেরোসিন-কুপির ধোঁয়াশা টের পাওয়া যায়। প্রতিটি বাতির পাশেই টিনের বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন ধরণের মাছ। মুখ্য পথটির দু'পাশে দু'সারিতে গ্রাহকের অপেক্ষায় বসে থাকা এক একজন মাছুয়ার সঙ্গে দু'একজন সহচর। হয়তো নিজেরই সহোদর, পুত্র বা পাড়াপড়শি কোনো গাঁইয়া মেছো। দূর থেকে আসতে থাকা গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখলেই সঙ্গীরা তৎপর হয়ে ওঠে। মাছের মাথায় লাগানো ডোর ধরে লাইটের সামনে মাছটি তুলে ধরে। গ্রাহক আকর্ষণ করার প্রতিযোগিতাতেই নি...করে কার সামনে গাড়িটি থামবে। তারপর দরদাম করে মাছ বিক্রি করতে পারলেই সেই সন্ধ্যার মত কাজ শেষ। অঞ্চলটির লোকগুলোর মাছই যে একমাত্র জীবিকা তা নয়। দু-চার বিঘা জমিতে সারা বছর যাদের কুলায় না তারা প্রায় সবাই সারাটা দিন ধরে হালচাষ বা ক্ষেতের অন্যান্য কাজকর্ম সেরে বিকেলের দিকে নদী বা বিলে জাল ফেলে। আর জালের মাছ নিয়েই সন্ধেবেলো সাঁকোর যে কোনো একটা মাথায় বসে পড়ে। এই মাছের পয়সাতেই রোজকার ঘরসংসারের যাবতীয় খরচ চলে। অবশ্য গোলায় যখন ধান থাকে না তখন একমাত্র মাছের পয়সাতেই ঘর চালাতে হয়।*
>
> *(আমৃত্যু অমৃত/ শিবানন্দ কাকতি)*

'মুগার পাঞ্জাবী' (মুগার পাঞ্জাবী), 'এরা সুঁতির ঢল' (মরা নদীর ঢল)-এর মত গল্প লিখে অরূপা পটঙ্গীয়া কলিতা ১৯৭২ সালে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ গল্পের প্রধান উপজীব্য নারী-জীবনের সমস্যা। একটি কাব্যিক ভাষা এবং একটি তীব্র সমাজ-সচেতন মনের অধিকারী অরূপা বেশ কিছু সুখপাঠ্য গল্প লিখেছেন। 'নিমন্ত্রণ', 'দৈবকীর দিন', 'কেতিয়াবা নুমলী এদিন' (কখনও বা নুমলী একদিন)-এর মত গল্প পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে যে উৎপীড়ন ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার-ই চিত্রায়িত রূপ। কিন্তু এ শুধুই বাহ্যিক জগতের বর্ণনা নয়। গল্পের চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক অবলোকন এবং তারই ভিত্তিতে নিম্নমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সমাজটির প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরবার ক্ষমতা অরূপার গল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। অরূপা

পটঙ্গীয়া কলিতার গল্পের পটভূমি এমন একটি সমাজ যে সমাজের মানুষজনের আচারব্যবহার, দিনযাপন সবকিছুতেই অর্থনৈতিক অবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

একটি মহিলা এক হাতে নাকটা চেপে ধরে অন্য হাতে চুবড়ির চাল-আলুর পুঁটলিটা টিপেটিপে দেখছে, 'কী আছে এটায়?' দৈবকীর মাথায় খুন চেপে গেল। দৈবকী মাছওয়ালিকে ওরা চোর বলছে। তার খাটনির পয়সাকে চুরির পয়সা বলছে। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলে মাগুর মাছ যেমন তার গায়ের কাঁটাগুলো মেলে ধরে তেমনি সে-ও তার হাত দুটো মেলে ধরল, তার কালো গায়ে শিঙি মাছের বিষ। চালের পুঁটলিটা টিপতে থাকা মহিলাটিকে সে হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিল। দৈবকী বাতাসে একটা চেনা-চেনা গন্ধ পেল। মানুষগুলো ঘুরে ঘুরে সাঁকোটার দিকে তাকাচ্ছে। রোদে চিকমিক কালো শরীরগুলো নিয়ে একদল মানুষ ছুটতে ছুটতে সাঁকো পেরিয়ে 'বর নামঘর' (কীর্তনঘর)-এর দিকে এগিয়ে আসছে। দৈবকী একবার সেদিকে তাকাল, তারপর পরিচিত ভঙ্গিতে উরুতে থাপ্পড় মেরে বলল, 'হ্যাঁ, আমি মেয়েমানুষ, আমি ঋতুমতী হই, আমি পেটে বাচ্চা ধরেছি। আমি ডোমনি, মাছ মেরে খাই। বর নামঘরে ঢুকে আমি পাপ করেছি। কিন্তু আমি চোর নই, গতরাত্রে মিলিটারির ভয়ে, ঝড়জলে......।' দৈবকী কথা শেষ করতে পারল না। চারদিক থেকে তার শরীরে চড়চাপড় পড়তে লাগল। মেলে দেওয়া ধানে তার ছায়াটা পড়লেও রাগে গরগর করা মানুষগুলোর ছায়ায় তা ঢেকে গেল। মা-মা বলে চিৎকার করতে করতে কালো, মাঝারি গড়নের একটি ছোট্ট ছেলে নামঘরে এসে ঢুকল। কে যেন তাকেও এক ধাক্কা মারল। ভিড়ের মধ্যে অন্ধকার থেকে দৈবকী এক গগনবিদারী চিৎকার করে উঠল, 'আমাকে মেরে ফেলিস না রে, কানি বুড়ির সঙ্গে আমার ছেলেমেয়ে ক'টা......।' চিৎকারটা গিয়ে বর নামঘরের দুয়ারমুখের সাঁকোটায় দাঁড়িয়ে থাকা কালো মানুষগুলোর মধ্যে একঝাঁক টাকি মাছের বাচ্চার মধ্যে বড়শি পড়ার মত পড়ল। লোকগুলো আঁতকে উঠল। জাল থেকে ঢেলে ফেলা কুঁচো মাছের ঝাঁকের মত মানুষগুলো পিলপিল করে তিন পুরুষেও পা না-দেওয়া বর নামঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। কানি বুড়ি হাত ধরে দৈবকীর চিৎকার লক্ষ্য করে নিজেকে সামলাতে সামলাতে এগিয়ে আসছে, 'ওরে দৈবকী! দেখি তোকে কে কী করে! তুই আমার মেয়ের মত! এই কানি বুড়ি বয়সকালে পলোর এক এক কোপে এক একটা পাকা রুই ধরেছে। বুড়ি মরেনি রে দৈবকী!'

(দৈবকীর দিন/অরূপা পটঙ্গীয়া কলিতা)

অন্যদিকে কুল শইকীয়ার গল্পের জগৎ হচ্ছে গল্পকারের মনোজগতের উপলব্ধির জগৎ। বাহ্যিক পৃথিবীর যেসব ঘটনা, চরিত্র এবং পরিবেশ দ্বারা গল্পকার আকর্ষিত হন সেগুলোই গল্পকারের মনোজগতে প্রবেশ করে একটি মানসিক প্রক্রিয়া বা চেতনার রূপ হিসেবে বেরিয়ে আসে। অসমীয়া গল্পের ক্ষেত্রে এ ধরণের রসায়ন সত্যিই বিরল। তাঁর গল্পের এই চরিত্র সৌরভকুমার চলিহার গল্পে বাইরের পৃথিবীর যে রূপকীয় অস্তিত্ব সজীবভাবে উপস্থিত থাকে কুল শইকীয়ার গল্পে সেই চরিত্র অন্তর্মুখী এবং গল্পকারের উপলব্ধি দ্বারা পরিশোধিত এবং নিয়ন্ত্রিত। তাঁর গল্প পড়তে শুরু করলে মনে হয়—লেখক গল্প লিখছেন না, ভাবছেন, গল্পটি বলতে চাইছেন। আর এই দুটো পরিস্থিতির অবলম্বনে আহৃত ছবিটি তিনি প্রতিফলিত করেন। অর্থাৎ গল্প লেখার প্রচলিত নিয়মানুবর্তিতাকে অস্বীকার করেই কুল শইকীয়ার গল্প রচনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। 'নিটোল কাহিনী'-র সীমাবদ্ধতা কুল শইকীয়ার গল্পে নেই আর এজন্যই তাঁর গল্পের পাঠক অর্থ আহরণের একটি বিরামহীন প্রক্রিয়ার

অংশীদার হয়ে ওঠে। তাঁর গল্পের পাঠ একটির পর একটি কল্পনার দরজা খুলে দেয়। কাহিনী এবং ঘটনার বাধ্যবাধকতা নয়, একটি মুক্ত এবং সংবেদনশীল মন নিয়ে সম্ভাব্য সকল ধরণের সম্ভবনাকে স্বীকার করার মানসিকতা নিয়ে তাঁর গল্পের পাঠক অগ্রসর হতে পারে বলেই এটা সম্ভব। তাঁর গল্পে অতীত যাত্রার আধিক্য বেশি। এই যাত্রা প্রকৃতপক্ষে নিজেকে পুনরাবিষ্কারের একটি প্রক্রিয়া মাত্র। সময় এবং স্থানের দূরত্বই অনেক সময় মানুষের জীবনে একধরণের aesthetic distance-এর সৃষ্টি করে। স্থিতাবস্থার জটিলতার যথার্থতা বিচার করতে গেলেই আধুনিক মানুষের মনে এই দূরত্বের মূল্য এবং গুরুত্ব নিরূপিত হয়। কুল শইকীয়ার গল্প এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সংবেদনশীল। এজন্যই তাঁর বহু প্রেমের গল্প, এজনই তাঁর বহু গল্প কবিতার গদ্যরূপ।

ঘুমুচ্ছেন না কি?

অস্ফুট এই স্বর আমি গত ক'দিন ধরে শুনে আসছি। বলতে পারি—'বোধহয় তা-ই, নইলে স্বপ্ন দেখলাম কী করে? এই যে তোমাদের বন্ধ দুয়ার—খুলে আমি বেরিয়ে পড়লাম, আমার পুরনো কলেজের দিনের একটি শহরে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে গলিতে গলিতে হাঁটলাম, আজ এত বছর পর অকস্মাৎ ,অভাবনীয়ভাবে বন্দনার সঙ্গে দেখা হল! স্বপ্ন না হলে কি এমন হয়.......?'

আমি কিছুই বললাম না। ভয়ে আমার গলা বুজে এল। আমি জানি, ছেলেটি আমার জন্য তার লিডারের কাছ থেকে নতুন ফতোয়া জারি করে এনেছে, সেখানে লেখা থাকতে পারে মৃত্যুর আদেশ।

আমার মন থেকে বন্দনার কোঠার ছবি ধীরে ধীরে মুছে যেতে লাগল, বুঝলাম, আমাদের সব স্বপ্নই এভাবে স্মৃতি থেকে দূরে সরে যায়—আমরা না চাইলেও।

চলুন, যেতে হবে।

তার মুখ থেকে বেরনো শব্দ ক'টির শারীরিক আকৃতি দেখবার আগ্রহে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

জলদি, সময় কম।

তার চেঁচামেচিতে আমি আঁতকে উঠলাম। যে দরজা দিয়ে কিছুক্ষণ আগে আমি পালানোর স্বপ্ন দেখছিলাম, সেই দরজা এখন খোলা।

সেদিক দিয়ে বেরনোর জন্য আমরা দু'জন তৈরী হলাম।

'এবার কোথায়?'—জিজ্ঞেস করে ফেললাম, নিজের কানেই প্রতিধ্বনিত হল হতাশা।

'অন্য কোথাও, অন্য কোনো ঘরে',—সে নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল।

'সেখানেও হয়তো দরজা থাকবে, দুটো বা তিনটে কাঠের দরজা, যেগুলো বন্ধই থাকবে'—জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেলাম।

ছেলেটির সঙ্গে আমি বেরিয়ে এলাম।

(দুয়ার/কুল শইকীয়া)

গল্পকার হিসেবে পরিচিত না হয়ে 'কথক' হিসেবে পরিচিত হতে আগ্রহী রবীন শর্মা একজন ব্যতিক্রমী গল্পকার। রূপকথার উপাদান থেকে শুরু করে গ্রাম্য প্রবচনের ব্যবহার, স্থানীয় লোকপুরাণ থেকে গল্পকারের চলচ্চিত্র সন্ধানী দৃষ্টিকোণ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকরণের ব্যবহার তাঁর গল্পে আঞ্চলিক বাস্তবকে তুলে ধরে। তাঁর গল্প নীতিকথা বলা শৈলীতে কথিত-প্রবণতার সঙ্গে জড়িত। তাঁর গল্পের

'কথক' গল্পকার নিজে এবং একই সঙ্গে অন্য কোনো ব্যক্তি বা পরিবেশের উপলব্ধিরই বাহক হওয়ায় রবীন শর্মার গল্পের কথক সূত্রধার না হয়ে সমগ্র উপলব্ধির প্রতিফলন হতে পারে। 'কথা ভগীরথ', 'লখেতরা', 'অ মনেতরা'-র মত গল্পে গল্পকার কেবল আঙ্গিকের ক্ষেত্রেই নয় ঘটনাক্রমেও জিজ্ঞাসা এবং বৈচিত্র্যের আন্তরিক সমাহার ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। জিজ্ঞাসা এবং বৈচিত্র্য দুইই আমাদের লোকজীবনের নীতিকথাসমূহের চরিত্র। কথিত ভাষার প্রয়োগ এবং ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রী শর্মা গল্পের লিখিত স্বরূপের সীমবদ্ধতাকে অতিক্রম করে পরিবেশিত কলার রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। রবীন শর্মার শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোয় গল্প নেই, আছে অনুভূতির প্রতীকী উপস্থাপন। গল্পকার নিজে লোকসংস্কৃতির একজন গবেষক বলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গল্পগুলোর উপস্থাপনায় Surface structure ও Deep structure একীভূত হয়ে থাকে যার ফলে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোতে সাংগীতিক মাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায়।

> *কাহিনীটি ভগীরথের। ভগীরথ আবার কে? রাইডিঙিয়া অঞ্চলের কাউকে যদি জিজ্ঞেস কর, কেউ বলতে পারবে না। যদি বল 'ঠেলা ডাক্তার'-এর কথা, 'পুরিয়া ডাক্তার' -এর কথা বা যদি জিজ্ঞেস কর 'ব্রিটিশ ডাক্তার' এর কথা, বাব্বা! দেখবে সকলের মুখে খই ফুটছে। তৎক্ষণাৎ দেখিয়ে দেবে পুরনো স্টেশনের ডাক্তারবাবুকে। কবেই টিনের রং হাওয়া হয়ে গেছে তবু ডাক্তারের প্রতি মমত্বে ফুটে আছে চারটি অক্ষর— 'ভগীরথ হোমিও প্রতিষ্ঠান'।*
>
> *ওপরে যে তিনটে নাম বললাম, ভেবো না ওগুলো ডাক্তারবাবুর উপনাম। তিনটি অঞ্চলের তিনটি সম্প্রদায় ওই নাম ক'টা দিয়ে যেন নিজেদের জীবন প্রতিনিধিকে চিনতে পারে। তাই না কি? হ্যাঁ। প্রথমেই বলছি, আই নদীর পারের ভাটিয়া গাঁয়ের চরবাসী চাষাভুষোদের কথা। এরা ডাক্তারকে যে নাম দিয়েছে তা হল— 'ঠেলা ডাক্তার'। কেন? কারণ রোগ যা-ই হোক না কেন রোগের লক্ষণ দেখে তার মুল উদঘাটনের জন্য ধুতির খুট দিয়ে চশমা মুছতে মুছতে ডাক্তার যে রাশি রাশি প্রশ্ন করে এবং তারপর মহাভারতের মত বিশাল হাজিরা খাথায় নামধাম, রোগেব ওষুধ পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে, কোলকুঁজো কোমরে হাত দু'টো রেখে ওষুধের আলমারিতে যেমন করে ওষুধের বোতল খোঁজে—অতিষ্ঠ হয়ে মিএরার বুড়ি কখনও কখনও নিজেদের মধ্যেই এই বলে মস্করা করে যে, 'এই যে ডাগদারবাবু এখন শাকে চুল খুজতেছে..... ।' এই দীর্ঘ পরিক্রমা কচ্ছপগতির। তাই ওদের দেওয়া ঠেলাগাড়ি নামটা উপযুক্ত নয় কি?*
>
> *তারপর 'পুরিয়া ডাক্তার' নামটা— ।এই নামটি কেওট-কলিতা-রাজবংশী এবং আরও অনেকের সম্মিলিত উপহার। সাদা পাউডার গুঁড়োতে এক ফোঁটা বা দু'ফোঁটা ওষুধ দিয়ে, ছোট ছোট পুরিয়া বেঁধে, তাকে এক নং, দুই নং, তিন নং দাগ দিয়ে, তিন থেকে ছ'ঘন্টা পরপর খাবার নির্দেশ থেকেই যে 'পুরিয়া ডাক্তার'-এর সাইনবোর্ড জ্বলজ্বল করছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।*

(কথা ভগীরথ/রবীন শর্মা)

পাঠক এবং সমালোচক উভয়ের মনে সমভাবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী মনোজকুমার গোস্বামীর গল্প আশি এবং নব্বইর দশকের অসমের সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ের জীবন-জিজ্ঞাসাকে অতি সফলভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। এই ব্যক্তিগত পর্যায়ের জীবন-জিজ্ঞাসা গল্পকারের স্ব-কথন নয় বলে চলিত জীবনের স্বাভাবিক তুচ্ছতার মধ্যেও মনোজকুমার গোস্বামীর গল্প নাটকীয়তার সন্ধান দিতে পেরেছে। এই গল্পকারের গল্প পড়লে মনে হয় স্রষ্টা পরিবেশ পরিস্থিতির

পর্যবেক্ষক মাত্র—নিয়ন্ত্রক নন, যে জন্য তাঁর গল্পের অধিকাংশ চরিত্রই বিপর্যস্ত কিন্তু হতাশাগ্রস্ত নয়। মনোজকুমার গোস্বামীর গল্পের চরিত্রের যৌক্তিক উত্তরণ ঘটে। একমাত্রিক দৃষ্টিকোণের পরিণামজাত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জোর-জবরদস্তি মনোজকুমার গোস্বামীর গল্পে নেই বলে তাঁর গল্পের নঞর্থক সমাপ্তিও পাঠককে জীবন এবং বাস্তব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। মনোজকুমার গোস্বামীর সৃষ্ট চরিত্রের যে সংশয় তা আধুনিক যুগের মানুষেরই সংকট। আর এই সংকটকে গল্পকার গল্পে যুক্ত করেছেন বর্ণনাভঙ্গিতে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং নির্মেদ গদ্যের ব্যবহারে এবং বহুক্ষেত্রে কথোপকথন শৈলীর প্রয়োগ দ্বারা পরিবেশ এবং চরিত্র জড়িত হয়ে থাকা চলিত উপলব্ধিকে অনুধাবন করার মাধ্যমে। দৈনন্দিন জীবনে অর্থহীন বলে মনে হওয়া ঘটনাগুলোতেও মনোজকুমার গোস্বামীর গল্প অন্তর্নিহিত তাৎপর্য খুঁজে পেতে পাঠককে সাহায্য করে।

কতক্ষণ অনাদি সেই লাশটির পাশে বসেছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ অনেকগুলো পায়ের শব্দে সে সম্বিৎ ফিরে পেল। মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে ঘরটিতে কয়েকজন গম্ভীর মুখের অফিসার, সিপাহি, ডাক্তার, নার্স এবং ওয়ার্ডবয়। প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে থাকা অনাদি উঠে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। তার মনে পড়ে অখিলকে এখন তার দু'টো জরুরী খবর দিতে হবে। অস্থির পায়ে অনাদি বেরিয়ে আসে, কেউ তাকে লক্ষ্য করে না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিভ্রান্ত অনাদি ভাবে অখিলকে সে কোন্ খবরটি প্রথমে দেবে—জন্মের না মৃত্যুর। ইমার্জেন্সির টেলিফোনটা বারান্দার ঐ মাথায়। বারান্দায় লোক গিজগিজ করছে। সারা বারান্দা জুড়ে তীব্র উত্তেজনা, চাঞ্চল্য আর ছুটোছুটি। আর তখনই ঝপ করে আলো নিভে যায়। লোডশেডিং এর অন্ধকার একটি কালো কম্বলের মত সবকিছুকে ঢেকে ফেলে, হতাশায় কে যেন চিৎকার করে ওঠে। আহত ব্যক্তির যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ বারান্দাময় ছড়িয়ে পড়ে, দুটো টর্চের আলো তার দিকে এগিয়ে আসে. কে যেন দেশলাই জ্বালে, একটি অল্প পাওয়ারের ইমার্জেন্সি লাইট জ্বলে—এরই মধ্যে অনাদি ফোনটাব দিকে এগিয়ে যায়। তার চারদিকে শরীরবিহীন অলৌকিক মানুষ, অলীক পায়ের শব্দ, ভৌতিক আর্তি এবং সংলাপ। পোস্টমর্টেম— সাতটা ডেডবডি—পাওয়ারফুল বোমা--বিক্ষিপ্ত শব্দগুলো অন্ধকারে ঝুলে থাকে। সেই অন্ধকার, আর্তনাদ আর জিঘাংসার মধ্যে টেলিফোনের দিকে এগোতে এগোতে অনাদি একটি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়। সে ঠিক করে, অখিলকে প্রথমে সে নিরুর ছেলে হবার খবরটিই দেবে। সে মনে মনে যুক্তি সাজায়। জন্ম চিরকালই মৃত্যুর চাইতে শ্রেষ্ঠ ও মহান। তাছাড়া এই সন্ত্রাস, দুর্ভাবনা আর ত্রাসের জগতে একটি শিশুর হাসি হয়তো খুবই প্রয়োজনীয়। অস্পষ্ট আলোয অনাদি ফোনের সামনে পৌছায়, ক্র্যাডেলের ধাতব স্পর্শ অনুভব করে। ডায়ালের সংখ্যাগুলো চোখে দেখা যায় না। একহাতে দেয়ালে ভর দিয়ে অন্য হাতে সে পকেট থেকে দেশলাই বের কবে, তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে একটি কাঠি জ্বালায়, সন্তর্পণে গগৈব ফোন নাম্বারটা ডায়েল করে। ওপাশে খুব ক্ষীণ স্বরে রিং হয়, কেউ একজন রিসিভার তোলে--হ্যালো...

গগৈদা নাকি? আমি হাসপাতাল থেকে বলছি, অনাদি৷ গলা কেঁপে ওঠে, অখিলকে একটু ডেকে দিন।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখার শব্দ হয়। টেলিফোনের কাছে আসতে অখিলের কিছু সময় লাগবে। রিসিভার হাতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে অনাদি দাঁড়িয়ে থাকে। হাসপাতালের বাতাসে ফিনাইলের অ্যান্টিসেপটিক গন্ধ। কয়েকটি মোমের আলো আর কিছু ভৌতিক পদশব্দ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। টেলিফোনের নিঃশব্দ রিসিভার হাতে অনাদি দাঁড়িয়ে থাকে। আর তখনই সে দেখতে

পায়, একটি লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে—বেঁটে, রোগা। লোকটি এসে অনাদির সামনে দাঁড়াল। মাথা নত করে সামান্য বিনয় প্রদর্শন করল। সেই বিচ্ছুরিত আলোকে চমকে উঠে অনাদি দেখে—লোকটির তামাটে মুখ, ঠোঁট দুটো নড়ছে, সে বলছে, এক্সকিউজ মি, আপনার দেশলাইটা একটু দেবেন?

(মোক জুইসলা বাহটো দিয়ক/মনোজকুমার গোস্বামী)

অপূর্বকুমার শইকীয়ার ঘটনা এবং গল্পের চরিত্রসমূহের আচরণ ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসার পর্যায়ে এবং এই অনুসন্ধিৎসা হয়তো গল্পকার নিজে একজন চিকিৎসক বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের চেতনা দ্বারা বিশ্লেষিত হয়। যে জন্য তাঁর গল্পের জীবনবোধের সামাজিক আকার পেতে দেরি হয়েছিল। তাঁর গল্পের দুটি জগৎ। একটি জগৎ হচ্ছে অনুভূতি এবং বাস্তব জগতের সাদৃশ্য থেকে আহৃত আত্মোপলব্ধির জগৎ আর অন্য দিকে এই অবস্থায় বিরাজমান আত্মবিভ্রমের জগতের আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে সৃষ্ট মানসিক অবস্থার জগৎ। তাঁর গল্পের চরিত্র একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রচলিত বাস্তবকে অনুসরণ করে। আর যখন সেই চরিত্রই চলিত অবস্থার বাস্তব আয়নায় নিজের আত্মকৃতি দেখতে চায় তখনই সৃষ্টি হয় হৃদয় এবং মগজের পুনঃপৌণিক হিসেবের খেলা। তাঁর গল্পসমূহ এ ধরণের সংঘাতের মধ্যেই জীবনসত্য আহরণের চেষ্টা করে। 'মনোহর বুঢ়ার পঢ়াশালি' (মনোহর বুড়োর পাঠশালা), 'এটা বন্দুকের ভাষারে' (একটি বন্দুকের ভাষায়), 'মেটামরফসিস' প্রভৃতি গল্পই তার উদাহরণ। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লেখকের ক্ষেত্রে একটি মাধ্যম এবং মানুষের জীবন তাঁর প্রয়োগশালা। অসমের পুরুষ গল্পকাররা নিজেদের লিঙ্গভিত্তিক অস্তিত্বহেতু বহুসময়ই কথক হিসেবে বোঝাপড়ায় আসতে পারেন না। এবং সেজন্যই পুরুষ গল্পকারের আধিক্যে অসমীয়া গল্পের জগৎটিও পুরুষের অনুভূতি এবং ইচ্ছার জগৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে অপূর্ব শইকীয়ার গল্পে সেই পরিসীমা অতিক্রম করার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

আমার চারপাশের লোকেরা বলে মানুষ হিসেবে আমি একেবারেই নীরব। কথাটাকে একপ্রকার কৃতজ্ঞতা এবং বিনয়ের সঙ্গেই আমি গ্রহণ করি। এরকম একটা কথা বেশি করে প্রচার হলে আমার নিজেরই সুবিধে হবে বলে আমার মনে হয়। নলখাগড়ার মত শুকনো আখের আগা চিবোতে শিয়ালীরাও বিশেষ আগ্রহ দেখায় না। আপাতদৃষ্টিতে খসখসে শুকনো বনরুইটিকে খেতে বাঘিনীরও পছন্দ নয়। এক চূড়ান্ত নিস্পৃহ অবস্থিতি, বিকর্ষক এবং একক।

তুলতুলে রসালো বস্তুর প্রতি আমার নিজেরও আগ্রহ কম । চিনির মত মিষ্টি চাঁপা কলা, পাকা তুলতুলে আতা বা চর্বিসর্বস্ব সর্বভোজী যুবতী থেকে আমি সাত হাত দূরে। আমি মানুষটি প্রাচ্যের মজ্জা দিয়ে তৈরি হলেও আমার সৌন্দর্যের সংজ্ঞা পাশ্চাত্য ঘরানার। বিপরীত সংযোগ। মধ্য ইউরোপীয় যুবতীর মত হনু বের করা গাল, চোখের মঙ্গোলীয় স্ফীতি, কণ্ঠা বের করা মেয়েকে আমি সুন্দরী দেখি। আর এটা সম্পূর্ণরূপেই সৌন্দর্য নিষ্কাম ধারণা। আমার কথা হল তোমার জায়গায় তুমি সুন্দর থাক, আমার জায়গা না হয় দর্শকের আসনেই থাক। এসো, আমরা দুজন দুজনকে বিরক্ত না করার এক চুক্তিপত্রে সই করি। বাস, এতটুকুই। যাকে সৌন্দর্যপিপাসু বলে তেমন মন আমার নেই। কুণো ব্যাঙের পেটটাও আমি সুন্দর দেখি। গিরগিটির চমড়াতেই সংসারের সব পেলবতা আমি খুঁজে পাই। আমার বিয়ের সময়ও আমার হবু পত্নীর ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত কোনো দৈহিক সৌন্দর্যের চাহিদা আমার ছিল না, তার কোষে কোষে ভরপুর একটি নারী-আত্মাই আমি চেয়েছিলাম। সেজন্যই যথাসময়ে যে মেয়েটি

লজ্জাবনত ব্রীড়াভঙ্গিতে আমার সঙ্গে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাবে বলে সংকল্পবদ্ধ হয়ে হোমাগ্নির সামনে বসল, তার ত্বক পরিমাণের চাইতে বেশি রঞ্জিত, শরীরে পরিমাণের চাইতে কম মাংস, দাঁতগুলো মুখগহ্বরের সীমবদ্ধতায় অসন্তুষ্ট আর এইসব অভাব পূরণের অহংকারে 'ওভার টাইম' খাটা এক হরিণী-নয়না মূক-অস্তিত্ব। (মেটামরফসিস/অপূর্বকুমার শইকীয়া)

নব্বই দশকের শেষের দিকে আত্মপ্রকাশ করা ইমরাণ হুসেইন গল্পকে গবেষণামূলক গুরুত্বের সঙ্গে নির্মাণ করেছেন। 'বাঁক', 'হুদুমদেউ' (বৃষ্টির দেবতা), 'যাত্রা বা পখিলা' (পাখি)-র মত গল্পে লোকাচার, লোকবিশ্বাস ও লোকবাস্তব-এর সবগুলো দিক বিশ্লেষণ করে মানবীয় সংবেদনের সঙ্গে যুগের পর যুগ এই অনুষঙ্গগুলো কীভাবে জড়িত হয়ে আছে তা অতি যত্নের সঙ্গে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই গল্পকার অত্যন্ত সচেতন এবং তাঁর অনুসৃত গল্পের কথনভঙ্গিও বিষয়বস্তুর সঙ্গে জড়িত একক এবং নির্দিষ্ট। তাঁর গল্পের গবেষণাসুলভ এবং কষ্টপ্রদত্ত সংযোগ যান্ত্রিক না হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মত সমাহিত এবং সন্তুলিত হওয়ায় কবিতা থেকে লোকাচার, সামন্ততন্ত্র থেকে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ, সামাজিক বাস্তবতা থেকে শৈল্পিক বাস্তবতা, স্থানীয় ঐক্য থেকে সমষ্টিগত নিম্নবর্গ চেতনা, মিথ থেকে ঐতিহ্য চেতনা পর্যন্ত—আধুনিক গল্পের উপাদান হতে পারে এমন সব কিছুই তাঁর গল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। গল্পকার তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞান দিয়ে অসমের গ্রামীণ লোকজীবনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটিকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। আর তা করতে গিয়ে একই সঙ্গে সম্ভাব্য মনস্তাত্ত্বিক জগৎটিকে গল্পকার উপেক্ষা না করায় তাঁর এই গবেষণাসুলভ ঘটনাগুলো কল্পনার বিস্তৃতিতে সুখপাঠ্য কাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যকে বিচার করে দেখার রাস্তা ইমরাণ হুসেইনের পক্ষে বহুমাত্রিক। অবশ্য এসবের পরেও এই লেখক 'জিঘাংসা'-র মত সরল হৃদয়স্পর্শী গল্প লিখেছেন যা শুধু জীবনেরই গল্প।

রাবেয়া হয়তো আরও কিছু বলত কিন্তু পেছন থেকে দুলালী তার হাত-দুটো ধরে বলতে নিষেধ করল। কিন্তু মুহূর্তেই রাবেয়া উল্টে দুলালীর ওপরই খড়্গহস্ত হয়ে উঠল—কেনে বাদ দিম? কি কয়া গেইল শুনিস নাই? তোর মতন অবিয়া চেংরীকে বোলে নিকা কইরবে। বসবু বুড়ের সাথে নিকে? তুই খালি কাম বাদ দিয়ে বাড়ি যা। তোর সতাল বাপে এমন বুড়ের সাথে তোর বিয়া নাদিছে তা মোর নাম রাবেয়া নাহয়. বসবু বিয়ে?'

'না বসিম'—শঙ্কিত কণ্ঠে সে বলল।

'বিয়েও বসবু না, খড়িও বেচাবু না। তাহালে তুই চলবু কেমনের বৈতেলী?'

'মনের মতন মানুষ পাইলে বিয়ে বসিম, নাহইলে থাকিম এমনে। খড়ি বেচে খাইম। তোর সাথে কয়েকদিন আসা-যায়া কইরলে পরে একলাই বেচপার পাইম।'

—অনেক বছর পেরিয়ে আসা অভিজ্ঞ মানুষের মত সে ধীরে ধীরে বলল। 'খড়ি বেচোয়া অত সহজ নহয়। মোর মতন শক্ত হয়া চইলরবে পাবু? মোর মতন মুখ চলাবার পাবু? রাবেয়ার কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর।

দ্বিধাহীনভাবে দুলালী উত্তর করল, 'পাইম'।

রাবেয়া স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ রেলগাড়ির ওই পারে যেতে থাকা হান্নানের অস্পষ্ট শরীরটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওই মানুষটা মোক অনেক অপমান কইরছে। অনেক অত্যাচার কইরছে । দে তো গাইল ওই মানুষটেক।'

এক মুহূর্ত দেরি না করে রাত্রির নিস্তব্ধতা, অন্ধকার এবং জমাট কুয়াশা ছিন্ন করে দুলালী চিৎকার করে উঠল, 'ওই জরুরে গোলাম। তোক যদি আরো এইপাকে দেখং খড়ি দিয়া চাপার

দাঁত খসাইম.....ওই নটীর বাচ্ছা......।'

রাবেয়া অবাক হয়ে দুলালীর মুখের দিকে তাকাল। অদৃশ্যপূর্ব, পাথরে খোদাই করা একটি রুক্ষ মুখ দেখে সে চমকে উঠল। (যাত্রা/ইমরান হুসেইন)

জীবন-সত্যের জটিলতা এবং গভীরতা শহরের অনুভূতিহীন মানুষের মত কোনো এক প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষও নিশ্চয়ই উপলব্ধি করে। কিন্তু জীবনবোধের জটিলতা সম্পূর্ণরূপে নগরীকরণের সঙ্গেই জড়িত। অসমীয়া সামাজিক জীবনের বিবর্তন ও রূপান্তরের প্রতি মনোযোগী না হলে অর্থাৎ অসমীয়া গল্পকাররা নগরীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট মানসিকতার অংশীদার না হলে মানুষের জীবনে ঘটা পরিবর্তন ও জটিলতাকে গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন না। গল্পের বিবর্তন ও রূপান্তরহীন ওই অবস্থায় অসমীয়া গল্পের আধুনিকতার ধারণাটিও ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গেই জড়িত হয়ে থাকবে, ভাবের সঙ্গে নয়। যে সব গল্পকার এসব কথা মাথায় রেখে গল্প লিখছেন, তাদের মধ্যে দেবব্রত দাস ও মনোজ গোস্বামীর পরই প্রশান্তকুমার দাসের কথা মনে আসে। নাগরিক জীবন চেতনাকে গল্পের মূল উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করা সৌরভকুমার চলিহার গল্পে অনুপস্থিত Concrete Poetrydetails এর প্রয়োগ এই ক'জন গল্পকার করেছিলেন। যার ফলে দেবব্রত-মনোজ-প্রশান্তের গল্প থেকে Poetry অন্তর্হিত হল, এল কাহিনী। কাহিনী বলতে যে এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার কথা মনে আসে জীবনের ওইরকম এক ধারাবাহিক খণ্ডায়িত চিত্রই প্রশান্তকুমার দাসের গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। এর কোনো শুরু নেই, কোনো শেষ নেই, আছে জীবনবৃত্তের যে কোনো বিন্দুতেই ঘটতে পারার সম্ভাবনীয়তা। প্রশান্তকুমার দাসের গল্পে সত্য এবং গ্রহণযোগ্যতা দুটোই ধারণা মাত্র ফলে আপেক্ষিকও। সত্যের নির্দিষ্টতাকে অতিক্রম করা এই লেখকের গল্পে বিভিন্ন সম্ভাব্য ঘটনার সম্ভাবনা জীবনকে বহুধাবিভক্ত অর্থের সমষ্টির রূপ দিয়েছে।

শুরুর আগেও থাকে শুরু, আবার সেই শুরুর আগেও আরও এক শুরু, যা আসলে কোথাও শুরুই হয়নি। সেজন্যই কাহিনীগুলো কালের ইতিহাসের মতই প্রাচীন এবং সূত্রপাতহীন। যেমন যোগীন্দর সিংহের কাহিনীটি— এই কাহিনীটি মেরিলিন কোথাও শুরু করেনি। কোথাও পরিসমাপ্তির ঘোষণা করেনি। কার্যত যোগীন্দর ছিল কোন একটি কাহিনীর আংশিক বিবরণ মাত্র।

যোগীন্দরের মৃত্যুর ঘটনাটিও ছিল একটি Funny thing। যোগীন্দর নকল গোঁফদাড়ি এবং পাগড়ি ব্যবহার করত আর সেগুলোকে আসল ভেবেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। সেই উন্মত্ত মার্কিনীরা গোঁফদাড়িযুক্ত যোগীন্দরকে তালিবানি বলে ভুল করেছিল। তাদের কোনো ধারণাই ছিল না যে শিখ বলেও একটি জাতি আছে যারা গোঁফদাড়ি রাখে এবং পাগড়ি পরে এবং তারা আফগানিস্তানের তালিবানি নয়। যোগীন্দরের মৃত্যুর আইরনি এটাই যে, যে গোঁফদাড়ির জন্য তাকে প্রাণ হারাতে হল তার সবটাই ছিল নকল।

(কাহিনী এটার কাহিনী/প্রশান্তকুমার দাস)

এই প্রবন্ধের বয়োকনিষ্ঠ এবং অতি প্রতিভাবান গল্পকার মৌসুমী কন্দলীর গল্পের বিষয়ে আমরা ডঃ হীরেন গোহাঁইকেই উদ্ধৃত করতে চাইছি—"গীতিধর্মী অন্তর্মুখিতা তাঁর রচনার একটি গুণ। কতগুলো গল্পে এই গুণটি প্রাধান্য লাভ করার ফলে তাঁর মনের প্রাথমিক প্রবণতাসমূহ সে গুলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোথাও বা জীবনের জটিলতা এবং অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি উদ্বেগ এবং শঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে আবার কোথাও (সুরম্য উপত্যকার স্তবক) প্রতিবিম্বিত হয়েছে নির্মল

নিষ্পাপ সরল ঐক্যের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ। কিন্তু যে গল্পগুলোতে এ ধরণের প্রাথমিক ভাবাবেগ বা মানসিক প্রবণতার সঙ্গে বাস্তব জীবনের যথার্থবোধ তথা জিজ্ঞাসা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোই তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প।

কন্দলীর গল্পে সরাসরি বিবরণের পরিবর্তে সৌরভ চলিহার গল্পের মত নিরবচ্ছিন্ন অনুভূতি, স্মৃতি, স্বপ্ন, টুকরো টুকরো চিন্তার প্রবাহ কাহিনীর আধার রচনা করে। আধুনিকতাবাদী আঙ্গিকের আদর্শ সে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছে। ফলে প্রাকৃতিক দৃশ্যের নানা রঙ-রূপ, শিল্পকলার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অবচেতন মনের বিস্ময়কর এবং মাঝে মাঝে উদ্ভট বলে মনে হওয়া প্রতিক্রিয়া, বইয়ের স্মৃতিচিহ্ন প্রভৃতিও তাঁর বর্ণাঢ্য মনোজগৎ রচনা করে কাহিনীর ব্যঞ্জনা বৃদ্ধি করেছে। অবশ্য লক্ষ্য করার বিষয় এই যে সৌরভ চলিহার অধিকাংশ চেতনাস্রোতের যে সহজ সাবলীল প্রবহমানতা সে জায়গায় কন্দলীর গল্পের কাহিনীতে মন্তাজের মত আকস্মিক যোগাযোগ, নাটকীয় সংঘাত এবং সাধারণভাবে এক উদ্বেগময় অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া প্রতীকের ব্যবহারও অনেক ক্ষেত্রে (যেমন, 'জোনাকত ঢেঁকিয়াবোর'/জোছনায় দেখা ঢেকি) কাহিনীকে এক অতিরিক্ত মাত্রা দান করেছে। পাঠকের অব্যাহত মনোযোগ দাবী করা এই গল্পগুলো দেবব্রত দাসের পরবর্তী পর্যায়ের এক সম্ভাবনাময় পদক্ষেপ।"

একটা কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। আমার ছায়াঘন নিভৃত জীবনেব সুদীর্ঘ গোপনীয়তায় একটি অদ্ভুত অবসেসন আছে। আমার এই অবসেসন নারীস্তন সম্পর্কীয়। যদিও আমি নিজেও একজন নারী, এক বয়স্কা নারী, তথাপি একজন পুরুষের মতই আমার চোখ দুটো দিয়ে নারী শরীরগুলোকে সূক্ষ্মভাবে লেহন করাটা আমার এক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। চোখের সামনে কোনো নারীকে দেখলে প্রথমেই আমি তন্নতন্ন করে লক্ষ্য করি তার স্তনের আকৃতি এবং আকার। কুমারী মেয়েদের উদ্ধত উন্মুখ ভঙ্গিমা। কী নিষ্পাপ এবং সুন্দর ওদের সেই ভঙ্গিমা। গর্ভবতী মহিলাদের দেখলেই আমার পাকা রসালো বিল্বফলের কথা মনে পড়ে— একটি পুষ্ট ভরাট স্ফীত বিল্বফল। আর কুঞ্চিত বলিচিহ্নিত ত্বকের বৃদ্ধা মহিলাদের সেই নিচে নেমে আসা স্তনগুলো? যেন শুকনো চামড়ার দোমড়ানো মোচড়ানো দুটো লম্বা লম্বা থলে। আসলে আমার চোখে, নারীস্তনগুলো এক প্রতীকীরূপে উদ্ভাসিত হয়। জীবনের রূঢ়-কঠিন বাস্তব দ্বারা ধীরে ধীরে নিষ্পেষিত কুমারী মেয়েদের উদ্ধত স্তনগুলোর শেষ পর্যন্ত কী করুণ অবনমন। উঃ জীবনের এই চরম সত্য আমার সহ্য হয় না। একেবারেই অসহ্য!

(চিরন্তন/মৌসুমী কন্দলী)

সমসাময়িক মহিলা গল্পকার ফুল গোস্বামী, মনোরমা দাস মেধি, পূরবী বরমুদৈ, কাব্যশ্রী মহন্ত, নবনীতা গগৈ, অনুরাধা শর্মা পূজারী এবং বন্তি শেনচোওয়া-র মত গল্পকাররা অসমীয়া গল্পের জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছেন; যা সমসাময়িক ভারতীয় অন্য প্রাদেশিক ভাষাগুলির ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। আধুনিকতা আমাদের সমাজ জীবনে, বিশেষ করে পারিবারিক জীবনে বহন করে আনা জটিলতাকে একজন নারীর দৃষ্টিকোণ দিয়ে ফুল গোস্বামী তাঁর গল্পে প্রতিফলিত করতে চান। মনোরমা দাস মেধির গল্পে এখনও আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে না যাওয়া সরল মানবীয়তার মাতৃবৎ প্রকাশভঙ্গী এবং চলিত বিক্ষিপ্ত সামাজিক পরিবেশে তেমনই এক হৃদয়ের হাহাকার দেখতে পাওয়া যায়। পূরবী বরমুদৈ অভিজ্ঞতাকে কাহিনীরূপে কল্পনা করেন--আর স্বাভাবিকভাবেই তেমনই এক আবেগিক প্রক্রিয়ায় জীবন এবং জগত সম্পর্কে গল্পকারের

উপলব্ধি প্রেম এবং আশার বাঁধনে ধরা পড়ে। জীবনের সরল এবং সৌন্দর্যময় দিকের প্রতি এই গল্পকারের আকর্ষণকে গল্পকার ঐতিহ্যচেতনা থেকে পরিচিত সুরেলা শব্দ-সম্ভারের প্রয়োগে ধরে রাখেন। এই তিনজন গল্পকারের বিপরীতে নবনীতা গগৈ, অনুরাধা শর্মা পূজারী, কাব্যশ্রী মহন্ত এবং বন্তি শেনচোওয়ার গল্প নারীত্বকে উপাদান হিসেবে না নিয়ে বাস্তবকে নিরীক্ষা করার জন্য অন্য সত্ত্বা বা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। মানুষের জীবনে প্রেমের যে মহৎ ভূমিকা তা সৃষ্টিশীল জীবনকে উদ্দীপিত করে রাখে। প্রেম বা সম্পর্ক স্থাপনের তাড়নার বিপরীত বিন্দুতে একটি জগত থাকে। তেমন-ই এক জগতের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রতি আগ্রহী গল্পকার হলেন নবনীতা গগৈ। এই গল্পকারের জীবনের নির্মমতাকে উদঘাটন করার সাহস পাঠকের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। অনেক সময়ে যদিও নবনীতার গল্প আত্ম-উপলব্ধি বলে মনে হয় তবুও সেই উপলব্ধির সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকা শ্লেষ-বিদ্রূপ এবং প্রতিবাদী দৃষ্টিকোণ সমাজের একটি শ্রেণীর মর্মবেদনা ফুটিয়ে তোলে। এর বিপরীতে বন্তি শেনচোওয়া গল্পে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতাকে সংলগ্ন করেছেন। অনুরাধা শর্মা পূজারী শেষদিকের গল্পগুলিতে বাহ্যিক পৃথিবীব পার্থিবতার থেকে সবে গিয়ে অন্তর্নিহিত জীবন সত্যকে উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন এবং সেই গল্পগুলি সুখপাঠ্য হওয়া ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বলে আমাদের মনে হয়।

অরিন্দম বরকটকী

২০০৭

ড. হী. গো.

ডঃ হীরেন গোঁহাই

১৯৩৯ সালে অসমের গোলাঘাটে হীরেন গোহাইয়ের জন্ম। ১৯৫৫ সনে গুয়াহাটির কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষায গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯৫৭ সনে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৯৬০-এ রামযশ কলেজে এম.এ পড়ার জন্য ভর্তি হন। ১৯৬২-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ইংরেজিতে এম.এ পাশ করেন। দিল্লির কিরোরিমল কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনার পরে ১৯৬৫ সনে তিনি কেম্ব্রিজের গণ বিল এণ্ড কীজ কলেজে (সংক্ষেপে কীজ কলেজ) পি.এইচ.ডি গবেষণাব জন্য ভর্তি হন। ক্রীষ্টোফার মরিসের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে ১৯৬৯ সনে পি.এইচ.ডি উপাধি লাভ করেন। পি.এইচ.ডি-র বিষয় ছিল—'Paradise lost and the 17th Century Crisis'। কিছুদিনের জন্য ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে ১৯৬৯ সনে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগের রাষ্ট্রীয় ফেলো হিসেবেও কার্যনির্বাহ করেন। শৈশব থেকেই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দান করা বিশিষ্ট সমালোচক, পণ্ডিত ডঃ গোঁহাই অসমীয়া বৌদ্ধিক জগতের একজন কাণ্ডারীস্বরূপ। অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত তাঁর মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা ৩৫টি। সম্পাদিত গ্রন্থ ৪টি, সম্পাদিত পত্রিকা ৫টি, ইংরেজি গ্রন্থ ৬টি। 'অসমীয়া জাতীয় জীবন ও মহাপুরুষীয়া পরম্পরা' শীর্ষক গ্রন্থের জন্য ১৯৮৯ সনে শ্রী গোঁহাই সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমানে তিনি তাঁর জীবনভিত্তিক রচনা 'বতাহত কার গোধূলি গোপাল'-এর দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় ব্যস্ত রয়েছেন। ১৯৬০ সাল থেকে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করা শ্রী গোঁহাই আজও একজন তীক্ষ্ণ, নিষ্ঠাবান পণ্ডিত, সমালোচক হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত।

পঙ্কজ ঠাকুর

ভারতীয অটোমোবাইল ইণ্ডাস্ট্রিতে অতি পবিচিত নাম পঙ্কজ ঠাকুব। একাধারে প্রকাশক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। জন্ম ১৯৪৮ সালের ১লা জুন। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থশাস্ত্রে এম.এ। মাঝে বেশ কিছু বছর তিনি 'আজির অহোম' সাহিত্য পত্রিকা (১৯৮৮ থেকে ১৯৯১, ২০০৩ থেকে ২০০৫) ও ইংরেজী দৈনিক 'The sentinel' (২০০৪ থেকে ২০০৬)-এর সম্পাদনার সাথে যুক্ত ছিলেন। এখন তিনি টোয়োটো কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার। অন্য পেশায় নিযুক্ত থেকেও নিরন্তর সাহিত্য চর্চায় ব্রতী থাকার জন্যে ১৯৯১ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৮২ সালে লেখকের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'আপুনি কিব কবো নেকি?' প্রকাশিত হয়। তবে তিনি মৌলিক লেখার থেকে অনেক বেশী বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। ১৯৮৮ থেকে গৌহাটির 'রাইটার্স গিল্ড' এর সম্পাদক। সাহিত্য অকাদেমী ও ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট থেকে বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৭ সালের শুরুতেই রিলিজ হবে লেখকের গল্পের আধারে চিত্রায়িত প্রখ্যাত পরিচালক শিব ঠাকুরের ছায়াছবি 'আহির ভৈরব'। নিজের সম্পাদনা (আমন্ত্রিত) করছেন বলে 'মুখাবয়ব' এর এই 'অসমীয়া গল্প ও গল্পকার' সংকলনে পঙ্কজ ঠাকুরের কোনো গল্প নেই।

অরিন্দম বরকটকী

১৯৭৬ সনে অসমের লামডিং শহরে জন্ম। ১৯৯৯ সনে পুনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। কটন কলেজে পড়ার সময় থেকেই সাহিত্য চর্চায় অগ্রণী ভূমিকার অধিকারী অরিন্দম বর্তমানে অসমের একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সমালোচক। অরিন্দম বরকটকীর সম্পাদনায় ২০০২ সন থেকে 'নিবেদন' নামে একটি বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ২০০৭ সন থেকে 'নিবেদন স্বজন চিন্তা' এই নামে পত্রিকাটিকে নতুন রূপে প্রকাশ করা হবে। 'নির্বাচিত অসমীয়া গল্প' বরকটকীর একটি সম্পাদিত গ্রন্থ। প্রখ্যাত সাহিত্যিক হোমেন বরগোহাঞির সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় অসম প্রকাশন পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'অসমীয়া গল্প ঃ তৃতীয় খণ্ড'। এছাড়া অসমীয়া বিশ্বকোষ ইতিহাস খণ্ডের সহকারী সম্পাদক ছিলেন অরিন্দম বরকটকী। বর্তমানে তিনি নগাঁওয়ের আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রবক্তা।

বাসুদেব দাস

১৯৫৮ সালে অসমেব নগাঁও জেলাব যমুনামুখে জন্ম। অসমের কটন কলেজ থেকে বাংলা সাহিত্যে অনার্স নিয়ে পাশ কবে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয থেকে বাংলা সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বে এম.এ কবেন। বর্তমানে চাকরিসূত্রে কলকাতাবাসী। 'চিন্তাভাবনা' প্রথম মৌলিক প্রবন্ধ-গ্রন্থ। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী-১ম পর্ব' ২০০৫ সনে কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হয। এ বছর জানুয়ারির ১ তারিখ গুয়াহাটি গ্রন্থমেলায় 'নির্বাচিত অসমীয়া গল্পসংকলন' প্রকাশিত হয়। ৩০ টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত সংকলনটির ভূমিকা লিখেছেন যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালযেব ইতিহাসের অধ্যাপক হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ পর্যন্ত অনুদিত অসমীয়া গল্পের সংখ্যা ৯০ টিরও বেশি। এছাড়া বেশ কিছু অসমীয়া কবিতা এবং দুটি উপন্যাসও অনুদিত হয়ে প্রকাশের পথে।

অরুণ গোস্বামী

১৯৪৫ সনে অসমের দেরগাঁও-এ গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার অরুণ গোস্বামীর জন্ম হয়। যোরহাটের জগন্নাথ বরুয়া কলেজ থেকে কলা বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে অসম সরকারের সমবায় বিভাগে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে সরকারী চাকরি ছেড়ে সাংবাদিকতার জগতে চলে আসেন। তাঁর গল্প সংকলনগুলি যথাক্রমে 'প্রতিপদের জোন', মাছমরীয়া ছোয়ালীর লাজ', 'মুক্তিস্নান', 'অরুণ গোস্বামীর ব্যঙ্গ গল্প আরু অন্যান্য নির্বাচিত গল্প' ইত্যাদি। ছোট গল্প ছাড়া উপন্যাস রচনাতেও তিনি সমান সিদ্ধহস্ত। নাটক রচনাতেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন। 'আজি' নামক নাটকটি হিন্দিতে অনুদিত হয়ে সর্বভারতীয় ছোট নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের মর্যাদা এনে দেয়। সামাজিক দায়বদ্ধতা লেখকের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লেখকের গল্প এবং নাটক বাংলা, হিন্দি, উড়িয়া এবং ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হয়ে সমাদর লাভ করেছে।

অপূর্ব শইকীয়া

১৯৬২ সালে নগাঁও জেলার ডিফলুতে জন্ম। পেশায় চিকিৎসক। প্রকাশিত গল্প সংকলন তিনটি ঃ 'ব্যর্থ নায়ক', 'বিষয় প্রেমর সংবিধান আরু মাটি আখরা'।

অরূপা পটঙ্গীয়া কলিতা

ইংরেজী সাহিত্যের সুপরিচিত অধ্যাপিকা অরূপা পটঙ্গীয়া কলিতা অসমের গোলাঘাট শহরে ১৯৫৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। অসমীয়া সাহিত্যের এই জনপ্রিয় লেখিকা ছোটগল্প এবং উপন্যাস, কথা সাহিত্যের এই দুটি শাখাতেই সমান দক্ষতার পরিচয় দান করেছেন। সাম্প্রতিক কালে রচিত লেখিকার 'ফেলানি' উপন্যাস অসম আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত এক উল্লেখযোগ্য দলিল স্বরূপ। লেখিকার গল্পগুলির ব্যতিক্রমী চরিত্র পাঠকের মনে এক সার্বজনীন আবেদনের সৃষ্টি করে। ১৯৯৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের 'সাহিত্যসেতু', ১৯৯৫ সালে 'ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার', ১৯৯৮ সালে দিল্লির 'কথা' পুরস্কারে সম্মানিত হন। বর্তমানে অসমের টংলা কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা রূপে কর্মরত। 'মৃগনাভি', 'মরুযাত্রা আরু অন্যান্য', 'অয়নান্ত', মরুভূমিত মেনকা আরু অন্যান্য', 'মিলেনিয়ামর সপোন', 'পাছ চোতালর ইতিকথা' লেখিকার অন্যতম গ্রন্থ।

অতুলানন্দ গোস্বামী

১৯৩৫ সালে জন্ম। কলা এবং বিজ্ঞানবিভাগের স্নাতক শ্রী গোস্বামী অসম সরকারের কর বিভাগের অধীক্ষক হিসেবে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অসমীয়া সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকার কাছে তিনি 'হামদৈ পুলর জোন'-এর স্রষ্টা রূপে বিখ্যাত। প্রকাশিত গল্প সংকলনগুলি হল 'হামদৈ পুলর জোন', 'গল্প', 'রাজপাট', 'পলাতক' এবং 'আশ্রয়'। লেখকের একমাত্র উপন্যাস 'নামঘরীয়া'। ১৯৯২ সালে 'কলীয়া হাতী' গল্পের জন্য লেখক 'কথা' পুরস্কারে সম্মানিত হন। লেখকের বেশ কিছু গল্প বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। শ্রী গোস্বামী নিজেও একজন সফল অনুবাদক।

অতনু ভট্টাচার্য

১৯৬৮ সালে অসমের গোয়ালপাড়া জেলায় গল্পকার অতনু ভট্টাচার্যের জন্ম। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখকের গল্পে উন্মোচিত হয় মানবীয় অভিজ্ঞতার কিছু তিক্ত-মধুর তাৎপর্য। মধ্যবিত্ত জীবনের হা-হুতাশের মধ্যে হঠাৎ চমকে ওঠে কিছু মনোরম অভিজ্ঞতার নির্যাস, অপ্রত্যাশিত আশার আলো অথবা নিরাশার মেঘ। এর মধ্য দিয়ে লেখকের গল্পে ফুটে উঠেছে সাম্প্রতিক সময়ের কিছু জীবন্ত চরিত্রের খুঁটিনাটি।

অনুরাধা শর্মা পূজারী

সাম্প্রতিক অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসে অনুরাধা শর্মা পূজারী একটি উজ্জ্বল নাম। ছোট গল্প এবং উপন্যাস দুটিতেই তিনি সমান দক্ষ। 'হৃদয় এক বিজ্ঞাপন' উপন্যাসটি কলকাতাকে কেন্দ্র করে রচিত। 'কলকাতার চিঠি' এবং 'ডায়েরি'-র লেখিকা হিসেবেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। 'একজন অসামাজিক কবির বায়োগ্রাফি', 'কাঞ্চন' লেখিকার অন্যতম উপন্যাস এবং 'বসন্তের গান' ছোট গল্পের সংকলন। অসমের বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'সদিনে'-র সম্পাদক।

অনামিকা বরা

১৯৬৮ সালে জন্ম। ১৯৯৫ সালে 'কমা' নামে একটি গল্পের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন। 'হিবাকুচা' একমাত্র গল্প সংকলন। লেখিকার গল্পে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে নরনারীর পরম্পরাগত সম্পর্ক এবং প্রেমের বহুধা বিভক্ত রূপও ফুটে উঠেছে। প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলির কল্পনাবিলাসিতা, আবেগসর্বস্বতা এবং ভাববাদের বিপরীতে পরবর্তীকালের গল্পগুলিতে বাস্তবমুখী, মননশীল এবং বস্তুবাদী জীবনচেতনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

প.রি.চি.তি

অপূর্ব শর্মা

১৯৪৩ সালে শোণিতপুর জেলার হেলেনে অপূর্ব শর্মা জন্মগ্রহণ করেন। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি, স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শ্রী শর্মা সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে নগাঁও বালিকা মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করে অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০০ সালে 'বাঘে টাপুর রাতি' গল্প সংকলনের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। অন্যান্য প্রকাশিত গল্প সংকলনগুলি যথাক্রমে 'বন্ধুর পথত কেইজনমান ডেকা মানুহ', শুভ বার্তা' এবং 'বিপুলর যুদ্ধ-সজ্জা আরু কিছুমান কাহিনীর কাহিনী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্র সমালোচক শ্রী শর্মা চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ 'ছা পোহর'-এর জন্য রজত কমল পুরস্কার লাভ করেন।

ইমরাণ হোসেন

১৯৬৬ সালে অসমের ধুবড়ি শহরে গল্পকার ইমরাণ হোসেনের জন্ম হয়। স্কুল কলেজের শিক্ষা ধুবড়িতে সমাপ্ত করে ১৯৯১ সনে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনীতি বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর উপাধি অর্জন করেন। শিক্ষকতাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে সম্প্রতি তিনি ছিপাব্বার কলেজে কর্মরত। হোসেনের গল্প বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছে। ১৯৯৯ সালে তিনি 'কথা' পুরস্কার এবং ২০০১ সালে 'চন্দ্রপ্রভা বরুয়া স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন। ২০০৩ সালে সাহিত্য অকাদেমি লেখকের 'হুদুমদেও আরু অন্যান্য গল্প' নামক গল্প সংকলনটি প্রকাশ করেন।

কমলা বরগোঁহাঞি

১৯৫২ সালে জন্ম। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর শ্রীবরগোঁহাই বর্তমানে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত। লেখকের প্রকাশিত গল্প সংকলনগুলি যথাক্রমে 'মই এটা সাপ', 'ইপার সিপার', অন্ধকারে আমার অস্তিত্ব', এবং 'সৃষ্টি আরু দৃষ্টি'। সত্তরের দশকে লেখকের মই এটা সাপ' গল্পটি অসমের বৌদ্ধিক জগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। আধুনিক জীবনের জটিলতা এবং নীতিহীনতার কাছে আত্মার অসহায় অবস্থানের কথা এমন সূক্ষ্ম মর্মস্পর্শী ভাষায় তীব্র শ্লেষের মাধ্যমে খুব কম গল্পেই রূপায়িত হয়েছে।

কুল শইকীয়া

১৯৫৯ সালে কুল শইকীয়া অসমের রঙিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে অর্থনীতিতে প্রথম বিভাগে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করে কিছুদিন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু কলেজে অধ্যাপনা করেন। তবে সেখানে বেশিদিন স্থায়ী হননি। পরবর্তীকালে ভারতীয় অর্থনীতি সেবায় যোগদান করে ক্রমশ ভারতীয় রেল সেবা এবং বর্তমানে ভাবতীয় পুলিশ সেবায় নিযুক্ত আছেন। বর্তমানে তিনি ভারতীয় পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। লেখকের গল্প সংকলনগুলির মধ্যে 'তীর্থ ডেকার নিরুদ্দেশর পিছর ছোবা', আখরাত মই আরু অন্যান্য' 'গ্রহান্তর', 'আড্ডা' এবং 'আরু কেইটামান গল্প' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৮ সালে লেখক 'আখরাত মই আরু অন্যান্য' গল্প সংকলনটির জন্যে মুনীন বরকটকী পুরস্কার লাভ করেন। গল্প ছাড়া তিনি কবিতা এবং নাটক রচনাতেও সমান পারদর্শী। 'ভোজ' এবং 'বৃত্ত' নামের দুটি টেলিফিল্ম গুয়াহাটি দূরদর্শন কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে।

কাব্যশ্রী মহন্ত

১৯৬৫-তে দেরগাঁও-এ কবি, গল্পকার কাব্যশ্রী মহন্তের জন্ম হয়। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে ১৯৯২ সনে অসম অসামরিক সেবায় যোগদান করেন। সম্প্রতি তিনি এই সেবাতেই ই.এ.সি হিসেবে কর্মরত। শৈশব-কৈশোর তথা জীবনের স্বর্ণমণ্ডিত মুহূর্তগুলির প্রাপ্তি, সুখ-স্বপ্নকে বর্তমানের মধ্যে দিয়ে—বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালের বীভৎস হিংস্রতার বিপরীতে জীবনের পরম আশাবাদ এবং অমূল্য সম্পদকে তুলে ধরায় কাব্যশ্রীর কলম সতত সচেতন।

জ্যোতিষ শিকদার

১৯৫৯ সালে গুয়াহাটিতে গল্পকার জ্যোতিষ শিকদারের জন্ম। বি.বরুয়া কলেজ থেকে কলা বিভাগে স্নাতক হন। সাহিত্য চর্চাকে জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে শ্রীশিকদার অসমের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় গল্প রচনা করে জনপ্রিয়তার অধিকারী হন। সংকলিত গল্পসংকলনগুলির মধ্যে 'গান ভালপোটরা ছোবালীজনী', 'স্বপ্ন বিষাদ জীবন', 'সেউজীয়া পুখুরী' এবং 'শৈশব' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জয়ন্ত কুমার চক্রবর্তী

১৯৫৭ সালে ওরঙাজুলি চা-বাগানে গল্পকার জয়ন্তকুমার চক্রবর্তীর জন্ম হয়। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পাশ করার পর অধ্যাপনাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। বর্তমানে টংলা কলেজে অধ্যাপনায় রত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা ছাড়াও 'দামল' নামে একটি অত্যন্ত উন্নতমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশক। গরিয়সীতে প্রকাশিত 'সংগমত এ সাঁতোর' গল্পের জন্য সর্বভারতীয় 'কথা' পুরস্কারে সম্মানিত হন। প্রকাশিত গল্প সংকলনের নাম 'সংগমত এ সাঁতোর'। সংকলনে অন্তর্ভূক্ত 'জন্মান্তর' গল্পটি গরীয়সী পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থেকে গৃহীত হয়েছে।

তপন দাস

১৯৬২ সালে গল্পকার তপন দাসের গুয়াহাটিতে জন্ম হয়। গৌহাটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ডিগ্রি লাভ করেন। স্কুলজীবন থেকেই তপন দাস গল্প, নাটক ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৮৩ সালে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করা তপন দাসের প্রথম গল্প সংকলন 'দীঘল বরুয়ার দালান'। দ্বিতীয় সংকলন 'ওথেলো এপ্রিল ৯৯' গল্পকার প্রশান্ত দাসের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রকাশিত হয়।

দেবব্রত দাস

১৯৫০ সনে গুয়াহাটিতে গল্পকার ঔপন্যাসিক দেবব্রত দাসের জন্ম হয়। অসম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে স্টেট ব্যাঙ্কে কর্মজীবন শুরু করেন। সম্প্রতি শিলঙে কর্মরত। লেখকের চারটি গল্প সংকলন--'অর্পিতার একরাত', 'হয়তো বা ভেশচন', অর্পিতার অন্য এক রাত', এবং 'বিষয়বস্তু প্রেম' পাঠকের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'গোধূলি থেকে গোধূলি পর্যন্ত এবং 'পুতুল নাচের সাধু' লেখকের দু'টি উপন্যাস।

জেহিরুল হুসেইন

১৯৪১ সনে অসমের গোলাঘাট শহরে গল্পকার জেহিরুল হুসেনের জন্ম হয়। শিক্ষকতাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে শ্রী হুসেন কার্বি আংলং, নাগাল্যাণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষকতা করেন দীর্ঘকাল গোলাঘাটের কাছারিঘাট স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। হোমেন বরগোহাঞি সম্পাদিত 'নীলাচলে' হুসেনের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। লেখকের প্রথম গল্প সংকলন 'দুবরি বনের জুঁই' ১৯৯২ সনে প্রকাশিত হয়। 'রাঙা কুকুরের টুপি' লেখকের একটি অন্যতম গল্প সংকলন। ২০০৫ সনের মে মাসে লেখকের মৃত্যু হয়।

নিরুপমা বরগোহাঞি

'অভিযাত্রী' উপন্যাসের জন্য ১৯৯৬ সালের আকাদেমি পুরস্কার বিজেতা অসমীয়া সাহিত্যের বিখ্যাত লেখিকা নিরুপমা বরগোহাঞি ১৯৩২-এ গুয়াহাটি শহরে জন্মগ্রহণ করে। ১৯৫৪ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ এবং ১৯৬৫ সনে গুয়াহাটি বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ করেন। ১৯৫৮ সালে প্রসিদ্ধ লেখক সাংবাদিক হোমেন বরগোহাঞির সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৬৮ সালে কলেজের চাকরি ছেড়ে 'সাপ্তাহিক নীলাচল' কাগজে সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। এই মানবতাবাদী লেখিকার ইতিমধ্যেই 'সেই নদী নিরবধি', 'একজন বুড়ো মানুষ', 'এপারের ঘর সে-পারের ঘর' ইত্যাদি একুশটি উপন্যাস এবং 'সতী', নিরুপমা বরগোহাঞির শ্রেষ্ঠ গল্প' ইত্যাদি দশটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। অসমীয়া তথা ভারতীয় সাহিত্যে এই বিশাল অবদানের জন্য ১৯৮৭ সনে ব্যাঙ্গালোরের 'শাশ্বতী' নামের মহিলা সংগঠন তাকে শাশ্বতী পুরস্কারে সম্মানিত করেন। এর বাইরেও তিনি অসম সাহিত্য সভার 'বাসন্তী দেবী বরদলৈ' পুরস্কার এবং 'হেম বরুয়া' পুরস্কার লাভ করেন।

প.রি.চি.তি

নগেন শইকীয়া

রামধেনু যুগের শেষের দিকে আত্মপ্রকাশ করা গল্পকার, ঔপন্যাসিক, কবি এবং প্রবন্ধকার নগেন শইকীয়া ১৯৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসমীয়া সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির অধিকারী শ্রী শইকীয়া দীর্ঘকাল ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া বিভাগের সঙ্গে অধ্যাপনা সূত্রে যুক্ত ছিলেন। রাজ্যসভায় প্রাক্তন সদস্য শ্রী শইকীয়া 'এ ক্রিটিক্যাল স্টাডি অফ দি সোস্যাল এণ্ড ইনটেলেকচুয়াল ব্যাকগ্রাউণ্ড অফ অ্যাসামিজ লিটারেচার ১৮২৬-১৯০৩' বিষয়ে গবেষণা করে পি.এইচ.ডি উপাধি লাভ করেন। 'ছবি আরু ফ্রেম', 'বন্ধ কোঠাত ধুমুহা', 'মাটির চাকির জুই', 'অস্তিত্বর শিকলি', 'আপার্থিব-পার্থিব' লেখকের অন্যতম গল্প সংকলন। ১৯৯৭-এ 'আন্ধারত নিজর মুখ' গল্প সংকলনের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন।

প্রশান্ত কুমার দাস

১৯৭১ সালে শিলঙে জন্মগ্রহণ করেন। বরপেটার মাধব চৌধুরী মহাবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক হন। সাংবাদিকতাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে লেখক বর্তমানে 'সাদিন' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। অসমের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখকের গল্প প্রকাশিত হয়েছে। কুড়ি বছর বয়সে 'পর্যবসান' নামক গল্পের মাধ্যমে প্রান্তিকের পাতায় গল্পকার প্রশান্ত কুমার দাসের প্রথম আবির্ভাব। লেখকের প্রথম গল্প সংকলন 'এটা শদিয়ার গল্প, আনটো পৃথিবীর'।

পূরবী বরমুদৈ

১৯৫০ সালে অসমের তেজপুরে গল্পকার ঔপন্যাসিক পূরবী বরমুদৈ-র জন্ম হয়। ১৯৭৩ সালে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। স্কুল জীবন থেকেই সাহিত্য চর্চার সঙ্গে জড়িত। 'শীতর কুরলী' এবং পূরবী বরমুদৈর গল্প' লেখিকার গল্প সংকলন। 'গজরাজ, প্রেম আরু বন্দীত্ব' লেখিকার অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস।

প্রশান্ত রাজগুরু

আশির দশকে আত্মপ্রকাশ করা আধুনিক অসমীয় গল্প সাহিত্যের একজন প্রতিভাবান গল্পকার প্রশান্ত রাজগুরু। সাংবাদিকতাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে লেখক বর্তমানে 'আমার অসম' পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক। আধুনিক সভ্যতার যান্ত্রিকতা, সমাজ জীবনের সর্বগ্রাসী হতাশা এবং হৃদয়হীনতায় আক্রান্ত পৃথিবীর চরিত্রগুলির ভাবাবেগ চিন্তন আচরণের তীব্র এবং সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'কর্ণেল এন্থনির এপিটাফ' এবং অন্যান্য গল্প শীর্ষক গল্প সংকলনটি শীঘ্রই প্রকাশিতব্য।

ফনীন্দ্র কুমার দেবচৌধুরী

১৯৫৩ সালে অসমের পাঠারকুছিতে গল্পকার, ঔপন্যাসিক ফনীন্দ্রকুমার দেবচৌধুরীর জন্ম হয়। ১৯৭১ সনে পাঠারকুছি বিদ্যাপীঠ থেকে সুখ্যাতির সঙ্গে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে ১৯৭৬ সালে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্যামিকেল ইঞ্জিনিয়ারিঙে প্রথম শ্রেণীর বি-টেক ডিগ্রি লাভ করেন। সম্প্রতি তিনি দুলিয়াজান অয়েল ইণ্ডিয়ার অ্যাসিস্টেন্ট মেটারিয়েল অফিসার।

প্রণব জ্যোতি ডেকা

অসমের একটি বিখ্যাত সাহিত্যিক পরিবারে ১৯৩৯ সালে কলকাতা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সুসাহিত্যিক হলিরাম ডেকা। ডঃ ডেকা কলকাতা, গুয়াহাটি, কাশী এবং সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে শিক্ষালাভ করেন। দীর্ঘকাল গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় রত ছিলেন। লেখকের একাধিক গল্প ইংরেজি এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে পাঠকদের বিপুল সমাদর লাভ করেছে। লেখকের প্রকাশরীতি বলিষ্ঠ এবং বাস্তবধর্মী। বক্রদৃষ্টি এবং বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস লেখকের গল্পের প্রাণকেন্দ্র।

ফুল গোস্বামী

১৯৪৮ সালে নলবাড়ির টিহুতে গল্পকার ফুল গোস্বামীর জন্ম হয়। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে শ্রীমতী গোস্বামী শিক্ষকতাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে বেছে নেন। বর্তমানে গুয়াহাটির সোনারাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীরূপে কর্মরত। 'অজ্ঞাতবাস' তাঁর অন্যতম গল্প সংকলন। ১৯৯৭ সনে 'প্রান্তিক' প্রকাশিত 'সহযাত্রী' নামে গল্পটির জন্যে লেখিকা 'কথা পুরস্কার' লাভ করেন। সহযাত্রী ইতিমধ্যে তেলগু, হিন্দি, বাংলা ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত।

নবনীতা গগৈ

১৯৬৭ সালে শিবসাগর জেলারর জাঁজীতে নবনীতা গগৈর জন্ম হয়। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে শিক্ষকতাকেই জীবনের অন্যতম ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। সম্প্রতি তিনি তৈলক্ষেত্র দুলিয়াজানের অয়েল ইণ্ডিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে কর্মরত। গল্প সংকলন দুটি যথাক্রমে 'ছাঁ পোহরত অকলে' এবং 'মই তোর নীলা চড়াই (মৃদুল বরুয়ার সঙ্গে যুগ্মভাবে গল্প কবিতার সংকলন) উল্লেখযোগ্য।

বিতোপন বরবরা

১৯৬৬ সালে গোলাঘাটের রঙাগড়া চা-বাগানে গল্পকার, সাংবাদিক বিতোপন বরবরার জন্ম হয়। গুয়াহাটির আর্য বিদ্যাপীঠ কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক হয়ে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা অর্জন করেন। সাংবাদিকতাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে তিনি 'নতুন দৈনিক' কাগজে কর্মজীবন শুরু করেন। বর্তমানে *'দৈনিক অসম'-এর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হিসেবে* কর্মরত। সংকলিত গ্রন্থ 'মোর এটা সপোন আছিল'।

ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া

১৯৩২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী অসমের নগাঁও শহরে ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছোট গল্প, উপন্যাস শিশু সাহিত্য, নাটক সর্বোপরি চলচ্চিত্র শিল্পে তাঁর অবদান অসমের ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। লেখকের গল্প সংকলনগুলির মধ্যে 'আতঙ্কের শেষে', 'প্রহরী', 'বৃন্দাবন', 'গহ্বর', 'শৃঙ্খল' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'অন্তরীপ' লেখকের অন্যতম উপন্যাস। ১৩ আগস্ট, ২০০৩ সালে এই লেখকের মৃত্যু হয়।

বন্তি শেনচোওয়া

১৯৬২ সালে জন্ম। শিলঙের উত্তর-পূর্ব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির অধিকারী বন্তি শোনচোওয়া বর্তমানে রাধাগোবিন্দ বরুয়া কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। ২০০০ সনে 'জল ভরি যশোদা' শীর্ষক গল্পের মাধ্যমে সাহিত্য জগতে প্রবেশ। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ দুটি যথাক্রমে 'নিষাদ গান্ধার' এবং 'সরলা আরু সুন্দর'। ইতিমধ্যে বেশ কিছু গল্প পাঠক এবং সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ভূমিধর তালুকদার

পেশায় শিক্ষক। অসমীয়া সাহিত্যের একজন প্রতিষ্ঠিত গল্পকার। ইতিমধ্যে তাঁর বেশ কয়েকটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রভূত পাঠে আদৃত হয়েছে। সমাজ সচেতনতা, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও তার চেতনাপ্রসূত নিরীক্ষা গল্পে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ভূপেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

১৯৫১ সালে নলবাড়ির পশ্চিম চামতায় জন্ম । বর্তমানে আর্যবিদ্যাপীঠ কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলনগুলি হল 'দালাল', 'ঘরাপাক', 'গরম বতাহ' এবং ব্রহ্মপুত্রের বুকে সূর্যাস্ত'। মরুদ্যান আরু নরককুণ্ডত একে ইজনমান অতিথি' নামে একটি উপন্যাসেরও রচয়িতা। একজন চিত্রশিল্পী হিসেবেও শ্রী ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত।

সৌ. কু. চ.

সৌরভ কুমার চলিহা

১৯৬৬ সালে অসমের দরঙ জেলার মঙ্গলদৈ শহরে জন্ম। গুয়াহাটিতে শিক্ষা লাভ। সৌরভ কুমার চলিহা ছদ্মনাম। আধুনিক অসমীয়া ছোটগল্পের নতুন রীতির প্রবর্তক সৌরভ কুমার চলিহা পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে ছাত্রাবস্থায় অধুনালুপ্ত 'রামধেনু' পত্রিকায় 'অশান্ত ইলেকট্রন' নামে একটি গল্প লিখে সাড়া জাগান। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ গুলি হল 'অশান্ত ইলেকট্রন', 'এ হাত ডাবা', 'গোলাম', দুপুরিয়া',, 'স্বনির্বাচিত সংকলন', এবং 'সৌরভ চলিহার স্বনির্বাচিত গল্প'। এ ছাড়াও একটি নাটক, প্রবন্ধ, এবং বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। 'গোলাম' গ্রন্থের জন্য লেখক সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। বহু ভাষায় তাঁর গল্প অনূদিত হয়েছে। একটি বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বর্তমানে অবসর গ্রহণ করেছেন।

মামণি রয়সম গোস্বামী

অসমীয়া সাহিত্যে দ্বিতীয় জ্ঞানপীঠ বিজয়িনী লেখিকা ইন্দিরা গোস্বামী ওরফে মামণি রয়সম গোস্বামী অসমের গুয়াহাটি শহরে ১৯৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগে অধ্যাপনারত এই অধ্যাপিকার রামায়ণী সাহিত্যের গবেষক হিসেবে সারা বিশ্বে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। গল্প এবং উপন্যাস দুটিতেই সমান দক্ষ এই লেখিকা 'মামরে ধরা তরোয়াল (মরচে ধরা তরোয়াল)' উপন্যাসের জন্য ১৯৮৩ সালে সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেন। ২০০০ সনে জ্ঞানপীঠ সম্মানে সম্মানিত লেখিকার অসংখ্য গল্প উপন্যাস ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'দাঁতাল হাতির পয়ে খোয়া হাওদা' লেখিকার একটি অন্যতম উপন্যাস।

মদন শর্মা

১৯৫২ সালে তেজপুরে গল্পকার মদন শর্মার জন্ম হয়। কটন কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষায় ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ পাশ করেন। হায়দরাবাদে কেন্দ্রীয় ইংরেজি এবং বিদেশী ভাষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি উপাধি অর্জন করেন। চাকরি সূত্রে তিনি তিনসুকিয়া মহাবিদ্যালয়, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল কাটিয়ে সম্প্রতি তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত। তাঁর গল্পসংকলন দুটি যথাক্রমে 'জীবনের মুখামুখি এদিন' আর 'তোমার মাত'। কবিতা সংকলন 'অতবোর তরাফুল' এবং উপন্যাস 'তেজাল স্বপ্ন'।

াধারণ' পত্রিকার সম্পাদনায় রত। তার বিখ্যাত গল্পসংকলনগুলি হলো 'ঈশ্বরহীনতা', 'সমীরণ বরুয়া আসছে', 'স্বাধীনতা', প্রেমহীনতা', 'আমি রাজেন বরুয়াকে সমর্থন করি' ইত্যাদি। 'ভল্মা একটি নদীর নাম' নামে একটি ভ্রমণ কাহিনী এবং 'অনাদি এবং অন্যান্য' নামে একটি উপন্যাসেরও রচয়িতা তিনি। ১৯৯৫ সালে শ্রীগোস্বামী 'কথা' পুরস্কার এবং ১৯৯৬ -এ 'সংস্কৃতি বঁটা' লাভ করেন।

মনোজকুমার গোস্বামী

১৯৬২ সালে অসমের নগাঁও শহরে গল্পকার, লেখক, সাংবাদিক মনোজ গোস্বামীর জন্ম হয়। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের স্নাতক শ্রীগোস্বামী আসামের প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র 'নতুন দৈনিক', 'আজির বাতরি', 'আমার অসম' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে 'দৈনিক জনসাধারণ' পত্রিকার সম্পাদনায় রত। তাঁর বিখ্যাত গল্পসংকলনগুলি হল, 'ঈশ্বরহীনতা', 'সমীরন বরুয়া আসছে', 'স্বাধীনতা', 'প্রেমহীনতা', 'আমি রাজেন বরুয়াকে সমর্থন করি' ইত্যাদি। 'ভল্‌গা একটি নদীর নাম' নামে একটি ভ্রমণকাহিনী এবং 'অনাদি এবং অন্যান্য' নামে একটি উপন্যাসেরও রচয়িতা তিনি। ১৯৯৫ সালে শ্রী গোস্বামী 'কথা' পুরস্কার এবং ১৯৯৬-এ 'সংস্কৃতি বঁটা' লাভ করেন।

মৌসুমী কন্দলী

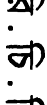
১৯৭৪ সালে কার্বি আংলঙের ডিফুতে জন্ম হয় গল্পকার মৌসুমী কন্দলীর। ১৯৯৮ সনে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্র এবং ২০০১ সালে বরোদার এম.এচ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলা, ইতিহাস ও সমালোচনায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'লামবাদা নাচের শেষে' ১৯৯৮ সনে প্রকাশিত হয়। মৌসুমী ২০০১ সনে মুনীন বরকটকী পুরস্কার এবং ২০০৫ সনে ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার লাভ করেন। ২০০৬ সনে মৌসুমী ভারতীয় চৌদ্দজন লেখক-লেখিকার একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে জার্মানী ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন। বর্তমানে মৌসুমী বরোদার এম.এইচ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত। কলা সমালোচনা এবং অনুবাদ কার্য্যেও ইনি যুক্ত।

সুরেশ চক্রবর্তী

১৯৬১ সালে জন্ম। পেশায় চিকিৎসক শ্রী চক্রবর্তী বর্তমানে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের মানসিক চিকিৎসা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। 'প্রান্তিক' পত্রিকায় ১৯৮৪ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করা শ্রী চক্রবর্তীর একমাত্র গল্প সংকলন 'আরণ্যক' ১৯৯৭-এ প্রকাশিত হয়।

হরেকৃষ্ণ ডেকা

১৯৮৭ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত কবি হরেকৃষ্ণ ডেকা অসমিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সম্মানিত নাম। ১৯৪৩ -এ অসমের তিনসুকিয়া শহরে শ্রীডেকা জন্মগ্রহণ করেন। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যের এম এ। গুয়াহাটি কমার্স কলেজে শিক্ষক হিসেবে তার কর্মজীবনের শুরু। ১৯৬৮ সালে ভারতীয় আরক্ষা (আই. পি. এস) সেবায় যোগদান করেন। ২০০০ -এর নভেম্বরে আরক্ষা সঞ্চালক প্রধান হন। বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ভারতীয় আরক্ষী পদক এবং রাষ্ট্রপতির পদক লাভ করেন। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'রাতের শোভাযাত্রা', 'অন্য একজন,' 'প্রাকৃতিক এবং অন্যান্য,' 'বন্দিয়ার' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।



য়েছে দরজে ঠংছি

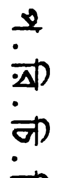
১৯৫২ সালে নেফার কামেং সীমান্তে বর্তমান অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলার জগং নামে এক গ্রামে দরজে ঠংছি জন্মগ্রহণ করেন। কটন কলেজ থেকে অসমিয়া ভাষায অর্নাসসহ স্নাতক হয়ে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসমিয়ায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৭ সালে অরুণাচল প্রদেশ প্রশাসনিক সেবায় যোগদান করে ১৯৯২ সালে ভারতীয় প্রশাসনিক সেবায় পদোন্নতি লাভ করেন। তাঁর অনেক গল্পই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'কামেং সীমান্তের সাধু', 'মৌন ওঠ মুখর হৃদয়', 'লিংঝিক' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গল্প উপন্যাস ছাড়া তিনি নাটক ও কবিতা রচনায়ও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিযেছেন।

শৈলেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

অসমের প্রতিষ্ঠিত গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম শৈলেন্দ্রকুমার ভটাচার্য। তার এযাবৎ প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলি পাঠকমহলে ব্যাপক সমাদর লাভ করেছে। মানবিক মূল্যবোধের প্রতি সচেতনতা, সামাজিক অবক্ষয় ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সতর্ত সোচ্চার তাঁর লেখনী।

হোমেন বরগোহাঞি

১৯৩১ সালে লখিমপুর জেলার কুয়াখানায় হোমেন বরগোহাঞির জন্ম। ১৯৫৪ সালে 'কটন' কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক। সাময়িকভাবে সরকারি চাকরি করে সাহিত্যচর্চা এবং পরবর্তীকালে সাংবাদিকতাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। 'নীলাচল', 'জনক্রান্তি', 'নাগরিক' ইত্যাদি সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদনা করেন। বর্তমানে 'আমার অসম' নামে দৈনিক 'নাগরিক' ইত্যাদি সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদনা করেন। বর্তমানে 'আমার অসম' নামে দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক। 'পিতাপুত্র' উপন্যাসের জন্য ১৯৭৭ সালে সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। বিভিন্ন নরক, সুবালা, মৎস্যগন্ধা, সাউদর পুতেকে নাও মেলি যায়, আত্মানুসন্ধান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।



প.রি.চি.তি

মহিম বরা

১৯২৬ সালে অসমের দরঙ জেলার ঘোপসাধারু চাবাগানে লেখকের জন্ম হয়। কলিয়াবর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন শেষ করে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ করেন। অধ্যাপনার সূত্রে তিনি দীর্ঘকাল নঁগাও কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'কাঠানিবারী ঘাট', 'রচনা সমগ্র', 'সৃষ্টি আরু প্রেরণা' লেখকের অন্যতম গ্রন্থ। ছোট গল্প ছাড়াও কবিতা ও গদ্যেও লেখকের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। হাস্যরসের অবতারণা এবং পটভূমির স্পষ্টীকরণ লেখকের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মনোরমা দাস মেধি

১৯৫০ সালে ভূটান পাহাড়ের নিকটবর্তী বেংবাড়ি নামে ছোট্ট একটি গ্রামে গল্পকার মনোরমা দাস মেধির জন্ম হয়। ১৯৭৩ সালে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসমীয়া সাহিত্যে এম.এ পাশ করার পর অধ্যাপনাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। বর্তমানে টংলা কলেজের অসমীয়া বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা রূপে কর্মরত। স্কুল জীবন থেকেই সাহিত্য চর্চার সঙ্গে যুক্ত। অসমের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখিকার গল্প প্রকাশিত হয়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 'কাঠগড়ায় ঈশ্বর' এবং 'সপোনর সোপারু' লেখিকার অন্যতম গল্প সংকলন।

মণিকুন্তলা ভট্টাচার্য

ছোটগল্প এবং উপন্যাস লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও মূলত কবি। প্রথম গ্রন্থ 'প্রস্থর কন্যা' (গল্প গ্রন্থ) ২০০৪ সালে মুনীন বরকটকী পুরস্কার লাভ করে। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সন্ধ্যা' এইডস্ ভিত্তিক উপন্যাস। 'অসমীয়া প্রতিদিন' পত্রিকার রবিবারে পরিপূরক 'সম্ভারে' ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত উপন্যাস 'অরুন্ধতী' ইতিমধ্যে পাঠক সমাজের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ২০০৫ সালে লেখিকার 'মা মেকলে চাহাব আরু বাইশালর পিতা' (উপন্যাস) এবং 'মণিকুন্তলার কবিতা' নামে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন শর্মা

১৯৬০ সনে গুয়াহাটিতে গল্পকার রবীন শর্মা জন্মগ্রহণ করেন। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসমীয়াতে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করে লোক-সংস্কৃতি গবেষণা বিভাগে গবেষণা করে ১৯৯১ সনে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। 'পাঞ্চার পাঁচালি', 'চং' এবং 'কথা ভগীরথ' লেখকের তিনটি গল্প সংকলন। ১৯৯৫ সালে 'পাঞ্চার পাঁচালি' গল্প সংকলনের জন্য মুনীন বরকটকী পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর গল্প ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি, মারাঠী ভাষায় অনুদিত হয়ে সমাদর লাভ করেছে। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রীয় আলোচনাচক্রে তাঁর গবেষণা নিবন্ধ পঠিত এবং প্রকাশিত হয়।

রাজেন্দ্র শর্মা

১৯৫২ সনে জন্ম। বর্তমানে অসমের উদ্যোগ এবং বাণিজ্য বিভাগের যুক্ত সঞ্চালকরূপে কর্মরত শ্রী শর্মা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙে স্নাতক। ১৯৯৪ সালে বিশ্ববরেণ্য গল্পকার চেকভের গল্পের অনুবাদের মাধ্যমে সাহিত্যজগতে প্রবেশ। ২০০৩ সনে লেখকের মৌলিক গল্প সংকলন 'দেশকাল' প্রকাশিত হয়। অনূদিত গল্প সংকলনগুলি হল 'চেকভের গল্প' , 'ও হেনরীর গল্প', এবং 'মমের গল্প'। ২০০৫ সনে 'প্রাতঃভ্রমণ' নামক গল্পের জন্য কথা পুরস্কারে সম্মানিত হন।

রত্না ভরালী তালুকদার

১৯৭১ সালে অসমের মাজুলী দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম গল্প সংকলন 'দুই আর দুইয়ে তিনি' ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়। সাংবাদিকতার জন্য দু'বার পুরস্কৃত হন। ২০০৫ সালে মহিলা মিডিয়া পারসন হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য চামেলি দেবী জৈন পুরস্কারে সম্মানিত হন। সম্মাননাটি দিল্লির মিডিয়া ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত। অসমীয়া এবং ইংরেজি পত্র পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে লিখে থাকেন। সাংবাদিকতা সূত্রে অর্জিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি উঠে এসেছে। তাঁর গল্প ইংরেজি, বাংলা এবং খাসি ভাষায় অনূদিত হয়ে সমাদর লাভ করেছে।

শীলভদ্র

১৯২৪ সালে ধুবড়ি জেলার গৌরীপুরে গল্পকার ও ঔপন্যাসিক শীলভদ্র ওরফে রেবতী মোহন দত্ত চৌধুরীর জন্ম হয়। গৌরীপুরে স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে কটন কলেজ থেকে আই.এস.সি এবং রংপুর থেকে বি.এস.সি পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত নিয়ে এম.এস.সি পাশ করে অসম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং সেখান থেকেই ১৯৮২ সনে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালে অসম প্রকাশন পরিষদের বঁটা এবং ভারতীয় ভাষা পরিষদের পুরস্কার লাভ করেন। 'মধুপুর বহুদূর' গল্প গ্রন্থের জন্য ১৯৯৪ সনে লেখক সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ঔপন্যাসিক হিসেবেও লেখক যথেষ্ট জনপ্রিয়। ইতিমধ্যেই লেখকের সাতটিরও বেশি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। 'বাস্তব', 'সমুদ্রতীর', 'তরুৰা কদম', 'উত্তরণ', বিশ্বাস আৰু অন্যান্য গল্প', 'নির্বাচিত গল্প' তাঁর বিখ্যাত গল্প সংকলনগুলির মধ্যে অন্যতম।

শিবানন্দ কাকতি

১৯৫৬ সালে নগাঁওয়ের শেতেলীতে গল্পকার শিবানন্দ কাকতির জন্ম হয়। প্রথমদিকে একাঙ্ক এবং অন্যতর নাটক রচনা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯৯৩ সালে তাঁর 'দুঃসময়' শীর্ষক নাটকটি সর্বভারতীয় পুরস্কার লাভ করে। ১৯৯৫ সালে লেখক তাঁর 'আমৃত্যু-অমৃত' ছোট গল্প সংকলনের জন্য মুনীন বরকটকী পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমানে ভারতীয় স্টেটব্যাঙ্কে কর্মরত। 'বরদৈচিলা আরু গাগিনী পানী তোর কিমান' লেখকের অন্যতম গল্প সংকলন।

সমকালীন
অসমীয়া
গল্প

দুঃখিনীর প্রতি দয়া

অরুণ গোস্বামী

মেয়েটিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্যা উপস্থিত হয়েছে ... এমন কিছু প্রশ্ন করে যে বাড়ির সবাই মুশকিলে পড়ে। উত্তর দেওয়া ... উত্তরের কথা সবাই এড়িয়ে যায়। অবশ্য মেয়েটির কথাবার্তা বাড়ির লোকের মাথা ঘামার উদ্রেক করে মতো বেশ ... তার এক একটা প্রশ্ন ছেলের মাথাগুলি ঘামিয়ে তুলেছে ... মেয়েটি কিছু বুঝতে না পেরে ঘামতে থাকা লোকগুলির দিকে অবাক হয়ে তাকায় ... কারণ খুঁজে পায় না। লোকগুলি তার কথার কোন উত্তর সেকথা যে শান্তভাবে চিন্তা করতে চেষ্টা করে তার প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নেই ছেলের প্রীতি ... বেশ বিব্রত হয়ে পড়ে ... মেয়েটির বাবা ভগবানকেই দরকারী করে সাধারণত মেয়েরা বাবার আদরের হয় ... সেদিক থেকে দুটো ছেলের পর মেয়ের জন্ম হওয়ায় বাবা ... নার্সিংহোমে আনন্দ প্রকাশ করে সবাইকে মিষ্টি বিলিয়ে দেন ... ছেলের বড় জমিদারের ... নার্সটি তাকে প্রথম মেয়ে জন্ম সংবাদ ... চট করে ... পাঁচশ টাকার একটা ... থেকে ... গলার হার খুলে দিত। এমনকি নার্সিংহোমে উপস্থিত অন্যান্য অ্যাটেনডেন্টরাও মিষ্টির ভাগ পেয়েছিল কত আব খবচ হবে দুহাজাব তিন হাজাব। সেটা কি আব এমন কথা ডিটিও পবাণ পূজাবীব কাছে দুটো ছেলেব পব মেয়েব জন্যেই অপেক্ষা করেছিলেন। মেয়ে যখন হয়েছেই তখন আব চিন্তা নেই জন্মেব সীমানাটাকেই চিবতবে বন্ধ করে দেওয়া হলো। টিউবেক টমি করে। আব সেজন্যেই তাব নাম বাখা হলো সীমানা। কোন কাবণে এবাবও যদি মেয়েব জায়গায় ছেলে হতো তাহলে তাব নাম বাখা হতো সীমান্ত। অর্থাৎ জন্মেব সীমানাব অন্ত হলো। সেই সীমানাব জন্যেই অফিস থেকে বাবা তাড়াতাড়ি চলে আসতে লাগলেন ক্লাবেব দবজা না মাড়িয়েই চলে আসতে লাগলেন। মেয়েব নাকে

গৃহলক্ষ্মীর বলে ঘবে মদ খাওযা ছেড়ে দিলেন আব বাইবে থেকে ড্রিঙ্ক কবে এলেও সেই মুহূর্তে শিশুকে কোলে নিতেন না। দূব থেকেই মেযেব সঙ্গে ইশাবায কথা বলতো, হাসান বা ঘুমে থাকলে হাত মুছে নিয়ে তাব পাখিব মতো কোমল বা মাখন গাল দুটিতে আঙ্গুল স্পর্শ কবে তৃপ্তি অনুভব কবতেন।

এখন সেই সীমানা বাবাব কাছে আসছে বলে টেব পেলেই বাবা সাবধান হযে যান, যেন বিভাগীয মন্ত্রী তাব সঙ্গে দেখা কবতে আসছে সিরিযাস হযে যান। মিথ্যেই সামনে একটা ফাইল খুলে গভীব মনোনিবেশেব ভাব কবেন যাতে সীমানা তাকে উল্টো পাল্টা প্রশ্ন কবে বিব্রত কবতে না পাবে। বাবা মেয়েকে এতটাই ভয কবে। মাত্র ছয বছব পাব হয়ে সাত বছবে পড়া মেযেটিব জন্যে অর্থাৎ নিজেব এতদিনেব আশা পূর্ণ কবা মেযেটিব জন্যে একটা সন্ত্রস্ত হওযাব ভাব। মানুষটি স্ত্রীকেও দোষাবোপ কবেন। সুবিধে হলে সীমানা আশেপাশে না থাকলে বকাবকি কবেন মাঝে মাঝে শাশুড়িও বৌমাকেই দোষ দেন ছোট্ট নাতনিব কাছে অপ্রস্তুত হতে হলে অনেক কাবণেই এই ছোট্ট মেযেটি যেন ঘবটিতে প্রতি মুহূর্তে বিপদেব সৃষ্টি কবে বিপদগুলি কিবকম তাব একটা উদাহবণ দিলে ভাল হবে। না, উদাহবণ দেবাব আগে পবিবেশটা কিবকম তাব একটা আভাস তুলে ধবা সমীচিন হবে কাবণ প্রত্যেকেব ঘবে ঘবেই তো ছোট ছোট ছেলে মেযে বযেছে বাকি মা বাবাবা তো তাদেব ছোট ছোট ছেলে মেযেদেব জন্যে বিপদে পড়েন না তাহলে সীমানা ঘবেব জন্যে আতঙ্ক হবে ওঠাব বহস্যটা কী?

অর্পণা ছিল ডিটিও অফিসেব পববর্তীকালেব হেডক্লার্ক যাদব ঠাকুবেব বড মেযে বলতে গেলে তাকে অপরূপা সুন্দরীই বলা যায় নতুন করে আসা যুবক প্রফেসাব ক্লাসে ঢুকেই কযেকমুহূর্ত অপর্ণাব মুখে—না রূপে চোখ স্থিব কবে বাখাটা নিযমে পবিণত হযেছে যা নিয়ে সহপাঠীদেব মধ্যে ঈর্ষাব সৃষ্টি হযেছে আব সে জন্যেই নয কি নতুন আসা ডিটিও একবাব বড়বাবুব ঘবে বেড়াতে গিযেই অপর্ণাকে দেখে বিযে কবাব কথা ভেবে ফেলেছেন। তখন আব তাব প্রেমিকা আলপনাব কথা মনে পড়ল না সাত বছব ধবে আলপনাব সঙ্গে প্রেম চালিয়ে আসছিলেন। চালিয়ে আসছিলেন না, প্রেমই কবছিলেন হলো। নিজেব অফিসেবই বড়কেবাণী যাদব ঠাকুবেব কাছে লোক মাবফৎ বিযেব প্রস্তাব পাঠালেন। যাদব ঠাকুব অবাক হলেন গুযাহাটি মহানগবেব ছেলে তাতে আবাব ডিটিও, এই গ্রামেব কেবাণীব মেযেকে বিযে কববে? নতুন কবে হওযা জেলাব নতুন ডিটিও অফিসেব হেডক্লার্ক যাদব ঠাকুব আগে ছিলেন উপাযুক্ত অফিসেব উচ্চবর্গেব সহাযক। কুড়ি কিলোমিটাব দূবেব গ্রামেব বাড়ি থেকে যাদব ঠাকুব অফিসে আসা যাওযা কবেন। ছেলে নেই। তিনটিই মেযে। বি এ পাশ কবাব পব তিন বছব অপর্ণা ঘবেই ছিল। বাপ ছেলেব খোঁজখবব কবছিল। নিজে থেকেও অনেক ছেলে এগিযে এসেছিল। ছোট দুই মেযেও কলেজে পড়ছে। ঠাকুব ভেবেছিলেন যে বিটাযাব কবাব আগে মেযেগুলিব ব্যবস্থা পাবলে বাঁচোযা। কেবাণিব আবাব এব চেযে বড কী অভিলাষ থাকতে পাবে। সেক্ষেত্রে ডিটিওব মতো একজন চাকবিজীবী ছেলে তাও আবাব গুযাহাটিব, এ যেন ঘবেব ভেতবেই ছেলে বযেছে। কথাটা অনেকটা এবকম হলো যেন পেটেব ক্ষুধাব জ্বালায যখন আবশোলা খেতেও প্রস্তুত তখন যেন কেউ মুখেব সামনে পাযেসেব বাটি এগিযে দিযে বলছে—খাও। তবুও যাদব ঠাকুবেব মনে কিছুটা দ্বিধা ছিল যা অপর্ণাব মনেও বাবাব মন থেকে সংক্রামিত হযেছিল।

কিন্তু বিয়ে হয়ে গেল। এটা বারো তেরোবছর আগের ঘটনা। ডিটিও এর বিয়ে হওয়ার কথাটা অপর্ণা এবং তার পরিবার ঘটনা বলেই মনে করেন। ডিটিও পরাণ পূজারীও কয়েকটি জেলায় ঘোরাঘুরি করে এখন গুয়াহাটিতেই স্থায়ী ভাবে রয়েছেন। এখন নাকি তাকে গুয়াহাটি থেকে সরানো যাবেনা। তার শিকড় এতদূর চলে গেছে যে তাকে যে সরাতে চাইবে সেই মুখ থুবড়ে পড়বে সে যত বড় অফিসার বা মুখ্যমন্ত্রীই হোক না কেন। তিনটে ছেলেমেয়েও হয়েছে তার মধ্যে বড়টির বয়স বারো বছর হলো তবু যেন অপর্ণা কোথাও থিতু হতে পারলেন না। থিতু হবেনই বা কীভাবে? যদি তিনি পরাণ পূজারীর এক জেলা থেকে আরেক জেলায় নিজের ইচ্ছেমতো বদলি করে নেবার মতো নিজের মনকে এত দিন পরেও ডিটিও অপিসের হেডক্লার্ক পিতার ঘর থেকে বদলি করে স্বামীর ঘরে না নিয়ে আসতে পারেন। না, আজও পারেন নি এই বৈভবের মধ্যেও অপর্ণার নিজেকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হয়। এই জনবহুল গুয়াহাটি শহরটাকেও তার কেমন যেন নির্জন মনে হয়। অর্থাৎ অপর্ণার মতে গুয়াহাটি এক জনাকীর্ণ নির্জন শহর। এই বৈভরের মধ্যেও অপর্ণার নিজেকে কেমন যেন ভিখিরি বলে মনে হতে লাগল। জলের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থেকেও তৃষ্ণার ছটফট করতে থাকা মানুষের মতো মনে হয় নিজেকে। এই বৈভব, এই প্রাচুর্য সমস্ত কিছুই যেন তার কাছে কেমন দূরের জিনিস বলে মনে হতে থাকে। ঠিক এমন একটি সময়েই যে সমস্ত যুবকরা তার প্রেমের প্রত্যাশী ছিল তাদের কথা যে তার মনে পড়ে না তা নয়। তার মনে হয় তেমন কোন একজনের সঙ্গে বিয়ে হলেই হয়তো সে সমস্ত কিছু পেতে পারত। কিন্তু পরানের যুক্তি কাটতে পারে না।

তোমার বাবা বিদুর। তিনি তখনকার দিনে চাকরিতে ঢুকেছিলেন মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে, সার্টিফিকেট দেখিয়ে। আর এখনকার দিনে আমরা আমি কীভাবে চাকরিতে ঢুকেছি? আমি ম্যাট্রিকে স্টার পেয়েছিলাম, হাইয়ার সেকেন্ডারিতে ফাস্ট ডিভিশন, এম এস সিতে ফাস্ট ক্লাস। চাকরির পরীক্ষার মেরিট লিস্টের তের নম্বরে ছিল আমার নাম। অথচ ডি টি ও-র চাকরিটা পেয়েছি আঠারো লাখ টাকার বিনিময়ে। মনে রাখবে আঠারো লাখ টাকা। তাহলে আমি কেন ঘুষ খাব না? আঠারো লাখ টাকা তো বের করে আনতে হবে। আঠার লাখ যখন খাবই তখন আর চল্লিশ লাখ খেতে অসুবিধে কোথায়? আমাকে নিয়ম করে কিস্তিতে এখনও টাকা দিয়ে যেতে হয়। আমি জানি আমার শ্বশুর এসমস্ত কারণেই আমার বাড়িতে আসেন না।

অপর্ণা কোন জবাব দিতে পারে না। এই জন্যেই সে একাকী। ছেলে দুটিও বাপের মতোই হয়েছে। ডনবস্কোতে পড়ছে। অসমিয়া মাধ্যমে পড়ানোর জন্যে অপর্ণা জোর করেছিল। হলো না। এখন ওরা অসমিয়া পড়তেই জানে না। বাবার সঙ্গে ইংরেজিতেই কথা বলে। কিন্তু সীমানার যখন জন্ম হলো অপর্ণা প্রতিজ্ঞা করল এই মেয়েকে যন্ত্রে পরিণত না করে মানুষ করে তুলতে হবে। মাঝে মাঝে ভয় হয় মেয়েকে যদি গুয়াহাটি মহানগরে বাস করেও তার মায়ের মতো নির্জনতার শিকার হতে হয় - মায়ের মতোই যদি হয়ে ওঠে তার জীবন। একটাই সান্ত্বনা সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। মায়ের মতো স্বামীর উপর নির্ভরশীল হবে না। সেরকমই আশা করে অপর্ণা সীমানার জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সে চেষ্টাই করে এসেছে। সেই ছোট বেলাতেই নতুন স্কুলে যাওয়া আসা শুরু করতেই তাকে অসমিয়া অক্ষর শিখিয়েছে। মগজটা পরিষ্কার - শিখে গেছে। এমন হলো যে চার বছরে নার্সারিতে নাম ভর্তি করাতে নিয়ে যেতে চাইলে সে নিজের আপত্তি জানাতেও সমর্থ হলো। বলা বাহুল্য যে চার বছর হওয়ার আগেই সীমানা নিজে নিজে কমিকস পড়তে শিখল, শিশুদের

পত্রিকা পড়তে শিখল, খবরের কাগজ পড়তে শিখল। বাবাকে অনুকরণ করে ঠাকুরমাকে দেখে চেয়ারে বসে পায়ের ওপর পা তুলে খবরের কাগজ পড়ে। দৃশ্যটা সবার কাছেই খুব মজার এবং উপভোগ্য বলে মনে হলো। পরে এর থেকেই একটা ঘটনা ঘটে গেল। খবরের কাগজটা পড়ে ছয় বছরের সীমানার হাতে কাগজটা নিয়ে দৌড় মারবে মায়ের কাছে। মাকে যদি না পায়—বাথরুমে থাকে তাহলে দৌড় লাগাবে দাদাদের কাছে। তারা নাকচ করে দেয় কারণ তারা দুজনেই অসমিয়া পড়তে জানে না। আস্তে করে দৌড় লাগায় বাবার কাছে। বাবা তখন হয়তো মোসাহেবদের সঙ্গে কথা বলছে, কাগজ কলমে কোন যোগবিয়োগ কষছে।

—বাবা (দাদারা পাপা বলে ডাকে)। ধর্ষণ মানে কী? সীমানার কথায় বাবা হয়তো প্রথমে মনোযোগ দেয় নি। কিন্তু দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করায় বাবার সামনে বসে থাকা মোসাহেব দুটি জোরে জোরে হেসে ওঠায় বাবা মেয়ের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, —'কী বেবি, কী বলছ?।

—স্যার মেয়ে কীসের অর্থ জিজ্ঞেস করছে শুনুন'—বলেই স্যুট টাই পরিহিত লোকটি হাসতে লাগল।

—ধর্ষণ মানে কী গো বাবা? পুনরায় হাসি। সামনে বসে থাকা কয়েকজন আসলে ভেবেছিল মেয়ের কথায় হাসলে স্যার হয়তো খুশিই হবে। কিন্তু স্যারের রাগ উঠল। সীমানা বাবাব রাগের কারণটা বুঝতে পারছে না। সে হাতে ধরে রাখা খবরের কাগজটার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম খবরটিব দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিযে বলে উঠল, — 'ধর্ষণ মানে কী এই দেখ।' পরাণ পূজারীর মাথা থেকে পায়ের দিকে যেন রক্তস্রোত উল্টোধারায় বইতে শুরু করল। দেখ, 'গণধর্ষণে কিশোবীর মৃত্যু'। তিনি কাগজটা টেবিলেব ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বসলেন, 'যাও মাকে জিজ্ঞেস কব গিযে'। মেয়েটি খবরের কাগজটি নিয়ে যাবার পরে এধরনের খবর প্রকাশ করা পত্রিকা গোষ্ঠীকে গালি দিতে ছাড়লেন না, স্ত্রীক্যে প্রকাশ্যেই বকাঝকা করলেন। তাব সামনে বসে থাকা মোসাহেবরা স্যারেব কথার সমর্থন জানিয়ে বলল এই অসমিয়া কাগজগুলিতে কেবল ধর্ষণের খবর, দুর্নীতিব খবর, টাকা আত্মসাৎ করার খবর, হত্যার খবর দিয়েই পাতা ভর্তি করা হয়। কিন্তু কাগজের মালিক-সম্পাদক রিপোর্টাবেও যে টাকার দাবি করে সে কথা শুধু আমারই জানি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই উদাহরণটাই কি বোঝার জন্যে যথেষ্ট নয় যে সীমানা কীভাবে মাঝে মাঝে ঘবের লোকদের মাথা গরম করে দিচ্ছে। সেজন্যেই পবাণ পূজারী প্রায়ই স্ত্রীকে বকাবকি করে মেয়েকে অসমিয়া স্কুলে ভর্তি করে দেবার জন্যে। সীমানাকে নিয়ে অনেক আশায় বুক বেঁধেছে বলে অপর্ণা সমস্তই লাঞ্ছনাই নীরবে সহ্য করে। কোনরকম প্রতিবাদ করে না। সীমানা পড়ায় ভাল। তাব স্মৃতি শক্তি বেশ তীক্ষ্ণ। স্কুলটি অসমিয়া মাধ্যমের হলেও বেশ নাম রয়েছে, অপর্ণাদের সময়ে মাদুর পেতে পড়া স্কুল নয়। প্রধান শিক্ষক কখনও কখনও তাদের বাড়ির গেটের সামনে মারুতি দাঁড় করিয়ে বলে — 'ম্যাডাম, আপনাদের মেয়ে কিন্তু খুবই মেধাবী। দেখবেন ও স্ট্যান্ড করবেই।' কিন্তু অপর্ণার ইচ্ছে ছিল মাসে পনেরশো টাকা দিয়ে এত দামী স্কুলে পড়ানো নয়, গ্রামের কোন এক স্কুলে যেখানে সঙ্গে করে বসার জন্যে ধাড়ি নিয়ে যেতে হয় সেখানে পড়ানো। ধাড়িতে বসবে, শরীরে ধুলো বালি লাগবে। সিদ্ধ ডিম, মাখনলাগানো রুটি, কিসমিস, কাজু বাদাম, টিফিন খাওয়া স্কুল নয় দুপুরে খিচুড়ি খেতে দেওয়া স্কুলে সীমানাকে পড়ানোর ইচ্ছে ছিল অপর্ণার। শৈশব থেকেই সীমানা মানুষের সঙ্গে পরিচিত হোক। মানুষের মানে দেশের প্রকৃত রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠুক। মানুষ কাকে বলে জানুক।

অপর্ণার একটাই পরিতৃপ্তি যে সীমানা এখনও তারই হয়ে রয়েছে। বিতোপন, বিমোহনের মতো বাবাকে অনুসরণ করা তাব দাদা দুজনের মতো নয়। সে মায়ের সীমানা, মায়ের মেয়ে হয়েই বয়েছে। অন্ততঃ আজও। কিন্তু দেশে যে পবিবর্তনের ঢেউ এসেছে তাতে মেয়ে আর কতদিন তার কথামতো চলবে সে কথা ভেবে ভেবে মাঝে মাঝে অর্পণা যে শঙ্কিত হয় না তা নয়। ভয় হয় অপর্ণার। তীব্র স্রোত বেকায়দায় ফেলা গাছকে যেমন উপড়ে নিতে পারে না তেমনই বৈভবের স্রোত পবাণের স্রোত এই এক-কুড়ি আঠাবো বছবের জীবনকে বিন্দুমাত্র তার আদর্শ থেকে টলাতে পারে নি। সেজন্যেই নিজের সন্তান বিতোপন বিমোহন কে কখনও কখনও বা কেমন যেন অপরিচিত বা সপত্নীর সন্তান বলে মনে হয়। গত চৌদ্দ বছরেও নিজের স্বামীকেও যেমন চিনতে পারে নি তেমনই নিজের গর্ভজাত এই ছেলেদুটিও কেমন যেন যতই বড় হচ্ছে ততই দিন দিন অপরিচিত হয়ে উঠছে।

অর্পণাকে ধমকে দিল পরাণ। বলতে গেলে গালিই দিল। অপর্ণা চুপ করে রইল। একটা ক্লাব বিউটি কনটেষ্ট আর ফ্যাশন শোয়ের আয়োজন করেছে। ডি টিও পরাণ পূজারীর কাছ থেকে ক্লাব হাজার টাকা চাঁদা নিয়েছে। প্রধান পৃষ্ঠপোষকের নামের তালিকায় মন্ত্রী কমিশনার স্যারের নামের পবেই ডিটিও স্যাবের নাম ছাপা হয়েছে। কিন্তু ডিটিও স্যার যেতে পারবেন না। হঠাৎ মন্ত্রীর সঙ্গে বাইরে একটা ট্যুর পড়ে গেছে। যেতেই হবে। তাই স্যারের হয়ে ম্যাডামকেই ফাংশনে যেতে হবে। আব তাতে বাজি না হওয়াতেই পরাণ পূজারী স্ত্রীকে গ্রাম্য, কেরাণির মেয়ে ইত্যাদি বলে গালাগালি করছেন। মেয়েটিকেও নিজের মতো করে তুলছেন বলেও পরাণ পূজারী স্ত্রীকে দোষারোপ করলেন। অপর্ণা নিজে এ'ধরণের অনুষ্ঠানে যাওয়া তো দূরের কথা সবচেয়ে বড় কথা হলো মায়ের সঙ্গে সীমানাও যাবে। কিন্তু মাত্র ছয় বছর অতিক্রম করা সীমানাকে এই বিষাক্ত বায়ু সেবন করানোর ইচ্ছে নেই অপর্ণার। অনেক কষ্ট করে নিজে অনেক ত্যাগ স্বীকার করে, সীমানার জন্যে বিশুদ্ধ বায়ুর ব্যবস্থা করে চলেছে অপর্ণা। কিন্তু পরাণ পূজারীর কাছে অপর্ণার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। যেতে তাকে হলোই।

প্রদর্শনী চলছে। প্রেক্ষাগৃহের প্রথম সারিতে বসে রয়েছে অপর্ণা আর সীমানা। সামনের কয়েকজন বোধহয় মন্ত্রী আর কমিশনারের পত্নী। বয়স হয়েছে যদিও তারা এভাবে বুক পেট দেখিয়ে কাপড় পরেছে যে মনে হয তারাই বোধ হয় ফ্যাশন শো -এর প্রতিয়োগিতায যোগদান করতে এসেছে। কথা বলতে হবে বলে অপর্ণা এক দৃষ্টে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে বয়েছে আর বারবার উঠতে যাওয়া সীমানাকে হাত ধরে সামলে রেখেছে।

মাথার রিবনের মতো সিল্কের কাপড় দিয়ে বুকের গোপনীয় অংশের চারভাগের একভাগ ঢেকে প্রতিটি পদক্ষেপে হাঁটু পর্যন্ত উদোম হয়ে যাওয়া ফাটা অর্থাৎ দুপাশে সেলাই না থাকা পায়জামার মতো পড়ে সুন্দর সুন্দর মেয়েরা মোহ -মেদুর ভঙ্গিতে বিড়ালের মতো পদক্ষেপে অথচ প্রতিটি পদক্ষেপেই রিবন জাতীয় আচ্ছাদন ছুঁড়ে ফেলার মতো করে সমস্ত শরীর বিশেষ করে স্তনযুগল কে আন্দোলিত করে দর্শকদের চিৎকার চেঁচামিচি, শিস ধ্বনি এবং প্রচণ্ড করতালির মধ্য দিয়ে মঞ্চে যাওয়া আসা করছে। অপর্ণার চোখ বুজে ফেলতে ইচ্ছে করল। বিশেষ করে প্রতিযোগিনীদের স্তন যুগলের আন্দোলন এবং প্রতিটি পদক্ষেপেই হাঁটুর ওপর পর্যন্ত উদোম হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে দর্শকদের বিচিত্র ধরনের হর্ষোল্লাষ শুনে অপর্ণার নিজেকেই কেমন যেন বিবস্ত্র মনে হতে লাগল। ভাগ্য ভাল যে সমস্ত আলো স্টেজে কেন্দ্রীভূত থাকায় হলটা অন্ধকার রয়েছে। ছয় বছর অতিক্রম করা সীমনার কাছে অপর্ণার ভীষণ লজ্জা লাগছে। সীমানা কোনরকম প্রশ্ন না করে একদৃষ্টে মঞ্চের

দিকে তাকিয়ে থাকায় অপর্ণা সাময়িক ভাবে কিছুটা রেহাই পেলেও বাড়িতে যাওয়ার পর সীমনার সম্ভাব্য প্রশ্নবাণের কথা চিন্তা করে অপর্ণা ভীত হয়ে ওঠল। এ'সমস্ত দেখার জন্যে পরাণরা পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা ক্লাবে দান করে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। হঠাৎ জরুরী কাজে চলে যেতে না হলে পরাণ তো এই সোফাতেই বসে থাকতেন। সে সীমানার দিকে আড়চোখে তাকাল। মঞ্চের আলোতে তার চোখদুটি তিরবির করছিল। সীমনার জ্বলজ্বলে চোখদুটি মঞ্চের ওপরে স্থিব হয়ে রয়েছে। একবার সে চট করে মায়ের পাশ থেকে ওঠে গিয়ে মঞ্চের সামনে এগিয়ে গিয়ে কয়েকটি পাঁচ টাকার মুদ্রা সেই পেখম ধরে ঘুরে বেড়ানো আর প্রতিটি পদক্ষেপেই উদ্বিগ্ন যৌবনকে দর্শকের সামনে তুলে ধরা মেয়েগুলির দিকে ছুঁড়ে দিল। মঞ্চের উপর নিচে শক্তিশালী মাইক্রোফোন লাগানো থাকায় মুদ্রাগুলি মঞ্চে পড়ার শব্দ শোনা গেল এমনকি মুদ্রাগুলি মেজেতে গড়িয়ে যাওয়ার শব্দও প্রত্যেকের কানে গেল। দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে এলো হাতে মাইক্রোফোন থাকা প্রায় একই ধরণের স্বপ্ল পোষাক পরিহিতা ঘোষিকা। সে কৃত্রিম এবং কোমল সুরে বলল ঃ কি সুন্দর আর আদুরে ছোট্ট মেয়েটি, তুমি কি ছুঁড়ে দিলে?

—পয়সা ছুঁড়ে দিয়েছি। নির্ভীক অথচ দৃপ্ত কণ্ঠে সীমানা ঘোষিকা তার মুখের সামনে ধরে রাখা মাইক্রোফোনটাতে বলল। তার সুরেলা শিশু কণ্ঠ হল ঘরের পরিবেশটিকে নিস্তব্ধ করে দিল।

—কেন পয়সা ছুঁড়ে মারলে? তুমি কেন পয়সা দিতে গেলে?

—আমার মা সবসময় আমাকে বলেন দুঃখীনীকে দয়া করতে হয়।' সীমানা বলল।

—তাই নাকি? কিন্তু এখানে তুমি দুঃখীনী কোথায় দেখতে পেলে? কোথায় আছে এখানে দুঃখী মানুষ?'

—ঐ কয়েকজন। ঐ কয়েকজন দুঃখীনী না হলে কী তবে?

—কে বলেছে দুঃখীনী? তুমি কীভাবে জানলে দুঃখীনী বলে? তাবা যে দুঃখী তা তুমি কীভাবে বুঝতে পারলে সুইট বেবী?

—কারণ তারা যে কাপড়পরে নি। দেখছ না তারা ফাটা কাপড় পরে বয়েছে। জামাও পবে নি, প্যান্টও ফাটা দেখছ না। দুঃখী বলেই তো ছেঁড়া কাপড় পরেছে। কাপড় কেনার মতো পয়সা নেই। দুঃখীনী। তারা দুঃখী। তুমিও তাই।

একটি বন্দুকের ভাষায়

অপূর্ব শইকীয়া

ছোটবেলায় আমাকে একজন ক্যুইজ মাস্টার ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় জিজ্ঞেস করেছিল, রাইফেল নামে যে আগ্নেয়াস্ত্রটি আছে, তাকে কেন রাইফেল বলা হয়ে থাকে? কেন বলা হয় কারণটা কখনও ভেবে দেখিনি। প্রশ্নটা ক্যুইজের প্রতিটি দলকেই একজন একজন করে অতিক্রম করে বিফল হওয়ার পর তাদের ছাড়িয়ে সভাগৃহেব অত্যুৎসাহী দর্শকদেব কাছেও তুলে ধরা হয়েছিল। ছোট চুল, মজবুত চেহারার একজন দর্শক প্রশ্নটাব শুদ্ধ উত্তর দিয়েছিল। আগ্নেযাস্ত্রটি থেকে একটা সীসের গুলি নির্গত হওয়ার সময় সেটা ঘূর্ণায়মান গতি লাভ করে। নলটা এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে গুলিটা তার ঘূর্ণায়মান গতিশক্তিতে এক প্রচণ্ড গতিশক্তি আর আঘাতের ক্ষমতা লাভ করে, কারণ একটা সীসের গুলির লক্ষ্যে সবসময় একটা জীবিত প্রাণীই থাকে আর লক্ষ্যটিকে প্রাণে মারাই হয় তার একমাত্র উদ্দেশ্য। বোধহয় আমাদেব জন্য প্রশ্নটাই অনুপযুক্ত ছিল, কারণ সে সময় আমরা একটা সাধারণ সরকারী বিদ্যালয়ের উঁচু ক্লাসের ছাত্র ছিলাম। ভাগচাষীর সন্তান আমি। কাপড় ধোওয়া সাবান মেখে স্নান করে মাথায় চপচপ করে সর্ষের তেল ঘষে তিন কিলোমিটার পথ হেঁটে স্কুলে যেতাম। স্কুল থেকে ফেরার সময় রাস্তার পাশের কূল আর আখ আস্বাদ করতে করতে ফিরতাম। একটা আগ্নেয়াস্ত্র তন্নতন্ন করে চিনতে পারার কোন সুবিধেই আমার ছিল না, প্রয়োজনীয়তাও ছিল না। ক্যুইজমাস্টারটি বোধহয় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন। এক দশক পরে এই রাজ্যে প্রতিটি মানুষ দিনের বেশিরভাগ সময়ই আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে কথা বলবে বা ভাববে বলে তিনি বোধহয় আগে থেকেই কোন ইঙ্গিত পেয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য সেদিন সেই প্রশ্নটির শুদ্ধ উত্তরদাতা লোকটি পুলিশের লোক ছিলেন। অসম পুলিশের সশস্ত্র শাখার তিনি একজন পরিদর্শক ছিলেন।

এখন এখানে এমন এক দুঃসময় বিরাজমান যে তখনকার সেই পরিদর্শকটি প্রতিনিধিত্ব করা সশস্ত্র বাহিনীর হাতেই নয়; সর্বত্রই একটা উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়। কেবল টাকার ভাষা ব্যবহার করা আমার চারপাশের এই মানুষগুলির অদম্য অর্থলিপ্সা, ক্ষমতালিপ্সা আর যৌন লিপ্সা সমাজের এক অসহনীয় বাতাবরণ সৃষ্টি করার সময় আমার হাতে থাকা এই আগ্নেয়াস্ত্রটিকে খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। আমি এই অস্ত্রটিকে একটা প্রচণ্ড শক্তির প্রতীক বলে মনে করি। হত্যা, সংঘর্ষ আর লুটতরাজেব এই পৃথিবীর প্রতি কি এক সাংঘাতিক মোহগ্রস্ততা এই বিশেষ মানুষগুলির। এদের কাছ থেকেই লেখা-জোকাহীন ধন যোগাড় করছে। কিন্তু একটা আগ্নেয়াস্ত্রের উদ্যত মুখ ওদেব দিকে একটুখানি ঘুরলেও এই মানুষগুলিই আমার পায়ে আত্মসমর্পণ করছে তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য— কারণ পৃথিবীর সমস্ত ক্রয়যোগ্য সুখ-সম্ভোগ এদের প্রত্যেককে করে তুলেছে একেকজন চবম ভোগবিলাসী চার্বাক।

এই রিভলভারটা আমার হাতে কীভাবে এল? তাবও এক সুদীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। আমার ধারণা বাঁ-হাতটা খুব জোরে একটা কলম খামচে ধরে থাকলে বা ধরে রাখতে পারলে একজন নিঃস্ব ছাত্রের হাতে আপনা-আপনি একটা রিভলভার আসতে পারে না। বোধহয় অনেকগুলি কারকেব জন্য একটা সময় আমার কলমের আঁকড়ে ধরে থাকাটা শিথিল হযে এসেছিল আর কিছু অসতর্ক মুহূর্তে আমার হাতের মুঠোটা আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য জায়গা কবে দিয়েছিল। অবশ্য এ'কথাটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। এই একটা অস্ত্রই বিরাজ দারিদ্র্যেব জন্য, মোহন নিজে শুদ্ধ বলে মনে কবা মতাদর্শের জন্য, হরেন তার স্বভাবজাত ক্রূরতার জন্য, মনোজ সীমাহীন ঐশ্বর্যে আসা বৈরাগ্যের জন্য, হিতেশ তার প্রেমিক জীবনে ব্যর্থতার জন্য আর বদন অকারণ জীবনের বিরোধিতা কবে হাতে তুলে নিয়েছিল। আমরা সকলেই আমাদের কৃতকর্ম আর কর্তব্যকে একটা সুন্দর নাম দিয়েছিলাম আর সেই সুন্দরতাই একটা উন্মুক্ত শিখার মত একদা নতুন হিতেশ, মনোজকে আকর্ষিত করেছিল। আমরা অনেকেই বিশেষ কিছু বুঝতে পারিনি, কিন্তু আমরা একটা আগ্নেয়াস্ত্রের বিশেষ শক্তির কথা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম।

আমার কাছে এই আগ্নেয়াস্ত্রটা যেমন ছিল আমিও বোধহয় মীনার কাছে তেমন ছিলাম। এক নিশ্চিত নিরাপত্তাবোধ আর ক্ষমতার প্রতীক। খাবার সময়, শোবার সময়, উঠতে বসতে এটা আমার সঙ্গে ছিল বলে আমি একটা বন্দুকের ভাষা আয়ত্ত করেছিলাম আর আমি সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম—আমি নিজেই সম্পূর্ণভাবে শব্দ এবং ধোঁয়ার ভাষায় ভাব বোঝানো একটা মারণাস্ত্রে রূপান্তরিত হতে পারি হয়তো। আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতি এ ধরণের একটা ভয়ের ভাবও আমার মনে জাগিয়েছিল মীনা। তার মতে অত্যধিক ক্ষমতার উপলব্ধি একটা অপরিণত মনকে দুর্নীতিগ্রস্ত করার জন্য বেশি সময় নেয় না আর একটা বন্দুকের মুখ যে সবসময় ঘাতক-মালিকের বিপরীত দিকেই দিক নির্দেশ করে থাকবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

সেই মীনা আমাকে নিয়ে মোটামুটি সন্তুষ্টই ছিল—কারণ তার আমার প্রতি কোন গুরুতর অভিযোগ ছিল না। এভাবে উভয়ে উভয়ের প্রতি অভিযোগ করতে না পারা একটা অবস্থা আমাকে হয়ত সাহায্যই করেছিল। দিন-রাত একাকার করে আমরা দেশের মুক্তির জন্য নানা কাজে ঘুরে বেড়ানোর সময়ই মীনাকে পেয়েছিলাম। প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদরাম কলিতার ঘরে তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। যকৃতের প্রদাহ রোগে আমি মরণাপন্ন হয়ে ওদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। মীনা ছিল মাস্টারের বড় মেয়ে। সে দিনরাত একাকার করে নিরলস সেবার মাধ্যমে আমাকে সুস্থ

করে তুলেছিল। এক মাস পরে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম। আমি তার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ অনুভব করেছিলাম, কিন্তু সে নিজেকে কৃতজ্ঞতার পাত্র ভাবে নি। কিছু দিনের জন্য আমি বন্দুকের ভাষা ভুলে যেতে বসেছিলাম, কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত পুনরায় বস্তুজগতে ফিরে এসেছিলাম। ক্ষণিকের জন্য হলেও যাত্রা আরম্ভ করা জায়গায় পুনরায় কিছু সময়ের জন্য ফিরে আসতে আমার তীব্র ইচ্ছে হয়, আমি নিজে যে একটুকরো সীসেতে পরিণত হয়ে যাইনি এই ঘটনাটা বোধহয় তাই প্রমাণ করে। কিন্তু আমার বাড়ির লোক আমার সম্পর্কে এরকম ভাবে না। অনেকদিন পরে লুকিয়ে চুরিয়ে কখনও বাড়ি গেলে বাড়ির সবাই আমার সঙ্গে একজন অপরিচিত অতিথির মত ব্যবহার করে। বোধহয় তারা আমার মধ্যে তখনকার কপৌ ফুলের মধু চুষে খাওয়া, মার্বেল গুলিতে পকেট ভর্তি হয়ে থাকা, শিউলি ফুলের পাতায় মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথে কাটা সেই হাবাগোবা ছেলেটির খোঁজ করে আর না পেয়ে হতাশ হয়। আমিও তাদের বোঝাতে পারিনা এই নেহেরু বালিতে— কলঙের চিরপ্রবহমান জল সহ সকালের একই কলঙকে যদি বিকেলবেলা খুঁজে না পাই, তাহলে ওরা আমার মধ্যে এখন এক দশক আগের নাক দিয়ে শিকনি পড়া ছেলেটিকে কেন খুঁজে বেড়ায়। হয়তো এটা একটা মনস্তত্ত্বের বিষয়। এভাবেই অতীত সন্ধানের এই সাময়িক প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে ওরা আমার একেবারে কাছটিতে আসতে চায়। আর ওদের এই কাছে আসার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলতে থাকা সময়টুকুর মধ্যে আমার ফিরে আসার সময় হয়। যদি আবার ফিরে আসি।

পুনরায় ফিরে আসি আমার আগ্নেয়াস্ত্রটির কাছে। একজন মায়োপিয়া রোগীর মত ইচ্ছাকৃতভাবেই আমি সঙ্কুচিত করে রাখি আমার দৃষ্টির দূরত্ব। আমি এগিয়ে যাওয়া একমুখী রাস্তাটির কিছুটা দূর পর্যন্ত দেখি, যাতে সামনে যেতে অসুবিধে না হয়। কারণ কেবল বর্তমানটিকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হওয়াটাই আমাদের নিয়ম।

'লারাং কাকে বলে জান? একটা লোহার তীক্ষ্ণ অস্ত্র বাঁ দিকের হৃদয়ের ঠিক নিচে দিয়ে মেরুদণ্ডের মাঝখান দিয়ে ঢুকিয়ে যকৃতটাকে ভেদ করে দিতে হয়। ভেতরে তীব্র রক্তপাত হবে, মিনিটের মধ্যেই মানুষটি ছটফট করতে করতে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু বাইরে সে ধরণের কোন বড় আঘাত থাকবে না।' দলপতি আমাকে বলেছিল। মৃত্যুদানের বিভিন্ন কলাকৌশলের মধ্যে এই কৌশলটাও আমাকে শেখানো হয়েছিল।

মাতৃভূমির শত্রুদের নিঃশেষ করার কলাকৌশল ছিল এসব। অত্যন্ত কম গুলি-বারুদ খরচ করে সর্বাধিক মানুষ মারতে হবে। এই মাতৃভূমিতে শুধু বেঁচে থাকবে একদল উৎপাদনশীল মানুষ। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া মানুষদের পরিবর্তে খেটে খাওয়া মানুষের দেশ হবে এটা। তার জন্য প্রচুর রক্তপাতের প্রয়োজন হবে। প্রয়োজনবোধে নির্বিচারে রক্তপাত।

এইখানটিতেই আমার সঙ্গে মীনার মতানৈক্য ঘটে। ও বিপ্লবের জন্য রক্তপাতের আবশ্যকতাকে স্বীকার করে না। বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করে। তার মতে, অত্যধিক রক্তপাত কোন ধরণের নতুন বস্তু সৃষ্টি করে না।

কিন্তু মীনাও একটা রহস্য। রক্তপাতে বিশ্বাস না করা মীনা কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে না। সে-ও বোধহয় দ্বৈত মানদণ্ড ব্যবহার করছে। হয়তো সে আমাকে অন্তর থেকে ভালোবাসে। নাঃ, কোন সন্দেহ নেই। উদ্দেশ্যহীনভাবে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ছাড়াই আমাকে ভালোবাসার দিনগুলিতে সে আমার এই রবিনহুড চরিত্রটিকে শুধু উপহাস করত আর ক্রমান্বয়ে সেই সম্পর্কটিই ধীরে ধীরে গভীরতা লাভ করে আজকের এই অবস্থায় যখন পৌঁছেছে, তখন সে বোধহয় অনুভব

করছে যে অস্ত্রের সঙ্গে আমার মধুচন্দ্রিমা শেষ করার সময় এসে গেছে। কারণ একই বিছানায় পত্নী, অস্ত্র, বিপ্লব—এই সবকিছুকে জায়গা দেওয়া যায় না।

এই সমস্ত কিছুর জন্য একটা বিছানায় জায়গা বের করতে গিয়েই আমি একটা বড় বিপদে পড়ে গেছি। আমি জানি যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এতটা দৈহিক নৈকট্যে এলে আর পুনরায় ফিরে যাবার কোন নিশ্চয়তা থাকে না। পরিবেশ পরিস্থিতিই আমাদের নৈকট্য ঘনিয়ে তুলেছিল আব আমার মতে সেই নৈকট্যের পরিণামের জন্য কাউকে দায়ী কবা যেতে পারে না। কিন্তু এ সমস্ত যুক্তি দিয়ে আমি দৈবঘটিত একটা দুর্ঘটনাকে ন্যায্যতা দান করতে পারি না। এর জন্য আমার উচ্চস্থানীয় নেতৃত্বকে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হত।

মীনা ঘটনাটিকে ততটুকু পর্যন্ত গড়াতে দিল না। আমার সন্দেহ হয়—একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সারশূন্যতা প্রমাণ করার জন্য সে এতবড় একটা ঘটনা ঘটিয়েছে। কিছুদিন থেকে আমি যে তার গর্ভে একটু একটু করে পুনরায় বেড়ে উঠেছিলাম, সে এই গঠন-প্রক্রিয়াটির অকস্মাৎ সমাপ্তি ঘটিয়ে দিল। অত্যন্ত আদিম উপায়ে তার গর্ভপাত করানো হল। প্রচুর রক্তপাত হল মীনার, কিন্তু এক দলা রক্তের বাইরে আর কোন গঠনমূলক কিছুর সৃষ্টি হল না। সুস্থ হয়ে ওঠার কয়েকদিন পর সে আমার হাতটা খপ করে ধরে বলেছিল, 'আমি জানি তুমি আমাকে ঠকাতে পার না, কাবণ তুমি এখনও একটা আগ্নেয়াস্ত্রে পরিণত হও নি বা ভবিষ্যতেও হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তোমাদেব যুদ্ধটা আমি আমার এই দুর্ঘটনাব সঙ্গে তুলনা করতে চাই। তোমাদের উদ্দেশ্য যদিও ভালো কিন্তু শত্রু নিরূপণের পদ্ধতি আর অত্যধিক রক্তপাতের জন্য তার থেকে নতুন কোন সৃষ্টি হওয়ার আশা এই মুহূর্তে নেই। এটা একটা অপ্রিয় সত্য এবং এই সত্যটা স্বীকার করে নেবার সৎ সাহস তোমাব থাকা উচিত।'

মীনা মুখ টিপে হাসতে শুরু করেছিল। আমি বিব্রত অনুভব করছিলাম। কিছুসময় এভাবেই থাকার পর আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তার মানে তোমার মতে একটা সুস্থ, সবল পূর্ণাঙ্গ শিশুর জন্ম-প্রক্রিয়ায় রক্তপাতের কোন ভূমিকা নেই?

'আছে'—মীনা বলেছিল—'পার্থক্যটা হল সময়েব। অসময়ে হওয়া রক্তপাত কখনও একটা সুস্থ-সবল শিশুর জন্ম দিতে পারে না। একটা সুস্থ শিশুর জন্মের আগে মায়ের যদি রক্তপাত হয়, তাহলে সেই মায়ের একটা অসুখ রয়েছে বলে ধরে নেযা যায়। আর জন্মের কিছুক্ষণ পরে সামান্য রক্তপাত হওয়াটা আমরা সকলেই একটা নিয়ম বলে মনে করি। এই রক্তপাতও একরকমের প্রয়োজনীয় রক্তপাতই।'

শেষে মীনা বলেছিল, 'আমি আশা করি, তুমি কথাগুলি আবার ভেবে দেখবে।'

শেঠানী, এরিনদিরা, চিমকী অথবা মাজনী

অরূপা পটঙ্গীয়া কলিতা

রূপকথাগুলির একটা গন্ধ থাকে। রঙ শিঙা, খং শিঙা, খোয়াবারী—কোঁয়রের রূপকথাটিতে নতুন করে জাগা দামুরির মুখে লেগে থাকা দুধের গন্ধ। কাচনীর রূপকথাটিতে বাতাস ভারী করে তোলে কাঁচা রক্তের গন্ধ। ঘুমন্ত রাজকুমারীর রূপকথা জুড়ে বন্য গোলাপের মন মুগ্ধকর গন্ধ। সিনড্রেলার গল্পে পরী এনে দেওয়া মায়াবী কাপড়ের একটা ফুরফুরে গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। আর পাখিটা রক্তের উষ্ণতায় ফুটিয়ে তোলে ভেসে আসা ফুলের গন্ধ, তেজীমালার সেই লেবু গাছের গন্ধ, চিলনীর মেয়ে রান্না করা একটা চাউল থেকে হওয়া এক হাঁড়ি ভাতে ম-ম গন্ধ। সত্যি সত্যিই প্রতিটি রূপকথার একটা গন্ধ থাকে।

রাজস্থানের বালি থেকে উঠে আসা সেই কাক এবং শেঠানীর রূপকথাটিতে কি অদ্ভুত গন্ধগুলি ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। শবদেহের গলা-পচা গন্ধ, বমির গন্ধ, মদের গন্ধ, চোখের জলের গন্ধ। গন্ধগুলি নাক দিয়ে ঢুকে মাথায় গিয়ে আক্রমণ করে। নাক-কান ঝিমঝিমিয়ে ওঠে।

রূপকথাটা এভাবে শুরু হয়েছিল। থর মরুভূমিতে একবার তিনবছর ধরে খরা চলছিল। কোথাও এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। চারপাশে কেবল অসহায় জীবজন্তুর মৃতদেহের স্তূপ। শুধুমাত্র কাক এবং শকুনদের দিনগুলি বেশ ভালই চলছিল। কাকগুলি মহানন্দে পেটভরে গলা-পচা মাংস খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একদিন একটা কাক তার স্ত্রীকে বলল, আরো কয়েকবছর পর্যন্ত আমাদের খাওয়াদাওয়ার কোন অভাব হবে না। চল আমরা কিছুদিনের জন্য কোথাও বেড়িয়ে আসি। মানস সরোবর নাকি খুব সুন্দর জায়গা। চল সেখানে থেকে বেড়িয়ে আসি গিয়ে।

নম্রতার সঙ্গে স্ত্রী কাকটি জবাব দিল, 'এত সুন্দর দেশটা আমার একেবারে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। তবু আপনি যখন বলছেন তখন তো যেতেই হবে। স্বামী দেবতার কথা না শুনে

আমার নরকে পচে মরার কোনরকম ইচ্ছে নেই।'

তিনদিন পরে কাক-দম্পতি সত্যি সত্যিই মানস সরোবরে গিয়ে উপস্থিত হল। কী সুন্দর দৃশ্য। হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া সরোবরের স্বচ্ছ জল। বাতাসে হেলতে দুলতে থাকা ফুল গাছ, ঝাঁকে ঝাঁকে গান গাইতে থাকা শুভ্র রাজহাঁস। চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে অমূল্য মুক্তার স্তুপ। কাক দুটো কিন্তু কোনরকম আনন্দ পেল না। কোথায় সেই পচা-গলা মৃতদেহে পরিপূর্ণ মাতৃভূমি আর কোথায় এই টুকরো পাথর খেয়ে জীবনধারণ করা রাজহাঁসের দেশ। কাক-দম্পতি দেশে ফেরার জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু রাজহাঁসের দলপতি কোন কিছু না খাইয়ে তাদের কোনমতেই ছাড়বে না। রাজহাঁসের দেওয়া মুক্তোকে ওরা পাথরের টুকরো ভেবে নাক কোঁচকাল। কাক-দম্পতি রাজহাঁসের দেশকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করল। তারা নিজেদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলল, 'আমরা থর মরুভূমির কাক, আমাদের দেশের মত সুন্দর দেশ আর কোথাও নেই।'

রাজহাঁসের দলপতি কিছুটা ইতস্তত করে বলল, 'আমরা ভাবছিলাম আমাদের দেশটাই সবচেয়ে সুন্দর। তোমাদের দেশে আমাকে নিয়ে যাবে নাকি? কাক-দম্পতি রাজী হল। দলপতি রাজহাঁস দম্পতির সঙ্গে সবগুলি হাঁসই যাবার জন্য হৈ-চৈ লাগিয়ে দিল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল যে প্রথমে দলপতি এবং তার পরিবার কাকের দেশটা গিয়ে দেখে আসবে, তারপরে বাকি সবাই যাবে। বিদায়ের সময় সবাই খুব কান্নাকাটি করল। রাজহাঁসের প্রতি ফোঁটা চোখের জল মাটিতে পড়ে এক একটা মুক্তোয় পরিণত হল।

কাকের দেশে ঢুকে রাজহাঁস অবাক হল। কী দেশ, চারদিকেই শবদেহের গন্ধ। কাক রাজহাঁসকে যতখুশি রক্তমাখা গলা-পচা মৃতদেহের মাংস খেতে বলল। রাজহাঁস সমস্ত কিছু দেখেশুনে দেশে ফিরে যাবার জন্য ছটফট করে উঠল, তার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে বলে মনে হতে লাগল। দেশে ফেরার পথে বৃষ্টি এবং তুফান এল। রাজহাঁস দুটি একটা গাছের কোটরে আশ্রয় নিল। সেখানে একটা ইঁদুরের পরিবার ছিল। দয়ালু রাজহাঁস দুটি অনেক কষ্ট করে পাখা মেলে বৃষ্টি আর তুফান থেকে ইঁদুরের পরিবারটিকে বাঁচালো। ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলে রাজহাঁস দুটি উড়তে গিয়ে দেখে তাদের দুজনের পাখাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। ইঁদুরগুলি তাদের পাখা কুটি কুটি করে কেটে দিয়েছে। রাজহাঁস একবার ঠকল কাকের হাতে, আবার ইঁদুরের হাতে।

এখানে এসে এই অদ্ভুত রূপকথাটির মধ্যে মানুষের প্রবেশ ঘটেছে। রূপকথা নতুন মোড় নিয়েছে। মরুভূমির বালির মধ্য থেকে ঝরঝর করে বালি ঝড়ের মত উঠে আসা রূপকথাটিতে মানুষের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে শবদেহের গন্ধের সঙ্গে যুক্ত হল বমি, মদ এবং চোখের জলের গন্ধ।

রূপকথাটির মধ্যে প্রথম পদার্পণ করা মানুষটি ঐ যে। গমের মত গায়ের রঙের যুবক ছেলেটি ঐ যে রাস্তা দিয়ে আপন মনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। লোকটি নতুন করে একটি বড় সুন্দর রূপবতী মেয়েকে বিয়ে করেছে। মেয়েটির আজ বাপের বাড়ি থেকে আসার কথা আছে। যুবকটি কাঁধে একটি পোঁটলা নিয়ে এগিয়ে আসছে। তার হাতের ওটা একটা সোনালি লাঠি।

যুবক এসে আমাদের দুর্ভাগা রাজহাঁসদুটির কাছাকাছি পৌছেছে। রাজহাঁস দুটি যুবককে সাহায্যের জন্য মিনতি করছে। 'আমাদের একটু জল দাও, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।' জল খেয়ে হাঁসদুটি কিছুটা শান্ত হয়েছে। যুবককে নিজেদের দুর্দশার কথা বলেছে। যুবকটি হাঁসদুটির পালকবিহীন শরীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে সঙ্গে থাকা একমুঠো গম খেতে দিয়েছে। 'আমরা তো শস্য খেতে পারি না, মুক্তো বা রুবি খাই।' ব্যবসায়ী যুবক চালাকির সঙ্গে উত্তর দিয়েছে, 'আমার সঙ্গে থাকা মুক্তো বা

রুবি তোমাদের খাওয়াব কিন্তু হিসেবের খাতায় লিখে রাখব। মানস সরোবরে গেলে হিসেব মিটিয়ে দেবে।'

'যত লাগে তত দেব। কিন্তু আমরা ফিরে যাব কি করে? যুবকটি নিজের কাঁধে তুলে হাঁসদুটিকে বাড়িতে নিয়ে এল। যুবকটি হাঁসের জন্য মুক্তো খরচ করায় বেশ গালি খেল। ব্যবসায়ী যুবক বাবাকে বলল, 'এটা আমি মূলধন বিনিয়োগ করছি মাত্র। দ্বিগুণ হয়ে সব ফিরে আসবে।'

রূপকথাটিতে এবার একটি নারীর প্রবেশ ঘটেছে। মরুভূমির বালির মধ্যে বালিছন্দার মত ছটফট করতে থাকা এই রূপসী নারীটি ব্যবসায়ী যুবকের স্ত্রী। নম্র, শান্ত এই মেয়েটির গায়ের রঙ দুধে-আলতার মত। ঐ যে সুন্দরী, উদার হৃদয়ের মেয়েটি বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে হাঁসদুটোকে আদর করছে। মেয়েটি নিজের হাতে হাঁসদুটিকে স্নান করিয়ে দিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে রাখে। ধীরে ধীরে হাঁসদুটির পালক গজাল। একদিন ওরা দেশে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। যাবার আগে রূপসী মেয়েটি যত কাঁদে, হাঁস দুটিও ততটুকু কাঁদে। চোখের জলগুলি মিলেমিশে একেকটা মুক্তোর রূপ লাভ করল। উড়ে যাওয়া হাঁস দুটির পালক থেকেও শেঠের উঠোনে ঝনঝন করে মুক্তো ঝরে পড়ল। তিন দিন তিন রাত হাঁসদুটি শেঠের ঘরের বারান্দায় কাঁদল।

তারপর রূপকথাটি ক্রমশ মদ এবং বমির গন্ধের দিকে, দয়া-মায়া ক্ষমাহীন এক রুক্ষ মরুভূমির মত হৃদয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। একদিন শেঠ ছেলেকে বলল, 'তুই একবার হাঁসের দেশ থেকে ঘুরে আসছিস না কেন, কতদিন আর বসে বসে জমানো টাকা খাবি?' ছেলে রাগে গরগর করতে করতে বলল, 'আমার স্ত্রীর গর্ভে ছেলেমেয়ে না আসা পর্যন্ত আমি কোথাও যাচ্ছি না।'

'তোর স্ত্রীর গর্ভে এখন কোন ছেলেমেয়ে হবে না, আমি জ্যোতিষীকে দিয়ে গণনা করে এনেছি।'

শেঠের ছেলে মানস সরোবরে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হল। রাজহাঁস দম্পতির কী আনন্দ। পদ্মফুলের ডাঁটার সঙ্গে রুবি এবং মুক্তোর অপূর্ব স্বাদের তরকারি যুবককে রাজহাঁসের পরিবার রেঁধে খাওয়াল।

এরপরের ঘটনাটি আসলে পাষাণ হৃদয় সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ। হাঁস দুটি একটা রুক্ষ হৃদয় সৃষ্টির প্রথম শব্দগুলি এভাবে উচ্চারণ করেছিল : 'খবরাখবর বলুন তো?' স্ত্রী হাঁসটি বলল। 'দলপতি রাজহাঁস দুটিকে সাহায্য করা মানুষটা আজ মানস সরোবরে এসেছে। 'শেঠের ছেলে এবং দলপতি রাজহাঁস দুটি এই হাঁস কয়টির কথাবার্তা মন দিয়ে শুনল।' এই যুবকটি সাহায্য না করলে আমাদের দলপতি কুকুরের মত পথেঘাটে মারা যেতেন।' যুবকটির ঘরে টাকাপয়সা ধন দৌলতের কোন অভাব নেই কিন্তু ওদের কোন ছেলেমেয়ে নেই।'

'একটা গোপন কথা বলছি। আজকের রাতটা হচ্ছে মহেন্দ্রক্ষণ। যদি যুবকটি আজ রাতে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে তাদের একটি দৈবগুণ সম্পন্ন ছেলে হবে। সন্তানটি শিশু অবস্থায় কাশলে মুখ থেকে একটা একটা করে মুক্তো ঝরে পড়বে আর বড় হলে কাশির সঙ্গে একটা করে অমূল্য রুবি পড়বে। এরকম একটা রুবির যে কত দাম!'

হাঁসদুটির কথা শুনে দলপতি রাজহাঁস দম্পতি যুবককে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরের দরজার চৌকাঠে দাঁড় করিয়ে দিল। যুবককে রূপসী স্ত্রীর রূপসুধায় মধ্যে হারিয়ে যেতে দেখল হাঁস দম্পতি। তারপর রাত শেষ না হতেই হাঁসদুটি পুনরায় যুবককে মানস সরোবরে ফিরিয়ে নিয়ে এল। গিয়েই ফিরে এলে শেঠ এত সহজে ছেলেকে ছেড়ে দেবে না। ইতিমধ্যেও যুবকটির স্ত্রী গর্ভবতী হল।

এটাই হল শুরু। শান্ত, আদরের মেয়েটির হৃদয় দুই ভাগ হল। হীরা-মুক্তো, হাঁসের কোমল রূপকথাটি ঘৃণা জাগাতে শুরু করল, ভয়াবহ হল। শেঠের গ্রামে হুলুস্থুল লেগে গেল। শেঠের পুত্রবধূ স্বামীর অনুপস্থিতিতে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। গ্রামের লোক শেঠের বাড়িতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এ পাপ সহ্য করা হবে না, শেঠের ন্যায় বিচার কত পরিবার ধ্বংস করেছে, নিজের ক্ষেত্রে এবার কী করবে, ছেলের বৌ-কে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

শেঠ বধূকে ব্যাপারটার সত্য-মিথ্যা জিজ্ঞেস করল। সে হাঁস থেকে শুরু করে কাশলেই রুবি পড়া শিশুটির সমস্ত কথাই বিস্তারিতভাবে জানাল। শেঠ কিন্তু পুত্রবধূর একটা কথাও বিশ্বাস করল না, এ ধরণের গাঁজাখুরি গল্প কে বিশ্বাস করবে।

রূপকথা মানেই তো হল আলো-ছায়া, অলীক মায়াবী। বাস্তব এবং কল্পনার সীমারেখাটা বারবার অতিক্রম করে যায়। শেঠের পুত্রবধূর রূপকথাটিও আলো-ছায়া, বাস্তব এবং কল্পনার মাঝখানের সীমারেখাটা এখানেও মাঝে মাঝে অস্বীকার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই আলো-ছায়ার জগতটিতেই মানুষ বুক চাপড়ে কাঁদে। হাঁস আর মুক্তোর অলৌকিক জগতটিতেও একজন নারী মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে কাঁদছে।

সেই অসামান্য রূপসী, গর্ভবতী নারী বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদছে। তাকে শ্বশুর চুলে ধরে হেঁচড়ে টেনে ঘর থেকে বাইরে বের করে দিয়েছে। সে জিজ্ঞেস করছে, 'আমি কোথায় যাব?'

'সে কথা তুই তোর পেটে যে বাচ্চার জন্ম দিয়েছে তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর।'

তাকে একজন কুমোরনী আশ্রয় দিল। সেখানেই তার মুখ থেকে মুক্তো ঝরা শিশুটির জন্ম হল। কুমোরনী সেই মুক্তো বেচতে যায় স্বর্ণকারের কাছে। স্বর্ণকার মুখ থেকে মুক্তো পড়া ছেলেটিকে চুরি করার পর রাজার কাছে আশ্রয়ের খোঁজে যায়। 'আমার ছয়টি ছেলে ডাইনীর পেটে গিয়েছে, এটাকে রক্ষা করুন'--বলে রাজার পায়ে পড়ে। প্রতিদিন রাজাকে একটা করে মুক্তো উপহার দেয়।

এদিকে শেঠের পুত্রবধূ কেঁদে শেষ করতে পারছে না। পাগলের মত মানুষের ঘরে ঘরে হারানো ছেলেকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। অন্যদিকে শেঠের ছেলে তিন মাস পর ফিরে এসে দেখে শূন্য ঘর। বাপের সঙ্গে ঝগড়া লাগে, নিজের আলাদা ঘর বানায়। নতুন ঘরনীর সঙ্গে সংসার পাতে।

শেঠের ছেলে নতুন ঘরনীর সঙ্গে মজে উঠেছে। নারী আর জল তো একই। এই কুয়োর জল কালো, ঐ কুয়োর জল মিষ্টি। এই পুকুরটির জল শক্ত, ওটার জল পাতলা। জল তো জলই। তৃষ্ণা মেটায়। মেয়েমানুষও একই। একেকজনের চেহারা আলাদা, স্বভাব আলাদা, কিন্তু বিছানার সুখটা একই। শেঠের ছেলের এই বিশ্বাস।

শেঠের ছেলে জল বদলেছে শুধু, তৃষ্ণা কিন্তু আগের মতই নিবারণ হতে লাগল। দরজায় দরজায় ঘুরে পাগলের মত প্রথম স্ত্রী এসে শেঠের ছেলের নতুন ঘরের দরজায় উপস্থিত হল। নতুন ঘর, নতুন জলে পরিতৃপ্ত মানুষটি তাকে দেখে জ্বলে উঠল।

'তুই কোথা থেকে এলি? আমার উঠোনে পা রাখবি না।'

'আপনি সমস্ত জেনেও এই কথা বলছেন?'

'সাতঘাটের জল খাওয়া নারীতে আর দরকার নেই। দশ জায়গায় দশ জনে ঝুটা করা জলে আমি মুখ দিইনা। তুই শ্বশুরের ঘর ছাড়ার আগে মাথা খুঁড়ে স্বামীর ঘরেই মরলি না কেন?'

সে এবার বাপের বাড়ি ফিরে গেল। বাবা স্বামীত্যাগী কন্যাকে জুতোর বাড়ি মেরে তাড়িয়ে দিল। ঘুরতে ঘুরতে সে এসে রাজার কাছে উপস্থিত হল। স্বর্ণকার এই সুযোগের জন্যই অপেক্ষা

করছিল। রাজাকে সে বলল, এটিই সেই ডাইনী যে তার সন্তানকে মেরে ফেলেছে। রাজা ইতিমধ্যে একটি করে মুক্তো পেয়ে সন্তুষ্ট। মানুষটিকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। প্রধানমন্ত্রী উপদেশ দিলেন হত্যা করার চেয়ে তাকে লাখুর কাছে বেচে দেওয়া যেতে পারে। কথাটা রাজার ভাল লাগল। লাখু এসে মেয়েটিকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গেল।

মেয়েদের চোখের জল সহ্য করতে না পাবা লাখু নামের নারীদেহের ব্যবসায়ী মেয়েটিকে এক নতুন ধর্মে দীক্ষিত করল। লাখু তাকে আরও একবার মায়ের ঘরে ফিরে যাবার সুযোগ দিয়েছিল। মা-বাবা-ঠাকুরমার তাড়া খেয়ে তার মন পাথব হয়ে গেল। এ অবস্থায় প্রথম রাতে সে প্রধানমন্ত্রীকে দেহদান করল। তারপরের দিন রাজাকে। রাজা মদ খেয়ে তার দেহের উপর বমি করে ভাসিয়ে দিল। তখনও সে একটা বাক্যও উচ্চারণ করতে পারছিল না, পারছিল না মুখটা ধুয়ে ফেলতে রাজার বমি ধুয়ে ফেললে যে ভয়ংকর অপরাধ হবে প্রধানমন্ত্রী তাকে দেড় লাখটাকার আংটি দিয়েছিল, রাজা দিলেন নয় লাখ টাকার হার। প্রথমদিন বমিতে মাখামাখি হয়ে লাখুর কাছে এসে কাঁদলে সে বলেছিল, 'বিবাহিতা মেয়েদেব শরীরে এ ধরণের বমি সবসময়ই পড়ে। ওরা বিনিময়ে জুতোর বাড়ি খায়। তুমি হার পেয়েছ।' সুন্দরী মহিলাটি সাত বছর শরীর বেচল। এই বেশ্যার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দিনে দিনে মানুষটির উপার্জন বেড়ে চলল আর বুকটা ক্রমশ শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে উঠল।

এদিকে স্বর্ণকারের ঘরে কাশলে এক একটা রুবির পাথর পড়া ছেলেটি বড় হতে হতে একদিন যুবকে পরিণত হল। সে-ও একসময় অসামান্য রূপবতী দেহোপজীবীনি মহিলাটির কথা শুনতে পেল। একদিন তাকে উপভোগ করার জন্য সে লাখুর দরবারে এসে উপস্থিত হল।

এখানটাতে রূপকথাটি বাতাসে উড়তে থাকা শুকনো বালির মত হয়ে পড়েছে। হাঁস, মুক্তো এবং একজন কোমল মনের সুন্দব মানুষ এই রূপকথাটি এব পবে আর শুধু বমি আর চোখেব জলে ভেজা হয়ে থাকেনি। রূপকথাটি থেকে রক্ত আর পুঁজের গন্ধ বেরিয়েছে। লাখু কাশলেই একটা করে রুবি পড়া ছেলেটিকে দুই একটা কথা জিজ্ঞেস করেই বুঝতে পারল সে আসলে কে। দেহের ব্যবসা করে চুল পাকা করা লাখু এসে মেয়েটিকে বলেই ফেলল, 'আমাদের সম্মান আজ তোমার হাতে। পুত্র শব্দটি ভুলে যাও। কেবল মনে রাখ এই পুরুষটি কাশলে একটা করে রুবি পড়ে।'

মেয়েটি লাখুর বলিরেখাপড়া মুখের দিকে তাকাল আর বলে উঠল, 'তাকে ডেকে আন। আমার আর কোন সম্বন্ধেই আস্থা নেই, আমি একটা কথাই জানি এই রাতে আমার ভাল উপার্জন হবে।' থর মরুভূমিতে জন্ম লাভ করা এই কালো রঙের রূপকথাটি এখানেই শেষ হয়েছে। রূপকথাটি কে জানি রচনা করেছিল। কেনই বা তিনি এতে শুধু কালো রঙই মিশ্রিত করলেন। কে বলতে পারবে তা? যুগে যুগে মানুষের মুখে চলে আসা এই রূপকথাগুলি নিজে নিজে জন্মায়।

আরো একটি রূপকথা। হ্যাঁ, রূপকথাই তো। যতসব উদ্ভট কথা। ঠিক হাঁস মানুষকে উড়িয়ে আনার মত, নবজাতকের মুখ থেকে মুক্তো ঝরে পড়ার মত। মানস সরোবরে স্তরে স্তরে পড়ে থাকে হীরে-মুক্তো, শেঠের ছেলেকে মুক্তো খেয়ে জীবনধারণ করা শুভ্র রাজহংস গোরুর গাড়ি বোঝাই করে তারই কিছুটা পাঠিয়ে দেয়। যত সব গাঁজাখুরি গল্প। ডাল-পাতা জোড়া দেওয়া কত ধরণেরকথা। কিন্তু মিথ্যে কথাগুলির মধ্যে সেই বুক পাথর হয়ে যাওয়া সুন্দরী মেয়েটির চোখের জলটুকু সত্যি। এই মানুষটির ভেঙে যাওয়া বুক, মরুভূমির গায়ে গা লেগে থাকা জায়গাটির নিষ্ঠুর সমাজের কথা এটাতো আর কল্পনা নয়। এই কথাটুকু মানুষকে বলার জন্য সেই অনামী লেখকটি এই ডালপাতা

জোড়া দিয়ে কাহিনীকে গড়ে তুলেছে বোধহয়। হতে পারে।

আমি যে রূপকথাটি এবার বলতে চলেছি সেটা একেবারে ডাহা মিথ্যে। ডাল-পাতা জোড়া দেওয়া রূপকথা। মানুষের রক্ত সবুজ হয়ে যাওয়ার কথা, সেই মৌমাছির আঠা দিয়ে পাখা লাগিয়ে সূর্যের কাছে উড়ে যাওয়া ইউলিসিসের নাতি বলে নিজেকে পরিচয় দেওয়া সুন্দর যুবকটির কথা, যুবকটি এরিনদিরার সঙ্গে দেখা করার পর যে জিনিসেই হাত রাখে তাই নীলাভ হয়ে ওঠার কথা, ঘুমের মধ্যে চোখ মেলে কথা-বলা সেই ভয়ানক বৃদ্ধার কথা, একটা প্রজন্মের ইঁদুর মেরে ফেলতে পারা বিষ খেয়ে না মরা সাদা একটা সাদা-তিমির মতো শক্তপোক্ত বুড়ির কথা......যতসব গাঁজাখুরি গল্প। এরিনদিরা এবং তার পাষাণী ঠাকুরমার রূপকথাটি হাঁস এবং সুন্দরী মেয়েটির রূপকথার মত অনামী লেখকের নয়। এরিনদিরার লেখক একজন চারপাশে ছড়িয়ে যাওয়া অতি পরিচিত নাম। এই মানুষটি যতসব গাঁজাখুরি গল্প বলে সাবা পৃথিবীর মানুষকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়েছে। এই মানুষটির ঝুলিতে কত যে রূপকথা। মানুষটি নিজেই বলেছে একহাজার এক রাতের রূপকথার তিনি পথপ্রদর্শক। আরব্য উপন্যাসের জীন পরীদের তুলনায় কোন অংশে কম নয় তার রূপকথা। একটা চাদর ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষ স্বর্গে চলে যায়, সাগর থেকে গোলাপের গন্ধ ভেসে আসে, এক কানা বুড়ি চোখে না দেখেও সব কিছুই টের পেয়ে যায়, দু বছর ধরে একটা মানুষ শুয়ে থাকে। বলে শেষ কবা যায়না উদ্ভট গল্পের দোকানি লোকটির কথা। আসলে অদ্ভুত রূপকথার ব্যবসা ফেঁদে পৃথিবীব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া লোকটি নিজেই এক অদ্ভুত প্রাণী। অদ্ভুত যতসব ঘটনার মধ্য থেকে এই জীন-পরীব উড়ন্ত গালিচার রূপকথা ভালবাসা মানুষটা উঠে এসেছে। তাঁর ঠাকুবমাকে চোখ অপারেশনেব পবে জিজ্ঞেস করা হল ঘবে কী কী জিনিস দেখতে পাচ্ছেন। বুড়ি চটপট বলে গেল। কী আশ্চর্য। বুড়ি যে সমস্ত জিনিসের কথা বলছে সে সবেব একটিও ঘরটিতে নেই। যে সমস্ত জিনিসেব কথা বুড়ি বলছে সে সমস্তই বুড়ি এতদিন ধবে বসবাস করা নিজেব শোবাব ঘরেব জিনিস। অদ্ভুত রূপকথা বলা লোকটির পিতামহের একদল অবৈধ সন্তান কপালে বংশের চিহ্ন নিয়ে অপরিচিত পিতাকে সম্ভাষণ জানাতে আসে, ঠাকুরমা এই অবৈধ সন্তানদেব হিসেব লিখে বাখে। লোকটিব দেশ গৃহযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজেই শ্মশানে মৃতদেহের উপব দিয়ে হাঁটছিলেন, দেখছিলেন সংহারেব মূর্তি। আর লোকটি দেখেছিল মরুভূমিব বালিতে পাতা নারী মাংসেব ব্যবসা। নিজ দেহের ব্যবসা কবা মেয়েরা অন্তর্বাস না পরে কুঁচি দেওয়া স্কার্ট পরে নাচে। বাতাসে ঘুবে ঘুবে নাচতে থাকা মেয়েদেব স্কার্টগুলি উপরের দিকে উঠে যায়, বাজাবে লোভনীয় হয়ে উঠে নাবীমাংসের বিশাল পণ্য।

সাগরের বালিতে এইসব পণ্য, লেখক শৈশবে বাবাব ব্যবসায়ের পয়সা আনতে গিয়ে দেখা নারীমাংসেব ব্যবসা, না কি সমগ্র বিধ্বস্ত দেশজুড়ে চলা বিভিন্ন জীবিত নারী মাংসেব পণ্যগুলি কোন একটা থেকেই বোধহয় এবিনদিরা উঠে এসেছিল। এরিনদিরার রূপকথাটি মুখে চলে আসা প্রচলিত রূপকথা নয়, ছাপাব অক্ষরের রূপকথা। রীতিমত বইপত্রে ছাপা হওয়া রূপকথা। অনেব মানুষের পড়া, অনেক মানুষের আলোচনা করা রূপকথা। রূপকথাটি মোটামুটিভাবে এইরূপ।

এরিনদিরা নামের ভাগ্যহীনা, শান্ত, চৌদ্দ বছরের মেয়েটি চলাফেরা করতে অক্ষম স্বাস্থ্যবতী ঠাকুরমাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। সাজিয়ে গুছিয়ে ঠাকুরমাকে বাগানে বসিয়ে রেখে সে কাজে হাত দিয়েছে। অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো মরুভূমির মধ্যে তৈরি প্রাসাদটিতে একমাত্র এরিনদিরা আর ঠাকুরমা থাকে। ঘুমের ঘোরে কাজ করতে করতে এরিনদিরা একদিন একটা মোম জ্বালিয়ে রেখেই ঘুমিয়ে পড়ল। মোমের আগুনে প্রাসাদ জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। ঠাকুরমা এই

ক্ষতিপূরণের জন্য এরিনদিরাকে বাজারে বসিয়ে দিল। পরিচিত জায়গাটিতে পয়সা খরচ করে উপভোগ করার মত যখন কোন খদ্দের জুটল না। ঠাকুরমা তাকে অন্য একটা জায়গায় নিয়ে গেল। যাবার সময় ট্রাকের ভাড়াটাও তাকে মালপত্র তোলা ছেলেটির কাছে নিজের দেহ বিক্রি করে যোগাড় করতে হয়েছিল। ঠাকুরমা একজন পিয়নকে কম পয়সায় তার দেহ উপভোগ করার সুযোগ করে দিয়ে পিয়নটির মাধ্যমে সেই অঞ্চলের সবাইকে খবর দিল। এরিনদিরার তাঁবুতে গ্রাহকের লাইন লেগে গেল। গ্রাহকদের সঙ্গে এল জুয়ার টেবিল, খাবার জিনিসের দোকান। আগুনে পোড়া যাবতীয় সম্পত্তি আর প্রাসাদের ক্ষতিপূরণ যোগাড় করার জন্য এরিনদিরাকে প্রতিদিন শরীর এলিয়ে না পড়া পর্যন্ত গ্রাহকদের বিছানায় আনতে হত।

এই হল এরিনদিরা। সে ঠকঠক করে কাঁপছে। মেয়েটি একদল পুরুষ মানুষের ঘামে মাখামাখি হয়ে আছে। 'ঠাকুরমা আমি মরে যাব এবার।' সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ঠাকুরমা তার কপালটা ছুঁয়ে দেখছে। জ্বর নেই।

আর মাত্র দশটা সৈন্য রয়েছে। ঠাকুরমার কথা শুনে একটা জন্তুর মত চিৎকার করে সে কাঁদতে শুরু করে দিল। উপায় না পেয়ে ঠাকুরমা বাইরে লাইন পেতে থাকা গ্রাহকদের পাঠিয়ে দিলেন। সেই সময়টাতে এরকম মনে হচ্ছিল যেন কেউ তার কিডনিতে লাঠি দিয়ে আঘাত করছে।

এমন একটি দিনেই তার সঙ্গে ইউলিসিসেব দেখা হয়েছিল। ফুলের মত সুগন্ধি ছড়ানো, সোনার মত জ্বলজ্বলে এই যুবকটির বাবা গাছের কমলার মধ্যে হীরা ভরে চোরকারবার করে। তার সঙ্গে দেখা হবার পর ইউলিসিস যাতে হাত দেয় তাই নীলাভ রঙের হয়ে পড়ে। সে এরিনদিরার প্রেমে পড়ল। একবার মিশনারীরা এরিনদিরাকে উদ্ধার করল। ঠাকুরমা টাকা খাইয়ে একটা বর যোগাড় করে বিয়ের নাটক সৃষ্টি করে এরিনদিরাকে মিশনাবীদের হাত থেকে উদ্ধার করে এনে পুনরায় বাজারে বসিয়ে দেয়। দেনা যে শোধ করতেই হবে। এরিনদিরার তাঁবুতে মানুষের সারি। মানুষের আঁকাবাকা সারিটা একটা সাপের মত হয়ে শহরের কোণগুলি তখন ভরে গেছে। ঠাকুরমার ব্লাউজের ভেতরটা ভরে গেছে সোনার টুকরোতে। এরিনদিরার পা দুটি বেঁধে রাখা হয় একটা কুকুর বাঁধা শেকল দিয়ে। সে যে সোনার বরণ ছেলেটির সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। ধারের হিসেব-নিকেশ ধূসর হয়ে এসেছে। কেবলই চাই আর চাই।

একদিন সাগরপারের তাঁবুতে বসে এরিনদিরা ইউলিসিসকে ডাকল। শত মাইল দূরের কমলাবাগানের মধ্যে বসে ইউলিসিস সে ডাক শুনতে পেল। সে এসে তাকে শিকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পেল। এরিনদিরা তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় ঠাকুরমাকে হত্যা করতে বলল। প্রথমে বারুদ, তারপরে ইঁদুর মারার ঔষধ দেওয়া কেক- -সব বৃথা হল। শেষপর্যন্ত বুড়িকে ড্যাগার দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করল। মধুর মত আঠা আর গাঢ় সবুজ পিচ্ছিল রক্তে সমস্ত জায়গাটা ভরে গেল। বুড়ির মৃত্যু হল। এরিনদিরা তখন ঠাকুরমাকে ভালভাবে দেখে নিয়ে মারা গেছে বলে যখন নিশ্চিত হল তখন সাগরের দিকে দৌড়াতে শুরু করল। হাতে একটা সোনার পাত্র নিয়ে এরিনদিরা দৌড়াতেই থাকল। সাগরের পারে পারে গিয়ে সে মরুভূমির দিকে যেতে থাকল। ইউলিসিস তাকে পেছন থেকে চিৎকার করে ডাকতে থাকল সে হরিণের থেকেও দ্রুত দৌড়াতে লাগল। পৃথিবীর কারো আহ্বান আর তাকে থামাতে পারছিল না। উদ্ভট গল্পের মায়াজাল রচনা করা লেখক বলেছেন এরিনদিরা শুকনো বাতাস আর শেষ না হওয়া সূর্যাস্ত পার হয়ে সোনার পাত্রটা নিয়ে দৌড়াচ্ছেই। তারপর তার কথা আর কেউ জানে না।

হাঁস এবং শেঠের পুত্রবধূর রূপকথা থেকে উদ্ভট এই রূপকথাটি এখানেই শেষ হয়েছে। একটি চৌদ্দ বছরের মেয়ে আর শেঠের সুন্দরী পুত্রবধূ—দুই জন দুই মেরুর দুটি অদ্ভুত রূপকথার নায়িকা কিন্তু দুজনের শরীরে একই গন্ধ। কামাতুর পুরুষের গায়ের ঘামের গন্ধে দুইজনেরই শরীর আঠালো হয়ে থাকে। দুইজনেরই বুকটা দ্বিধাবিভক্ত মাটির মত। দুইজনেরই মাংস বাজারে মেলে ধরা রয়েছে। একদল কুকুর কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে এই মাংস।

শেঠের সুন্দরী পুত্রবধূ আর এরিনদিরার মেলে দেওয়া এই নারীমাংসের বাজার কে জানে মানুষ টাকাপয়সা অবিষ্কার করা সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত শুরু হয়েছিল। বাইবেলে এই নারীদের সম্পর্কে একটা শব্দে চুয়াল্লিশবার আর অন্য একটা শব্দে তেপ্পান্নবার ব্যবহার করা হয়েছে। ভগবানের মন্দিরেও এদের রাখা হয়েছিল। দেবতার দাসী একটা সময়ে গীর্জাতেও ছিল. এক বা দু'বছর এই সব মেয়েরা নিজের দেহ বিভিন্ন মানুষকে বিক্রি করত আর উপার্জিত টাকা পয়সা গীর্জায় দিয়ে এসে পুনরায় সংসারে দ্বিগুণ মর্যাদা নিয়ে ফিরে আসত। একটা জাতির মধ্যে আবার মেয়েদের দেহ বেচে বিয়ের যৌতুক যোগাড় করার প্রথা ছিল। ধীরে ধীরে এইসব মেয়েরা সমাজের নর্দমা বলে পরিচিতি লাভ করল। সমাজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে নর্দমার প্রয়োজন। আসলে পুরুষ মানুষই ব্যক্তিগত সম্পত্তির নির্ঝঞ্ঝাট উত্তরাধিকারী এবং নিজস্ব উপভোগের স্বত্ত্ব বজায় রাখার জন্য নারীকে দুভাগে ভাগ করেছিল। পারস্যের একটা রাজ্যে রাজা এবং সমাজের অভিজাত শ্রেণীর কর্মচারীদের ভোজসভায় সস্ত্রীক উপস্থিত থাকা নিয়ম ছিল। হোমরাচোমরারা পান ভোজন করে কিছুটা অ প্রকৃতিস্থ হতে না হতেই নিজ নিজ স্ত্রীদের সসম্মানে সুরক্ষিত আরামদায়ক কক্ষে পাঠিয়ে দিতেন। তারপর আরম্ভ হতো তাদের ভোগলীলা। ভোজনকক্ষে আমদানি করা হত অন্য নারীর। একই নারীর শরীর। একপাশে সুরক্ষিত কক্ষে শুয়ে থাকে, অন্যপাশে পয়সার বিনিময়ে দেহ বিলোতে থাকে। সতীত্বও বজায় রইল, উত্তরাধিকারীও থাকল। ভোগের আয়োজনও রইল।

যে মাংসের বিপণিতে এরিনদিরা এবং শেঠের সুন্দরী পুত্রবধূকে মেলে দেওয়া হয়েছিল সেই বিপণির চোখের জলে আমি একবার হাত রেখেছিলাম। আমার হাতে লেগেছিল রক্তের ছিটে। ঠিক একটা রক্তজবার পাপড়ির মত। সেখানে একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। এরিনদিরার বয়সীই হবে। প্রাসাদটা পোড়ার পর এরিনদিরাকে ঠাকুরমা প্রথম গ্রাহকের হাতে তুলে দেবার সময় তার বয়স ছিল চৌদ্দ। আমার সঙ্গে দেখা হওয়া মেয়েটির বয়স তার থেকেও কম ছিল। সেই মেয়েটির কথা বলার আগে একটা রূপকথা বলছি। এটা পড়ে পাঠক হয়তো বলবে অরূপা এবার একটা উদ্ভট রূপকথা শোনাল। কেউ কেউ গালিও দিতে পারে, অরূপা পটঙ্গীয়া পশ্চিমী তত্ত্বের মোহে পড়েছে। পাঠক কী বলে পরে জানতে পারব। প্রথমে ছোট্ট মেয়েটির রূপকথাটি বলছি।

পেনিলপীর তাঁতের রূপকথাটা মনে আছে? স্বামী ঘরে নেই। অপরূপা পেনিলপীকে একদল পুরুষ ঘিরে ধরেছে। ক্ষমতাশালী পুরুষদের সে মুখের উপর না-ও করতে পারছে না। সে একটা তাঁত খুলে বসল। তাঁতটা শেষ হলেই কোন একজনের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসবে। দিনে তাঁত বোনে, রাতে খুলে ফেলে, দিনে বোনে, রাতে খুলে ফেলে। অসমাপ্ত পেনিলপীর তাঁত। লিখতে বসতেই পেনিলপির তাঁত আমার শরীর থেকে খসে পড়ল। ছেলেমেয়েদের ইংরেজী পড়ানোর চাকরিটাতে কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম। একমাসের জন্য নামী বিশ্ববিদ্যালয়টিতে পড়ার সুযোগ পাব কেবল চাকরিটার জন্য। পড়ার বিষয় নারী। নারীর জীবন যে পড়ার বিষয়বস্তু হতে পারে সে কথা ভেবে

আমি অদ্ভুত এক আনন্দ পেয়েছিলাম। একটা জয়ের অনুভূতি হয়েছিল। আমরা আপন দেহের ব্যবসা করা নারীদের সম্পর্কে আলোচনায় বসেছিলাম আমি বড় অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলাম সমাজের উপর শ্রেণীর মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন নামী অধ্যাপিকা এই দুর্ভাগ্যপীড়িতা নারীদের জীবনের সঙ্গে জড়িত। কত আন্তরিকতার সঙ্গে অধ্যাপিকা কয়জন সেই সমাজের নর্দমার ভেতর কাজ করছেন। একদিন একজন অধ্যাপিকা পাঁচহাজার যৌনকর্মীর উপর করা একটা সমীক্ষা আমাদের দেখিয়েছিলেন। সমীক্ষাটা করা হয়েছিল ১৮৫৮ সনে। পাঁচ হাজার দেহ বিক্রি করে খাওয়া নারীর মধ্যে ১৪৪১ জন অবস্থার চাপে, ১৪২৫জনকে শুচিতা নষ্ট করে ছেড়ে দেবার জন্য, ১২৫৫ জনকে মা-বাবা খাওয়াতে না পারায় বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। অধ্যাপিকাটি একটি অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। তিনি নিজে পাঁচহাজার যৌন কর্মীর উপর অধ্যয়ন করে ১৮৫৮ সনের সঙ্গে একই হিসেব পেয়েছেন কিছুটা হেরফের হলেও মূল ছবিটা কিন্তু একই রয়েছে। এত সভ্য হওয়ার পরেও এই সমাজের এই দুর্ভাগা মেয়েরা একই অবস্থায় রয়েছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বলা হল পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যার দেহ বিক্রি করা নারী একসঙ্গে থাকার জায়গাটিতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে। আমাদের বলা হল কিছু দিলে যেন খাব না বলে না বলি আর ক্যামেরা যেন সঙ্গে না নিই।

জনস্রোতে পরিপূর্ণ শহরটা দিয়ে একেবেঁকে আমাদের বাস গিয়ে একটা রাস্তায় প্রবেশ করল যেখানে শুধু সোনার গহনা। আয়নার মধ্যে ঝিলমিল করছে। বাসটা থেমে গেল। বাস আর যাবে না। আমি দাঁড়িয়ে পেছনদিকে গহনার দোকানটিতে আয়নার একটা বাক্সের ভেতর একটা রুবির নেকলেস দেখছিলাম। কি সুন্দর। একটা একটা লাল গোলাপের কলি গেঁথে গেঁথে যেন মালা তৈরি করা হয়েছে। নেকলেসটা একজন মহিলার আবক্ষ মূর্তির গলায় পরিয়ে রাখা আছে।

'অরূপা', কার কণ্ঠস্বর এটি! পড়তে আসা তার অধ্যাপিকা একজন তো নয়। আওয়াজটা আবক্ষ মূর্তিটা থেকেই এসেছে। মূর্তিটা আমার দিকে তাকিয়ে যেন অল্প অল্প হাসছে।

চিনতে পারছ আমার গলার রুবিটা? মানুষটি যেন হাসতে গিয়েও কেঁদে উঠেছে।

চিনতে পারনি? কাশলে মুখ থেকে একটা করে রুবি পরা যুবকটি দিয়েছিল। 'যুবকটির সঙ্গে তুমি'.....। শেঠের অপরূপা পুত্রবধূ আমার প্রশ্নটা শুনে এভাবে হাসল যে মূর্তিটা আয়নার বাক্স নিয়ে পড়ে যাবে মনে হল। অনেক সময় ধরে লাল রুবির নেকলেসটা আমার চারপাশে ঘুরতে লাগল। গহনার দোকান জুড়ে থাকা নানা অলঙ্কারের মধ্যে শেঠের পুত্রবধূর কথাগুলি ঝনঝন করে বেজে উঠছিল, 'তাকে ডেকে আন, আমার আর কোন সম্বন্ধতেই বিশ্বাস নেই। আমি একটা কথাই জানি আজ রাতে আমার ভাল উপার্জন হবে।' রুবির নেকলেসটা ছিঁড়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত হয়ে চারপাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল। প্রতিটি রক্তের ফোঁটাতেই ছিল সম্বন্ধ ভাঙার কাহিনী।

গলিটাতে পা রেখেছিলাম। ছোট গলিপথটার পাশে পাশে অদ্ভুত দেখতে ছোট ছোট কিছু ঘর। দরজা জানালা নেই। বাগান, ফুল, গাছপালা কিছুই নেই। কেবল কয়েকটা ঘর। ঘরগুলিতে রঙটঙও নেই, বেশিরভাগই ভেঙেচুরে গেছে। ঘরগুলির সামনা-পেছনও নেই। সামনের দিকে কেবল একটা নর্দমা এঁকেবেঁকে গেছে। ঠিক নর্দমাগুলির গা ঘেঁষে ওঠা কারো স্নেহ-স্পর্শবিহীন অদ্ভুত ঘরগুলির জরাজীর্ণ বেড়াগুলি। খসে পড়া জানালাগুলি বন্ধ। কোথাও একটা পাল্লাও খুলে রাখা হয়নি। যেখানে খোলা বলে মনে হচ্ছে সেটা আসলে কব্জা ভেঙে যাওয়ায় বন্ধ করতে না পারা পাল্লা। নর্দমাটা কালো। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানটায় বেশকিছু আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে নর্দমাটা বন্ধ হয়ে আছে।

ময়লা আবর্জনা জমা হয়ে হয়ে স্তুপীকৃত হয়ে উঠেছে। আর পাশের খাল দিয়ে জল ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে। আমি স্তুপীকৃত নোংরার দিকে তাকিয়েছিলাম। এরকম অদ্ভুত নোংরার স্তুপ আমি আর কোথাও দেখিনি। একগুচ্ছ শুকিয়ে গলে পচে যাওয়া রজনীগন্ধা, নার্জী আর গোলাপ ফুলের স্তুপ। ব্যবহার করা কণ্ডোমের প্যাকেট, পলিথিন, কালো চপচপে কাদা মাখা জিনিসগুলি দেখে আমার মাথা ঘুরে উঠেছিল। আমি কালো চপচপে কাদার মধ্যে ভাল করে তাকিয়ে দেখছিলাম কযেকটা লাল পাথর। রক্ত-রাঙা, রক্তের ফোঁটার মত, লালগোলাপের পাপড়ির মত। কাদার মধ্যেও জ্বলজ্বল করছে লাল পাথরগুলি।

'অরূপা!' এবার শেঠের পুত্রবধূর আওয়াজ পুরো চিনতে পেরেছি। 'এই গলিতে সবার কাছেই একটা হলেও রুবি পাবে। অবশ্য কেউ একটাও দামী জিনিস রাখতে পারে না। সব সেই মূল রাস্তার সামনে দোকানগুলিতে জমা পড়ে।'

'এরা এইসব দামী দামী রুবি কোথায় পায়?'

'তুমি কাগজ কলমের জগতে বসবাস করা মানুষ। ঘরের চারসীমানার মধ্যে স্নেহ ভালোবাসায় বড় হয়ে উঠেছ। তুমি কীভাবে বুঝতে পারবে?'

'তুমি বললে বুঝতে পারব না আমি?'

'তাহলে শোন, এরা সবাই একটা কথাই মাত্র ভাবে। আজ বাতে কীভাবে আমাব বেশী উপার্জন হবে। কাশলেই একটা করে রুবি পড়া মানুষ খোঁজ করলে আমাদের সমাজে অনেক পাওয়া যাবে।'

গলিটা দিয়ে আমবা এগিযে যাচ্ছিলাম। রাস্তার দুই পাশে কেবল যতটুকু পর্যন্ত দৃষ্টি যায় সারি সারি যুবতী। উগ্র বেশভূষা, উগ্র রঙ, অশ্লীল ভঙ্গিমা। সঙ্গে থাকা একজন লোক বলেছিল, 'এরা সব ফালতু লাইনের। ঘরে চাকরি করতে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে আসে।' আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল পাঁচটি যুবতী। ফালতু। হঠাৎ তারা খিলখিল করে হেসে উঠল। লাল রঙ মাখা ঠোঁটগুলিতে হাসিটা ঠিক যেন মেলায় বসা গান গাওয়া পুতুলের নাকি সুরের গানের মত। একটা জায়গাতেই ঘুরঘুব করছে। হাসির উৎস একটা মোটা লোক। ঘি-রঙের পাঞ্জাবী-পায়জামা পরা মানুষটির হাতে ভাঁজ করে রাখা একটা যুঁই ফুলের মালায় চোখ পড়তেই আমার শরীরটা রি-রি কবে উঠল। মাংস কিনতে আসা মানুষটির হাতের মালাটা নর্দমার কাদায় পড়ে থাকা ফুলগুলি থেকে বেশি কুৎসিৎ বলে মনে হচ্ছিল। লোকটি যুবতীগুলির পাশে দাঁড়িয়েছে। একজন বুকের কাপড়টা বারবার ফেলে দিচ্ছে, একজন লালবঙের স্কার্টটা উরুর উপরে তুলে ধরছে। একজন জিনপ্যান্টের চেইনটা খুলে ফেলেছে, চোখে পড়ছে ভেতরের লাল অন্তর্বাস। দেখতে দেখতে সমস্ত মেয়েগুলি ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। সমুদ্রপারের বাতাস, দিগন্ত জুড়ে থাকা ধূ-ধূ বালি। বালির উপর নারী মাংসের মুক্ত বাজার। মেয়েগুলি নাচছে, অন্তর্বাস না পরা মেয়েগুলির কাপড় সমুদ্রের বাতাসে ওপরের দিকে উঠিয়ে দিচ্ছে। সোনাগাছির এই মেয়েগুলি আর সেই এরিনদিরার রূপকথা বলা লেখকটির বর্ণনা করা মেয়েগুলি হঠাৎ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। প্রত্যেকেই নাচছে, ঘুরে ঘুরে নাচছে। নাচের ছন্দে ছন্দে এরা ডেলা ডেলা মাংসে পরিণত হয়েছে। মাংসের ডেলাগুলি নড়ছে। কলাপাতা বা শালপাতায় ভাগাভাগি করে রাখা মাংসের ডেলাগুলিকে মানুষটা দেখছে। মানুষটির চোখদুটি বড় বড়, মণিটা পিঙ্গল। পিঙ্গল চোখ দিয়ে সে মাংসের ওজন দেখছে।

'অরূপা'---শেঠের পুত্রবধূর রাজস্থানী ভাষার ছাপ থাকা আওয়াজ নয়। বিদেশী মানুষের জিহ্বায় আমার নামটা কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে। অনেকটা আমার স্কুলের বিদেশী সিস্টারের মত, আমার বিদেশী বান্ধবী নেনসী বা রোজির মত। মেয়েগুলির মধ্য থেকে একটি চৌদ্দ বছরের মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসেছে। অদ্ভুতভাবে সুন্দর ফ্যাকাশে মেয়েটি ঘুমের ঘোরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। এত ক্লান্ত লাগছে তার মুখটা।

'তোমাকে কেন এত ক্লান্ত লাগছে। ঠাকুরমাকে স্নান করাচ্ছিলে? ঠাকুরমা ঘুমোতে যাবার আগে তোমাকে অনেক কাজ করতে দেয়, তাই না?'

'ঠিকই বলেছ, কার্পেটটা ধোওযা, কাপড় ইস্ত্রি করা, কাপড়ের আলমারি ঠিক করে রাখা, ফুলের টবগুলি বাইরে বাখা, উটপাখিকে খাওয়ানো--সব কাজ শেষ করে এসেছি।'

ঠাকুরমা বিছানায় শুয়ে শুয়ে তোমাকে কাজের লিস্ট দেয় নাকি ঘুমোতে যাবার আগেই?

শুধু নয় শোবাব পরেও ঠাকুরমা আমাকে কাজ করার জন্য বলতে থাকে, কবরে জল দিবি, আমাদিজরা এলে বলবি, ভেতরে আসার দরকার নেই, গানের দলটা অপেক্ষা করছে।'

'আমাদিজ তোমার মৃত কাকা এবং বাবার নাম, তাই না?'

হ্যাঁ।

'তাহলে মৃত মানুষদেব '

'তুমি একেবারে বোকা। ঠাকুরমা ঘুমেব মধ্যেও জেগে থাকে। ঠাকুরমা অতীতেত কথা বলতে শুরু করলেই আমি জানি ঠাকুরমা ঘুমিযে পড়েছে।' আমাদিজের কথা বলে ঘুমিযে পড়ার পবেই তোমাব মোমটা থেকে আগুন লেগে গেল, তাই না?'

'ঠাকুবমার কাছে আমাব অনেক ধার হযে গেল।'

'তোমাকে বাজারে বসতে হল।'

নর্দমার পাশেব একটি মেযেব সঙ্গে একজন লোক দরকষাকষি করছে। মেয়েটি একশ', লোকটি ত্রিশ, চল্লিশ, একশ, বিশ যাট . ' দাম-দব চলছে। আমার সঙ্গে কথা বলতে থাকা এরিনদিরাবে একটা সাদা তিমি মাছের মত ঠাকুবমা হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। এরিনদিরার কুকুর বেঁধে রাখার শিকল। ঠাকুবমা আব একজন লোক তর্কতর্কি করছে।'

'কী আছে এই মেয়েটির শরীরে? লোকটি চীৎকাব করে উঠছে। কী আর বলবে এরিনদিরা। তার শরীরে কিছুই নেই। ঠাকুবমা এরিনদিরাকে পাল্লায় উঠিয়ে ওজন করছে।' এই দেখ তার ওজন নব্বই পাউণ্ড।'

'একশ থেকে আমি আব এক পয়সাও বেশি দিতে পারব না।'

'একটা নতুন মেয়ের জন্য একশ টাকা!'

'একশর সঙ্গে আরও পঞ্চাশ বাড়িয়ে দিলাম।'

'অরূপা, তুমি হারিয়ে যাবে কিন্তু।' রক্তমাংসহীনের আওয়াজ নয়, জীবিত মানুষের কণ্ঠস্বর। ইনি ডঃ দেবলীনা। প্রখর মেধাসম্পন্ন অধ্যাপিকাটি কেন জানি আমার মত সাধারণ মানুষকে স্নেহের চোখে দেখেন। 'অরূপা, তুমি কেমন হয়ে গেছ। কি হয়েছে? আমাদের আটটা গ্রুপে ভাগ করে দিয়েছে। তুমি আমার গ্রুপে পড়েছ। তোমার যা জিজ্ঞেস করার জিজ্ঞেস করবে। কিছু কিছু বাংলা ভাষা তুমি বুঝতে পারবে না, আমি অনুবাদ করে দেব।' পিঙলা চোখের লোকটির দামদরে বনল না। সে মেয়েদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। জীনপরা, শাড়ি পরা, স্কার্ট ব্লাউজ পরা, সবগুলি মেয়ে

লোকটিকে গালিগালাজ দিচ্ছে, মুখ ভেঙাচ্ছে। কী অদ্ভুত ভঙ্গিমা, কী অশালীন ভাষা, কী ধরণের হাসি।'

আমার চোখের জল বেরিয়ে আসছে বোধহয়। ডঃ দেবলীনা হাসছেন, 'অরূপা, তুমি প্রথমবারের জন্য দেখছ, আমি গত দশবছর ধরে দেখছি। 'কিন্তু নারী কীভাবে এরকম হতে পারে?'

মেয়েগুলির পুনরায় প্লাস্টিকের হাসি। নতুন গ্রাহক এসেছে। ডঃ দেবলীনা আমার হাত ছাড়েন নি। আমি আবার ফিরে তাকাচ্ছি। একজনের পরে আরেকজন লাফিয়ে লাফিয়ে পাল্লায় দাড়িপাল্লা ওঠানামা করছে। এবার এরিনদিবা উঠছে। একবার জীন, একবার শাড়ি, একবাব স্কার্ট এরিনদিরা মোমের আগুনে ঠাকুরমার প্রাসাদ ভস্মীভূত করার জন্য ঠাকুরমা তাকে বাজারে বসিয়ে দিয়েছে। শেঠ পুত্রবধূকে সাতজন মানুষ ঝুটা করার জন্য তাড়িয়ে দিয়েছে, লাখু কিনে নিয়ে বাজারে বসিয়ে দিয়েছে। এদের জীবনে কোন লাখু আছে? কোন ঠাকুরমা আছে? কি করেছিল তারা? কতজন লোক ঝুটা করার জন্য তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে?'

ডঃ দেবলীনা একটা ঘবের দিকে আমার দৃষ্টি নির্দেশ কবছেন।'

'ওটা নীলকুঠি।'

'নীলকুঠি? ঘরটার জানালা দরজা সব নীল।'

'একজন জমিদাবের উপপত্নীর ঘর ছিল এটা। পববর্তীকালে অন্যেরা তা কিনে নেয।'

'এখন কে থাকে?'

'এটাতে ইংরেজী বলতে পাবা মেয়েবা থাকে। এদেব দাম বেশি। একজনেব দাম দশ-বাবো হাজাব টাকা পর্যন্ত হয়।'

'কিসের জন্য?'

'পাওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংরেজী ভাষা। ইংবেজী বলতে পাবা মানে ভাল ঘরের মেয়ে।'

'এদিকে এসো। রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দৃষ্টির বাইরে পর্যন্ত সারি পেতে দাঁড়িয়ে থাকা ফালতু মেয়েদের মাঝখান দিয়ে দেবলীনা আমাকে নিয়ে যেতে লাগলেন।'

একটা ছেলে অপেক্ষা করছে। চোখে কাজল, কানে একজোড়া কানফুল, কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটা। 'ও মেল সেকস-ওয়ার্কার।'

'ডঃ দেবলীনা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হাসছেন।'

'তুমি কিভাবে জানতে পারলে?'

'আমার রিসার্চে ওদের ওপর একটা পুরো চ্যাপ্টার ছিল।' ছেলেটি এগিয়ে আসছে।

'কথা বলবে? তোমার বাংলা ও ঠিকই বুঝতে পারবে।'

'কাস্টমার কীভাবে?' আমার গলা শুকিয়ে উঠেছিল। ট্রামে বাসে উঠে ভুলিয়ে ভালিয়ে ইশারা করে সে এখানে গ্রাহক আনে। কিশোর ছেলেটির শরীরে চাকাচাকা দাগ। কিছু কাস্টমার তাকে দাগগুলি উপহার দিয়েছে। তাকে কে বাজারে নিয়ে এসেছে, 'অরূপা, পার্সোনাল কথা জিজ্ঞেস করো না। কোথায় জিজ্ঞেস করতে হবে আমি তোমাকে বলে দেব।'

কোমর দুলিয়ে কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা চুল নিয়ে চোখে কাজল দেওয়া ছেলেটি চলে গেল। হয়তো বা ভুলিয়ে ভালিয়ে কাস্টমার আনার জন্য।

ডঃ দেবলীনা এবার আমাকে নিয়ে একটা ঘরে গেলেন। ঘর যে এরকম হতে পারে তা কোনদিন ভাবতেই পারিনি। ঘরটা কে জানে হয়তো তেতলা হবে। অন্ধকার। বাইরে সানগ্লাস পরে

নিলেও রোদ চোখ ঝলসে দেয়। কীভাবে দিনের আলোতেও একটা ঘর এরকম অন্ধকার হতে পারে? ঘরের সিলিংগুলি নিচু বলে? দরজা জানালা সব বন্ধ বলে? আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। কেবল ডঃ দেবলীনাকে দেখতে পাচ্ছি পাকা পেয়ারার মত গায়ের রঙ, হাসি খুশি মানুষটাকে অন্ধকারেও দেখা যায়। আজ তিনি সাদা রঙের উপর সাদা সুতোর কাজ করা একটা চুড়িদার পরেছেন। কীভাবে এত সহজে তিনি অন্ধকার ঘরে ঢুকে গেলেন। কতখানি পরিচিত হলে এভাবে একটা অন্ধকার ঘরে একজন মানুষ বিনা বাধায় চলাফেরা করতে পারে। জানি দেবলীনা দেহের বেসাতি করা মেয়েদের নিয়ে এক যুগান্তকারী গবেষণা করেছেন। নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপিকাটি সম্পর্কে আমার হঠাৎ অনেক কথা জানতে ইচ্ছে করল। এতদিনে, মানে আজ দশদিনে এই মেধাবী অধ্যাপিকাটি সম্পর্কে আমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সেদিন আমাদের একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখানো হয়েছিল--হাঙ্গার'--ক্ষুধা। বালিতে বসবাস করা কয়েকজন মহিলার জীবনের ক্ষুধা, বিভিন্ন ধরণের ক্ষুধার অপূর্ব চিত্রন। একটি লাল রঙের ঘাগরা পরা, হাতে বেশ কিছু চুড়ি, গলায় কানে রূপোর অলঙ্কার পরা মহিলা বালিতে পড়ে রয়েছে। মেয়েটি ক্রমশ বালিতে শরীরটা ঘষতে লাগল, চারপাশে বালিতে ঝড় তোলা হু হু বাতাস আর বালির মধ্যে শরীর ঘষতে থাকা একটি মহিলা। দুবাইতে চাকরি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে পড়ে কালো কালো নিকোটিনের দাগ লাগা দাঁতের একটা মানুষ; জন্তুর মত হাউমাউ করে কাঁদা একটা মুখের সঙ্গে বারবার মহিলার শরীরটা সুপার ইমপোজ হচ্ছিল। আমি বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। প্রতিদিনের মতই মহিলাটি শরীরের গন্ধ আর স্পর্শ নিয়ে আমার কাছে হাজির হয়েছিল। তার গায়ের বালি আমার গায়ে এসে পড়ছিল। তার গায়ের ঘামের গন্ধ আমার নাকে এসে লাগছিল। আমি জানি এর পরে সে আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করবে, চিরচির করে উঠবে আমার মন ---

ডঃ দেবলীনা আমার কাঁধে হাত রেখেছিল। আমরা দুজনে অনেকক্ষণ পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম তিনি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটিয়েছিলেন। কোন উপাধি না লেখা মানুষটি ভাঙা সংসারের কথা বলেছিলেন বলেছিলেন দেহোপজীবিনীর উপর রিসার্চ করার, সেই রিসার্চের জন্য অ্যাওয়ার্ড পাওয়া, ইউনিভার্সিটির প্রফেসরশিপ পাওয়া পর্যন্ত তার মালটি ন্যাশনাল কোম্পানীর বিশাল বিদেশী ডিগ্রির কেরিয়ারের একজিকিউটিভ স্বামীর বিরল সহযোগের কথা। আর বলেছিলেন সমস্ত কাজ শেষ হওয়ার পরেও দেবলীনা রিসার্চের কাঁচামাল অভাগিনী নারীদের ছাড়তে না পারার জন্য সংসারে সংঘটিত অশান্তির কথা।

ডঃ দেবলীনা আমার হাতটা চেপে ধরেছিলেন, 'বল অরূপা তুমি পারবে সেই সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া নারীদের কাস্টমার হতে? আমি কোনমতেই পারলাম না।'

এই দেবলীনার পক্ষে অন্ধকার ঘরের অলিগলি চিনতে পারাটা মোটেও আশ্চর্যের কথা নয়। আমাকে একটা খাড়া সিঁড়িতে উঠতে দিয়ে দেবলীনা এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘুটঘুটে অন্ধকার। লোহার জালিকাটা একটা খাড়া সিঁড়ি। সাবধান করতে করতে দেবলীনা এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যে পোষাকই পরুন না কেন তার সঙ্গে স্পোর্টস জুতো পরে থাকেন। আমার চোখে দৃষ্টিকটু লাগছিল। কিন্তু মেধা এবং সৌন্দর্য মিলেমিশে থাকা এই অধ্যাপিকাটি যাই পরুক না কেন বেখাপ্পা মনে হয় না। কেবল চোখের সামনে ভেসে থাকে এক অম্লান জ্যোতি। আমার পায়ের কোমল চামড়ার, মিহি ফিতের হাইহিল জুতো পরে এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা অসম্ভব। নেমে যাওয়াও সম্ভব নয়। জুতোজোড়া আস্তে করে খুলে নিয়েছিলাম। কোথায় গিয়ে পড়ল বুঝতে পারছি না। সিঁড়িটা শেষ হওয়ার পর একটু

আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। ঘুলঘুলি দিয়ে আসা আলো-ছায়ার আঁধারে দেখতে পাচ্ছিলাম সারাটা ঘর জুড়ে কেবল ছোট ছোট কুঠুরি। কুঠুরির দরজার মুখে কিছু স্টোভ বা হাঁড়ি। লঙ্কার ফোঁড়ন, খড়ির ধোঁয়া, মাছভাজার গন্ধ। মৌচাকের মত একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িয়ে থাকা কুঠুরিগুলি থেকে গন্ধ ভেসে আসছে। আমাদের গ্রুপটা আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। আমি আর দেবলীনা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন মেয়ে এগিয়ে এল। দেবলীনার সঙ্গে তাদের সহজ সখিত্ব। মাটির ভাঁড়ে চা-বিস্কুট। আমরা মেয়েগুলির মেলে দেওয়া পাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম।

নয়জন মেয়ে ছিল সেখানে। প্রত্যেকেরই মোটামুটি একই কাহিনী। সমাজের কাছে বঞ্চিত হওয়ার কাহিনী। দেবলীনা জিজ্ঞেস করছিল চিমকি নামে কোন একটি মেয়ের কথা। একজন আধাবয়সী মহিলা অঙ্গুলিনির্দেশে একটা ঘরের দিকে দেখিয়ে দিয়েছিল। দেবলীনা আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা অনেকগুলি ছোট ছোট কুঠুরির একটাতে গিয়ে ঢুকেছিলাম। অন্যান্য খুপরি ঘরের মত এটাতেও প্রায় সারা ঘর জুড়ে বিছানা। বিছানাটিতে একটি ছোট মেয়ে, একটা গোলাপী রঙের ফ্রক পরে রয়েছে। মেয়েটির গালে স্পষ্ট আঙ্গুলের কালো দাগ, একটা চোখ ফুলে রয়েছে। পড়াশোনা করলে খুব বেশি হলে ক্লাস নাইন-টেনে থাকত। দেবলীনা তার বিছানায় থাকা প্যাকেটগুলি দেখছেন। রাগে মানুষটা গরগর করছেন---প্রত্যেকেরই একই স্বভাব, একটু ভাল হয়ে গেলেই আর ঔষধ খায় না। দেবলীনার প্রায় একক প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলের মেয়েদেব জন্য কয়েকজন নামী ডাক্তার নিয়মিত এদের দেখাশোনা করেন।

মেয়েটি হতাশার সুরে বলছিল, 'ঔষধ খেয়ে কী হবে দিদি, আমার আর বাঁচার ইচ্ছে নেই। দেবলীনা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'তোদেব মরা-বাঁচার কথা আমার জানা আছে। আজ মরতে যাবি, কাল দুটো পয়সা হাতে এলেই শাড়ি-চুড়িদার, রূপোর আংটি, পায়েল।' হঠাৎ মেয়েটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। দেবলীনা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অবাক লাগছে দেবলীনা তাকে মুখের কালো দাগগুলি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। আমার মুখের প্রশ্নবোধক ভাবটা তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছেন।'

'এ সমস্ত দাগ বড় সাধারণ ব্যাপার অরূপা। আজ হবে, কাল আবাব ভাল হয়ে যাবে। চিন্তা ওদের অসুখটা নিয়ে। একটা বড় অসুখ থেকে উঠেছে। ডঃ লীনাব জন্যই সেটা সম্ভব হয়েছে।' দেবলীনা তাকে দুটো ট্যাবলেট খাইয়ে দিলেন।

'লীনা কে?' কেন জানি ডাক্তারের প্রতি আমার কৌতূহল বেড়েই চলেছে। এই মেয়েদের কাছে এভাবে এসে সাহায্য করা বড় সহজসাধ্য কাজ নয়।'

'লীনার সংসাবের কথা জানতে চাইছ?' মুখ খুললেই বাকিটা বুঝতে পারেন দেবলীনা। 'ডঃ লীনা সিঙ্গল ওমেন। বাই চয়েস সিঙ্গল ওমেন।' মেয়েটি উঠে বসেছে। দেবলীনা যেন তার মাথায় যাদুকাঠি বুলিয়ে দিয়েছেন। সে যেন মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসেছে।'

'দিদি, আমার ভাই মাট্রিক পাশ করেছে। সেকেণ্ড ডিভিশন পেয়েছে।'

'পয়সা পাঠাতে পেরেছিস?'

'একটু কম পড়ে গেছে। কলেজে ভর্তি হতে অনেক টাকা লাগে। কেন এত টাকা নেয়? আমি কলেজে পড়াই বলেই আমাকে প্রশ্নটা করেছে।'

'তোমরা ভাইবোন কয়জন? ঘরে কে কে আছে?'

তারও একই কাহিনী। পিতৃ-মাতৃহীন মেয়েটিকে কাকা বিক্রি করে দিয়েছে। যে কিনেছে সে আবার বাজারে এনে বিক্রি করে দিয়েছে। তার একটাই আশা। ভাইকে পড়াশোনা শিখিয়ে বড়মানুষ করবে, তাবপরে এই লাইনটা ছেড়ে দেবে।

কুঠরিটার ভেতরে একজন লোক প্রবেশ করছে। অসুখ এবং যন্ত্রণায় অকালে বৃদ্ধা হয়ে যাওয়া মানুষটি এককাপ লাল চা আর কিছুটা মুড়ি নিয়ে মেয়েটির কাছে এসেছিল। মানুষটি মেয়েটির শেষের দিকে কথাগুলি শুনল। হঠাৎ মানুষটি মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বাছা বাছা শব্দে গালি দিতে শুরু করল। গালির শব্দগুলি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। কেবল বুঝতে পারছিলাম শব্দগুলি অশ্লীল এবং যৌনতার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। গালির তীব্রতায় শুধু আমি নই, দেবলীনাও চমকে উঠেছিলেন। মানুষটির গালির সারমর্ম একটাই--মেয়েটি ভুল আশা করে রয়েছে। এই লাইনে আসা কোন মেয়েরই কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না।

ঝুমঝুম পায়েল বাজিয়ে ইনি শেঠের পুত্রবধূই যেন এসে চিমকির কাছে বসেছে। থ্যাঁতলানো যুগের মেয়েটির দুই পাশে বুড়ি মানুষটা আব অন্যদিকে শেঠের পুত্রবধূ। চেইন ছ্যাঁচড়ানোর শব্দে আমি চমকে উঠলাম। পায়ে কুকুরের শিকল বাঁধা অবস্থায় এরিনদিরাও এসে মেয়েটির বিছানার পাশে বসল। পরপর তিনজনই মেয়েটির ভাইয়ের জন্য নিজের রোজগারকে শেষ করতে মানা কবছে। নিজের জন্য এক টুকরো জমি কিনে রাখতে বলছে।

অকালেই বুড়িয়ে যাওয়া মানুষটি অশ্লীল গালাগালি মিলিয়ে মিশিয়ে নিজের কথা বলছে। তিনি দুটো ভাইকে পড়িয়েছেন, দুজন বোনকে বিয়ে দিয়েছেন। তাকে কী কেউ দেখেছে? ভাই বোন তাব পরিচয় দিতে ঘৃণাবোধ কবে। মানুষটি আমাকে তার ঘরের দিকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন। প্লাস্টারহীন ইটের গাঁথনির একটা অন্ধকার খুপরি। লোহাব জালিকাটা গোল গোল ছোট ফুটো দিয়ে যতটুকু আলো আসছে সেটা ঘরটিকে আরো অন্ধকার করে তুলেছে। অন্ধকার খুপরিটা চটের কাপড় দিয়ে চারভাগে ভাগ করা আছে। চারটে খাট আর চারটে আযনা খুপরিটাব ভেতরে নড়াচড়া করা অসম্ভব করে তুলেছে। দু'পাশ থেকে মানুষের নিঃশ্বাস আর নড়াচড়ার শব্দ ভেসে আসছে। বুড়ি নিজেকে খালি বোতল বলে বর্ণনা করে কুঠরি চারটের কথা বলছেন। তার ইনকাম এই চাবটে ভাগেব চাবটে খাট। কলেজের ছেলেমেয়েরা আসে। ঘন্টা হিসেবে রেট ধরে আসে। যেদিন আসে না, সেদিন ভাত জোটে না। আজ একজোড়া ছেলেমেয়ে এসেছে।

বুড়ি, এরিনদিরা, শেঠের পুত্রবধূ প্রত্যেকেই মেয়েটিকে চেপে ধরেছে। সে এখন ভরা বোতল, নেশা ধরাতে পারে। একদিন তো সেও বুড়ির মত 'খালি বোতলে' পরিণত হবে। সেদিন তাকে কে দেখবে? তার তো বুড়ির মত চারটে ভাগ করে ভাড়া দেবার মত একটা প্লাস্টারহীন খুপরিও নেই। মেয়েটি থ্যাঁতলানো মুখ বিকৃত করে কাঁদছে। তার ভাই এরকম নয়। ভাইয়ের জন্য সে সব কিছুই করতে পারে।

এরিনদিরা চিৎকার করে উঠেছে, 'দেখ, ঐ যে সাদা তিমিটা আমার ঠাকুরমা, আমার বাবার মা।'

'ঐ যে আমার স্বামী, নতুন কুয়োর জল খেয়ে আমাকে লাথি মারা মানুষটি আমার স্বামী, তার সন্তান আমি পেটে ধরেছি।' শেঠের পুত্রবধূ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

'আমার রোজগেরে মানুষ হওয়া ঐ যে আমার ভাই-বোন।'

মেয়েটি গোঁয়ারের মত বসে বসে চোখের জল মুছছে। থ্যাঁতলানো মুখটায় হাত পড়ায় সে মধ্যে মধ্যে উঃ-আঃ করে উঠছে। সে মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠছে, 'না-না', কখনও নয়।'

তার মুখে আমি আমার ব্যাগে থাকা অ্যান্টিসেপটিক ক্রীমটা একটু লাগিয়ে দিয়েছি, 'কী হয়েছে এসব।'

'আমার খেয়ে আমাকে মারধর করেছে সে।'

'কেন?'

'সে আমাকে পয়সা দিয়েছে।'

'পয়সা দিলেই মারধর করবে নাকি।' অদ্ভুত এক হাসির সঙ্গে সবাই ঘুরে তাকাল, শেঠের পুত্রবধূ উঠে কেঁপে কেঁপে হাসছে। তার শরীর বমিতে মাখামাখি হয়ে রয়েছে। মানুষটির অপরূপ মুখটির অর্ধেকটা বমিতে ঢেকে আছে।

'আমি এই বমি ধুতে পারব না। রাজার বমি ধুলে ভয়ংকর অপরাধ হবে. রাজা আমাকে সোনার হার দিয়েছেন' লাখুকে বলেছেন, 'জান এরকম বমি প্রতি রাতেই গৃহস্থ ঘরের মেয়েমানুষের গায়ে পড়ে। বিনিময়ে তারা জুতোর বাড়ি খায়, তুই সোনার হার পেয়েছিস।'

আহত একটা জন্তুর মত এরিনদিরা চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে, 'আমি আর পারছি না'। তার শরীর সৈনিকদের ঘামে ভিজে গেছে' তার শোবার বিছানা মানুষের ঘামে ভিজে চপচপে হয়ে গেছে। বাইরে সৈন্যদের লাইনটা দেখে ঠাকুরমা বলছেন, 'আর মাত্র দশটা সৈন্য রয়েছে।' ভয়ে ভীত জন্তুর মত এরিনদিরা হাহাকার করছে।

মদ, বমি, পুরুষমানুষের ঘামের গন্ধে আমার নাক ঝিমঝিম করে উঠছে। চিমকী, এরিনদিরা, শেঠের পুত্রবধূ সব ঘোরাফেরা করছে। হাহাকার করতে করতে ঘর থেকে এরিনদিরা দৌড়ে বেরিয়ে এল. সে হাতে সোনালী পাত্রটা নিয়ে দৌড়ে চলেছে, সাগরের দিকে, ঐ যে এরিনদিরা হরিণের চেয়েও দ্রুত দৌড়ে চলেছে সে সাগরের তীরে দৌড়ে দৌড়ে ঐ যে মরুভূমিতে ঢুকে পড়েছে। অন্তহীন সূর্যাস্ত এবং মরুভূমিতে হু হু করে প্রবাহিত হওয়া বাতাসের মধ্য দিয়ে দৌড়চ্ছে। ইউলিসিস ডাকছে। পৃথিবীর কারো ডাকই আর তার কানে প্রবেশ করছে না। সে কেবলই দৌড়ে চলেছে।

থর মরুভূমির অপরূপা মানুষটি অবিশ্বাস্যভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। তার দুধে আলতা রঙ আরও লাল হয়ে উঠেছে। মানুষটা কাঁপছে। সে পৃথিবীর মূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলা শব্দগুলি উচ্চারণ করছে, 'আমার আর কোন সম্বন্ধে বিশ্বাস নেই।' সমস্ত সম্বন্ধ ভেঙেচুরে সে সালঙ্কৃতা হয়ে যুবকটির সঙ্গে শোবার ঘরে ঢুকেছে। সে কাশছে। তার কাশির সঙ্গে একটা করে রুবি পড়ছে। লাল গোলাপের পাপড়ির মত, রক্তের বিন্দুর মত। রক্তবর্ণের রুবিগুলি দুধে আলতা মানুষটিকে ঢেকে ফেলেছে। অজস্র রক্তবিন্দু মধ্যে ঢাকা পড়ে আছে শেঠের পুত্রবধূ।

'অরূপা, আমাদের যাবার সময় হয়ে এল। এখন এদের ওয়ার্কিং আওয়ার শুরু হবে।' দেবলীনা আমাকে ডাকছে। সাদা চুড়িদার কামিজ আর স্পোর্টস শু পরা দেবলীনা। ডঃ দেবলীনা।

সবাই একজায়গায় একত্রিত হয়েছে। একত্রিত হওয়া জায়গাটা একটা মেডিকেল সেল। রাস্তার পাশে ছোট একটা ঘর। সেখানে আমাদের সঙ্গের অধ্যাপিকাদের বিভিন্ন গ্রুপগুলি একত্রিত হয়েছে। মাটির ভাঁড়ে করে চা এনেছে। জীবনের কাছে মার খাওয়া মানুষগুলি আমাদের এত

শ্রদ্ধা করেছে, ভালোবেসেছে, বোধহয় আমাদেরও ডঃ দেবলীনা বা ডঃ লীনার মতই মনে করেছে। আমি মেডিকেল সেলটা দেখেছিলাম বেড়ার কাঠের বাটামগুলিতে থাক থাক করে রাখা জন্মনিরোধের সামগ্রী। একজোড়া কান ফুল পরা ছেলেটিও এসেছে। সে আমাদের জন্য বিস্কুট এনেছে চা-বিস্কুট খেতে খেতে আমরা মেয়েদের কথা শুনছিলাম। দেবলীনা ডঃ লীনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। উচ্চ বংশ, অভিজাত পরিবারের মেয়েটির ব্যক্তিত্ব দেবলীনার মতই। সমস্ত অবয়ব জুড়ে এক জ্যোতি প্রকাশিত বোধহয় আত্মবিশ্বাস থেকেই এই আভা ফুটে উঠেছে। অনবরত গালি শুনতে থাকা একটি মানুষ গোড়া ছেঁড়া একটা গাছের মতই শুকিয়ে যায়।

আমরা বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে এসেছিল। তখনই দেখলাম চিমকি এসেছে জানি তার নাম চুমকি নয়, মায়ের দেওয়া আসল নামটা এরা বলে না। একজন বলেছিল প্রতিটি গ্রাহকের সামনে সে নতুন করে নাম নেয়। সে আমার দিকে এগিয়ে আসছে এই নাম দিয়ে তাকে আমার ডাকতে ইচ্ছে করছে না। তার হাতে আমার মিহি কাজ করা, কোমল চামড়ার হাইহিল স্যাণ্ডেল জোড়া, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে না পেরে আমি পা থেকে নিচে খুলে ফেলে দিয়েছিলাম। আসার সময় অন্ধকারে খুঁজে পাইনি। আসলে স্যাণ্ডেলজোড়ার কথা আমার মনেই ছিল না।

চিমকি স্যাণ্ডেল জোড়া আমার দিকে এগিয়ে দিল।

'মাজনী' নিজের অজান্তেই আমি তাকে আমার মেয়ের নামেই ডেকেছিলাম। সে আমাকে বলেছিল আমি যেন গলি থেকে বেরিয়ে গিয়েই তাদের ভুলে না যাই। রাস্তায় পা রেখে দুই দিকের অদ্ভুত ঘরগুলি সারি সারি মেয়েতে ভরা আঁকাবাঁকা গলিটার দিকে একবার ঘুরে তাকিয়েছিলাম। গলিটার মধ্যে হাতে সোনার পাত্রটা নিয়ে ঐ যে এরিনদিরা দৌড়াচ্ছে। খেয়ালী লেখক তাকে সাগর এবং মরুভূমির দিকে দৌড় করিয়ে বলেছেন এর পর তার কথা আর কেউ জানতে পারে নি। ঐ মরুভূমির পুত্রবধূকে রুবি দিয়ে ঢেকে ফেলে তার বুক চিরে দেখাচ্ছে সেই রূপকথা বলা অনামী মানুষটি। রূপসী মেয়েটির বুকের মধ্যেও একগোছা রুবি পাথর। শীতল কঠিন এবং রক্তের মত লাল। তার মুখে ভয়ংকর শব্দগুলি বসিয়ে দিয়ে রূপকথা বলা মানুষটি বসে আছে আমার চিমকি অথবা মাজনীকে থ্যাতলানো মুখ নিয়ে কোথায় দৌড় করাব না কি তার মুখেও ভয়ংকর কথাগুলি বসিয়ে রুবি দিয়ে ঢেকে দেব!

ডঃ লীনা তাকে ধমকাচ্ছে। 'তোদের এই স্বভাবটা আমার একেবারে পছন্দ হয় না। ঔষধের কোর্সটা শেষ করলে অসুবিধে কোথায়, একটু সুস্থ হলেই ঔষধ বন্ধ।'

দেবলীনা আমাদের সঙ্গে ফিরবেন না। কী যেন কাজ আছে। আগামীকাল ক্লাস নিতে যাবেন।

আমি ঘুরে তাকিয়েছিলাম। ডঃ লীনা আর ডঃ দেবলীনা দুটি লম্বা আর দৃঢ় মানুষ চিমকী এবং মাজনীকে শক্তভাবে ঘিরে ধরেছে। তারা কেন ঔষধের কোর্সটা শেষ করবে না। আমি মাজনী এবং চিমকির থ্যাতলানো মুখটা সেখানেই শেষবারের মত দেখেছিলাম।

পাগলা হাতি

অতুলানন্দ গোস্বামী

কথাটা দাবানলেব মত ছড়িযে পড়ল। হাতিটা এদিকেই আসছে। শোনামাত্র কিছুক্ষণেব জন্য সবাই স্তব্ধ হযে গেলেন। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা হল। লোকগুলি এখন কী করবে? বুড়ি কযেকজন নিজেদেব চারপাশটা ভাল কবে দেখে নিল, ছেলেমেযেবা আশেপাশে বযেছে তো? পুরুষরা সবাই একজায়গায একত্রিত হল। ঘরে ঘবে শুকনো খড়ি আছে তো? গ্রামেব পূব সীমান্তে জমা করতে হবে। বড় কবে আগুন জ্বালাতে হবে। হাতিটা ওদিক থেকেই আসছে। মেয়েদেব কাঁপনি শুরু হয়ে গেছে। সবাইকে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে ওড়নাটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধবে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মেল বসিয়েছে। এই অবস্থা দেখে পুরুষরা ক্ষেপে উঠেছে। হাতি তাড়া করলে এই সমস্ত ঘরে আশ্রয় নিলেই রক্ষা পাওয়া যাবে নাকি? শরীরটা ঘষে দিলেই তো ঘরগুলি সব হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।

একটা পাগলা হাতি হুলুস্থুল বাঁধিয়েছে। দাঁতাল হাতি। আজ প্রায় পনেরো দিন হল, অভয়াবণ্য থেকে বেরিয়ে এসে বলিয়াজাকে অনেক ঘর বাড়িই শুধু ভাঙে নি, চার-পাঁচটা মানুষও নাকি খুন করেছে। খবরগুলি গ্রামের মানুষ পাচ্ছে। নানা মুখে ঘুরে ঘুরে খবরে যদি কিছু অতিরঞ্জনও ঘটে থাকে সত্য মিথ্যা যাচাই করার উপায় নেই। যতটুকু জানা গেছে, তাতে হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাবার অবস্থা। কোন একটা গ্রামে নাকি একটা বিয়ের মণ্ডপ মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে, কনের তাতেই মৃত্যু হয়েছে। অন্য একটি গ্রামে কয়েকজন মহিলা পুরুষকে মেরেছে। মাঠে ফিরে যাবার সময় একজনকে মেরেছে। বিকেলে বাজার থেকে ফেরার সময় একজন বুড়োকে নাকি ফুটবলের মত লাথি মেরে মেরে মেরেছে। কত যে ঘর ভেঙেছে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। হাতির উৎপাতের খবরাখবর জেনে নিয়ে সরকার ওটাকে পাগল বলে ঘোষণা করল। হাতিটাকে মারতে হবে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল। এ সমস্ত প্রশাসনিক খবর গ্রামের লোকজন খুব একটা বুঝতে পারে নি। প্রত্যেকেই ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। সবাই উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করছিল হাতিটাকে কেউ মেরেছে কি না এই খবরটা শোনার জন্য। শুনতে পেল এই ভয়ানক খবরটাই। পাগলা হাতিটা নাকি এদিকেই আসছে। গ্রামের প্রতিটি প্রাণীর মনেই এই ভয়ানক ভয় সঞ্চারিত হয়ে পড়ল। সবারই খাবার দাবার মাথায় উঠল। এই অবস্থাতেও টুকরো টুকরো খবর এ কান থেকে সে কান হয়ে আসছেই। হাতিটা নাকি চোরা শিকারীর তাড়া খেয়েই পাগল হয়েছে। দাঁত দুটো নাকি খুব বিশাল, বেরিয়ে থাকা টুকুই দেড় হাতের মত হবে।

হোক। এ সমস্ত খবরে শরীর জুড়োচ্ছে না। হাতিটা মরেছে কি? তার উৎপাতের সমাপ্তি ঘটুক, ছেলে-মেয়ে পুরুষ মহিলা শান্তিতে শ্বাস নিতে পারলেই হয়। সে ধরণের একটা খবর এনে দাও হে ঈশ্বর। পুবদিকের গ্রামগুলিতে মানুষ নাকি রাতের বেলা পাহারার ব্যবস্থা করেছে। ঢোল, খালি টিন, এমনকি রাতের বেলা থেমে থেমে ঢাকও বাজানো হচ্ছে। খড়ের আঁটি কিছু যোগাড় করে রাখা আছে। আগুন দেখিয়ে হলেও হাতিটাকে তাড়াতে হবে। এই গ্রামটা একেবারে প্রান্তসীমায়। জঙ্গল থেকে খুব একটা দূরে নয়। উত্তরের দিকে বড় নদী। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছোট একটা ঝরণা বয়ে গেছে। দক্ষিণ দিকে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি। পাহাড় না বলে টিলা বলাই ভাল। এই জঙ্গল থেকেই কয়েকটি পরিবারের ভরণপোষণ চলে। কাজটা সুবিধের নয়। চুরি করে কাঠ কেটে জঙ্গলের মধ্যেই কাঠ কয়লা পোড়ানো হয়। কাজটা বেশ শক্ত। প্রাণপাত করে করতে হয়।

সেজন্যেই গত দু'দিন ধরে গজলা ছটফট করছে। এক গর্ত কয়লার ব্যবস্থা করে এসেছিল সে। সারাটা দিন লেগেছে গাছ বাছাই করতে, সেটাকে কেটে সাইজ মতো করে নিতে। কাটা টুকরোগুলিকে গর্তে চেপে চেপে ঢুকিয়ে আগুন দেবার আগে উপরে জঞ্জাল ছড়িয়ে তার উপর কাদার লেপ দিয়ে দেওয়া হল। সারাটা রাত যতটুকু হয় পুড়বে, সকালবেলা গিয়ে যদি দেখা যায় যে কাদার মধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে তাহলে পুনরায় আরও একটা লেপ দিয়ে আসতে হবে। সেভাবেই সব করে রেখে এসেছিল। সকালে আর যেতে পারল না। আরও দু'দিন ঘরেই থেকে যেতে হল। কোনভাবে ফাটলটা বড় হয়ে আগুনটা যদি বড় আকার ধারণ করে তাহলে অনেক কাঠ বাজে ভাবে জ্বলে যাবে। যেভাবে ভেবেছিল সেভাবে কাঠকয়লা বের হবে না। আর গজালের ভয়ও সেখানটাতেই। সেদিন রাতের বেলা ফিরে এসেই সে হাতির কথা শুনেছে। সকালে আর সেদিকে যাওয়ার সুযোগই করে উঠতে পারে নি। এটা একটা কথা হলো?—সবাই হৈ হৈ করে উঠল।

গজলারও যে ভয় না লাগছিল তা নয়। ভয়েরও একটা সামগ্রিক রূপ আছে। সেও তো সমাজেরই একজন। হলেও তার চিন্তা হলো কোনভাবে তার কয়লার গর্তটার আগুন যদি মুক্তভাবে জ্বলতে থাকে তাহলে উপরের দিকে ধোঁয়া দেখা যাবে। গাছটা সে পুষ্ট দেখেই কেটেছিল। কম করেও চারশত টাকার কাঠ-কয়লা পাবার কথা। গেলে কয়লাও যাবে, জঙ্গলের রক্ষীও ধোঁয়া দেখে তেড়ে আসবে। অবশ্য একটা কথা, মুক্তভাবে জ্বললে আগুনটা তাড়াতাড়ি নিভে যাবে।

দু'দিন পার হয়ে গেল। হাতির চলাফেরার কোন নতুন খবর পাওয়া যায় নি। দুই একজন বলাবলি করছে খবরটাই হয়তো ভুল ছিল। কিন্তু সেটাকে পরখ করে দেখতে যাবে কে? গজলা মনটাকে শক্ত করল। সে আজ কয়লাটা দেখে আসবে। ভাল করে যদি জ্বলে থাকে তাহলে আজ পোড়া শেষ হয়ে যাবে। ঠাণ্ডা হতে আরও দু'দিন লাগবে। তারপরেই ঝেড়েঝুড়ে কয়লাটা বের

করতে হবে। একা আনা সম্ভব হবে না। লোক ঠিক কর' আছে। আজ কিন্তু যাবেই যাবে। একাই যাবে। ঘরের কেউ তাকে আর বাধা দিতে সাহস করল না খেয়ে উঠে দুপুরবেলাই বেরিয়ে পড়ল গজলা।

গর্ত করা জায়গাটা তার ঘর থেকে তিন কিলোমিটারের মত হবে একটা ছোট টিলার নিচেই করা আছে তার গর্তটা। নদীটা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। নদীর পারে পারেও ঘরে ফিরে আসা যায়। নদীর তীরে গজলারা কখনও কখনও কয়লা পোড়াতে এসে সবাই মিলে ভাত রেঁধে খায় রেঁধে খায় মানে একটা বাঁশের চোঙার মধ্যে সেদ্ধ করে খায়। এভাবেই হাঁস-মুরগী পেলেও সেদ্ধ করে খায়। নুন লঙ্কা বাড়ি থেকেই নিয়ে আসে। রোজ সঙ্গে থাকা দা'টা হাতে নিয়ে গজলা কয়লার গর্তের কাছে এসে পৌঁছল কাজটা করেই তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। জায়গাটাতে পৌঁছেই মন ভাল হয়ে গেল। মাটি খসে নি, বিশ্রীভাবে ফাটলও ধরে নি। ভেতরে কাঁচা কাঠপোড়া থেকে বাষ্প বেরিয়ে আসছে। কাঠটা ভালভাবেই পুড়েছে। তবুও চারপাশে ঘুরেফিরে টিবিটা ভালভাবে দেখল সে। দেখে সে ঘুরে কয়েক পা এগিয়েছে মাত্র, সামনেই ধড়াস করে কিসের যেন একটা আওয়াজ শুনতে পেল। কে যেন কাদা ঘাঁটছে। গজলার এতক্ষণে ভয় হল। শক্ত-সমর্থ লোকটির কপালটা মুহূর্তের মধ্যে ঘেমে উঠল। নিশ্চয় হাতিটাই হবে। কিন্তু কোনদিকে? কোনদিকে দৌড়ে পালাবে সে? কয়েকটা বাস্তাই সে জানে। কিন্তু প্রাণটা নিয়ে একজায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। হাতিটা কোনদিকে আছে জানতে পারলে তার বিপরীত দিকে দৌড়ে পালাতে পারত। কিছুক্ষণ কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল। গলাটা যতটা সম্ভব ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাল। কিছুই শুনতে পেল না. কিন্তু দেখতে পেল। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে দশ হাত দূরে মাটিতে হাতির শুঁড়। একটা বিরাট অজগর সাপ যেন পড়ে আছে। এবার যেন কেউ তাকে বাণ মেরেছে এভাবে নড়াচড়া না করে একজায়গায় দাঁড়িয়ে রইল : তারপর ঘুরে সে কয়লার গর্তের দিকে দৌড় লাগাল। মাঝপথেই থেমে গিয়ে সে ভাবল শুঁড়টা মাটিতে পড়ে কেন? একবার ফিরে তাকাল সেদিকে। হ্যাঁ, শুঁড়টা মাটিতে। তার সাহায্যেই যেন তাকে ইশারা করে হাতিটা কাছে ডাকছে। অজগর সাপ নাকি ছোট ছোট জীবকে সম্মোহন বাণ মারতে পারে। এই হাতিটাও আজ গজলাকে বাণ মেরেছে।

গজলা সামনে এগিয়ে গেল। হাতিটাও এবার শুঁড়টা দ্রুত নাড়াল। সামনে গিয়ে দেখে হাতিটা একটা গর্তে পড়েছে। পুরনো গর্ত, লতা-পাতা দিয়ে ঢাকা ছিল। কে কবে গর্তটা খুঁড়েছিল গজলা জানে না। নীচে নিশ্চয় জলকাদা রয়েছে। হাতিটা গর্তে পড়ে গিয়ে আর বেরোতে পারছে না। সে আরও একটু কাছে এগিয়ে গেল। একটু দূর থেকে ঝুঁকে হাতিটার শুঁড় হাত দিয়ে স্পর্শ করল। হাতিটা যেন তার কাছ থেকে এটাই চাইছিল। গজলা আরও কিছুটা এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে টের পেল—এটা সেই পাগলা হাতিটাই। দাঁত দুটো দেখল। এ ধরণের হাতি আশেপাশে নেই। সে গর্তটার চারপাশে ঘুরে দেখল হাতিটার পক্ষে একা একা গর্ত থেকে বেরনো সম্ভব নয়। সাহায্য না করলে গর্তেই মরবে। নিশ্চয় দু-একদিন আগেই গর্তে পড়েছে। বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে করে আধমরা হয়ে পড়েছে।

গজলা গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল, লোকদের ডেকে আনার জন্যে, এই বিকেলবেলা যাকেই পাওয়া যায়। কিন্তু দু'পা গিয়েই থেমে গেল। কাজটা উচিত হবে কি গ্রামের লোকের কাছে হাতিটার এই পরিণতির কথা বলার। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকজন লাটিসোটা নিয়ে তেড়ে আসবে নাকি?

এসেই হাতিটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলবে না কি? আর যদি সে বলে হাতিটা আধমরা হয়ে গর্তে পড়ে রয়েছে, সবাই মিলে ওটাকে গিয়ে তুলে দিই চল তাহলে সবাই তাকে পাগল বলবে না? কিন্তু বিপদে পড়া এই হাতিটাকে এই ভাবে গর্তের মধ্যে খুঁচিয়ে মারাটা অধর্মের কাজ হবে না? থাক। গ্রামের মানুষকে ডেকে আনার কোন প্রয়োজন নেই যা করার গজলা একাই করবে।

হাতিটার সামনে এসে আবার সে গর্তটা ভালভাবে পরীক্ষা করল। হাতিটা একবার শুঁড় তুলে গজলাকে যেন ছুঁতে চাইছে বলে মনে হল। হাতিটার নড়াচড়া করার কোন ধরণ দেখে গজলার সেরকমই মনে হল। এবার দেখল শুঁড়টা লম্বা করে মাটিতে পেতে দিয়েছে। এতটাই কি কাবু হয়ে পড়েছে হাতিটা? তবে কি হাতিটা শুঁড় দিয়ে গজলাকে কোন কাকুতি-মিনতি করছে? সাহস করে সে গর্তের উপরের কিছু গাছ-গাছালি কেটে ফেলল। তখন দেখতে পেল হাতিটা গর্তটা ভরিয়ে ফেলছে। গর্তের উপর থেকেই গজলা হাতিটার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'দাঁড়া আমি কিছু একটা ব্যবস্থা করছি।' হাতিটা মাথা তুলে গজলার দিকে তাকাল বলে মনে হল। গজলা তার কয়লা পোড়ানোর গর্তের কাছে গেল। সেখান থেকে দুটো গাছের ডাল বেছে নিল। এগুলি দিয়ে ভাল কয়লা হয় না। হাতের দা-টা দিয়ে ডালগুলির সম্মুখভাগটা ভাল করে সূঁচলো করে নিল। তারপর সেটাকেই খুন্তি হিসেবে ব্যবহার করে হাতি পড়ে যাওয়া গর্তটার একটা দিক খুঁড়তে লাগল। একদিকে ঢালু মত পথ বের করবে সে।

অবাক হয়ে পাগলা হাতিটা তার কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল। হাতিটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল গজলা তাকে সাহায্য করতে চাইছে। গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে গজলা হাতিটার সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগল। সে হাতিটাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই আবার গর্তটার ভেতর কীভাবে পড়তে গেলি। এতটাই হুঁশছাড়া হয়ে পড়েছিলি তুই। জঙ্গলে থাকিস, তা বলে.. ....।' হাতের সূঁচলো ডালটা ভোঁতা হয়ে যায়। পুনরায় সেটাকে কেটে ঠিক করে নেয়, ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে সেটা. হাতিটা উঠে আসার মত এখনও তৈরী হয়ে ওঠেনি পথটা। এদিকে বিকেল হয়ে আসছে। হাতিটা মাঝে মাঝেই শুঁড় বাড়িয়ে গজলার হাতটা ধরতে চাইছে। সমস্ত শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে গজলার। হাতিটা গজলার পরিকল্পনাটা বুঝতে পেরেছে। কিছুটা খনন করা হতেই হাতিটা একবার চেষ্টা করতে গেল। পারল না। পাটা আবার কাদায় ডুবে গেল। ধপাস করে শব্দ হলো একটা।

গজলার রাগ হয়ে গেল। 'দাঁড়া না,—'বলে সে হাতের সুঁচলো লাঠিটা তুলে হাতির শুঁড়েই যেন কোপ বসিয়ে দেবে এরকম একটা ভাব করল। ভয় দেখালে শিশুরা যেমন চুপ করে যায় তেমনই হাতিটাও মাথাটা একদিকে কাত করে গজলার শাসন মেনে নিল। গজলা বলতে লাগল, 'দেখতেই তো পাচ্ছিস, একটু ধৈর্য ধরলেই উঠে আসতে পারবি।' বড় কঠিন কাজটা। গ্রাম থেকে গিয়ে একটা কোদাল নিয়ে আসতে পারলে এতক্ষণে হয়ে যেত। তবুও সে নাছোড়বান্দা। শাবল দিয়ে পর্বত খসানোর মত অবস্থা হয়েছে। একটা হাতি উঠে আসার মত খাল কেটেছে গাছের সুঁচলো ডাল দিয়ে। কিন্তু উপায়ও নেই। হাতিটা এখন শান্ত। শুঁড়ে, গায়ে হাত বুলিয়ে সে তাকে এখন শান্ত করছে মাঝে মধ্যে। একটা সময়ে সেও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। হাতের তালুতে ব্যথা করছে। এদিকে বেশ ভাল করে অন্ধকারও নেমে এসেছে। হাতের সুঁচলো ডালটা রেখে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার জন্যে বসল। হাতিটাকে বলল, ' একটু অপেক্ষা কর, হাতটা খুব ব্যথা করছে। আর পারছি না। একটুখানি জিরিয়ে নিই।' হাঁটু দুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে মাথা গুঁজে গজলা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিল। এ অবস্থায় থাকতে থাকতে তার ঘুম এসে গেল। কতক্ষণ পার হয়ে গেল বলতে পারল না। কখন

একসময় ঘুমের ঘোরে একপাশে ঢলে পড়েছিল। হাতিটা শুঁড় দিয়ে উঠিয়ে দিল। গজলা ধড়ফড় করে উঠে বসল। অপরিচিত পরিবেশে নিজেকে সামলে নিতে বেশ কিছুটা সময় লেগে গেল। 'ইশ ইশ আমার ঘুম এসে গিয়েছিল দেখেছিস। দাঁড়া, তোকে তুলে নিই।' বলেই গজলা পুনরায় কাজে হাত দিল।

হাতিটা উঠে আসার মত খালটা খনন হতে হতে ভোর হয়ে এল। গজলা হাতের ইশারা করে হাতিটাকে কাছে ডাকল, 'আয়।' হাতিটা শুঁড়টা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। গজলা সামনেটা খামচে ধরল। ওটাতে ধরে সে যেন হাতিটাকে টেনেই তুলবে। হাতিটা সায় দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল। সহজে পারছিল না। 'আয় আবার ওঠ।'—বলেই গজলা জোরে টান দিল এবার। হাতিটা ডান পা'টা তুলেছিল, বদলে নিয়ে বাঁ-পা দিয়ে চেষ্টা করল। বার দুয়েক চেষ্টা করে একসময় উঠে এল। একটু একটু আলো হয়ে আসছে তখন।

গজলা আদর করে হাতিটার শরীরে হাত বুলিয়ে বলল—'ইশ, সমস্ত কাদা দেখছি তোর শরীরে। দাঁড়া....বলেই পাশ ফিরে ঘুরতে যেতেই চোখে পড়ল হাতিটাব ডান পায়ের উপর দিকে বিরাট এক ঘা। গজলা থেমে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী হয়েছে তোর? বলেই হাত দিয়ে ঘায়ের চারপাশের কাদাগুলি খুঁচিয়ে পবিষ্কার করে দিতে লাগল। হাতিটা যদিও চমকে উঠল, নড়াচড়া না করে একজায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বইল। মুক্তি পেয়েই হাতিটাব দৌড়ে পালিয়ে যাওযা উচিত ছিল। তা করল না। গজলা হাতিটার কান ধরে আস্তে করে একটা টান মেবে ঝবণার দিকে নিয়ে গেল। বলল, 'চল ঘা-টা ধুয়ে দিই।' হাতিটাও চুপচাপ গজলাকে অনুসবণ করে চলল। গজলা বলে যেতে লাগল, 'আমি বুঝতে পেরেছি, ওটা চোরা-শিকারীদেব কাজ। তোব শরীরে গুলি লেগেছে, তাই না? কখন লেগেছে তা তুই কীভাবেই বা বলবি ঝরণার কাছে গিয়ে গজলা একটা বড় ডাল পেড়ে নিল। শরীরের গামছাটা ভাল করে জলে ভিজিয়ে নিযে ঘাযেব উপর চাপা দিযে ডলে দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগল। ঘা-টা পেকেছে। প্রচণ্ড ব্যথায় হাতিটা কাবু হয়ে পড়ল। গজলা ভালভাবেই বুঝতে পারছে হাতিটার পাগল হওয়ার মূলে রয়েছে এই গুলিটা। একটা হলে তো ভালই। আরও কয়টা বয়েছে কে জানে।

'তোর দাঁত দুটোই তোর কাল হয়েছে, বুঝলি। ওই দুটির জন্যেই তোর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। ভাগ্য ভাল বেঁচে গেলি। তা বলে তোর এতটাই পাগলামি উঠল যে এতগুলি লোককে মেরে ফেললি?' কথা বলতে বলতে গজলা ঘা-টা পরিষ্কার করছিল। 'সেই ঘরটিতে এখন কী চলছে তা তুই বুঝবি কী রে অবোধ জীব.. ..'

ভালভাবে ভোর হযে গেছে। গজলা হাতিটার শুঁড়ের উপব আস্তে করে হাত দিয়ে চাপড় মেরে বলল—'একটু দাঁড়া এখানে। আমি একটা ওষুধ লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। তুই নড়াচড়া করিস না।' বলে এদিক ওদিক তাকিয়ে বন্য কচু কয়েকটা উঠিয়ে আনল সে। বিষকচু খুঁজেছিল, পায়নি। সে যখন কচু উঠিয়ে আনছিল, হাতিটা বারবার তার দিকে তাকিযে দেখছিল। 'দাঁড়া পেয়েছি'-—বলে গজলা হাতিটাকে যেন অপেক্ষা করতে বলল।

আশেপাশে পাথর ছিলই। একটা বড় দেখে পাথরের উপর রেখে ভাল করে কচুটাকে ছেঁচে নিল সে। হাত দিয়েও চেপে নিল। তারপর রসটা হাতির ঘা-টার উপর লেপে দিতে দিতে বলল, 'ভালভাবে রস করা গেল না। তবে এতেই হয়ে যাবে। তোকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারলে চেনিমা দুদিনেই ওষুধ লাগিয়ে ঘা শুকিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তোকে নিয়ে যাব না, বুঝেছিস। গ্রামের

লোকজন তোকে ঘিরে ধরে হল্লা করলে তোর আবার রাগ উঠে যেতে পারে। তুই কিন্তু জঙ্গলে চলে যাবি, বুঝেছিস। মানুষের বসতির মধ্যে তুই কিন্তু আর ফিরে আসিস না।'

হাতিটা মাঝখানে দুই একবার জোরে নড়ে উঠেছিল। গজলা ধমক দিয়ে উঠল—'দাঁড়া, কচু তো একটু জ্বালা করবেই। বিরক্ত করিস না....'। গজলা এবার হাতিটার চোখের দিকে তাকাল। কানটা খাড়া করে রেখেছে হাতিটা। শুঁড়টা দিয়ে সে গজলার হাতে একটা চাপ দিল। হাতটা ছাড়িয়ে নেবার জন্যেই নাকি। বিরক্ত হয়ে গজলা পুনরায় কড়া সুরে বলল, 'ইস বিরক্ত করিস না তো। তুই-ই তো ভাল হয়ে যাবি। ব্যথাটা কমে যাবে। দু দিনের মধ্যেই পুরো ভাল হয়ে যাবি। তুই কিন্তু আর মানুষ মারিস না ... ।' গজলার কথা শেষ হতে না হতেই গুড়ুম করে একটা আওয়াজ হল। কোথা দিয়ে কি হল গজলা বুঝতেই পারল না। একটা বিরাট চিৎকার করে হাতিটা উপর দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠল। তার একটা দাঁত গজলাকে গিয়ে আঘাত করল। গজলা ঝরণাটার কাছে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। সেখানেই পড়ে রইল সে। শক্ত মাটিতে পড়ে বেল ফাটার মত তার মাথাটা ফেটে গেল। দরদর ধারায় রক্ত বেরিয়ে ঝরণার জলের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল।

হাতিটাও ধীরে ধীরে প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসে তারপরে পড়ে গেল। শুঁড়টা লম্বা করে মেলে দিল। শুঁড়ের ডগাটা গজলার পা টাকে যেন স্পর্শ করতে চাইছে। দুই আঙ্গুলের মত পার্থক্য থেকে গেল। সারাটা রাত শিকারী খোঁজ করেছিল। আগেরদিন গজলা জঙ্গলে এসে বাড়িতে ফিরে না যাবার খবরটা গ্রামের লোকেরা জানতে পেরে গিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা কাঠকয়লা দেখতে আসা একটা লোকের নাম গজলা বলে জানিয়েছিল। হাতির কোন খবরই ছিল না। বন্দুক নিয়ে ঘোরা লোকটা সঙ্গের গ্রামের লোক দেখিয়ে দেওয়া পথেই এগিয়ে এসেছিল। রাতে সমস্ত গ্রামে কান্নাকাটি। গজলা বলে ছেলেটির বৌ পাগল হয়ে গেছে।

সরকার হাতিটাকে মারার জন্যে অনুমতি দিয়ে ঘোষণা করার পর থেকেই তৈরি হয়ে এসেছে শিকারী. ভোরের দিকে এখানে এসে পৌঁছেছে। টিলার উপর উঠেই শিকারী দেখতে পেল হাতিটা একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। কী করছে তা জানার কোন আগ্রহ নেই শিকারীর। সময় নষ্ট করার উপায় নেই।

ভাল করে লক্ষ্য করে একেবারে মাথার মাঝখানটাকে গুলি চালিয়ে দিল। গুলি করার পর শুধু ভাবল পাগলা হাতি কি কখনও চুপচাপ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে?

প্রথম গুলিতেই হাতিটা ছিটকে পড়ল। তবুও শিকারী অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে আরও দু-পা এগিয়ে গেলেন। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আরও একটা গুলি করলেন। হাতিটা অসাড় হয়ে পড়ে রইল। মহা উল্লাসের সঙ্গে শিকারী একেবারে সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তখনও পর্যন্ত কোন কিছু লক্ষ্য করেন নি। একেবারে কাছে এসে হাতিটার ওপাশে আড়ালে মানুষটিকে পড়ে থাকতে দেখলেন।

—'দেখেছিস, পাগলা হাতিটা আরও একটা মানুষ মেরেছে। এটা নিয়ে সাতটা হল।' শিকারী সঙ্গের লোকটিকে বলল। বন্দুকের শব্দ গ্রামের লোকরাও শুনেছিল। দ্বিতীয় গুলিটার শব্দ শুনেই কয়েকজন গজলার খবর করার জন্যে বেরিয়েছে।

শেষ চিঠি

অতনু ভট্টাচার্য

১.

কুকি আসার সময় হয়ে গেছে। আজ সে ভূচিত্রাবলী নিয়ে আসবে। আমি গতকালই তাকে বলে রেখেছিলাম মানচিত্রের একটা বই আনার জন্যে। সে জিজ্ঞেস করেছিল—'কিসের মানচিত্র?'

আমি বলেছিলাম—'পৃথিবীর।' আজকে আমার তাকে বাবন থাকা দেশটা দেখাতে হবে। ও কি-ই বা বুঝবে, আসলে আমারই একবার বাবনকে ছুঁয়ে দেখাব ইচ্ছে। তবে মানচিত্রের এত ছোট ছোট অক্ষরের লেখা কি আমি আর দেখতে পাব? মনে হয় পাব না। তবে আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ তো করতে পারব। এভাবেই কত নদ-নদী, সাগর বন্দর মুহূর্তের মধ্যে অতিক্রম করা যায়। কত সহজেই যে হাতের মুঠোতে বন্দী করে ফেলা যায় এই বিশাল পৃথিবীটাকে।

সমস্ত পৃথিবীটাই আজ হঠাৎ একটা গ্রামের মত হয়ে পড়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা আচম্বিতে এত ক্ষিপ্র এবং উন্নত হয়ে পড়েছে যে দূরত্ব ব্যাপারটা আজ আর কোন সমস্যাই নয়। খুট খুট করে দুয়েকটা বোতাম টিপলেই হল—যেন গোটা পৃথিবীটাই আছড়ে পড়বে শোবার ঘরে।

অথচ আমার অবস্থাটা এখন এরকম যে সাধ্যের ভেতর কিছু টাকা পয়সা খরচ করেও আমি পৃথিবীর অপর প্রান্তে থাকা বাবনের একটা মুখের কথা শোনার কোনরকম বন্দোবস্ত করে উঠতে পারি নি। আট বছর এভাবেই পার হয়ে গেছে। সভ্য দেশের মানুষদের পক্ষে একথা বিশ্বাস করা শক্ত হবে যে এই ইলেকট্রনিক যুগেও পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে মা-ছেলের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম—চিঠি। একটা ছোটখাটো শহরের রূপ নিতে চলা পশ্চাদমুখী এই শহরে এখন পর্যন্ত টেলিফোনের কোন ব্যবস্থা নেই।

এ বযসে ছানি-পডা দু'টি চোখ এবং ব্যথায জর্জবিত পা দুটি নিয়ে আমাব মতো আধাবযসী মহিলাব পক্ষে দূবেব শহবে গিয়ে টেলিফোন বুথে লাইনে দাঁডিয়ে থাকা সম্ভব কি? তাছাডা বাবন থাকা দেশটাব স্থানীয সময মিলিয়ে, সে চাকবি কবা কোম্পানীব সময-তালিকাটা অনুমান কবে, সেভাবে ঘবেব সমস্ত ঝামেলা সামলে টেলিফোনেব জন্য নগবে যাওযাটা পোষাবে কি— এই প্রশ্ন যদি আমাব অসুস্থ শবীবেব দিকে লক্ষ্য বেখে কবা হয তাহলে তাব উত্তবটা বড সন্তোষজনক হবে না। অথচ মাযেব মমতা বলেও যে কথা একটা বয়েছে তা আমাকে মাঝে-মধ্যেই বড আবেগতাডিত কবে তোলে।

স্বামীব মৃত্যুব পবে, যদি আমাদেব ছোট্ট ছেলে চন্দনেব ব্যাপাবটা জডিয়ে না থাকত তা হলে এই ঘব ছেডে এই পিছিয়ে পডা জাযগা ছেডে আমি হযতো চলে যেতাম বাবন থাকা সেই অদ্ভুত মাযাবী দেশে, যেখানে হযতো সে কিছু সম্মান এবং প্রতিপত্তি অর্জন কবেছে।

২

বাইবে ঘটাং কবে একটা শব্দ হযেছে। একজোডা হাওযাই স্যাণ্ডেল এগিয়ে আসছে—উচ্ছৃঙ্খল আব বিক্ষিপ্ত। দবজায টোকা দেবাব প্রশ্ন নেই। ভেতবে প্রবেশ কবাব জন্যে অনুমতি নেবাব প্রয়োজন নেই কুকিব।

— কুকি। সেই আটবছব বযসী ছেলেটি যে এই ঘবে যখন-তখন প্রবেশ কবাব মত আব কেই বা আছে? কুকি আব আমি। দুপুবেব এই সমযটুকু আমবা দুজন বড ঘনিষ্ঠভাবে কাটাই। অথচ আমাদেব দুজনেবই একটা আলাদা পৃথিবী বয়েছে। তাব সতেজ চোখদুটিতে বয়েছে ভবিষ্যতেব অজস্র স্বপ্ন আব আমাব ভাগ্যাহত মনটিকে দখল কবে বয়েছে অতীতেব অনেক দুঃখময স্মৃতি। আমাব এই একাকীত্বেব সমস্যাব তাৎক্ষণিক কোন সমাধান নেই। অন্যদিকে কুকিব নিঃসঙ্গতা সামযিক। দূবেব একটা স্কুলে চাকবিবত কিছু মানুষ তাদেব কর্মক্ষেত্র থেকে ফিবে না আসা পর্যন্ত সে এখানেই থাকবে। তাব স্কুল তাডাতাডি ছুটি হযে যায। সেজন্যেই এই ব্যবস্থা। ভালই হযেছে। পাশেব প্রতিবেশী একজনকে উপকাব কবাব নামে আমাবই যেন সময কাটানোব একটা উপায হযে গেছে।

এখন সে সব ছডিয়ে ছিটিয়ে নিয়ে বসবে। আমাদেব ঘবেবই কোন এক কোণে তাব প্রয়োজনীয খেলাব সামগ্রীগুলি সযত্নে লুকিয়ে বাখা আছে। অবশ্য শহবে বসবাস কবা স্কুলেব ছেলেদেব মত চোখ জুডনো খেলাব সবঞ্জাম তাব নেই। একটা পুবনো, ভাঙা বেডিওব যন্ত্রপাতি, এক টুকবো চুম্বক, সমযেব সঙ্গে কোনদিনই সঙ্গতি না বাখা একটা বঙচঙে প্লাস্টিকেব ঘডি, সম্পত্তিব নমুনা হিসেবে এই কযেকটি বস্তুব নাম উল্লেখ কবা যেতে পাবে। বাবন, চন্দনদেব কোনবকমভাবে থেকে যাওযা দুই-এক পদ সামগ্রীও উত্তবাধিকাব সূত্রে যেন তাব।

বাবনেব লেখা শেষ চিঠিটাব খাম থেকে গত সপ্তাহে ডাকটিকেট দুটো খুলে দিয়ে বলেছিলাম-—এগুলি বাবন-মামা থাকা দেশেব ডাকটিকিট।

'এগুলিতে কী লেখা আছে ঠাকুবমা?' কুকি জিজ্ঞেস কবে।

'জানি না। আমি তো পডতে পাবি না।'—আমি বলে উঠি।

'কেন? তুমি আমাব মতো স্কুলে পডাশোনা কব নি?'—সে পুনবায জিজ্ঞেস কবে।

'তা নয বে। চোখে দেখতে পাই না।—' আমি অসহায়ভাবে বলে উঠি। অবশ্য সে যে

আমার সব উত্তর মন দিয়ে শুনবে ততটুকু ধৈর্য তার নেই। আমার অসহায় অবস্থাটা বোঝার মত বোধশক্তিও তার জন্মায় নি। আমি মনে মনে ভাবি,—এই বোধশক্তি না হওয়া পর্যন্তই সুখ। অথচ আমার যে কত বিড়ম্বনা।

একটা চিঠির জন্যে আকুল আগ্রহে বসে থাকি। মুখের একটা কথা শোনার জন্যে দিনের পর দিন অপেক্ষা করে থাকি। রাগ ওঠে। অভিমান হয়। সেই অনুভব, সেই ব্যথা ভাগ করে নেবার জন্যে এই পৃথিবীতে এখন আমার নিজের মানুষটি নেই। এরকম সময়ে আমার বিছানা থাকা এই দশফুট বাই বারো ফুট ঘরটিকেই আমি অতিক্রম করতে না পারা একটা বিশাল পৃথিবী মনে হয়।

৩.

আমেরিকা।

সেই দেশটা নাকি কোটি কোটি মাইল দূরের গ্রহ উপগ্রহে মহাকাশযান পাঠায়। কোন মানুষ-জন না থাকা এমন কি শ্বাস নেবার মত বায়ু পর্যন্ত না থাকা মহাশূন্যে মানুষ পাঠিয়ে গৌরব বোধ করে। তারা কি দুদিনের জন্য একটা ছেলেকে মায়ের কাছে পাঠাতে পারে না?

গরম জলের ব্যাগটা দিয়ে বাঁ পায়ে সেক দিতে দিতে আমি কখনও বা চন্দনকে জিজ্ঞেস করি— 'বাবনের শেষ চিঠিটা কবে এসেছিল রে?'

'কি জানি, মনে নেই। দুই-তিন মাসের মত হয়েছে বোধহয়'— পাশের ঘর থেকে উত্তর ভেসে আসে।

'ও— আমি মনে মনে একটা হিসেব করে বলি— 'ছয়মাসের কম হবে না।'

টুকটাক কাজে যখন চন্দন বাইরে বেরিয়ে যায় আর ঘরে আমারও কাজ করার মত বিশেষ কাজকর্ম থাকে না তেমনই নির্ভেজাল দুপুরবেলা কোন কিছুই ভাল না লাগা মুহূর্তে আমি সযত্নে রেখে দেওয়া চিঠির বাণ্ডিলটা বের করে নিই। কোন একটা চিঠিতে হয়তো উত্তর অ্যারিজোনা প্রদেশের মোহনীয় বর্ণনা, কোন একটায় আর্কানসাস নদীর রূপ। আমি কোনমতেই বুঝতে না পারা বহুজাতিক কোম্পানীর কথা। চিঠিগুলি একটার পর একটা করে পড়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজেকেই ভুলে যাই। কিন্তু তার মধ্যেই এক একটা অভিমানের বাষ্প আমার চোখদুটিকে আর্দ্র করে তোলে। আমি কখনও বা এমনকি এখনও ভাবি--অন্তত বাবার শেষ দিনকয়টিতে তার পাশে থাকা উচিত ছিল। একজন বিদেশিনীর সঙ্গে তার বিবাহ সম্পর্কে পিতার স্থিতি যাই হোক না কেন, মানুষটার মৃত্যুর সময়েও সেই ব্যাপারটিকে আঁকড়ে থাকার কোন অর্থ ছিল না। অথচ ঘটনাগুলি একটার পর একটা এমনভাবে ঘটে চলল যে সারা রাত বিছানায় পড়ে পড়ে ভেবে ভেবে সময় অতিবাহিত করার বাইরে আর কিছুই করার রইল না।

যাই হোক না কেন, একটা দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্যে কাউকে দায়ী করার সময় হয়তো পার হয়ে গেল। আমার গৃহস্থের মৃত্যুশোকের মধ্যেও আমি এই ভেবে কিছুটা আশান্বিত হলাম যে এবার হয়তো বাবন ঘরে ফিরে আসবে। রাগ-অভিমান-অসন্তোষ করার মতো এখন তো আর কেউ নেই।

আমি চন্দনকে কাতরভাবে জিজ্ঞেস করি— 'তুই শহরে গিয়ে একটা ফোন করতে পারিস না?'

---'বলেছি তো, আগের চাকরিটা ছেড়ে দেবার পর সে আর নতুন টেলিফোন নম্বর দেয়নি।'---চন্দন রাগের সঙ্গে বলে। কুকি যখন মেঝেতে প্লাস্টিক অথবা কাপড়ের তৈরী পুতুলগুলি দিয়ে একা একা খেলতে থাকে আমার তখন বাবনকে মনে পড়ে। সাইকেলের চাকার একটা রিঙ লাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে সে কোথা থেকে কোথায় যে পৌঁছে যেত, রিঙটা চালানোর সময় সে মুখ দিয়েও গাড়ি চালানোর মত একটা অদ্ভুত আওয়াজ বের করত। একদিন সে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিল আর অনেক খোঁজখবর করার পরে নদীর মাথাউরির পাশে দেখতে পেয়ে বাবা তাকে দু-ঘা কষিয়ে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল, আর বলেছিল, 'আর কোনদিন আমাদেব জিজ্ঞেস না করে কোথাও যাবি না।'---সেই কথাগুলি মনে পড়ে।

পড়াশোনা সমাপ্ত করে একদিন সে নদীর মাথাউরি পার হয়ে, আমাদের পেছনে পড়া এই অঞ্চল ছেড়ে, এমনকি দেশেরও সীমা অতিক্রম করে চলে গেল অনেক দূরের একটা দেশে। জীবন আর জীবিকার তাড়না মানুষকে যে কোথায় নিয়ে যায়। আমার মন হাহাকার করে উঠেছিল। রান্নাঘরে আমি লুকিয়ে কেঁদেছিলাম। রাতে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমুতে পারিনি। তিনি, ---মানে বাবনের বাবা বলেছিলেন---'সুযোগ যখন পেয়েছে, যেতে দাও।'

এতটুকু পর্যন্ত যাই হোক তবু ঠিকই ছিল। আমাদের ছোট ছেলে চন্দনের মুখের দিকে তাকিয়ে বাবনেব দূবে যাবার দুঃখটা কিছুটা ভুলতে পেরেছিলাম। প্রতিবেশীদের সামনে গর্বও করতে পেরেছিলাম। পাসপোর্ট, ভিসা, বিদেশী কোম্পানি, ডলার---ইত্যাদির কূলকিনারা করতে না পারা, শহর থেকে দূরে এরকম এক গেঁয়ো জায়গায় বাস করতে থাকা একটা সাধারণ পরিবারের আওতা থেকে বেরিয়ে এত দূরে যেতে পারাটা তো কম কথা নয়।

অবশ্য সাধারণ পরিবার বলেই বা কীভাবে বলব? দেশীয় সরকার আমার শ্বশুরমশাইকে তো মুক্তি যোদ্ধার সম্মান দিয়েছেন। আমাদের আশেপাশের লোকেরা তো আমাদের কম সম্ভ্রমের চোখে দেখে না। টাকা-পয়সা আর মর্যাদা নামের সম্পদ দুটোর ক্ষেত্রেই ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে এ পর্যন্ত কোন রকম কৃপণতা করেন নি। আমার শারীরিক অবস্থা একটু অসুবিধের সৃষ্টি করলেও কারো প্রতি আমার মারাত্মক কোন অভিযোগ নেই।

৪.

এখন আমি চিঠির অক্ষর পড়তে পারি না। দুপুরবেলা পিয়ন চিঠিটা দিয়ে গেলেও চন্দন আসার অপেক্ষা করে থাকি। সে সব কাজ শেষ করে চিঠিটা হাতে না নেওয়া পর্যন্ত আমি ছটফট করতে থাকি। অজানা আশঙ্কায় কখনও বা আমার হাত-পা কাঁপতে থাকে। কিন্তু চিঠিটা পড়তে চন্দন আর কোথায় আগ্রহ দেখায়? আমার এই একটা অসুবিধে। কতদিন ভেবেছি, অন্যের উপর নির্ভর করব না। পারতপক্ষে কারোকে বিরক্ত করব না। অথচ এতখানি স্বাধীনতা আমার শরীর আমাকে দেয় না। শেষ পর্যন্ত কারো না কারো শরণাপন্ন হতেই হয়। এর জন্যে আমি আর কাকেই বা দায়ী করতে পারি? শহরে গিয়ে চোখের ছানিটা কাটিয়ে আসতে চন্দন দু-তিনদিন আমাকে বলেছে। তবে আমিই খুব একটা আগ্রহ দেখাই নি। চলে তো যাচ্ছে। অন্য কোন কাজে তো তেমন কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

খুব প্রয়োজন হলে আমি আমার প্রতিবেশী হরনাথের ছেলে ভেলুকে ডাকিয়ে আনি। ও মাঝে মাঝে এটা-সেটা এনে দেয়। একপোয়া চিনি, এক লিটা'র কেরোসিন, দুটো মোমবাতি---এ ধরণের হঠাৎ প্রয়োজনীয় জিনিসের ক্ষেত্রে আমার ভরসা ভেলু। অবশ্য সে-ও স্কুলের উপর ক্লাসে উঠেছে হরনাথ তার পড়াশোনার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে---তাই এখন আর ভেলুকে বিরক্ত করতে ভালো লাগে না।

এরকম সময়গুলিতেই চন্দনের উপর রাগ ওঠে। ঘরটা কীভাবে চলছে---ওর কি খোঁজ খবর রাখার কোন দরকার নেই? অথচ সে ব্রহ্মাণ্ডের খবর রাখে। হ্যাঁ, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার জন্যে, চাকরির ইন্টারভিউ দেবার জন্যে সে জীবনে কোনকালেই কাজে না লাগা কিছু অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে রেখেছিল। চাকরির চিন্তাটা এখন তার মাথা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে গেল। এখন ঠিকেদারীর নামে সারাটা দিন সে বাইরে বাইরেই থাকে কোন কাজকর্ম না করে উপার্জনহীন অবস্থায় একটা যুবক ছেলে কীভাবে যে দিনের পর দিন টো টো করে ঘুরে বেড়াতে পারে? কীভাবেই বা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে?

না, আমার ছেলেদের উপার্জনের টাকাপয়সার প্রয়োজন নেই। আমার জীবনটা চলে যাবার মত একটা পেনশন এবং পিতৃপুরুষের জমানো কিছু টাকা রয়েছে। কিন্তু চন্দন কী করবে এই কথাটা মনে হলেই আমার বুকের হৃদস্পন্দনটা দ্রুত হয়ে যায়। অনিশ্চয়তার একটা ভয়ে আমার হাত-পা গুলি ঠাণ্ডা হয়ে হয়ে আসে। অবশ্য ওর জন্যে আমার করুণাও হয়। কেন না আমার শ্বশুরের ত্যাগের বিনিময়ে দেশীয় সরকার আসন সংরক্ষণের যে সুবিধে দিয়েছেন, সেটা রাবন লাভ করায় চন্দন সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৫.

কুকি ভূচিত্রাবলীটা এনেছে। অক্ষরগুলি আমি পড়তে পারছি না অনুমানের উপর ভর করে গোলাপি রঙের একটা ভূখণ্ড দেখিয়ে বলেছি---'ভালো করে দেখো তো কী লেখা রয়েছে?' বিচিত্র রঙ এবং বিভিন্ন আকৃতির অক্ষরের চাপে সে হয়তো কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আমি আবার বলতে শুরু করেছি---'এখানেই হওয়া উচিত বুঝেছিস, এটাই আমেরিকা, এখানেই কোথাও অ্যারিজোনা নামের একটা জায়গা---ভালো করে দেখ তো কুকি পেয়েছিস কি?'

কয়েকটা দেশ এবং রাজধানীর নাম সে ভুল করে অস্পষ্টভাবে পড়ছে। আর হঠাৎ সে একবার আনন্দে লাফিয়ে ওঠার ভঙ্গিতে শরীরটা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল---'ঠাকুরমা, এই যে পেয়েছি আমেরিকা।'

'এখানেই, বুঝেছিস কুকি, এখানেই আমার রাবন থাকে।' কথাগুলি বলতে গিয়ে আমি একপ্রকার শিশুসুলভ আচরণ করলাম। এক ধরণের আনন্দের আতিশয্য প্রকাশ করে আমি পুনরায় বলতে শুরু করলাম---'এবার পুজোর সময়েই সে আসবে দেখিস। ও এলে আমি ওর সঙ্গে চলে যাব দেখে নিস।'

কোথায়?'---সে জিজ্ঞেস করল।

'আমেরিকায়, আবার কোথায়।'---আমি বললাম।

'চন্দনমামা?'-- সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল। প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে আমার উচ্ছ্বাস কেমন স্তিমিত হয়ে পড়ল। পলকের মধ্যেই আমি একটা কল্পনার পৃথিবী থেকে একজন আধবয়সী মহিলার বয়সে প্রত্যাবর্তন করলাম। আমার সাময়িক মৌনতাকে কুকি ভ্রূক্ষেপ করল না। ভূচিত্রাবলীটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু সমর্থ সহযোগে সে তার নিজের মনোজগতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'টিকিট দুটো কী করলি?'--কথাটা এমনিতেই আমি তাকে একবার জিজ্ঞেস করলাম।

'কিসের টিকিট?' সে আমাকে উল্টে জিজ্ঞেস করল।

'সেদিন যে দিয়েছিলাম আমেরিকার টিকিট দুটো।' আমি মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

'সে দুটি তো আমাদেরই দেশের টিকিট, আমেরিকার নয়।'—আমি অস্থির হয়ে উঠলাম।

'আমেরিকার নয়? কে বলল?'—আমি অস্থির হয়ে উঠলাম।

'বাবা'--সে নির্বিকার ভাবে বলল। ব্যাপারটাতে আমার মনে কিছু আলোড়নের সৃষ্টি হল। সন্দেহের একটা দোলা আমার সমস্ত শরীরের লোমরাজিকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। কিছুটা সময় আমি অপেক্ষা করে কুকিকে বললাম, 'ভেলুকে একটু ডেকে আনতে পারবি?'

কিছুই বুঝতে না পারলেও কুকি বিদ্যুৎবেগে দৌড়ে গেল। আর কয়েকমিনিটের মধ্যেই ভেলুকে সঙ্গে নিয়ে সে ফিরে এল। একগাদা চিঠি বার করে আমি ভেলুকে বললাম—'এই চিঠিগুলির সীলমোহরগুলি তুই ভাল করে দেখ তো ভেলু, বুঝতে পারবি কি এসব কোথা থেকে এসেছে?'

বয়স্ক লোকের কোনো গোয়েন্দার নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার সঙ্গে ভেলু চিঠিগুলি তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করল তার কিছুক্ষণ পরে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মতো মুখভঙ্গি করে বলল-- 'পুরনো দুটো চিঠি শুধু আমেরিকার। পরের গুলির অক্ষর সে দুটির সঙ্গে মিলছে না। ভেতরের কথাগুলি অন্য কারো লেখা।'

'আর কেউ! মানে কে?'

আমি চন্দনের টেবিল থেকে তার লেখা অক্ষরের নমুনা সংগ্রহ করলাম। এবার ভেলুর চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি' সে বলল।

আমি বুঝতে পারলাম যে বাবনের শেষ চিঠিটা কবেই এসে গেছে, যেখানে সে লিখেছে যে ঘরে ফিরে আসা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। আমি ভেঙে পড়ব বলে, বেঁচে থাকার আগ্রহ হারিয়ে ফেলব বলে চন্দন চিঠি লিখে লিখে ডাকবাক্সে ফেলে দিত। একজন অসহায় মা'কে আশ্বস্ত করার জন্যে জীবনের অন্য কোন কাজে লাগাতে না পারা আর্কানসাস নদী উত্তর অ্যারিজোনার আবহাওয়ার জ্ঞান সে কাজে লাগিয়েছিল।

স্বাধীনতার পাঞ্জাবী

অনুরাধা শর্মা পূজারী

গত তিনদিন ধরে বিষ্ণু শর্মার ঘরটিকে এক মৃদু আনন্দ প্রবাহ চঞ্চল করে রেখেছে। বিষ্ণু শর্মার পত্নী কমলা ঘরের এই আনন্দময় পরিবেশ বহুদিনের পরে দেখতে পাচ্ছে। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে পড়াশোনার সমাপ্তি ঘোষণা করতে বাধ্য হওয়া কোমলমতি কন্যা রাধাও এই কয়েকদিন বেশ হাসি হাসি মুখে ঘোরাফেলা করছে। সবচেয়ে বড় কথা বেশিরভাগ সময়ই দুর্বাসা হয়ে থাকা বিষ্ণু শর্মার মুখটিও আজকাল বেশ প্রসন্ন। গত তিন দিনে বিষ্ণু শর্মার হাবভাবই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কথাবার্তায় গম্ভীর, খবরটা শুনে খবর নিতে আসা গ্রামের মানুষদের সামনে চলাফেরাতেও এক ধরণের স্বদেশী স্বদেশী ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন। পিতার মতই রাধাও অনেকদিন পর আজ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রগতি শিল্পীসমাজের অনুষ্ঠানে রাধাকে ইতিমধ্যেই কোবাস প্র্যাকটিস কবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে। 'ও আমার আপনার দেশ' গানটা ভালভাবে অভ্যাস না করলে সবসময়েই ভুল হয়ে যায়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী আসার কথা আছে, ভুল হলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। প্রগতি শিল্পী সমাজের সেক্রেটারি প্রজ্ঞান গ্রামেরই ছেলে। সে এসে বলে গেছে গানটা নাকি রাধাকেই লিড করতে হবে। কমলাও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিষ্ণু শর্মাকে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে সম্মান জানানো হবে, খবরটা শোনার পর থেকেই গ্রামের মানুষ, আত্মীয়স্বজন এমনকি তাড়িয়ে দেওয়া চারটি মেয়ের জামাইগুলিও এসে খোঁজ খবর নিয়ে গেছে। প্রজ্ঞানের কথানুসারে সংবর্ধনার সঙ্গে দু'হাজার টাকাও নাকি সম্মাননা হিসেবে দেওয়া হবে। বিষ্ণু শর্মা তাই দীনু মহাজনের গোলাতে বাকির খাতার অঙ্ক বাড়াতে খুব একটা দ্বিধা করেন নি। মনে মনে হিসেব করে দেখেছেন, পাওয়া টাকাটা দিয়ে ধার শোধ করলেও হাতে আট শত টাকার মত বেঁচে যাবে। কিন্তু তাই বলে খবরটা পেয়ে তার ঘরে আসা গ্রামের মানুষগুলিকে এক কাপ চা না খাইয়ে, আত্মীয়স্বজনকে এক মুঠো ভাত না খাইয়ে কি ফিরিয়ে দেওয়া

যায়? জীবনটাই এভাবে জোড়াতালি দিয়ে অভাবের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে পার হয়ে গেল। বিষ্ণু শর্মার ষাট বছরের জীবনে একদিনের জন্যও কেউ মনে করিয়ে দেয়নি যে দেশের স্বাধীনতার জন্য তারও কিছু অবদান ছিল। বিষ্ণু শর্মার কথা বাদই, এই গ্রামেরই বিষ্ণু শর্মার জ্যাঠামশায়, যার অনুপ্রেরণায় ১৯৪২ সনে তিনি মাত্র বারো বছর বয়সে, জেঠামশায়ের সঙ্গে গিয়ে যোরহাট কাছারিতে পিকেটিং করে জাতীয় পতাকা ওড়াতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। মনে পড়ছে নাবালক বলে তাকে তিন দিন পরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল আর জ্যাঠামশায়ের তিন মাস হাজতবাস হয়েছিল। এই জ্যাঠামশায় কোন ধরণের স্বীকৃতি ছাড়াই মৃত্যুবরণ করেন। তাই বিষ্ণু শর্মা কোনদিনই ভাবতে পারেন নি যে তিনি তার কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন বা সম্মান পাবেন। গ্রামের আদর্শ বুনিয়াদী স্কুলে শিক্ষকতা করেই চারটি মেয়েকে মোটা ভাত কাপড়ে বিদায় করেছেন। অনিয়মিত বেতন, অবসরের পরে পেনশনহীন দিনগুলোর দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগের সময়েই সুখবরটা নিয়ে এল শিল্পী সমাজের সেক্রেটারি প্রজ্ঞান। স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্যের কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। একটা সময়ে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী আবেগপ্রবণ হয়ে তাম্রপত্র সরকারকে ফিরিয়ে দেবার পর স্বাধীনতা দিবসের উদ্‌যাপনের নিয়মগুলিও শিথিল হয়ে গেল। এ সমস্ত বিষয় নিয়ে ভাবার মত অবকাশ বিষ্ণু শর্মার কোনদিন জোটেনি। ফিরিয়ে দেবার মত কোন সরকারী প্রশংসা পত্রও বিষ্ণু শর্মা কোনদিন পাননি। কিন্তু আজকের দিনটির কথা আলাদা। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে হলেও গ্রামের ছেলেরা বিষ্ণু শর্মার অবদানকে স্বীকৃতি দিতে চলেছে শর্মার মেয়েরা বড় হওয়ার পর থেকে বাবাকে পাঁচ কথা শুনিয়ে এসেছে, তিনি নাকি এ যুগের মানুষ নন। নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে তিনি নাকি সর্বদা অন্যের উপকার করে এসেছেন। এবার অন্তত তিনি বলতে পারবেন পুরস্কারের জন্য মানুষকে হাতড়ে বেড়াতে হয় না, ভাল কাজ করলে পুরস্কারই মানুষকে খুঁজে নেয়।

বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। বিষ্ণু শর্মা এই কয়েকদিন পুরনো বইয়ের আলমারিটা থেকে শুধুমাত্র বই খুঁজে খুঁজে বের করেছেন আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ঢুকিয়ে রেখেছেন। কাঁচ ভাঙা আলমারিটা ঘুণে ধরে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। তার পাশ দিয়ে কমলাকে যেতে দেখে বললেন--'শুনছ টাকাটা পেলে একটা আলমারি বানাতে দিলে হয়। বইগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু বই আরশোলায় নষ্ট করে ফেলেছে। এখন থেকে সভাসমিতিতে তো আমাকে ডাকবেই, ভাষণ দিতে হলে ভালভাবে পড়াশোনা না করলে হবে?' কমলা কিছুসময় তার সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন চিন্তা করে বলল--'আমি কিন্তু অন্য কিছু ভাবছিলাম। বসার ঘরের চালের উপরে মাত্র দুটো টিন রয়েছে। শোবার ঘর এবং রান্না ঘরের চালে খড়ের বদলে টিন দিলেই ভাল হবে না কি? রান্নাবান্নার ভীষণ কষ্ট হয়। বৃষ্টি হলেই ঘর কাদা হয়ে যায়। শোয়ার ঘরের পালঙ্কটা সরিয়ে রাখার জায়গা নেই। যেদিকেই রাখা যাক না কেন সেদিকেই জল পড়ে। কাল রাতের বেলা তো আপনিই শুতে পারলেন না।' 'হবে হবে, ভেবে দেখতে হবে কি করা যায়। এক কাপ চা খাওয়াবে না কি?....না থাক, অসুবিধে হলে দরকার নেই।' বলে শর্মা পুনরায় বইয়ের পাতায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। টেবিলের উপর পড়ে থাকা, রাধার স্কুলের একটা পুরনো খাতার খালি পড়ে থাকা পৃষ্ঠায় আবোল তাবোল কি সব লিখতে লাগলেন। কমলা জানে এ সময়ে শর্মা এক কাপ চা পেলে খুশি হন। কিন্তু দীনু মহাজনের বাকি খাতার হিসেবটার কথা মনে পড়ে যেতেই শর্মার কেমন চা খাবার উৎসাহটা দপ করে নিভে যায়। কমলা মুখে কোন কথা না বলে শর্মার জন্য এক কাপ চা আনতে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ান। শর্মার কেমন যেন ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। শার্টটা পরতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কমলাকে শার্টটা আনতে বলার সাহস হল না।

এ কয়দিন শর্মা বাড়িতে গেঞ্জি পরেই আছেন। যদিও গেঞ্জিটিতে কয়েকটি ফুটো রয়েছে, তবু খুব একটা চিন্তা করেন নি। ঘরে আসা যাওয়া করা মানুষরা সবাই এ গ্রামেরই। এ কয়দিন পাঞ্জাবীটা কমলা পরতে দেয়নি পাঞ্জাবীটার জায়গায় জায়গায় ফেঁসে গেছে। কমলা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে হাত মেশিনে সেলাই করে ধুয়ে ট্রয়ে নিজের কাপড়চোপড় রাখা তোরঙটাতে রেখে দিয়েছে বেশি ছিঁড়ে গেলে সভায় যেতে পারবেন না চিন্তা করেই কমলাকে তিন দিন আগেই এ ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে টাকাটা পেলে প্রথমেই গিয়ে দুশো টাকা দিয়ে একটা ভাল পাঞ্জাবী নিয়ে আসবে বলে বলে রেখেছে। বিষ্ণু শর্মা শরীরটাকে গরম করে তোলার জন্যই পায়চারি করতে করতে ভাষণ মুখস্থ করতে লাগলেন পঞ্চাশ বছর আগের সেই তেজোদ্দীপ্ত সময়টাকে ফিরে পাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি চোখের সামনে বারবার জ্যেঠামশায়ের মুখচ্ছবিটা ভেসে উঠতে লাগল। বরহোলা, বাজারাহার, কচুখাত, বাঙ্গাজান, মরাণগাঁও ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা স্বেচ্ছাসেবকের দলগুলি, তিতাবর রেবেজিয়ার প্রধান শিবিরে সকালের জলপান সেরে যোরহাট কাছারি অভিমুখে শোভাযাত্রার দলটি নিয়ে যাবার সময় 'বন্দেমাতরম' শ্লোগান দেওয়ার সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলি মনে আসতেই বিষ্ণু শর্মার চোখে জল আসে কমলা চা নিয়ে আসতেই তিনি বাস্তবে ফিরে আসেন। স্টীলের গ্লাসটিতে চা নিয়ে কমলাকে আসতে দেখে তার মনটা এত প্রসন্ন হয়ে ওঠে যে তিনি কমলাকে বলেই ফেলেন- 'তুমি আমার মনটা কিভাবে বুঝতে পার।' আজ কয়েকদিন ধরে স্বামীর মুখে এ ধরণের কথা শুনে কমলার রীতিমত অস্বস্তি হচ্ছিল কমলা আজ ছাব্বিশ বছর ধরে স্বামীর মন বুঝেই সংসার চালিয়েছে স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারাটাই কমলার জীবনে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে এতদিন ধরে জেনে এসে আজ তিনদিন ধরে কথায় কথায় স্বামীর কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়াটা কমলার কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে বিষ্ণু শর্মার সামাজিক স্বীকৃতি চাইবার আগেই কমলাকে গার্হস্থ্য জীবনে স্বীকৃতি এনে দিয়েছে

সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বিষ্ণু শর্মার চিন্তা বেড়েই চলল। কোন কারণে যদি সভা স্থগিত হয়ে যায়? অল্প আগে প্রতিবেশী টংকেশ্বর বরার ছেলে জিতেন এসে বলে গেছে 'কাকু, ঠিক আটটার সময় আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য আমরা গাড়ি পাঠিয়ে দেব ' 'আমরা গ্রামের মানুষ, গাড়ির আবার কি প্রয়োজন?' শর্মা লজ্জিতভাবে বলে ওঠেন 'না কাকু, আপনাকে মঞ্চে বসতে হবে, মন্ত্রী আসবেন, এদিকে আর এ পরশু দিন স্বাধীনতা দিবস বর্জন করার জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে। আমাদেরও সংগঠন বলেছিল, তবে কয়েকজন বন্ধু ছিল ওদেরকে বোঝালাম, শহরে তো স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠান লেগেই আছে, আমাদেরও সুযোগ দাও। মন্ত্রী আসবে, আমাদের ক্লাবে কিছু সাহায্য করবে বলেও বলেছেন। গ্রামের উন্নতি হলে খারাপ কিসে? তখনই ওরা মেনে নিল। এখন দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। মন্ত্রীর জন্যে যথেষ্ট পুলিশ, মিলিটারি, সিকিউরিটি আসবে। মঞ্চে উপবিষ্ট লোকগুলিকে আগে চেকিং করা হবে। এমনকি সভা দেখতে আসা লোকগুলিকেও চেকিং করা হবে। আপনাকে না নিয়ে গেলে সিকিউরিটি মঞ্চে উঠতে দেবে না। রাধাকেও তাড়াতাড়ি যেতে বলবেন। আমরা শুরু করব 'বন্দেমাতরম' দিয়ে আর শেষ করব 'ও মোর আপনার দেশ' দিয়ে। ওকে ঠিক দুটোর সময় যেতে বলবেন।' জিতেন কথাগুলি বলে যাবার পর থেকেই কি এক অজানা আশঙ্কায় শর্মার বুকটা কেঁপে উঠতে লাগল। তিনি এ সমস্ত কথা ভাবেন নি। এতগুলি পুলিশ মিলিটারির মধ্যে তিনি কি পারবেন বলতে সেই শোভাযাত্রাটির কথা? জ্যেঠামশায়ের কথা? যোরহাট কাছারিতে হওয়া পিকেটিং-এর কথা? রাধা কালকে বলল,

সংগঠনের লোকদের সঙ্গে ক্লাবের ছেলেদের কিসের যেন ঝগড়া লেগেছে। মিটিং বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মিটিং বন্ধ হয়ে গেলে তার দু হাজার টাকা....বিষ্ণু শর্মা গত তিন দিন কি ভাষণ মুখস্থ করেছিলেন বেমালুম ভুলে গেলেন। তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলে উঠলেন--'হে ঈশ্বর, মিটিংটার যেন কোন ধরণের ক্ষয়ক্ষতি না হয়, আলফার ছেলেগুলিকে সুমতি দাও।'

মিটিং এ যাবার আর এক ঘন্টা সময় মাত্র হাতে আছে। যতই সময় হয়ে আসছে, শর্মার মনও ততই অশান্ত হয়ে পড়ছে। রাধা তাড়াতাড়ি ক্লাবে চলে গেছে। মাঝখানে একবার এসে মিটিং-এর খবরাখবর দিয়ে যাবার কথা। এখনও আসেনি। বৃষ্টিও কমেনি। এমন সময়ে রান্নাঘরে কিসের একটা শব্দ হল। শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে কমলার কাতরানির আওয়াজ ভেসে এল। শর্মা তাড়াহুড়ো করে দৌড়ে রান্নাঘরে উপস্থিত হয়ে মূর্চ্ছা যাবার অবস্থা হল। কমলা রান্নাঘরের মেঝেতে কাদার মাঝখানে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। ভাতের হাঁড়িটা একদিকে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। গরম ভাতের জলীয় উপাদান স্রোতের মত নিঃশব্দে কমলার দিকে এগিয়ে আসছে। শর্মা অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে প্রথমেই কমলাকে জিজ্ঞেস করলেন -'পুড়েছে নাকি? কোথায় পুড়েছে?' 'পোড়েনি, ভাতের মাড় গালতে গিয়েই মেঝেতে পিছলে গেলাম'. হাঁপাতে হাঁপাতে কমলা বলল। কমলার মাথা থেকে তখনও জল পড়ছে। শর্মা খড়ের চালটার দিকে তাকাল। কাক ঠোক্কর মেরে মেরে মাঝে মাঝে ছাউনিটা ফাঁকা করে ফেলেছে।

কমলার সারা শরীরে কাদা আর ভাতের মাড়ের চটচটে আঠা। শর্মা সঙ্গে সঙ্গে কমলার গায়ের কাপড়টা টেনে খুলে দিয়ে বলল, 'শুকনো কাপড় কোথায় আছে?' কমলা নিরুত্তর হয়ে থাকল। বিষ্ণু শর্মার ক্রোধে সারা শরীর কাঁপতে লাগল। মাইকে ইতিমধ্যে মিটিং-এর ঘোষণা শুরু হয়ে গেছে। ভাতটা খেয়ে যাবার আশাটাও বাদ দিতে হল। রাগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলছ না কেন, কাপড় কোথায় আছে?'

'নেই।' কমলা ধীরভাবে বললেন।

'নেই! কি নেই?'

ভাল কাপড়টা রাধাকে পরিয়ে পাঠিয়েছি ..

বিষ্ণু শর্মা ধপ করে কাদা মেঝেতেই বসে পড়লেন। কমলার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলেন না তিনি। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, 'আমার পাঞ্জাবীটা কোথায়?'

'আমার বাক্সে।'

বিষ্ণু শর্মা প্রায় দৌড়ে গিয়ে বাক্স খুলে পাঞ্জাবীটা এনে কমলার সামনে রেখে বললেন, 'এটা পরো....'

'আপনি সভায়....

'যাব না।'

কমলা পাঞ্জাবীটা হাতে নিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

কাঁদছ কেন। পাঞ্জাবীটা পরতে বলছি না। শর্মা উগ্রমূর্তি ধারণ করলেন।

বাইরে কয়েকটা ছেলে ডাকডাকি করতে লাগল। 'কাকু হয়েছে? দেরি হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি করুন।' কমলা নিষ্পলক দৃষ্টিতে শর্মার দিকে তাকিয়ে রইলেন। শর্মা সব শুনতে পেয়েও কোন উত্তর দিলেন না। কমলা ধীরে ধীরে কাপড়টা খুলতে লাগল।

কাকু.....

তোমরা যাও। আমি পরে আসছি....বিষ্ণু শর্মা ক্ষীণস্বরে ভেতর থেকে উত্তর দিলেন।

কাকু, মিটিং-এ গণ্ডগোল হতে পারে। সেজন্যই সময়টাকে এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। দেরি করবেন না। আমরা আসছি।

বিষ্ণু শর্মার মুখের দিকে তাকাতে সাহস হল না কমলার। হঠাৎ কমলা একটা আশ্চর্য ধরণের কাজ করে বসল। রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করে ভেতরে ঢুকে গেল। বিষ্ণু শর্মা বাইরে থেকে চিৎকার শুরু করে দিলেন, দরজা বন্ধ করছ কেন? কেউ নেই, কেউ দেখবে না....

ঠিক তখনই কমলা দরজাটা একটু ফাঁক করে পাঞ্জাবীটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বাইরে থেকে দরজাটা আটকে দিয়ে পাঞ্জাবীটা পরে মিটিং এ যান। জীবনটা সুযোগ হারাতে হারাতেই গেল.... মেয়েরা এমনি এমনি আপনাকে দেয়ে না, ঘরটার চারিদিকের দরজা বন্ধ করে যাবেন। চিন্তা করবেন না, আমি কাদা লাগা কাপড়টা ছেড়ে রেখেছি।'

মাইকে ভেসে এল বন্দেমাতরম।.....'ঐ যে রাধারা কোরাস শুরু করে দিয়েছে। মিটিং আরম্ভ হল।' কমলার কণ্ঠে কান্না।

বিষ্ণু শর্মা বিন্দুমাত্র দেরি করলেন না। পাঞ্জাবীটা পরে, রান্নাঘরের দরজাটা বাইরে থেকে ভাল করে বন্ধ করে রেখে দৌড়াতে শুরু করলেন। বিষ্ণু শর্মা কোনদিকে না তাকিয়েই দৌড়াচ্ছেন। দৌড়াতে দৌড়াতেই তিনি ভাবতে শুরু করলেন.....দুহাজার টাকার চেকটা পেলে তিনি কোথায় ভাঙাবেন, তার ব্যাঙ্কে কোন অ্যাকাউন্ট নেই...মিটিংটা কি কোন কারণে বন্ধ হয়ে যেতে পারে...রান্নাঘরেব ভেতরে যে তিনি রেখে এসেছেন উলঙ্গ স্ত্রীকে।

তাঁহাদের সমস্যা

অপূর্ব শর্মা

এটা প্রকৃতপক্ষে ভবত ফুকনেব গল্প। তাই একটা ভূমিকার প্রয়োজন।

হোটেল বরসুইতের 'বার' বাত একটার সময় বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভ্রান্ত হোটেল; নীতি-নিয়ম গ্রাহক বিচারে কঠোর। কিন্তু আমরা হোটেলের সম্মানীয় অতিথি, তাই আমাদের সম্মানে আর ভরত ফুকনের প্রভাবশালী উপস্থিতির জন্য 'বারে' কমে আসা গ্রাহকদের শেষে কয়েকজনের বিলম্বিত দীর্ঘায়িত বিদায়ের পরেও প্রায় এক ঘন্টা, বারোটা পর্যন্ত বার খোলা রাখা হল। ছোট শহরটির প্রাচীনতম ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক সংঘটির 'প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী' উৎসবে আগামীকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি একজন বিশিষ্ট অতিথি। আরক্ষীয় দুর্দান্ত প্রতাপী উচ্চ অফিসার, এক কালের বিখ্যাত জবরদস্ত ফুটবল খেলোয়াড় ভরত ফুকন এসেছে 'সারা আসাম ক্রীড়া সমারোহ' উদ্ঘাটন করার জন্য। উদ্যোক্তাদের আতিথেয়তার আতিশয্য থেকে মুক্ত হযে আমরা বিকেলবেলা বারে প্রবেশ করেছিলাম, ভরতের সঙ্গে যুবক ক্রীড়া সংগঠক প্রণব চৌধুরী।

বারোটা বাজতেই বার এর তীব্র আলোর লাইটগুলি জ্বলে উঠল। এটা বোধহয় আমাদের জন্য একটা অনতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল, কারণ আমরা ছাড়া তখন সেখানে আর কেউ ছিল না আর ম্যানেজারের সঙ্গে একজন বার-টেণ্ডারকে তখনও অপেক্ষা করতে হচ্ছিল।

—'ইশ্,বারোটা বাজে, যাওয়া যাক।' ভরত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল যেন এতক্ষণ বারের স্তিমিত আলোতে ঘড়িটা দেখতে না পাওয়ার জন্য বসে থাকতে হয়েছিল। 'ইশ্ অনেক রাত হয়ে গেল।' আমিও সামান্য উদ্বিগ্নতার সঙ্গে বলে উঠলাম। ভরত উঠল আর 'বার' এর ভেতরের বাঁশ এবং বেত দিয়ে তৈরী করা ইন্টেরিয়র ডিজাইনগুলির প্রশংসা করে বলল, 'বিউটিফুল। বড় সুন্দর কাজ।'

যাটের দশকের পুরনো রোলিং স্টোন কোমল স্বরে বাজছিল, বন্ধ হয়ে গেল; বোধহয় আরও একটা ইঙ্গিত। আমি আর প্রণব উঠলাম। বার ম্যানেজার এবার স্পষ্টভাবে রাতের বিদায় অভিনন্দন জানালেন।

আমরা হোটেলের লাউঞ্জে এলাম। যুবক ম্যানেজার শইকিয়া হেসে অভিবাদন জানালেন। তিনি সমস্ত কিছু সামলে সুমলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, ক্লান্ত মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের জন্য কিছু করতে পারি মহাশয়?'

—'অবশ্যই পারেন কী বলেন দাদা? ওয়ান ফর দি রোড! যুবক প্রণব মমতাহীন উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তাব দিল। দীর্ঘস্থায়ী সমস্ত আনন্দেই সব সময়ের মত আমার বিরক্তি জাগছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'রোড কোথায় হে?' কিন্তু প্রণবের উৎসাহ সহজে দমার মতো নয়, 'ফর দি লিফট?' তিনতলার ওপর যেতে হবে! কি বলেন ভরতদা?' সে ভরতের সমর্থন চাইল।

সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত, তবু ভরত প্রণবের প্রস্তাবেই সায় দিল। শইকিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার হাতে কিছু আছে নাকি শইকিয়া?'

—'নিশ্চয় স্যার। আপনারা লবিতে বসুন।' আমরা বসলাম। শইকিয়া লবির দরজা বন্ধ করে দিয়ে লিফটম্যানকে কাছে ডেকে কি যেন নির্দেশ দিল। আমি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। খোলাখুলি বললাম, 'ও সঙ্গে থাকলে এসবে একটু অসুবিধে আছে হে।'

ভরত একটা দুর্বল হাসি হাসলেন। তাঁর অবস্থাও খুব একটা স্বস্তিকর মনে হল না। কিন্তু গল্প এবং রসের নেশা, আর আমরা ইতিমধ্যে তো যাকে বলে, 'বসে গেছিই।' প্রণব আমাকে পরোক্ষে সাহস যোগানোর উদ্দেশ্যে বলল, 'বৌদি কোথায় আর আপনার সঙ্গে আছে দাদা। বিকেল থেকেই তো দেখছি, আপনি আমাদের সঙ্গে।' আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য আরও বলল, 'চিন্তা করবেন না, বৌদি ডিনার করে আ-রা-মে টিভি দেখছে।'

লিফটম্যান একটা ট্রে-তে আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীটুকু এনে সামনের টেবিলে রাখল। ভরত তার হাতে একটা নোট গুঁজে দিল আর ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শইকিয়া, একে পাঠিয়ে দাও, আর তুমিও চলে যাও; আমাদের ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করে নেব।' হোটেলের বিনম্র আতিথ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়ে দ্রুতকণ্ঠে শইকিয়া বললেন, 'না স্যার, অসুবিধে হবে না স্যার, আমরা আছি। রাতে আপনাদের ওপরে যেতে অসুবিধে হবে।' শইকিয়ার কথায় প্রায় একটা খোলাখুলি ইঙ্গিত ছিল নাকি!

ভরত বলল, 'কোন কথা নেই। তোমরা যাও। শোন, আমরা সকাল পাঁচটায় সোজা এখান থেকে উঠে একপাক মর্ণিং ওয়াক করে পাঁচ তলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে সক্ষম মানুষ, বুঝেছ? এবার যাও।' ভরত তাদের চূড়ান্তভাবে বিদায় জানাল। আমি তার কথায় একমত হতে পারলাম না, ভয়ও পেলাম, এই সেশানটা সকাল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে নাকি!'

আমার গেলাসটা ঠোঁটের সামনে নিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভরত বলল, 'এই ছেলেটির মুখটা দেখে আমার অন্য একজন মানুষের কথা মনে পড়ছে। আমার বন্ধু। দাঁড়ান, দাঁড়ান, বড় ইন্টারেস্টিং গল্প। দাদা, শুনুন।' আমি গল্পের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিরুৎসাহ করার জন্য বললাম, 'ভরত তোমার বিষয়ে শোনা অজস্র গল্পে আমার একটুও সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমার নিজের মুখে বলা গল্প যখন, কিছুটা নুন মেখে নেবার বোধহয় প্রয়োজন হবে।'

ভরতকে সামান্য আহত হওয়া মনে হল। সে কিছুটা গহীন সুরে একটা তত্ত্ব পরিবেশন করার মতো করে বলল, 'দাদা, গল্প বানানোতে, গল্প শোনায় আর প্রতিটি শোনা গল্পে নিজের দিক থেকে একটুকরো লেজ জুড়ে দেওয়াতে আমার জুড়ি নেই। আমার বিষয়ে গল্পগুলির নব্বইভাগ আপনি বিশ্বাস করবেন না। আর আমাদের তিলকে তাল বানানো কাগজগুলির জুড়ি নেই। আমার বিষয়ে গল্পগুলির নব্বইভাগ আপনি বিশ্বাস করবেন না। আর আমাদের তিলকে তাল বানানো কাগজগুলির তো আমি অতি ফেবারিট হুইপিং বয়, আপনারা তা জানেনই।' আমি তাকে খুশি করার জন্য তাড়াতাড়ি করে বললাম, 'এ কাগজগুলির কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু সেবার যে আমার ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের ওপর লেখা একটা নাটক তিনসুকিয়ার ডি.সি-র কাছে বাসে পাঠানোর সময় হারিয়ে গিয়েছিল, তুমি বাসটা ধরার জন্য সমস্ত শহরে 'নাকাবন্দী' লাগিয়েছিলে, না? পরে সুপার এক্সপ্রেস বাসটা ধরে ড্রাইভারকে আধঘন্টা 'মেনরোডে' হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রেখেছিলে।

'ঐ যে দেখুন। ট্রাফিকের একটা সিপাহী। বাসটাকে ধরে ড্রাইভারটিকে মাত্র দুটো চড় মেরেছিল। দেখেছেন মানুষের কথা, ভরত উৎসাহ ফিরে পেয়েছে। আমি বল্লাম, তাতেই বুঝে নিন। মেনরোডে দিন দুপুরে ভর্তি সুপার এক্সপ্রেস বাসের ড্রাইভারকে নামিয়ে যেখানে ট্রাফিকের সামান্য একটা সিপাহী দুটো চড় কষিয়ে দিতে পারে সেখানে জেলার পুলিশ সাহেবের প্রতাপ কি মারাত্মক হতে পারে।

ভরত আমার দিকে আড়চোখে তাকাল। তাঁর মুখে সলাজ আত্মতৃপ্তি। বলল, দাদা আমার একটা গল্প কোনভাবে আপনার হাতে পড়লে আপনি যে কী ফাটাফাটি একটা মুম্বাই সিনেমা বানিয়ে দেবেন, যেটায় মুম্বাইওয়ালাদেরও আপনাকে সেলাম ঠুকতে হবে। বিশ্বাস করুন। .... এদিকে দেখি, আরও একটা পেগ নিন।'

'একেবারে ছোট একটা দেবে।' আমি গ্লাসটা তার দিকে এগিয়ে দিলাম। জায়গাটা ছিল শহরের একটা নির্জন, শান্ত আর সভ্য পাড়া। যদিও পাড়ার মধ্যের পাকা রাস্তাটা শহরের এক মাথায় কিছু দূরে অবস্থিত কলেজ পর্যন্ত আর তারও ঐদিকে শহর ঘেঁষা গ্রাম পর্যন্ত এগিয়ে গেছে, অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজের পরিচিত ব্যস্ততার সময়টুকুতে মানুষের আসা যাওয়ার বাইরে এখানে শহরের উপদ্রব ছিল না। সাইকেল রিক্সা পথচারীর আধিপত্যকে অনেক সময় পরে পরে কেবল দুই-একটা ছোট মোটরগাড়ি দুর্বল প্রত্যাখ্যান জানিয়েছিল। আজকের বাইক বলে পরিচিত সন্ত্রাসী দ্বিচক্রযান তখন এখানে অপরিচিত ছিল। সাপ্তাহিকে মুচি, মাথায় পণ্য নিয়ে কোন অনিয়মিত ফেরিওয়ালা, কখনও কখনও ছোট দা ধার দেওয়া অথবা কুয়ো কাটানোর অপরিচিত মিস্ত্রিও এই নিরুপদ্রব বস্তির ভেতরের লোক হয়ে পড়েছিল। শহরের মূল রাস্তা থেকে বস্তিটার ভেতরে প্রবেশ করার সময় পথের দুপাশে ছিলেন এক সময় জজেও সমীহ করা দুর্জয় তীক্ষ্ণধী অন্নদা উকিল আর তার ভাই ভাইপোর দুটো গভীর ধরণের অসমীয়া ঘর। একটু দূরে আর একটু ভেতরে ভাটির থেকে এসে বসা ঠাণ্ডা প্রকৃতির ব্যবসায়ী অসমীয়া মানুষের বাড়ি। আরও কিছু এগিয়ে গেলে বাঁদিকে সাপ্লাই ইনস্পেক্টার বরুয়ার পরিবার আর ডানদিকে বস্তির জনপ্রিয় মধুরভাষিণী কাজের মেয়ে ভান্টির পিতা ধরণী হাজারিকার ঘর। তারপরেই নতুনত্বের অহংকার আর অনাত্মীয় অসহজতায় বস্তির একমাত্র কংক্রিটের একতলা বাড়িটা ধীরেন হাকিমের ছেলে ডি.এস.পি ডালিম বরুয়ার আর সেটার প্রায় মুখোমুখি—বস্তির একমাত্র—কুমুদদার দোকান। কুমুদদা শান্ত প্রকৃতির মানুষ, সিভিল হাসপাতালের কেরানি, কিন্তু কীভাবে তার মাথায় ঢুকল, তিনি আরম্ভ করলেন মুদির দোকানের সঙ্গে বয়ামে লজেন্স-ট্রফি-

বিস্কুট আর চুলের ফিতে, ক্লিপ, সেফটি পিন, হুক-বোতাম-সূঁচ-গুলি, তানসেন শশী মালতীর একটা ছোট দোকান, যা দুপুরবেলায় সবসময় বন্ধ থাকে। তারপর বিপরীত দিকের ঘরটিতে একটা ভাড়াটিয়া পরিবার আর তাদের কাছেব খালি জমিটিতে থাকে বাড়ির মালিকের একটা ভেঙে খসে পড়া বাসগাড়ি, বস্তির শিশুরা তাতে উঠে মুখ দিয়ে শব্দ করে স্টিয়ারিংটা ঘোরায আর পেছন দিক থেকে রশি টেনে হেল্পারের ঘন্টিটা বাজায়। বিপরীত দিকে বস্তির ছোট নামঘরটা, যেখানে ভাদ্র মাসে মহিলারা নামগান করে। তার পেছনের ঘরগুলি যথাক্রমে নলিনী সেরেস্তাদারের, উইণ্ডিং কাজ করা, বিপত্নীক দাসের, বরগোহাঞি রেঞ্জারেব। কিন্তু তার থেকে আগে যাকে বলে নানা ধরণেব মিশ্রিত লোকেরা বাস করে, বস্তির ঘনত্ব সেই দিকটায় ক্রমশ কমে এসেছে, পথের দুপাশে সরকারী বিভাগে ছোটখাটো কাজ করা কর্মচারীদেব একটা মেস, একটা লণ্ড্রি, একটা তাম্বুল পানের গুমটি ঘব ইত্যাদি হিসেবের বাইরে নানা রকম ঘরের লাইন লেগে গেছে। সমস্ত বস্তির ঘরগুলির ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে ছিল পতিত জমি, ফাঁকা ফাঁকা জায়গায় অবস্থিত ঘরগুলি পেয়েছিল স্বস্তি এবং আরামের নিঃশ্বাস। বস্তির একপাশে ছিল একটা গর্ত আর গর্তের ওপারে প্রশস্ত মাঠ যেখান থেকে বস্তিতে আসত প্রয়োজন থেকেও বেশি প্রাণদায়িনী বাতাস।

এটা বস্তির চার দশক আগেব রঙ চটা বিবর্ণ পুরনো ছবি। আজ এই বস্তিটা আপনি এখানে খুঁজে পাবেন না। এর মধ্যে এই চাব দশকে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু সোৎসাহ প্রজনন আর প্রজননের প্রভাবে অস্বাভাবিক গতিতে মানুষ বাড়ল। কেউ প্রথমে ধবতে না পারার মত বস্তিতে খালি পড়ে থাকা খালি জায়গাগুলি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল, সেগুলি প্রথমে ইট-বালির স্তূপ থেকে ক্রমে ক্রমে বাড়ি ঘর হয়ে বস্তিটা ভবে গেল। কত রকমের বাড়ি, যে যেখানে সুবিধে পেয়েছে কোন রকমে একটা ঘর তৈরী করে নিয়েছে, বেশীরভাগই অপরিচিত কুশ্রী নতুন কংক্রিটের রকমারী চেহারাব বাড়ি, নিকৃষ্ট আকর্ষণহীন অহংকাবী বিশাল বিশাল দোতলা ঘর। অনেকেই আগেব থেকে থাকা ঘবেব পাশে একটা ছোট্ট দেখে ভাড়া ঘর বানিয়ে নিযেছে। কোথাও পরিবার ভেঙে একটাব জাযগায় তিনটে ঘর হয়েছে। কেউ আবার পেছনের জমিটা অপ্রয়োজনীয় ভেবে বিক্রি কবে দিয়েছে, যেখানে দ্রুত আর একটা ছোট বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য, পেছনের মাঠটায় কখন, কে কীভাবে অনেকের অজান্তেই একটা রাস্তা বের করেছে আর সেখানে এখন মাঠটা অদৃশ্য হয়ে উঁচু উঁচু ঘরের সারি জ্বলজ্বল করছে। অন্যের কথা বাদ দিন, আগের সেই গভীর গর্তটাই নেই। এখন তাব চারপাশে একটা প্রকাণ্ড দেওয়ালের সতর্ক অধিকার। বস্তির আগের পুরনো ঘরগুলিরও চেহারার পরিবর্তন হয়ে গেছে। এক ধরণের দুর্বল প্রতিযোগিতায় নতুন এবং আধুনিক হওয়ার চেষ্টায় কেউ কেউ গ্রিল লাগিয়েছে, কারো ঘরের দবজা-জানালাব নক্সা বদল হয়েছে, কোন বাড়ির সামনে বা উপরেরটা, নাহলে সামনেরই কিছুটা পাকা করে একটা নতুনত্বের ছাপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। শেষপর্যন্ত এখন পুরনো গ্রামের ধারণাই অন্য পণ্যের প্রসার এবং মধ্যবিত্তের বর্দ্ধিত ভোগ-স্পৃহার আগ্রহী বাজার আবাসিক অঞ্চল এই বস্তির মুখটি আবৃত করে ফেলেছে। পা বাড়ালেই বাজার, কারণ অনেকগুলি বাড়ির সামনে, সামনের উঠোন উঠিয়ে দিয়ে ছোট ছোট দোকানঘর বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। কুমুদদার পুরনো দোকানঘরটার প্রতিদ্বন্দ্বী আরও দুটি নতুন মুদির ঝকঝকে দোকান, ভিডিও পার্লার, পান-সিগারেট-তামোল, আরও কত সব। পথে যাতায়াত বেড়েছে, বেড়েছে ব্যস্ততা, অসাবধান বেপরোয়া রিক্সাচালক, সঘন এবং নিয়মিত ছোট গাড়িগুলি, উদ্ধত উদ্দাম দু-চাকার যানবাহন— প্রত্যেকেই ব্যস্ত। প্রত্যেকেরই দৌড়াদৌড়ি, প্রত্যেকেরই তাড়াতাড়ি করে গন্তব্যস্থলে যেতে হবে, তাই

অন্যের সুবিধে অসুবিধে না দেখে বাতাসে সাবধানতার বাণী ছড়িয়ে দিয়ে, যেখানে সেখানে ঠেলেঠুলে এঁকেবেঁকে উর্দ্ধশ্বাসে সব ছুটে চলেছে। বস্তিটাতে এত পরিবর্তন এসেছে যে অবাক হতে হয়: মানুষের চেহারা পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আগের বুড়ো মানুষগুলি আর নেই, নতুন করে বস্তিতে আর কোন মানুষ বুড়ো হয়নি। অবসরপ্রাপ্ত মানুষগুলি নতুন যৌবন লাভ করে ঘোরাফেরা, বাজাবটাজার, সভাসমিতি করে বেড়াচ্ছে, সাময়িকভাবে বার্দ্ধক্যকে ঠেকিয়ে রেখেছে। ছেলেমেয়েদের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, প্রত্যেকেই আজকাল সুন্দর দেখতে, অসুন্দর ছেলেমেয়ে আজকাল দুর্লভ হযে উঠেছে। তাদের আনন্দের উৎস আব প্রকাশের ভঙ্গীরও পরিবর্তন হয়েছে। তাদের মুখের ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে, ছোট থেকে বড় পর্যন্ত তারা এক বেপরোয়া শক্তিশালী ভাষা বলতে শুরু করেছে। পরিবার-পরিজন, সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে তাদের নিজের হিসেবে করা নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

বস্তির এই নতুন দৃশ্যপটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে একদিন এই নতুন জীবনপ্রবাহের জন্য অপরিহার্য একটা পি.সি.ও তথা ভিডিও পার্লার বস্তির মাঝখানে পথের পাশে গড়ে উঠেছে। বঙিন গ্লাস, ঠেলা দরজায় লাগানো আকর্ষণীয় সগর্ব চেহাবার পি সি আর এর সঙ্গে প্রশস্ত সুসজ্জিত রুমে ভিডিও-অডিও ক্যাসেটের ছড়াছড়ি। এই পিসিও-ভিডিও পার্লারের শুরু বস্তির বুকের এক ইতিহাসের সমাপ্তি। হয়তো, বলা যায় না, ভবিষ্যতের ইতিহাসের শুরু। কিন্তু বস্তির পরিবর্তিত স্মার্ট চেহাবার আড়ালে তার আসল খসে পড়া রূপটি একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে।

এতখানি পর্যন্ত আসার পরেও আপনি যখন গল্পটি পড়া ছেড়ে দেন নি, বইটা সামনের ছোট টেবিলটায় পুঞ্জীভূত বিরক্তির সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বস্তিব জন্য আকাশের দিকে তাকান নি বা সামনেব পথে বেরিয়ে যান নি, অনুমান করা যেতে পারে আপনি আর একটু এগোবেন। কিন্তু বাইরে এখনও একটু একটু ঠাণ্ডা রয়েছে। দুই একটা স্ট্রে মশা আসতে শুরু করেছে। তাই, ভেতরে চলুন, দরজাটা বন্ধ করে দিন, জানালাগুলি বন্ধ করে পর্দাগুলি টেনে দিন। আপনার প্রিয় আরাম চেয়ারটাতে বসুন। কিন্তু আপনাকে কৌতূহলোদ্দীপক বলে মনে হলেও বস্তির ইতিহাস নিয়ে এই গল্পটা নয়, গল্পটা ইতিহাসের শেষটুকুকে নিয়ে।

যেমন, প্রথমেই মনে করুন ভারত কলিতা। ভাবত কলিতা ভাটির দিক থেকে এসেছিল ভাত রান্না করার ছেলে হিসেবে। কয়েকবছব পরে ঘরেব মালিক যুবক ভারতকে নিয়ে শহরের চক-বাজারে অবস্থিত তাদের মুদিব দোকানে রেখে এল। এখানে এসে ধীরে ধীরে ভারতের চোখ, মন আর মগজ খুলে গেল। সে ভাবতে আর স্বপ্ন দেখতে শুরু করল, ভারত স্বাধীন হতে চাইল। সময়ে মনের জোর, পরিশ্রম আর বুদ্ধি খাটিয়ে ভারত তখনকার অন্ধকার এই শহরের একমাথায় এই বস্তিতে নিজে একটা ছোট মুদিব দোকান খুলে বসল। সরল, শান্ত কিন্তু হিসেবী ভারত দোকানের শ্রীবৃদ্ধি, পরিবারের বৃদ্ধি, বয়স-বুদ্ধির বৃদ্ধির মাধ্যমে একদিন সকলেরই প্রিয় কলিতা মহাজনরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

কিন্তু কলিতা মহাজন একদিন হতাশ হয়ে আবিষ্কার করলেন যে তাঁর নতুন করে কলেজে পড়া একমাত্র পুত্র নবীন কলিতার দোকানটার প্রতি আকর্ষণ কমে এসেছে। সে গদিতে বসতে লজ্জা বোধ করে। দোকান বা দোকানীর প্রতি তার অবজ্ঞা নেই, কিন্তু কলেজে গিয়ে সে অন্য এক জগতের স্বাদ পেয়েছে, সেটা নবীনের জগত। সে সেখানে প্রবেশ করার রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে, কারণ তার সঙ্গের বন্ধুদের সেই জগতটিতেই ঘোরাফেরা, শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, বেড়ানো এবং বিশ্রাম। মুদির

দোকানের মাধ্যমে সেখানে প্রবেশ করা যায় না। ভারত কলিতা এখন কি করে! তার আশা ছিল, আশা নয়, নিঃসংশয় বিশ্বাস ছিল যে কলেজ থেকে বেরিয়ে তার ছেলে তার গদিতে বসবে। সে হিসেব করে রেখেছিল যে ক্রমশ ব্যবসা বাড়িয়ে সে-ও তার পুরনো মহাজনের মত প্রথম একটা বাসগাড়ি কিনবে আব বাপ-ছেলে মিলে শহরটা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দোকান আর গাড়ির ব্যবসাও বাড়িয়ে যেতে পারবে। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল যে গাড়ি আর মুদির দোকানের চাহিদা কমবে না আর নবীনকে পাশে পেলে সে অনায়াসে পারবে।

কিন্তু এখন দেখা গেল নবীনের গদিতে বসার আগ্রহ নেই, তার ইচ্ছে বাবু হয়ে চেয়ারে বসে চাকরি করবে। ভারত কলিতা শান্ত মানুষ, সে ভেতরে ভেতরে একটা ধাক্কা খেল। কিন্তু ছেলেকে সে-ই কলেজে পাঠিয়েছে, শিক্ষিত বানিয়েছে আর শিক্ষিত করে তার মনে বাবুর ধারণা ঢুকিয়েছে। তার ছেলে মানুষের আণ্ডারে চাকরি করবে, সে গদির মূল্য বুঝতে চায় না—এ কথাটা তার মনে আঘাত দিল। কিন্তু উপায় কী? তার পরিচিত একজন হাকিমকে আর তার দীর্ঘদিনের গ্রাহক বন্ধু বড় সাহেবের অফিসে বড়বাবু বর্মণকে ধরাধরি করে একরকম আক্ষেপের সঙ্গেই ছেলেকে কাছারিতে কেরানির কাজে ঢুকিয়ে দিল। তারপর তিনি দ্রুত মেয়ে দুটিকে বিয়ে দিল আর নবীনের জন্য বৌ নিয়ে এল। সংসারের দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়ে তিনি সম্পর্কিত ভাইপো একজনকে দোকানে বসিয়ে দোকান চালাতে লাগল। সে প্রতিদিন খেয়ে দেয়ে উঠে বিকালে দোকানে গিয়ে বসে আর সন্ধের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতভাবে বস্তির নামঘরে যেতে শুরু করল।

এবার নবীন কলিতার খবর নেওয়া যেতে পারে। সময় পরিবর্তিত হয়েছে, সে পরিবর্তিত সময়ের সন্তান। তাই এই সময়ের পরিবর্তনে সে খুবই সক্রিয়। শুরুর কয়েকবছর পরে সময়ের, বাস্তবের, চারপাশের পৃথিবীর বিষয়ে যখন তার ধারণা স্পষ্ট হল, সে যথেষ্ট সক্রিয়তার সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ টেবিলে জ্যেষ্ঠ কেরানি রূপে নিজেকে মানিয়ে নিল। সে কথাবার্তা কম বলে, হাত আস্তে ধীরে নাড়ায়, টেবিলের ফাইলগুলি ধীরে সুস্থে সরায়। যথেষ্ট পুরুষার্থ আর সাংসারিক সক্রিয়তায় সে তিনটি মেয়ের পিতৃত্ব অর্জন করে। সেখানেই না থেমে পুৎ নামে নরক থেকে উদ্ধার পাবার আশায় চতুর্থবার সগৌরবে একটি পুত্রসন্তানের জন্মদান করে। সে সুখী এবং সফল হয়েছে বলে মনে করল আর পুত্রের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য সক্রিয় হল। শহরের চকবাজারটা আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় নতুন তৈরী বাজারে সে পৌরসভার সভাপতির মাধ্যমে ছেলের নামে একটা ঘর নিয়ে রাখল। এর মধ্যেই বস্তিতে আরও দুটো মুদির দোকান বসেছিল, সে বাড়ির সামনে থাকা তাদের দোকানটা চকবাজারে উঠিয়ে নিয়ে এল। সে প্রথমে পুরনো দোকানঘরটা ভেঙে ফেলল। বস্তিতে তখন একের পর এক নতুন করে পাকা বাড়ি উঠতে শুরু করেছিল। সে-ও দোকানঘরটা ভেঙে পুরনো বসবাস করা ঘরটার সঙ্গে মিলিয়ে একটা প্রকাণ্ড অবিনয়ী দালানঘর বানিয়ে ফেলল। সহকারী নাজিরের পদে উন্নীত হওয়ার পরে সে জাঁকজমকের সঙ্গে একজন একজন করে তিনটি মেয়ের বিয়ে দিল। তার বাড়ির বিয়েতে টিপটিপ লাইট জ্বলল, উর্দিপরা ব্যাণ্ড পার্টি এলো, আতসবাজি পুড়ল। এরপর সে বাবার আমলের দোকান বেচে দিয়ে একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি নিল, অন্নদা উকিল আর ধীরেন হাকিমের পরে বস্তিতে তৃতীয় গাড়িটা এল। শহরের উন্নয়নশীল দিকটাতে সে দুই বিঘা জমি রেখে দিল।

ইতিমধ্যে সবার অজান্তেই বস্তিটা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। নিজের নিজের ক্ষুদ্র অবস্থানে প্রত্যেকেই বস্তিটাকে নতুন করে গড়ে তুলছিল। কেউ জানতই না যে তারা কোন জিনিসের পরিবর্তন

ঘটাচ্ছে বা পরিবর্তিত হওয়া বস্তির নতুন রূপের সঙ্গে মিলে মিশে থাকার মত করে নিজেও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কেউ বুঝতেই পারছিল না যে তারা পরিবর্তিত হয়েছে। আর সবার অগোচরে ইতিমধ্যে নবীন কলিতার পুত্র রূপম কলিতা কলেজে ঢোকে।

জিনস্, বুকে ঘোষণা সম্বলিত টি-শার্ট, চোখে রঙিন চশমা, গলায় সোনার চেন, ঠোঁটে সিগারেট, হাতে ব্রেসলেট, পায়ে ডিজাইন শু। তার মুখে তার পরিচয়ের বিজ্ঞপ্তি, তার দেহে চঞ্চল যৌবনের ভাষা। রূপম সহকারী নাজিরের ছেলে, সে আর কলিতা মহাজনের নাতি নয়। কারণ সেই পরিচয় জানার মত লোক আজ আর কেউ বেঁচে নেই। যে দু-একজন আছে তারা ঘরের বারান্দার চিরস্থায়ী চেয়ারে বসে অচল হয়ে পড়েছে। রূপম তার অর্বাচীন পরিচয়েই সহজ। সে তরতাজা ও চঞ্চল। আর সে সঙ্গে পেয়েছে সমবয়সী একদল ছেলেকে। কথাবার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-অভ্যেস, খাদ্য-পানীয়, বাইক-স্কুটার ইত্যাদির মিল, চিন্তা-চর্চা, গভীরতা ইত্যাদির অভাবের মিল, কর্তব্য দায়িত্ব-লক্ষ্য ইত্যাদির বিষয়ের সুখের অজ্ঞতার মিল ছাপিয়ে কেবল আনন্দ উচ্ছ্বাস উন্মাদনার প্রাবল্যের মিল। আশ্চর্য, কীভাবে তারা একজন আর একজনকে সহজে আবিষ্কার করে ফেলে আর সময় নষ্ট না করে আপন হয়ে পড়ে। তাদের কথা-কাজ-ভাব-স্বপ্নে তৈরী করে একটা শূন্যে ঝুলে থাকা আনন্দময় জগত যেখানে নিশ্চিন্ত নির্বিকার হয়ে তারা বাস করে। তারা একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে, অন্যেরা তাদেরকে তাদের পরিবেশের সঙ্গে অস্বস্তিসহ গ্রহণ করে। কলেজে, রেস্তোঁরায়, খেলার মাঠে, সঙ্গীতানুষ্ঠানে, বস্তির আড্ডায় বা ক্লাবের বারান্দায় তারা সরবে উপস্থিত থাকে। এই দলটির মধ্যে প্রতিষ্ঠা সাব্যস্ত করার জন্য অন্যান্যবারের মত রূপম সচেষ্ট ছিল। তাই কলেজের নির্বাচন আসার সঙ্গে সঙ্গে সে ঠিক করল সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সে বিষয়ে চিন্তা-চর্চা চলতে লাগল। পবামর্শদাতা, উপদেষ্টা আর কৌশল রচয়িতার অভাব হল না। পিতা নবীন কলিতা কিছু সংশয় সত্ত্বেও মেনে নিল যে তাদের সময়ের কলেজ আর নেই, সময় পরিবর্তিত হয়েছে, এখন নিজে কিছু একটা হয়ে না দেখাতে পারলে অন্যেরা সম্মান করে না। সে পুত্রের নির্বাচনে খরচ দিতে কোন আপত্তি করল না।

সত্যি সত্যিই নির্বাচনে কলেজের কোন এক সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পবে রূপম আমূল বদলে গেল। মিটিং ফাংশন, ডেপুটেশন, প্রসেশন, ধর্ণা, গণ অবস্থান, আরও কত বেহিসেবী কাজ, সময়হীন পরিশ্রম। তার একটা বাইকের খুব প্রয়োজন হল আর সে সম্পর্কে সে বাড়িতে প্রস্তাব উত্থাপন করল।

নবীন কলিতা পরিবর্তন দেখেছে। সে নিজেও পরিবর্তনের সহযোগী। প্রথমে চোখ বুজে আর এখন চোখ মেলে পরিবর্তনের স্রোতে সে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে, দুহাতে তার সুবিধে নিচ্ছে। কিন্তু ছেলেদের দেখে সে অস্বস্তিবোধ করে। ওদের বাছবিচার কম, অনবরত উড়ে বেড়াতে হয়। ছেলেরা গুরুজনদের কথাবার্তা না শোনা, উৎপাত করে বাইক চালানো, মা-বাবার এই বাইক কিনে দেওয়া নবীন কলিতা পছন্দ করে না, এই আপত্তি সে নিজেও বিরক্তির সঙ্গে কয়েকদিন প্রকাশ করেছে। সে সংকটে পড়ল। কিন্তু সে ছেলের দায়িত্ব আর কর্মব্যস্ততা দেখে, তার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ধরতে পেরেছে। সে ভাবল, ছেলের প্রস্তাবে যে একেবারেই যুক্তি নেই তা কিন্তু নয়। বড় সমস্যা, সে মনে মনেই বলল আর ছেলেকে বাইক এর জন্য পয়সা বের করে দিল।.

আপনি শরীর জুড়ে আড়মোড়া ভাঙছেন। আপনার মুখে হাসির একচিলতে আভাস। কারণ গল্পের লাইনটা আপনি ধরতে পেরেছেন, আর কোনদিকে কতটুকু পর্যন্ত এগোবে বুঝতে পেরে

সামান্য হতাশ হয়েছেন। মনে করা যেতে পারে, আপনি আর বেশি এগোবেন না, আলোচনা সমাপ্ত করে টিভির সামনে গিয়ে বসবেন, কিন্তু দাঁড়ান, এর পরের অংশটুকু সংক্ষিপ্ত।

রূপম একাধিক মেয়ের সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়ল। এ সমস্ত ঘটনা থেকে তো রেহাই পাওয়া যায় না, অবশ্যম্ভাবী। ফলস্বরূপ তাকে সিনেমা, রেস্তোবা, পার্ক, পিকনিক ইত্যাদিতে আগের চেয়ে বেশি সময় কাটাতে হল। সে দুবাব করে পরীক্ষায খারাপ করল। প্রেমে বিফল হল, প্রেমিকারা কনে হয়ে বিয়েতে বসল বা কোথাও চলে গেল। কলেজে চিরকাল কেউ থাকে না। দিনগুলি ভাল থেকে খারাপের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ খারাপের দিকে এভাবে বাঁক নেবে কেউ ভাবে নি। কাছারির টাকার হিসেব নিকেশের কেলেঙ্কারীতে নবীন কলিতাকে চাকরি থেকে সাসপেনশন করা হল। ব্যাপারটা খুব আস্তে আস্তে ফিসফাস খবর হয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে ড্রয়িংরুমে ছড়িয়ে পড়ল। তখনকাব নীরস খবরের কাগজ এসমস্ত খবরে কোনরকম মশলার গন্ধ পেত না। তাই বস্তির প্রথম কেলেঙ্কাবিটা বস্তির মানুষের কান দিয়ে ঢুকে মনের মধ্যেই ধীরে ধীরে চাপা পড়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই কলিতাকে ধুতি পাঞ্জাবী পরে নিজের পুরনো গাম্ভীর্য নিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়াতে দেখা গেল, মানুষের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গেল। কুমুদদার দোকানে বিকেলের আড্ডায় যোগ দিতে লাগল। কয়েকদিনের মধ্যে বস্তির উপব দিয়ে আরেকটা কেলেঙ্কারি এত জোরে বয়ে গেল যে নবীন কলিতা কিছুটা স্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। বস্তির মোড়ে বসবাস করা বরগোঁহাঞি বেঞ্জাবেব ভাড়াঘরে থাকা স্কুল শিক্ষক মোহন নাথের স্ত্রী ছেলে-মেয়ে দুটি ফেলে রেখে পাশের ঘরের ভাডাটিযা যুবক ঠিকাদারের সঙ্গে পালিয়ে গেল। এটা একটা অবিশ্বাস্য খবর, কিন্তু তার ঢেউ সবাই বুঝতে পারল। বিকেলের দিকে কুমুদদাব দোকানে গম্ভীবভাবে বসে বস্তিব বয়স্ক লোক হিসেবে নিরুপায আক্ষেপেব সুরে কলিতা বলল, 'ইশ্ মহা সমোস্যা! ....কি দিনকাল এল!'

দিন সত্যি সত্যিই ক্রমশ খারাপ হয়ে আসছিল। রূপম পরীক্ষা দেবে না। চাকবি করবে না- —অবশ্য এসবের একটাতেও সে কিছু করতে পারবে বলে কলিতা কোনরকম আশা দেখছিল না। সে সকাল-বিকেল বাইক নিয়ে বেরিয়ে যায়, দেরি করে ভাত খায়, বাতে দেবী কবে ঘরে ফেরে। ঘবেব মধ্যে একটা অস্বস্তি চলতে থাকে। একদিন সে হঠাৎ ঘোষণা করল যে সে ব্যবসা করবে, তাব টাকার প্রয়োজন, আর এই বলে সে ভয় দেখাল যে তাব কথা না শুনলে সে জঙ্গলে চলে যাবে। এই ঘোষণাই ঘরটিকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। তাব সঙ্গের দুটি ছেলে ইতিমধ্যেই অদৃশ্য হয়েছে। গোপনীয় সূত্রের খবর যে তারা 'জঙ্গলে' গেছে। নবীন কলিতাব সুখের শৈশবকাল নগরেই কেটেছে, যৌবনে বড় সাহেবের অফিসে বাবু হয়ে সে পুরোপুরি নাগরিক হযে উঠেছে। সে 'জঙ্গল' চেনে না, জঙ্গলে তাব বড় ভয়। সে বড় ভয় পেল। মনে পড়ল, আজ কিছুদিন হয় শহরের জলসিঞ্চনের কনিষ্ঠ অভিযন্তা বরকাকতির গলায় ছুরি ধবে ছেলে 'ড্রাগ' কেনার জন্য টাকা চেয়েছিল।

বস্তির চেহারা পরিবর্তিত হয়েছিল। নতুন ঘর, দোকানপাট, এমনকি এ পাশে ওপাশে দুয়েকটা অফিস পর্যন্ত বস্তিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। নতুন গলি-উপগলি বেরিয়েছে, ভাড়াবাড়ির সংখ্যা বেড়েছে। নতুন-নতুন মানুষ এসেছে। আগের খালি জায়গাগুলি কোন না কোনভাবে ভরে উঠেছে। মানুষ, রিক্সা, বাইক, মোটরে পথটা প্রায়ই ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। এখন এই বস্তিতে একটা পিসিও প্রয়োজন। নবীন কলিতা স্বস্তি অনুভব করল, মানুষ যাই বলুক না কেন সে যদি যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে না চলত তাহলে আজ ছেলেকে যুগের সঙ্গে যাওয়ায় সাহায্য করতে পারতো না। সে তার সঞ্চিত অক্ষয়ভাণ্ডারে হাত দিলো। ঘরের সামনের দিকে কিছুটা দূরে, পথের সামনে যেখানে

একটা সময়ে তাদের মুদির দোকানটা ছিল, এখন সেখানে রয়েছে রঙিন গ্লাসের দরজা দিয়ে সাজানো একটা পিসিও, সঙ্গে প্লাইউডের র‍্যাক, সানমাইকার কাউন্টার, বসার উঁচু টুল, একটা আরাম চেয়ার ইত্যাদিতে সাজানো একটা ভিডিও এবং অডিও ক্যাসেটের পার্লার। রূপম কলিতা ব্যবসা আরম্ভ করল।

কিন্তু রূপমকে আপনি জানেন। অপরিচিত হতে থাকা সময় আর যাকে বলে, তরুণ প্রজন্ম আপনার আর অপরিচিত নয়। তাই, বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয় যে পিসিও আর ভিডিও পার্লারটা ভালভাবে চলা সত্ত্বেও রূপমের বিরক্তি লাগতে বেশিদিনের প্রয়োজন হল না। 'সারা দিন এভাবে বসে থাকা যায় নাকি বে? আমি পাগল হয়ে যাব।' বিরক্তির তীব্রতা প্রকাশ করার মত উপযুক্ত অশ্লীল শব্দ সহযোগে সে বন্ধু বান্ধবকে জানাতে লাগল। সে একটা ছেলেকে নিয়োগ করল আর নিজে বন্ধুর সঙ্গে ঠিকা এবং দালালির সন্ধানে অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়াতে লাগল, বিধিসম্মতভাবে নিয়মনীতির মধ্য দিয়ে ভদ্রভাবে চলা সরকারী ধনের অপচয়ে সে নিজেও ভাগ বসাতে চাইল।

দুপুরে ছেলেটি যখন ভাত খেতে যায়, রূপম এসে পৌঁছায় না, নবীন কলিতা পার্লারে আরাম চেয়ারে বসে চোখ বুজে শোবার চেষ্টা করেন, দোকান দেখাশোনা করেন। সে অস্বস্তি বোধ করে। কারণ দুটি ছেলে আসে, তাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ছেলেটি নেই নাকি?' আর তার গুরুগম্ভীর উত্তর শুনে চলে যায়। আর একজন প্রেমিকাকে ফোন করার জন্য আসে, তাকে দেখে কী করব-কী না করব-এগোবে না ফিরে যাবে—ঠিক করতে না পেরে, ফোন বুথে ঢুকে নিম্নকণ্ঠে আকারে ইঙ্গিতে কিছুক্ষণ কথা বলে অসন্তুষ্ট মুখে চলে যায়। বা দুটি মেয়ে আসে, ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করে, 'আংকল, ম্যায়নে তুমসে প্যার কিয়া ক্যাসেটটা আছে নাকি?' আসে স্মার্ট বেপরোয়া ব্যস্ত মেয়ে, এমন একটি ছবির ক্যাসেটের খোঁজ করে যেটা, কলিতাও শুনেছে খুব গরম দৃশ্যের ছবি। বড় সমস্যা, বুঝেছেন, সে বিকেলে কুমুদদার দোকানে বসে আক্ষেপ করে।

এ ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার জন্য রূপম মধ্যে মধ্যে কিছুসময়ের জন্য পার্লারে বসে, মেয়ে গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলে, নিজে ভাল ক্যাসেট বেছে দেয়, ছবির বিষয়ে অতিরিক্ত খবর দেয়, যে ছবি নেই তা এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় আর ঠিক এনে দেয়। আর এভাবেই সে পুনের প্রেমে পড়ে। এ পর্যায়ে তাব প্রথম প্রেমিকা ছিল প্রভা, কলেজের ছাত্রী, শহরের অন্য এক বস্তিতে বাড়ি। ততদিনে প্রেমের সংজ্ঞাও বদলে গিয়েছিল। বিনামূল্যের টেলিফোন সেবা আর ভিডিও ক্যাসটে, বিভিন্ন উপহার, হোটেল-রেস্তোরায় খাওয়া আর বাইকে ঘোরাফেরা করা। কিন্তু তার সঙ্গে প্রভার ঘোরাফেরার গতি এবং মাত্রা কিছুটা বেশি হওয়ার প্রভার দাদা যাকে বলে 'হস্তক্ষেপ' করল। আর প্রয়োজনে হস্ত নিক্ষেপ করতেও সে প্রস্তুত বলে জানিয়ে দিল। তাই, রূপমের দল আর প্রভার দাদার দলের মধ্যে সঘোষ আহ্বান-প্রত্যাহ্বানের মধ্য দিয়ে মুক্ত সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিল। ফলস্বরূপ, ঘোরাফেরা বন্ধ, প্রভা নিস্প্রভ আর রূপমের প্রথম অধ্যায়টা এখানেই সমাপ্ত হল।

এর কিছু পরে রূপমের কলেজের বন্ধু নিঃসঙ্গ যুবক ডি.এস.পি ভরত ফুকন শহরে এল। একটা ঘর ভাড়া করে আর সেই ঘর দুই বন্ধুর আড্ডা-বিশ্রাম-পান-ভোজন-স্মৃতিমন্থন-স্বপ্নদর্শণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। দুই বন্ধুর দিনগুলি উচ্ছল আনন্দে ভরে ওঠে, ভরত এমনকি দুই একটা সরকারী কাজ পাবার ক্ষেত্রেও সাহায্য করে দেয়। এই আনন্দে জোয়ার আনার জন্য রূপমের জীবনে আসে আরও একটি প্রেমিকা। মেয়েটির নাম সাবিত্রী, শহরের পাশেরই গ্রামের মেয়ে। বি.এ পরীক্ষা দেবার পর মেয়েটি চাকরির খোঁজ করছে আর একটা চাকরির সূত্রে বাড়ি থেকে এসে প্রায়ই রূপমের

পিসিও থেকে কাকে যেন ফোন করে, প্রতিদিন বিভিন্ন ধরণের উত্তর আশ্বাস লাভ করে আর সরল বিশ্বাসে মনে করে এভাবেই সে হয়তো একদিন ফোনের মাধ্যমে তার ভাল খবরটা পেয়ে যাবে। খুব সহজেই সে রূপমের গভীর সহানুভূতি আর উদার সাহায্যের জালে ধরা পড়ে। চাকরিটা হয়নি কিন্তু হবে, আর কোন উপায়ও নেই, নিরুপায় অপেক্ষার মধ্যে সে নিজেকে রূপমের প্রেমে সমর্পণ করে। সাবিত্রীর দাদার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারা যায় নি, তাই বস্তিতে কোনরকম আশঙ্কার ভয় ছিল না, কারণ ভরতের কাছ থেকে সে আশানুরূপ সমর্থন পায় নি। তবুও ভরতের ঘরটাই তাদের ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন রচনার আশ্রয় ছিল, সেখানেই তারা বয়সোপযোগী স্বর্গসুখ উপভোগ করত। প্রেমের নীতি নিয়ম, মাপজোক, গতিপ্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়েছিল। তাদের প্রেমের গতি বাড়ল, মাপ অতিক্রম করল। আর একদিন সম্ভোগান্তে নগ্ন দেহ, বিশ্রামরত নায়কের বুকে মাথা রেখে আগের গল্পগুলিতে বর্ণিত ভয়ে বিবর্ণ, চিন্তায় কুঞ্চিত মুখাবয়বে নায়িকা বলল, 'আমার কিছু একটা হয়েছে।'

নায়িকার মুখভঙ্গী আর কথায় কোনরকম গুরুত্ব না দিয়ে সন্তুষ্ট নির্লিপ্ত, যৌনক্লান্ত নায়ক যান্ত্রিকভাবে মেয়েটির চুলের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন মাথাব্যথা বা কোমরের ব্যথা কিছু হয়েছে? নায়িকা এবার আত্মস্থ, কিছুটা ভৎর্সনার সুর মিশিয়ে বলল, 'জান না মেয়েদের কি হয়?' ক্লান্তির মধ্যেও নায়ক এবার তার প্রশ্নটার প্রতি মনোযোগ দিকে বাধ্য হল। জিজ্ঞেস করল নিরুদ্বেগভাবে, 'কি?' নায়িকার কণ্ঠে পুনবায উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেল, নায়কের গলায় মুখটা চেপে ধরে বলল, 'মেন্স বন্ধ হয়ে গেছে।' রূপম চমকে উঠল। কিন্তু অবাক হওয়ার ভাবটা প্রকাশ পেতে দিল না। সাবিত্রীকে জড়িয়ে ধরে সে বলল, 'ভয় নেই, ভয় করার কোন প্রয়োজন নেই। এম.পি.টি করাতে হবে।'

'কি? মেয়েটি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল।

'এম.পি.টি; এবর্সন।' সে সহজ কণ্ঠে বলল। মেয়েটি ছিটকে তার শরীরের সামনে থেকে সরে গেল। তার কণ্ঠে উদ্বেগ, সংশয়, প্রতিবাদ সমস্বরে ফুটে উঠেছিল।

' কি, ওয়াশ! না-না, আমি ওয়াশ করাব না। আমার ভয় লাগে। পাপ হবে।'

সুখের পরিণতি অসুখ এই সমস্যার ওপরে প্রায় এক সপ্তাহ শান্ত কথাবার্তা, আলোচনা, ব্যথা-তিক্ত তর্কবিতর্ক, ক্রুদ্ধ অভিযোগ এবং তার চেয়েও বেশি নিন্দা ভর্ৎসনা, অভিমান-ক্রন্দন, বোঝাপড়া যেন কখনো শেষ হবে না এভাবে চলল। সাবিত্রীর পাপটাকে কোনমতে চাপা দিতে না পেরে অবশেষে তিক্ত বিরক্ত, ক্ষুব্ধ রূপম 'মহামূর্খ, গ্রাম্য ভূত, যেখানে খুশি মরগে যা' বলে তাকে স্রোতহীন, ঢেউহীন গ্রামের জীবনে বিসর্জন দিল। মেয়েটিও 'আপনার পাপ হবে, আমি অভিশাপ দিচ্ছি। আমি এভাবেই থাকব, মরে যাব, যা হয় হবে' বলে কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে রিক্সায় উঠে ঘরে চলে গেল। রূপম দু'দিন গোমড়ামুখো হয়ে থাকল, তারপর ভরতের সঙ্গে শিলং গিয়ে উপস্থিত হল। দুদিন দিনরাতের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মদ খেয়ে ভরতের কাজ শেষ হতেই পুনরায় ঘরে ফিরে এল। কয়েকদিন সে সারাটা দিনই পার্লারে বসে রইল। রাতের বেলা একা একা পার্লারে বসে সে বস্তিটার কথা ভাবতে লাগল। সে এই বস্তিরই ছেলে কিন্তু সে বস্তিটাকে ভালভাবে জানে না। সে অনুভব করল, সে এতদূরে চলে গেছে যে বস্তিটাও তাকে এখন চেনে না।

কিছুদিন পরে রূপম কলিতার জীবনে তৃতীয় প্রেমিকা এল। মেয়েটির নাম বেণী। স্মার্ট মুখসজ্জা, মুখের ভাষা-চোখের ভাষা সবদিক দিয়েই 'আলাদা' আত্মসচেতন, আগ্রাসী। বুঝতেই

পারা যায় যে রূপম প্রথমে কিছু উদাস আর সতর্ক ছিল। কিন্তু প্রেমের সংবিধান পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন সংবিধানে পুরনো অনেক বিধিনিষেধ উঠে গেছে। তাছাড়া বেণী অভিজ্ঞ, ইতিমধ্যে কয়েকবার খেলে সে প্রেমের খেলায় পটুত্ব আর খ্যাতি অর্জন করেছে। রূপমের উদাস মনে সজীবতা এনে তার সতর্কতার ব্যূহ ভেঙে প্রবেশ করতে তার খুব বেশিদিন লাগল না। প্রেমের প্রাথমিক লুকোচুরি, ধরে ফেলা, ফাঁকি কারসাজি ইত্যাদি খেলার পরে একদিন সে বেণীকে তার গুহায় নিমন্ত্রণ করল। এই পরিকল্পনাটা তার মনে কিছুদিন থেকেই খেলছিল, কারণ সে বেণীর কাছ থেকেই এ ধরণের নিমন্ত্রনের জন্য উৎসাহ পাচ্ছিল। বেণী কয়েকদিনই বলেছে, চল না কোথাও থাকার মত করে একদিনের জন্য বেড়াতে যাই।' সে তার প্রস্তাবটা চিন্তা করে, বিভিন্ন সম্ভাবনা তাকে উত্তেজিত করে তোলে। ভরত দুদিনের জন্য সরকারী কাজে রাজধানী গিয়েছে, ঘরটা সম্পূর্ণভাবে রূপমের হাতে, সে বেণীকে নিমন্ত্রণ করল। 'ভয় লাগে ভাই।' বেণী কৃত্রিম সংশয়ের কণ্ঠে বলল। তার মুখের উচ্ছ্বাস আর দেহের ভাষায় ভয়ের প্রকাশ নেই। ' কোন ভয় নেই, চল। আমার ইন্টিমেট দোস্তের ঘর। কেউ নেই।' সে তাকে আশ্বস্ত আর প্রস্তুত করে তুলতে চায়। বেণীও আশ্বস্ত হয়েছে এরকম ভাব করে। 'ঠিক আছে, চল।'

'সারাটা দিন থাকতে হবে কিন্তু।' সে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলে।

'ইশ্! বেণী সলাজ আপত্তি করে।

বাইক এর গতির উন্মাদনা ওদের রক্তে প্রবেশ করে। তীব্র বাতাসে ওরা পরস্পরের দেহের মাংসের গন্ধ পায়। অন্য সমস্ত চেতনা, সমস্ত বোধ, বাস্তবের বিবিধ অস্তিত্ব ওদের কাছে হারিয়ে যায়। এক উগ্র, তীক্ষ্ণ, জান্তব চেতনায় উত্তাল ওরা পরিচিত লক্ষ্যের অপরিচিত রহস্যের প্রতি একাগ্র মগ্নতায় উড়ে যায়। গুহার ভেতরে রূপম দেখে বেণী নিঃসঙ্কোচ, তার প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালনের প্রতি তাৎক্ষণির সম্মতিতে মেয়েটির পূর্ণ সহযোগ রয়েছে। সে চরম পদক্ষেপের দিকে এগিয়ে যায়। প্রথমে তার কামিজটা আর তারপরে কূর্তাটা ধীরে ধীরে, অভ্যস্ত ধৈর্যের সঙ্গে খুলে সে চেয়ারে পরিপাটি করে রেখে দেয়। তার বুকের মধ্যে মুখটা ঢুকিয়ে দিয়ে সে সুখ আস্বাদন করে। তার উরু দুটিতে প্রচুর রক্তসঞ্চালন ঘটতে থাকে। তার শ্রীঅঙ্গ কঠিন হয়ে ওঠে। বেণীকে সজোরে জড়িয়ে ধরে সে পিঠের অঙ্গবাসে হাত দেয়। হঠাৎ বেণী মাথাটা সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়। তার থুতনিটা চেপে ধরে অভিনন্দন সূচক উৎসাহ দেওয়া হাসি হেসে ফিসফিস করে বলে, 'দাঁড়াও, বাথরুম থেকে আসছি।'

সে তাকে ছেড়ে দেয়। বেণী বাথরুমের ভেতর ঢোকে। সে দ্রুত কাবার্ডের সামনে যায়, দরজাটা খুলে হাতটা ঢুকিয়ে দিতেই হঠাৎ বিজলী চমকের মত তার চোখের সামনে খেলে যায়, কাবার্ডটার দরজাটা খুলে ভেতরের দিকে আঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখা একটা প্রকাণ্ড উজ্জ্বল পোস্টার। 'পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর, সরল, নিষ্পাপ শিশুটি পোস্টারটা থেকে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। তার শরীরে এক শীতল শিহরণ খেলে যায়। এই পোস্টারটা প্রভা লাগিয়েছিল। তার কলজেটা কেউ যেন জোরে খামচে ধরল, মুচড়ে দিল, প্রচণ্ড কষ্টে সে বোবা হয়ে পড়ল। তার দেহের রক্তপ্রবাহ মুহূর্তের মধ্যে শীতল হয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ল। শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হল, শরীরের সমস্ত অঙ্গ নির্জীব, নিথর, নিশ্চল হয়ে পড়ল। অস্পষ্ট আবছা চেতনার মধ্য দিয়ে সে দেখল প্রভার গর্ভ থেকে পড়া শিশুটি তার দিকে তাকিয়ে একটা গোপন হাসি হাসছে। এই শিশুটিকে একটা সাকশন পাম্পের সাহায্যে সে প্রভার গর্ভ থেকে কাঁচা রক্ত আর গলিত মাংসরূপে শোষণ করে বের করে আনতে চেয়েছে। সে

ডানহাতটা সামনে এনে চোখের সামনে তুলে ধরল, আত্মগ্লানির রক্ত, ধিক্কার, মাংসের টুকরো তার শরীরে মাথায় ছিটকে পড়েছে।

পরের মুহূর্তে তার সমগ্র সত্ত্বা বিকল হয়ে পড়ল। এইমাত্র বাথরুমের দরজাটা খুলে যাবে, কামনা পিচ্ছল উন্মাদনায় মোহময় হাসিতে নগ্ন দেহ সঙ্গম অভিলাষী বেণী তাব কাছে এগিয়ে আসবে। কি হবে? কি হবে? খট করে দরজার ছিটকিনি খোলার আওয়াজ হল। কি হবে? কি হবে? টেলিফোনটা বাজল। ঝপ করে রূপম টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল, হ্যাঁ বলছি, সে বলল আর শুনতে থাকল। আড়চোখে তাকিয়ে সে দেখল বাথরুমের দরজার মুখে বেণীর অসম্ভব মূর্তিটা দাঁড়িয়ে রযেছে, অর্দ্ধ নগ্ন, উত্তুঙ্গ বক্ষ, প্রস্তুত কিন্তু হঠাৎ তার মুখে অনিশ্চয়তার ছাযা, ক্রমে অস্পষ্ট বিরক্তি, শঙ্কা, অনিশ্চিত হতাশা, সে তার টেলিফোনে বলা কথাগুলি কান পেতে শুনছে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে বলছে, 'আমি যাচ্ছি। দুই মিনিট।' বেণী দুহাতে বুকটা ঢেকে ফেলে। সে ধপাস করে টেলিফোনটা রেখে দেয়।

'কী হল?' সে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করে।

দ্রুততার সঙ্গে সে তার দিকে কামিজ আর কূর্তাটা এগিয়ে দিতে দিতে বলে, 'বাবা বাথরুমে পড়ে গেছেন। সেন্স আসে নি।'

'অ মাই গড!' বেণী বলে ওঠে। প্রচণ্ড জোরে সে কাবার্ডটা বন্ধ কবে দেয়।

বাবা দুপুরের ভাতের টেবিলে। থালাব পাশে শিমের চচ্চড়ি নিযে মা আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করছে, 'একটুখানি খান, কিছু হবে না, ঔষধ খেয়ে নেবেন।' রূপম দরজাব কাছ থেকে এই দৃশ্য দেখতে পেল। অসময়ে তাকে বাড়িতে দেখে মা ভয় পেয়ে গেল। 'কী হল?' বাবা তাব দিকে একবাব তাকিয়ে ভাতের প্রতি মনোযোগ দিল। তার মনে কোন অনুশোচনা নেই। বাবা আরও অনেকদিন বেঁচে থাকবে। সে হাতের ক্যাসেটটা মায়েব দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নতুন ধর্মমূলক ছবি এসেছে। বাবার সঙ্গে বিকেলে দেখতে পারবে। ভাত দাও, ক্ষুধা লেগেছে।'

মা তার হাত থেকে ক্যাসেটটা নিযে নিল আর তাড়াতাড়ি করে তার জন্য ভাত বাড়তে শুরু করল। বাবা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল। এভাবে দুপুবে ভাত খাবার কথা সে ভুলেই গিযেছিল। ভাত খেযে উঠেই রূপম বেণীর কাছে একটা ফোন করল, 'না চিন্তা করাব মত কিছু নেই। ডাক্তার দুই একদিন রেস্ট নিতে বলেছে। কিন্তু বাবা কোথায় আর রেস্ট নেবেন। তবুও, তাড়াতাড়ি একটা ই.সি.জি করাতে হবে। সে তার সঙ্গে দুই একদিনের মধ্যেই দেখা করবে। ফোনটা রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিন্তু তার ঘুম এল না। বারবার তার মনে ভেসে আসতে লাগল ছোট্ট মেয়ের মত প্রভার অসহায় ক্রন্দনরত মুখটির কথা।

ঘন্টা বাজল। আমি দেখতে পেলাম দরজার বাইরে একজন আধাবয়সী স্মার্ট ভদ্রলোক। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই পবিচিত মুচকি হাসি হেসে সে বলল, 'দাদা আমি রূপম।'

'আমি ঠিক...' অনিশ্চিতভাবে আমার মুখে উচ্চারিত হল।

'রূপম কলিতা।' এরকম আত্মীয়তার সুরে বলল যে আমার না চেনার আর কোন উপায় রইল না। চমকটা ভেতরে ভেতরে রেখে মুখে ঘনিষ্ঠতার হাসি হাসলাম। আমি তাকে ভেতরে বসালাম আর কি বলব তা চিন্তা করার আগেই সে বলে উঠল, 'দাদা, পড়লাম। বড় ভাল লাগল।' আমার নিরুপায় হাসিটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সে পুনরায় বলল, 'কিন্তু আমি, দাদা, আপনাদের মত চিন্তা করতে পারি না কেন? সেই যুবক বয়সেও পারলাম না, আর এখনও পারছি না। একটা

নিষ্পাপ শিশুর ছবি, তার নিরীহ মুখের স্বর্গীয় হাসি—এ সমস্ত আপনারই ভাষা—কেন আমাদের মনে আপনার লেখার মত প্রতিক্রিয়া করে না?' আহত অভিমান বা ক্ষোভ নয়, তার মুখে এক ধরণের অক্ষমতার আমেজ, ঠোঁটে ব্যর্থতার ধূর্তামি ভরা হাসি।

'না...হয়তো করে...মানে....' আমি একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু রূপম কলিতা আমাকে সুযোগ দিল না।—'কোথায় কবে, গর্ভস্থ এক অনাবিল ভবিষ্যতের প্রত্যাশা, আগন্তুক এর পরম সম্ভাবনা—আমার মুখ দিয়েও আজ এ সমস্ত ভাষা কীভাবে বেরোচ্ছে বলতে পারি না—কেন মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মানুষ করে তুলতে পারে না?'

'ইশ কেন এভাবে বলছ? তুমি কিছুটা ওভার-রিঅ্যাক্ট করছ।'

'তা নয় দাদা। গ্রামের একটা সহজ সরল মেয়েকে প্রেগন্যান্ট করার পর আবার আরেকজন মেয়ের সঙ্গে যৌন সঙ্গমের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলাম, সেই জানোয়ারের মত কাজটিতে একটা শিশুর মুখ বাধা দিয়েছিল।' সে চুপ করে গেল। তার সহজ, সাবলীল, বেপরোয়া ভাষায় আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। সময় তখনও পরিবর্তিত হয়েছিল। আজও আমার জন্য অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। আমি অনুভব করলাম, তবুও আমার কৌতুহল আমাকে পরাভূত করল, মুখ থেকে বেরিয়ে এল—'তাহলে? কণ্ডোম ছিল না?' চোখের পাতা না ফেলে সে বলল, কাবার্ডটা খুলে কোণের দিকে হাত বাড়িয়ে ছিলাম, সেখানেই থাকে। সর্বনাশ, কণ্ডোম শেষ। বিরাট ভয় পেয়ে গেলাম। বেণী তো, আপনিই জানেন সাংঘাতিক মেয়ে। অনেকের সঙ্গেই কারবার। দিল্লিতে গিয়ে আমাদের এম.পি একজনের সঙ্গে দু'মাস ছিল। সেখানে পরিচয় হল পাঞ্জাবী কর্পোরেট বসের সঙ্গে, তার সঙ্গেও কয়েকমাস। অরুণাচলের একজন মন্ত্রীও কিছুদিনের জন্য রেখেছিল। আরও যে কতজনের সঙ্গে। আর এদিকে গলিতে গলিতে বিজ্ঞাপন, 'সুরক্ষিত যৌন সম্ভোগ।' বুক কেঁপে ওঠে। আর কোনরকমে যদি সে প্র্যাগন্যান্ট হয়, আমার জীনা হারাম করে দেবে। সে তো আর প্রভা নয়, আপনি তো তাকে জানেনই।

নিজের উপরই অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলাম। কিসে পেয়েছিল আমাকে। কিছুটা তীক্ষ্ণতার সঙ্গেই বললাম, 'আমি তো কিছুই জানি না। কে বেণী, কোথাকার বেণী। ভরতই তো...'

'হ্যাঁ, ভরত অবশ্য আমাকে ভাল বাঁচা বাঁচিয়েছে। সমস্যা সমাধানে ভরতের জুড়ি নেই। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে তো। তার সাহায্যে প্রভা সিভিল ডিফেন্সের চাকরিতে ঢুকল। তারপর নার্সিংহোমের ওটিতে ঢুকল আর শেষ পর্যন্ত ভরতের অফিসেরই একজন কেরানির সঙ্গে বিয়ে হল তার।

'তুমি তো নিশ্চয় তার বিয়েতে গিয়েছিলে?' আমার মুখ থেকে আধা বিদ্রুপের সুরে বেরিয়ে এল।

'হ্যাঁ,' সরস কণ্ঠে সে বলল। 'ভরতের জীপে। প্রেজেন্ট টেজেন্ট নিয়ে বিয়ের ভোজ খেয়ে একেবারে শেষরাতের দিকে ফিরে এসেছি।' রূপম কলিতা তার ধূর্ত হাসিটা এবার সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিল।

তার সঙ্গে সায় দিয়ে আমিও হাসলাম। আমার হাসিটা নিশ্চিতভাবে একজন বুর্বক লেখকের হাসি।

প্রেত-আত্মা

অনামিকা বরা

আকাশ থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মত কুয়াশা পড়ছে। বাধা পেয়ে গাছের গায়ে ঝুলে রয়েছে কুয়াশার আস্তরণ। ধোঁয়ার মত কুয়াশার ঘন আস্তরণে ডুবে গেছে সকালের প্রকৃতি। গাছেব পাতা বেয়ে টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে শিশির।

সুকুমার পাশ-পরিবর্তন কবল। সে পরে থাকা গামছাটার নিচে একটা নেংটি ইঁদুর নড়ে উঠল। সে ইঁদুরটাকে তার উত্তেজনার গভীরে আহ্বান জানিয়ে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল। উকুনের উৎপাতে পাগল হয়ে শাণিত নখে মাথার চুল খুবলে তুলে ফেলার মানসে একটা তীব্র উত্তেজনায় সুকুমারের মাংসপেশীগুলি শক্ত হয়ে উঠল। সে লাফিয়ে উঠল। চমকে উঠে ইঁদুরটা পালিয়ে গেল। লেপটা শরীর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুকুমার উঠে বসল। তাকে এক ধরণের তাৎক্ষণিক সুখে প্রলোভিত করা ইঁদুরটার প্রতি প্রচণ্ড আক্রোশে সুকুমারের শরীরটা কেঁপে উঠল। প্রস্রাব এবং স্খলিত বীর্যে চটচটে হওয়া দুর্গন্ধময় গামছাটা কোমর থেকে খসিয়ে সুকুমার তেলচিটচিটে হওয়া শক্ত বালিশটা শরীবের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দুই পায়ের মাঝখানে চেপে ধরল। একটা কোমল, স্তনায়িত নারীদেহের কল্পনায় উন্মাদের মত হয়ে ওঠা সুকুমার বিছানার চাদরটা খামচে ধরে একসময়ে জন্তুর মত ফোঁপাতে শুরু করল। সুকুমারের সারাটা বিছানা, ঘরটা নেংটি ইঁদুরে ভরে উঠেছে। ফাটা লেপটার মধ্যে মধ্যে ছিঁড়ে গিয়ে তুলো বেরিয়ে পড়া অংশে ইঁদুর ইচ্ছেমত বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। সুকুমার বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখা সস্তার যৌনগন্ধী ম্যাগাজিন কয়েকটা ইঁদুরে কুটি কুটি করে ফেলেছে। প্রায় প্রতি রাতেই তাকেও কুটে খাবার জন্য ইঁদুরেরা বেরিয়ে আসে। কী খেতে আসে? মূলত তার চেতনা। হৃদয়ের তো কথাই নেই। ফাটা উঠোনের মত তার এবং একমাত্র দাদা সহদেবের হৃদয়হীন অস্থি-চামড়ার বুকটা। জীবন যন্ত্রণার প্রখর রৌদ্রে সেই হৃদয়ের তলা শুকিয়ে গেছে। নারী

সেই শুকনো হৃদয়ে আঘাত করতে গিয়ে দূরে ছিটকে পড়া যেন একটা ধাতব অস্তিত্ব, যেন একটা সীমাহীন যন্ত্রণা আর উপর্যুপরি নিপীড়ন করতে থাকা আঘাতের উৎস।

গামছাটা পরে নিয়ে সুকুমার লেপটা ঝেড়েঝুরে পুনরায় শোবার চেষ্টা করল। মা, বোন দুটি আর সে—এই চারজন মানুষের জন্য দুটো লেপ। তার মধ্যে একটা শুধু তার একার। রাগ হলেও সে লেপটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে না। সুকুমারের ঘুম এল না। রাত শেষ হয়ে আসছিল।

বাবার মৃত্যুর পরে ভেতরে ভেতরে পচন ধরা ঘায়ের মত হয়ে পড়া, উচ্ছন্নে যাওয়া সংসারটার দায়িত্ব একপ্রকার বাধ্য হয়েই ছোটখাটো ঝগড়া-ঝাঁটিতে ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশে চলে যাওয়া সহদেব কাঁধ পেতে নেবে বলে সবাই একেবারে নিশ্চিত ছিল। আত্মীয় স্বজনরাও তেলহীন প্রদীপের সলতের মত টিমটিম করে জ্বলতে থাকা আলোর মাধ্যমে ওদের ঘরটা আবেগিক উষ্ণতায় ভরা আছে বলে ভেবেছিল। বাবার মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ সাত বছর পার হয়ে গেল। হঠাৎ কি হল, পিতার মৃত্যুর প্রথম বছর বিহু পুজোর বন্ধে ঘরে আসা সহদেব পুনরায় যেন নিখোঁজ হয়ে গেল। কাণ্ডটা ঘটেছিল সহদেবের খোঁজে নয়না নামের একটি মেয়ে আসার পর। পাকা ফলের মত ছিল মেয়েটি। না খেয়ে সঞ্চয় করে রাখলে দুদিন পরেই যেন পচে যাবে। সহদেবের দুই বোন নাহর আর টগরের পাশে তাকে পুরুষ্টু একটা সরষের মত, পেকে ঝুলে পড়া ধানক্ষেতের মত মনে হচ্ছিল।

সুকুমার নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলতে লাগল– এই ঘরে অন্য ঘর থেকে মেয়ে আসতে পারবে না। আমি আমার ভাইবোনের বাইরে অন্য কোন মেয়েকে আসতে দেব না। সহদেবের খোঁজে আবার যদি মেয়েটি আসে তাহলে আমি তাকে তাড়িয়ে দেব। নাহলে সে আমার দাদাকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে। পরী, একজন পরীর মত মেয়ে। সুকুমার পাশ পরিবর্তন করে শুলো।

মা দুবার তাকে দরজায় টোকা দিয়ে ডেকে গেল। সুকুমার, এই সুকুমার ওঠ। আষ্টেপৃষ্ঠে সাপের মত জড়িয়ে আর কত বিছানায় থাকবি। সুকুমার গরগর করে উঠল ঃ উঠব না। মা ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট মনে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—'অনবরত বিছানায় পড়ে থাকবি। কামকাজ কিছুই করবি না। এরা আমাকে শেষ করে দিল। ইশ্!

মাঘ-বিহুর ভোজ খাবার দিনটাতেই সহদেবের খোঁজে একেবারে তিনসন্ধ্যেয় এসে উপস্থিত হয়েছিল মেয়েটি। মেয়েটি আগেও এসেছিল। সুকুমারের পাগলামি, নাহয় টগরের ভ্রূকুটিকেও নস্যাৎ করে তাদের মনের নিঃস্ব মাঠ সবুজ করার দৃঢ় সংকল্প এবং একধরণের তীব্র আকুলতায় উজিয়ে আসার মত এসেছিল সে। কিন্তু সেবার এসেছিল নতুন সাজে। সহদেবের মাকে নমস্কার জানিয়ে সে বসস, মাসি, সহদেবের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। একেবারে অনানুষ্ঠানিক, একেবারে অনাড়ম্বর বিয়ে। আমি তার উপর ভরসা করে, মৌনতার প্রশ্রয় পেয়ে আর আমার প্রতি থাকা গোপনতম ভাবনাটার ভাষা বুঝে ওঠার পরে খোদ তাকেই সাক্ষী করে কপালে এই সিঁদুর ধারণ করেছি। বকুলমালা যেন নিজের কানদুটোকে বিশ্বাস করতে পারেন না। তিনি কিছু একটা বলার আগেই মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য এক প্রবল আবেগ সৃষ্টি হবার আগেই নাহর আর টগর নয়নার সামনে উড়ে এসে পড়ার মত পড়ল। খোলস-ছাড়া সাপের মত ফ্যাকাশে, বিবর্ণ রূপ নিয়ে বিকেলের বিছানায় পড়ে থাকা সুকুমার লাফ দিয়ে উঠে এল। বকুলমালার গলাটা শুকিয়ে এল মনে হল। তার বুকটা কোন এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। তার বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে দুটি নাহর, টগর আর ক্রমশ পাগলামির লক্ষণ ফুটে ওঠা সুকুমার ঘটাতে পারা যে কোন অঘটনের কথা ভেবে

তার হৃদয় কেঁপে উঠল। নয়না হাসছিল। তার ফোঁটা দেওয়া পাকাল মাছের মত কপাল, নাক, মুখ, চোখ সবকিছু থেকেই যেন আলো ছিটকে পড়ছিল। আব সে ভরা মন নিয়ে সুখের জ্যোৎস্নায় যেন প্লাবিত হয়ে যাচ্ছিল।

বকুলমালার মাথাটা আচমকা ঘুবে ওঠে। সেদিনের কথা ভাবলে বকুলমালার মাথাটা আচমকা ঘুরে যায়। একটা বীভৎস ঘটনা ঘটে গেল। ইশ্, একটা লজ্জাকর বীভৎস ঘটনা। কত আশা করে ভালবাসায় উজ্জ্বল মনটা আঁচলে বেঁধে সহদেবেব ঘরে এসেছিল মেয়েটি। পলাতক আসামীর মত সহদেব সুমলার ঘরে আত্মগোপন করেছিল। বকুলমালার আদরের বৌমা হওয়াব জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়া মেয়েটিকে নাহর, টগর হাতে ধরে বাড়ির আঙ্গিনার বাইরে বের করে দেবার সময় সহদেব গোগ্রাসে মদ খাচ্ছিল। গলা পর্যন্ত মদ খেকে সহদেব ওয়াক ওয়াক করে বমি করে সুমলার ঘবে চিৎ হয়ে পড়ে রইল। মদের টক টক গন্ধে সুমলার ঘর-দুয়ার পানশালায় পরিণত হল।

স্নান করে উঠে বকুলমালা ঠাকুবঘবে প্রদীপ জ্বালাবার জন্য ঢুকল। ঈশ্বরের কাছে আর কী প্রার্থনা করবে? ঈশ্বর তার ঘরটিকে ভাঙনের হাত থেকে বাঁচানোর কোন চেষ্টাই করেন নি। শ্মশানেব নীরবতা ঘরটিকে গ্রাস করে ফেলেছে। চোখেব সামনে তিলতিল করে সব ক্ষয়ে যাচ্ছে। আশা, স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ। ভয়ানকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে তার সন্তানরা। ক্ষয়ংকরী ভাবনার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে তার সন্তানদের অস্বাভাবিক মন। বকুলমালা বেশ কিছু সময ঠাকুরঘরে বসে রইলেন। ঠাকুবঘর থেকে বেরিয়ে এসে বকুলমালা জল মেশানো দুধে বেশিরভাগ চাল দিয়ে ভাতেব মত সিদ্ধ করে জলপান খেতে লাগলেন। সুকুমাবেব ঘরের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। সহদেব ছেড়ে যাওযা জামাটা পরে কোঁকড়ানো চুলগুলি মুছতে মুছতে সে বেরিয়ে আসছে। বকুলমালা আডচোখে তার দিকে তাকাল। দিন দিন আসুরিক হয়ে উঠছে সুকুমার। কদর্য, ভয়ানক রূপ নিচ্ছে সে। দাডিব জঞ্জালে ভরা বিবর্ণ, কর্কশ এক মুখ। চোখে মুখে আহত জন্তুর জিঘাংসাব ভাব। মনে হয এই মুহূর্তে সে যেন কারোকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে। ভয়ানক কোন এক ষড়যন্ত্র করছে কাউকে নিঃশেষ করে ফেলার। হয়তো সহদেবকে, হযতো বকুলমালাব সংসারটিকে নিপাত করার। সহদেবের হৃদয় থেকে আবেগ অনুভূতি খামচে ধবে প্রেমের শিকড় উপড়ে ফেলার জন্য সুকুমাব দৃঢ়চিত্ত। আপোষহীন তার স্থিতি। অনমনীয় সিদ্ধান্ত। বকুলমালা অসহায়ভাবে চেয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারেন না। নিজের গর্ভে জন্মানো সন্তানের এরকম অপরিচিত বেশ। কেন এবকম হয? বকুলমালা জলপান অর্ধেকটা খেলেন। এই মেয়ে দুটি, নাহর আর টগরকে পাত্রস্থ করতে পারলে? ওহো, পারবেন না। বকুলমালা পারবেন না।

বকুলমালা চমকে উঠলেন। তিনি এদিকে, ওদিকে তাকালেন। খসে পড়া বেড়া আর ঘুণ ধরা বাটামগুলির কোথাও তো একটা টিকটিকি নেই। তাহলে কে বলল এ কথা? কে বলল? বকুলমালা যখনই গোপন আশায় মনটা শক্ত করতে চায়, তখনই যেন এই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। বকুলমালা অজানা ভয়ে কেঁপে ওঠেন। তিনি গভীর আকুতিতে দু'হাত জোড় করে প্রার্থনা করেন ঃ হে প্রভু, আমার সমস্ত ঔদ্ধত্য, সমস্ত কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা কর। চোখ মেলে তাকাও প্রভু। বকুলমালার প্রার্থনা শূন্যে ধাক্কা খেয়ে পুনরায় তার কাছেই ফিরে আসে। আত্মীয়-স্বজন, বংশ-পরিবার, প্রত্যেকেই বলাবলি করছে, বকুলমালা তার বিপথে যাওয়া সন্তানদের আর উচ্ছন্নে যাওয়া সংসারটাকে উদ্ধাব করতে পারবেন না। এটা তার প্রাপ্য। অত্যাচারী, নিষ্ঠুব শাসকের মত ছিলেন একসময় বকুলমালা। তিনি লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলা থালার ভাতে সমস্ত মেঝে সাদা হয়ে পড়েছিল। ছুঁড়ে ফেলা হাঁড়ির

ভাতে কলতলা সাদা হয়ে পড়েছিল। তিনি ছুঁড়ে মারা কাটারির আঘাতে ননদ শীতলার হাত কেটেছিল। দেবর বোনটি উপোস করে কলেজে যাওয়া-আসা করত। শীতলার ঠিক হয়ে যাওয়া বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছিল সে। শীতলাকে বিয়ে করতে চাওয়া নিশ্চিত একটা বরের কাছ থেকে, নানা কারসাজি করে বকুলমালা তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। জালে বন্দী হরিণের মত নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে শীতলা ছটফট করছিল। শীতলা আর বোপটির মুক্তির পথ যেন চারপাশ থেকে রুদ্ধ হয়ে পড়ছিল।

বকুলমালার দেহ মন অবশ হয়ে পড়ল। মন থেকে জোর করে সরিয়ে দিলেও মনটা বিবেকের দংশনে জ্বলেপুড়ে ছাই হবার কথা। ধূমায়িত এক কাপ চা নিয়ে সুকুমার দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিল। অর্ধেকের মত চা-টা খেয়ে সে কাপটা বারান্দার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিল। বোনদের সম্বোধন করে সে গরগর করে উঠল, চা নাকি মূত এসব? সে বোনেদের সামনে দাঁড়িয়ে সবসময় বলা কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করল—'তোদের দুজনের বাইরে আর কোন মেয়ে আমাদের ঘরে আসতে পারবে না, বুঝেছিস। আর তোরাও, ঐ বাঁদরীবা শুনছিস তো, অন্য মানুষের ঘরে যেতে পারবি না। বুঝেছিস। কে এসেছিল—কে এসেছিল বললি? সহদেবের স্ত্রী? সে কেন এসেছিল? আজও এসেছিল নাকি?'

বকুলমালা ধমকে উঠলেন ঃ চুপ কর। পাগলামি শুরু হয়ে গেল নাকি? সুকুমার মায়ের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে দুপদাপ করে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল। তার দড়াম করে দরজা বন্ধ করার শব্দে সমস্ত বাড়িটা সচকিত হয়ে উঠল।

সহদেবের সঙ্গে বিয়ে হওয়া নয়না নামের মেয়েটি আসার পর থেকে সুকুমারের মধ্যে অদ্ভুত সব পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তাব ভয় হয়েছে—তাদেব একমাত্র দাদা সহদেব তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ওরা কি খাচ্ছে, কি পরছে—সে সব কোন কথাই সে ভাবনাচিন্তা করেনি। তার মধ্যে পিতার মৃত্যুতে সহদেব হঠাৎ ঘরে এসেছিল। মানুষ বলাবলি করছিলল—এবার সে আর ফাঁকি দিতে পারবে না। লোকের বিস্ময়কর কৌতুহলী দৃষ্টি নয়নাকে যেন একেবারে উলঙ্গ করে দিল। তার হৃদয় কসাইয়ের ব্যবহৃত ছাগলের মাংসের মত ঝুলে রইল। সে সহদেবের ঘর দুয়ার অবলম্বন করে মমত্ববোধের সুবাস খুঁজে বেড়াতে লাগল। সুকুমার তাকে দেখে খোড়লে মুখ লুকোল। মায়ের প্রতি তীব্র ঘৃণায় সুকুমার সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। মা চেয়েছিল মেয়েটির সঙ্গে তারা আত্মীয়তার সুরে কথা বলুক। ঘরটা উপচে উঠুক। কোন একটা ঘর থেকে ভেসে আসুক গানের গুনগুন সুর। সুকুমার মাকে সচকিত করে দিচ্ছিল, 'সময় থাকতে ওকে তাড়িয়ে দে। ও আমাদের দাদাকে নিয়ে যাবে। বাবাকে যেভাবে তুই আলাদা করে নিয়েছিলি। ঐ কুকুবনি, তুই যেভাবে কাকা আর পিসির কাছ থেকে বাবাকে কেড়ে এনেছিলি।'

সুকুমারের দু'পাটি দাঁতের ঘর্ষণ শোনা গেল। তার বাবাকে মনে পড়ল। বাবা তখন রেডিওতে খবর শুনছিল, খবর শেষ হওয়ার পর গান বাজছিল—'এত সুন্দর মুক্তোর মালা তুমি কোথায় পেলে দান।' এই গানটা বাবা খুব ভালোবাসত। গানটা যেন বাবার মুখে সবসময় লেগে থাকত। হৃদয়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল গানটার সুর। বাগানের আগাছা নিড়ানোর সময় গুনগুন করে বাবার গাইতে থাকার সময় কখনও হঠাৎ মায়ের সজোরে ছুঁড়ে ফেলা কাঁসার থালার আওয়াজ ঘরের ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিত। থালা-বাটি ছুঁড়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কাকা আর পিসিকে উদ্দেশ্য করে মা জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ ছিল। পিসি ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল। কাকা প্রায়ই উপোস করে থাকত। সেই সময় বাবা একটা খড়ি হাতে তুলে নিতেন। বকুলমালা পা ছড়িয়ে কাঁদার মানুষ ছিলেন না। কিন্তু না কেঁদে সারা রাত বাইরে বসে থেকে তিনি ত্রিশ বত্রিশ বছরের স্বামীর উপরে অদ্ভুতভাবে

প্রতিশোধ নিতেন। দাদা সহদেবের পাশ থেকে উঠে গিয়ে দিনের দুর্দান্ত বাবা রাতের বকুলমালার কাছে কাতর হয়ে পড়ত। মা-বাবার সম্পর্ক সুকুমারের মনটাকে পঙ্গু করে ফেলল। প্রচণ্ড নাবীবিদ্বেষ তার মনে জন্ম নিল। নারী তার মনে চাঁদ বা জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য হয়ে রইল না আর। নারী হয়ে পড়ল মান-অভিমান, দায়িত্ব জ্ঞানহীন অন্যায় আব্দারের জ্বলন্ত এক টুকরো আগুন। এই নারীকে ভালবাসা যায় না, প্রশ্রয় দেওয়া যায় না, শ্রদ্ধা করা যায় না, স্নেহ করা যায় না।

একটা কীটের মত সুকুমার তার অন্ধকার কুঠুরির মধ্যে বাসা বানাল। দিনের বেলাটা সে তার কুঠুরিতে ঢুকে থাকে আর রাতে উজাগরে কাটায়। সুকুমার কিছু অশ্লীল বইপত্র যোগাড় করে পড়তে শুরু করে দিল। সুকুমারের সরীসৃপের মত শীতল দেহে সেই বইগুলি কিছু উত্তাপের সঞ্চার করল। তার দাদা সহদেবও তো তার মতই একটা জীবন বেছে নিতে পারে। মেয়েদের কী প্রয়োজন?

সুকুমার লেপটা নিয়ে তার শরীরটাকে পরিপাটি করে ঢেকে নিল। নয়না নতুন বেশে আসার দিন সে সহদেব বাতিল করে দেওয়া একটা পুরনো শার্ট পরেছিল। নয়না শার্টটার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল, ধনটি না? ইশ্, আমি তোমাকে একেবারে তোমার দাদা বলেই ভেবেছিলাম। তার শার্টটায় তোমাকে একেবারে তার মতই দেখাচ্ছে। তারপরই নয়না স্বর নামিয়ে বকুলমালাকে আস্তে করে বলেছিল, 'মাসিমা, শার্টটা ধনটিকে খুলে দিতে বলুন তো। আমি নিয়ে যাই। এই শার্টটা, এই শার্টটা। নয়না মুখটা ঢেকে রেখেছিল। সুকুমার সহদেবের শার্টটা শরীর থেকে খুলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। নয়না সহদেবের শার্টটা চিনতে পারে, সে বাতাসে শার্টটার সঙ্গে মিশে থাকা সহদেবের গন্ধ পায়। এই মেয়েটি সহদেবকে কেন তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে না? সহদেব চলে যাবে। সে মুক্তি পাবে। সে কেন চলে যাবে? সে কেন মুক্তি পাবে? সে একটি মেয়ের দেহ স্পর্শ করবে। কেন করবে? নয়না কেন কেবল সহদেবের হবে? নয়না তাদের চারজনের একচেটিয়া সম্পত্তি হবে—নাহর, টগর তার আর সহদেবের। ঐ যে নয়না পুনরায় আসছে। সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে, 'ধনটি দেখি ওঠো তো। এত দেরি পর্যন্ত ঘুমোয় নাকি? ধনটি, সুকুমার বেশ অবাকই হল। তার নাম তো ধনটি নয়। ও এটা তাহলে মেয়েটি তার একমাত্র দেওরকে দেওয়া আদরের নাম। সুকুমার মুখ ভেঙচাল, বজ্জাতি। ও আমাকে ধনটি বলে ডাকে। সে দড়াম করে দরজাটা খুলে আসার মত করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নয়নার খোঁজ করল। বাগানের লাল কাঁচালঙ্কা কয়েকটা ছিঁড়ে বকুলমালাকে রান্নাঘরে ঢুকে যেতে দেখে সে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। সে মাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করার মত জিজ্ঞেস করল—'সহদেবের স্ত্রী এসেছিল নাকি? আমার মনে হল যেন কণ্ঠস্বর শুনলাম। বকুলমালা ধমকের সুরে বলে উঠলেন, 'অনবরত মেয়েটিকে দেখতে থাকিস নাকি? মগজ ঘোলা হয়ে গেছে? কামকাজ করার কোন নাম নেই, মগজ আর কীভাবে ঠাণ্ডা থাকবে। যা, একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে আয়।

সুকুমার মায়ের দিকে তেরচা চোখে তাকিয়ে সোজাসুজি কলতলায় গিয়ে দাঁড়াল। সে ঘটাং ঘটাং শব্দে পাম্প করে বালতি ভরে জল নিয়ে মুখ-হাত ধুল। কয়েকটা হাঁস কলতলায় নোংরা খুঁটে খাচ্ছিল। সে হাঁসগুলিকে বাগানের দিকে দৌড়ে নিয়ে গেল। হরিতকি, চতিয়না আর কয়েকটা তাম্বুল গাছ নিয়ে সুকুমারদের বাগানটা পরিত্যক্ত বাগানের মত হয়ে পড়েছে। কচু, ঢেঁকি, অদরকারী ঘাস-বনে জায়গাটা ছেয়ে ফেলেছে। সুকুমার একটা ছোট ছেলের চঞ্চলতার সঙ্গে হাঁসগুলিকে বাগানের শেষ সীমা পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেল। তার মনে হল নয়না যেন দরজার সামনে থেকে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার হঠাৎ লজ্জা করতে লাগল। সে দুই হাতে খালি গা-টা ঢাকতে চেষ্টা করল।

একজন অপরিচিত যুবতী, সে তার নতুন বৌদিও হোক না কেন—তার খালি গা-টা দেখছে। কম লজ্জার কথা না কি সেটা? বৌদি যেন তাকে ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'ধনটি, তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না?' সুকুমার মাথা নিচু করে রইল। চোখের পলকে সে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা বৌদির কাল্পনিক অবয়বটি থেকে নিজেকে আড়াল করল। সুকুমার বাগানের একেবারে পেছনদিকের শিমূলগাছের আড়ালে লুকোল। শিমূলগাছের নিচে তার বাবার দেহটা দাহ করা হয়েছিল। সুকুমার শিউরে উঠল। সে দৌড়ে এসে মায়ের পাশে দাঁড়াল। সুকুমার ধড়াস করে মাটিতে ছিটকে পড়ল। তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে লাগল। সে জোরে জোরে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। নাহর, টগর তার হাতের তালু গরম তেল দিয়ে মালিশ করতে লাগল। বকুলমালা গরুর চামড়ার একপাটি স্যাণ্ডেল তার নাকের সামনে গুঁজে দিল। হাত-পা খিঁচে একটা সময়ে সুকুমার শান্ত হয়ে পড়ল। মুখের ফেনা মুছে দিয়ে নাহর আর টগর তার দেহটা কোনমতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।

সুকুমারের এই রোগটা গত কিছুদিন ধরে প্রায়ই হচ্ছে। একটা সময়ে সহদেবেরও এই রোগটা ছিল। এই রোগটি তাকে ধীরে ধীরে কাবু করে ফেলছিল। ঘন ঘন রোগাক্রান্ত সুকুমার অদ্ভুত আচরণ করতে শুরু করেছে। ঐন্দ্রজালিক ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে সে। সে কল্পনা করে নিয়েছে সহদেবের অনুপস্থিতিতে সে ঘরের কর্তা। ঘরের মেয়েরা তার কথামত চলতে বাধ্য। তার দায়িত্ব বেড়ে গেচে। এখন তাকে নয়নারও অভিভাবকত্ব নিতে হচ্ছে। তার অনুমতি ছাড়া ওরা কেউ লক্ষ্ণরেখা পার হতে পারবে না। লোকেরা বকুলমালাকে বলেছে, 'ওকে কাজে লাগিয়ে দিন। বাড়ির সামনাটাতে একটা দোকান দিয়ে দিন। ছেলেটা অধঃপতনে যাচ্ছে। কুঠরিতে ঢুকে সারাদিন সে কি করে তার কোন খোঁজ রাখেন কি? আপনি তার ঘরের বিছানাপত্র, অন্যান্য জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে দেখেছেন কি? সুকুমার নাকি মুচকি মুচকি হাসতে থাকে? পাগলের মত সে নাকি আজকাল একা একাই হাসতে থাকে? একা একাই কথা বলে?'

বকুলমালা অস্থিরতা অনুভব করেন। তিনি বড় অসহায় বোধ করেন। তিনি কিভাবে বলেন, নিজের ছেলেকে কি বেশে দেখে তিনি ভূত দেখার মত চমকে ওঠেন। আজকাল সে অনবরত সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে মুখ হাত ধুতে থাকে। সাবান ঘষে ঘষে সে ক্ষয় করে ফেলে। তার হাত-পায়ে সাবানের টুকরো আঠার মত লেগে থাকে। সাবানের ফেনা শুকিয়ে থাকে। হাত-মুখ ধুয়ে সে মুখে ক্রীম ঘষে। পাউডার দিয়ে সমস্ত শরীর সাদা করে ফেলে। চুলে তেল দেয়। কানের লতি বেয়ে তেল নেমে আসে। নাহর, টগর তার ভয়ে তেল, সাবান, পাউডার ইত্যাদি তাদের প্রসাধনের অপরিহার্য সামগ্রীগুলি লুকিয়ে রাখে। সুকুমার কখনও কখনও ওসবের খোঁজে সমগ্র ঘর তোলপাড় করে বেড়ায়। তারা বের করে দিতে বাধ্য হয়। অসন্তুষ্টির সঙ্গে বলে, এত দামি জিনিসগুলি তুই মিছামিছি এভাবে নষ্ট করছিস কেন? আমাদের কে এনে দেবে? ছেলেরা এসব না মাখলেও তো হয়। সুকুমার কপাল কুঁচকে বলে, 'কেন? আমাকে সুন্দর হতে নেই? মেয়েরা আমাকে ভালোবাসার কোন প্রয়োজন নেই? মেয়েরা আমার দিকে চেয়ে হাসার প্রয়োজন নেই? তোরা আমাকে হিংসে করিস। দাদাকে ভালবাসিস। সে যেন সাবান দিয়ে স্নান করে। এখন তো তার একটা বউ-ও রয়েছে। বৌ তাকে ভালবাসে। সে মুখে পাউডার দেয়। বকুলমালার হাতে পায়ে কম্পন ওঠে। সমস্ত রাতটাই চোখের পাতা এক করতে না পেরে জেগে বসে থাকেন। তার রক্তচাপ বাড়তে শুরু করে।

বকুলমালার কখনও কখনও নয়নার উপরেও রাগ হয়। কি দরকার ছিল মেয়েটির আসার? কেন সে তার হৃদয়ের নিভৃত কোণে স্বপ্নের বীজ বপন করতে গিয়েছিল। বকুলমালার উচ্ছন্নে যেতে চলা সংসারটা যেন আবার সজীব হয়ে উঠেছে, পবিপূর্ণ হয়ে উঠেছে শূন্য ঘর, নুপুরের নিক্কনে মুখরিত হয়ে উঠেছে বাড়ির অন্দরমহল। নতুন মেয়েটির হাসি, এখানে সেখানে ছিটকে পড়া তার না-ভাবা, না চিন্তা করা প্রাণময়তায় ভরপুর কথাগুলি যেন ধুয়ে নিয়ে গেছে সমস্ত দীর্ঘশ্বাস। নয়নার বিস্তৃত স্বপ্ন, প্রচণ্ড ভালোবাসার উত্তাপ, বিষণ্ণতা, দ্বিধা সংশয়, অবিশ্বাসের কুয়াশা ভেদ করে নাহর, টগবের হৃদয়কে করে তুলেছে পরিষ্কাব। স্বাভাবিক প্রাত্যহিকতা ফিবে এসেছে বকুলমালার ভগ্নপ্রায় সংসারে। বকুলমালা থমকে গেল। এ কি সম্ভব? সহদেবের খোঁজে আসা মেয়েটির সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। আগে সে কখনও পাশের বাড়িতে ফোন করে তাকে ডেকে পাঠাত। ভাল-মন্দ খোঁজখবর নিত। অনেকদিন হয়ে গেল সে তাদের কোন খোঁজখবর নিচ্ছে না। একদিন তাকে নাহব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল—'তুমি কেন আমাদের বিরক্ত করো। মায়েব সময় নেই। ফোন করবে না।' অপরপাশে মেয়েটি বোধহয় হতভম্ব হয়ে পর্ড়েছিল। সে অপ্রস্তুতভাবে জবাব দিয়েছিল, 'আমি তোমাদের ভাল চাই। কারণ আমি সহদেবের কথাগুলি জানি।' জান যদি ভাল কথা। কিন্তু সে তো তোমার কথা আমাদের বলে নি। তাই আমরা তোমাকে জানি না।' নয়না হাসাব চেষ্টা করল। তীব্র অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল নয়না। সে সহদেবের মনটা স্বচ্ছ কাচেব মত দেখতে পাচ্ছিল। তার অন্তর্দৃষ্টিব আলোকে আলোকিত হয়ে উঠেছিল সহদেবের ভূত-ভবিষ্যৎ। সে বকুলমালাব সংসারেও প্রতিটি খুঁটিনাটি দেখতে পাচ্ছিল।

মনে হয় সহদেবেব সঙ্গে নযনার সহবাস ঘটেই নি। বকুলমালার ঠিক সেবকমই মনে হচ্ছিল। তাব যেন কোন দৈহিক তাড়নাই ছিল না। একটা আশ্চর্যজনকভাবে স্বপ্নালু মোহগ্রস্ত মন নিয়ে সে যেন সহদেবের চারপাশে প্রদক্ষিণ করছিল। বিছানার মহিমা আর পুরুষের সঙ্গসুখ কী সে ভালভাবে বুঝতেই পারে নি। সিঁদুর মুছে ফেললে সে বিশুদ্ধ কুমাবী মেয়ে। অনভিজ্ঞ মন, পবিত্রতাব প্রলেপ মাখা অনাস্বাদিত একটা জীবন। বকুলমালা তাকে নির্মোহভাবেই একজন নাবীর প্রতি অন্য একজন নারীর সহমর্মিতা এবং তাব বয়সের প্রাজ্ঞতা নিয়ে বলেছিল, তুমি এখনও কুমারী মেয়ে। আমি আমার ছেলেকে জানি। সে তোমার প্রেম এবং বিশ্বাসের যোগ্য নয়। গান্ধারীর মত চোখে কাপড় বেঁধে ক্রোধ, ক্ষোভ, বিতৃষ্ণায় আমার বিদ্রোহ এবং অপ্রেমের বহ্নিমান একটা অগ্নিকুণ্ড গর্ভে ধারণ করে তাকে যেন জন্ম দিয়েছিলাম। তুমি জান না ও কাঁদতে জানে না। সে নারীকে স্পর্শ করতেও জানে না। সিঁদুর মুছে ফেল তুমি। নয়না হাহাকার কবে উঠেছিল 'এটা কীভাবে সম্ভব? মাসি এই সিঁদুর আমি মুছতে পারব না। আমি আমার মনটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পাবি না। এই সিঁদুরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সহদেবের আয়ুষ্কাল। সে বকুলমালাকে বিহ্বলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিল, 'একজন মহিলার সঙ্গে সহদেবের সম্পর্ক থাকার কথা শুনেছি। আপনি জানেন কি?' বকুলমালা চমকে উঠল। নারীর এই চিরন্তন আকুলতা, ঈর্ষা, অবিশ্বাস কিম্বা সন্দেহ- -এই নিযেই তো নারীর জীবন। যে জীবনের শিকড় মাটির অনেক গভীরে সাগরের তল পর্যন্ত প্রোথিত থাকে। হ্যাঁ, তিনি জানেন সহদেবের একজন বন্ধুপত্নীর বিধবা সুমলার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। এই ধরণের সম্পর্ক রক্ষার জন্য তাকে পিতৃত্বের কোন দায় নিতে হবে না। ক্ষুধাতুর একটি নারীকে কেবল তৃপ্তি দিতে হবে তাকে। বকুলমালা অনুভব করল এ ধরণের সম্পর্কের জন্য নয়না নির্ভরযোগ্য সঙ্গী নয়। প্রেমের আবির মাখা মনের কাছে সে যেন একটা বিমূর্ত ব্যক্তিসত্তা। নয়নার অনুভব করা ঈর্ষার মত

বকুলমালাও একটা সময়ে ঈর্ষায় দগ্ধ হয়েছিল। তার স্বামীর সহকর্মী মহিলা একজনের সঙ্গে থাকা সম্পর্ক তাকেও তিল তিল করে দগ্ধ করেছিল। তিনি আজও জানেন না তার স্বামীর মনের সঙ্গোপনে সত্যি সত্যিই কোন পরনারীর পরকীয়া প্রেমের ছায়াপাত ঘটেছিল কিনা। কথাটা কতটুকু সত্যি ছিল বা কতটুকু মিথ্যে। এখন তিনি ভাবেন, ঘটে থাকলেও সেটা ছিল খুবই সাধারণ ব্যাপার। নিতান্তই স্বাভাবিক। কখন যে তার নিজেরই অজ্ঞাতে ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল হৃদয়ের গভীরে কুরে কুরে ঢুকে যাওয়া সেই ঈর্ষা-অভিমান। জীবনের শুকনো বালিচরে মুখ গুঁজে পড়ে রইল নিরুত্তাপ নিরুদ্বিগ্ন শান্ত এই মন। যে মন বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে যন্ত্রণার উপকূলে ঘষা খেতে খেতে মসৃণ হয়ে পড়েছে। একটা সময়ে বকুলমালা স্বইচ্ছায় নিজেকে কষ্ট দিয়ে তার স্বামীর আত্মীয় স্বজনদের দৃষ্টিতে ক্ষতিকারক কিছু কাজ করে এক ধরণের তৃপ্তি পেয়েছিল। তিনি স্বেচ্ছায় ভুল করেছিলেন। পরে তিনি নিজের অজান্তেই ভুল করতে শুরু করলেন, ভুলগুলি যেন সর্বনাশা ছায়ার মত পেছনে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। নয়না আসার সময় তিনি যদি মাতৃত্বের অধিকার, মমত্ববোধের কর্তৃত্ব নিয়ে সহদেবকে বলতেন, 'বাবা মেয়েটি এসেছে, থাকুক। ও আমাদের সঙ্গেই থাকবে। তোর তাতে ভয় পাবার কি আছে? নয়না তোর বিষয়ে না জানা কথা নেই। সমস্ত কিছু জেনেশুনেই তো সে এগিয়ে এসেছে। সুকুমার ওদের নয়না তো নিজের ভাই-বোনের মতই ভাবছে।' বকুলমালা সেভাবে বলতে পারল না। নাহর, টগর যেন বকুলমালাকে পাহারা দিয়ে রইল। ওরা দুজনেই মায়ের মুখে তাদের ভাষা যুগিয়ে দিয়ে বলাল, 'দেখ আমি কী করব। তোমাকে কীভাবে রাখব? দুটি মেয়েকে এখনও পাত্রস্থ করতে পারিনি। ওদের একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ছেলের বউয়ের আশা কীভাবে করতে পারি? নাহর, টগর বকুলমালার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বকুলমালা শক্তিহীন হয়ে পড়লেন। সহদেব বেরিয়ে যাবার রাস্তা খুঁজছিল। সে প্রজাপতি হতে চাইছিল। অদৃশ্য একটা শক্তি তার অভিশাপগ্রস্ত অদৃষ্ট আশেপাশের দুর্ভাবনাগুলি যেন তাকে চেপে ধরল। তার পাখা পুড়ে গেল। নিজের থেকে পালাতে গিয়ে নিজের মনকে ফাঁকি দিতে গিয়ে মুখের নিচে মুখ লুকনোর জন্য সহদেব যেন হঠাৎ পুনরায় একটা মহার্ঘ সুযোগ পেয়ে গেল। সহদেব বড় করুণভাবে পরাজয় স্বীকার করে নিল। বিবেকশূন্য, ক্লীব একটা মন নিয়ে সহদেব হঠাৎ অনেক অনেক নিচে খসে পড়ল। বকুলমালার অধিকারশূন্য হয়ে আসা নিঃস্ব মনটাতে আরও একটা বিষণ্ণ কোপ পড়ল। লোকেরা বলাবলি করতে শুরু করল---'অকালকুষ্মাণ্ড একটা পাষণ্ডের জন্ম দিয়েছে বকুলমালা। হৃদয়হীন একটা জল্লাদের বীজ ধারণ করলে তুমি বকুলমালা। অঙ্কুরেই নষ্ট করে ফেলা উচিত ছিল এই ভ্রূণ। দুঃখের কারণ হতে পারত না। পাপের ভাত খেয়ে, পাপ-বাসনা নিয়ে জন্ম দিয়েছিলে মায়া, মনুষ্যত্ব, বুদ্ধি-বিবেকহীন এই দস্যুদের। এরা নিজেরাই শুধু দুঃখী নয়, যারা এদের সংস্রবে আসবে তাদেরও দুঃখী করে তোলাই এদের কাজ। তোমার কুলাঙ্গার পুত্র কী কৌশলে, কী ধরণের ভেল্কিবাজিতে তার কবলে বন্দী করেছে এই মেয়েটিকে।' লোকগুলি নিজেদের মধ্যেই অঙ্গভঙ্গী করে হাসাহাসি করতে লাগল। বোকা মেয়ে ছিল বোধহয়। সুকুমার ছিল সুমলার বুকের মাপজোক জানা পাকা খেলোয়াড়। মেয়েদের সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি করে সে কথা বলত না। এভাবেই চুপ করে থেকে বকুলমালার ছেলে চোরের মত মনে সিঁধ কেটে বেড়াত।

অসহ্য যন্ত্রণায় বকুলমালা কঁকিয়ে উঠলেন। তিনি কীভাবে বলেন তার ছেলে সহদেব সে ধরণের নয়। তাকে এত নির্মমভাবে বিচার করো না। তার প্রতি এত নিষ্ঠুর হয়ো না। সে এই

মেয়েটিকে বড় আদরের সঙ্গে জীবনসঙ্গিনী করার কথা ভেবেছিল। আমার ছেলে লম্পট ছিল না। গভীর আত্মোপলব্ধিতে বকুলমালা বিনম্র হয়ে উঠতে লাগলেন। জীবনটা তাকে আবার ছলনা করল। গৃহকর্ত্রীর ক্ষমতায় গর্বিত হয়ে চূড়ান্ত স্বার্থপর আর আত্মকেন্দ্রিক ছিল এক সময়ের যুবতী বকুলমালা। স্বামীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, উপার্জনের টাকায় তিনি ছিলেন এক বিশাল সংসারের সম্রাজ্ঞী। স্বামীর বর্তমানে এক ধরণের অহংকার শিকড় মেলছিল তার চেতনা-দৈন্য মনে। সহদেবের খোঁজে আসা মেয়েটি সেই মনে একটা কম্পনের সৃষ্টি করল। তিনি এতদিন পর্যন্ত না-দেখানো বোঝা, অনুভব করতে না-পারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কিছু কথা তার মনের পর্দায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল। সন্তানদের একান্ত নিজের করে পাবার তাড়নায় তার মাতৃহৃদয় অহর্নিশি কাঁপতে লাগল। তাদের পুনরায় নতুন করে মানুষের দায়বদ্ধতা, স্পর্শকাতরতা, সুন্দরতায় গড়ে তোলার জন্য তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। অভিশাপ। অভিশাপ। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, 'কোন এক দুষ্টগ্রহের প্রভাবে তোমার ঘর-সংসার ছারখার হতে চলেছে বকুলমালা। তিল তিল করে কষ্ট ভোগ করা তোমার দেবর, ননদ, শ্বশুর শাশুড়ির অভিশাপে তোমার সংসার উচ্ছন্নে যাচ্ছে। মনোকষ্ট ভোগ করে করে তোমার শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে। দেবর, ননদকে কোনদিনই পেটভরে খেতে দাও নি। তোমার ছেলে সহদেবের খোঁজে আসা মেয়েটিকেও আপন করে নিতে পারলে না। বিধাতার দেওয়া ধনের পোঁটলা হাত পেতে নেবার সময় চোখ বুজে কানার ভান করা সেই চিরদুঃখী হতভাগার মত আচরণ করলে তুমি বকুলমালা।'

বকুলমালা অস্থির হয়ে পড়লেন। পারবেন না, তিনি পারবেন না মনের দাবীদাওয়া মেনে নিতে পারবেন না। শিকারি বাঘের চোখের মত ওদের জ্বলতে থাকা চোখ তার আশা পুড়ে ছারখার করে দিয়েছে। বকুলমালা স্বপ্ন দেখারও অধিকার হারিয়ে ফেলেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে ভয়ানক নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন তিনি। একটা সময়ে সুকুমারের শৈশবকালটা তাকে মুগ্ধ করেছিল। কত ভাল ছেলে ছিল সে। পড়াশোনা করত সে, খেলাধুলো করত। হাফ প্যাডেলে এই গোলাকার উঠোনটাতে সে সাইকেল চালাত। আর এখন সেই মা-ই সেই প্রিয় ছেলের মৃত্যুকামনা করে। ও মরাই ভাল। ও মরে না কেন? বিষ খেয়ে মরুক, ফাঁস লাগিয়ে মরুক, না-হলে সন্ত্রাসবাদী হয়ে যাক। মরুক, মরুক, দেশের দশের নামে গুলি খেয়ে মরুক। বকুলমালা ফোঁপাতে লাগলেন। তিনি অস্ফুটস্বরে বললেন---'নাহলে প্রভু আমাকেই নিয়ে যাও।'

আজ সকালে সুকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। সহদেবের ফেলে যাওয়া শার্ট প্যান্ট পরে, মুখে পাউডার ঘষে সে তেরাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে। সে খুব ব্যস্ততার সঙ্গে রাস্তায় এদিক ওদিক করছে। যেন তার কারুর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। যেন তার কারো সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। অত্যন্ত জরুরী কাজে তার যেন কারো সঙ্গে দেখা করার কথা অছে। সে কাচ-ভাঙা, সেকেণ্ড আর মিনিটের কাঁটা খসে পড়া বন্ধ একটা ঘড়ি পরে নিয়েছে। মাঝে মধ্যে হাতটা নেড়েচেড়ে সে ঘড়িটা টিকটিক শব্দে ঠিকমতো চলছে কিনা দেখে নিচ্ছে। হাত দুটো কোমরে রেখে সে কোন একদিকে গলা বাড়িয়ে দেখছে। তাকে দিয়ে যাওয়া নির্ধারিত সময়ে কেউ যেন এখনও এসে পৌছায় নি। বকুলমালা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কাতরভাবে তাকে হাতের ইশারা করে ডাকল, 'আয় সুকুমার ঘরে আয়। সুকুমার এখনও পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে যায়নি। কিন্তু এই বেশে এভাবে থাকলে মানুষের মুখ থেকে বেরুনো কথাগুলি বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে না কি? কে আসবে তার মেয়েদুটিকে বিয়ে করতে।

ভেতরে নাহর আর টগরের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে। ঘরের নোংরা ফেলা, কাপড়-চোপড় ধোয়া জাতীয় কোন কাজের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে ওদের দুজনের মধ্যে বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। লেগেই রয়েছে। ওদের দুজনের মধ্যে প্রায়ই ছোটখাটো ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকে। কখনও কখনও ঝগড়াটা মারাত্মক রূপ নেয়। একজন আরেকজনের চুলে খামচে ধরে। কেউ বা ধারালো ব্লেড দিয়ে হাতের শিরা কাটতে চায়, দিনের পর দিন ধরে ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে না। একজন আরেকজনের ছায়া মাড়াতে চায় না। একজন সামনে থাকলে অপরজন পেছনে থাকে। অপরজন সামনে থাকলে আরেকজন পেছনে থাকে। ওদের ঘোলা চোখ আর ভার হয়ে থাকা মুখ ঘরটাকে অমাবস্যার আঁধারে আবৃত করে রাখে। আর এইসবের মধ্যে দুর্বল সাঁকো হয়ে এই ভেঙে পড়ব, এই পড়ব ভাবে ঝুলে থাকেন বকুলমালা। বকুলমালা চোখের কোণ-দুটি মুছে নিলেন।

নিজের সন্তান, স্বামীকে নিয়ে সুখে থাকার ইচ্ছেটা কি পাপ ছিল? বকুলমালা সেরকম ভাবাটা যদি পাপ ছিল, তাহলে সে রকম পাপ প্রত্যেক নারীই করে থাকে। কেবল তাকেই দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে কেন? তার দেবর, ননদ তো এখন সুখেই আছে। তার উঠোন শূন্য হয়ে রইল কেন? শ্মশানের নিস্তব্ধতা গ্রাস করে ফেলেছে তার সংসার। নাহর, টগর কবুতরের কূজন শোনার জন্য সারা রাত কান খাড়া করে রাখে। হাতের রেখায় সোৎসাহে খুঁজে দেখে বিয়ের লগ্ন ঘনিয়েছে কি না।

ঃ 'ঐ বান্দরীরা, হবে না, হবে না। তোদের কিছুই হবে না। ঘরের মধ্যেই পচে মরবি। আমাকে হিংসে করিস তো।' সুকুমারের সুস্থতা কামনা করে বকুলমালা আকুল হয়ে উঠল। তিনি আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেড়ানো পাঁচটাকা সুকুমারের হাতে দিয়ে এক প্যাকেট লবন দোকান থেকে কিনে আনতে দেবার কথা ভাবলেন। তাকে খড়ি দুয়েকটা ফালা করার জন্য বলবেন ভাবলেন।

সুকুমার বেশ কিছুক্ষণ সময় তেরাস্তার বটগাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ বড় জরুরী কিছু একটা কথা মনে পড়ার মত সে দ্রুত ঘরে ফিরে এল। সময় বড় কম, আর তাকে অনেক বেশি কাজ করতে হবে। সাংঘাতিক ব্যস্ততার সঙ্গে সে কলের পারে গেল। সে শার্টের হাত দুটি গুটিয়ে সাবান ঘষতে শুরু করল। হাত-পা ধুয়ে সে পাউডারের ডিবেটা খুঁজতে শুরু করল। পাউডার না ঘষলে যে চলবে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের দেহটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সে চিরুণি খুঁজতে গিয়ে হুলুস্থুল লাগিয়ে দিল। সে ভেবে নিল পোর্টিকোতে একটা সুন্দরী মেয়ে বসে রয়েছে আর তাকে মেয়েটির পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। বকুলমালা তার হাতে হাত রেখে ক্রন্দনরত অবস্থায় বলল, 'তুই কেন এরকম করছিস বাবা আমার? ভাত দিই, খা। ঘরে থাক। নাহর-টগর ছেলেটার মাথায় তেল-জল মিশিয়ে দে তো। তিনি সুকুমারের হাত ধরে টানতে লাগলেন। সুকুমার মায়ের দিকে আরক্ত চোখে তাকিয়ে এক জায়গাতেই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়া দুগ্ধপোষ্য বুকের ব্যথার মত যন্ত্রণায় বকুলমালা কঁকিয়ে উঠলেন। নতুন বেশে নয়না সহদেবের খোঁজে এসে তার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বড় মমতার সঙ্গে বলেছিল, 'মাসিমা, আপনি পুত্র হারিয়ে যে যন্ত্রণা অনুভব করছেন, আমি আমার প্রিয়জনকে হারিয়ে নাড়ি থেকে গর্ভ পর্যন্ত, গর্ভ থেকে বক্ষ পর্যন্ত, বক্ষ থেকে হৃদয়ের গভীর পর্যন্ত, আমার আত্মা পর্যন্ত সমগ্র সত্ত্বা জুড়ে একই যন্ত্রণা অনুভব করতে পারছি। আপনারা যদি আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা করতেন।' বকুলমালা হাত দুটি সরিয়ে এনে বলেছিলেন, 'দেখতেই পাচ্ছো। সহদেব ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। সুকুমার পাগল হয়ে যাচ্ছে।'

ঃ আমি তাকে ভাল করে তুলতে পারব। আমি তার বৌদি।' বকুলমালা পিছিয়ে এল। তিনি আঁচল দিয়ে কপালে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে নিলেন।

ঃ কিন্তু সে আমার পুত্র হলেও তোমাকে বলছি আমি। আমার এই ছেলে অমানুষ হয়ে গেছে। সে প্রেতাত্মার রূপ নিয়েছে। তুমি কে তা সে বুঝবে না। তুমি তার বোধের অতীত। তুমি হৃদয়ে লালন করা এই সম্পর্কের পবিত্রতা, এই সম্পর্কের ঐকান্তিকতা আর অধিকারবোধ তার মর্মস্থলে আঘাত করতে অক্ষম। তুমি জান না, দাদা এলে ও দূর থেকে তাকিয়ে থাকে। দেহের সঙ্গে যেন মিলে মিশে যেতে চায়। এই আকুতি বড় মর্মান্তিক, বড় বিপজ্জনক।'

সুকুমার মায়ের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে পুনরায় দ্রুত কলপারে গিয়ে সাবান দিয়ে হাত-পা ঘষে ঘষে ধুয়ে নিল। শার্টটা খুলে অন্য একটা শার্ট পরে নিল। সে লম্বা হাতার শার্টটার উপরে অন্য একটা হাফশার্ট পরে নিল। দুটো ম্যাগাজিন কোমরে গুঁজে নিল। সুকুমার উদ্ভট রকমের সাজপোষাক পরছিল। শার্টের বোতাম ছিল পেছন দিকে। ছোট ছোট কয়েকটা মেয়ে তাকে 'সুলেমান খান' বলে ক্ষ্যাপাতে শুরু করেছিল।

বকুলমালার রক্তচাপ বেড়ে চলছিল। একদিন হঠাৎই প্রত্যাশিতভাবে মাটিতে ঢলে পড়ে বকুলমালার মৃত্যু ঘটল। হাই ব্লাড প্রেসার, হার্ট স্ট্রোকে মৃত বকুলমালার শবদেহের উপর তার ছেলেরা উপুড় হয়ে পড়ে ছিল না। দরজা বন্ধ করে সুকুমার তার ঘরে ঢুকেছিল। নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, কোথায় আত্মগোপন করে থাকা সহদেব হঠাৎ মায়ের শ্রাদ্ধের দিন আচমকা এসে হাজির হল। সে একজন মহিলার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে শুরু করেছিল। মহিলাটি সুমলা বা নয়না ছিল না। সে ছিল কোন এক রেলস্টেশনে বসবাস করা এক রিক্সাচালকের পত্নী। মহিলাটি সহদেবের ঔরসে একটি ছেলের জন্ম দিয়েছিল। সহদেব মায়ের শ্রাদ্ধে তার ছেলেটিকে নিয়ে এসেছিল। প্রথমে একটু ইতস্তত করা সহদেবের প্যান্টে খামচে ধরে ছেলেটি সহদেবের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, পরে তার সমবয়সীদের সঙ্গে নিজের ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছিল।

শ্রাদ্ধ শেষ করে সহদেব চলে গেল। তার প্রতি মানুষের মনে যেন ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে এল। সে আত্মীয়স্বজনের চোখে দিকে তাকিয়ে কথা বলার মত সাহস হারিয়ে ফেলছিল।

এইবার সুকুমারের আরও একটা নতুন ধরণের পাগলামি শুরু হল। সে নাহর, টগর যাকেই সামনে পায় তাকে তার বিয়েটা দিয়ে দেবার জন্য অতিষ্ঠ করে তোলে। সে মানুষকে বেশ দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের মতই বোঝাতে চেষ্টা করল যে মায়ের অবর্তমানে ঘর সংসার দেখাশোনা করার জন্য তার বিয়ে করাটা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। তা নাহলে মেয়েদুটিকে সবসময় চোখে চোখে রাখবে কে? তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠা বিয়ে করার বাসনা সুকুমারকে উন্মাদপ্রায় করে তুলল। বাড়ির প্রতিটি রুমে রুমে, ঘর থেকে গেটের সামনে, সেখান থেকে তে-রাস্তা পর্যন্ত তার নিরন্তর ব্যস্ততাপূর্ণ আসা-যাওয়া চলতে থাকল। সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কারো দিকে উঁকি মেরে তাকিয়েই সরে যায়। সে কল্পনা করতে শুরু করল ঘরে তার একজন সুন্দরী বউ রয়েছে। একজন সুন্দরী যুবতীর স্বামী হওয়ার, তাকে ছুঁয়ে দেখার অধিকার আর সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্ভট উন্মাদনায় সুকুমার ঘরের রুমগুলিতে সেই যুবতী নারীর পেছন পেছন ঘুরে বেড়াতে লাগল। নাহর, টগরদের সামনে হঠাৎ সে স্ত্রীকে যেন কিছু একটা বলে ফেলে লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠেছে এমনভাবে অভিনয় করতে লাগল। পুরুষ মানুষ যেভাবে মেয়েদের ধমক দেয় সেভাবে সে স্ত্রীকে ধমক দিল। অশ্লীলভাষায় গালিগালাজ করল। রাতের বেলা কাল্পনিক স্ত্রীকে সে তার বিছানায় হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে চলল।

আত্মীয়-স্বজন বলার মত তখন তাদের সেরকম কেউ ছিল না। বংশ-পরিবার কারো সঙ্গেই কোন যোগাযোগ রইল না। ওদের ঘরের অংশটুকু ক্রমশ সংকুচিত হয়ে এল। বাড়ির বেড়া-গেট ভেঙে চুরে গেল। কোন নির্দিষ্ট সীমা আর রইল না। রাজ্যচ্যুত হওয়া ক্ষমতাসীন দরিদ্র রাজার মরচে ধরা তরোয়ালটির মত বাবা তৈরি করে যাওয়া পুরনো হাবেলিটার সামনে ঝুলে রইল কেবল লোহার প্রকাণ্ড গেটটা। একটা কুকুর বকুলমালার সংসারটা পাহারা দিতে লাগল। পুরনো ভৃত্যের আনুগত্যে কুকুরটা নাহর, টগরের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সুকুমারদের ঘরের সঙ্গে বিজলীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল। অনেকমাসের বকেয়া টাকা পরিশোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঘরের পুরনো কিছু আসবাবপত্র যেমন মেহগিনি কাঠের নকশা করা খাটটা, ঠাকুরমাদের সময়কার তিতাচাপ কাঠের সিন্দুক, পাল্কি, আলমারিটা, কাঁসা-পিতলের কিছু বাসনপত্র সস্তা দামে বিক্রি করে দেওয়া হল। কিছু দুর্লভ সাজ-সরঞ্জাম বাক্সের ভেতর থেকে উধাও হয়ে গেল। বকুলমালার স্বামী তাঁর পিতার সময়কার কিছু জিনিসপত্র খুব যত্নের সঙ্গে মূল্যবান সম্পদ ভেবে রেখে দিয়েছিলেন। সেগুলির মধ্যে মূল্যবান সোনা-রূপোর গহনার সঙ্গে হুঁকো, হাতি বাঁধা রশির মতো কিছু জিনিসপত্রও ছিল। সে সমস্ত কিছুই এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইল, তার থেকেই কিছু জিনিস আবার যারা মূল্য বোঝে তারা নিয়ে গেল। সুকুমারকে সামান্য কিছু দিলেই সে সেই সমস্ত জিনিস লোকজনদের বিলিয়ে দিতে লাগল। এই সমস্ত জিনিস দিয়ে সে কী করবে, তার একজন পাত্রীর যে প্রয়োজন।

সুকুমার গায়ের কাপড়চোপড় খুলে খালি গায়ে, কখনও বা শার্টটা গলায় ঝুলিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল। কেউ কেউ তাকে একটা কনে যোগাড় করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। সুকুমার খুব ভাল করে শরীরে পাউডার ঘষল। সে একজোড়া জুতোও যোগাড় করে নিল। প্যান্টটা কোমর থেকে যাতে খুলে না যায় সেজন্য সে বেশ আঁটোসাটো করে বেঁধে নিল। তার প্যান্টের চেইনটা খোলাই রইল। মহিলারা তাকে দেখলেই মুখ টিপে হাসতে লাগল। মেয়েরা তাকে সভয়ে এড়িয়ে চলতে লাগল। তাকে তাড়ানোর জন্য লোকেরা হাতে লাঠি নিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রইল। না হলে যে পুরুষ হিসেবে বাড়ির মেয়ে-বৌদের কাছে আর নিজেদের মান-সম্মান থাকে না।

বকুলমালার প্রথম বর্ষের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন। মায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন সুকুমারের উৎপাতটা কিছুটা বেশিই হল। শ্রাদ্ধের দিন দুই একজন মানুষই মাত্র এসেছিল। বিশেষ কোন আয়োজন নেই। নিয়মটা কেবল দরকার। ঘরটা শুদ্ধ করা দরকার। এমনিতেই তিনটে পুষ্কর লাগা ঘর। সুকুমার প্রথমে গোটা ব্যাপারটাকে তার বিয়ের আয়োজন বলে ভেবেছিল। আসল কথাটা জানতে পেরে, লোকেরা তখনও তার বিয়ের চেষ্টা করছে না দেখে সে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল। ভাল কাজ করে ঘরটা শুদ্ধ করার জন্য আসা লোকেরা রাগ করে চলে গেল। সুকুমারের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বাড়ির সামনে লোকেরা ভিড় করে দাঁড়াল। কেউ কেউ আবার সুকুমারকে মারধোর করে শান্ত করার কথা ভাবল। কেউ আবার নাহর, টগরকে এই নরক থেকে মুক্তি দেবার উপায়ের কথা ভাবতে লাগল। কোন একজন মানুষ যদি এই জমির বিনিময়েও মেয়েদুটিকে আশ্রয় দেবার জন্য এগিয়ে আসত। কারো সঙ্গে ওদের দুজনকে যদি হালের গরুর মত জুড়ে দেওয়া যেত। এমনিতেও তো দুজনের মধ্যে বনিবনা নেই। সুকুমার ঘরের জিনিসগুলি লণ্ডভণ্ড করে বেড়াতে লাগল। নাহর, টগর তার ভয়ে একজায়গায় চুপ করে বসে রইল। তাদের যদি এই মুহূর্তে কেউ উদ্ধার করে নিয়ে যেত। তাদের যদি কেউ মুক্তি দিত. ঈশ্, কেউ একজন আসুক। শোয়ালকুচির ওদিক থেকে পাটের কাপড়

বেচার জন্যে যে ক'টা চোখের লোকটি আসে সেই আসুক। এ ধরণের কোন লোক এগিয়ে আসবে কি? এই ঘর বাড়িতেই থাকবে। এই দুজন মানুষের দুটো অভুক্ত পেট, অপূর্ণ আশা, তুষের আগুনের মত একটু একটু করে জ্বলতে থাকা দুটো আধপোড়া মন, বিবাহ-বাসনায় টলমল, ভবিষ্যতের নিরাপত্তার ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে পড়া দুটি মন।

গায়ের কাগড় চোপড় খুলে একেবারে নগ্ন হয়ে সুকুমার দৌড় মেরে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। লোকগুলি হৈ-চৈ করে উঠল—ধর্ ধর, ওকে ধর্। ধরে ভাল করে রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখ। নাহর আর টগর একজন আরেকজনের দিকে মাথা তুলে তাকাল। ওরা দুজনেই একজন আরেকজনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। সুকুমার লাফাতে লাফাতে দুই হাত উপরে তুলে চিৎকার করে বলতে লাগল 'খবরদার। আমাদের ঘরে কেউ আসতে পারবে না। এদের দুজনকে অবিবাহিত অবস্থাতেই থাকতে হবে। ওদের বিয়ে-থা হয়ে গেলে ঘরের কাজকর্ম করবে কে? ওরা আমার বিয়ে দেবে না। আমিও ওদের রেহাই দেব না।

নাহর টগরের চোখদুটি চিতাবাঘের মত জ্বলে উঠেই নিভে গেল। লোকেরা আবার চিৎকার চেঁচামেচি করে উঠল, কি দেখছিস, ধর্ ওকে। কিছু ছেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। বকুলমালার কথা ভেবে তারা শান্ত হল। বকুলমালার উচ্ছন্ন সংসারের জন্য তার সুখ-দুঃখের সমভাগীরা দুঃখ প্রকাশ করল। ওদের ওদের মত থাকতে দিয়ে লোকেরা যে যার পথে চলে গেল। সন্ধে হয়ে আসছিল। সমস্ত দিনের উপবাসের শেষে ক্লান্ত, শ্রান্ত ভগ্ন দেহে টগর আর নাহর প্রদীপ নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত পাগলা কুকুরের মত সুকুমার তার বন্ধ ঘরে ঢোকে, আবার বেরিয়ে এসে নাহরদের বন্ধ দরজায় আঘাত করে রাগে গরগর করে বলতে লাগল, 'কেউ আসতে পারবে না আমাদের ঘরে। শোয়ালকুচির কাপড়ের ব্যবসায়ীও আসতে পারবে না। বুঝেছিস? তোদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার জন্য যে ব্যরসায়ীটি আসে সেটাও আসতে পারবে না। আর কে ছিল জানি? সহদেবের খোঁজে আসা সেই মেয়েটি? সেই মেয়েটি?'

রাত গভীর হয়ে এল। আর সুকুমারও ...একই কথাকে একবার মুখের ভেতরে বিড়বিড় করে আবার সমস্ত ঘরে জানান দিয়ে বলে যেতে থাকল। চোখের পলকের মধ্যে সীমাহীন দুর্ভাবনা বুকে গুঁজে কালান্তক তুফানের মধ্যে বিধ্বস্ত হয়ে পড়া নাহর, টগর সুকুমারের প্রতিটি শব্দে থেমে থেমে শিউরে উঠতে লাগল। নাহর, টগরের বোধহয় একটু ঝিমুনি এসেছিল। ঘুম আসছিল না সুকুমারের। বিছানায় শুয়ে, বসে থেকে সুকুমার মধ্যরাতে হঠাৎ বাগানের পেছনের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল। মাকে তার অনেক কথা জিজ্ঞেস করার আছে। বাবার ঠিক পাশেই শিমূলগাছের দিকটাতে তার মাকেও সৎকার করা হয়েছিল।

সুকুমার বেড়ালে মাটি খোঁড়ার মত করে দুহাতে খুঁড়ে খুঁড়ে মায়ের দাহ করা উঁচু ঢিপির মত জায়গাটা খুঁড়তে লাগল। নাহর, টগর চোখ মেলে তাকাল। ওরা অন্ধকারেই একজন আরেকজনকে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে চলল। মায়ের মৃত্যুর পরে আর ঘরের অতিরিক্ত বিছানাপত্র সব বিক্রি করে দেবার পরে ওরা দুজনেই একই ঘরে একই বিছানায় শুতে শুরু করেছে। ওরা দুজনেই দুজনের শ্বাস-প্রশ্বাসের মৃদু উষ্ণ স্পন্দন নিজের নিজের হৃদয়ে খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করতে লাগল। বুকের ধুকপুক শব্দ পর্যন্ত ওরা দুজনে যেন শুনতে পেল। ঘোর অমাবস্যার রাত। আর বাইরে বহু দূরে, বহু দূরে ঐ যে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। নাহররা শুয়ে থাকা পশ্চিমদিকের রুমের দেওয়ালের ঠিক পাশেই একটা মেয়ে-বিড়াল অদ্ভুত সুরে কেঁদে উঠল। তাদের ঘরে আশ্রয় নেওয়া কুকুরটাও বিড়ালের

সুরে সুর মিলিয়ে ডেকে উঠল। কবুতরের কূজন শোনার জন্য সদাই উৎকর্ণ হয়ে থাকা নাহর, টগর ঘরের পাশে বজ্রপাতে ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে যাওয়া গাছটা থেকে খুব ধীরে ধীরে ডাকা একটা পাখির ডাক শুনতে পেল। টগর প্রথমবারের জন্য বোনের আব্দারে নাহরের গলা জড়িয়ে ধরার জন্য আর্তের মত হাতটা মেলে দিল। সে বিছানায় নাহরকে টগর খুঁজে না পেয়ে কম্পিত স্বরে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ডেকে উঠেছিল—দিদি! উত্তরে সে নাহর থেকে কোনরকম প্রত্যুত্তর পেল না।

সুকুমার পাগলের মত মায়ের ঢিপিটা খুঁড়তে শুরু করেছিল। একটা সময়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। হঠাৎ তার মনে হল তার মা তো মরে গেছে। জীবিত মানুষ সোজাসুজি কীভাবে মৃত মানুষকে দেখতে পাবে। কিন্তু তার যে মায়ের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাকেও মরতে হবে। এখনই তাকে মরতে হবে। মায়ের ভিটা খোঁড়া ছেড়ে দিয়ে সে দু'হাত দিয়ে শক্ত করে তার নিজের গলাটা টিপে ধরল। শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ায় একবার সে হাতদুটো সরিয়ে আনতে চাইল। সুকুমার হাতদুটি চেষ্টা করেও গলা থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারল না। সুকুমারের হঠাৎ মনে হল তার হাত নয়, তার হাতে সঙ্গে মিলে মিশে অন্য দুটো অদৃশ্য—ইস্পাতের মত কঠিন, সুদৃঢ় হাত যেন তার শীর্ণ গলাটায় ফাঁসের মত এঁটে বসেছে।

শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে সুকুমার হাত দুটি ছাড়িয়ে আনতে চাইল। হাত দুটি ছাড়িয়ে আনার চেষ্টায় সুকুমার মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। দিনের পর দিন পাগলামিতে পীড়িত, বুভুক্ষায় পীড়িত, রোগাক্রান্ত সুকুমারের দুর্বল অশক্ত শরীরটা মাটিতে ঢলে পড়ল। সুকুমারের নিঃশ্বাস ক্ষীণ হয়ে এল। ছোট্ট নিঃশ্বাসগুলি বুকের রক্ত থেকে ছিটকে ছিটকে তার হাত-পা, চোখ-মুখে যেন ছিটকে পড়ল। সুকুমার ধড়ফড় করে উঠল। কে যেন তার কানের কাছে মুখ রেখে প্রচণ্ড আক্রোশে, উত্তেজনায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে কর্কশ কণ্ঠে বলে চলেছে—'আমাদের মুক্তি চাই। তোর জন্যই সেই শোয়ালকুচির কাপড়ের ব্যবসায়ীটা আমাদের কাছে আসতে পারে না। শকুনের শব পাহারা দেবার মত তুই আমাদের আগলে রাখিস। আমাদের নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনার জন্য তুই কান খাড়া করে রাখিস। শেষের দিকে গলার স্বর ছিন্নভিন্ন হয়ে ভেঙে যাওয়া কাচের মতো খণ্ড খণ্ড হয়ে ঝরে পড়ল। কিছুক্ষণ ছটফট করে সুকুমারের দেহটা একটা সময়ে স্থির হয়ে গেল।

ভেতরটা একেবারে তোলপাড় করে রক্তের সঙ্গে, অশ্রুর সঙ্গে, ছিটকে পড়তে চাওয়া তীব্র চিৎকারটা বুকের মধ্যে চেপে রেখে অদৃশ্য হাত দুটি, অস্পষ্ট ছায়াটা এবার ধীরে ধীরে বকুলমালার ঢিপিটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

বাঁক

ইমরাণ হুসেইন

সুশৃঙ্খলভাবে জালটা দু'ভাগ করে, হাতের মুঠিতে সাজিয়ে নিয়ে জলে খেপ দিতে যেতেই হরেন থমকে দাঁড়াল। কুয়াশায় ভাসতে থাকা গ্রামের অপরিসর গোরু-বাছুর চলার পথ দিয়ে সে আসছে। হাঁটার অদ্ভুত ভঙ্গি এবং ভাঁজপড়া বিকৃত শরীরটার জন্যে অনেক দূর থেকেই তাকে অনায়াসে চেনা যাচ্ছে। পাতলা বাঁশ-ঝাড়ের চিকন চিকন পাতার মধ্য দিয়ে নেমে আসা জ্যোৎস্নায় ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তার কুয়াশায় ভেজা কুৎসিৎ শরীর। শরীরী হয়েও আশ্চর্যজনকভাবে অশরীরী হয়ে উঠেছে সে।

জলের উপর স্তূপীকৃত হওয়া ঘন কুয়াশার আস্তরণ আর বাঁশ-বনের সোঁ সোঁ ধ্বনির সঙ্গে ছিটকে আসা জ্যোৎস্নার আলো ছায়ায় মায়াবী হয়ে উঠেছে বিলের দুই পার। দিনের বেলাতেই ভূতুড়ে হয়ে থাকা বিলটা কুয়াশায় আচ্ছন্ন জ্যোৎস্না রাতে আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে। পরিচিত পথ-ঘাট, গাছ-পালা, বিলের পারে উল্টে রাখা ছোটবড় নৌকো হঠাৎ যেন অপরিচিত হয়ে ওঠে।

নদী দূরে নয়, বিলেরই একটা ধারা গিয়ে কলঙের সঙ্গে মিশেছে। তবুও আশেপাশে ঘিরে থাকা কৈবর্ত, কলিতা এবং লালুং গ্রামের সরল জনজীবনের প্রাণকেন্দ্র এই বিলটি। স্নানাদি করতে আসা গরীব বৌ-ঝি-দের কলরব এবং সাঁতার কাটতে থাকা ছেলেদের উচ্ছল কোলাহলে বিলের পশ্চিমদিকটা দিনের বেলাতেও গমগম করতে থাকে। তাছাড়া ছোট-বড় নৌকা আর জাল নিয়ে প্রায় সমগ্র বিলটিতেই জেলেরা মাছ ধরে বেড়ায়। তবুও প্রত্যেকেরই ভয় এই ঈশান দিকটাকেই বিশেষ ভাবে শ্মশান থেকে সহস্র বাহু মেলে দাঁড়িয়ে থাকা গাছের বিশাল গুড়িগুলোকে। রাতবিরেতে জাল মারতে থাকা মহলদারের সিলেটি জেলেরাও বিলটার এদিকটাকে আসতে সাহস করে না।

বুড়ো মেথা বলেন বড় ভূতুড়ে এই জায়গাটা। এখানেই পূর্ণিমার ফটফটে আলোতে মাছ ধরতে এসে রত্নেশ্বর বরা সোনার নৌকা ভেসে উঠতে দেখেছিলেন। কোনমতে বাড়িতে ফিরে এসে তিনি নঙলামুখ পেয়েছেন মাত্র—সেখানেই মূৰ্ছিত হয়ে পড়ে যান। যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন, শরীরে ভীষণ জ্বর, আবোল-তাবোল বকতে শুরু করেছেন—সোনার নৌকোর কথা বললেন, রূপোর বৈঠার কথা বললেন, গাছের গুড়িতে কার গুপ্তধন পুঁতে রাখার কথা বললেন। লোকে বলে, রত্নেশ্বর বরা বাঁচতেন না, যদি না তার দাদা সুরেন সেদিনই বজামায়ঙ গিয়ে চুরা বেজের কাছে থেকে ঝাঁড়ফুকের তেল এনে দিতেন। তখনকার তরতাজা রত্নেশ্বর এখন বুড়ো হয়েছেন, চুল-দাড়ি পেকেছে, মুখ ঝুলে পড়েছে। তবে সেদিনকার ব্যাপারটার কথা উঠে পড়লে এভাবে বলেন যেন গতরাতের ঘটনার কথা বলছেন। লোকে ভয় পেয়ে অনেক বছর পর্যন্ত সেদিকমুখো হত না, ক্রমশ পোড়ো বাড়িতে পরিণত হচ্ছিল জায়গাটা। কিন্তু সুপুরি চুরি করে নতুন্ বউয়ের আবদার পূরণ করা কিছুটা অসুবিধেজনক বলেই হেবাঙ একদিন ঔ-গাছের গুড়িতে মাটি খুঁড়ল। সোনার কলস পেল না, যদিও দুটো মোহর নাকি পেয়েছে। তবে সেটা আর ভোগ করতে পারল না। নতুন বউয়ের সিঁথিটা চিরকালের জন্যে শূন্য করে দিয়ে সে রাতেই সে রক্ত-পায়খানা করে মৃত্যুবরণ করল।

কিন্তু বিলপারের জনগণের কাছে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো ভীখারুকে বাঁকে মেরে তার রূপ ধরে পদুমীর সঙ্গে সংসার করার ঘটনাটা। একদিন সুযোগ বুঝে বাঁকে সরষের ডুলিতে রেখে দেওয়া তার থলেটা ভীখারুর মায়ের কাছ থেকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেল বলেই বেঁচে গেছে, তা নাহলে আজও হরেন মহলদারের তাবেদার হয়ে বিল পাহারা দ্বিতে হতো। বাঁক তাবেদার হয়ে থাকা অবস্থায় প্রতিদিনই মহলদারের অবস্থা মাছে-ধানে একেবারে উপচে পড়ত। কিন্তু যেই বাঁক পালিয়ে গেল তারপর থেকেই তার অবস্থা পড়ে গেল। জুয়া আর আফিঙের নেশা তাকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে দিল। তখনকার হরেন মহলাদার যে নাকি উৎসব পার্বণেও জনগণকে জাল মারতে দিতেন না, এখন নিজেই দুটো মাছের আশায় লোকের বিলে লুকিয়ে চুরিয়ে জাল মেরে বেড়ায়। বাঁক নেই। আজ বছর সাতেক হয়, রূপসী পদুমীও বাঁকের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। কিন্তু বাঁকের ছেলে গঁরে আছে। জনগণ বলে, বাঁকের ছেলেও বাঁকের মতোই। তা নাহলে কি আর দিন নেই রাত নেই এভাবে বিলের পারে ঘুরে বেড়ায়!

আজ পাঁচ-ছয় বছব ধরে হরেন ঔ-ঝোপের আশেপাশে শেয়ালের উৎপাতের কথা বাদ দিলে বিশেষ কোন অসুবিধে ছাড়াই মাছ পুঁটি চুরি করে বেশ মনের সুখেই ভাতের সঙ্গে খাচ্ছিল। কিন্তু আজ এক বছর ধরে বিল পারে গঁরের রহস্যময় উপস্থিতি তাকে বেশ অসুবিধেয় ফেলেছে। কৃষ্ণপক্ষের ঘন অন্ধকারে হরেন সাধারণত এদিকটায় মাছ মারতে আসে না, গ্রামের আশেপাশে সুযোগ বুঝে খেপ মারে। কিন্তু শুক্লপক্ষে মরিগাঁও মহলদারের সজাগ প্রহরীদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে সে পোড়োবাড়িটাতে আসে। আর দুপুর-রাতের আগেই ঝোপের মধ্যে জালটা লুকিয়ে রেখে সেই গোরু-চলা হাঁটা পথটা দিয়ে বাড়ির দিকে হনহন করে এগিয়ে চলে। কিন্তু এখন গঁরের সঙ্গে পথেঘাটে দেখা হওয়ার ভয়ে সে প্রধান রাস্তাটা ছেড়ে ঝোপ-ঝাড় ভেঙে অনেকটা ঘুরপথে বাড়িতে পৌছায়। কারণ প্রায় ঠিক সেই সময়টিতে গঁরে সেই পথ দিয়ে ঘুমন্ত মানুষের মতো ধীর, ভারী অথচ পরিচিত পদক্ষেপে এসে উপস্থিত হয় ঔ গাছের নিচে আর বিলের চিকমিক করতে থাকা জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। গালে-মাথায় হাত রেখে অনেক চিন্তা করেও হরেন তার বাড়ির পালিত হওয়া এই ছেলেটির রহস্যময় বিচরণের কোন দিশা পায় না।

গরৈ অদ্ভুত আচরণের কথা নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে অনেক কথাই শোনা যায়। নানা জনের নানা মত। শ্রীহট্টের জেলে নিতাই এবং পরাণের মা মায়ারাণী ফিসফিস করে বলে, 'নিশির ডাক লো নিশির ডাক, অরে নিশিয়ে ডাইক্যা লয়।' কিছুদিন আগে গাঁওবুড়োর বাড়িতে বাগানের একজন এল.এম.পি ডাক্তার এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মানুষ নাকি কখনও কখনও ঘুমের মধ্যেও হাঁটাহাটি করে। জনগণের অবশ্য এ সমস্ত আজগুবি কথায় বিশ্বাস নেই। ওরা বলে অন্য কথা। জ্যোৎস্নার রাতে বাঁক নাকি তাকে ডেকে আনে বিলের পারে, আর তীরে বসে বাপ-বেটা কাঁচা মাছ খায় আর মোরগ ডেকে ওঠার আগেই বাঁক ছেলেকে ঘরে পাঠিয়ে দেয়। এমনকি দুই একজন তাকে বাঁকের পেছন পেছন বিলের দিকে যেতেও দেখেছে। তার মধ্যে হেরম্বের বর্ণনায় গঞা রাতে বাইরে প্রস্রাব করতে যাওয়াও বন্ধ করে দিল। গত একাদশীতে 'বর কানীয়া'-র কানির আড্ডা থেকে বেরিয়ে প্রস্রাব করতে যেতেই হেরম্ব নাকি একটা অস্পষ্ট, দীর্ঘ ছায়ামূর্ত্তির পেছনে গরৈকে দেখতে পেয়েছে। সে নাকি ছায়ামূর্তিটার কাঁধের উপর থেকে লুটোতে থাকা একটা দীর্ঘ জালের গোড়ায় ধরে পেছন পেছন থপথপ করে যাচ্ছিল সেই বিলের দিকে। প্রত্যেকেরই এক কথা, 'যাবে নাই বা কেন? সে তো বাঁকেরই ছেলে।'

রুই চিতল থেকে পুটি-খলসের কথা বললেও পাভৈ বুড়ির মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হয় না। বুড়ির কালা কানের কাছে কেউ এই সমস্ত কথা বললেই বুড়ি আঙ্গুল মটকে মটকে অভিশাপ দেবে, 'গরৈ আমার নাতি— আমার ভীখারুর ছেলে। কোন মাতালটা বলেছে বাঁকের ছেলে বলে। কোন উড়নচণ্ডী বলেছে, ডেকে আন তাকে—মেখেলা দিয়ে শায়েস্তা করছি। বাড়িতে তিতো লাউ ধরবে, মুখে পোকা পড়ে মরবে, জহ্‌রা কোথাকার।'

আসলে সেই অনেকদিন আগেই মাছ মারতে গিয়ে ছেলের হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে বুড়ি আজও মেনে নিতে পারেনি। কীভাবেই বা মানবে, এই বিল অধ্যুষিত সবগুলি গ্রামেই ভীখারুর মতো কেউ সাঁতার কাটতে পারত নাকি। এখনও কেউ পারবে কি এই দীর্ঘ বিলটি একবারও না থেমে সাঁতরে পার হতে? তার মতো সারাটা দিন জলের নিচে থেকে জেং দিতে? বাঁক বা দৈত্যই তাকে কীভাবে মারতে পারে? জলেই ছিল যার বসতি। ভীখারুকে যে একবার দেখেছে সে তাকে কখনও ভুলতে পারবে না। সে ছিল এই অঞ্চলের সবচেয়ে দক্ষ জেলে। পুঁটি-খলসের কথা তো বাদই, ধূর্ত রুই বরালীও তার পুরনো জালটার হাত থেকে রেহাই পেত না। মাঘবিহুর সময় সমস্ত গ্রামের লোক পোলো, জুলকি নিয়ে বিলের জল তন্ন তন্ন করে ফেললেও পাঁচ কিলো ওজনের রুই মাছটা ঠিক ঢুকবে গিয়ে ভীখারুর পোলোর মধ্যে। সে বাজার হাট অথবা দূরের হিন্দু গ্রামে মাছ বেচে জীবিকা নির্বাহ করলেও উৎসব পার্বণের সময় প্রায় সমস্ত মাছটুকুই জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিত। অবশ্য বিলপারের লোকেরা ভীখারুর মাছ এভাবে বড় বেশিদিন খাবার সুযোগ পেল না, আর নিজে মারা তো দূরের কথা। সরকার জনগণের সাধের বিলের উপর কর বসাল।

বিলের ডাক হবে শুনে গঞা আপত্তি করেছিল, কিন্তু তাদের কোন ওজর-আপত্তিই শেষ পর্যন্ত টিকল না। বিলের মহলদার হওয়ার আশায় গ্রামের মাতব্বররা জনগণের দুর্দশার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে রইলেন। তাই একদিন স্বাভাবিকভাবেই বিলের ডাক পড়ল। আর একদিন বিলপারের সবাইকে অবাক করে দিয়ে অবিরল ঝগড়া-ঝাটি আর আফিঙের আড্ডায় পড়ে থাকা ভীখারুর কাকার ছেলে হরেন একরাতের মধ্যে বিলের মহলাদার হয়ে পড়লেন। অবশ্য সে শুধু একাই নয়, তার সঙ্গে মরিগাঁওয়ের দুইজন ব্যাপারী বিলের অংশ ডাকে পেল। কিন্তু সবচেয়ে বেশি লাভ হলো

হরেনের, সে পেল পূবদিকের সবচেয়ে ভোগালী অংশটা —তাদের গ্রাম থেকে ঔ-র গুড়ি পার হয়ে একেবারে শ্মশান পর্যন্ত।

ডাকের পরের দিনই মহলদারের সঙ্গে বরেনও জনগণকে বিলের মাছ মারার জন্যে আহ্বান জানান। দুই একজন জেলে বাধা না মেনে জাল মারতে গেলেই হরেন ঢোঁড়া সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে মারতে এলো। দেখতে দেখতে একটা বড়সড়ো ঝগড়া বেধে গেল, ঝগড়াটা হয়তো অনেকদূর গড়াতো যদি না গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর জনগণকে সরকারের নিয়মকানুনের কথা বলে শান্ত না করত। তারপর দিনই সিলেটি আর দেশোয়ালী জেলেদের হাঁক-ডাকে বিলের নির্জন বুক উচ্ছ্বল হয়ে উঠল। তারমধ্যেই গঞা অবাক হয়ে দেখল সকালের রোদে চিকমিক করছে ভীখারুর দীর্ঘ শোলমাছের মতো কালো শরীরটা।

তাদের মধ্যে ভীখারুকে দেখতে পেয়ে বিলপারের লোকরা বড় অবাক হয়েছিল। ভীখারুর সঙ্গে বরেনদের যাওয়া-আসা,কথাবার্তা নেই আজ অনেক বছর হয়ে গেল। গ্রামের একপাশে অনাহারে দিন গুজরান করলেও পাভে কখনও বরেনদের বারান্দায় পা রাখে নি। ভীখারুর বাবা বেখারান বেঁচে থাকতে এত দুঃখ-কষ্ট ছিল না তাদের। কিন্তু ভাগ্যের লিখন, অকালেই ক্ষয় রোগ গ্রাস করল তাকে। আর বেথারামের শরীর পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবার আগে ছোট ভাই পানীরাম তার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করল। ঘর থেকে বিতাড়িত হয়ে পাভে অনেক দুঃখে-কষ্টে বড় করেছিল ভীখারুকে। এ সমস্ত কথা কারো অজানা নয়।

যাই হোক না কেন, তবুও অপরিচিত জেলেদের মধ্যে ভীখারুকে দেখতে পেয়ে গ্রামের জেলে কয়েকজন কিছুটা হলেও সান্ত্বনা পেয়েছিল সেদিন। কিন্তু জীবিকা হারিয়ে ক্রমশ ওদের অবস্থার অধঃপতন হতে থাকায় ভীখারুকেই জলের নিচের কাঁটা বলে ভাবতে লাগল। বড় স্বাভাবিক ভাবে, ভীখারুর সঙ্গে গড়ে ওঠা এতদিনের পুরনো সম্পর্কটা ক্রমশ জলে ডুবতে থাকা মানুষের মতো তলিয়ে যেতে লাগল আর তার বিপরীতে সে যে মহলদারের কাকার ছেলে এই কথাটা ওদের মধ্যে জলে ভেসে ফুলে ঢোল হয়ে ওঠা একটা মৃতদেহের মতো ভেসে উঠল।

আসলে কোন সম্পর্কের জন্যে নয়, সমস্তটা দিন আফিঙের আড্ডায় বসে কাশতে থাকলেও ভীখারুর আশ্চর্যজনক ভাবে মাছ পাবার খবরটা হরেনও জানতে পেরেছিল। আর সে সঙ্গে থাকলে এই ব্যবসায় অনেক সুবিধে হবে কথাটা বুঝতে পেরে বিল 'বাইচ' করার আগের দিনই ভীখারুদের ঘরে গিয়ে পাভের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, মা-বাবা কেউ আর বেঁচে নেই, পুরনো ঝগড়ার রেশ টেনে চলার আজ কোন অর্থ হয় না। ঘরের মানুষের ঘরে ফেরা উচিত। স্ত্রী অসুখ, বড়মাকে গিয়েই সংসারের হাল ধরতে হবে। হরেনের অনেক কাকুতি মিনতিতেও প্রথম প্রথম রাজী হতে চায় নি সে। কিন্তু এতবড় ছেলেটি যখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল, বুড়ির মন কোমল হয়ে এলো। হরেনের সঙ্গে সেদিন রাতের বেলাতেই মা-বেটা নিজের ভিটেতে ফিরে এলো।

পরের দিনই ধলফাট দেবার আগে হরেন বাইচ করাল। ভীখারুর জালে আটকে পড়া একটা বড় বোয়াল মাছকে জেলেরা পূজোর জন্যে বেছে রাখল —মাছটির কপালে সিঁদুর দিয়ে সেবা করে ওটাকে পুনরায় জলের মধ্যে ছেড়ে দিল। কয়েকজন আবার দুধ এবং লবন ঢালল, সিলেটি জেলেরা আলাদা করে গঙ্গাদেবীর পুজো করল। সেদিন থেকেই মাছ মারা আরম্ভ হলো। ভীখারু দেশোয়ালি আর সিলেটি জেলেদের সঙ্গে কম্পিটিশন করে বেশি মাছ মারাই শুধু নয়, ওদেরও জেং দেওয়া এবং মাছ মারার নানা রকম পদ্ধতি শিখিয়ে দিল। দক্ষ হালদার কয়েকজন প্রথমদিকে ভীখারুকে কিছুটা

হেয় জ্ঞান করলেও এক সপ্তাহের মধ্যেই ভীখারুর ভক্ত হয়ে উঠল। হরেন তার নতুন ব্যবসার কায়দা কানুন খুব একটা ভাল করে জানত না, তবুও ভীখারুর সততা এবং তৎপরতার জন্যেই সে অন্যান্য মহলদারের চেয়ে বেশি লাভবান হলো। কষ্ট না করেই আরও অধিক লাভের আশায় সে ভীখারুকে বাড়ির পেছনদিকে ঘর তুলতে দিয়ে তার উপর হালদার, জেলে আর বিল দেখাশোনা করার সমস্ত দায়িত্বও ছেড়ে দিল।

বছর ঘুরতেই হরেন গ্রামের আশেপাশে অনেক মাটি কিনল, ভাঁড়ার ধানে উপচে পড়ল, মাছের ব্যবসা মরিগাঁও, জাগীরোড, এমনকি গুয়াহাটিতেও ছড়িয়েপড়ল। টাকাপয়সার সঙ্গে সঙ্গে হরেন মহলদারের বেশভূষারও পরিবর্তন হলো। বাগানের জমাদারবাবুর মতো সৌখিন ধুতি-পাঞ্জাবী পরতে শুরু করল। হালোয়া-জেলেদের সঙ্গে একাসনে বসতে হয় বলে সে আফিঙের আড্ডায় যাওয়াও ছেড়ে দিল। চেহারার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষারও পরিবর্তন হলো। ভাব দেখে মনে হয় যেন ভোলা সাধু। এদিকে অত্যধিক খাটনির ফলে ভীখারুর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। বেশিরভাগ জলে থাকতে হয় বলে কানেও কম শুনতে লাগল,কাশিটাও ভাল হলো না। তবুও কাজের প্রতি সে কোনরকম অবহেলা করত না। অসুস্থ শরীর নিয়েই সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিলের মধ্যে মাছ ধরতে থাকত। বিল পাহারা দেবার জন্যে টঙি ঘরে মাছটা ছড়িয়ে রেখে জেলেদের কয়েকজন গ্রামে গ্রামে ফিরে গেলেও ভীখারু সেই কাঁচা মাছের স্তূপের মধ্যেই পড়ে থাকতে ভালোবাসত। কাঁচা মাছের গন্ধে তার খালি পেট ভর্তি হতে হতে সজাগ, নিদ্রাহীন রাত পার হয়ে যেত।

ঘরে থাকার সময়টাও ভীখারুর উপস্থিতি একেবারেই টের পাওয়া যেত না। বাড়ির পেছনদিকে পরিষ্কার করে নেওয়া একটুখানি জায়গাতে বসে আপনমনে মহলদারের পুরনো জালগুলি মেরামত করায় ব্যস্ত থাকবে আর তা নাহলে নতুন জাল বুনতে থাকবে। পাভৈর কাছে ছেলে ঘরে থাকা আর না থাকা সমান কথা। তার বয়সও বাড়ছে—আগের মতো কাজও করতে পারে না। প্রায়ই মাথা ঘোরানোতে কাহিল হয়ে পড়ে, কোমরের ব্যথা কাবু করে ফেলে। হরেনের স্ত্রীও অসুস্থ, ছেলের বৌ-ও নেই যে কাজকর্মে সহায়তা করবে। অনেক বলেকয়েও সে কিছুতেই ভীখারুকে বিয়ে করতে রাজি করতে পারেনি। নানা অজুহাত দিয়ে সে মা'র কথাটা এড়িয়ে গেছে। দেখতে দেখতে তার বয়স দু'কুড়ি হয়ে গেল। পাভৈ ছেলের বৌ-এর হাতের ভাত খাবার আশা ছেড়েই দিয়েছিল কিন্তু একদিন সবাইকে অবাক করে দিয়ে ভীখারু জলপরীর মতো রূপসী একটি মেয়েকে মায়ঙ থেকে বিয়ে করে আনল।

হরেনের স্ত্রী সেউতী চারবছর আগে একটি ছেলের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল ব্যাঙাচির মতো অর্ধেক বিকশিত, মৃত। তারপরে আর নেই। বিলপারের বৈদ্য কত ঔষধ দিল—কিন্তু কোন কাজই হলো না। সেসব খেয়ে হরেনের স্ত্রী আরও রোগা হয়ে গেল—নানারকম রোগব্যাধি তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। এত প্রাচুর্যের মধ্যেও সন্তানহীনতার দুঃখ হরেনকে কুরেকুরে খেতে লাগল। দিনটা কোনরকম ব্যস্ততার মধ্যে পার হয়ে যায়, কিন্তু রাতের বেলা অস্থিচর্মসার স্ত্রী-র সঙ্গে শুতে গেলেই কথাগুলি তাকে আঁকড়ে ধরে। তাদের দীর্ঘশ্বাসে মজবুত পালঙটাতে বাঁক ধরে যায়। সেজন্যই হরেন ভীখারুকে পাঠিয়েছিল মায়ঙে। পরের দিন আসার কথা যে লোকটির সে কিনা এলো তিনদিন পরে। বড় মায়ঙের বুড়ো কবিরাজ ভীখারুর হাতে গণ্ডারের রক্ত-মাংস আর বনফুলের ছাল দিয়ে তৈরী ঔষধের সঙ্গে মেয়েকেও পাঠিয়ে দিল। বিকেলের দিকে ভীখারুর সঙ্গে উড়নি দেওয়া নতুন বৌ ছৈ দেওয়া গরুর গাড়ি থেকে যখন আলগোছে নামল, হলুদ আর পদ্মফুলের মিশ্রিত গন্ধে সমস্ত গ্রামটাই ভরপুর হয়ে উঠেছিল। হ্যাঁ, পদুম ফুলের মতোই সুন্দরী ছিল প:্মী।

এতদিন পর্যন্ত বিয়ে করতে রাজি না হওয়া মানুষটা পদুমীকে দেখেই বড় আশা করে মত দিয়েছিল বোধহয়। কিন্তু কয়দিনই বা সংসার করতে পারল? বিয়ের দু'বছর পূর্ণ হওয়ার দিনই মাছ মারতে গিয়ে আর ফিরে এলো না ভীখারু। সন্ধ্যেবেলা বারান্দায় প্রদীপ জ্বালাতে গিয়ে পদুমী তাকে শেষবারের মতো দেখেছিল। কাঁধ থেকে মাটি পর্যন্ত ঝুলে পড়া একটা জাল নিয়ে ভীখারু মায়ের সঙ্গে ভাঁড়ার ঘরের সামনে কী যেন বলাবলি করছিল। কাল-সন্ধ্যের ম্লান আলোতে পদুমী দেখেছিল তার সমস্ত শরীর ভিজে, সিক্ত পাঞ্জাবীটা থেকে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটিতে পড়ছে। কী এক অজানা আশঙ্কায় মনটা শিউরে উঠেছিল তার। পদুমীকে কোনরকম জানান না দিয়েই সেদিন বেরিয়ে গিয়েছিল ভীখারু।

তিনদিন ছেলের কোন খোঁজখবর না পেয়ে পাভৈ বুড়ি যখন অস্থির হয়ে একবার ঘরে একবার নঙলামুখে ছটফট করে বেড়াচ্ছিলেন, পদুমী ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাচ্ছিল, সমস্ত গ্রামটাই তাদের বাড়ির উঠোনে ভেঙে পড়েছিল, তখনই হরেন আসল কথাটা ইতস্তত করে বলছিল। তার কথাগুলি ছিল গল্পকথার মতো, দুঃস্বপ্নের মতো। অলীক ভয়-জাগানো গল্প। ছয়মাস আগের কথা--ঐ ঝোপের নিচে কে মাছ মারছে জানতে পেরে হরেন গিয়েছিল ভীখারুর সঙ্গে। গিয়ে দেখে, কেউ নেই সেখানে। তবুও সাহস করে দু'জনেই শ্মশান পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। ওদিকে ভীখারু কাউকে না পেয়ে জালটাই বের করে নিল। তারই পুরনো জালটা ছিল নৌকোয়। ভুন ভুন করে মন্ত্র পড়ে সেটা দিয়েই সে অনেক মাছ মারল। মাছে ভর্তি হয়ে গেল নৌকোব গলুই। মাছ মারা শেষ হয়ে যাওয়ায় ভীখারু প্রস্রাব করার জন্যে নৌকোটা তীরে নিয়ে এল। আর কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে নৌকোর গলুইয়ে বসে রইল। মাছ মেরে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ভেবে হরেন নৌকো বেয়ে যেতে লাগল। কিছুটা দূরে যাবার পরই হঠাৎ হরেনের মনে হলো—নৌকোয় মাছ কম। এমন সময় পেছন দিকে তালুতে আওয়াজ করার মত শব্দ শুনতে পেল। মুখ ফিরিয়ে জ্যোৎস্নার মৃদু আলোতে দেখে ভীখারু কাঁচা কাঁচা মাছ খাচ্ছে। আসল কথাটা বুঝতে হরেনের আর বাকি রইল না। কোন এক ফাঁকে ভীখারুর ঘাড় মটকে মেরে তার রূপ ধরে বসে রয়েছে বিলের বাঁক। বাঁক-কে মাছ খাওয়ায় ব্যস্ত দেখে হরেন তাড়াতাড়ি নৌকোটা তীরে নিয়ে এলো আর ঝোলাটা নিয়ে ভাঁড়ার ঘরের উদ্দেশ্যে দৌড় লাগাল। সরষের ডুলিতে ঝোলাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে ভয়ে কাঁপছিল। কিছুক্ষণ পরেই কান্নার শব্দ পাওয়া গেল। বেড়ার ফুটো দিয়ে তাকিয়ে দেখে উঠোনের মাঝখানে বসে ভীখারু-রূপী বাঁক ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে—ঝোলাটা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তার হৃদয়ভাঙা কান্নাতেও হরেন তার ঝোলাটা ফিরিয়ে দিল না। আর সে-ও তার রূপ বদলাতে পারল না—ভীখারু হয়েই বসবাস করতে লাগল। পদুমীকে কথাটা কীভাবে বলবে তা ভেবে হরেন ব্যাপারটা চেপে গেল। এইমাত্র সেদিন ঝোলাটা পাভৈকে ফাঁকি দিয়ে সরষের ডালি থেকে নিয়ে পালাল।

হরেনের কথা শুনে পাভৈ বুড়ি সুর করে কাঁদতে লাগল—গান গেয়ে গেয়ে। পদুমী কেঁদে উঠল বাঁশীর করুণ সুরের মতো। ওদের কান্নায় গঞা হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল। বুড়ির ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না শুনের পূবের দিক থেকে সোঁ সোঁ করে বয়ে আসা বাতাস একজায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পাক খেতে লাগল, পদুমীর কান্নায় বিলের ঢেউগুলি উত্তাল হয়ে উঠল, গঞার হাউমাউ করে কান্নায় ঢোলের বোলের মতো গুমগুমিয়ে উঠল ছোট-বড় মেঘ আর শেষে সবার মিলিত কান্নায় প্রচণ্ড তুফান আর মুষলধারে বৃষ্টি নামল।

শোক-বিলাপে সবাই সেদিন এত বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে কখন যে পদুমী এই ঝড়-তুফানের মধ্য দিয়ে বিলের পারে দৌড়ে গিয়েছিল তা কেউ বুঝতেই পারেনি। যখন ঝড়-তুফান থেমে গিয়েছিল তখন পাভৈ বাস্তবে ফিরে এসেছিল এবং ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। মুহূর্তের মধ্যেই সে চিৎকার চেঁচামেচি করে বিল-পারের উদ্দেশ্যে দৌড়ে গিয়েছিল। গ্রামের জনগণ কী হয়েছে কিছুই বুঝতে না পেরে পেছন পেছন দৌড়েছিল। বিলের পারে পৌঁছে সবাই দেখে কুমারী ঘাটে বসে পদুমী দেবতায় ভর করা মানুষের মতো একদৃষ্টে বিলের দিকে তাকিয়ে আছে। বিলের জলে তখন ভেসে রয়েছে হাজার হাজার মরা মাছ। সেদিন থেকেই হরেনের পায়ের নিচের মাটি সরে গিয়েছিল। তারপর থেকে আর জাল ফেললেই মরা মাছ, জাল ফেললেই শামুক । কেউ কুমন্ত্র পড়ে বিলের জলে উল্টো করে বাঁশ পুঁতে রেখেছে ভেবে হরেন পাবকাঠির ওঝা নামাল। ওঝা জলপানি আর হুঁকো নিয়ে তিনদিন জলের নিচে রইল—কিন্তু কিছুই করতে পারল না।

সাতমাস পরে সারাটা রাত অসহ্য প্রসব-বেদনায় ছটফট করার পরে পদুমী কচুরিপানার মতো বেগুনী রঙের একটি কুৎসিৎ পুত্রসন্তান প্রসব করল। সে রাতেও প্রচণ্ড বৃষ্টি আর তুফান হয়েছিল। আর বৃষ্টির মধ্যে পড়েছিল ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ। মৃত নয়, জ্যান্ত গরৈ মাছ। জন্মের সময় বারান্দা ভর্তি করে মাছ পড়েছিল বলে সবাই তাকে 'গরৈ' বলে ডাকতে লাগল। পদুমী কিন্তু ছেলেকে অন্য একটা সুন্দর নাম ধরে ডাকত—কী একটা ফুলের নাম ছিল সেটা। মায়ের মতো হরেনের স্ত্রীও তাকে সেই নামেই ডাকত। আলগোছে মুছিয়ে দিত তার ধবধব করতে থাকা বেগুনী রঙের বুকটা। কিন্তু সেই নামে ডাকার জন্যে আর কতদিনই বা বেঁচে ছিল তারা দু'জন। একবছরের মধ্যেই শুকিয়ে কঞ্চির মতো হয়ে সেউতী মারা গেল। আর তিনবছরের বাচ্চা রেখে গরৈর মা মারা গেল বর-ডুলির মতো শক্ত হয়ে। মরার সময় দেখলে কে বলবে কয়েকবছর আগেই খালৈর কোমরের মতো সরু কোমর ছিল তার। লোকে বলে, রাজা মায়ঙের ওঝা একজনের সঙ্গে পদুমীর বাবার শত্রুতা ছিল, সেই বুড়ো ওঝাটাই তার এই অবস্থা করেছিল।

অসহ্য যন্ত্রণা আর কষ্টের মধ্যে পদুমী মৃত্যুবরণ করেছিল। অসুস্থ শরীরেই হেঁচড়ে হেঁচড়ে বাচ্চাকে দেখাশোনা করা, শাশুড়িকে দেখাশোনা করা আর ঘরের যাবতীয় কাজ করতে হতো তাকে। বাঁকের সঙ্গে বৌমার সংসার করার ব্যাপারটাকে পাভৈ কীভাবে সহজভাবে মেনে নিতে পারে? আর বাঁকের ছেলেটাকেই বা নিজের নাতি বলে ভাববে কোন শর্তে? সেজন্যেই গর্ভপাত করানোর জন্যে বুড়ি খুব চেষ্টা করেছিল। পদুমী রাজি না হওয়ায় খাবারের সঙ্গে গোপনে বিষের ঔষধও মিশিয়ে দিয়েছিল। তবুও গরৈর জন্ম হলো। বুড়ি প্রসূতি ঘরে প্রবেশ না করলেও জন্ম হলো। বুড়ি কোলে-পিঠে না নিলেও সে দৌড়োতে শিখল। কিন্তু তিন বছর বয়সে যেদিন সে মা'কে হারাল সেদিন পাভৈর মতো কঠিন হৃদয়ও গলে জল হয়ে গেল। গিজগিজ করতে থাকা উঠোন ভর্তি লোককে অবাক করে দিয়ে পাভৈ 'এই নাতি কাঁদবি না, আমি এখনও বেঁচে রয়েছি' বলে গরৈকে বুকে তুলে নিয়েছিল। তারপর থেকেই গরৈর নীল বর্ণটা ক্রমশ পাল্টাতে লাগল আর পরিবর্তিত হতে হতে একটা সময়ে ঠাকুরমার মতোই সুন্দর হয়ে উঠল। ছোটবেলায় আর দশটি ছেলের মতো গরৈও মাঠে মাঠে ঘুড়ি উড়াতে, বনে বনে জহামাল খুঁজে বেড়াতে ভালোবাসত। আমের গুটির মতো বড় বড় চোখ, খসখসে চামড়া, কুৎসিৎ কুঁজো চেহারাটার জন্য সঙ্গে সাথীরা তাকে কখনও ঘৃণা বা ভয় করত না। আসলে সেই চেহারার সঙ্গে তার সরল হাসি আর খোনা-স্বরে কথা বলার আমোদজনক ভঙ্গীর জন্যই সঙ্গীদের মধ্যমণি ছিল সে। কেউ তাকে বাঁকের ছেলে বলে ক্ষেপালেও সে রাগ করত না বরং

তাদের তামাশায় আনন্দিত হয়ে হাত-তালি দিয়ে হেঁচকি তোলার মতো করে অদ্ভুতভাবে হাসত— বড় মজা পেলেই সে এভাবে হাসত।

চেহারার বিপরীতে গরৈর চালচলন তখন বড় স্বাভাবিক ছিল। ক্রমশ মনের পাপড়িগুলি একটা একটা করে বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সংসারের রীতিনীতি বুঝতে শিখল। এমনকি গ্রাম প্রধানের গোরু-মোষগুলি মাঠে নিয়ে যাবার সময় রাখালদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে শ্লীল অশ্লীল অনেক কথাই সে শিখে ফেলল। গ্রামের বৌ ঝি'রা তাকে দেখে এতদিন ধরে করে আসা রসালো মন্তব্যগুলির অর্থও সে বুঝতে পারল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে দূর থেকে দেখে 'বাঁকের ছেলে বাঁকের ছেলে' বলে ক্ষেপালে সে সরলভাবে হাসার পরিবর্তে পাথর মারতে শুরু করল। ক্রমশ রাগী হয়ে উঠতে লাগল সে। তার চণ্ডালের মতো রাগ থেকে সঙ্গীরাও রেহাই পেত না। সাধারণ ইয়ার্কির জন্যেও দুই একজন তার কাছে চড়-থাপ্পড় খেল। গ্রামপ্রধানের ছেলে ধনীরাম শুধু তার রাগটাকে কিছুটা দমনে রাখতে পারত। ঘরের চাকর হলেও ধনীরাম তাকে 'মিতা' বলে ডাকত, সেজন্যেই হয়তো গরৈ তার সমস্ত কথাই নির্বিচারে মেনে চলত। সকালবেলা গোরু-মোষের দলটাকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিয়ে সে ধনীরামের পাশে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াত। ধনীরামও তাকে খুব ভালবাসত। আর একদিন সেই ধনীরামই তার জন্ম নিয়ে কুৎসিৎ মন্তব্য করল। আড়ালে আবডালে হলেও কেউ তাকে এ ব্যাপারটা সামনাসামনি এতদিন বলেনি। সেজন্যেই এতদিন পর্যন্ত বুঝতে না পারা কথাটা সে হঠাৎই বুঝতে পেরে বজ্রাঘাতে স্থির হয়ে যাওয়া মানুষের মতো কিছুক্ষণ আহত, বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ধনীরামের মুখের দিকে। তারপরই হঠাৎ গুলতি থেকে বেরিয়ে যাওয়া গুলির মতো ক্ষিপ্র গতিতে সে বাড়ির দিকে দৌড় মেরেছিল, কাউকে কিছু না বলেই। ঠাকুরমা সেদিন অনেক চেষ্টা চরিত্র করে গরৈকে রান্নাঘরের পিড়িতে বসাতে পেরেছিল। পোড়া মাছের ভর্তার সঙ্গে শোল মাছ আর মুলোর তরকারী দিয়ে পরিপাটি করে ভাত বেড়ে দিয়ে নিজেও সামনে বসে পড়েছিলেন তিনি। থালায় প্রিয় মাছের তরকারী দেখেও গরৈকে ভাত মুখে না দিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করতে দেখে বুড়ি বললেন, এগুলি মানুষের মনগড়া কথা বাবা। হরেনের কথা সাধারণ গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করলেও আমি বিশ্বাস করি না। আফিঙখোরটা আফিঙের নেশায় কী দেখেছে আর কী বলেছে তাতে আমাদের কী আসে যায়। তুই আমার নাতি, ভীখারুর ছেলে। তোর মা পদুমী ছিল জলপরীর মতো সুন্দরী। তোর বাবা তোর মাকে বিয়ে করে এনেছিল সেই সুদূর বুড়োমায়ঙ থেকে। এ সমস্ত অনেক কথা— রূপকথার গল্পের মতো। শুনতে চাস যদি তাহলে ভাতটা তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নে।'

'জলপরীর মতো সুন্দরী ছিল তোর মা'—কথাটা গরৈকে অদ্ভুত আনন্দ দেয়। মায়ের রূপের কথা আগেও সে অনেকবার শুনেছে। মধ্যে মধ্যে বিলের জলে নিজের কুৎসিৎ চেহারার প্রতিবিম্ব দেখে সে মায়ের সুন্দর মুখটা মনে করতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোনমতেই সেই চেহারাটাকে আর সে মনের সামনে আনতে পারে না। শুধু কারো ভেতরের ঘর থেকে ভেসে আসা ঘুমপাড়ানি গানের মতো অস্পষ্ট, মুখহীন একজন মহিলার ছবি মনের আনাচে কানাচে উঁকি মারতে থাকে। অবশ্য শৈশবের একটি দৃশ্য গরৈর চোখে এখনও ভাসতে থাকে। সেটাই তার মুছে না যাওয়া স্মৃতি – একদিন বিলের পারে গরৈকে একা ছেড়ে দিয়ে পদুমী পথের পাশে কাপড়গুলি কাচছিল। খেলতে খেলতে কীভাবে যেন সে বিলের জলে পড়ে গেল। অসুস্থ শরীরেই পদুমী সেদিন অতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আর বিলের জল উথাল পাথাল করে অনেক কষ্টে তাকে উদ্ধার করেছিল। লোকে বলে বাঁকের ছেলেকে বাঁক নিয়েছিল......মা খোঁজ করতে গিয়েছে বলেই ফিরিয়ে দিয়েছে। সেদিন

গরৈর আয়ু বেড়েছিল। পুনরায় এরকম হতে পারে বলে ভয়েই পদুমী একটা জাকৈ-এ তার জন্মের সময় রেখে দেওয়া নাভিটা একটা ডিম দিয়ে বিলের জলে তার নামে দীর্ঘ জীবন কামনা করে মানত করেছিল। তাব কিছুদিন পরে পদুমীরই জীবনদীপ নিভে গেল। এ সমস্ত কারণেই তার সাঁতার শেখা হলো না—সেই স্মৃতির জন্যেই কিনা কে জানে জলের ভয়টা তার মনে একেবারে গেঁথে গিয়েছিল।

রাতের বেলা গরৈকে বুকের ভেতর আলগোছে জড়িয়ে ধরে বুড়ি তার অদ্ভুত কথনভঙ্গীতে বলতে শুরু করে ভীখারুর আখ্যান। ঠাকুরমাব গল্পের আমেজে গরৈ একটা জীর্ণ নৌকার মত ভেসে রইল। অনেক রাত পর্যন্ত ছেলের কথা বলে বলে একটা সময়ে নিজের অজান্তেই পাভৈ ঘুমে ঢলে পড়ল। গরৈর কিন্তু ঘুম এলো না—আমের গুটির মতো চোখ দুটি মেলে ঠাকুরমার ঘুমন্ত মুখের মধ্যে সে বাবাকে খুঁজতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে, জানালা দিয়ে গলে আসা জ্যোৎস্না পাভৈর হা করে থাকা মুখের ভেতর দিয়ে গিয়ে তার শুকিয়ে যাওয়া মগজের মধ্যে ঢেউয়ের সৃষ্টি করল। ঘুমে বিভোর হয়ে পড়ে থাকা অস্থিচর্মসার দেহটা সেই ঢেউয়ে যেন কিছুটা নড়াচড়া করে উঠল। নাভি থেকে উৎপত্তি হওয়া কথাগুলি অনেক সময় ধরে অস্পষ্ট এক গোঙানির রূপ ধরে তার তাম্বুলের রঙে রঞ্জিত হওয়া মুখের ভেতর, লালায় সিক্ত হওয়া জিহ্বার চারপাশে একটা ঘূর্ণনের সৃষ্টি করল। আর একটা সময়ে জলস্তম্ভের মতো সেগুলি ধারাসারে বেরিয়ে এলো। 'মেয়েকে যে কতবার বলেছি এই অসাধারণ রূপলাবণ্য নিয়ে বিলের পারে একা যাসনে, অথন্তর ঘটবে। শুনল কি আমার কথা লজ্জা। গাঁয়ের বৌ-ঝিদের সঙ্গে একসঙ্গে স্নান করতে নাকি লজ্জা লাগে, শোন কথা। হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম তাই হলো। পদুমীর রূপে বাঁক মাতাল হলো। আমার বুকটা খালি করে বাঁক এই যখিনীটার সঙ্গে সংসার করল। আমার হাত থেকে ডুলিটা ফুসলিয়ে নিয়ে পালাল—রেখে গেল এই আপদটাকে। এটাকে নিয়ে আমি এখন কোথায় গিয়ে মরি.....'

বাস্তবে বলা কথাগুলি ঘুমের মধ্যে বুড়ি উল্টো করে বলতে শুরু করল। শেষপর্যন্ত ঠাকুরমার মুখেও সে যে বাঁকের ছেলে এ কথা শুনে গরৈ যন্ত্রণায় তপ্ত তেলে ভাজা জ্যান্ত কৈ মাছের মতো কুঁকড়ে গেল। তাহলে ধনীরামের কথাই ঠিক, গ্রামের বৌ-ঝিরা এজন্যেই তাকে দেখলে ফিসফিস করে নিজেরদের মধ্যে কথা বলে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও তাকে 'বাঁকের ছেলে, বাঁকের ছেলে' বলে ক্ষেপাতে থাকে। সে বাঁকের ছেলে। কোথায় থাকে তার বাবা? বিলের অতল জলে? শ্মশানের পাশের সেই নোংরা স্তুপের মধ্যে?

তখনই চাঙ থেকে নেমে গরৈ বাবার খোঁজে বিলপারে ছুটে গিয়েছিল। ছটফট করে এখানে সেখানে ঘুরে শেষ পর্যন্ত ঔ-ঝোপের নিচে এসে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিল। জলে জাল ফেলে সেখানে, প্রায় বিশ-বাইশ হাত দূরে বসে হরেন দু'দণ্ডের জন্যে বড়শিতে মাছ ধরতে ধরতে ঢুলছিল। চোখ মেলেই হঠাৎ গরৈকে ঔ-গাছের গুড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হরেনের নির্ভীক বুকটাও কেঁপে উঠেছিল ভয়ে, গায়ের সমস্ত লোমগুলি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বাঁক, দৈত্য, পিশাচী কে ভ্রুক্ষেপ না করা হরেনও জ্যোৎস্নার আলো-ছায়ায় গরৈকে কোন উপদেবতা বলেই মনে করেছিল। অমাবস্যার রাতে সে এদিকে আসে কি না, সেটা অবশ্য হরেনের কাছে রহস্য। কিন্তু তার পর থেকে হরেন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে সবসময়ই বিলের পারে তাকে অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখত।

গরৈ এলে জাল গোটাতে হবে বলে হরেন আজ অন্যান্য দিন থেকে অনেক আগেই ঔ-গাছের কা΄ῃ পৌছে গিয়েছিল। কিন্তু কাঁধের জাল কাঁধেই থেকে গেল। বিলের নির্জন বুকে হাসতে

থাকা চাঁদটার দিকে চোখ যেতেই অকস্মাৎ তার পদুমীর কথা মনে পড়ে গেল। হায়, পূর্ণিমার চাঁদের মতোই সুন্দরী ছিল পদুমী। দূর থেকে ভেসে আসা সুবাসের মতো এগারো বছর আগেকার একটা দিন হরেনের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

সেদিন ভীখারু ছিল না, আগের দিন শুকনো মাছের দু'জন ব্যাপারীর সঙ্গে জাগীরোডে গিয়েছিল। এদিকে ধুরন্ধর মহুরীটির হাতে সবকিছু ছেড়ে দিতে না পেরে হরেন টঙি ঘরে রাত কাটাল। কাক ডাকা ভোরে জাগীরোড, মরিগ্রামে মাছ পাঠিয়ে সে ঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা বলো। পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য সে সোজা পথ ছেড়ে দিয়ে বিলের পারে পারে আসছিল। গ্রামের বৌ-ঝিরা স্নান করার পর কুমারী ঘাট পাবার আগেই জলের খলখল শব্দে সচকিত হয়ে হরেন জলের দিকে তাকাল। দেখে, আকাশের দিকে বুক রেখে চিল সাঁতার দিচ্ছে পাদুমী। গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকা ভিজে কাপড়ের উপর দিয়ে তার যৌবনপুষ্ট দেহ প্রকট হয়ে উঠেছে। পদুমীর বিয়ে হয়ে আসার তখন মাত্র এক বছর হয়েছে। হরেনদের বাড়ির পেছনদিকেই তাদের ছোট্ট কুঁড়েঘরটি— তবু এর মধ্যে মাত্র একদিনই সে পদুমীকে কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিল। সেদিন সে পদুমীকে 'ভীখারুদাকে কি মায়ঙীয়া তামোল খাইয়েছ বৌদি' বলে ক্ষেপিয়েছিল। তবে উত্তর দেবার বদলে লজ্জায় রাঙা হয়ে পদুমী ওড়নাটা টেনে দিয়েছিল। বড় লাজুক সে—হরেনকে দেখতে পেলেই ঘরের ভেতর ঢুকে যায়। পদুমীর কথা বললেই ক্ষণিকের দেখা সেদিনের পূর্ণিমার চাঁদের মতো নিষ্পাপ, লাবণ্যময় মুখটির কথাই হরেনের মনে পড়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ তাকে এই রূপে দেখতে পেয়ে হরেন স্থির হয়ে গেল।

কয়েকটি পদ্মফুলের মধ্যে তখন একটা পদ্মফুল হয়ে পদুমী ভেসে ছিল। পদ্মপাতার মতোই সবুজ হয়ে গিয়েছিল তার হাত, তার পা। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য, হঠাৎ একটা পাক মেরে বিলে অতল জলের নিচে ডুব মারল। অনেকক্ষণ পরে একেবারে পারের কাছে ছোট-বড় ঢেউয়ের মধ্যে দেখা গেল তার শরীরের আভাস। জলের উপর ভেসে উঠে পুনরায় সে আগের মতো আকাশের দিকে বুক রাখল। সকালের কোমল রোদে বড়-জালের মতো স্বচ্ছ হয়ে পড়েছিল তার শঙ্খের মতো স্তন, খালৈর মত কোমর, পাকের মূর্ত ঘূর্ণ্যমান গভীর নাভিমূল। তার সেই আশ্চর্য ঢেউ খেলানো পিছল শরীরের ভাঁজে ভাঁজে খেলা করছে অসংখ্য ছোট ছোট মাছ। তীরে পৌঁছেও পদুমী পারে উঠে এলো না, জলকুমারীর মতো পা দাপিয়ে সে এভাবে বিলের বুকে সাঁতার কাটতে লাগল যেন জলের মধ্যে আগুন লেগেছে।

সেদিন আগুন শুধু জলেই লাগে নি, হরেনের মনেও লেগেছিল। কামনা আর ঈর্ষার আগুন। কয়েকদিন সেই আগুনে ছটফট করতে থাকার পর বৃষ্টিস্নাত এক রাতে তার দেহের উত্তাপ শান্ত হয়েছিল। ভীখারুকে টঙীঘরে রাত কাটাতে বলে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে একদিন হরেন ভীখারুদের দুর্বল দরজার খিল খুলল। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে চিৎ হয়ে গভীর ঘুমে অচেতন পদুমীর পাশটিতে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

পদুমীর শরীর থেকে তখন পদ্মফুলের সুবাস বেরোচ্ছিল। সেই সুবাসের উৎস খুঁজতে গিয়ে হরেন তার ফুলের মতো কোমল দেহের মধ্যে প্রবেশ করল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পদুমীর বৈশাখের বিলের মতো হালকা দেহটিতে কুঁচো মাছের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। বর্ষাকালের প্রবল বর্ষণে তখন বয়ে নিয়ে আসছিল উজানের হাওয়া।

সারাদিনের অমানুষিক খাটুনির ফলে রাতের বেলা পদুমী মরা মাছের মতো ঘুমোয়। মধ্য রাতে ভীখারু ঘরে ফিরে, তাই ঘুমের ঘোরে সে হরেনকে তার নিজের স্বামী বলেই মনে করেছিল।

অন্য কোনদিন হলে হয়তো সে ঘুমের মধ্যেই ডুবে থাকত, কিন্তু পরপুরুষের অপরিচিত কর্কশ স্পর্শ তাকে সজাগ করে তুলল। জেগে উঠেই বুকের উপর শুয়ে থাকা অপরিচিত দেহটিকে সে দুহাত দিয়ে সজোরে ঠেলে ফেলে দিতে চাইল, কিন্তু পাবল না। কালো রঙের হাতটা পদুমীর চিৎকার করে উঠতে চাওয়া মুখটা সজোরে চাপা দিয়ে ধরল। প্রবল বৃষ্টির শব্দে তার গোঙানির আওয়াজটা চাপা পড়ে গেল।

চরম দুর্ঘটনাটা যদিও সেদিনই ঘটে গিয়েছিল, পদুমীর কোন দোষই ছিল না-- রাধিকার মতোই সতী ছিল সে। স্বামী না থাকার সুযোগ নিয়ে পরপুরুষ অশুচি করে পালিয়ে যাওয়ার কথাটাও তার সরল মন মেনে নিতে চাইছিল না। মনে করেছিল, কোন ভূত বা পিশাচ ভর করেছে। রাতের বেলায় ঝাড়ফুঁক করে শরীরটা বেঁধে নিয়ে পুনরায় সে দুচোখ বুজল—অকল্পনীয় একটা স্বপ্নও দেখল। দেখল, ভীখারুর পেটটা গর্ভবতী মহিলার মতো ফুলে উঠেছে। মানুষ বলাবলি করছে-—তার নাকি ছেলে হবে। কেবল সেদিনই নয়, আরও একদিন গায়ে কাঁচা মাছের গন্ধ মেখে হরেন পদুমীর শরীরের সুবাসিত পাপড়িগুলি আলগোছে খসিয়েছিল। এই সমস্ত কথা ভাবতে গিয়ে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও হরেনের দেহ গরম হয়ে উঠল। গোঁফের নিচে একটা মুচকি হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল। এই চিন্তাতেই তার মশগুল থাকতে ইচ্ছে করল। কিন্তু হঠাৎ ছটফট করে যাওযা কোন অচিন নিশাচরী পাখির কর্কশ আওয়াজে সে চমকে উঠল। হায়, অনেক রাত হলো—মাছ মারতে হবে। তখনি সে তার শতচ্ছিন্ন খেয়ালি জালটা কাঁধ থেকে নামাল আর পরিপাটি করে জালটা দু'ভাগ করে হাতের মুঠিতে সাজিয়ে নিয়ে জলে খেপ দিয়েই হরেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কুয়াশায় ভাসতে থাকা গ্রামের অপ্রশস্ত গরু-ছাগলের পথটি দিয়েই সে আসছে। অন্যান্য দিন থেকে আগেই তাকে আসতে দেখে হরেন বিরক্তির সঙ্গে তার জালটা গুটিয়ে নিল। আর খালৈ দুটো কোমরে বেঁধে পেছনের রাস্তা দিয়ে যাবার জন্য তৈরী হতেই অকস্মাৎ তার মনে হলো গরৈ আজ হাঁটছে শামুকের মতো ধীর গতিতে, ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে। ঔ-গাছের কাছে পৌছতেই তার অনেক সময় পার হয়ে গেল। কি হয়েছে তার কৌতুহল বশত কুয়াশায় ভেজা ঝরে পড়া পাতাগুলি সাবধানে মাড়িয়ে হরেন ঔ গাছের ঝোপের কাছটাতে পৌছল। অবাক হয়ে সে দেখল, এই হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডাতেও তার গায়ে কোন কাপড় নেই—সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

দুপুরবেলা একটা আমগাছের নিচে বিমর্ষ হয়ে বসে গরৈ মায়ের কথা ভাবছিল। এমন সময় গ্রামপ্রধানের সাদা গোরুটা কোথা থেকে দৌড়ে এসে তার গা চাটতে লাগল। গ্রামপ্রধানের ঘর ছেড়ে আসার পরে দূর থেকে তাদের গরু মোষগুলিকে দেখলে তার মন কাঁদে, তার উপর তার সবচেয়ে আদরের গরুটিকে কাছে পেয়ে গরৈ তার গলকম্বলে আলগোছে একটা চুমু খেল, গা-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কিছুটা দূর থেকেই দুই একজন রাখালের সঙ্গে ধনীরামও এই দৃশ্যটা উপভোগ করছিল। হঠাৎ তার মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি গজিয়ে উঠল। ধনীরাম তার কর্কশ স্বরের সঙ্গে কিছুটা বিদ্রুপ মিশিয়ে বলল, 'এই দেখ, তোর মাকেও বাঁকে এভাবে আদর করত ....'

ধনীরামের প্রতিটি শব্দ গরৈকে শিঙি মাছ বিদ্ধ করার মতো বিঁধল, তার ছোট্ট শরীরটা লবন দেওয়া মাগুর মাছের মতো ছটফট করে উঠল। তবু শুনেও না শোনার মতো ভান করে সে আগের মতোই গরুর গা-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু ক্রমশ সহ্যের বাইরে চলে যাওয়া ধনীরামের অশ্লীল কথাবার্তাগুলি গরৈর ঘুমন্ত চণ্ডালের মতো রাগটাকে জাগিয়ে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে হাতের লাঠিটা দিয়ে ধনীরামের বাঁ-হাতে প্রচণ্ড জোরে একটা আঘাত হানল। পরপর

তিনবার এভাবে প্রহার করার পর ধনীরামকে এভাবে মার খেতে দেখে রাখালরা গঁরেকে এসে জাপটে ধরল। হুলুস্থুল শুনে মাঠ থেকে সবাই দৌড়ে এলো। কেউ গরৈর কথা শোনার চেষ্টা করল না, সবাই মিলে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে চোর পেটানোর মতো প্রহার করল। মার খেয়ে গরৈ যখন একেবারে অবশ হয়ে মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছিল, নাক দিয়ে ফেনা বার হচ্ছিল, তখন সবাই মিলে তার ধুতিটা খুলে নিল। আর হঠাৎ উলঙ্গ হয়ে পড়া তার গরৈ মাছের মতো কর্কশ দেহটার চারপাশে সবাই এক আশ্চর্য পাশবিক উল্লাসে চিৎকার করে উঠল।

একটুও নড়াচড়া না করে গরৈ অনেক সময় নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকায় দেহে প্রাণ আছে না নাই দেখতে গিয়ে তার রক্তাক্ত দেহে ধনীরাম কাঁচা মাছের গন্ধ পেল। ধনীরামের কথা শুনে তারা সবাই গরৈর উলঙ্গ দেহটা শুঁকে দেখার জন্য তাড়াহুড়ো লাগাল। আর আশ্চর্যজনকভাবে সবাই তার শরীরে কাঁচা মাছের টাটকা গন্ধ পেল। সে যে বাঁকের ছেলে, তা নিয়ে আর কারো মনে কোন সন্দেহ রইল না। কিন্তু পরে তারা নিশ্চল, রক্তাক্ত দেহটা একটু নড়াচড়া করে উঠতেই তারা সবাই সমস্বরে 'বাঁকের ছেলে গরৈ মাছ, বাঁকের ছেলে গরৈ মাছ' বলে চিৎকার করে গান গাইতে গাইতে ঘরে ফিরে গেল। যাবার আগে ধনীরাম গরৈর ধুতিটা একটা জীর্ণশীর্ণ আমগাছের অনেকটা উপরে ছুঁড়ে দিল।

জ্যোৎস্নার রাতে গরৈকে ও-ঝোপের আশেপাশে দেখতে পাওয়াটা হরেনের কাছে কোন নতুন কথা নয়। সাধারণত রাত না পোহানো পর্যন্ত এখানটাতে কানাওলা পাওয়া মানুষের মতো সে ঘোরাফেরা করে থাকে। কিন্তু আজ তাকে একেবারে অন্য রূপে দেখতে পেয়ে হরেন স্তব্ধ হয়ে গেল। কোনমতে দাঁড়িয়ে থাকা গরৈর ক্ষতবিক্ষত উলঙ্গ দেহটা, বিশেষত জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠা তার রক্তাক্ত পিঠটা হরেনের তালু থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। যেন তেলে ছাড়ার আগে জীবন্ত একটা মাগুর মাছকে কেউ মাঝখান দিয়ে কেটেছে। তার মুখটা আরো কুৎসিৎ হয়ে উঠেছে। দেখলে কে বলবে পদুমীর রক্ত-মাংসে গড়ে উঠেছিল তার কুৎসিৎ শরীর, গড়ে উঠেছিল তার হাত, তার পা আর.....

'পিতা.......

অকস্মাৎ রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে ভেসে এলো এক করুণ আকুতি। মুহূর্তের জন্য বিলের মৃদু ঢেউগুলির উপর দিয়ে ভেসে আসা ঠাণ্ডা বাতাস, এমনকি বাতাসে থরথর করে কাঁপতে থাকা বাঁশগাছের পাতাগুলিও থমকে গেল। জলের দিকে তাকিয়ে গরৈ পিতা বলে ডেকে চলেছে। গরৈর রাতের বেলা ঘুরে বেড়ানোর কারণটা বুঝতে পেরে হরেন শিহরিত হয়ে উঠল। পিতা। কে তার পিতা?

লোকে বলে, সে বাঁকের ছেলে। কিন্তু হরেনের সামনে কেউ বাঁকের ছেলে বললে তার খুক খুক করে হাসি পেয়ে যায়। এদিকে পাভে বুড়ি বলে, না গরৈ ভীখারুর ছেলে। ভীখারু কীভাবে জন্ম দেবে তাকে? গরৈর জন্মের কয়েকদিন পরে বাগানের ডাক্তার বড় অবাক হয়ে তাকে আসল কথাটা বলেছিল। অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখানোর পরেও সন্তানের মুখ না দেখে শেষে ভীখারু নাকি তার কাছেও গিয়েছিল। তিনি ঔষধপত্র দিয়ে অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোন লাভ হলো না। তার মতে, সন্তানের জন্ম দেবার ক্ষমতা ভীখারুর ছিল না।

অনেক আশা করেই নির্জন বিলের বুকে নৌকা নিয়ে গিয়ে হরেন ভীখারুর মাথার পেছন দিকটাকে বৈঠা দিয়ে আঘাত করেছিল। আর তারপরে নৌকোর পাটাতনে কিছুক্ষণ ধড়ফড় করে নিশ্চল হয়ে যাওয়া তার মৃতদেহটা জাল দিয়ে ঘিরে নিয়ে শ্মশানের সামনে সেই জংলাজায়গাটায় পুঁতে রেখেছিল। কিন্তু তাকে হত্যা করার পর আর কোনদিনই হরেন পদুমীর কাছে ঘেঁষতে পারে নি। স্বামীর মৃত্যু তার রূপের সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের ঘুমকেও কেড়ে নিয়েছিল। হরেনের মুখে প্রথম কথাটা শুনে পদুমী

বিশ্বাসই করে নি। কিন্তু ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দৌড়ে এসে যখন সে বিলের জলে হাজার হাজার মরা মাছ ভেসে থাকতে দেখল, তার চোখ স্থির হয়ে গেল। বিস্ময় এবং যন্ত্রণায় অদ্ভুত ভাবে মেলে থাকা চোখদুটি আর কোনদিনই বন্ধ করতে পারল না।

সারাজীবনের জন্য না পেলেও পদুমীর বর্ষার ঝিলের মতো স্ফীত হয়ে ওঠা পেটটার দিকে তাকিয়ে হরেনের মন এক ধরণের আনন্দে ভরে গিয়েছিল। সেউতীর মতো তাকে বিছানায় স্ত্রী হিসেবে না পেলেও পদুমীর গর্ভে বেড়ে উঠছে তারই বংশধর।

'পিতা'.....

ঔ-গাছের গুড়ি থেকে জলের কাছে দু'পা এগিয়ে গিয়ে গরৈ পুনরায় চিৎকার করে উঠল। বাঁশীর করুণ সুরের মতো বুক নিংড়ে বেরিয়ে আসা তার কান্না মিশ্রিত চাপা, ক্ষুব্ধ আকুতিটা হরেনের বুকটাকে মুচড়ে ধরল। সেই নির্দয় বুকে অচল হয়ে থাকা এতদিনের সকল রুক্ষ গাছটাকে গরৈর বুকভাঙা কান্না শিকড় উপড়ে নিতে চাইল। উত্তর দিতে গিয়েও হরেন চুপ করে গেল, জবাবের বদলে তার বুক ভেদ করে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

খাড়াইয়ের পাশে বড় বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে গরৈ এবার প্রায় অর্ধস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে উঠল। কয়েকটি অনিশ্চিত মুহূর্ত বড় দ্বিধান্বিত ভাবে পার হয়ে গেল। তারপর সে শেষবারের মতো 'পিতা' বলে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গরৈকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে হরেনও তাড়াতাড়ি করে খাড়াইটার পাশে দৌড়ে গেল। দেখল, জ্যোৎস্না-স্নাত বিলের একটা জায়গায় অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। তার চারপাশে অজস্র ঢেউয়ের ঘূর্ণি। হরেন জানে হাতিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মতো জল এখানে, আর এর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কিনা কখনও জলে না নামা ছেলেটি। জালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হরেনও সেই জমাট বাঁধা অন্ধকারের গভীরতায় ঝাঁপ মারল। জলের উপরে মৃদু আলোর ঝলকানি, কিন্তু তার নিচের দিকে অন্ধকার ক্রমশ আরো ঘন হয়ে উঠেছে। পাক খেতে খেতে এগিয়ে আসা বিশাল অন্ধকারের মধ্যে হাহাকার করে হরেন ঘুরে বেড়াল। কিন্তু গরৈর কোন চিহ্নই দেখতে পেল না। তবুও বুকের মধ্যে শ্বাস থাকা পর্যন্ত সে ঘুমন্ত মাছের রাজ্যে, পদুম, শালুক ফুলের লতাপাতায় আর জলজ ঘাসে ভরা জলের নিচে অনেকক্ষণ ছেলেকে খুঁজে বেড়াল। কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না। বিলের নিচে কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল—কোথাও তার হাত-পা নাড়ার শব্দ শোনা যায় কিনা দেখার জন্য। না, কোন আশাই নেই। কেবর অথৈ জলের মধ্য দিয়ে ভেসে আসছে অনাথ মাছগুলির দীর্ঘশ্বাস আর ফিসফিসানির শব্দ। নিরাশ হয়ে একবুক নিঃশ্বাসের আশায় হরেন উপরের দিকে ভেসে উঠল। কিন্তু ভেসে ওঠার আগেই দুটো অদৃশ্য হাত তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। অনেক চেষ্টা করেও সেই সবল বাহুবন্ধন থেকে হরেন বেরিয়ে আসতে পারল না। সে যতই চেষ্টা করে হাত দুটো তাকে ততই শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। মৃত্যুভয়ে ভীত হরেন ছটফট করে চিৎকার করে উঠল, নিঃশ্বাস নিতে না পারা তার ভয়ত্রস্ত চিৎকারটা জলের মধ্যে কয়েকটা বুদ্বুদের সৃষ্টি করল। বহু প্রতীক্ষার শেষে, অথৈ জলের মধ্যে বাবাকে খুঁজে পেয়ে গরৈ এত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল যে তার বুকের মধ্যে হরেন স্থির হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই ঘুরে ঘুরে তলিয়ে যাওয়া বাপ-ছেলের আলিঙ্গনাবদ্ধ, বরফ হয়ে যাওয়া দেহদুটিকে ঘিরে ধরে মাছগুলি কলরব করে উঠল।

(কলং এবং কপিলি নদীর ধারের নদীমাতৃক সমাজের একটি অলৌকিক কিংবদন্তীর বিনির্মাণ)

নদী যদি

কুল শইকীয়া

গাল এবং গোলাকার সূর্যের মধ্যের রঙের বৈসাদৃশ্যটা ক্রমশ দূর হয়ে এলো—বাতাস উড়িয়ে নিল আকাশের তুলোর মেঘ আর কপালের চুলের গোছা, সূর্যের কিছুটা অংশ অদৃশ্য হলো, আর অবাধ্য চুলগুলি ঢেকে দিল বাঁ চোখটা, সে ডান হাতের আঙুল দিয়ে চুলগুলিকে পেছনে ঠেলে দিল, বালি আর ঘামের দ্রবণ সৃষ্টি করল এক ভাললাগা লেপন। স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুড়ুৎ করে ভেতরে টেনে নিল নাকের নিচ পর্যন্ত নেমে আসা শির্কানটা—

"এরপরে ?"

তার কথায় নিমুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল।

"কাজের মধ্যে কথা বলতে নেই—

অথচ নিমুও কথাই বলল। তার লিডারের চেহারা নিয়ে পুনির দিকে তাকাল, যার অর্থ হলো এখন এই সময়ে আমিই লিডার, আমার কথা আর হুকুম মতেই সমস্ত কাজকর্ম চলবে, খেলার নীতি-নিয়ম, বাকি যেখানে যা—

নিমুর এ ধরনের ব্যবহার তনুকে খুব একটা আনন্দ দিল না, সে বলল যে খেলায় সকলের নিয়মই চলবে, কারো কোন আইডিয়া থাকলে জানাতে পারে, কারণ শুধু যে নিমুর মাথাতেই ভাল কথাগুলি খেলবে, সেটা তো নাও হতে পারে-- - আর তার এই ধরনের সাহসী ঘোষণা পুণির মনে সাহসের সঞ্চার করল, সে ফ্রকের ধুলোবলি ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল, নিমুর দিকে এগিয়ে এলো, এক নিরাপদ দূরত্বে থেমে গেল, আর বলল ঃ "হবে হবে, সবই চলবে—"

বিকেলের রোদে পুণির দীর্ঘ ছায়াটি নিমুর দীর্ঘ ছায়াকে ঘিরে ধরল, সে বালির ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা হাতটা বের করে আনল, দুই হাত দিয়ে চাপড মেরে মেরে ধুলো ঝাড়ল, আর ঘ্যানঘ্যান করে উঠল।

"তোরাই খেল—আমি এসবের মধ্যে নেই—"

তারপর সে আর কারো দিকে তাকাল না, বালির পাহাড়ের উপর দিয়েই হেঁটে চলল, গরম বালির মধ্যে ঢুকে গেল তার দুটো পা। সে ধীরে ধীরে পুণি এবং তনুর দিকে পেছন দিয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে এগিয়ে গেল -- তার চোখ মুখের ভাব ভঙ্গি থেকে বোঝা গেল এরকম নিয়মবিহীন খেলা থেকে দূরে সরে গিয়ে সে এখন বাড়ির দিকে রওয়ানা দিচ্ছে।

বালির পাহাড়ের উপারে নিমু অদৃশ্য হবার আগে তাকে পুনরায় আপোষ মীমাংসার জন্যে ডেকে আনাটা ভাল হবে -- তনু ভাবল, এবং ঠিক করল যে পুণিকে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে রাখাটা ভাল হবে -

"তোর কথার কোন রাখ ঢাক নেই--"

মুখের ভেতরেই এ ধরনের মহান বাক্যের অবতারণা করে সে দু'বারের মতো পুণি শুনতে না পায় এভাবে আওড়ে গেল, বড় আশ্বস্ত হলো না, পুণি বড় ছিঁচকাদুনে, সে কান্না শুরু করলে আর বন্ধ হবে না --

তনু পাহাড়টার দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে গেল এবং নিমুকে চিৎকার করে ডেকে বলে উঠল "আয় আয় তোর নিয়ম মতেই --" পাথরের পাহাড় হলে চিৎকারটার প্রতিধ্বনি শোনা যেত-আহ হ কিন্তু চারদিকের বালির স্তূপগুলি সৃষ্টি করা পাহাড়ের মতো ঢিপিগুলিতে তনুর কথাগুলি কম্পিত হলো না, কিন্তু সে অনুমান করল নিমু ঠিকই শুনেছে, সে ফিরে আসবে, কারণ, এখনও বিকেল হওয়ার কিছু বাকি আছে, সূর্য ডুবলেও কিছু আসে যায় না, আজ জ্যোৎস্না রয়েছে, জ্যোৎস্নাব আলোতে সমস্ত মরুভূমিটাই হয়ে উঠবে দিনের মতো ঝকঝকে - আরও কিছুক্ষণ খেললেও আপত্তি নেই, তাঁদের বাবারা তো সেই রাতেই ফিরবে --

"না এলেও কোন কথা নেই -- "

এখনও পুণির রাগ পড়েনি, তার কাছে এখন নিমুর কোন অস্তিত্ব নেই, প্রযোজনে সে আর তনুই খেলার বাকি অংশটুকু শেষ করবে, তা বলে কি মিথ্যে দাদাগিরি সহ্য করতে হবে ?

সে আর কথাটা বিস্তারিতভাবে বলল না, অথচ তনুর বুঝতে অসুবিধে হলো না যে পুণির পক্ষে গোটা ব্যাপারটা হজম করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

"শুধু আমরা দু'জনে মিলে কি খেলব? তোর সঙ্গে তো আরো মুশকিল, সুযোগ পেলেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবি --"

তনুর নির্মম শব্দের প্রহার পুণিকে স্পর্শ করে গেল, মুখে কিছুই বলল না, দুই হাতে অঞ্জলি ভরে বালি নিল, ঝিরঝির করে বালিগুলি তাব ছোটছোট আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ল এবং ছোট একটা বালির স্তূপ সৃষ্টি করে তুলল। মরুভূমির বাতাস সেই স্তূপটিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই সমান করে দিল, আর তার অবস্থিতি তার চোখের সামনেই বিনষ্ট হয়ে গেল।

"আমি যাই --"

হঠাৎ বসা থেকে উঠে দাঁড়াল পুণি।

"কোথায়?" তনুর কথায় ফুটে উঠল এক নিঃসহায়ের ধ্বনি।

''মীনার সঙ্গে খেলব--'

তনু জানে যে ওরা নতুন কিনে আনা উটের বাচ্চাটির নাম দিয়েছে মীনা—

''আয় তাহলে এক সঙ্গেই খেলি ''

দু'জনেই মুখ ঘুরিয়ে নিশ্চিত হলো যে ইতিমধ্যে নিমু এসে ওদের কাছে পৌচেছে, তার মুখে সেই গম্ভীর ভাবটা আর নেই, হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে সে ওদের কাছে বসেই পড়ল --

''আয় বোস ''

তার মমতা মাখা নির্দেশে তনু আর পূর্ণি নিজের অজান্তেই বালির স্তুপটার উপর বসে পড়ল পায়ের নিচে থেকে হুড় হুড় করে বালি সরে গেল।

''কি খেলবি?''

''কিছু একটা নতুন--''

নিমুর পরামর্শ নীরবতা এনে দিল – কি হতে পারে নতুন খেলা ?

''কিছু একটা অন্য ধরনের, কিছু একটা নতুন—এই মনে কর একটা খেলা যা আমরা আজ পর্যন্ত খেলিনি, বা পুষ্প, শৈলেনরাও খেলতে পারেনি।''

সমস্ত ব্যাপারটাই পূর্ণির কাছে কেমন যেন অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। সে শুধু বালির উপর আঙুল দিয়ে আঁকল ওদের মীনার দীর্ঘ কান দুটি -

''নতুন খেলা আর কোথায় পাবি?''

তনুর স্বরে এক অসহায় ধ্বনি ফুটে উঠল। সে বালির উপর আঁকল কাঁটা ক্যাকটাসের ঝোপ আব আমার দিকে তাকাল। প্রথমবারের জন্যে আমার মনে হলো একজন অপরিচিত ট্যুরিষ্ট ওদের কাছ থেকে কিছু দূরে বসে থাকা এই মাত্রই এদের দৃষ্টিগোচর হলো, আমি চোখ সরিয়ে দূরের দিকে তাকালাম—বাতাস তৈরী করা বালির স্তূপগুলি, স্যান্ড ডিউনসগুলিব দিকে আমি একটা একটা করে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম, দূরে শুধু বালি, সমতলপৃষ্ঠ, তাবপর আকাশ ছুঁয়েছে মাটিকে, সূর্যটা এখনও মাটি থেকে কয়েক ফুট উপরে

লোকসঙ্গীতের একটা সুর বাজছে, কিছু দূরে উটেব পিঠে উঠে ভয়ে ভীত, স্ফূর্তি তামাশায় মেতে উঠেছে মরুভূমি দেখতে আসা পর্যটকের দল। আমি এখন নিমু, তনু, পূর্ণি নামের তিন মরু শিশুর থেকে বেশ দূরে অবস্থান করছি, নিরালায়, আর অপেক্ষা করছি মরুভূমির দিগন্তে কিভাবে সূর্য অস্ত যায় :'ব এক দৃশ্যের ফটোগ্রাফিক স্মৃতির জন্যে।

''ভেবে পেলি?''

''কি?''

''নতুন খেলা?''

'উঁহু''

অনুমান করে নিচ্ছি শেষের নেতিবাচক উত্তরটা নিশ্চয় তনুর, তার স্বরে একটা নাকি সুরেব প্রবণতা আছে। মাথা ঘোরালাম না ওঁদের দিকে, দৃষ্টিতে আমাব একটা প্রকাণ্ড বালির স্তূপ, বাতাসের স্রোত সৃষ্টি করা বালির ঝিরঝির ছোট নদী - আমরা উপস্থিতিকে ওরা নিশ্চিতভাবে অগ্রাহ্য করে মরুভূমি দেখতে আসা মানুষদেরই কেউ একজন বলে আমি ওদের বিশেষ আকর্ষণের লক্ষ্যস্থল হতে পারি না এরকম অজস্র ভ্রমণকারীর মধ্যেই ওঁরা প্রত্যহ মেলে ধরছে দৈনন্দিন খেলাব সম্ভার, আমার অবস্থান কোন নতুনত্বের সৃষ্টি করতে পাবে না, আমি নিঃসঙ্কোচ হলাম

''আগের খেলাটাই--''

''বিরক্ত লাগছে'' -- পুণি তনুর মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে এক গম্ভীর উত্তর দিল, সে উঠে দাঁড়াল, আর হঠাৎ কথায় কথায় এসে পড়ল নতুন কিছু একটা খুঁজে পাবার প্রসন্নতা -

''কেল্লা একটা বানালে কেমন হয় ? এই যে টাউনে রয়েছে, রাজার আমলের দুর্গ, যেখানে রাজা থাকে, রাণী বাস করে, আশেপাশে প্রয়োজন হলে অন্য মানুষের হার্ভেলি বাজার হাট, ঘর-বাড়ি আরও কত কিছু--''

পুণির এই উত্তেজনা মুহূর্তে তছনছ করে নিমু উত্তর দিল যে এটা কোন নতুন খেলাই নয়, এর আগেও কয়েকবার ওঁবা এরকমের খেলা খেলেছে -- বাজার হাট বানিয়েছে, বালি দিয়ে তৈরী করেছে দুর্গের প্রাচীর, শুকনো ডাল দিয়ে নির্মাণ করেছে গুলী না-ছোঁড়া কামান - তাতে আবার পুণির নতুন কোন কিছু আবিষ্কারের মাহাত্ম্য নেই, এমনকি টাউনে গেলে ওরা পাহাড়েব উপরেব বাজারের মন্দির অনেকবার দেখেছে, একই, এটাকে সে খুব একটা নতুন কিছু বলে ভাবে না।

পুণি স্পষ্টতই ক্ষুন্ন হলো। পুণির মুখের দিকে তাকাতে হবে এমন কোন কথা নেই, তবু আমার চোখ ওর দিকে গেল—অশৃঙ্খলিত চুল ঢেকে এনেছে তার কপাল, রাঙ্গা গালে এখানে সেখানে ঘাম আর বালির নির্মোহ কলাপ, এখানকার স্থানীয় স্টাইলের রঙচঙে ফ্রকজাতীয় কাপড় তার হাতের চুড়িগুলি ঢেকে রাখতে পারেনি, তার চলাচলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সস্তা পাযেল থেকে বেরিয়ে আসছে মৃদু আওয়াজ।

- মুখ ঘোরালাম, আমার পাশ দিয়ে চলে গেল একদল বিদেশী পর্যটক, বুটের পদক্ষেপে বালিতে সৃষ্টি হলো পদচিহ্ন, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেগুলি মিলিয়ে গেল, কে যেন চিৎকার করে বলল, ক্যামেরা প্রস্তুত রাখা দরকার, আর কিছুক্ষণ পরেই সূর্য ডোবার এক আশ্চর্য দৃশ্য ভরিয়ে তুলবে মরুভূমির পশ্চিমাকাশ --

বললাম, 'ঘরে যাই—'

কথাটা বাকি দুজনকে খুব একট ভাবাল না, আর কেউ কোন মন্তব্য করল না, আমি বুঝলাম তনুর কথাতেও কোন উষ্মা নেই, নতুন খেলার অনাবিষ্কার তাকে শুধু বিরক্ত করে তুলেছে।

"কি বানালি ওটা?"

''কিছু একটা - মনে কর, একটা পাথর থাকা পাহাড়--''

পুণি নিমুকে খুব একটা খুশি করতে পারল না, সে বলল, ''বাদ দে ওগুলি - পুরনো খেলা''

ওঁদের ছোটখাট বাকবিতন্ডা থেকে, মুখ না ঘুরিয়ে, আমি অনুমান করলাম ইতিমধ্যে নিমু প্রচন্ড লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেলেছে পুণির পাহাড- ছোট বড় কণা এসে আমার গলায় লাগল - ইচ্ছে করলে আমি অন্যান্য পর্যটক দলের মধ্যে ভিড়ে যেতে পারি, আর এদের দ্বন্দ্ব—লড়াই থেকে সরে গিয়ে একাগ্র চিত্তে দেখতে পারি মরুভূমির সূর্যাস্ত- কিন্তু চলে গেলাম না, উপর আঙুল দিয়ে আঁকলাম কয়েকটি ইংরেজি অক্ষর, যার কোন শব্দগত অর্থ হলো না, কেবল টাইম পাস -

''নদী নদী খেলব --''

নিমুর কথায় হঠাৎ ফুটে উঠল নগ্ন আর্কিমিডিসের উল্লাসের ধ্বনি। ক্ষণিকের জন্যে কারো কাছ থেকে শোনা গেল না উচ্চ বাচ্য, শুধু পুণির মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে এলো বিরক্তিব এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

"তুই না খেললে নেই --"

নিমুর স্পষ্ট কথায় পুণি আত্মরক্ষায় নামল--

"খেলব আবার"

দূরে বসে থাকা উটটার দিকে আমার দৃষ্টি গেল, তার পিঠ থেকে নামল দুজন পর্যটক, মুখ থেকে তাদের শঙ্কার ভাব দূর হলো আর উটের পিঠে হাত বুলিয়ে একজন জিজ্ঞেস করল, "এর নামটা কি?"

"বাদশাহ"

"বাঃ খুব সুন্দর —"

আর ডুবন্ত সূর্যের দিকে মুখ করে একভাবেই বসে রইল বাদশাহ।

"নদী দেখেছিস?"

"হ্যাঁ --"

পুণির উত্তর নিশ্চিতভাবে সুখী করল না নিমুকে। ওঁদের গ্রামের শত মাইলের ভেতরে নদী নেই, সে আবার নদী দেখবে কোথা থেকে -- নিমুর এই কথায় তনু বড় প্রসন্ন হলো না।

"নিজে দেখেছিস?"

মনে হলো, এই প্রত্যক্ষ প্রত্যাহ্বানের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল নিমু, কারণ প্রশ্নটা তার দিকে ছুঁড়ে দিতেই অনর্গলভাবে বলে গেল সে, নদী দেখেছে, শুধু দেখাই নয় -- নদীর জলে সে নেমেও দেখেছে, ঢেউয়ে সে ভাসিয়ে দিয়েছে ছেঁড়া কাগজের টুকরো, স্রোত সেগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, ঘূর্ণির মধ্যে হঠাৎ ঢুকে গেছে আর বেরিয়ে এসেছে অনেকটা দূরে -- এ সমস্ত ব্যাপার যারা নদী দেখেনি তারা বুঝতে পারবে না -

বাকি দুজনের মুখের অভিব্যক্তি দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে ওঁরা এখনও নিমুর কথায় বিশ্বাস করতে পারছে না -- নদী দেখা কি সামান্য কথা? খাবার জলের জোগাড় করতেই ওদের মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়, উটের পিঠে উঠে ঘুরে বেড়ায় ওদের ঘরের লোক জলের সন্ধানে। সেটা আবার নদীর মতো কি যেন একটা যার বুক দিয়ে অহরহ জল বেরোয়, নৌকা চড়ছে, মানুষ সাঁতার কাটছে —

"মিথ্যে কথা" -- পুণির কথায় ফুটে উঠল এক গভীর প্রত্যাহ্বান। নিমু তার কাছ ঘেঁষে আসল, আমার মনে দেখা দিল শঙ্কা। যুযুৎসু ভঙ্গিতে তার এগিয়ে আসা তনুকেও সচকিত করে তুলল।

"ঠিক আছে, দেখেছিস মেনে নিলাম'—তনুর আপোষমূলক কথা তাকে শান্ত করে তুললেও তার সমস্ত রাগ দূর হলো না, আর সে ঝগড়া ভুলে গিয়ে ঘোষণা করল যে দুই মাস আগে সে বাবার সঙ্গে বহু দূরে বেড়াতে যাবার সময় সত্যি সত্যিই নদী দেখেছে। সে জায়গাটা বেশ দূরে, তার নামটা মনে নেই, কিন্তু নদীর পারের শহরটাতে দস্তুরমতো দুই রাত কাটিয়ে এসেছে। এতটুকু ব্যাখ্যাই পরিবেশে এনে দিল কিছু শীতলতা।

"একটা নদীই বানাই -- কেমন দেখ ?

"সুন্দর --" পুণির কথায় দেখা গেল এক নতুন মাদকতা। দূরে বসে থাকা বাদশাহ গলাটা নাড়িয়ে দিল আর তার গলায় ঝুলিয়ে রাখা ঝুমঝুমির ঝুনঝুন শব্দ সৃষ্টি করল এক অপরিচিত সুর, তার চোখে মুখে উড়তে থাকা কীট পতঙ্গের ঝাঁকটা কিছু দূরে সরে গেল, উটের চালক তার গ্রীবাটাকে স্পর্শ করল। মানুষ, উট, বালির স্তূপ -- প্রতিটিরই ছায়াগুলি ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে আসছে, থেকে থেকে

বাতাসে ভেসে আসছে ধূলিকণা -- দূরে মরুভূমি ছাড়া কিছুই নেই, আর আমার চোখ দুটি ধাক্কা খেল রোদের প্রাচুর্য কমে আসা রাঙা রাঙা সূর্যাস্ততে -

নিমুদের গুনগুনানি বেড়ে গেল, তিনজনের চোখেমুখেই দেখা গেল ব্যস্ততা, কাজের ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেওয়া হলো -- তবু নদী খুঁড়বে, সে দুহাতে উঠিয়ে আনা বালিগুলি কিছু দূর পর্যন্ত ঠেলে পাঠাবে পুণি, হুকুম চলল নিমুর --

"জল ছাড়া কি নদী হয়?"

পুণির জবরদস্ত প্রশ্ন নিমুর মনের মধ্যে আবার রাগের মাত্রা চড়িয়ে দিলেও সে ঠান্ডা মাথায় বলল ঃ "হবে হবে খেলাই তো - খেলার মধ্যে কত কথাই তো আমরা মিছামিছি ধরে নেই, এই যেমন, তুই কনে হলি, আমি বন্দুক চালালাম -- এগুলি কি সত্যি?" পুণি তার যুক্তি বুঝতে পারল, সে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজে নেমে পড়ল -

"শুধুই নদী না আরও অন্য কিছু?"

জলহীন তৃষ্ণাতুর নদীর নির্মাণ কাজ তনুকে তৃপ্তি দেয়নি - তার কথার অর্থ আমি এভাবেই ভেবে নিলাম।

"কখনও নদী শুকিয়েও যেতে পারে - "

নিমুর স্বল্পজ্ঞানের ব্যাখ্যা এভাবেই বোঝাল যে, একটা নদীতে যে শুধু অনবরত জলই বইতে থাকবে সেটা নাও হতে পারে, তাতে সব সময় নৌকা চলবে, মাছ কুমীরের জন্ম হবে -- এসবে কখনও স্থিতাবস্থা আসতে পারে, যেমন এই মরুভূমির কথাটাই ধরা যেতে পারে -- তাদের স্কুলের শিক্ষকমশায় বলেছেন যে আসলে এসব এক সময় সাগরের নিচেই ছিল, সমুদ্রের নিচের বিভিন্ন জীবজন্তুরা একসময এখানে বিচরণ করত, সেটা হলো হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। তারপর হঠাৎ একটা কি যে হলো, হয়তো ভূমিকম্প, বা তেমনই কোন বড় ধরনের প্রলয় যার ফলে মাটি কাঁপল, পৃথিবী নড়ল, সাগর নাই হয়ে গেল এবং এখন এখানটা এক বিন্দু জল থেকে বঞ্চিত একটি শুষ্ক প্রান্তর --

নিমুর জ্ঞানের প্রাবল্য আমাকে নিশ্চিতভাবে চমকে দিল।

"এভাবে নদীও কখনও শুকিয়ে যায়, নতুন দিকে সে গতি পাল্টায়, তারপর শুকিয়ে যাওয়া নদীর তীরবর্তী গ্রাম-শহর-মানুষ-জীবজন্তু সবার কাছেই নদী হয়ে পড়ে একটা স্মৃতির বক্ররেখা সেখানে জল থাকে না, সেখানে জীবন চলে না, রাখালের উলঙ্গ শরীর সেখানে ডুব দিতে পারে না -" এই কথাটাই আমি ওদের বলব বলে আওড়াতে থাকি, মনের মধ্যে আরো নিশ্চুপ, নিশ্চলভাবে বাদশাহের শ্রান্তিতে মুদে আসা চোখজোড়ার উপর চোখ রাখলাম।

"শুধু নদীতেই হবে না -- তার পাশে থাকতে হবে ঘর, খেলার মাঠ, পাহাড়, মানুষ, বাজার, রেলের লাইন, রাস্তা আরও কত কিছু, মনে কর, একটা শহরে যে সমস্ত জিনিস থাকে --"

নিমুর হুকুম বাকি দুজনকেই আহ্লাদিত করে।

"বাজার, দেউল? কেল্লা? হাভেলি - এ সমস্ত "

পুণির প্রশ্নের ঝাঁককে তছনছ করে নিমু আদেশ দিল - 'সমস্ত কিছুই'।

ওদের শুকনো নদীর পারে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল নিমুর নির্দেশে শহর, গ্রাম —

"নদী থেকেই তোমরা জল বইয়ে দাও শহরের মধ্য দিয়ে, তার স্রোতে ভাসিয়ে দাও নৌকা, হয়তো কলাগাছের ভেলাও হতে পারে - ঠিক আমি যেখানে থাকি সেখানকার নৌকাটার মতো,

পাশেই বিবিণা এবং ঝাউ বনেব ঝোপ, সাদা বালিতে পড়ে থাকা চাঁদা মাছের ঝিলমিল, জেলেদের গ্রামের মাছের কাঁচা গন্ধ, বড় বড় জাল এ সমস্তই বালি দিয়ে তোমরা বানিয়ে ফেল -- কি মজার ব্যাপার, একটা প্রবাহিত নদী, স্রোতে ভেসে যাওয়া নৌকা, সন্ধ্যেয় নদীর বুকে ছড়িয়ে পড়া রক্তস্নাত বালি এ সমস্ত ''

আমার গলার ভেতরের এ সমস্ত ভাব শব্দের রূপ লাভ করার আগেই ধপাস করে একটা শব্দ হলো এবং আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম তনু ল্যাং কাটায় পুণি চিৎ হয়ে পড়েছে আর উঁচু জায়গা থেকে সে বালির পাহাড়ের পাশেই নিচে গড়িয়ে পড়ল—হাত আর পায়ের পায়েলের ঝনঝনানি ছাপিয়ে গেল বাকি দুজনের হর্ষধ্বনিকে।

ধুলো ঝেড়ে পুণি উঠে দাঁড়াল মনে হলো সে যেন ধূলোর নদীতে সাঁতার কেটে এলো।

''একেবারে ঐ মাথা পর্যন্ত যেতে হবে নদীকে --''

নিমুর হুকুম মতে ওঁরা বালির উপবে নদীর আকৃতিতে এক ফুট প্রস্থের খনন করা নর্দমাটাকে লম্বা করে টেনে নিয়ে গেল। পারে পারে সৃষ্টি হলো ছোট ছোট শহর, অজানা গ্রাম, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া রাজার দেউল, দুর্গ, পুবনোদিনের অভিজাত হাভেলি– আমি দেখলাম ইতিমধ্যে ওরা বড় বালির পাহাড়ের উপর দিয়ে অনেক দূব পর্যন্ত নিয়ে গেল ওদের শুকনো নদীটা। প্রত্যেকের চোখেমুখে ব্যস্ততার চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠল, মনে হলো, প্রথমবাবের জন্যে এই নদী নদী খেলার মাধুর্য ওদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ওরা বালি দিয়ে সৃষ্টি কবল ছোটছোট ঘর, রাস্তা-ঘাট, নীরস তরু তৃণেব আদল ওদের নদীর দুপাশে গড়ে উঠল এক সভ্যতা - এই সমস্ত কিছুরই নীরব দর্শক হয়ে রইলাম আমি এবং বাদশাহ।

''নদীটা একটা সেতু -- প্রাচীন এবং নবীনের মধ্যে, এই দেখ সে কীভাবে জোড়া লাগিয়েছে পুরনো ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়! নতুন দিনের সঙ্গে কীভাবে সে সভ্যতার বোঝা বয়ে চলেছে কেমন এক গতিশীল তার ভাষা, মনে কব আর দেখ তোমাদের এই মরুভূমিও একই কথা বলছে, নীরবে, অস্ফুট কণ্ঠে বলছে, আমিও ছিলাম তখন যখন সমস্ত কিছুই শুকনো ছিল, মানুষ ছিল না, প্রাণীহীন ছিল তোমার বিশ্ব- -আব আজও রয়েছি, তোমাদের বাতাস নিয়ে, নিঃশ্বাস গ্রহণ করে, আর পেটের মধ্যে স্তরে স্তবে সাজিয়ে রাখলাম তোমাদের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে, কাঁটা গাছের খোঁচায় রক্তাক্ত হওয়া তৃষ্ণাতুর মানুষকেও গোপনে লুকিয়ে রাখলাম আমার .. বালির নিচে--''

এই কথাটা আমি আর বললাম না, আরও বললাম না যে তোমাদের এই নদীব মতোই ছিল আমাদের গ্রামের নদীটা -যেখানে নাকি জল ছিল, বন্যার সময় ইচ্ছেমত তা ফুলে ফেঁপে উঠত, বইয়ে নিয়ে যেত কচুরিপানার ঝাঁক, তাতে আমরা সাঁতার কাটতাম, তীর থেকে লাফিয়ে পড়া জলে নেচে বেড়াত পুঁটি মাছের ঝাঁক - এখন সেখানে নদী নেই, নদী গভীর দহের আকারে জলের পিপাসায় আতুর তার চেহারা, সবাই জানে কখনও এভাবে শুকিয়ে যায়, থেকে যায় সেখানে শুধু মানুষের দীর্ঘশ্বাস আর ফ্যাক্টরির থেকে নিঃসৃত কদর্য দুর্গন্ধ

বাদশাহ কান নাড়াল, ডাঁশ জাতীয় মশা তাকে বিরক্ত করছে।

''কি এক অপূর্ব দৃশ্য --''

পাশে এসে বালির উপর ধপাস করে বসা বিদেশিনী প্রৌঢ়াটি বসল আর আমি শুনলাম ক্যামেরার শাটারের আওয়াজ, কয়েকটি ফ্রেমে বন্দী হয়ে গেল ধীরে ধীরে মরুভূমির অস্তগামী লজ্জাবতী সূর্য। বাতাসের প্রচন্ড তাপে মুখ ঘোরালাম। ধুলোর ধোয়া আমার চোখ কান ঢেকে ফেলল - আমি

অনুমান করতে পারলাম না কত সময় চলল এই ধুলোর ঝড় --

''সব ভেঙ্গে গেল --''

নিমু চিৎকার করে বাকি দুজনকে জানাল। পুণি এসে দেখল তাদের নদী এখন নেই, তনু টের পেল ওদের গড়ে তোলা এক বিস্তৃত সভ্যতা বালির নিচে তলিয়ে গেল। আনন্দে ওরা নাচতে লাগল।

আমি বাদশাহের পিঠে উঠে মরুভূমি থেকে ফিরে আসার সময় চাঁদ ওঠে, দেখতে দেখতে চারপাশে ছেয়ে যায় মরুভূমির শীতল জ্যোৎস্না।

আমি একটা সাপ

কমলা বরগোঁহাঞি

আমি কি একটা সাপ ?- - অনেকদিন ধরে আমি নিজেকে প্রশ্নটা করছি যদিও সঠিক উত্তরটা খুঁজে পাই নি। অনেকেই বলেছে বটে আমি একটা সাপ। কিন্তু লোকে বলা সব কথাই তো আর সত্যি হয় না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষ আমাকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছে। কিন্তু আমি একাই তো আর সব নই। তাই আমি ঠিক করতে পারছি না আমি একটা বাঁদর, বেড়াল, কুকুর, গরু, গাধা, বাঘ না সাপ।

প্রশ্নটার সঠিক উত্তর খুঁজে না পেয়ে আমার মনটা যখন গুমরাতে থাকে তখন কাউকেআন্তরিকতার সঙ্গে গভীরভাবে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে প্রকৃতপক্ষে আমি কী। কিন্তু অনেকদিন ধরে নিবিড়ভাবে আমার কাছে কাউকে পাইনি। আমার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নেই। ঘরের কাউকে বা পরিচিত কাউকে কথাটা জিজ্ঞেস করার সুযোগই পাই না। কখনও বা জিজ্ঞেস করলেও উত্তর না দিয়ে চলে যায়। হায়, মানুষ আজকাল আমাকে এড়িয়ে চলে। তাই আমার মনে হচ্ছে দুই একজনের বক্তব্যানুসারে আমি হয়তো একটা সাপই।

আমার একজন দাদু আমার শৈশবকালে আমার সঙ্গে তামাশা করত, আমার খুব রাগ হয়েছিল। মাঝে মাঝে আমার মাথাটা ন্যাড়া করে দেবার কথা বলত। বাঁ হাতটিতে ডানহাতে ক্ষুর ধার করার এরকম একটা ভঙ্গি করত যে আমার খুব ভয় করত। নাহলে নতুন গামছা দিয়ে আমার হাত দুটি এভাবে বেঁধে ধরে রাখত যে আমার মনে হত জঙ্গলের মধ্যে কাঁদতে থাকা ছাড়া মুক্ত হয়ে আসার আমার আর কোন উপায় নেই। তাই চুলটাকে রক্ষা করার জন্যে বা জঙ্গলে না যাবার জন্যে প্রতিরক্ষার শেষ অস্ত্র হিসেবে আমি দাদুর হাতটিতে কামড়ে দিই। দাদুর হাতে বাঁধন শিথিল হয়ে যায়। আমাকে বলে---এটা মানুষখেকো বাঘ। আমার কিন্তু খারাপ লাগে না। আমি বাঘ হব। ঘরের বড় ছেলে যখন আমাকে

ছোটভাই-বোন ভয় করবে। মিথ্যে কথা বলা রাখাল ছেলেটির মত বজ্জাত ছেলে পেলে শাস্তি দেব। কিন্তু আমি কি বাঘ হতে পেরেছি? আমার কাছ থেকে মানুষেরা বোধহয় বিরক্তিবশতই দূরে সরে থাকে, ভয়ে নয়। তাছাড়া আমি কয়টা বজ্জাত লোককেই বা শাস্তি দিতে পেরেছি?

শৈশবে, লিচু, পেয়ারা, লেতেকুর খোঁজে গাছে উঠেছি। পিসিরা আমাকে বলত এটা পেটুক বাঁদর। ছোট বোনটিকে মুখের বিকৃত আওয়াজে ভয় দেখাই। লোকেরা আমাকে বাঁদর বলে- -আমার কিন্তু বাঁদর হতে ভাল লাগে না। বাঁদর আর শেয়ালের গল্পে বাঁদরের পরিণতি ভাল হয়নি। লোকে যেন আমাকে হনুমান বলে ডাকে তাই আমি চেয়েছিলাম। সেই নামের আশায় হনুমানের পর্বত আনার মত মাঠ থেকে ভেতরে বাঁশ ঢুকে থাকা একটা বিশাল মাটির চাঙড় বয়ে আনলাম। অন্য একদিন একটা বড় গাছের ডাল নিয়ে এলাম। তবে আমাব আশা কিন্তু পূরণ হল না। প্রথম দিন বুড়ী দিদিমা রাগ করে বললেন---'এত বড় চাঙড় এনে লাগাতে চাইছিস।' দ্বিতীয় দিন দুষ্টুমি করার জন্যে বাবা খুব বকাবকি করলেন। সে সময় মিটসেফ খুলে মাঝে মাঝে মিষ্টি চুরি করে খেতাম। পরে মা আমাকে ধরতে পেরে বিড়াল আখ্যা দেয়। আমার কিন্তু চোরনী বিড়াল হওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তবে আমি বাঁদর বা বিড়াল কোনটাই যে হইনি তাতে কোন ভুল নেই। বাঁদরের মত ধূর্ত হলে গ্রাম পঞ্চায়েতেব সভাপতি কণ খুড়োর মত কিছুটা ক্ষমতা লাভ করতে পাবাব সঙ্গে সঙ্গে লোকের সিমেন্ট এবং নামঘবেব টিনও চুরি করতে পারতাম। বিড়ালের মত চোর হতে পারলে রামচরণ কেঞ্জার মত চাল, চিনি ব্ল্যাক করে আর রাতের অন্ধকারে গাড়ি ভর্তি ধান-চাল পাচার করে ধনী-মানী মানুষ হয়ে উঠতে পারতাম। মোটা টাকার চাঁদা দিয়ে সভা-সমিতির প্রথম সারিতে নিজের আসনটা পাকা করে নিতে পারতাম।

আমি গরু নাকি? আমি গাধা নাকি? শৈশবে বাবা আমাকে অঙ্ক শেখানোর সময় অল্পেতেই ধৈর্যহারা হয়ে যেতেন। আমার কান মুচড়ে দিয়ে বলতেন---'এই অঙ্কটা পারছিস না। মগজে গোবর আছে। গরু-গাধাই হবি।' আর মাকে বলতেন---'ওকে ভাত দেবে না আজ।' সাধাবণত খুব কম কথা বলা বাবার এই দুটি কথাতেই আমার মনে অভিমানের মেঘ জমে উঠত। মায়ের হাজার অনুরোধও আমাকে ভাতের থালার পাশে নিতে পারে না। বাবা যখন আগের আদেশ প্রত্যাহার করে বলতেন 'পোনা, ভাত খাবি না কেন?' আমিও আমার অভিমান ভুলে যেতাম।

তবে আমি বোধহয় গাধা নই। গাধার স্বভাবচরিত্র আমি জানি না, ভার বয় বলে শুনেছি। আমি কিন্তু কোন কাজ করি না। গরুও নই তবে। আমার ঘরের গরুগুলির একটা দৈনন্দিন নির্দিষ্ট কার্যসূচী রয়েছে, আমার তো কোন কার্যসূচী নেই। শৈশবে পড়েছিলাম গরু একপ্রকার উপকারী জন্তু আর আমি ঘরের কোন্ কাজে এসেছি?

কথাগুলি ভাবতে থাকলে বর্ষাকালের দিখৌ নদীর মত বেড়ে যেতে থাকে। কোন মাথামুণ্ডু খুঁজে পাই না। শৈশবের কথাগুলির মত স্কুলজীবনের কথাবার্তাও আমার মনে আসে। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষাগুলোতে সবসময়েই কিছু একটা স্থান দখল করি। ঘরের প্রত্যেকেই ভালোবাসে। কেউ গরু, বিড়াল, গাধা বলে না। আমার ভাল লাগে। হাইস্কুলের শেষ পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগ পেলাম। ঘরের সবাই খুশি হল। ঘরের সবাইকে আনন্দিত করতে পেরে আমারও খুব ভাল লাগল। কলেজের বিজ্ঞান শাখায় নাম লিখিয়ে এলাম। দ্বিতীয় বিভাগ পেলাম, মা বাবা মনে মনে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেন। উচ্চ পদে চাকুরীরত মামা বললেন ---'পোনা এখন তাহলে কি করবি বলে ভেবেছিস? মেডিকেলই পড়।'

'সিট পাব না। দরখাস্ত করে লাভ নেই।' আমার নিরুদ্বেগ উত্তর।

'আমি শিডিউল কাস্টের একটা সার্টিফিকেট যোগাড় করে দেব। তাহলে তো পেয়ে যাবি।'

'মেডিকেল পড়তে পারব না বলব না, কিন্তু আমার চেয়ে যোগ্যতর একজনকে আমি বঞ্চিত করতে পাবব না।' মামা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। আমাকে বলেছিলেন, হয়ত অভিশাপই দিয়েছিলেন- সংসারের ভাবসাব বুঝিস নি। দু'দিনেই শিখে যাবি।'

মেডিকেল পড়ার কোনরকম চেষ্টা করলাম না। ঘরের লোকগুলিও ক্ষুণ্ণ হল। আমি কিন্তু নিজে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন একটা সিংহ। সিংহ মৃতদেহ খায় না। নিজে শিকার করে খায়। আমি ভেবেছিলাম আমি কারো অনুগ্রহ গ্রহণ করব না। পেরেছি কি? ঘরের হাজারো পরামর্শ উপেক্ষা করে আমি এগ্রিকালচার বা ভেটেনারি না পড়ে যখন ডিগ্রি কোর্সে নাম লেখালাম, ঘরের প্রত্যেকেই আমার উপর ক্ষেপে গেল। মা দুঃখ করে বললেন—'বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও আর কথা শুনছে না। ভবিষ্যতে যে কী পরিণতি হবে তা আমি আর ভাবতে পারছি না।'

হায়, এখন আমি কি হয়েছি আমি নিজেই জানি না। মা বেঁচে থাকলে হয়তো জানতে পারতাম। কিন্তু আমার কলেজে পড়ার সময়েই উচ্চ রক্তচাপে ভুগে মায়ের মৃত্যু হয়। যথাসময়ে কেমিস্ট্রিতে অনার্স সহ গ্র্যাজুয়েট হলাম। ঘরের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল না হলেও বাবা এম.এস.সি পড়তে বলেছিলেন। দরখাস্তও করেছিলাম কিন্তু সিট পেলাম না। জীবনে প্রথমবারের জন্যে আমি হোঁচট খেলাম। আরম্ভ হল চাকরি খোঁজাব পালা। ইন্টারভিউর নামে বাবার টাকা খরচ করে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে দেখে অনেক দরখাস্ত করলাম। কিন্তু কোনো ফল হল না। মামার কথা মনে পড়ে গেল। বোন বলল, মামার কাছে যেতে। কিন্তু আমি রাজী হলাম না। ট্রেজারি চালানের টাকা দুটির জন্যে, দরখাস্ত পাঠানোর ডাক খরচের জন্যে বাবার কাছে না চাইলেই নয়। আমি খুব নিদারুণভাবে অনুভব করলাম আমার পক্ষে সিংহ হওয়া সম্ভব নয়।

আমার শখ ছিল গীটার বাজানোর। ফাংশনগুলিতে একসঙ্গে গিয়ে, একসঙ্গে ঘুরে এসে প্রতিবেশী বাসবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। আমার থেকে দুই ক্লাস নিচে পড়ত বাসবী। ও গান করত। একজন যুবতী মেয়েকে ফাংশনে নিয়ে যাওয়া-আসার মধ্যে আমি গৌরব অনুভব করতাম। রিক্সায় বসা অবস্থায় তার দেহের পরশ, অন্ধকার রাতে তার হাতটা আমার হাতে নিয়ে উত্তাপ অনুভব করতে আমার খুব ভাল লাগত। আর আমি একদিন আবিষ্কার করলাম যে আমি বাসবীকে ভালোবাসতে শুরু করেছি। তার আচরণ, কথাবার্তা, গান সবকিছুই আমার চোখে সুন্দর হয়ে দেখা দিচ্ছে। চাকরি খুঁজে বেড়ানোর তিক্ততা ফাংশন ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ কমিয়ে দিল। একদিন বাসবীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা কমে গেল।

বাসবী আগের মতই ফাংশন ইত্যাদিতে গায়। বারীন নামে একটা ছেলের সঙ্গে খুব সিনেমা দেখে, হোটেলে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে। বাসবীর দাদা আমার সমবয়সী বিকাশকে বললাম— 'বাসবীর বারীনের সঙ্গে ঘোরাফেরাটা কিছুটা বেশী হয়ে যাচ্ছে না কি? হাজার হোক বাসবী আমার নিজের বোনের মত। আমি নিজেই বলতে পারতাম, কিন্তু একটু সঙ্কোচ হয়।'

দু'দিন পরে বাসবী আমাদের ঘরে এল। আমার ঘরে ঢুকে বলল—'পোনাদা, একসময়ে তোমাকে ভালোবাসতাম, বিশ্বাস করেছিলাম, আজও করি। আমার ভালোবাসার প্রতিদান তুমি এভাবে দেবে বুঝতে পারিনি। তুমি একটা সাপ।' ছলছল চোখে সে বেরিয়ে গিয়েছিল। ঘরের মধ্যে আমি অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম। সে সময় আমি নিজেই মনে মনে উচ্চারণ করেছিলাম— 'আমি একটা সাপ।'

আমার ছোট দাদুর নামে একটি মদের দোকান রয়েছে। দাদু নামে মাত্র মহলদার। লাইসেন্সটা একজন বিহারী মানুষকে দিয়ে দিলেন। তার বিনিময়ে দাদু মাসে তিনশ' টাকা করে পান। বিহারী স্থানীয় আবগারী বিভাগকে টাকা দিয়ে বশ করে রেখেছে। অনেকদিন থেকেই মদের সঙ্গে জল মিশিয়ে প্রচুর টাকা রোজগার করছে। ছোটবেলার বিহু-সংক্রান্তিতে আমাদের জামাকাপড়ও দিত। ইন্টারভিউ দিতে দিতে বিরক্ত হয়ে একদিন ভাবলাম—আমি তো এই মদের ব্যবসাটাই চালাতে পারি। রামজী অসৎ উপায়ে অনেক টাকা রোজগার করছে, তাকেও সাবধান করে দেওয়া হবে। ওকে গিয়ে বললাম,--'রামজী, এত জল দিবি না আর।'

'তাহলে কারবার চলবে কী করে?' তার বিনয়ী উত্তর।

'আবগারিকে টাকা দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। আগামী বছর নাহলে আমি নিজে মহল চালাব। সরকার থেকে শিক্ষিত যুবকদের মহল দিচ্ছেই।' সে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল—'সরকারের সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত রয়েছে পোনাবাবু। দোকান একজন লোককেই দেবে।' আমার রক্ত উছলে উঠল। তাকে রাগের সঙ্গে বললাম, 'আচ্ছা, দেখব তোকে কে রক্ষা করে। তোকে না ধরলে আমি এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টকেও সহজে ছেড়ে দেব না। তোর মাথা আমি একদিন গুঁড়ো করে ছেড়ে দেব।'

সেদিন সন্ধেবেলা দাদু আমাকে বললেন—'পোনা, তোর সম্পর্কে অনেক অভিযোগ এসেছে। ঘরের উপার্জনের একটা ভাল পথ তুই বন্ধ করে দিতে চলেছিস। দাদা তোকে লালন পালন করে একটা সাপ পুষেছে।' অনেকক্ষণ নীরবে তেকে আমি উচ্চারণ করেছিলাম, 'আমি একটা সাপ।' বাসবী বলেছে আমি একটা সাপ, দাদু বলেছে আমি একটা সাপ। সে রাতে আমার ঘুম এল না। কয়েকদিন গভীরভাবে চিন্তা করার পর আমি ভাবলাম—সবাই যখন আমাকে সাপ বলে ভাবছে, তাহলে আমার সাপ হওয়াই ভাল। পরের দিন বাজার থেকে একটা বাঁশি কিনে আমি ভাইকে বললাম—'এটা তুই বাজা তো।'

'কীভাবে বাজাব?'

'ওই সাপুড়েরা যেভাবে বাজায়। তুই বাজাতে থাক, আমি নাচব।'

'ধ্যাৎ, কি যে ফাজলামি করিস।' বাঁশীটা আমার হাতে দিয়ে ভাই চলে গেল। রাগের চোটে আমি বাঁশীটা কর্কশভাবে বাজাতে শুরু করলাম। আমার গীটারের সুর শুনে মোহিত হওয়া বাড়ির লোকেরা বাঁশীর সুরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার বেশ মজা লাগল।

আর একদিন আমার পুরনো একজোড়া প্যান্ট শার্ট রশির মতো লম্বা করে বারান্দায় সাজিয়ে রাখলাম। আমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে বোনটি পাশে এসে দাঁড়াল। আমাকে জিজ্ঞেস করল—'পোনাদা, তুই কী করছিস?'

'খোলস ছাড়ছি।'

হাসতে হাসতে কাপড়গুলি তুলতে যেতেই আমি বোনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললাম—'এই ছুঁস না, ছুঁস না। সাপের খোলস ছুঁস না।' নিমেষের মধ্যে বোনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তার চোখে ফুটে উঠল এক ধরণের বেদনা-বিধুর দৃষ্টি, সে দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে আমি মাথা নীচু করে নিলাম।

অন্য একদিন বোনের সঙ্গের মেয়েটি এসেছিল আমাদের ঘরে রাতে থাকার জন্য। বোন রান্নাঘরে কাকিমাকে রান্নার কাজে সাহায্য করছিল। মেয়েটি রেডিও থাকা টেবিলটাতে বসে কী যেন

পড়ছিল। আমার মনে একটা ভাবনা দেখা দিল। ঘরের লোকগুলিকে আমি কে জিজ্ঞেস করলে উত্তর না দিয়ে দূরে চলে যায়। এই মেয়েটি বাসবীর সমবয়েসী হবে। মেয়েটি নিশ্চয় বলতে পারবে বাসবী কেন আমাকে সাপ বলেছে। মেয়েটির কাছে গেলাম। তার পাশেই একটা চেয়ারে বসলাম, মেয়েটি চমকে উঠল। সে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম—'বস বস।' পুনরায় মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম— 'তুমি আমাদের মীনার সঙ্গে পড়?'

সে মাথা নাড়ল। আমি বললাম, 'আমি ওর দাদা।' মেয়েটি নমস্কার জানাল। আমার ভাল লাগল। ওকে বললাম—'চল আমার রুমে যাই।' ও একটু ইতস্তত করতে লাগল। আমি বললাম, 'কোন ভয় নেই, চল। এই পাশের ঘরে বসেই কথা বলব।' মন্ত্রমুগ্ধের মত মেয়েটি আমার পেছন পেছন আমার ঘরে এল। ওকে আমার বিছানায় বসতে বললাম। মেয়েটি জড়োসড়ো হয়ে আমার বিছানায় বসল। আমি তাকে বললাম—'তুমি বলো তো, লোকে আমাকে কেন সাপ বলে?' মেয়েটি অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া উদ্দেশ্যে মেয়েটি দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ওকে আড়াল করে দাঁড়ালাম। মেয়েটি বেরিয়ে যাবার জন্যে ক্ষীণ চেষ্টা চালাল। আমি বললাম, 'আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তুমি যেতে পারবে না।' মেয়েটির মুখে আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল। সে খুব জোরে চিৎকার করে উঠল—'মী-না!'

চিৎকার শুনে বোন, ভাই, কাকীমা সবাই দৌড়ে এল। বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়তে থাকা বাবাও দৌড়ে এলেন। সবার চোখ মেয়েটির উপর। নিষ্প্রাণ এক মূর্তির মত আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রত্যেকের 'কী হল-কী হল' প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি কোনরকমে থতমত খেয়ে বলল —'দাদা-দাদা আমাকে....' সবাই আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। আমি বললাম, 'আমি ওকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম আমি কে।' কিন্তু কেউ আমার কথায় কান দিল না। মেয়েটির হাত ধরে বোন, কাকীমা বেরিয়ে গেলেন। আমার ঘর থেকে আমি শুনতে পেলাম বোন আর মেয়েটি নীরবে কেঁদে চলেছে। ভাইয়ের মুখে অসহায়তার ছাপ। বাবা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর উচ্চস্বরে বলে উঠলেন—'এই জন্যেই তোকে এত বড় করেছিলাম? ভেবেছিলাম মানুষ হবি, শেষ পর্যন্ত এই হলি গিয়ে! দুধ খাইয়ে সাপ পুষেছি।' বাবার পরের কথাগুলি আমি শুনতে পেলাম না। আমার কানের কাছে কেবলমাত্র একটাই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—'দুধ খাইয়ে সাপ পুষেছি।' দরজাটা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বাবা তাহলে আমাকে সাপ বলেই ভেবেছে। রাতে আমার ঘুম এল না। ভাত খাওয়ার কথা ভাবার মত অবকাশ পেলাম না। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল, বোধহয় ভাই। আমি দরজা খুলে দিলাম না।

পুরনো একটা ঘটনা আমার মনে এল। এল.পি স্কুলের শেষ শ্রেণীতে পড়ার সময় একটা ছেলে আমাকে ক্ষ্যাপাত। আমি কোন এক বিশেষ ঘরের ছেলে বলে। ধরতে যেতেই সে পালিয়ে গেল। পরের দিন ক্লাসে একটা জোর চড় কষিয়ে ছেলেটিকে বলেছিলাম— 'কাল কি বলে ক্ষেপাচ্ছিলি মনে পড়ে?' কাঁদতে কাঁদতে ছেলেটি চলে গিয়েছিল। সে সময় আমি ভেবেছিলাম আমি একটা হাতির মত। কারণ সে সময় এক দর্জির ওপর হাতির প্রতিশোধ নেওয়ার গল্প আমি পড়ছিলাম। এখন আমার মনে হচ্ছে আমি হাতি নয়, তখনও একটা সাপই ছিলাম। হাতির শক্তি আছে, হাতি মানুষের উপকারী। আমি ঘরের কী উপকারে আসছি? সাপ কখনও আঘাতের কথা ভুলে যায় না। হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকে আমি একটা সাপই ছিলাম। তাই মা বলেছিল--'বড় হয়ে ও যে কী হবে বলতে পারছি না।' বাসবী বলেছিল, 'তুমি সাপ।' আজ বাবা বলছেন 'তুই একটা সাপ।' কাল বোন বা

ভাই বলবে, 'তুই একটা সাপ।' আমার বুকের মধ্যে অনুভব করতে লাগলাম এক অসহনীয় বিক্ততা। আমি একটা সাপ। এই ঘর আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। বিনিময়ে আমি দিয়েছি বিষ। আমার চোখ দিয়ে অঝোর ধারে গড়িয়ে পড়ল জল।

আমার কার্যসূচী আমি ভেবে নিলাম। পায়খানার সামনে একটা ফিনাইলের বোতল আছে, আমি সেদিকটাতে যাব না। বিছানার নিচে আমি ঢুকে গেলাম। আমার মনে হল এখানে যেন নিবাপদ। আমি একটা গর্তে ঢুকেছি। আমাকে আর কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না।

পরের দিন সকালবেলা জানালা দিয়ে আমাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে আমার দরজা ভেঙে বাবা, কাকা, আমার ভাই ঘরে ঢুকল। ভাই বিছানার কাছে চলে এল। আমি জোরে বললাম, 'ফোঁস ফোঁস!'

বৃষ্টি

কাব্যশ্রী মহন্ত

কখনও কোনরকম আভাস না দিয়েই ঝেঁপে বৃষ্টি আসে। গাছের ধূলোয় ধূসরিত পাতাগুলি ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়। রাস্তার ধূলিতে জল মিশে একটা ভিজে গন্ধ বেরোয়। ধূলো-জলের মিশ্রিত গন্ধ বুকে জড়িয়ে নিয়ে বৃষ্টির পরে আসা বাতাস ভাবুক কারো মনে বহন করে নিয়ে আসে অতীতের কোন রিক্ত মুহূর্তের করুণ ব্যথাভরা স্মৃতি। এক একটি অভীপ্সার পূর্ণতার পর সবসময়ই সেটাকে অকাম্য বলে মনে হয়। রিক্ত হৃদয় পুনরায় হাহাকার করে ওঠে অন্য এক অভীপ্সাকে আশ্রয় করে।

তিনটে পনেরো থেকে একটা অনার্সের ক্লাস ছিল। থার্ড ইয়ারের ছেলে-মেয়ে মোট সাতজন। অনার্স-ক্লাসের জন্য তিনটে অফ পিরিয়ড এমনিতেই কাটিয়ে অপেক্ষা করছিল বীথিকা। আবহাওয়া অদ্ভুতভাবে গুমোট হয়ে পড়ার জন্য বাসটা ঘুরে যাবে বলে মেয়েগুলি ভয় পাচ্ছিল। হাঁটতে হবে। তাই সবাই মিলে আলোচনা করে আজকের ক্লাসটা আগামীকাল সাড়ে আটটার সময় নেবার সিদ্ধান্তটা বীথিকাকে জানাল। বীথিকার বলার কিছু ছিল না। 'আচ্ছা, তাহলে যাই' বলে ব্যাগটা হাতে নিয়ে সেও এক পা দু-পা করে বেরিয়ে এল। আকাশের পশ্চিমদিকে গভীরভাবে মেঘ জমাট বেঁধেছে। ঘরফেরা পাখিগুলি ভয় পেয়ে আর্তস্বরে চিৎকার করছে। বীথিকা আসার সময় কারো জন্য অপেক্ষা করল না। নির্জন রাস্তাটিতে তার খুব একা মনে হতে লাগল। কিরকম একটা বিষাদময় ভাব মনটাকে পূর্ণ করে তুলল। এভাবে কতদিন সে কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে। শৈশবে স্কুল থেকে ঘরে, ঘর থেকে স্কুলে, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, চাকরি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সবসময় একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে হাঁটতে থাকা বীথিকার এমন মনে হল যেন সে এমনিতেই হেঁটে চলেছে। কোন উদ্দেশ্য নেই। তাঁর বামদিকটায় উন্মুক্ত মাঠ, ডানদিকে নতুন করে কেনা জমিতে বিভিন্ন জনের ঘরবাড়ি। বিভিন্ন আকৃতির ঘরগুলির কিছু আধা-তৈরী অবস্থায়

রয়েছে। কিছুটা গিয়ে ডানদিকের একটা বাইলেনে সে যখন ঢুকল, আকাশ সম্পূর্ণ কালো হয়ে উঠেছে। সে হাঁটার গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। বৃষ্টির আগে ঘরে পৌঁছে যেতে পারলে হয়। ইশ্, মেয়েগুলিই বা স্টপেজ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে কি না কে জানে। হঠাৎ বীথিকার মনে পড়ল, মৌসুমীও এখন ঘরে থাকবে না বোধহয়। তার সঙ্গে একসাথে পড়া অনিমেষের সঙ্গের আরাধনার মেয়ে পপিবুলের আজ বার্থ-ডে। অনিমেষের অফিসের সামনেই ঘর। লাঞ্চব্রেকে এসে তাকে নিয়ে যাবার কথা। কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার বীথিকার মনটা হাহাকার করে উঠল। মৌসুমী পাশে না থাকলে তার মনের উদাস ভাবটা আরো বেশি হয়। ঘরের সামনে এসে দেখে দরজায় তালা মারা। দিদি বারান্দায় উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে গেট দিয়ে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই দিদি খোলা গেট দিয়ে বেরিয়ে কিছুটা দূরে তার ঘরের দিকে দৌড়ে গেল। দ্রুত বেরিয়ে যাবার সময় সে বলে যাওয়া কথার সারমর্মটুকু হল যে অল্প একটু আগেই স্যার আর মইনা বেরিয়ে গেছে। আবহাওয়া খারাপ বলে সে নিষেধ করেছিল কিন্তু মইনা কোথায় শুনবে, তার পক্ষে এখন এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ঘরে হলুদ আর ডালের বড়ি, মুড়ির জন্য সব বোদে মেলে দেওয়া আছে। একমুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে বীথিকা তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। কাপড় ছাড়তে না ছাড়তেই হুড়মুড় করে বৃষ্টি নেমে এল। আকাশটা যেন বীথিকা ঘরে এসে ঢোকার অপেক্ষা করছিল। বেডরুমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল বীথিকা। আকাশটা দেখে বোঝা যাচ্ছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি হবে। কিন্তু পশ্চিমাকাশের ঘোর কালো মেঘের টুকরোগুলির মধ্য দিয়ে সিঁদুরবর্ণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সূর্যটা যেন পুনরায় উঠবে। তার মানে বিপরীত দিকে নিশ্চয় রামধনু বেরিয়েছে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকল বীথিকা। এরকমই ছিল নাকি পৃথিবীর আদিমতম প্রেমের ক্ষণটি। মেঘ, রোদ, আর বৃষ্টি নিয়ে খেলা করা একটা আকাশ। নিচে বৃষ্টিতে ধুয়ে নেওয়া গাছ-গাছালির ছন্দোময়, বর্ণময় এক পৃথিবী। বীথিকা জানালার গ্রিলে মুখটা চেপে ধরল। সেখান থেকেই সে বুঝতে পারল ঘরের বারান্দায় কেউ নড়াচড়া করছে। কারেন্ট নেই নিশ্চয়। সেজন্যই কলিংবেলের শব্দ শুনতে পায় নি। হাউসকোটের ফিতেটা বেঁধে বেঁধে বীথিকা সামনের দিকে বেরোল। দরজার বাইরে অপরিচিত একজন ভদ্রলোক । হেঁটে আসার সময় বৃষ্টিতে ভিজে ঢুকেছেন। মাথার চুল আর পায়ের অর্ধেক ভিজে। পকেট থেকে রুমাল বের করে গায়ের জল মোছার বৃথা চেষ্টা করছেন। জুতোজোড়ার নিচে লেগে থাকা কাদামিশ্রিত ঘাস ছাড়ানোর জন্য জুতোজোড়া ভালভাবে ঝেড়ে নিচ্ছেন। দরজা খোলা বীথিকাকে দেখে লোকটি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন বলে মনে হল।

'কিছু মনে করবেন না, আপনার বারান্দাটা আমি নোংরা করে ফেললাম।'

'ইশ, এটা কী কথা। ঘরের ভেতর আসুন, নইলে বৃষ্টির ছাঁটে আরো ভিজে যাবেন।' কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে বীথিকা বলল। মাথাটা নিচু করে বীথিকাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অপরিচিত ভদ্রলোকটি বীথিকার পেছন পেছন ড্রয়িংরুমের ভেতর চলে এলেন।

হাতের কালো চামড়ার ব্যাগটা টেবিলের উপর রাখলেন।

'ইশ্, বসলে আপনার সোফাটাও নষ্ট হবে। আমি এখানেই বসছি। দরজার সামনে রাখা একটা চেয়ারে তিনি বসলেন। নিজের অপ্রস্তুত অবস্থাটা ভদ্রতার সঙ্গে ঢাকার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করলেন। বেচারা বোধহয় আগে পরে কখনও এরকম পরিস্থিতিতে পড়েন নি। কোন কারণে বোধহয় আজ তাকে হেঁটে আসতে হয়েছিল।

'দাঁড়ান, আপনাকে একটি তোয়ালে দিচ্ছি।' বীথিকা ভেতরে গেল।

'আপনার মেয়েটি ঘরে নেই নাকি?' বীথিকার হাত থেকে তোয়ালেটা নেবার সময় ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর দৃষ্টির সামনে ঝুলছে বীথিকা, অনিমেষ আর মৌসুমীর একটা বাঁধানো গ্রুপ ফটো।

'তার সঙ্গের একটি মেয়ের আজ বার্থ-ডে।' বৃষ্টির আগে আগে সে-ও বেরিয়ে গেছে।'

'একাই গেছে?' মৃদু উৎকণ্ঠার সঙ্গে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

'না-না, একা একা কোথাও যাবার মত বয়স এখনও তার হয়নি। বাবার সঙ্গে গাড়িতে গেছে। অফিসের কাজ শেষ করে আসার সময় নিয়ে আসবে।'

'ও।'

'আপনার জন্য এক কাপ চা করি, বসুন।'

'না-না, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।'

'কিছু অসুবিধে হবে না, মাত্র এক কাপ চা, আপনি বসুন।' দুধের সসপেনটা গ্যাস-স্টোভের উপর বসিয়ে বীথিকা কাপ-প্লেট সাজিয়ে নিল। লোকটি বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে হয়ে ঢুকেছে। বৃষ্টিটাও তাড়াতাড়ি ছাড়ার কোন লক্ষণ নেই। এক কাপ চা অফার করা ঠিক হবে। বাইরে বৃষ্টির সঙ্গে মেঘের গর্জনও শুরু হয়েছে। আজ সারাটা রাত বোধহয় এরকমই চলবে। একটু আগেই ভাবা কথাগুলি পুনরায় মনে পড়ল বীথিকার। রোদ, বাতাস, মেঘ, বৃষ্টি একসঙ্গে খেলা করা প্রহরগুলি পৃথিবীর আদিমতম প্রেমের প্রহর। সেই প্রেম ছিল কেবলই দৃষ্টিনন্দন আর চিত্তনন্দন। সেখানে যুক্তি আর বাস্তবের কোন স্থান ছিল না। চোখ দেখেছিল, মন মুগ্ধ হয়েছিল। হৃদয় ছটফট করেছিল আর শরীর অকৃপণভাবে দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল। প্রেমের অঙ্কুরণ ঘটেছিল পর্বতের পাদমূলে, নদীর নির্জন তীরে, ছায়াঘন অরণ্যের মধ্যে পর্ণকুটীরে, সরোবরে স্নানরতা অর্ধবসনা কোন রমণীকে দেখে বীর্যবান পুরুষের চিত্তচঞ্চল হয়ে উঠেছিল। পুরুষের দুই বাহুর শৌর্যকে প্রত্যক্ষ করে উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিল কামিনী নারী। সময় পরিবর্তিত হয়ে যেতে থাকল। পরিবর্তিত হতে লাগল যুক্তি, বিচার, প্রয়োজন আর সংস্কার। তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হল প্রেমের অভিধান। প্রেম এখন যুক্তিনির্ভর, বিচারনির্ভর। বিচারও হয়ে পড়ল বাস্তবসম্মত। জানালা দিয়ে দেখতে পাওয়া গাছ-গাছালি গুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বীথিকার মনে হল যেন সেই ধূসর অরণ্যানীর মধ্যে ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে কারো পথ চেয়ে বসে রয়েছে একটি যুবতী আর মেঘে ঢাকা আকাশের নীচে বৃষ্টিস্নাত পথ দিয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে তরুণ। কাঁধে যুপকাষ্ঠের.....। সসপেনের দুধটা উথলে উঠে পড়ে যেতে চাইছে।

'আপনাকে অসময়ে অসুবিধের মধ্যেই ফেললাম।' চায়ের কাপটা সামনে রাখার সময় ভদ্রলোক বললেন। উত্তরে স্মিতহাসিতে সমর্থন জানাল বীথিকা, আড়চোখে একবার লোকটির দিকে তাকিয়ে নিল। বয়স হয়তো বীথিকার সমান সমানই হবে। প্রথম দিকের অপ্রস্তুত ভাবটা এখন অনেকটা কমে এসেছে। এখনও পর্যন্ত লোকটি বীথিকার পরিচয় নেয়নি। বীথিকাও নেয় নি। নিজের জন্য এক কাপ চা নিয়ে বীথিকা সামনের একটা সোফায় বসল।

'এরকম জোর বৃষ্টি হলে আমার আবার খুব ভালো লাগে। আপনার?'

'আমার? আমি জোরে বৃষ্টি দিলে গান শুনতে ভালোবাসি।' ভদ্রলোক উত্তরে বললেন।

'তাই নাকি?'

পাশেব রুমটা মৌথুপির পড়ার ঘর। অতিথিদের শোবাব বিছানাটা সেখানেই আছে। অনিমেষের প্রিয় সি.ডি প্লেয়ারটাও সেখানেই রাখা আছে। চায়ের কাপ শেষ করে বীথিকা কাপটা টেবিলের ওপর রাখল আর একবার লোকটার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল। সেই মুহূর্তে লোকটিও বীথিকার দিকে তাকিয়েছিল। বীথিকা চোখ সরিয়ে নিল না। প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে জলবিন্দুগুলি ধোঁয়া হয়ে বাতাসে উড়ছে। জানালা দিয়ে বীথিকা দেখল, ড্রেনটার আবর্জনাগুলি প্রবল স্রোতে ভেসে গিয়ে এখন পরিষ্কার ফটফটে জল বইছে। রাস্তার কিনারাগুলিকে প্লাবিত করে দিচ্ছে। ক্যাসেটটা অন করে জানালার পাশ থেকে সরে এসে বিছানায় বসল বীথিকা। এভাবেই পৃথিবীতে বন্যা নামে, সশব্দে, উল্লসিতভাবে। আশার বন্যা নামে হৃদয়ের গভীরে। নিঃশব্দে, অগোচরে। প্রায় এক ঘন্টা পরে বৃষ্টিটা কমে এল। বাইরেটা কিছু আলোকিত। পাখির কলকাকলি শোনা গেল। ওদের বাসাগুলি বোধহয় বৃষ্টিতে ভেঙে গেছে। একটা দু'টো করে কুটো কুড়িয়ে নিয়ে তারা আবার বাসা সাজিয়ে নেবে। বিছানা থেকে নেমে স্যাণ্ডেল জোড়ায় পা ঢুকিয়ে এক-পা দু-পা করে বীথিকা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তার আগে আগে অপরিচিত মানুষটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বীথিকার শরীরটা খুব হালকা মনে হচ্ছিল। এক ঘন্টা আগে কলেজ থেকে ফেরার পথে মনটা কেমন লাগছিল মনে পড়ল বীথিকার। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও ক্লাসটা করে না আসতে পারার জন্য দিনটা বৃথাই গেল বলে মনে হচ্ছিল। হালকা একটা আড়মোড়া ভেঙে আয়নার সামনে গিয়ে বীথিকা চুলটা আঁচড়ে নিল। ড্রয়িংরুমে এসে দরজার সামনে রাখা ফোল্ডেড চেয়ারটা নিয়ে সামনের দিকের বারান্দায় বসল। রাস্তার অদূরে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অপরিচিত ব্যক্তিটির সুগঠিত অবয়ব। ইতিহাসের প্রাতঃকালের কোন শর্তহীন প্রেমের মূক কল্পনা আজ থেকে বীথিকাকে আর অস্থির করে তুলবে না।

রেডিও

জ্যোতিষ শিকদার

সারাটা দিন কোম্পানির কার্যালয়ে ব্যস্ত থেকে ঘরে ফিরে আসতে বিভা কাকতির সন্ধ্যে পার হয়ে যায়। বিভা অনুভব করে এক নাগাড়ে কয়েকঘন্টা ধরে টাইপ করার ফলে হাতের আঙ্গুলগুলি অবশ হয়ে পড়েছে। সে আগ্রহের সঙ্গে পথের দু'পাশের ঘরবাড়িগুলির দিকে তাকায়। কখনও কখনও অর্ধেক খোলা জানালা বা দরজার ফাঁক দিয়ে পুরুষ বা মহিলার কয়েকটা মুখ, অথবা ঘরের ভেতর চলতে থাকা টেলিভিশনগুলি দেখতে পেলে তার মনে পড়ে যায় অন্য এক চলমান পৃথিবীর কথা। আর সি সি বিল্ডিংয়ের মধ্যে পুরনো কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো, সামনে লন বা বাগানের সাহায্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টায় দাঁড়িয়ে থাকা টিনের ঘরগুলি তাকে বড় আকর্ষণ করে। প্রায় প্রতিটি ঘরের সামনেই টেলিভিশনের অ্যান্টেনা।

এই অ্যান্টেনাগুলি দিনরাত সব সময় অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। বিভার মনে কিছু টুকরো টুকরো ছবি ভেসে উঠে। সকালবেলা একঝাঁক ছেলেমেয়ে উচ্ছল আনন্দে উদ্বেল হয়ে হাতে যন্ত্রসঙ্গীতের বাক্স একটা নিয়ে সঙ্গীত বিদ্যালয় থেকে এই পথেই ঘরে ফিরে আসে। হাইস্কুলের সেই শিক্ষয়িত্রীটি (বিয়ের পর সে চুলটা ববকাট করেছে) তাকে দেখতে পেলেই মুচকি হাসে, হাতে সাদা কোটটা নিয়ে চশমা পড়া মেডিকেল কলেজের ছাত্রীটি মাথা নিচু করে দ্রুতগতিতে হাঁটে, একদল মেয়ে এবং যুবক বাসের জন্যে অপেক্ষা করে, ঠিক সে সময়েই সেখানটাতে উপস্থিত হওয়া বিভা পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যায় .....।

রাস্তার দু'পাশের ঘরগুলিতে টেলিভিশনের অ্যান্টেনাগুলি দেখতে দেখতে বিভার মনে হয় পৃথিবীর কেউ কি আর রেডিও শুনবে না? সন্ধ্যের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে প্রথমে কয়েকটি হুলুস্থুলে-চায়ের দোকান আর টেলিভিশনের শো রুম পার হয়ে এসে এই নির্জন রাস্তাটায়

হাঁটতে শুরু করতেই তার মন বিভিন্ন চিন্তায় অশান্ত হয়ে ওঠে। গ্রামে যাওয়ার পরে সে দেখতে পেয়েছিল, দুই মাইল দীর্ঘ রাস্তার দুই পাশে বিজলী সরবরাহের জন্যে খুঁটি এবং তার। অবশেষে তাদের গ্রামে বিজলীর আলো এলো। শৈশবকালে বিভা বাবার সঙ্গে রাতের বেলা থিয়েটার দেখে ফিরে আসার সময় হাতে টর্চ নিয়ে পথ হেঁটেছিল। বাবা এবং গ্রামের মানুষের সঙ্গে হৈ-হল্লার মধ্যেও সে অবাক বিস্ময়ে চারদিকের অন্ধকারের মধ্যে পড়ে থাকা এই রাস্তা এবং পাশের বাঁশ গাছগুলির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ...

সেদিন রাতে বিজলি বাতি আসার সঙ্গে সঙ্গে, চারদিকের বিস্তৃত মায়াজাল হারিয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে, সে যেন চিরবিদায় দেওয়া অতিথিকে দেখার মতো বিমুগ্ধ নয়নে জ্যোৎস্নাস্নাত রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। তার মনে অযৌক্তিক ভয় আর কিছু চিন্তার উদয় হচ্ছিল, প্রত্যেকের ঘরেই বিজলি বাতি আসবে কেবল তাদের ছাড়া — ।

বিভা এই অনুভূতিগুলির কথা অল্পেতেই বিস্মিত হওয়া কোম্পানির স্টেনোগ্রাফার হেমাকে বলতেই সে ঠাট্টা করে বলেছিল, — 'এসব অর্থহীন সেন্টিমেন্টাল কথা।' সময় দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। পাহাড়ের উপরে নিজের ভাড়াঘরে ঢোকার আগের মুহূর্তে নিচের দিকে তাকালেই সে সবসময় দেখতে পায়—চারপাশের ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত ঘরগুলিতে ঝকঝকে আলো। এর মধ্যেই হয়তো উল্লাসে নেচে উঠছে অতিমানবীয় প্রাণীর মত কিছু টেলিভিশন, আর তার সামনে মাঝে মাঝেই নেচে উঠছে কয়েকটি অভিভূত মানুষের শরীর।

কোম্পানির অফিস থেকে বেরোনোর পরে দিনের সমস্ত কথাই কলঙ্কিত এক অধ্যায়ের মতো সে ভুলে যেতে ভালবাসে। অফিসের সবাইকে প্রথম থেকেই বিষাক্ত প্রাণীকে এড়িয়ে চলার মতো করে বড় কায়দায় সঙ্গে এড়িয়ে চলেছে। বিভা শৈশব থেকেই পুরুষকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না। কোম্পানির অফিসের চারপাশেই বর্তমান ষ্টেনোগ্রাফার হেমা, ক্লার্ক শিপ্রাব কথা - এর মধ্যেই সে নীরবে টাইপ করে। সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিবে আসে। বিভার হাঁটা বেশ দ্রুত। একদিন রাতের বেলা কয়েকটি ছেলে বিরক্ত করার পর সে দিনের আলো থাকতে থাকতেই ফিরে আসে। ঘরের দায়িত্বশীল বড় মেয়ে হওয়ার জন্যেই সে সবসময় ভাই বোনের সঙ্গে কিছুটা কর্তৃত্বের সুরে কথা বলে। সেই বিভাকেই গুয়াহাটিতে আতঙ্কগ্রস্ত, অসহায়, যন্ত্রণাকাতর, নানা ধরণের হীনমন্যতায় ভোগা প্রাণীর মতো থাকতে হচ্ছে।

নিজের ঘরে ঢুকে বিভা ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে, হাত মুখ ধুয়ে, এক কাপ চা খায়। তারপর ষ্টোভে চালটা বসিয়ে কিছুসময় বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, চারপাশের নিস্তব্ধ পরিবেশটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করে, যেন কিছুক্ষণ আগের একটি চলমান পৃথিবী থেকে এই মাত্র একটা নিস্তরঙ্গ স্থবির পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে। চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবলই শোনা যায় এই ভাড়াঘরের মালিক ভব দাসের কাশির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে তার কানে ভেসে আসে দূর থেকে রেডিওর স্বর, বিজলি বাতি থাকা কয়েকঘর মানুষের ঘরে বেজে ওঠা টেলিভিশনের শব্দ, আর চিৎকার করে কথা-বলা মানুষের কণ্ঠস্বর।

ভব দাসের বয়স পঞ্চান্ন থেকে ষাট বছরের মধ্যে। চুল এখনও আধ পাকা। ঘর ভাড়া নেবার প্রথম দিনেই ভবদাস বিভাকে বলেছিল — এখানে রেডিও বাজানো নিষেধ। আগের কয়েকজন ভাড়াটিয়াকে আস্তে করে রেডিও বাজাতে বলা সত্ত্বেও ফুল ভলিউমে রেডিও বাজানোর জন্যে তাদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভব দাস একটা শেষ সত্যে উপনীত হওয়ার মতো করে

বলেছিলেন —জোয়ান ছেলের পক্ষে আস্তে রেডিও বাজানো সম্ভব নয়, তাদের হাত সুযোগ পেলে সাউন্ড বাড়াবেই। অনেকদিন অনেক রাত রেডিওর শব্দের জন্যে আমি ঘুমোতে পারি নি। আমি বাতের ব্যথা আর নানা ধরনের অসুখে ভোগা মানুষ। রেডিওর শব্দ আমি কোনমতেই সহ্য করতে পারি না। তাই আমি কোনভাবেই এই ভাড়াঘরে রেডিওর প্রবেশ ঘটতে দিতে পারি না।

ভব দাস আগে কাঠমিস্তিরির কাজ করত। তার জীবনের কৃতিত্বের একমাত্র চিহ্ন হিসেবে পাহাড়ের অল্প উপরে দখল করা এই মাটিটিতে (যেখানে কারো কারো ঘরে বিজলি বাতি জ্বলে, কারো ঘরে ল্যাম্প জ্বলে) চার কোঠার টিনের ঘরটি নীল রঙের দরজা জানালার সঙ্গে ঝকমক করতে থাকে। এই টিনের ঘরের মেঝেটা কিন্তু লাল মাটির।

বিভাকে ভাড়া দেবার জন্যে মাসে একবার ভবদাসের ঘরে প্রবেশ করতে হয়। কখনও কখনও সন্ধ্যের সময় মেঝের মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। ভবদাসকে ল্যাম্পের অনুজ্জ্বল আলোতে গ্রামের সেই ভূতে পাওয়া মানুষকে ভাল করা, নিজের ঘরে ভূত পালন করা যাদু মন্ত্র জানা ওঝার মতোই মনে হচ্ছিল। একবার এরকম এক ওঝা মন্ত্রপূত একটা তাবিজ একটা লোকের ঘরের সামনে পুঁতে রাখতে বলেছিল। রাতের নিস্তব্ধ এই পরিবেশে, সারা দিনের ক্লান্তির পরে বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে একটা রেডিওর প্রয়োজন বড় বেশি করে অনুভব করে। শিপ্রা একদিন একটা ছোট, ফরেন রেডিও অফিসে এনেছিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বিভা রেডিওটার ভেতর থেকে বেরোনো সুমধুর কণ্ঠস্বরে তন্ময় হয়ে ডুবে গিয়েছিল।

রাতের এরকম কয়েকটি নিঃসঙ্গ মুহূর্তে অফিসে দেখা ছোট একটা রেডিও বুকের কাছটাতে নিয়ে শুনতে বিভার খুব ইচ্ছে করে। ভব দাসের নিষিদ্ধ করা এই জিনিসটার প্রতি তার আকর্ষণ আর আকাঙ্খা দিনদিন বেড়েই চলে। বিভা অনুভব করে—লোভী মানুষের জীবনের বহু অপূরণীয় বাসনার মতোই রেডিওর কথাটাও কেবল চিন্তা করেই যেন তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অফিস তাকে যে টাকা দেয়, তা মাস শেষ হতে কয়েকদিন বাকি থাকতেই শেষ হয়ে যায়। কবে যে বেতন বাড়বে সে সম্পর্কেও তার কোন ধারণা নেই।

বিভার নতুন করে ভাড়া নেওয়া ভব দাসের এই ঘরটা কোম্পানির অফিস থেকে খুব একটা দূরে নয়। তবু সন্ধ্যেবেলা একা পায়ে হেঁটে আসতে হলে তার সমস্ত শরীর এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। নির্জন রাস্তাটায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে সেই পুরনো আতঙ্কের ভাবটা ফিরে আসে। বিভা প্রি-ইউ পরীক্ষা পাশ করে বাবার মৃত্যুর পর প্রাইভেট কোম্পানিটাতে টাইপিষ্টের চাকরি পাওয়ার পর গুয়াহাটিতে চলে এসেছিল। গুয়াহাটির কোথাও আত্মীয় স্বজন না থাকার জন্যে, মেস বা অন্য কোথাও থাকার কোন ব্যবস্থা করতে না পেরে, একটা ঘর ভাড়া করে একা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার সুবিধের জন্যে মা ছোট ভাইটাকেও সঙ্গে নিয়ে আসতে বলেছিল, কিন্তু সে রাজি হয় নি। বিভা প্রথমে মেসে পুরুষ মানুষে পরিপূর্ণ, লম্বা সারি সারি কোঠা ঘর একটা ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেছিল। পাশেই একটা বিহারী পরিবার থাকায় সে মনের মধ্যে কিছুটা সাহস পেয়েছিল। কিন্তু বাকি ঘরগুলির বাসিন্দাদের গভীর রাত পর্যন্ত হৈ-হল্লা, তাস খেলা, রেকর্ড প্লেয়ারের শব্দ তার মনে এক ধরনের ভীতির সঞ্চার করল। সে ভাড়াঘরের প্রত্যেককেই এড়িয়ে চলতে লাগল। লোকগুলি তার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে একটা বিশেষ কায়দায় তার ঘরের দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ করে যেতে লাগল। কখনও কখনও সে গভীর রাতে দরজায় টোকার আওয়াজ পেয়ে ধড়মড় করে জেগে ওঠার পর চারদিক থেকে মানুষের কলকোলাহল আর রেকর্ডপ্লেয়ারের শব্দই শুনতে পায়। একজন

তরুণীর পক্ষে এভাবে আলাদা করে ঘর ভাড়া করে থাকাটা বিভার নিজের কাছেই কেমন যেন বিসদৃশ বলে মনে হলো যেন সে সবার পরিত্যক্ত একটা কাপড় পরে রয়েছে। কেউ যে কাজটা করে না সে তাই করেছে।

এরকমই এক মানসিক অবস্থার মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। বিভা সন্ধ্যেবেলা নির্জন হয়ে যাওয়া রাস্তাটাতে কয়েক পা হাঁটতে শুরু করতেই অনুভব করল—পেছন পেছন কেউ তাকে অনুসরণ করছে। সে ঘুরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। এর মধ্যে মানুষটা এসে ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়েছে। আচম্বিতে তার হাতটা গলার সোনার হারটার কাছে চলে গেল। এই হারটা সে দিনরাত সবসময়েই পরে থাকে। বিভা মুহূর্তের মধ্যে জোরে একটা দৌড় মারার কথা ভাবল, কিন্তু পেটের অসহ্য ব্যথাটার কথা ভেবে চিন্তাটাকে মন থেকে বাদ দিল। ইতিমধ্যেই সে পরিশ্রান্তের মতো হাঁপাতে শুরু করেছে। অবশেষে শেষ অস্ত্র হিসেবে সে চিৎকার করার কথা ভাবল।

আধবয়সী লোকটি গম্ভীর অথচ আস্তে, কাঁপা গলায় তাকে জিজ্ঞেস করল, —'এত ভয় পাচ্ছ কেন ? তোমার ঘর কোথায় ?' বিভা আড়চোখে লোকটির দিকে তাকাল। স্ট্রিট লাইটের আলোতে দেখতে পেল লোকটির চেহারা সামরিক বাহিনীর লোকদের মতো শক্ত সমর্থ, মুখে দীর্ঘ গোঁফ, পায়ে বুট জুতো। বিভা মুখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকাতেই দেখতে পেল লোকটির শরীরটা টলমল করছে। তার বুঝতে বাকি রইল না—মদ্যপ লোকরা একটা কথাই বারবার বলে এবং কথার মাঝখানে হঠাৎ হিংস্র হয়ে ওঠার স্বভাবের কথা সে শুনেছে। বিভা চিৎকার করার মতো করে জিজ্ঞেস করল, —আপনাব কি চাই ? আমি আপনাকে চিনি না।

লোকটি নাটকীয় ভঙ্গি করে উত্তর দেবার আগেই বিভা দৌড়ানোর মতো করে হাঁটতে শুরু করল। চিৎকার করার কথা ভাবল, কিন্তু সামনের শূন্য রাস্তা—পাশের থমথমে বন্ধ ঘরগুলি দেখে কাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করবে তা বুঝতে না পেরে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। পেছন ফিরে দেখতে পেল — লোকটি এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন সেখান থেকেই সে একটা অস্ত্র তার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে মারবে।

সেদিন রাতে বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয়ে যাওয়া আরেকটি ঘটনার কথা বিভার মনে পড়ল। ম্যাট্রিক দেবার সময় একদিন রাতে মামার ছেলেটা তার হাত ধরে টানাটানি করায় সে গায়ের জোরে একটা ঠেলা মেরে চলে গিয়েছিল। লোকটি বিভ্রান্ত হয়ে, এক বিরাট অপরাধবোধের চাউনি নিয়ে একজায়গাতেই অনেক সময় দাঁড়িয়েছিল। অনেকদিন তাদের বাড়িতে আসে নি। এখন সে একটা স্কুলের শিক্ষক, বিবাহিত। আজকাল দেখা হলেই একটাও পুত্রসন্তান হয়নি বলে তার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে সে।

ঘটনাটার পরেই পাহাড়ের কিছু উপরে ভবদাসের খালি হয়ে থাকা এই ভাড়াঘরটির সন্ধান পায় বিভা। সঙ্গে সঙ্গে সে আগের হুলুস্থুল, আতঙ্কে ঘেরা জায়গাটা ছেড়ে এখানে চলে আসে। এই ঘরটা কোম্পানির অফিস থেকে বেশি দূরে নয়। তাছাড়া সে ভবদাসের মধ্যে একটা নিরাপত্তার সন্ধান পেয়েছে। ভবদাস প্রথমদিনেই তাকে সাবধান করে বলে দিয়েছে — রেডিও বাজানোটা সে পছন্দ করে না। বিভার পাশের রুমগুলিতে কলেজে পড়া কয়জন যুবক টিউশন, ক্লাস ইত্যাদি শেষ করে সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকে। সারাদিন ক্লান্তির পরে নিঃসঙ্গ এই মুহূর্তগুলি বিভার কাছে খুব যন্ত্রণাদায়ক হয়ে পড়ে। গ্রামের দারিদ্র্যক্লিষ্ট ঘরটির কথা ভেবে ভেবে সে কেঁপে ওঠে। বিজলী বাতি থেকে শুরু করে গ্রামে আসা বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে করে সে শঙ্কিত হয়।

ভবদাস ইচ্ছে হলেই বিভার ঘরে উঁকি মারে। সে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চারদিকে মিট মিট করে তাকায়। ভাড়াঘরে থাকা অন্যান্য লোকদের সঙ্গে ভবদাসের কদাচিৎ দুই একটা কথা হয়। প্রত্যেকেই নিজের মত চলাফেরা করে, যেন একজন আরেকজনকে চেনে না। কলেজে পড়া যুবকগুলি নিজেদের মধ্যেই কথা বলে, হাসে আর বন্ধ কোঠার ভেতরে ঝংকৃত হওয়া শব্দগুলি তার চাপাকণ্ঠে গুনগুনানি বলে মনে হয়। ভবদাস কখনও কখনও রাতের বেলা বিভার ঘরে ঢুকে কথা বলতে শুরু করে। সে মুহূর্তে তার মনে হয় পাশের ঘর থেকে যুবক ছেলেগুলি যেন হাসছে। ভব দাসের সঙ্গে কথা বলাটা তার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠল। এখনও শক্তসমর্থ থাকা ভবদাসের শরীরটা গেঞ্জির উপর দিয়ে দেখতে পেয়ে বিভার একদিন উপলব্ধি হলো একটা পুরুষমানুষের শরীর। একদিন একটি উলঙ্গ শিশুকে তুলে ধরার সময় তার মনে হয়েছিল—ক্ষুদ্র এই শরীরটা থেকেই একদিন পরিণতি লাভ করবে একজন পুরুষের শরীর। ভবদাসের স্ত্রীর অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে। একমাত্র ছেলেও বিয়ের পরে বাপকে ছেড়ে চলে গেছে। দূরে কোথাও ঘর ভাড়া করে থাকে। ভবদাস বিভার সামনে ছেলে আর পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে বিষোদগার করতে থাকে। সে প্রায়ই ঘোষণা করে—তার সমস্ত সম্পত্তি অনাথ আশ্রমকে লিখে দেবে। এই ঘরবাড়ি অনাথ আশ্রমের জন্যে উপযুক্ত হবে কিনা সে সম্পর্কে বিভার কোন ধারণা নেই। ভবদাসের একঘেয়ে, বিরক্তিকর এবং বিদ্বেষপূর্ণ কথাগুলি শুনতে শুনতে বিভার ক্রমশ মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হতে থাকে।

রাত বাড়ার সঙ্গে চারপাশের নির্জনতার মধ্যে বিভা একটা রেডিওর প্রয়োজন বড় বেশি করে অনুভব করতে শুরু করে। একটি ছোট, বুকের ভেতর নিতে পারা রেডিও। বিভা একদিন আবার ভবদাসকে রেডিওর কথা বলল। ভবদাস তার উপর ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। রেডিওর কথা জিজ্ঞেস করতেই এতদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তুষ্টি প্রকাশের রাস্তা পেয়ে গেলেন। বিভার রেডিওর প্রস্তাবটা তিনি নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখান করে দিলেন। ভবদাস আগের কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করলেন — পৃথিবীর কোন লোকের পক্ষেই আস্তে আস্তে রেডিও শোনা সম্ভব নয়। নিজের অজান্তেই রেডিওর নবে হাত চলে যায়, সে জোরে বেজে উঠবেই ....।

বিভা ঠিক এরকমেরই একটা জবাব প্রত্যাশা করছিল। তাই ভবদাসের কথায় খুব একটা অবাক হল না। সে হয়তো দিনের পর দিন এই ঘরের ভেতর আবদ্ধ থেকে জীবনের বহু অপূরণীয় বাসনার মতই এই নিষিদ্ধ করে দেওয়া বস্তুর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে করতেই সময় অতিবাহিত করে যাবে। এভাবেই পার হয়ে যাবে তার দিন, সময়, বছর.......। বিভার চোখে জল আসার উপক্রম হল।

ল্যাম্পের ক্ষীণ আলোতে বিভা আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখতে চেষ্টা করে। সে ক্রমশই কুৎসিত হয়ে পড়ছে। দ্রুতগতিতে তার বয়স বেড়ে চলেছে। অবশ্য সে আজও আজন্ম সংস্কারের মতো বড় হাতা পুরনো ফ্যাশনের ব্লাউজ পরে, দীর্ঘ চুলগুলিতে যত্ন করে চিরুনি দেয়, কাপড়ের দোকানে ব্রেসিয়ার কিনতে গেলে তার গলার স্বর কেঁপে যায়।

অবশেষে বিভা নিজের বিষয়ে কয়েকটা নিষ্ঠুর শব্দ উচ্চারণ করে। তার হয়তো এ জীবনে বুকের পাশে ছোট্ট সুরেলা কণ্ঠের স্বর বেরুনো একটা রেডিওপাবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

সঙ্গমে সাঁতার

জয়ন্ত কুমার চক্রবর্তী

ঠিক সে'সময়ই নদীর স্রোতে একদিন ভেসে এলো একজন যুবতী। নগ্ন, ক্ষত-বিক্ষত, মৃত। নদীর পারের লোকগুলি সম্পর্কে তোকে তো বলেছিই। অভিবাসী হিন্দু, মুসলমান এবং আর সব জনজাতীয়, বরো মানুষ। যুবতী মেয়েটির শরীর আর মুখের দিকে তাকিয়ে বলা সম্ভব নয় মেয়েটি হিন্দু না মুসলমান, জনজাতীয় না কি অজনজাতীয়। এখন সমস্যাটা হলো লোকগুলি মেয়েটিকে নিয়ে কি করে? কথাগুলি বলে রফিউল টেবিলের হাতঘড়িটার দিকে হাত বাড়াল। কাল সে আসার পর থেকে তার মুখে সংঘর্ষ জর্জর বরপেটার বিভিন্ন কাহিনী শুনেছি। গ্রামের পর গ্রাম জ্বলেছে, ঘর বাড়ি। ধন-সম্পত্তি ছেড়ে মানুষগুলি পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আশ্রয় শিবিরগুলি জালিয়ানওয়ালাবাগ হয়ে উঠছে, পুলিশ আর সি.আর.পি-র তাণ্ডব চলছে।

আটটা বেজে গেছে দেখছি। একবার আমি রবীনদের ডেকে দিই। কিন্তু যুবতী মেয়েটি? তার মৃতদেহ নিয়ে মানুষ কি করল? দাঁড়া, আমি এসে নি। গাড়ির আর বেশি সময় নেই। আর না হলে তুই-ই চিন্তা করতো মানুষগুলি মেয়েটিকে নিয়ে কি করতে পারে। তোর এই সাসপেন্স রেখে কথা বলার স্বভাবটা এখনও গেল না দেখছি। আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যেতে গিয়ে রফিউল দরজার সামনে থেকে বলে উঠল—এটাকে একটা রহস্য বলে ধরে নে।

রহস্য। রহস্য শব্দটি আমাকে নিয়ে গেল গ্রামের সেই স্কুলটিতে যেখানে একসময় রফিউল এবং আমি একসঙ্গে পড়াশোনা করতাম। আমাদের দুজনের শরীরে তখন রহস্যের ভূত চেপেছিল। অন্য সময়গুলিতে তো রহস্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতামই, কখনও, এমন কি ক্লাসরুমেও স্যারের অজান্তে

রহস্যের সমাধান করার খেলা খেলতাম। ক্লাস টেনে একদিন ইতিহাস স্যারের কাছে নামটা কি যেন শর্মা ছিল ভুলে গেছি, শর্মা স্যারের হাতে ধরা পড়ে গেলাম।

পলাশীর যুদ্ধ কার কার মধ্যে হয়েছিল, বল? আমাদের দুজনকে দাঁড় করিয়ে রেখে অর্কেস্ট্রা কণ্ডাক্টরের মতো বেতটা নাড়াতে নাড়াতে স্যার জিজ্ঞেস করলেন।

ক্লাসে অখণ্ড নীরবতা। সাৎ সাৎ বেতের ঘা, লাল টকটকে হয়ে ওঠা হাত আর ছেলেমেয়েদের খুকখুক করে হাসি সেদিন আমাকে বাধ্য করেছিল ক্লাসে আর কখনো রহস্য সমাধান খেলব না বলে প্রতিজ্ঞা করতে। প্রকৃতপক্ষে আমি সেই ঘটনা থেকেই রহস্যকে ভয় করতে শুরু করলাম। কিন্তু আমারই দুর্ভাগ্য, মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারা সবগুলি প্রশ্নই দেখি একসময় সমাধান করতে না পারা রহস্যে পরিণত হয়। শিক্ষকের চাকরি করি, বিলাসিতার প্রশ্নই ওঠে না, তবুও কুড়ি দিন পার হবার পরেই মাস যেন আর শেষ হয় না বলে মনে হয়, 'শিক্ষক দেশের মেরুদণ্ড, শিক্ষকই দেশ তথা জাতি গড়ে' বলে চারদিকে শিক্ষকের চাকরির জয়জয়কার শুনতে থাকার সময়ও শিক্ষকের চাকরি নিয়ে কেনাবেচা চলে ইত্যাদি আমার কাছে যেমন রহস্যময় তেমনই পশুপালন বিভাগের অফিসারের পশুর জন্য বরাদ্দ খাদ্য থেকেও চুরি করা, বন বিভাগের অফিসারের বনজঙ্গল কেটে নষ্ট করা, স্বেচ্ছাচারী ভ্রষ্টাচারী বলে পরিচিত সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসারের পুরস্কারের পর পুরস্কার পাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারগুলিও আমার কাছে এক একটা সমাধানহীন রহস্য হয়েই রয়েছে। এখন রফিউল আবার অন্য এক রহস্য ....

স্রোতে ভেসে আসা একজন তরুণী, জনজাতীয় না অজনজাতীয়, হিন্দু না মুসলমান ধরা যায় না। চোখমুখ দেখে জনজাতীয় কিনা বোঝা যায় না?

চোখের সামনে দিয়ে এক একজন করে কয়েকজন জনজাতীয় তরুণ তরুণীর মুখ পার হয়ে গেল। সকলকেই তো চিনতে পারছি। কেন দেবেন? না, দেবেনকে বোঝা যায় না। মাইনাকেও? নামটা না জানলে তাকেও বরো যুবতী বলে বোঝা যায় না। দেবেনের মা-বাবার বিষয়ে জানি না, কিন্তু মাইনাকের মা বরো, বাবা অ-বরো। রাজনীতি যেভাবে মোড় নিচ্ছে ভবিষ্যতে আমরা আর এ ধরণের বরো অ-বরোর মধ্যে মিলন দেখতে পাব কি? আরও একটা প্রশ্ন, আরও এক রহস্য।

না, এ সমস্ত বাদ দিয়ে মৃত যুবতীটিকে নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিটা একবার কল্পনা করে দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে। অপরিচিত মৃত মেয়েটিকে দেখার জন্য চারদিক থেকে লোকজন এসে নদীর এপারে জমা হয়েছে। বরোদের বসতি নদীর এপারে যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোকের জমি জমা ওপারেও না থাকা নয়। ওপারের মুসলমানদের আবার অর্ধেকেরও বেশী এপারের বরো মানুষের ঘরে জমি-জমায় কাজকর্ম করে দিন গুজরান করে। এখনও পর্যন্ত এখানে যদিও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি তবুও আশেপাশে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের খবরাখবর লোকগুলির মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করছে।

কোথাকার মেয়ে? কিভাবে মরল? কে-ই বা পারে ওঠাল?—কৌতূহলী মানুষগুলির মুখে মুখে এসব প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথম প্রশ্ন দুটির উত্তর কারো জানা না থাকলেও মেয়েটিকে পারে কে তুলেছে তা কিন্তু মানুষগুলি ইতিমধ্যে জেনে গেছে। লোকগুলির একই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বলরাম অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে।

অন্যান্য দিনের মতো আজও লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে গোরু দুটোকে তাড়াতে তাড়াতে কাকভোরে বলরাম মাঠে গিয়েছিল। শ্রাবণ শেষ হয়ে এখন ভাদ্র পড়েছে। বর্ষার নামগন্ধই নেই। চারাগুলিও

হলদেটে হয়ে পড়েছে। এবার দেখছি অনাহারেই মরতে হবে। বিষণ্ণ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলরাম ভাবল । পৃথিবীতে রক্তের নদী দেখতে দেখতে আকাশের বুকটাও বোধহয় শুকিয়ে কয়লা হয়ে গেছে।

নদীর পারে পৌঁছে অন্যান্য দিনের মত আজও গোরু দুটি জল খাবার জন্য নদীর ঢালু গা দিয়ে গেল। বলরাম পাশের বিস্তীর্ণ মাঠটার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছু দূরে কলিমুদ্দিন মহাজনের পাট বাছার কাজে ব্যস্ত। বৃষ্টি হলে এসময়ে সমস্ত মাঠটাই সবুজে সবুজে হয়ে থাকত। এই গণ্ডগোলটা না লাগলে জনগণের শুরু করা বাঁধের কাজটাও এতদিনে শেষ হয়ে যেত। বলরাম নদীর অর্ধ-সমাপ্ত বাঁধটার দিকে তাকিয়ে রইল। সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখ কপালে উঠল। একটি মেয়ে। বাঁধের উপর যেন উঠতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। একবার জলে ডুবে যাচ্ছে, আর একবার মাথা তুলছে। বলরামের কান-মাথা গরম হয়ে উঠল। লাঙ্গল ফেলে সে কলিমুদ্দিনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে করতে সে বাঁধের উদ্দেশ্যে দৌড় লাগাল। কোমর পর্যন্ত জল সে সাঁতরে পার হয়ে মেয়েটির কাছে পৌঁছাল। কলিমুদ্দিনের সঙ্গে ধরাধরি করে মেয়েটির ঠাণ্ডা বরফ শরীরটা সে পারে তুলল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ মেয়েটির ঠোঁট, গাল, বুক এবং তলপেটের ক্ষতস্থানগুলিতে চোখ যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনেই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, হায় ভগবান। ইয়া আল্লা।

নিঃসাড় নিরাভরণ মেয়েটির দিকে বেশি সময় তাকিয়ে থাকতে না পেরে কোমরের আধা ভেজা গামছাটা দিয়ে বলরাম মেয়েটির দেহটা ঢেকে দিল। আসলে জলের স্রোত বাঁধটাকে ধাক্কা মারাতেই সে মেয়েটিকে জীবিত বলে ভেবেছিল। মৃতদেহটা নিয়ে মানুষগুলি এখন সমস্যায় পড়ল। তার বাড়ীঘর কোথায়, জাতি-ধর্মই বা কি, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বলরামের গামছাটায় ওকে একেবারে বরো মেয়েদেরই মতো মনে হচ্ছে। কিন্তু ......

রোদ প্রখর হয়ে উঠেছে, তবু লোকের ভিড় কমছে না। জলের অভাবে মাঠের কাজকর্ম বন্ধ। প্রাণের ভয়ে দিন হাজিরা করে যারা তারাও কাজে বেরোতে পারছে না। বাতাসটা না থাকলে অবশ্য এই রোদে এভাবে বসে থাকাও যেত না।

কিছুটা দূরে দুই হাঁটুর মধ্যে থুতনিটা রেখে উদাস কলিমুদ্দিন একা একা বসে রয়েছে। মহাজনের পাটক্ষেতটা পরিষ্কার করতে পারলে আজকে রাতের খাবারের ব্যবস্থাটা হয়ে যেত। কিন্তু মেয়েটির মৃতদেহটা দেখার পর থেকে তার কোন কিছুই করতে ভাল লাগছে না। তার উপর আজ এখানে এত লোকজন। গতবারও এখানটায় এই সময়ে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়েছিল। মেলাও বসেছিল। আগে-পিছে, বাঁশী বাজানো পুলিশের গাড়ী সহ মন্ত্রী এসেছিল। নতুন পাম্প হাউসটার লাল ফিতে কেটে মন্ত্রী ভাষণ দিয়েছিল। ভট ভট শব্দে পাম্পটা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে পাইপ দিয়ে উঠে আসা নদীর জল পাশের ক্ষেত প্লাবিত করে দিচ্ছিল। সবার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সবুজ ধানের ক্ষেত ভরে ওঠার আগেই নদীতে বন্যা এসে গেল। আধমরা মানুষে ভাঙা বাঁধের উপর তৈরী অস্থায়ী শিবিরটা উপচে পড়ছিল।

এই খরা থেকে বরং বন্যাই ভাল। বিধ্বস্ত পাম্প হাউসটার দিকে তাকিয়ে কলিমুদ্দিন ভাবল। আধপেটা করে হলেও শিবিরে খাওয়াটা তো জোটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঁশবাড়ি আশ্রয় শিবিরে সংঘটিত গুলি বর্ষণের কথা মনে পড়ায় কলিমুদ্দিন ভয়ে শিউরে উঠল। ওয়াক থুঃ। পাম্প হাউসটার দিকে তাকিয়ে সে থুথু ফেলল। এই ডেডবডি কেউ ছোঁবে না। মার্ডার কেস। পুলিশকে খবর দিতে হবে। পঞ্চায়েতের সদস্য গোপাল বরো সবাইকে শুনিয়ে চিৎকার করে কথাগুলি বলল।

দু'পারের মানুষগুলি উৎকর্ণ হয়ে মেম্বারের কথা শুনল। বিজয় এবং লুইসকে পাশে ডেকে এনে মেম্বার বরো ভাষায় কি সব যেন বলল। সামনে দাঁড়ানো জাবেদ এবং বসির পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। অসমীয়া ভাষা তারা জানে, বুঝতে পারে। কিন্তু বরো ভাষা? সন্দেহ আর শঙ্কায় ভুগতে থাকা মানুষগুলি কিছুক্ষণ নীরবে থেকে পুনরায় নিজেদের মধ্যেই ফিসফাস কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বলতো, কিছু একটা বল। কি করলে খাবার জুটবে?

অসহায় রহমৎ বদরুদ্দিনের মুখের দিকে তাকিয়ে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল। রহমত মেম্বার গোপাল বরোর ঘরে থাকে, কাজ করে। বছরটা শেষ হতে এখনও দেড়মাস বাকি। তার সমস্যা হচ্ছে স্ত্রীকে নিয়ে। ওরা চার ঘর একেবারে হিন্দুদের মধ্যে থাকে। সংঘর্ষের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের কে যেন বলল হিন্দুদের মত সাজপোষাক পরতে। ধার করে আনা শাঁখা-সিঁদুর এবং রাঙা পাড় শাড়ি পরে রহমতের স্ত্রী পুরোপুরি হিন্দু নারী হয়ে পড়ল। সেই যে একবার সে জিনিসগুলি পরেছে এখন আর খুলতে নারাজ। খুললেই যেন কেউ তাকে মেরে ফেলবে। রহমত এবং আশেপাশের অনেকেই তাকে বুঝিয়েছে। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতেই চাইছে না। জ্ঞাতিভাইয়ের রোষে পড়বে বলেও রহমতের ভয়। তাই সে বদরের শরণাপন্ন হয়েছে। বদর তাকে ওদের মাঝখানে গিয়ে থাকতে বলেছে। কিন্তু রহমত মন স্থির করতে পারেনি। অল্প একটু হলেও সেটা তার নিজের মাটি।

গেল গেল। উড়ে গেল। হঠাৎ কারো একটা বিকট চিৎকার শুনে লোকগুলি বসার থেকে ঝাঁপ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। কী হলো? কী গেল?

মেয়েটির দেহ থেকে বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বলরামের গামছাটা নদীর স্রোতে কিছুদূর ভেসে গিয়ে ধীরে ধীরে ডুবে গেল। হায় রাম। হে আল্লা। মেয়েটির ক্ষতবিক্ষত নগ্ন দেহটা লোকগুলির চোখ কোটর থেকে টেনে বের করার উপক্রম করল। ভীষণ অস্বস্তিতে লোকগুলি উশখুশ করতে লাগল। চোখ-মুখ ঢেকে কয়েকজন মাটিতে বসে পড়ল। হঠাৎ কাদের মিঞাকে মেয়েটির কাছে এগিয়ে যেতে দেখা গেল। গলায় জড়িয়ে রাখা নীল গামছাটা দিয়ে বুড়ো যতটা সম্ভব মেয়েটির দেহকে ঢেকেঢুকে দিল। তারপর প্রসারিত হাতদুটি আকাশের দিকে মেলে দিয়ে বিড়বিড় করে বুড়ো ঘরের দিকে রওয়ানা হলো। মেয়েটিকে এখন মুসলমানের মেয়ে বলেই মনে হতে লাগল। লোকগুলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মেম্বারের দিকে ঘুরে তাকাল। নিজের অস্বস্তি লুকিয়ে রাখার জন্য মেম্বার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সেখান থেকে সরিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, যা যা তোরা ঘরে যা।

করছিস্ কি? বসে বসেই বড়শি ফেলছিস নাকি? রফিউলের ডাকে চমকে উঠলাম। দেরী হয়ে গেল বন্ধু। রবীনের ঘরে পুলিন আর বিকাশকে পেয়ে গেলাম। কিছু স্মৃতি রোমন্থিত হলো। দ্য লাইট অব আদার ডে'জ। চল, আমাকে একটু এগিয়ে দিবি। তোর রহস্যটা?

রহস্য? ওটার ব্যাখ্যা তোকেই দিতে হবে। বল, কী পেলি?

আমার মনে হয় পুলিশ এসে মৃতদেহটা পোস্টমর্টেমের জন্য নিয়ে যাবে। দুই-চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিয়ে যেতে পারে।

কি? কোথায় আছিস তুই? ঘোঁকট গ্রাম থেকে সেই জাত-পাত হীন বেওয়ারিশ লাশ আনার জন্য আট-ন মাইল দূর থেকে পুলিশ যাবে? নো নেভার। অবশ্য সে রাতে বি.এস.এফ নাকি একটা সি.আর.পি.এফের বাহিনী সঙ্গে নিয়ে পুলিশ গিয়েছিল সেই বরো গ্রামটিতে। আর তারা কি করেছিল জানিস? গ্রামের যুবকগুলিকে বাইরে টেনে এনে গোরু পেটানো---না, গোরুকেও বোধহয় মানুষ

এত নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে না—আর যুবতী মেয়েদের সঙ্গে তারা তো আজকাল সব জায়গাতেই একই আচরণ করে।

কিন্তু মেয়েটি, মেয়েটির কী হলো?

মেয়েটির কী হবে? জীবিতদেরই দেখাশোনার লোকের অভাব, মৃতদেহের আর কে খোঁজ করে? শুনেছি সকালবেলা নদীর পারে গিয়ে কেউ তার দেহটা দেখতে পায়নি। কেউ কেউ ভূত জিন ইত্যাদির কথা বলতে চায়। আমি সেগুলি বিশ্বাস করি না। অবশ্য রাতের বেলা যদি শেয়াল-কুকুর .....

রফিউল হাউলিতে চলে গেল। দু'টো দিন আমার সঙ্গে থেকে সে আমার ছেলেবেলার ভুলে যাওয়া স্মৃতিতে জল সিঞ্চন করে গেল। সে যাওয়ার পর প্রায় দু'দিন ধরে সেই অখ্যাত গ্রামের নদীতে ভেসে আসা মেয়েটি আমাকে মাঝে মাঝেই আনমনা করে দিতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে আবার সব আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে গেল।

সময় ধীরে ধীরে সমস্ত কিছুকে সহনীয় করে তোলে বলে যে কথাটা প্রচলিত রয়েছে তা খুব একটা মিথ্যে নয়। কিন্তু মানুষের বোধহয় কিছু দুঃখ, কিছু যন্ত্রণা কখনও ভোলা উচিত নয়। নেলী, গহপুরের বেদনাবিধুর স্মৃতি মনে থাকলে বরপেটার সংঘর্ষ ঘটত কি? এর পরেও পুনরায় বরপেটার ঘটনা ঘটবে না এমন কথা নিশ্চিত ভাবে কে বলবে?

'স্যার, আপনার চিঠি।'

আমার চিঠি? পিয়নের রেখে যাওয়া চিঠিটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। 'চিঠি লিখতে কুঁড়েমি লাগে। তবু মাঝে মধ্যে চিঠি লিখতে চেষ্টা করব' বলত যে রফিউল সে-ই এত তাড়াতাড়ি চিঠি লিখল? রফিউলের চিঠি পড়ে নদীতে ভেসে আসা সেই মৃত যুবতীর এবং নদীর দু'পারের মানুষগুলি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে রাতে উগ্রপন্থীর সন্ধানে আসা বরো গ্রামটিতে পুলিস বাহিনীর অবর্ণনীয় অত্যাচারের বর্ণনা পড়ে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। একটা সময়ে আমি হঠাৎ নিজেকে সেই বড়ো গ্রামটায় আবিষ্কার করলাম। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ইতিমধ্যে পুলিশবাহিনী চলে গেছে। চারদিকে অন্ধকারের দীর্ঘশ্বাস। আহত, ধর্ষিতা যুবতীদের দুঃখ-কষ্টে বাঁশগাছগুলিও কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাতাস থেকে ভেসে ভেসে আসছে—

কিসের রহস্য?

সেই নদী দিয়ে ভেসে আসা মেয়েটি!

ঝিল্লির করুণ বিলাপ। ধীরে ধীরে আমি মেম্বারের উঠোনে উপস্থিত হলাম। বারান্দায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন কেরোসিনের প্রদীপটার কাছে মাথায়-কপালে হাত দিয়ে মেম্বার বসে রয়েছে। মেম্বারের ছেলেকে পুলিশে ধরে নিয়েছে। দরজার গোড়ায় কাঁদতে কাঁদতে পড়ে থাকা মেম্বারের স্ত্রীর শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

অন্ধকার বারান্দা দিয়ে বড় বড় পদক্ষেপ ফেলে বলরাম মেম্বারের বারান্দায় এসে হাজির হলো। সারাটা দিনই তাকে নানা জনের নানা কথা শুনতে হয়েছে। তুই-ই ঝামেলাটা লাগালি। কী দরকার ছিল তোর মৃত যুবতীটির দেহ পারে তোলার? নদীতে ভেসে এসেছিল নদীতেই ভেসে যেত। তোর জন্যই আজ আমাদের সবার এই দশা হলো।

মেম্বার আর তার স্ত্রীর দশা দেখে বলরাম থমকে রইল। কী করবে না করবে ভেবে এদিক ওদিক তাকাতেই কিছু দূরে অন্ধকারে মাথা নীচু করে রহমতকে বসে থাকতে দেখল। রহমতের পাশে

গিয়ে কানের কাছে কী যেন ফিসফিস করে বলে তাকে প্রায় টেনে নেবার মতো করে বাইরে বের করে নিয়ে গেল। কি করছিস, কি করছিস বলে আমিও ওদের অনুসরণ করলাম। রহমতের হাতটা ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বলরাম এবার বাইরে বেরিয়ে নদীর দিকে হাঁটতে লাগল। রহমতও তাকে অনুসরণ করল। আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে একজনের পেছনে আর একজন করে আমরা এগিয়ে গেলাম। ধপ ধপ শব্দ করে পাখা ঝাপটে কয়েকটা বাদুড় আমাদের পাশ দিয়ে উড়ে গেল। যেতে যেতে আমরা একসময় নদীর পারের খোলা জায়গায় হুক্কাহুয়া করতে থাকা শেয়ালগুলোকে দূর থেকে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পেলাম।

চুহ-চুহ-চুহ। অপ্রত্যাশিত শব্দে বলরামের সঙ্গে আমাদের পা'গুলিও মাটিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিসের শব্দ! মৃতদেহটার সামনে থেকে শব্দটা ভেসে আসছে বলে মনে হচ্ছে না?

রহমত কিছু একটা বলতে চাইছিল। বলরাম চিমটি কেটে তাকে চুপ থাকার ইঙ্গিত করল। সাবধানে তিনজন বাঁধটার কাছে এগিয়ে গেলাম। চুহ-চুহ্। সঙ্গে সঙ্গে চাপ চাপ মাটির চাপড়া মাটিতে পড়ে গুঁড়ো হয়ে যাবার শব্দ শোনা গেল। দা হাতে রহমতের হাতের মুঠিটা আপনা থেকেই শক্ত হয়ে গেল। তিনজনেই যতটা সম্ভব নিঃশব্দে জল ভেঙে ওপারে গিয়ে উঠলাম। কে? ওখানে কে?

আওয়াজটা শুনেই রহমত কাদের বুড়োকে চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে উঠল, আমরা চাচা, আমি রহমত আর ..... এই গভীর রাতে কাদের মিঞা এখানে একা একা কি করছে? রহস্য আর অপার কৌতূহল আমাদের কাদের মিঞার কাছে টেনে নিয়ে গেল। কয়েকটা মাটির চাপড়া সামনে নিয়ে নদীর খাড়াইয়ের পাশে একা বুড়ো বসে আছে। সামনের ঘাটে কাপড় ধোওয়া পাটের মতো পড়ে রয়েছে যুবতীটি। কিন্তু এখানে থেকে, এ অন্ধকারে বুড়ো তাকে দেখতে পাচ্ছে কি? কিছু কিছু জিনিস দেখার জন্য বোধহয় চোখ থেকে হৃদয়ের বেশি প্রয়োজন।

নিঃশব্দে বুড়োর সামনে মাটিতে বসে আমরাও এক একটা ছায়ামূর্তি হয়ে পড়লাম। শুধুমাত্র জোনাকী পোকাগুলি মিটমিট করে কি যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল। কে জানে, মেয়েটির মা-বাবাও হয়তো তাকে এভাবেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। 'কি আর করবি, মরলেও তো মানুষেরই বাচ্ছা।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কাদের চাচার বলা কথাগুলি অনেকক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ে বাজতে লাগল। অনুভব হলো ধীরে ধীরে যেন হৃদয়ের শুকনো মাঠটা ক্রমশ সিক্ত হয়ে উঠছে।

কাদের চাচা! একটা কোদাল পাওয়া যাবে কি এখানে?

কোদাল। এই বলরাম কি বলছে? আমরা প্রত্যেকেই বলরামের দিকে তাকালাম। হঠাৎ খবরের কাগজের বুক থেকে উঠে আসা একটা ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। একটার উপর আর একটা রাখা যুবকের দেহগুলো টায়ার কেরোসিনের আগুনে জ্বলে উঠছে। সে ছবি অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে তার জায়গায় ভেসে উঠল অন্য এক ছবি। কয়েকটা শেয়াল। একটি যুবতী মেয়েব দেহ শেয়ালগুলি আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। সারা শরীর কেঁপে উঠল। দেহের লোমগুলি খাড়া হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে বলরাম, রহমত এবং আমি একসঙ্গে মিলে একটা গর্ত খুড়লাম। জলের কাছ থেকে এক পা দু পা করে নিঃশব্দে মেয়েটি উঠে এলো। গর্তটার দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বলে উঠল-- 'মা, এই রামরাজ্যে আমি আর থাকব না। আমাকে তোমার বুকে একটু জায়গা দাও!'

ধীরে ধীরে গর্তটায় নেমে মেয়েটি শুয়ে পড়ল।

সরু ধোমালি বর ধোমালি

জেহিরুল হুসেইন

'একটা বেজে গেল, দুটো বেজে গেল, বীণাপানিব . ' বাক্যটা শেষ না হতেই যোগেশ্বরেব একটা সজোর চড়ে তোলন দাস ওবফে পেলু বালির উপরে উপুড় হয়ে পড়ল। পেলু ঠ্যাংদুটোব পাশে দাঁড়িয়ে হিন্দী সিনেমাব হিবোর পোজে বেঁটেখাটো যোগেশ্বর বাঁ-হাতের তর্জনী নাচিযে তাকে নির্দেশ দিল,—'ওঠ্, আজ তোর মুখ ভেঙে গুঁড়ো করে দেব।'

পেলু যোগেশ্বরের হাতে আগেও মার খেয়েছে। কিন্তু আজকেব মত তার এই হিংস্র ভয়ঙ্কর রূপ পেলু কোনদিন দেখে নি। যোগেশ্বরেব ভয়ে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। অসুরটা তাকে বোধহয় আজ শেষ করে ফেলবে। বালিতে অনেকটা ছেঁচড়ে গিয়ে সে যোগেশ্ববকে অনুনয় বিনয় করতে লাগল,—'আর মারিস না, অ বায়ন। এই দেখ কানে ধরছি। ওরা আমাকে আগেও খেপিয়েছিল বলেই আমি বলেছিলাম।'

কর্কশ স্বরে যোগেশ্বর গর্জন কবে উঠল,—'কী বলে ক্ষেপাচ্ছিল তোকে?'

পেলু মেয়েদের দলটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, 'ওরা কয়েকজন আমাকে মেয়েদের চড খাওয়া, দুধের সর খাওয়া বলেছিল।'

—'মেয়েদের চড তোকে কেন খেতে হল?'— যোগেশ্বরের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে পেলু নাক দিয়ে শিকনি টানতে লাগল। বালি, শিকনি, চোখের জল মিলেমিশে একাকার হয়ে তাব মুখটা কিম্ভুতকিমাকার রূপ ধারণ করেছিল। কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বীণাপানিদের দলটা পেলুব অবস্থা দেখে মুখ টিপে হাসি উপভোগ করতে লাগল। মেয়েদের দলের কেউ তাকে একটুও দেখতে পারে না। প্রতিটি মেয়েকেই সে জ্বালাতন করে। বীণার ভাব দেখে মনে হয় সুযোগ পেলে সে যেন তার গলাটাই মুচড়ে দেবে। পেলু যার সঙ্গে খুশি তার সঙ্গে নাম জুড়ে দিয়ে ক্ষেপায়। বীণাপানিকে

একবার যোগেশ্বরের বৌ' বলে জড়াতে গিয়ে সে আজকের মতোই যোগেশ্বরের বিরাশী সিক্কা ওজনের চড় খেয়েছিল।

মেয়েদের দলটির মধ্যে বীণাপানি আর মামণি বড়। দশ কী এগারো বছর হবে দুজনের, লাজ-লজ্জা অন্যদের থেকে বেশি। মাটিতে থ্যাবড়া মেরে বসলে ফ্রকটা টেনে টুনে হাঁটু ঢেকে বসতে শিখেছে। কারো না.ে. ঙ্গে জড়ালে ওর লজ্জা পায়। রণচণ্ডী মূর্তি ধরে বদমাশ ছেলেদের পেছন পেছন ধাওয়া করে .াই ওদের দুজনকে ক্ষেপিয়ে পেলু বেশ মজা পায়। দূর থেকে সে তাড়িয়ে নেয় আর দ্বিগুণ উৎসাহে চিৎকার করতে থাকে। নির্লজ্জের মত দাঁত বের করে হি-হি করে হাসে।

একদিন বালির উপরে বীণারা 'ইমাম পানি গঙ্গা রাণী' খেলছিল। কোমরে হাত রেখে বীণা খেলায় মশগুল। হঠাৎ কোথা থেকে সেখানে পেলু উপস্থিত। সে এক পা দু'পা করে বীণার পেছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ তার ফ্রকটা উপর দিকে তুলে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'দেখে নাও, দেখে নাও।' দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ, দেখে নাও।' পেলুর কাণ্ডে ছেলেরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল। মেয়েরা আর্তনাদ করে উঠল, ইশ্ রাম, কী অসভ্য। লজ্জা নেই। মেয়েদের ফ্রক উঠিয়েছে। ছিঃ ছিঃ। লজ্জা আর অপমানে বীণার চোখ ছলছলে হয়ে এলো। ছেলেগুলিকে শাসন করার জন্যে সেদিন যোগেশ্বর অনুপস্থিত। বীণা আর অপেক্ষা করল না। সে দৌড়ে গিয়ে পেলুর গালে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা চড় কষিয়ে বলে উঠল, 'কুকুরের বাচ্চা, জহরা, নির্লজ্জ!

পেলু পালানোর মত সময় পেল না। অতর্কিতে বীণার জোর থাপ্পড় খেয়ে সে হতভম্ব হয়ে গেল।' মেয়েদের চড় খাওয়া পেলু।

পেলু বীণার শত্রুতা আরো বেড়ে গেল। সুবিধা পেলেই তাকে খেপায়। প্রত্যুত্তরে বীণাও তাকে চড়, লাথি, মুখ ভেঙায়। ওদের ঝগড়ার মধ্যে যোগেশ্বরকে ঢুকে পড়তে হয়। ছেলে-মেয়ে দু'দলেরই অবিসম্বাদী নেতা যোগেশ্বর। তার কালো মোটা শরীরে অসুরের শক্তি। ছেলে-মেয়ে সবাই তাকে ভয় করে। তার নির্দেশ সবাই নির্বিবাদে মেনে চলে।

অবশেষে পেলুর অনুনয়-বিনয়ে যোগেশ্বরের মন গলল। যোগেশ্বর মেয়েদের দলটাকে নির্দেশ দিল, 'আজ থেকে তোরা তোলনকে 'মেয়েদের চড় খাওয়া' বলতে পারবি না। বিনিময়ে তোলনও কোন মেয়েকে বিরক্ত করবে না। অবশ্য এ ধরণের চুক্তি আগেও অনেকবার হয়েছে। চুক্তিগুলি বড়ই সাময়িক। কিছুক্ষণ পরেই তারা সব ভুলে যাবে। নতুন চুক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নরেন নামের ছেলেটি বলল, 'আমাকেও আজ থেকে কেউ 'ডালডা' বলে খেপাতে পারবে না।' ডালডা বললে আমিও ছেড়ে দেব না বলছি।' নরেনের কথায় সবাই গর্জন করে উঠল। নরেনের সবসময় সর্দি লেগে থাকে আর তার নাকের ফুঁটো দিয়ে স্রোতের মত শিকনি গড়াতে থাকে। তাই পেলু তার নতুন নামকরণ করেছে 'ডালডা'। নরেনের উচ্চারণে 'ন' অক্ষরটা 'ল' হয়ে যায়। কেউ তার নাম জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'আমার নাম লরেল।'

লাবণ্যের গলার আওয়াজ ফ্যাসফেসে বলে পেলু তার নাম রেখেছে 'পাতি হাঁস'। লাবণ্যের মুখ সবসময় চলতে থাকে। সেও আজ সবাইকে শুনিয়ে বলল, 'আমরাও কাউকে খেপাব না। আমাদের খেপালে কিন্তু কাউকে ছেড়ে কথা বলব না। বলে রাখলাম।'

তার কথায় ছেলের দল লাফিয়ে উঠল। 'এই পাতিহাঁস। তোকে আমি কখন খেঁপিয়েছি। মিথ্যে কথা বলবি না কিন্তু। আর খেপালেই বা আমাদের কী করতে পারবি।' লাবণ্য যোগেশ্বরকে সাক্ষী মানল, 'শুনলি বায়ন। ওরা কিরকম প্যাঁক প্যাঁক করছে।'

যদু বলে উঠল, 'প্যাঁক প্যাঁক পাতিহাঁস করে। আমরা করি না।' সবাই মিলে আবার গর্জন। পেলু ইতিমধ্যে স্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল। বাক বিতণ্ডা তাকে উৎসাহিত করে তুলছিল। সে চুপ করে থাকতে পারল না। কোমরাটা বাঁকা করে লাবণ্যের দিকে দৌড়ে এসে বলল, 'করিস না প্যাঁক প্যাঁক ফুলেশ্বরীর নন্দেক।'

গহীন গম্ভীর যোগেশ্বরের মুখেও তার কথায় হাসি ফুটে উঠল। মেয়েরা পেলুর দিকে দৌড়ে গেল। পেলু এক দৌড়ে চরের ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। পেলু না থাকলে যোগেশ্বরের কার্য সিদ্ধ হয় না। ফর্সা বেঁটেখাটো পেলু কূটবুদ্ধির ভাণ্ডার। যোগেশ্বরের শরীরে হাতির মত শক্তি থাকলে কী হবে বুদ্ধিটা তার একেবারে ভোঁতা। বিপদের সময় পেলুর বুদ্ধি না হলে তার চলে না। পেলুর আরও একটা গুণ হল—সে সুন্দর করে ছন্দ মিলিয়ে ছড়া বানাতে পারে। তার ছন্দের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও মাতাল হয়ে ধ্বনি দেয়।

মেয়েদের ছাড়াও যোগেশ্বরের খেলায় মন বসে না। ছাল ছাড়ানো সাদা মোমের মত দেখতে পুতলী তার দিকে তাকিয়ে কীভাবে হাসতে থাকে। সে বুঝতে পারে না কেন জানি তার তাকানো যোগেশ্বরের এত ভালো লাগে। পুতলী না থাকলে যোগেশ্বরেরও খেলায় মন বসে না। যোগেশ্বরের ভয়—তাদের ঝগড়া-ঝাটি, পেলুর কাণ্ড-কারখানা কোনভাবে বড়দের কানে গেলে সব ভেস্তে যাবে। বালির চরের খেলাও সেদিন থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। খর্ব হবে তাদের অবাধ স্বাধীনতা। তার মধ্যে আবার বীণাপানির মা দেখতে যে কালি গোঁসাইয়ের মত। তিনি যদি এ সমস্ত কথা কোনভাবে জানতে পারেন তাহলে আব রক্ষা থাকে— —ব না।

অবশেষে কোনভাবে ঝগড়াঝাটির অন্ত পড়ল। আলাদা আলাদা দলে খেলা শুরু হল। একদল চঞ্চল দুরন্ত শিশুর হাসি-ঠাট্টায় শীতে শীর্ণ ধনশিরির চর অঞ্চল জীবন্ত হয়ে উঠল। ওদের চিৎকার চেঁচামেচি, হাসি আর ধনশিরির ঢেউ যেন একাকার হয়ে উঠতে লাগল।

শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে যোগেশ্বরদের গ্রামটা নদীর পার থেকে অনেক দূরে সরে যায়। তীরে বালির চর পড়ে। বিশাল বালির চর। ঘর ভেঙে বেরিয়ে আসা পাখির মত ওরা তখন বালির চরে খেলাধূলো শুরু করে। ওদের চিৎকার আর চেঁচামেচি দূরদূরান্তে পৌঁছে যাওয়া বড়দের কানে যায় না। যোগেশ্বরদের তখন অবাধ স্বাধীনতা।

বর্ষায় ধনশিরির জল বালির চরটাকে ভাসিয়ে নেয়। ওদের খেলার মাঠের উপর দিয়ে বয়ে যায় ধনশিরির প্রবল স্রোতের ধারা। একটা সময়ে ভরা-বর্ষায় ধনশিরির প্রবল স্রোতে বড় বড় কাঠ ভেসে আসত। রশির মাথায় লোহার কাঁটা একটা লাগিয়ে গ্রামের লোক কাঠ ধরত। কাঠগুলি শুকিয়ে ফালা করে মুঠো মুঠো করে বেঁধে ওপারের নগরে নৌকো করে নিয়ে বিক্রি করত। এখন আর আগের মত কাঠ ভেসে আসে না। মানুষের খড়ি কেনা-বেচার ব্যবসাও বন্ধ হয়ে গেছে।

বালির উপর তিনটে খুঁটি পুঁতে দু'জন ক্রিকেট খেলতে শুরু করল। যদু একমাথা থেকে পুরনো টেনিস বল একটা বোলিং করতে লাগল। যোগেশ্বর বড় একটা কাঠ দিয়ে ব্যাটিং করছে। 'ডালডা' উইকেটকিপার। ব্যাটে বল লাগুক আর না লাগুক ওদের হাবভাব কিন্তু তেণ্ডুলকর-আজহার-কুম্বলের মত। কেউ আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু-একজন হাততালি দিয়ে উঠবে। ধূসর হয়ে যাওয়া প্যান্টে বলটা কয়েকবার ঘষে বোলিং করবে। তা নাহলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের মত সাম্বা নৃত্য করবে।

বাকি দুয়েকজন হিন্দি সিনেমার অনুকরণে ক্যারাটে, কংফু, বক্সিং খেলায় মেতে উঠল। হাত-পা নেড়ে মুখে 'ঢিসুম ঢিসুম' শব্দ করতে লাগল। ঘুরে ঘুরে মারা কিক আর ঘুষির জোরে কে কোথায় ছিটকে পড়ল তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। টেপু আর ইন্দ্র দুটো এ.কে-৪৭ এর মতো করে 'শিউ শিউ' শব্দে গোলাগুলি শুরু করে দিল। মুখে জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমার ডায়লগ। মেয়েরা বালির উপর গোলাকার হয়ে বসে 'বিয়ানাম' গান করছে। তাদের মধ্যে আবার দুয়েকজন এক টুকরো কাগজের উপর একটু লবন রেখে তার সঙ্গে কুল এবং জলপাই মেখে বেশ মজা করে খাচ্ছে। মামণি একটা বাতাবী লেবু এনেছিল খাবার জন্যে। সেটা কখন যে পেলু সবার অগোচরে চুরি করে নিয়ে গেল তা কেউ টেরই পেল না। ইতিমধ্যে পেলু সেটা দিয়ে ফুটবল খেলতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যেও সে খেলা ছেড়ে টক খেতে থাকা মেয়েদের পাশে এসে 'ওমা মরে যাই, লেটেকু পানিয়ল দেখছি পাকা পাকা' বলে ওদের ক্ষেপাতে শুরু করল। মেয়েরা ক্রিকেট খেলতে থাকা যোগেশ্বরকে চিৎকার করে জানাল, 'দেখছিস তো বায়ন, ও আমাদের আবার ক্ষেপাচ্ছে।' পেলু মুহূর্তের মধ্যে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

একঘেয়েমি লাগায় ক্রিকেট খেলা বন্ধ করা হল। আরম্ভ হল ভাওনা। যদু এবং অনন্ত আগুপাছু হয়ে ধনু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। অন্তহীন যুদ্ধ। যোগেশ্বর মুখে মুখে খোল বাজিয়ে যুদ্ধের তাল দিতে লাগল। 'তাও তাচ তাও, খিতি তাখি তাও, বিদধেই তাতাক ধেই।' বোল শেষ হতেই দুই ধনুর্ধর পরস্পরের দিকে শর নিক্ষেপ করতে লাগল। তখনই হাতে পুরনো সাইকেলের একটা ফ্রি হুইল বাঁ হাতের তর্জনীতে ঘুরিয়ে কৃষ্ণরূপী পেলুর প্রবেশ ঘটল। মুখ থেকে বেরোল, 'য়ে হেই হামারি সুরক্ষাচক্র।' যদু আর অনন্ত তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল। ভীষণ ধনুর্যুদ্ধ চলতে লাগল।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাড়া খেয়ে পেলু কিছু দূরে গিয়ে নদীর তীরে বসে ওপারের দৃশ্যাবলী দেখতে লাগল। হঠাৎ তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে যোগেশ্বরকে চিৎকার করে ডাকল, 'এই বায়ন, দানি এসে গেছে। তাড়াতাড়ি আয়, দানি এসে গেল।'

পেলুর চিৎকারে ধনু-যুদ্ধ বন্ধ হল। যোগেশ্বররা দৌড়ে এসে পেলুর কাছে উপস্থিত হল। পেলু নদীর ওপারে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে তার সুরে সুর মিলিয়ে বাকি কয়েকজনও চিৎকার করে উঠল, 'এসে গেল দানি, এসে গেল দানি।'

মেয়েরাও নাচগান ছেড়ে ওপারের দিকে তাকাল। যোগেশ্বর কান খাড়া করে ওপারের শব্দগুলি কোন ভাষার তা বুঝতে চেষ্টা করল। একবার পেলুকে জিজ্ঞেস করল, 'কী শুনছিস? বল হরি হরি বোল, না রাম নাম সৎ হ্যায়?' পেলু কোন উত্তর দিতে পারল না। 'ডালডা'-ই বলে উঠল, এত দূর থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। 'বল হরি হরি বল' বললে যোগেশ্বরদের করার কিছুই নেই। ওরা পুনরায় খেলতে শুরু করবে। কিন্তু যদি 'রাম নাম সৎ হ্যায়' এসে গেল দানি। আর কোনো কথা নেই। ওরা সোজা নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেট সাঁতার দিয়ে ওপারে গিয়ে পৌছবে। 'রাম নাম সৎ হ্যায়' বলে ধ্বনি দিলেই যোগেশ্বররা ধরে নেয় কোন মাড়োয়ারী পার্টি মৃতদেহ নিয়ে আসছে। মাড়োয়ারী শবযাত্রা এলেই ওদের 'দানি' এসে যায়। মারোয়াড়ীদের শবযাত্রায় খুচরো পয়সা ছড়িয়ে দেয়। যোগেশ্বররা সেই ছিটিয়ে ফেলা খুচরো পয়সা কুড়িয়ে নেয়।

আজকের শবযাত্রাটা বাঙালী মাড়োয়ারী কারোর-ই নয়। কী জাতের মানুষ মরেছে তাহলে? নদীর ওপারে ঐ শ্মশানটিতে অসমীয়া মানুষরা সাধারণত শব দাহ করে না। যোগেশ্বররা কিংকতর্ব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। এত লোক এসেছে। প্রচুর গাড়ি, মোটর এসেছে। যোগেশ্বর চোখের

ইশারায় পেলুকে ইঙ্গিত করল, 'কি ভাবছিস? যাবি? না যাবি না।' পেলুর মুখ গম্ভীর। সে কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। 'এই বায়ন, দেখে আসি গিয়ে চল। তখন আসল ব্যাপারটা বুঝতে পার যাবে। সবার যাবার দরকার নেই। তুই, আমি, যদু আর পুতুল, ব্যস।'

যোগেশ্বর পেলুর কথামত যদু এবং পুতুলকে জামাকাপড় খোলার নির্দেশ দিল। তৎক্ষণাৎ সবাই জামাকাপড় খুলে রেখে ধনশিরির জলে ঝপাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা সাঁতারে দক্ষ। ভরা বর্ষাতেও ওরা ধনশিরি নদী খুব সহজেই এপার ওপার হয়। এখন শীতকালের ধনশিরি শুকিয়ে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে একটা খালে পরিণত হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই যোগেশ্বররা ওপারে গিয়ে পৌঁছাল।

ওপারের তীরে উঠে তাদের মনটা নিরাশ হয়ে পড়ল। শব দাহ করতে আসা মানুষরা মাড়োয়ারী নয়, অসমীয়া। পেলুদের সমবয়সী একজন শুকনো পাটখড়ি একগোছায় আগুন ধরিয়ে আগে আগে যাচ্ছে। সঙ্গে অসংখ্য মানুষ, গাড়ি আর মোটর। সুন্দর সাজ পোষাক পরা মানুষগুলিকে দেখে যোগেশ্বররা বুঝতে পারল যে মৃত ব্যক্তি বেশ ধনী লোক।

নদীর জল থেকে যোগেশ্বরদের তীরে ওঠার ব্যাপারটাকে দুই একজন লক্ষ্য করেছিল। শক্ত পেটুক, ফুরফুরে ধূতি পাঞ্জাবী পরা একটা লোক তাদের জিজ্ঞেস করল, 'এই তোরা কার ছেলে? লোকটির গলার স্বরটা বড় কর্কশ। বলার ধরণটা ওরা খুব একটা পছন্দ করল না। কেমন একটা অবজ্ঞার ভাব রয়েছে। পেলু তাদের গ্রামের দিকটায় অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল—'ওই গ্রাম থেকে এসেছি। আচ্ছা, কে মারা গেছে?' কর্কশ স্বরের লোকটি উল্টে তাকে জিজ্ঞেস করল – 'তা দিয়ে তোর কী দরকার?' 'না এমনিতেই জিজ্ঞেস করলাম। জিজ্ঞেস করাটা কি অন্যায় নাকি?' কর্কশ স্বরের লোকটি তার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল— 'বাঃ বাটলু গুটির বেশ বড় বড় কথা তো। সব কয়টার শরীর থেকে কাঁচা মাছের গন্ধ বেরোচ্ছে। যা ভাগ এখান থেকে।'

পেলু 'বড় বেশি' বলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝাঁপ দেবার আগে কর্কশস্বরের লোকটির কানে যাবার মত করে বলল 'পেটুয়াকা পেট গাড়ি লেট' বলে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে যোগেশ্বররাও ব্যাঙের মত নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীর পার থেকে তাদের লক্ষ্য করে দুয়েকটি ঢিল ছুটে এসেছিল। যোগেশ্বররা সঙ্গে সঙ্গে ডুব-সাঁতার দিয়ে ওপারে গিয়ে উঠল।

ওপারে অপেক্ষা করতে থাকা ছেলেমেয়েরা তাদের জিজ্ঞেস করল, 'কে মারা গেছে বায়ন? মাড়োয়ারী না অসমীয়া? যোগেশ্বরের রাগ হয়েছিল। গুলতিটা সঙ্গে থাকলে আজ সে নিশ্চয় পেটুয়াটার টাকের মধ্যে গুলতি মারত। একটা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করে সে বলল, 'বাদ দে যেখানকারই মানুষ মরে থাকুক না কেন। বড় শহুরে ভাব দেখাতে এসেছে।' পেলুর মুখে খিকখিক হাসি। 'আমাকে যে বড় কথা বলেছে তার পেটটা এই মোটা।'

'মাড়োয়ারী নয়, বুঝেছিস। অসমীয়া। মাড়োয়ারী হলে পয়সা ছড়াত। অসমীয়া হলে ফুটো কড়িও পাবার আশা নেই।' ইন্দ্র প্রস্তাব দিল, 'তাহলে আয় ভাওনাটা তাহলে আবার শুরু করা যাক আয়।' আরম্ভ হল 'অভিমন্যু বধ' ভাওনা। অভিমন্যুরূপী যদু হাতের লাঠিটাকেই ধনুকের মত নিয়ে বলে উঠল, 'অন্যায়ভাবে সপ্তরথী ঘিরে ধরেছ যদিও, এই অভিমন্যুর শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকতেও প্রাণপন যুদ্ধ করে যাব।

একজন সপ্তরথী একটা ঝাঁপ মেরে প্রত্যাহ্বান জানালেন, 'ধর তাহলে অস্ত্র আজ, কর না দেরি।' তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। যোগেশ্বর মুখ দিয়ে খোলের বোল তুলল। যুদ্ধের বোল। তাঁও তাচ তাঁও, খিতিকি তাখি তাও ......'

বীণারা ততক্ষণে নিজেদের মধ্যে গানবাজনায় মেতে উঠেছে। ধনাশরির বালির চর মুখরিত হয়ে উঠল। ভাওনা করতে যোগেশ্বরের আজ বিরক্তি বোধ হচ্ছিল। তার আজ কিছুই ভাল লাগছে না। একটাও মাড়োয়ারী শবযাত্রা এল না। মিছেমিছি পেটুয়াটার গালি খেতে হল। ভাওনা ছেড়ে সে বালির উপর মুখ গোমড়া করে সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটার দিকে তাকিয়ে রইল। ওপারের চিতায় ততক্ষণে আগুন জ্বলে উঠেছে। বাঁশ ফুটছে। মাঝে মাঝে শোল মাছ পোড়ার মত একটা গন্ধ বাতাসে ভেসে এপারে আসছে। পেলু এসে তাকে বলেই ফেলল, 'দেখেছিস বায়ন, ওরা আমাদেব কাঁচামাছের গন্ধ বেরোচ্ছে বলেছিল। এখন দেখছি ওদের দিক থেকেই পোড়া মাছের গন্ধ বেরোচ্ছে।'

পেলুর কথায় যোগেশ্বর কোন জবাব দিল না। তার শরীর মন একেবারেই ভাল নয়। তার কার উপরে যেন রাগ উঠেছে। কুলক্ষণে দিন। মাড়োয়ারী শবযাত্রা হলে দু'পয়সা পেয়ে বিড়ি কিনে সুখটান দিতে পারত। তাহলেও মন কিছুটা ভাল থাকত। সিগারেট টানার দুর্বার ইচ্ছে দমন করতে না পেরে যোগেশ্বর পেলুকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। পেলু আশেপাশে নেই। দূরে গান গাইতে থাকা মেয়েদের সে অঙ্গভঙ্গি করে ক্ষেপাচ্ছে। যোগেশ্বরের ডাক শুনে তৎক্ষণাৎ ইয়ামা চালিয়ে তার সামনে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল সে।

যোগেশ্বর তার মুখের দিকে কাতরভাবে তাকিয়ে বলল : 'তুই কিছু এনেছিস? তাহলে একটা দে না।' পেলু গম্ভীর হয়ে গেল। অসুর যোগেশ্বরের কানে তালা লাগা চড়টার কথা সে ভুলে যায় নি। সে গম্ভীরভাবে বলে উঠল, 'আছে একটা, কিন্তু তোকে দেব না। তুই মেয়েদের দলে।'

—'তার মানে তোর কাছে আছে?'

পেলু কোন উত্তর দিল না। যোগেশ্বর তাকে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। 'শুধু আজকে দে ভাই, তোর পায়ে ধরছি। আজ থেকে তোকে কিছুই বলব না।' যোগেশ্বরের কাকুতি-মিনতিতে পেলু গলে গেল। সে বলল, 'একটাই রয়েছে। প্রথম আমি খাব। তারপরে তুই পাবি।'

যোগেশ্বর রাজি হল। পেলু বালির উপর রেখে দেওয়া শার্টের গোপন পকেট থেকে অত্যন্ত সাবধানে একটা চারমিনার, দিয়াশলাইয়ের ভাঙা বাকল বের করল। সাবধানে দিয়াশলাইয়েব কাঠি জ্বালিয়ে সে সিগারেটে সুখ টান দিল। তার নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। যোগেশ্বর তার পালার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। বেশ কয়েকটি দীর্ঘ সুখটান দিয়ে পেলু সিগারেটটা যোগেশ্বরের দিকে এগিয়ে দিল। যোগেশ্বর জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা নিয়ে প্রাণপনে টানতে লাগল। মেয়েদের দলটা দূর থেকে ওদের সিগারেট টানা দেখছিল। বীণাপানি বলল—'দেখেছিস। দেখেছিস। ওরা আবার সিগারেট খাচ্ছে। যোগেশ্বরের মা কে বলে দিতে হবে।'

— 'ঘরে নালিশ করিস না। বায়ন রাগবে। এ সমস্তই পেলুর কাজ, বুঝেছিস। কেন মনে নেই ই প্রথম বিড়ি খাওয়া শুরু করেছিল।'

- 'রেখে দে, তুই তো যোগেশ্বরের মন রেখে কথা বলবিই। যোগেশ্বরও কোন কম নয়। দুজনেই সমান।' ইতিমধ্যে যোগেশ্বর চারমিনারের টুকরোটা শেষ পর্যন্ত টেনে বাকি অংশটা নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে বলল, 'যাই, বুঝেছিস তোলন। তুই যাবি না কি?'

এত তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার পেলুর মোটেই ইচ্ছে ছিল না। সে কোন উত্তর দিল না। যোগেশ্বর তাকে আবার জিজ্ঞেস করল। পেলু বলল, 'তুই গেলে যা, আমি এখন যাব না।'

—'তার মানে তোর কাছে আরও সিগারেট আছে? আমি চলে গেলেই একা একা খাবি, তাই না? দাঁড়া আমি তোর জামার পকেট দেখছি।'

পেলু নির্বিকার। সে যোগেশ্বরকে বাধা না দিয়ে বলল, 'দেখ দেখ, যত খুশি দেখে নে। একটা ছিল, খেয়ে নিলাম। কাল কিন্তু তোকে খাওয়াতে হবে। আমি কয়েকদিন খাওয়ালাম।'

যোগেশ্বর জানে পেলু মাঝে মাঝেই তার মায়ের বাক্স থেকে পয়সা চুরি করে। যোগেশ্বরের সে সুবিধে নেই। ওদের অবস্থা পেলুদের থেকে খারাপ। তার মা লোকের মাঠে ঘাটে কাজ করে যে কয়টা পয়সা পায় তা বড় যত্ন করে রাখে। যোগেশ্বরের সেই পয়সা চুরি করতে মন চায় না। তার বাবাটা এক নম্বরের ভাঙ-খোর। কাম-কাজ করে না। দিন রাত কেবল ভাঙের নেশায় মশগুল হয়ে থাকে। জীর্ণ-শীর্ণ মায়ের জন্যে যোগেশ্বরের বড় কষ্ট হয়। কত কষ্ট করে দু'বেলার আহার জোগাড় করে। সে পয়সা সে কীভাবে চুরি করবে?

'ঐ নাচেশ্বরীর দিকে তাকা বায়ন। ওঃ কী সুন্দর কোমর ভাঙছে।' পেলুর খিকখিক হাসিতে যোগেশ্বরের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। কিছুটা দূরেই মামণি নামে মেয়েটি হিন্দি সিনেমার একটা গানের তালে তালে কোমর ভেঙে নাচছে। পেলু দুটো হাতে পিস্তল নেওয়ার ভঙ্গি করে তার উদ্দেশ্যে গুলি চালাল। ......সুঁই। মামণি কিন্তু মরল না। সে নাচতেই থাকল। এবার সে নদীর পারে পারে অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছল। যোগেশ্বরও এক পা দু পা করে গ্রামের দিকে যেতে শুরু করল। তার ক্ষুধা পেয়েছে। ক্ষুধাটা বেশি লাগলেই যোগেশ্বরের মা'র কথা বেশি করে মনে পড়তে থাকে। সে ক্ষিদে পেয়েছে বললেই, 'দাঁড়া বাছা আমার' বলে মা তাকে কিছু না কিছু খেতে দেবেই। ঘরের কোথাও খুদের একটা কণাও খুঁজে পাওয়া না গেলেও মা যে কোথা থেকে কীভাবে খাবার জোগাড় করে তা কিছুতেই ভেবেও কোন কূলকিনারা করতে পারে না সে। মা যেন যাদুর সাহায্যে খাবারের বন্দোবস্ত করে ফেলে। মায়ের কথা মনে পড়তেই যোগেশ্বরের হাঁটার গতিবেগ বেড়ে যায়।

হঠাৎ 'ঐ বায়ন, যাস না, ফিরে আয়' বলে পেলুর চিৎকারটা শুনতে পেতেই যোগেশ্বর থমকে দাঁড়ায়। কী হলো? এখন আবার কী হল? পেলু নদীর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছে, 'দানি এসে গেল, দানি এসে গেল।' বাকি কয়জনও খেলা বাদ দিয়ে পেলুর সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'দানি এসে গেল, দানি এসে গেল।' যোগেশ্বর ওপারের দিকে তাকাল। কোথায়? কিছুই তো দেখছি না। কি দানির কথা বলছে পেলু? পেলু নদীর উজানের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল, 'ঐ কানা, ওদিকে তাকা। কী দেখছিস না? বড় একটা কাঠ ভেসে আসছে দেখতে পাচ্ছিস? প্রথমে আমিই দেখতে পেয়েছি।' পেলু কোমর ঘুরিয়ে নাচতে শুরু করল।

—কাঠ কিন্তু আমার আর বায়নের মধ্যেই ভাগ হবে বলে দিলাম।' পেলু ধুরন্ধর। সে ভাল করেই জানে যোগেশ্বরের সাহায্য ছাড়া কাঠ তীরে আনা তার একার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নয়। সরু পোনা গজগজ করে উঠল, 'ইশ্, নদীতে ভেসে আসা কাঠও তার। দেখলেই তোর হয়ে যাবে নাকি? একা তুলে আনতো দেখি। বায়নকে আবার সঙ্গে জড়াচ্ছিস কেন?'

—'এই শালা জেঠী, বকবক করবি না তো। নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেব।' জেঠী বলতেই সরুপোনা গর্জে উঠল। 'এই জেঠী জেঠী বলবি না বলে দিচ্ছি। শালা মেয়েদের চড় খাওয়া। ও আমাকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলবে। সাহস থাকলে শরীরে হাত দিয়ে দেখ।' সরুপোনা ততক্ষণে ক্যারাটের পোজ নিয়েছে। নিজের চারপাশে ঘুরে গিয়ে সে একটা কিকও মেরেছিল। ভাগ্য ভাল পেলুর গায়ে লাগল না।

যোগেশ্বরের ধমক খেয়ে দুজনেই চুপ মেরে গেল। বহুদূর থেকে ভেসে আসা কাঠের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'ওটা কি সত্যি সত্যিই কাঠ? অন্য কিছু বলেই মনে হচ্ছে যেন।'

-- 'কাঠ না হয়ে কি আর হবে? বড় কাঠ, কাছে এলেই বুঝতে পারবি।' কাঠ মনে করা জিনিসটাকে নদীর স্রোত তীরে ঠেলে নিয়ে এলো। তারা দেখল ওটা কাঠ নয়। একটা জ্যাকেট। জলে ভেসে আসা একটা চামড়ার দামী জ্যাকেট। যোগেশ্বর কালবিলম্ব না করে জলে ঝাঁপ দিল। কিছুটা সাঁতরে গিয়ে জ্যাকেটটা ধরে টান মারতেই সে চমকে উঠে চিৎকার করে উঠল, 'জ্যাকেটটার নিচে একটা মৃতদেহ আটকে রয়েছে, কি করব? এই কি করব? তাড়াতাড়ি বল।'

পেলু তীর থেকে চিৎকার করে উঠল, 'খবরদার। ছেড়ে দিস না বায়ন। আজ দানিয়েই দানি। ওটাকে পারে টেনে নিয়ে আয়, ঐ বায়ন।' তার নির্দেশক্রমে যোগেশ্বর জ্যাকেটটা ধরে মৃতদেহটা ধীরে ধীরে পাড়ে টেনে আনল। মৃতের মাথাটা সহ শরীরটা বালির উপর টেনে তুলল। পা দুটি জলের নিচেই ডুবে রইল। একটা যুবকের মৃতদেহ। শক্ত, ফর্সা, সুন্দর। মুখটা দাড়িতে আবৃত। হাত পা গুলি ইতিমধ্যেই শক্ত হয়ে পড়েছে। মৃতদেহটা যদিও ফুলে উঠেছে তবে এখনও গন্ধ ছড়াতে শুরু করেনি।

মৃতদেহটা দেখেই মেয়েরা আকাশ ফাটা চিৎকার করে বাড়ির দিকে দৌড় লাগাচ্ছিল। যোগেশ্বর হাতে একটা লাঠি নিয়ে তাদের ধমক দিয়ে ফিরিয়ে আনল ঃ 'কেউ যেতে পারবি না। একজন গিয়ে দেখ তো দেখি, পিঠে এই লাঠিটা ভাঙব।'

মেয়েরা আবার যে যার জায়গায় ফিরে এল। বায়নের আজ যে কালান্তক মূর্তি, কখন যে কি করে তার কোন ঠিক নেই। ভয়ে কাতর মেয়েরা বিহুলভাবে যোগেশ্বর আর পেলুর কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল। যোগেশ্বর জানে- -মেয়েরা গ্রামে ফিরলেই মৃতদেহটার কথা আর গোপন থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জায়গাটা লোকে ভর্তি হয়ে যাবে। তার মধ্যেই হয়তো দুয়েকজন আবার পুলিসে খবর দিতে চলে যাবে।

পেলু যোগেশ্বরের কানে কানে কিছু একটা বলতেই তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পেলু তাকে দরকারী একটা কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। একবছর আগে এই জায়গাতেই এভাবে একটা শবদেহ পারে তুলে আনার পর তার পকেট সার্চ করে রেব খুড়ো পঞ্চাশ টাকার একটা বাণ্ডিল পেয়েছিল। খুড়ো টাকার বাণ্ডিলটা নিজের পকেটে ভরে মৃতদেহটাকে পা দিয়ে জলের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। রেব খুড়ো আর তার সঙ্গী কয়েকজন গ্রামের মধ্যে এক নম্বরের গুণ্ডা। প্রত্যেকেই তাদের ভয় করে। পারে অপেক্ষা করে থাকা বাকি মানুষগুলিকে রেব খুড়ো সাবধানবাণী শোনালেন ঃ 'এ সমস্ত কথা পুলিসকে ঘুণাক্ষরেও জানাস না। জোড়ায় জোড়ায় বেঁধে নিয়ে যাবে। কেউ বলে দিলে ফল ভাল হবে না বললাম।' লোকগুলি ভয়ে পুলিসকে জানাতে সাহস করল না।

আজও যদি এরকম একটা টাকার বাণ্ডিল তারা পেয়ে যায়! এসে গেল দানি। পেলু সত্যি সত্যিই ধুরন্ধর। যোগেশ্বর বেশ সাহসী। সে মৃতদেহটার পাশে গিয়ে জ্যাকেটটা টেনে খুলে নিল। মানুষটার শরীরে মাথায় সেলাই জড়িয়েছিল। মানুষটার কপালের বাঁ দিকটা ভাঙা। সেদিকটা দিয়ে সাদা মগজ বেরিয়ে এসেছে। মেয়েরা ওমা, মাগো বলে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল। ওদের অবস্থা দেখে পেলুর আনন্দের আর সীমা রইল না। সে খিক খিক করে তার স্বাভাবিক হাসিটা মেরে মৃতদেহটার পাশে বসে তার জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে খোঁজ করতে লাগল। বীণারা আর বাকি ছেলেগুলি তাদের কাজ দেখতে লাগল।

যোগেশ্বর তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু পেলি?'

পেলু কোন উত্তর না দিয়ে সাবধানে তার বাঁ হাতটা শবটার শার্টের পকেটে ঢোকাতে গিয়েই চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সে হাতটা বাইরে বের করে আনল। পেলুর হাসি উবে গেল। তার হাতের মুঠিতে একটা বিরাট শামুক। তার হাতে শামুকটা দেখে মেয়েরা ঘৃণায় ছিঃ ছিঃ করে উঠল। পেলু শামুকটা তাদের গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। মেয়েরা ছিঃ বলে দূরে সরে যাওয়ায় শামুকটা বালির উপর পড়ে রইল। লাবণ্য পেলুকে বিভিন্ন বিশেষণযুক্ত গালাগালি দিয়ে চলল।

পেলু যোগেশ্বরকে বলল, 'জ্যাকেটের পকেটে কিছুই পেলাম না বায়ন। শার্টের পকেটেও শুধু শামুক। কি করব।' যোগেশ্বর কিছু একটা বলতে যেতেই পেলু পুনরায় বলল, 'ইশ্, এর বুকটা দেখছি একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। অনেক গুলি লেগেছে। রেব খুড়ো যে মৃতদেহটা পেয়েছিল তার থেকেও বেশি। এটাকে নদীতেই আবার ফেলে দে, বুঝেছিস বায়ন।'

ছেলেমেয়ে প্রত্যেকেই একসঙ্গে বলল, 'ছেড়ে দে বায়ন, ছেড়ে দে।' যোগেশ্বর তাদের কথা না শুনে বলল, 'এটাকে উল্টে দে। প্যান্টের বা্যাক পকেটটা দেখ, তারপর ছেড়ে দিবি।'

যোগেশ্বরের হুকুমে যদু আর ইন্দ্র মৃতদেহটাকে উলটে দিলে তার জিনস্ প্যান্টের ব্যাক পকেট দুটো বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পেলু হাত ঢুকিয়ে দিল।- -'এই যে পেয়ে গেলাম।' প্রত্যেকেই পেলুর দিকে তাকাল। তার হাতে একটা মানি ব্যাগ। যোগেশ্বর থাবা মেরে তার হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নেয়। প্রত্যেকেই যোগেশ্বরকে ঘিরে দাঁড়াল। যোগেশ্বর মানিব্যাগটা চেইনটা খুলে ভেতরে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁটদুটো হতাশায় বেঁকে গেল।---'এতে কিছুই নেই, ধুৎ।' সে ব্যাগটা ফেলে দিতেই তার থেকে একটা ছোট ফটো বেরিয়ে বালির উপর পড়ে গেল। পেলু তাড়াতাড়ি করে ফটোটা বালির উপর থেকে কুড়িয়ে হাত দিয়ে পরিষ্কার করল। ছেলেরা তাকে ঘিরে ধরে উঁকি মেরে ফটোটা দেখার চেষ্টা করল। পেলু খিকখিক করে তার বদমাশি হাসিটা হেসে বলে উঠল, 'এই দেখ লোকটির বউয়ের ফটো।'

ফটোর কথা শুনতেই মেয়েরা কাছে এগিয়ে এল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভয়, ঘৃণা কমে আসছিল। ওরাও ফটোটা ঝুঁকে দেখতে শুরু করল।

---'তোর চোখ দুটি পেলু চোখ নয়'

---'কেন, বউ না হলে কে তবে?'

---'এই বুড়ি মহিলাটি কীভাবে এর বউ হতে পারে?'

এবার যোগেশ্বররাও ভাল করে ফটোটা দেখতে শুরু করল। হ্যাঁ, এটা একটা বয়স্কা মহিলার ফটো বলেই মনে হচ্ছে।

---'ছেলেটির পকেটে এটা কার ফটো হতে পারে তাহলে?'

---'কেন? তার মা'র হতে পারে। আর কার হবে আবার।'

মায়ের। মা'র বলতেই যোগেশ্বর কেমন যেন স্থির হয়ে গেল। সে একবার ফটোটার দিকে, একবার দাড়িতে আবৃত ছেলেটির মুখের দিকে তাকাল। হঠাৎ তার বুকের ভেতরটা একটা কেমন যেন হাহাকারে ভরে গেল। নানা প্রশ্ন তাকে ঘিরে ধরল। কোথাকার মানুষ এটা, কেই বা তাকে এভাবে গুলি করে হত্যা করল, ইশ মা'কে ছেলেটি ভীষণ ভালোবাসে বলে এভাবে মায়ের ফটো বুকপকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। মা'র কথা মনে হলেই বোধহয় ফটো বের করে দেখে নিত। যোগেশ্বর বাকি সবার মুখের দিকে তাকাল। চঞ্চল ছেলেমেয়েগুলিও স্থির চোখে মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এমন কি পেলুও। প্রত্যেকের মুখেই কি যেন এক বিষাদের ভাব ছেয়ে ফেলেছে।

যোগেশ্বর আলগোছে ফটোটা মানিব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে পুনরায় ছেলেটির ব্যাক পকেটে রেখে দিল। তারপর সে মৃতদেহটা টেনে নিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিতে চাইল। পেলু তাকে পুনরায় বাধা দিয়ে বলল, 'একটু দাঁড়া বায়ন কাজ আছে।'

এবার পেলু পুনরায় কি তামাশা খুঁজে পায়? সকলেই পেলুর মুখের দিকে কৌতুহলের দৃষ্টিতে তাকাল।

-'লোকটি দেখতে এত সুন্দর, মনে হয় যেন এক্ষুণি বেঁচে উঠবে। এখনই যেন কথা বলবে। এরকমই মনে হচ্ছে না তোদের?'

বীণাপানি মাঝখান থেকে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। মানুষটা অবিকল আমাদের চন্দ্রকাকুর মত দেখতে।'

সঙ্গে সঙ্গে পেলুর প্রত্যাক্রমণ শুরু হল, ' রাখ রাখ্ তোর চন্দ্রকাকুর কথা। চন্দ্রকাকুকে যেন আমরা কেউ দেখিনি। এই ধবধবে ফর্সা মানুষটিকে সে চন্দ্রকাকু বলতে এসেছে। তোর চন্দ্রকাকু কড়াইর পাছার মতো কালো।'

বীণাপানি সঙ্গে সঙ্গে সাপের মতো ফোঁস করে উঠল, - এই ছেলে কাকুকে এভাবে বলবি না কিন্তু। খুব খারাপ হবে।'

যোগেশ্বর পেলুকে ধমকে উঠল, 'এই তোলন, তুই মেয়েদের সঙ্গে শুধু ঝগড়াই করবি না এটার কোন ব্যবস্থা করবি? আমি কিন্তু শবটাকে জলে ভাসিয়ে দেব।'

'দাঁড়া, একটু অপেক্ষা কর।' বলেই পেলু দৌড়ে গিয়ে একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে আনল। ইন্দ্র তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা দিয়ে কী করবি।'

--'তোরা দেখতে থাক আমি কী করি। তোরা শুধু আমার সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে যাবি।'

যোগেশ্বর বুঝতে পারল পেলুর অভিনব খেলা শুরু হল। সে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা মিলিয়ে যাব। তবে তাতে কী হবে? পেলুর মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর। সে বলল, 'কনক ওঝাকে ঝাড়তে দেখিস নি। আমি কণক ওঝার মতই ওকে ঝাড়ব। ওর মা'কে ডাকব। দেখবি ওর মা এসে উপস্থিত হবেই। মা এসে পড়লেই ও বেঁচে উঠবে। তোরা শুধু আমার সঙ্গে চিৎকার করে গলা মিলিয়ে গেয়ে যাবি।'

পেলুর কথায় বাধা দিয়ে কে একজন বলে উঠল, 'রাখ রাখ, মরা মানুষ আবার কোথাও বেঁচে ওঠে নাকি?'

- 'চুপ।' যোগেশ্বরের ধমক খেয়ে সবাই চুপ করে গেল।

– 'তুই কি করতে চাচ্ছিস তাড়াতাড়ি কর। এই তোরা তোলনের সঙ্গে সঙ্গে তোলন যা গায় তাতে সুর মিলিয়ে যাবি। পেলু আশ্চর্যজনকভাবে গম্ভীর। হাতে তার একটা গাছের পাতা। ভাব-ভঙ্গি কনক ওঝার মতই। সে মৃতদেহটাতে পাতা দিয়ে একটা কোপ বসাল। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিল, 'আমি যেভাবে গাইব ঠিক সেভাবে গাইবি। দেখবি, ও বেঁচে উঠবে।' পেলুর কথায় গভীর আত্মবিশ্বাসের সুর। তার কথায় বাকিদেরও বিশ্বাস হল। বোধহয় কিছু একটা হবে। বিশেষ করে যোগেশ্বরের। সে তীব্র দৃষ্টিতে পেলুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। প্রত্যেকেই ধ্বনি দেবার জন্যে তৈরী হয়ে রইল। পেলু ছন্দ মিলিয়ে ধ্বনি দিতেই ওরা আনন্দে উন্মাদ হয়ে যায়। ধ্বনির সুরে সুরে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ছন্দায়িত হয়। সুরের লহরে লহরে ওরা আত্মহারা হয়ে নাচতে থাকে। ওদের ধ্বনির ছন্দে আজ যদি মরা মানুষটি বেঁচে ওঠে!

পেলু শবের গায়ে গাছের পাতাটা দিয়ে কোপ মারতে মারতে গাইতে লাগল, 'মা ও মা। বাকি কয়জনও তার সঙ্গে সমান জোরে সুর মিলিয়ে গাইতে লাগল ঃ 'মা ও মা।'

পেলু পুনরায় গাইল, 'মা ও মা। এদিকে আয় তোর ছেলে শুয়ে আছে একবার এসে দেখে যা। বাকিরাও সমস্বরে গাইল, 'মা ও মা। এদিকে আয় তোর ছেলে শুয়ে আছে একবার এসে দেখে যা।' পেলু দ্বিগুণ উৎসাহে গাইতে লাগল, 'মা ও মা বুক ভরে তাকিয়ে দেখ মা। যুবক ছেলে ডাকছে তাড়াতাড়ি আয়.....'

প্রত্যেকেই দ্বিগুণ জোরে পেলুর সুবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। যোগেশ্বর কোন কথা বলছে না। সে স্থির দৃষ্টিতে মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখ দুটো তার জলে ভরে উঠেছে। বুকটা কে যেন মুচড়ে চলেছে। ধ্বনি দিতে থাকা পেলুর গলার স্বরটাও আবেগ বিহ্বল। তার দুই গাল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে চলেছে। ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকেই ফুঁপিয়ে চলেছে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্নশিবি নদীটাও যেন কেঁদে চলেছে ...... মা ও মা।'

পেলুর শরীরে দেবতা ভর করেছে। গাছের পাতাটা নেড়ে নেড়ে সে নেচে নেচে গেয়ে চলেছে.....'মা ও মা। তাড়াতাডি আয়। নদীব পারে শুয়ে আছি একবার এসে দেখে যা।'

যোগেশ্বরের মনে হল সেও যেন গুলি খেয়ে মবে গেছে। নদীর পারে তার মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে। তার মা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে নদীর পারে আসছে। যোগেশ্বর আবছা ভাবে দেখতে পাচ্ছে তাব মায়ের সঙ্গে তোলন, ইন্দ্র, যদু, বীণাপানি, মামণিদেব মায়েরাও নদীর পারে দৌডে আসছে। তাবা মৃতদেহটাকে আলগোছে তুলে ধরেছে। তার মায়েব কোলে শবের মাথাটা। মা আলতো করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

পেলুর কথাই ঠিক। তাদের গানের সুবে শবের মুখের উজ্জ্বলতা বাড়ছে। দাড়িব জঙ্গল ভেদ করে চোখদুটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ও হাসছে। ও হাসছে। ও . . . ও .....এখনই উঠে বসবে। যোগেশ্বর উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠল, 'তোলন তুই চালিয়ে যা। তুই গাইতে থাক ও বেঁচে উঠছে!

আর ঠিক তখনই যুবকটির বুক থেকে ছাড়িয়ে এনে বালির উপর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া শামুকটা সকলের অলক্ষিতে ধীরে ধীরে বালিব উপর দিয়ে চলতে শুরু করেছে।

ক্লেপ

তপন দাস

—কী দেখছিস? খৈনি মারতে মারতে ওর লাইফলাইন মুছে গেছে দোস্ত। পুলপুলি মজা করল। বুদ্ধ মগ্ন অমিতাভের হস্তরেখায়। অমিতাভ বর্মন নতুন এসেছে এখানে। এম.এ পড়ছে। একটা ম্যাগাজিনের সঙ্গেও জড়িত। ছেলেটি লম্বা। কাপড়-চোপড়ে ফিটফাট। চশমা পরে। একজন ব্যাঙ্ক কর্মচারীর সঙ্গে শেয়ার করে ভাড়াঘরে রয়েছে।

বুদ্ধরা এখানকার পুরনো লোক। প্রভাবশালী। সে নিজে কিন্তু অকর্মা। দেখতে বেঁটেখাটো, বুদ্ধিতে কিন্তু মামা। এক জায়গাতে বসে থেকেই অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু পরিকল্পনা করে যে কোন মুহূর্তে যার তার পানীয় জলের পুষ্করিনীতে বিষ ঢেলে দিতে পারে। একবার অঞ্চলটির চারজন পূজারী বামুনকে গৃহিনীসমেত মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দিয়েছিল—দশমাথা রাবণের পুষ্পক রথ দেখার জন্য। এহেন বুদ্ধ বৈশ্যের ঘরের পুরনো অংশটিতে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে অমিতাভরা। বি.কম পাশ করে বসে রয়েছে বুদ্ধ। বাবার অপর্যাপ্ত সম্পত্তি। একটাই মাত্র ছেলে। আলসেমি কমানোর জন্য তার বিয়ে দেবার আয়োজন করছে ঘরের সবাই মিলে। সম্প্রতি সে অ্যাস্ট্রোলজি পড়া শুরু করেছে। এই মাসের শেষের দিকেই তার বিয়ে।

পুলপুলি নামের ছেলেটি পাঞ্জাবী। বুদ্ধের বন্ধু। আঁটোসাটো দেহ, মাঝারি উচ্চতা। বাবার গ্যারেজ আছে। এখন সে-ই সমস্ত কিছু দেখাশোনা করে, বাপ বুড়ো হয়েছে। বুদ্ধ সবসময় সকালবেলা পেটপুরে খেয়ে এসে তার গ্যারেজের একটা টুলে বসে পড়ে, পুলপুলি গাড়ির নীচে ঢুকে কাজ করতে থাকলেও বুদ্ধের লেকচারের ভাগ নিতে হয়।

গল্পের আরম্ভের সময়টা সকাল দশটা। কাতি বিহুর বন্ধ। পুলপুলির গ্যারেজ খোলা। সেখানে আড্ডা মারছে বুদ্ধ, অমিতাভ আর পুলপুলি।

বিয়ার খাওয়াবি?—অমিতাভের হাতের দিকে তাকিয়েই বলে বুদ্ধ। অমিতাভের চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

মযনা, ইন্টারেস্টিং জিনিস পেয়েছি।

- কী? —এইবার অমিতাভ জিজ্ঞেস করে।

- আগে বল খাওয়াবি কি না।

- পয়সা নেই ......।

--পয়সা আমি দিচ্ছি ভাই– যা নিয়ে আয়। মানিব্যাগটা বার করে বুদ্ধ। পুলপুলি কথা· গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। হাত থেকে বিয়ার। বিয়ার থেকে জিপ। জিপ থেকে জোরাবাট। বুদ্ধকে বিশ্বাস নেই।

-বুদ্ধ, বাবা আসতে পারে। সতর্ক করে দেয় পুলপুলি।

—দোস্ত। আমি বিয়ার খেয়ে তোর জিপ চাইতে যাব না, হলো তো?—বুদ্ধ তিনটে বিয়ারের পয়সা দেয় অমিতাভকে। অমিতাভ উঠে দাঁড়ায়। সামনেই একটা বিয়ার বুথ রয়েছে। আসাম ট্রাঙ্ক রোডের দু'পাশে এই অঞ্চলটা জুড়ে অসংখ্য স্কুটার আর মোটরের গ্যারেজ, তাই বিয়ারের ব্যবসাটা ভালই জমছে।

—হাতে কী লেখা রয়েছে বললে না তো—অমিতাভ যাবার আগে উৎসুকতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

ফ্রেণ্ডশিপ করার এক মাস হতে চলল, এখনও তুমি তুমি চালাচ্ছো। গালি দিয়ে খিকখিক করে হেসে সিগারেট জ্বালাল বুদ্ধ। তারপর বলল, 'তোর ভাগ্যে আর্টিস্ট বউ রয়েছে মইনা, ফিল্ম অ্যাকট্রেসও পেয়ে যেতে পারিস'—এই বলেই আবার হাসতে শুরু করল। পুলপুলি বুঝতে পারল বুদ্ধের হাতে এই নিরীহ ছেলেটির ভোগদশা রয়েছে।

তাড়াতাড়ি করে বিয়ার বুথের দিকে এগিয়ে গেল অমিতাভ বর্মন। 'ছেলেটিকে দেখতে স্মার্ট বলেই মনে হয়, তবে লাজুক, ইনট্রোভার্ট। ছেলেটিকে বোকার মতো দেখতে কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুব চালাক।' রাস্তা পার হতে থাকা অমিতাভের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করে পুলপুলি। আসলে পরিচিত হবার পর থেকেই বুদ্ধ ছেলেটিকে ক্ষেপাতে থাকায় তার খারাপ লেগেছে। বুদ্ধকে তো আর সোজা কথায় বলা যাবে না, তাই মন্তব্যটা করে সে বুদ্ধকে ইনডাইরেক্টলি বলল যে অমিতাভকে এভাবে ডিসটার্ব করাটা তার ঠিক হয় নি। মজাটা বুঝতে না পেরে কখনও চেপে ধরতে পারে। চেহারাটাও বেশ লম্বা চওড়া।

—দুর ভাগ, ওটা একটা আলু হয় বে।—বুদ্ধের মন্তব্য।

—এভাবে বলিস না বে। এত তাড়াতাড়ি মানুষকে বোঝা যায় না।—পুলপুলি বিরোধিতা করল।

—তাহলে কি ও দারা সিং?

—না।

—তবে কী? চার্লস শোভরাজ?

—না বে, আমি ......

– আরে রেখে দে। ওটাকে ফিট করতে আমার দু'মিনিটও লাগবে না। দৌড়ে পালাবার পথ পাবে না এখান থেকে।

- কি করবি? ভাড়াঘর থেকে তাড়িয়ে দিবি?

না। ওরকম মেয়েদের কাজ বুদ্ধ বৈশ্য করে না।

-তাহলে তোর সিস্টারের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে ধোলাই দিবি? পুলপুলির মুখ ফসকে কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে গেল। বুদ্ধ নীরব হয়ে গেল। বোনেদের নিয়ে অঞ্চলটিতে অনেক ধরণের নাটক হয়েছে। বুদ্ধের কাছে এই প্রসঙ্গটাই বিপজ্জনক। বুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ফুলো ফুলো গাল দুটো লাল হয়ে উঠেছে। নীরবে সিগারেটটিতে লম্বা লম্বা টান দিয়ে চলেছে। চোখ দুটি স্থির হয়ে রয়েছে পুলপুলির পাগড়িতে। কিছু একটা মনস্থির করে নিল বুদ্ধ।

-তুম যো বোলা না পুলপুলি, এইসা কুছ নেহী করেগা বুদ্ধ বৈশ্য. উসকা বালতক ভী নহী ছুঁয়েগা। লেকিন এক মহিনে কে অন্দর ও ফুটেগা ইহাসে।- কথাটা একটা একটা করে বলল বুদ্ধ।

-বা বা তু তো সালিম জাভেদ বন গযা র‍্যায়- -ক্যায়া ডায়লগ হায় বে।- -হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল পুলপুলি। বুদ্ধর হাতটা রাগে নিশপিশ করতে লাগল।

- -আবে সর্দারজী তুই আমাকে চ্যালেঞ্জ করছিস?

- যা যা তোর ভাড়াঘরেই তো থাকে।

---সোজসুজি বল, তুই আমাকে চ্যালেঞ্জ করছিস তো?

ধুৎ। তুই যেখানে সেখানে লাগালাগি করিস বে। হাঃ হাঃ হাঃ......।

- লাগি না। যেখানে সেখানে আমি লাগতে যাই না। কিন্তু আমার ইজ্জতে যখন লাগে, তখন ছেড়ে কথা বলি না- -পুলপুলি যতই হালকা ভাবে হাসতে লাগল, বুদ্ধ ততটাই সিরিয়াস হয়ে লাল হয়ে উঠতে লাগল। সে পুলপুলির দাড়িতে আবৃত মুখটা একটানে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল....

-বল, তুই আমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করছিস? চোখে চোখ রেখে বুদ্ধ জিজ্ঞেস করল।

-আরে যা, করছি যা, করছি। তোকে চ্যালেঞ্জ করছি। হল তো। দাড়ি ছেড়ে দে।-- পুলপুলিরও চট করে রাগ উঠে গেল।

--ছাড়ব না। বোল ক্যা চ্যালেঞ্জ দিয়া হ্যায়।

ফাজলামি করিস না বুদ্ধ।

-করছি না, বল। কী চ্যালেঞ্জ করছিস।

-আরে যা। এক মাসের মধ্যে ঝগড়া না করে ওকে এখান থেকে তাড়াতে পারলে আমার জীপটা তুই নিয়ে নিস বুদ্ধ।---রাদের চোটে থুর্তনি থেকে বুদ্ধের হাতটা ছাড়িয়ে নিল পুলপুলি।

---কসম?

--আমার পাগড়িতে লাথি মারিস। আর যদি না পারিস?

- -হনিমুনে বৌয়ের সঙ্গে তোকেও নিয়ে যাব। হলো তো?

--বাজি।

---বাজি।

হঠাৎ ঘটে গেল কাণ্ডটা। জেদ ধরে রইল দুই বন্ধু। পুলপুলি জেদি ছেলে, বুদ্ধ তো বুদ্ধই।

তখনই দেখা গেল অমিতাভ রাস্তা পার হতে চলেছে। নিউজ পেপারে মোড়া বিযারের বোতল তিনটে বুকে চেপে ধরেছে দু'হাতে। সামনে আসতেই বুদ্ধ তার দিকে তাকাল।

-- ওটা নেই।- - অমিতাভ বলল।

--হাতের দিকে তাকাল বুদ্ধ।

---এটা দিয়েছে, ভাল। --অমিতাভ বলল। সে খায় না আর ভাল করে জানেও না কোনটা বিয়ার। বুদ্ধ কাগজটা ফাঁক করে দেখে বলল, চলবে।

---ম্যাটাডোরের ভেতরে বসে যা।---গাড়ির পাশ থেকে গভীর সুরে বলল পুলপুলি। বোতল তিনটা নিয়ে একটা ভাঙা বডির মেটাডরের পেছনের সীটে গিয়ে বসল বুদ্ধ। অমিতাভ গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে খৈনি ডলতে ডলতে আগ্রহের সঙ্গে রাস্তার দিকে দেখতে লাগল।

রাস্তার ওপাশে একটা রেস্টুরেন্ট। তার সামনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড়। ওরা হাততালি দিচ্ছে আর হাসতে হাসতে পালাচ্ছে। ছেলেগুলির আগে আগে একটা কুঁজো লোক জলের ভার নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকবারই হাতে তালি দেবার সঙ্গে সঙ্গে কুঁজো লোকটি জলের ভারটা নামিয়ে রাখছে আর অকথ্য ভাষায় ছেলেমেয়েগুলিকে গালিগালাজ করছে। পাশের পানদোকানী, রেস্টুরেন্টের বয় একটা দুটোও যোগ দিয়েছে। রাস্তার মানুষ মজা লুটছে।

অমিতাভ গ্যারেজের সামনে থেকে ম্যাটাডরের কাছে এল। দেখল বুদ্ধ প্রথম বোতলটা শেষ করে দ্বিতীয় বোতলটার মুখটা দাঁত দিয়ে খোলার চেষ্টা করছে। সে পুলপুলির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

-- পাগল নাকি---অমিতাভ জিজ্ঞেস করল। পুলপুলি বুঝতে পারল না। জলের ভার নিয়ে যাওয়া লোকটার কথা বলল অমিতাভ।

---ও বঙ্কু। ওকে দেখে হাততালি দিলে ক্ষেপে যায়।- -পুলপুলি বলল।

---বংকু আসছে। তার পেছন পেছন ছেলেমেয়েরা। ওরা হাততালি দিচ্ছে। বংকু অপেক্ষা করছে, ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, গামছার সামনের দিকটা তুলে ধরছে, আর গালি। ছেলেমেয়েদের ভীষণ ফূর্তি। আবার হাততালি দিচ্ছে। বংকু অপেক্ষা করছে, ঘুরছে, তুলে ধরছে আর গালি। হাততালি, গালি, বংকু আসছে। কাণ্ডটা দেখে অমিতাভও বেশ মজা পেল।

বংকু গ্যারেজের পাশের পথটা দিয়ে ঘরে যাবে। এদিকেই আসছে সে। হাতে জলের টিন নিয়ে যাওয়ার শুধু বাঁশটা। ছেলেমেয়েরা কিছুটা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে। গ্যারেজের পাশে এসে পৌছাল বংকু। হঠাৎ কী যে মনে হলো অমিতাভের, হাততালি বাজিয়ে দিল - 'এই বংকু ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ.....'

---শালা কে বে ওটা.....বংকু মন খুলে গালাগাল দিতে আরম্ভ করল। বংকু গালাগালি শেষ করে চলে যেতে চাইলেই অমিতাভ পুনরায় শুরু করল —

- ঐ বংকু, ঐ বংকু ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ। হাততালি দিতে শুরু করল অমিতাভ।

-- ঐ শালা হারামজাদা তোর গায়ে পোকা পড়বে.........।

বংকু পুনরায় গালিগালাজ শুরু করল। ইতিমধ্যে ছোট ছেলেমেয়েরাও যোগ দিয়েছে। সবাই মিলে এবার হাততালি দিতে শুরু করল। বংকু দূর থেকে আকাশ ফাটিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দিতে শুরু করল। সঙ্গে শারীরিক অঙ্গভঙ্গী। এ সমস্ত দেখে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অমিতাভেরও আনন্দের আর সীমা নেই। অমিতাভ হাততালি দিচ্ছে আর হো হো করে হাসছে। মেটাডরের ভেতর থেকে ব্যাপারটা বুদ্ধ লক্ষ্য করছিল।

হঠাৎ সে বিয়ারের বোতলটা রেখে লাফ দিয়ে নেমে এলো।

---এখনও বাচ্চা রয়েছিস বে। হাততালি দিয়ে রাস্তার পাগলকে ক্ষেপাচ্ছিস।.....এই বলে আরও কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল বুদ্ধ। সে একটা কথা এইমাত্র লক্ষ্য করল যে অমিতাভ বাঁওয়া। তাই অমিতাভের হাততালি দেবার কায়দাটাও একটু আলাদা। ডানহাতটা ছোটবেলায় ভেঙেছিল বোধহয়, কিছুটা বাঁকা। তার ফলে হাততালি দেবার সময় বাঁ-হাতটা বাঁকা করে পেতে তার উপরে ডানহাত দিয়ে বাজিয়ে শব্দ করে। মনে হচ্ছে, যেন খৈনি মারছে।

—হিঃ হিঃ হিঃ—আরে এ তো দেখাচ্ছ অমিতাভ বচ্চন বে। লেফট হ্যাণ্ডেড। আরে সিংজী দেখ বে দেখ--ঐ বংকু ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ--এই বলে অমিতাভ বংকুকে ক্ষ্যাপানোর ভঙ্গীটা নকল করে দেখাতে শুরু করে। পুলপুলি গাড়ির নিচ থেকে মাথা বের করে দেখতে থাকে।

—ঐ বংকু, ঐ বংকু ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ। --হাততালি দিতে দিতে বৃদ্ধ অমিতাভের চারদিকে লাফাতে শুরু রে।

— শালা বিয়ার খেয়ে নাচ দেখাচ্ছিস।--মুখে বিড়বিড় করে পুলপুলি পুনরায় গাড়ির নিচে অদৃশ্য হয়ে যায়। বৃদ্ধ ক্ষেপাচ্ছে অমিতাভকে। ব্যাপারটাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বেশ মজা পেয়েছে। কারণ তাদের আগের স্ফূর্তির উৎসটা আর নেই। বংকু গালি দিতে দিতে চলে গেছে। প্রথমদিকে ছেলেমেয়েরা বড় বড চোখ করে দেখছিল। একটা সময়ে ফিঁচিক ফাচাক করে হাসতে লাগল। তারপর এক মুহূর্তের মধ্যেই তাদের প্রত্যেকের হাসি মিলিতভাবে ধ্বনি তুলল। অমিতাভ হাসির পাত্র হয়ে উঠল। অমিতাভ প্রথমে খিকখিক করে হাসছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তার মুখের রঙ পরিবর্তিত হতে লাগল। হাসবে না রাগ করবে, কাঁদবে না নির্বিকার থাকবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে, মুখ দিয়ে শুধু বৃদ্ধকে ধ্যেৎ ধ্যেৎ করল।

বেশি হাল্লা করে বে।—পুলপুলি বিড়বিড় কবল। অমিতাভ কোন মন্তব্য কবল না।

—বিয়ার খাবি নাকি আনাই।—অমিতাভ জিজ্ঞেস কবল।

-ভাল ছেলে। আবে চিঁডিয়া টিঁড়িয়া কিছু ফাঁসিয়েছিস—একটা বাঁকা হাসি হাসল পুলপুলি।

—ধেৎ।—অমিতাভ লজ্জিত হাসি হাসল।

—কী ধেৎ বে। দেখতে সুন্দর। না থাকলে একটা ধরে নে। সামনেই রয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ..। পুলপুল অর্থপূর্ণভাবে অট্টহাস্য করল। অমিতাভ লাল-নীল হয়ে উঠল। সে ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছে। পুলপুলি শ্রীদেবীর প্রতি ইঙ্গিত করছে। শ্রীদেবী বৃদ্ধের ছোটবোন। কলেজে পড়ছে। প্রথমদিনেই তার হৃদয়ের তার ছিঁড়ে গেছে। এখন একমাত্র শ্রীদেবীই তাতে জোড়া দিয়ে ঝঙ্কার তুলতে পারে। মোট কথা এই কয়দিনের মধ্যেই অমিতাভ শ্রীদেবীর প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

—ছাড়িস না। কয়েকমাস ট্রাই কর। সহজেই তোর সঙ্গে ঝুলে পড়বে। পুলপুলি অমিতাভের দিকে ঝুঁকে সিরিয়াসলি বলে উঠল। অমিতাভ কিছুক্ষণের জন্য একটা কবুতরের মত পুলপুলির দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠল। পুলপুলি অভয় দান করে মাথা নাড়াল। সিগারেট জ্বালিয়ে গ্যারেজের সামনের দিকে তাকাল পুলপুলি—বৃদ্ধ নেই সেখানে, সে বাইরে গিয়েছে। বাইরে ফুটপাতের উপরে ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ফিসফিস করে কি কথা বলছে। মাঝে মাঝেই সিগারেটে লম্বা টান।

দুপুর বারোটা বাজল। পুলপুলি খাবার খেতে বেরিয়ে গেল। অমিতাভকে পাঠিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ তিন নম্বর বোতলের বাকি বিয়ারটা একবাবে শেষ করল। তারপর পেছন দিকের নালাটায প্রস্রাব করে এল। সবার শেষে সিগারেট একটা জ্বালিয়েপুলপুলির পাশে এসে বলল--

--তুই বাজি রেখেছিস তো একমাসের মধ্যে সে নিজে নিজেই এই জায়গা ছেড়ে পালাবে। আমি কিছুই করব না, ঝগড়া করব না, ঘর থেকে তাড়াব না এবং ভয়ও দেখাব না। বুঝেছিস তো সর্দারজী এই ক্লিপটা মুছে টুছে রাখিস। বৃদ্ধ চ্যালেঞ্জ জানাল।

দু'দিন পার হয়ে গেল। বৃদ্ধ বিয়ের বাজার নিয়ে ব্যস্ত। পুলপুলি ব্যস্ত মোটর গ্যারেজের কাজে। অমিতাভের চলছে দুর্দিন। শ্রীদেবী নেই। সে বাবার সঙ্গে বরপেটা রোডে গেছে। এই মাসের

শেষে বৃদ্ধদাদার বিয়ে। তাই কিছু কেনাকাটা রয়েছে। ভাবে বিভোর অমিতাভ বিকেল বেলা ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরছে। ঘরে ফেরার কোন উৎসাহ নেই। শ্রীদেবীই নেই। অমিতাভের মনে একটা বিষণ্ণ কবিতা লেখার মুড তৈরী হচ্ছে। আপনমনে বিরহর্জনিত এক পুলক উপলব্ধিতে আচ্ছন্ন হয়ে মাথা নিচু করে এগিয়ে যাচ্ছে অমিতাভ। সাদা কাগজে আজ একটা কবিতার জন্ম হবে, যাতে মূর্ত হয়ে উঠবে শ্রীদেবী...শ্রীদেবী...শ্রী ... ঃ ঐ বংকু ঐ বংকু ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ। চমকে উঠল অমিতাভ। ঘুরে তাকাল। একটু দূরেই গুমটি দোকান একটার কাছে ছোট ছোট কয়েকটা ছেলে। একটা বিড়ি টানছে, দুই একজনের হাতে সাইকেলের চাকার রিঙ। ছেলেগুলি আকাশের দিকে তাকিয়ে পরস্পর পরস্পরকে কি যেন দেখাচ্ছে। অমিতাভ আকাশের দিকে তাকাল। কিছুই নেই আকাশে। অন্যান্য দিনের মতই সূর্যাস্ত যাওয়া আকাশ। পুনরায় নিজের মনে মগ্ন হয়ে পথ চলতে লাগল অমিতাভ। এবার একটা শিসের আওয়াজ শোনা গেল। সুই...ই...ই। আবে ঐ বংকু, ঐ বংকু, ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ।

অমিতাভ দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে গুমটির পাশ থেকে ছেলেগুলি দৌড় লাগাল। রাস্তার মাঝখানে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর মাঝরাস্তাতেই লাফাতে লাগল। বাঁকা করে ডানহাতটা পেতে তার উপর বাঁ হাত দিয়ে ক্রেপ ক্রেপ করে হাততালি মেরে অমিতাভকে লক্ষ্য করে চিৎকার করতে লাগল– ঐ বংকু ...... ঐ বংকু ... ।

ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে আধমিনিটের মত সময় লাগল। সে পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারল যে ছেলেগুলি তাকে ক্ষেপাচ্ছে। কান-মাথা গরম হয়ে গেল। রাগে ছেলেগুলির দিকে তেড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে পড়ি কি মরি করে দৌড়। সাইকেলের রিঙ চালাতে চালাতে কিছুক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এটা ছিল কাণ্ডটার শুরু মাত্র। আবার পরের দিন। সকালবেলা ইউনিভার্সিটি বাস স্ট্যাণ্ডে যাবার জন্য বেরিয়ে এসেছে অমিতভ। গুমটি ঘরের পাশে সেই ছেলেগুলি। কার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুজনের হাতে সাইকেলের চাকার রিঙ। একজনের চোখে একজোড়া থ্রি ডি চশমা। ছোটা চেতন' নামের থ্রি ডাইমেনশন সিনেমা চলছে বোধহয়। অমিতাভের চোখে চোখ পড়তেই শয়তান ছেলেগুলি গুমটি ঘরের পেছনে লুকিয়ে পড়ল। অমিতাভ তাদের চিনে ফেলতে পারে বলে ভয় করছে বোধহয়। কোন অসুবিধে ছাড়াই অমিতাভ এগিয়ে যাচ্ছে। গুমটিটা পার হলো নিঃশব্দে। রাস্তাটাও পার হলো। নিঃশব্দে। সিটি বাস স্ট্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে যেতে লাগল। দূরে নীল বাসটা দেখা যাচ্ছে। নিঃশব্দে। বাস সশব্দে এসে থামল। নিঃশব্দ। নিঃশব্দ। অমিতাভ পাদানিতে পা রাখল, ঠিক তখনই ঐ বংকু, ঐ বংকু .....।

বিকেলবেলা। অমিতাভ ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে আসছে। গুমটির এক কোণে শয়তান ছেলেগুলি। কালিতা নামে যুবক ছেলেটির সঙ্গে তারা কথা বলছে। অমিতাভ তাদের দেখতে পায় নি। সাদা চুন ডলতে ডলতে পার হয়ে গেল অমিতাভ। এমন সময়....ঃ ঐ বংকু, ঐ বংকু, ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ। একটা অন্য ধরণের গলার স্বর। তীব্র কম্পনে জ্বর আসা মানুষের মত রাগে পথ থেকে একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল অমিতাভ। দোকানের ভেতর থেকে মাথা বের করে দাঁত বের করে হাসতে থাকা কলিতা দোকানীর মাথাটা পুনরায় সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে গেল। শয়তান ছেলেগুলি এক দৌড়ে গিয়ে আসতে থাকা একটা ঘোড়া গাড়িতে লাফ মেরে উঠে পড়ল। তারপর চলন্ত ঘোড়াগাড়ি থেকে তারা হাততালি দিয়ে গাধার মতো চিৎকার করতে লাগল— ঐ বংকু, ঐ বংকু...। ব্যাপারটা এরপর থেকে ঘনঘন আর যেখানে সেখানে ঘটতে লাগল। সকালে বেরিয়ে যায়

অমিতাভ। মুদির দোকান থেকে শোনা যায়---ঐ বংকু, ঐ বংকু, ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ। অমিতাভ লাল হয়ে ওঠে।

দুপুরে বেরিয়ে যায় দাড়ি কাটতে। লন্ড্রি থেকে শোনা যায়---ঐ বংকু, ঐ বংকু, ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ। অমিতাভ নিজের মনেই বিড়বিড় করে---শুয়োরের বাচ্চা। রাতের বেলা সিনেমা দেখে ফিরে আসে অমিতাভ, পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে বেরিয়ে যায় কে যেন---ঐ বংকু, ঐ বংকু.....। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় অমিতাভের।

মধ্যরাতে গভীর ঘুমে মগ্ন অমিতাভ। হঠাৎ স্বপ্নের মধ্যে চোখের সামনে ভেসে ওঠে থ্রি ডি চশমা পরা শয়তান ছেলেগুলি - ঐ বংকু, ঐ বংকু, ক্রেপ ক্রেপ। প্রচণ্ড চিৎকার করে স্টেনগান দিয়ে গুলি চালিয়ে দেয় অমিতাভ। ধ্যাৎ ধ্যাৎ ধ্যাৎ.... । কী হলো, কী হলো কীভাবে হলো---অমিতাভ কূলকিনারা পায় না। একনাগাড়ে কাণ্ডগুলি ঘটে যেতে থাকে। কিন্তু এরপরেই যা ঘটল তার জন্য অমিতাভ বর্মন মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

সোমবার, সকালবেলা। অমিতাভের ক্লাস সকাল দশটায়। ভাত খেয়ে বেরিয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় পৌঁছেছে মাত্র, তখনই পেছন থেকে কাঁপা কাঁপা স্বরে ভেসে এলো...... ওই-ই লম্বু...ল অম বু উ উ ও ই ই......। অমিতাভের পেছন দিকে বুদ্ধের চার পাঁচ বছরের ভাইপোটা। ছোট্ট শিশুটা তার ছোট ছোট কোমল হাত দিয়ে হাততালি দিতে দিতে চিৎকার করছে। পাশে মুখে হাত চাপা দিয়ে দুইবার বি.এ পরীক্ষায় ফেল করা শ্রীদেবীর দিদি শ্রীলা। অমিতাভ তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীলা লুকিয়ে পড়ল। পার হয়ে গেল কিছুদিন।

বুদ্ধদের ঘরে রঙ করা হল। শ্রীদেবী এসে পড়ল বরপেটা রোড থেকে, রঙীন হয়ে। অমিতাভের হৃদয়ে জন্ম নিল কবিতার সংলাপ -'গোলাপ গোলাপ অনেক সংলাপ।'

অবশেষে সেই দিনটি এসে পড়ল। বিয়ে। বুদ্ধর বিয়ে।

বিয়ের দিন। বিকেলবেলা। সবাই উৎসবমুখর। নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা চলছে। কোলাহলময় বিবাহ বাসর। গেটের সামনে স্কুটার-গাড়িতে হেলান দিয়ে যুবক ছেলেদের হাসি হট্টগোল। প্রৌঢ়দের মৃদু আলাপ। ককাদের হাসির ঝলক বিবাহ মণ্ডপে। যুবতী মেয়েরা বিদ্যুৎগতিতে এখান থেকে ওখানে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ সব কিছুরই মধ্যবিন্দু কিন্তু শ্রীদেবী। পাটের কাপড় পরে সেজেগুজে সে বনফড়িঙের মতো সমস্ত বিবাহ বাসরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অর্থহীন দীর্ঘ বাক্যের মধ্যে যেন একটা যতিচিহ্ন সে, যেই দেখছে একবার করে লম্বা শ্বাস টেনে নিচ্ছে। কিন্তু অমিতাভেরই দুর্ভাগ্য একবারের জন্যও সে শ্রীদেবীর দেখা পায়নি।

অমিতাভও ব্যস্ত। বিয়েবাড়ির অন্দরমহলে খাবার দাবারের দেখাশোনায় ব্যস্ত রয়েছে সে। স্টোররুমের সামনে একটা চেয়ার পেতে বসে রয়েছে সে। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে একেকজন তার কাছে দৌড়ে আসছে আর সে-ও তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বের করে দিচ্ছে।

-- ঐ অমিত। পুলপুলি হাতে একটা প্লাস্টিকের জগ নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল। সে জগটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'জল ভরে দে তো। আর মেয়েরা যেখানে বসেছে সেখানে বয়েল কেকের স্টক কম রয়েছে। একটা ডিবে পাঠিয়ে দিবি তো। কথাটা বলেই তাড়াতাড়ি পুলপুলি চলে গেল। বুদ্ধর ঘরে বসে তারা এখন মৃদুভাবে ড্রিংক করবে। বুদ্ধের কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবরাও এসেছে।

অমিতাভ ভাবল কাউকে ডেকে খাবার জিনিসগুলি পাঠিয়ে দেবে কি না। না কি নিজেই নিয়ে যাবে, কে জানে শ্রীদেবী হয়তো সেখানেই বয়েছে। কিছু বয়েল কেক বাস্কেটে ভরে নিয়ে অমিতাভ চলতে শুরু করল।

হাসিঠাট্টায় মশগুল হয়ে রয়েছে মহিলা মহল। যুবতীদের প্রাণোচ্ছ্বল হাসির কাছে সমস্ত কথা চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু আছে। আছে। শ্রীদেবী আছে। তার গলার স্বরটা অমিতাভ ঠিকই ধরতে পারল। তার বুকটা যেন খালি খালি মনে হতে লাগল। বাস্কেটটা দুহাতে ভাল করে খামচে ধরে লাল হয়ে অমিতাভ ভেতরে ঢুকে গেল। শ্রীদেবীর চোখে চোখ পড়ল। সে যেন উড়তে শুরু করল। তার চোখের সামনে ভাসতে শুরু করল সহস্র যোজন বাগিচা একটা, বিস্তীর্ণ সরষে ফুলের মাঠ, সাগরের ফেনিল তরঙ্গ, অন্তহীন দৈর্ঘের একজোড়া কপৌ ফুল, লক্ষ লক্ষ প্রজাপতি......

—এই, গায়ে প্রজাপতি বসলে কি হয়? দেখল আগের বিশৃঙ্খল পরিবেশটা কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে, তার বদলে যুবতীরা একজন আরেকজনের কানে কানে কি যেন বলাবলি করছে আর তাকে লক্ষ্য করে মৃদুভাবে হাসছে। তারও চোখে পডল একটা প্রজাপতি না মথ যেন তার মাথার উপর দিয়ে চক্রাকারে ঘুরছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার মুখে একটা গৌরবের হাসির ঢেউ খেলে গেল। বিবাহ আসরে হাজারো মানুষ থাকতে একটা মিষ্টি দেখতে প্রজাপতি তার মাথার উপর এসে ঘুরঘুর করছে আর যুবতীরা (শ্রীদেবী নয়তো) তাকে নিয়ে মিষ্টি মধুর ঠাট্টা করছে—'এই, গায়ে প্রজাপতি বসলে কি হয়?'

গৌরবে বুক ফুলিয়ে বয়েল কেকের বাস্কেটটা নিয়ে একটা টেবিলের দিকে হাওয়ায় উড়তে উড়তে চলল সে। মাথার উপর প্রজাপতিটা তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহিলাদের পাশ দিয়ে, যুবতীদের কাছ থেকে এক সম্মানীয় দূরত্ব বজায় রেখে সে হাওয়ায় ভেসে চলল টেবিলটাব দিকে। মাথার উপর তখনও ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছে প্রজাপতিটা।

অমিতাভ বাস্কেটটা আস্তে করে টেবিলে রাখল। প্রজাপতিটা নাচছে।

মুখটা ভাল করে মুছে নিল। প্রজাপতিটা নেমে আসছে।

আস্তে করে শ্রীদেবীর দিকে তাকাল। প্রজাপতিটা বুকের উপর এসে বসল। অমিতাভ বুকের উপর প্রজাপতিটা নিয়েই হাঁটতে শুরু করল—ঠিক তখনই কে যেন আস্তে করে বলে উঠল—বংকু, বংকু, ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ।

প্রজাপতিটা দূরে উড়ে গেল।

শিকড় জন্মানো মানুষের মতো অমিতাভ জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল। সে বাইরে তখনও বেরোয় নি। সাঁৎ করে ঘুরে দেখল। দেখে শ্রীদেবী। শ্রীদেবী তাকে হাততালি দিয়ে ক্ষেপাচ্ছে। অমিতাভের মাথার ভেতর যেন একটা সূর্য ফেটে গেল। সে ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে মৃদু কোলাহল। যুবতীরা হাততালি দিচ্ছে, চিৎকার করছে, সাঁৎ করে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, আবার খিলখিল করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে।

—ঐ বংকু, ঐ বংকু ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ।

—ঐ বংকু, ঐ বংকু ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ।

অমিতাভ স্টোর রুমের কাছে থেকে সরে এলো। নিজের রুমের কাছে পৌঁছে গেল। তার কানে ভেসে আসছে—ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ।

—ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ। তালা খুলে ঘরের ভেতর ঢুকল অমিতাভ। দরজা বন্ধ করল। এখনও শোনা যাচ্ছে।

—ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ।

—ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ। বিছানায় শুয়ে পড়ল হাঁটু দুটো গুটিয়ে বুকের কাছটাতে নিয়ে এলো। কান দুটো দু'হাতে চেপে ধরল। কিন্তু

--ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ।

--ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ।

দশমিনিটের মতো একটুকরো কাঠের মত পড়ে রইল অমিতাভ।

—ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ।.....বিছানার চাদরটা হাতে নিল।

--ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ। সিলিং ফ্যানের নিচে একটা টেবিল এনে তাতে উঠে দাঁড়াল।

—ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ। বিছানার চাদরটা ফ্যানের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে নিজের গলায় পেঁচিয়ে নিল।

—ক্রেপ ক্রেপ ক্রেপ।

টেবিলের উপর থেকে কি জানি কি ভেবে অমিতাভ ঝাঁপ মেরে দিল।

—ক্রেপ।

বুদ্ধ জানতেই পারল না যে অমিতাভ তার বিয়েতে তাকে পুলপুলির জিপটা উপহার দিয়ে গেল। পুলপুলি জানতেই পারল না যে অমিতাভ আর তার গ্যারেজে কোনদিনই আসবে না, সে খোদ বিশ্বকর্মার গ্যারেজে চলে গেছে।

সাইকেলের চাকার রিঙ চালানো থ্রি-ডি চশমা পরা শয়তান ছেলেগুলিও জানতে পারল না যে একটা মানুষকে ক্ষেপানোর জন্য যে তারা প্রতিদিন বুদ্ধের কাছ থেকে সিনেমা দেখার পয়সা পেত, তার সমাপ্তি ঘটল।

একটি গণতান্ত্রিক মৃত্যু

দেবব্রত দাস

আমার কথা

অসংখ্য লোকজন অফিসটিতে। মাঝেমধ্যে আবার তাল্লাশি চালানোর জন্যে এখানে সেখানে পুলিস পাহারা। লোকগুলি হাতে কাগজপত্র নিয়ে এদিক সেদিক যাওযা আসা করছে। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দরকারি কাজ। যেভাবে আমিও একটা দরকারি কাজ হাতে নিয়ে এসেছি। অন্যান্য লোকজনের মতই ব্যগ্রতা এবং উৎকণ্ঠা আমার নিজের মধ্যেও। আমার নামটা নির্বাচনী ভোটের লিস্টে নেই। জিজ্ঞাসাবাদ করে যে অফিসারটি এই কাজ করে তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি আমাকে অনেকক্ষণ দাঁড করিয়ে রাখার পর অন্য একজন কর্মচারীকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই কর্মচারীটিই পুরনো রেকর্ডপত্র রাখে। তাই পুরনো ভোটের লিস্টে আমার নাম আছে কিনা, যদি থাকে কিসের ভিত্তিতে আছে আর যদি না থাকে তাহলে তার আগের লিস্টে আছে কিনা, এই সমস্ত কিছুই দেখে রিপোর্ট করার দায়িত্ব তার। তারপরেই সিদ্ধান্তে আসা হবে আমার নাম এবারের ভোটের লিস্টে আসবে কিনা। কর্মচারীটি আমাকে নির্দেশ দিলেন—আসুন। এদিকে আসুন। তিনি গিয়ে একটা কাগজপত্রে পরিপূর্ণ রেকর্ডরুমে ঢুকলেন। পেছনে আমি। তিনি বললেন, দেখুন তো এত কাজ একা একা করা সম্ভব কি?

এবার তিনি একগাদা কাগজপত্রে পরিপূর্ণ একটা টেবিলের সামনে বসে পড়লেন। বিরাট একটা ফাইল বের করে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে কাগজপত্র খুঁজে দেখতে লাগলেন। তিন চার মিনিট পর আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন – আজ হবে না, বুঝেছেন? আপনি আগামী সোমবারে আসুন।

অন্যের কথা

মলি আমার দিকে মাথা তুলে তাকাল আর চাউমিন খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল—এখনও তুমি কলেজের কথাগুলি ভুলতে পারনি? আমি উত্তর দিলাম---না। কখনও কখনও সুজয়ের কথা মনে পড়ে। সেই যে সুজয় বলেছিল-- লোকসভা বিধানসভা এ সমস্তই হল শুয়োরের খোঁয়াড়। সব ভেঙে চুরে শেষ করে দিতে হবে তবেই মুক্তি আসবে- -মলি আমার কথা শেষ হতে দিল না- সে বলল-- সুজয়, ও সুজয়। বাট হি ইজ এ ক্লোজড চ্যাপ্টার নাউ।

সময় সত্তরের দশক। কলকাতায় তখন আমরা সবাই একসঙ্গে পড়তাম। একই কলেজে। আমার মনে পড়ল মলি তখন ছিল মল্লিকা। সুজয়ের প্রেমিকা। সুজয়রা প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হাতে কলমে নেমে পড়েছিল। নকশালবাড়িতে নয়, গোপীবল্লভপুরে ওরা সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ভারতবর্ষের তথাকথিত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। যে গণতন্ত্রে গরীব দুঃখীর বেঁচে থাকার কোন গ্যারান্টি নেই সেই গণতন্ত্র, সেই শাসনতন্ত্র, নির্বাচন এ সমস্ত কোনকিছুরই দরকার নেই। দরকার গণমুক্তির। দরকার গণযুদ্ধের। দরকার রাইফেল, পাইপগানের। সুজয়রা পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিল। অনেকদিন পুলিসের মার খেয়ে সুজয় একদিন কারাগারেই মরে পড়ে থাকল। মল্লিকার গর্ভে তখন সুজয়ের সন্তান। পেটে পুলিসের বুট জুতোর লাথি খেয়ে সন্তানটাও গর্ভেই মারা গেল। সুজয়দের একটা বংশ পুলিস মিলিটারির দল তিলতিল করে হত্যা আর নির্মম অত্যাচারের দ্বারা ধ্বংস করে ফেলল ধীরে ধীরে। মল্লিকা একদিন মলি রায় হয়ে গেল। ডালহৌসির একটা অফিসের টেলিফোন অপারেটর। একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বৃদ্ধের আশ্রমে থেকে সে পুনরায় একজনকে বিয়ে করেছিল। ডিভোর্স হয়ে গেল। মলি আমার দিকে তাকিয়ে বলল—সুজয়ের বন্ধু পিন্টুকে মনে পড়ে? পিন্টু এখন নামকরা রাজনৈতিক নেতা। জান কি? এবার পিন্টু আমার কনস্টিট্যুয়েন্সি থেকেই নির্বাচন প্রার্থী। সেই দলের প্রার্থী -যে দল একটা সময়ে পিন্টুকে, সুজয়কে আমাদের প্রত্যেকের পেছনেই স্পাই লাগিয়ে দিয়েছিল, গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছিল, সেই দলটির প্রার্থী পিন্টু। ব্যাপারটা হাসি পাবার মত নয় কি? দুটো দশকেই মানুষ কতটা বদলে যায়--পিন্টু এখন কলকাতার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আমরা মলির ফ্ল্যাটে গেলাম। মলির ছেলেটি আমাদের দেখতে পেয়েই ব্যস্ততার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। মলি জানাল ছেলে এম.বি.এ করেও চাকরি পায়নি। আমি অবাক হলাম। আমি শুনেছিলাম এম.বি.এ করলেই নাকি আজকাল অনেক টাকার চাকরি পাওয়া যায়। মলি জানাল—আজকাল এম.বি.এ পাশ করেও দুর্দশা ঘুচছে না। আমরা কথা বলতে বলতেই মলির আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক এসে পৌছলেন। তিনিও কথাবার্তায় অংশগ্রহণ করলেন। আমরা একসঙ্গে চা খেতে লাগলাম। এ সময়েই বাইরের গলিটাতে হুলস্থুলু। কিছুক্ষণ পরে একজন যুবক এসে খবর দিল তাদের ঘরের দেওয়ালে কে যেন নির্বাচনী পোস্টার সেঁটে দিয়ে গেছে। লোকটি ইংরেজীতে একটা অকথ্য গালি মুখে এনে বাইরে দৌড়ে গেলেন। বৃদ্ধ লোকটি চিৎকার করে এখন বাংলায় গালাগালি দিতে শুরু করেছেন - 'শালা বেজন্মার দল, আমার ঘরের দেয়াল নোংরা করতে এসেছিস? এখন কে পয়সা দেবে এ সমস্ত সাফা করার জন্য?'

দেওয়ালে ছেলেগুলি লিখেছে - ইলেকশনকো গুলি মারো। করাপসন পার্টি জয়েন করো। বুড়ো পড়া শেষ করে আমার দিকে তাকাল আর কিছুক্ষণ আগের রাগ ভুলে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। আমিও হাসিতে যোগ দিলাম। নির্বাচন গণতন্ত্র এ সমস্তই আজকাল হাসির কথা হয়ে পড়েছে।

আমার কথা

আমি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের বারান্দার একটি বেঞ্চে বসে রয়েছি। আমার পাশেই রাখা আছে একটা ছোট শ্লেট। শ্লেটে চক পেন্সিল দিয়ে লিখে রাখা আছে একটা নম্বর। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। অবিরাম বৃষ্টি। বৃষ্টিতে সামনের গাছপালাগুলি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমার কাছে এল ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে থাকা যুবকটি। সে বলল—বৃষ্টির ঝাঁকটা আলো কমিয়ে দিয়েছে। এখন ভাল ফটো ওঠানো যাবে না। আপনাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

আমি বেঞ্চে বসেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার ফটো তোলা হবে। ফটোব ওপরে সুপার ইমপোজ করে লিখে দেওয়া হবে শ্লেটের লিখে রাখা নম্বরটা। সেই নম্বরটা ফটো আইডেনটিটি কার্ডে থাকা ফটোর চেহারার পুরুষের ভোটার নম্বরটাকেই বোঝাবে। দেশের বৃহত্তম গণতন্ত্রের একজন নাগরিক থেকে আমার ছবিটা, আমার অবস্থিতিটা, আমার সত্তাটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে একটা সংখ্যা—আমি বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে তারই অপেক্ষায় বসে রইলাম। এই ফটোটা তোলা হলে এই নম্বরটা আমার বলে প্রতিপন্ন হয়ে গেলে আমি একটা অধিকার পাব। দেশে ভোট দেবার অধিকার। দেশের সরকার গঠন করার অধিকার। কিন্তু সেই সরকার আমাদেব ভাত-কাপড় দিতে পারার দায়িত্ব পালন করতে পারবে কিনা আর যদি না-ই পারে তাহলে তাদেরকে আমরা সরকাবের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারব কি না অথবা সেই সরকার লাঠি-গুলি-বেয়নেট দ্বারা আমাদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা হরণ করার চক্রান্ত করলে আমরা তার প্রতিকার হিসেবে কী কবতে পারব, সেই অধিকারগুলি কিন্তু এই ফটো আইডেনটিটি কার্ড আমাদের কখনও দেয় না। তবুও এই ফটোটি, এই নম্বরটা আমাদের প্রয়োজনীয়। কারণ আমি যে এই দেশেরই নাগরিক এই সত্যটা অন্তত আমার নিজের জন্যে একটা প্রবোধের মত সঙ্গে থাকাটা বাঞ্ছনীয়। যুবকটি পুনরায় এগিয়ে এলো। বৃষ্টি কমতে শুরু করেছে। সে বলল—দাদা অল্প হাসুন। ফটোটা ভাল উঠবে।

অন্যের কথা

প্রতিবেশী একজন বন্ধু তিনতলা একটা বাড়ি বানাচ্ছে। আমি খবর করতে গিয়েছিলাম। আজ কাজ বন্ধ। শ্রমিকদের প্রত্যেকেই ছুটি নিয়ে গ্রামে চলে গেছে। বরপেটার পাশের চর অঞ্চলের মুসলমান শ্রমিকরা। বাড়ির আশেপাশে কোন কাজকর্ম থাকে না বলে শীতকালে পুরো দলটাই গুয়াহাটিতে চলে আসে। এখানে সেখানে হাজিরার কাজ করে থাকে। শনিবার-রবিবার বাসে করে গ্রামে চলে যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম আজ তো শনিবার-রবিবার নয়। আজ কেন ওরা ছুটি নিয়েছে? বন্ধুটি উত্তর দিল—আজ ওদের ভোটের ফটো তোলান হবে। এদের আবার ভয়টা বেশি। ফটো না ওঠালে নাকি ভোট দিতে পারবে না। ভোট দিতে না পারলে পুলিস ঝামেলা করবে। সেই ভোটের দিন এগিয়ে আসছে। আড্ডায় আজকাল ভোটেরই কথা। আমাদের আড্ডায় সদস্য সুজন কাকতি একটা জায়গা থেকে সর্বভারতীয় একটা দলের প্রতিনিধি হয়ে নমিনেশন পাবার কথা ছিল। তুমুল প্রতিযোগিতার পরে দলটি অন্য একজন প্রার্থীকে নির্বাচিত করল। কাকতি অধ্যাপক মানুষ। ধন-বল নেই কিন্তু জনবল আছে। অসংখ্য বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিতের দল। তাছাড়া সৎ লোক হিসেবে নিজের অঞ্চলে সুনামও রয়েছে। অপরদিকে অন্যজন ছিলেন একটা ডিপার্টমেন্টের সুপারিন্টেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার। দুর্নীতির মামলায় একবার চাকরি যেতে যেতে বেঁচে গেছেন। কাকতি আমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ ক লেন—দেখছিস দিল্লির হাইকম্যাণ্ড ভেবেছে এ ব্যাটা প্রফেসার টাকা ঢালতে পারবে

না। জিতবে কীভাবে? তাই টিকিটটা ইঞ্জিনিয়ারকে দেওয়াই ভাল হবে। যদি ইলেকশনে জিতে যায় কী হবে বলতো? সারাটা জীবন যে লোকটি করাপশান করে এসেছে দিল্লিতে গিয়েও সে একই করাপশানে জড়িয়ে যাবে। শালা এই হলো দেশের ডেমোক্রেসি, দেশের ইলেকশন প্রসেস। এভাবে আর কী হবে?

আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি দেশের নির্বাচন সমাগত প্রায়। চারপাশে ক্যানভাসিং চলছে—হাতে দিন। হাত হাতি মিথ্যে কথা, সাইকেলে দিন। পদ্মফুলে দিন, কাঁচিতে দিন। দিন দিন। মোটকথা দিন।

অন্যদিকে হয়তো রিগিং চলবে। এদিকে হয়তো বোমা-বারুদ চলবে। কোনদিকে হত্যা সন্ত্রাস তার মধ্য দিয়েই একটা সরকার গঠিত হবে। জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। নতুন মন্ত্রী আমলারা নতুন শাসনভার নেবে। নতুন প্রতিশ্রুতি নতুন অঙ্গীকার। ঠিক আগের মতই। পাঁচবছর পরে পুনরায় নির্বাচন হবে। যদি মাঝখানে কোন অঘটন না ঘটে। ঘটবে কি?

আমার কথা

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে একটা সময় আমি বুথের ভেতরে ঢুকলাম। একদিকে নির্বাচনী অফিসার, অন্যদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক। আমি নির্বাচনী অফিসার থেকে ভোটের পত্রটি নিলাম। সমর্থক প্রতিনিধি প্রত্যেকেই আমার দিকে আশা করে তাকিয়ে রয়েছে। প্রত্যেকেই ভাবছে আমি তার দলকেই ভোট দেব। প্রতিটি দলের প্রতিনিধিই ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। আমি এখন কাকে ভোট দেব? এই ছবিটাতে দেব না অন্য ছবিতে দেব। আমি কী করব? না, এই ভোটটা কাস্ট করার ফলে কারো কোন লাভ হবে কি? আমি বুথে গিয়ে স্ট্যাম্পটা হাতে নিয়ে পুনরায় ভাবলাম। সৃজয়রা কী বলেছিল গণতন্ত্র, নির্বাচন এই সমস্তই ভূয়া। এসবের দ্বারা সাধারণ মানুষের কখনও লাভ হবে না। আমার মনে হল আমার হাতে একটা রাবার স্ট্যাম্প নয়, একটা মুক্ত ড্যাগার। সামনের এটা ভোটের পত্র নয়। এটা সুজয়ের মুখ। আমি জেনেশুনে পুনরায় সুজয়ের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হব কিনা। আমি আজ ভোট দেব না। আমি এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যাব। আমি চিৎকার করে বলব—ভূয়া। এ সবই ভূয়া। আমি ভোটে বিশ্বাস করি না। আমি এই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি না।

আমি জানি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লোকগুলি ঘিরে ধরবে। পুলিস ঘিরে ধরবে। বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা আমাকে শত্রু বলে গণ্য করে আমার দিকে ধেয়ে আসবে। পুলিসরা আমাকে লাঠি দিয়ে পেটাবে। দেশদ্রোহী বা পাগল সাজিয়ে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাবে। আমাকে হয়তো যুগযুগ ধরে লকআপে বা পাগলা গারদে বন্দী করে রাখবে। কিন্তু তা বলে আসল সত্যটা কী আমার থেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে? আমি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলাম। ঠিক হবে কি এভাবে একটা হুলুস্থুলু সৃষ্টি করা? আমি কি নিজেকে এরকম একটা অ্যাডভেঞ্চারের জন্য সত্যি সত্যিই প্রস্তুত করে তুলতে পেরেছি? আমার মনে পড়ল গতকাল বিকেলে কোন দলের প্রার্থী এসেছিল। তিনিও কি আমাকে প্রলোভন দিয়েছিলেন না আমার প্রমোশন আর ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করে দেওয়ার? তিনি বলেছিলেন এমন এক জায়গায় আপনাকে ট্রান্সফার করিয়ে দেব যেখানে আপনি শুধু বসে থাকলেই হল। উপরি রোজগার আপনার পেছন পেছন ছুটে এসে আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আমি আবার পত্রটার দিকে তাকালাম। সেই লোকটির নাম আর চিহ্ন খুঁজতে লাগলাম। আমি বোধহয় ইতিমধ্যে প্রবলভাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি। জয় হিন্দ।

সন্তানের সন্ধানে একজন জননী

নিরুপমা বরগোহাঞি

মামী, রুম্পাকে আপনার কাছে রেখে যাই, "পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা মণিকা এসে শান্তিকে জিজ্ঞেস করল।

শান্তি তখন সোফাসেট এবং বুককেসের ধুলো ঝাড়ছিল। বুককেসের ওপর নানা ধরণের সাজানো বস্তু তার মধ্যে দুই একটা অসাবধান হলে ভেঙ্গে যেতে পারে, যেমন দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে গিয়ে কিনে আনা কালো মাটির গণেশের মূর্তি, রাজস্থানে বেড়াতে গিয়ে কিনে আনা ব্ল পটারিজের জিনিসপত্র, কলকাতা বেড়াতে গিয়ে কিনে আনা কৃষ্ণনগরের মাটির একজোড়া বুড়ো বুড়ি। শান্তি এসমস্ত নিজের হাতেই পরিস্কার করে, কোথাও অসাবধানে ফেলে ভেঙে ফেলবে বলে কাজ করার লোকেদের হাতে দেয় না। আগে অবশ্য দিত, কিন্তু একবার ছোটভাই বিদেশে থেকে এনে দেওয়া মার্বেল পাথরের মাতা মেরী এবং যিশুর মূর্তিটা কাজ করার লোক পরিস্কার করতে গিয়ে ভেঙে ফেলার পর শান্তি আর কাউকে এগুলি মুছতে দেয় না। মার্বেল পাথরের মূর্তিটা ভেঙ্গে ফেলার দুঃখ শান্তি বহুদিন পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি। মূর্তিটা ভেঙ্গেছিলও আশ্চর্যভাবে, মেরির নাকটা ভেঙেছিল, কপালে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু কোলের যিশু একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেছিল। বোধ হয় অনিতা অর্থাৎ কাজ করা মেয়েটির হাত থেকে পড়ার সময় মূর্তির মুখটা আছড়ে পড়েছিল। শান্তির মনে তখন একটা অদ্ভুত ভাবের উদয় হয়েছিল। মেরী নিজের সন্তানকে বাঁচাতে পারল না, সেই দুঃখে ও লজ্জায় নাক কাটা গেল।

শান্তির ঘরের কোন জিনিস সাধারণত ভাঙে না। এবং ঘরের সমস্ত কিছুই যথাযথ অবস্থায় থাকে। তাই ঘরটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিপাটি করে সাজানো গোছানো। একদিন ছোটবোন অর্দি তো বেশ শ্লেষভরা সঙ্গে বলেই বসল, তোরই ভাল দিদি, ছেলে মেয়ে নেই, ঘরটা সুন্দর করে ছবির

মত সাজিয়ে রেখেছিস। আমি তো বাবলার জন্য কোন জিনিস ঠিকভাবে রাখতে পার নি, ওর ভয়ে সাজিয়ে রাখা জিনিসগুলো পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হই। কবে যে ও বড় হবে... শান্তির নিজেকে সেদিন নাক ভাঙা মাতা মেরীর মতোই মনে হচ্ছিল, সে 'বন্ধ্যা' তাই তার লজ্জা এবং দুঃখের সীমা নেই।

মণিকার কথায় শান্তি ধূলো ঝাড়া থেকে বিরত হয়ে ঘুরে তাকিয়ে অল্প একটু হাসল, তুমি রোজ আমাকে, রুম্পাকে রাখার কথা জিজ্ঞেস কর কেন? রেখে তা যাবেই। সারাদিন আমার আর কি কাজ আছে, ওকে রাখতে আমার আর কি কষ্ট হবে?

''না না রুম্পা ভীষণ দুষ্টুমি করে তো, আপনাকে সারাদিনও একটুও বিশ্রাম নিতে দেয় না। কি যে করব, এত খোঁজ করেও একজন ভাল লোক পেলাম না। কোন রকমে রুম্পার তিনবছর হলেও কোন একটা নার্সারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে রক্ষা পাব।

রুম্পা মোটেই উৎপাত করে না, সুন্দরভাবে খেলা করে। খাবার সময়ও বিরক্ত করে না। আমার বোনের ছেলে বাবলা সব সময় এত বায়না করে, অদিতিকে ভাতের থালা নিয়ে তার পেছনে পেছনে দৌড়তে হয়।

এরপর মণিকা রুম্পাকে শান্তির হাতে ছেড়ে দিয়ে তাড়াহুড়ো করে কলেজে চলে গিয়েছিল।

মণিকা কলেজে চাকরি করে. ওর স্বামী ডানলপ কোম্পানিতে চাকরি করে। এই ফ্ল্যাটে ওরা একা থাকে, মণিকার শ্বশুর বাড়ি মঙ্গল দৈ, শ্বশুর শাশুড়ি সেখানেই থাকে। কখনও মণিকা ভাবে, পুরনো কালের মতো শ্বশুর শাশুড়ি সঙ্গে থাকলেই ভাল হতো। কাজ করা মেয়ের দুশ্চিন্তা- বিশেষ করে বান্ধবী জ্যোৎস্নার মুখে কলকাতার কয়েকটি ঘটনা শোনার পর রুপার চিন্তায় মণিকার কলেজে মনই বসে না। জ্যোৎস্না কলকাতায় থাকে। মাঝখানে একবার কলকাতা থেকে গুয়াহাটি আসার পর মণিকার বাড়িতে বেড়াতে এসে রুম্পাকে এক ঘরে কাজের লোকের কাছে ছেড়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তা প্রসঙ্গে জ্যোৎস্না বলেছিল - দেখ, খুব বিশ্বাসী লোক না হলে ছেলেমেয়েকে একা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কলকাতায় কিছুদিন আগে কি ঘটেছিল শুনেছিস? তোর মতোই একজন ছোট মেয়ের মা অফিসে কাজ করে। স্বামী -স্ত্রী কাজে বেড়িয়ে যায়। কিন্তু তাঁদের মনে হলো যে মেয়ে যেন ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। অথচ ওকে তো ভাল জিনিস খাওয়ান হয়। কাজ করা মেয়েটি ওর ভাগেরটা খেয়ে ফেলে নাকি? কিন্তু সেরেল্যাক ইত্যাদিও খেতে যাবেই বা কেন? তাছাড়া ঝি'র খাওয়ার ব্যাপারে তো ওরা কোন রকম কার্পণ্য করে না। নিজেরা যা খায় তাই ওকে দেয় - মাছের টুকরোও সমান ভাগ করে। ভাতও সে এক থালা খায়। কিন্তু এ নিয়ে ওরা কোন দিনই কথা বলে না। সব রকমে সন্তুষ্ট থাকুক ও, তবুও যেন ওদের শিশু কন্যাটির কোন রকম অযত্ন না হয়। শেষ পর্যন্ত ওরা মেয়েটিকে ডাক্তার দেখিয়েছিল এবং ডাক্তার বলেন- কোন কারণে মেয়েটির শরীরে রক্ত বড় কম। তারপর পাশের ফ্ল্যাটের মহিলা একদিন শিশুটির আর্তনাদ শোনে। শেষে মা দুপুরবেলা পরপর দুয়েকদিন পাশের ফ্ল্যাটের এসে লুকিয়ে থেকে শিশুটির চিৎকার শুনে দৌড়ে গিয়ে নিজের কাছে রাখা চাবি দিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দেখে যে একজন লোক শিশুর গা থেকে রক্ত বের করে নিচ্ছে। মেয়েকে নাওয়ানো, খাওয়ানো, কাপড়-চোপড় পরানো, পাউডার মাখানো সবই ওই চৌখস কাজের মেয়েটিই করত, তাই মেয়ের গায়ে ইঞ্জেকসনের কোন দাগ তিনি দেখতে পান নি।.........

জ্যোৎস্না বর্ণিত সমস্ত ঘটনাটির বর্ণনা দিয়ে মণিকা শান্তিকে বলেছিল-মামী. তারপর থেকে আমার মনে আর শান্তি নেই। আমার আগের কাজ করা মেয়ে পুতলি বেশ ভাল ছিল, রুপার জন্মের আগে থেকেই সে আমাদের সঙ্গে ছিল. রুম্পাকে ও সত্যিই ভালবাসত, আমি নিশ্চিত মনে ওর সঙ্গে

রুম্পাকে রেখে কলেজে যেতাম। কিন্তু ওর মা বাবা পুতলীকে বিয়ে দেবার জন্য নিয়ে যাওয়াতেই আমার হাহাকার শুরু হল। দুয়েকজনকে রেখে দেখলাম, একজনও বিশ্বাসযোগ্য নয়, বড় চোর রুম্পাকে যে কি করবে ভগবানই জানে। তবুও জানাশোনা লোকরাই আমাকে অভয় দিয়ে নিজের গ্রাম থেকে এনে দেয় বলেই এতটা ভয় করতম না, কিন্তু একজন সকালবেলা দুধ আনতে গিয়ে পয়সা আর ব্যাগ নিয়ে পালাল, একজনের বাড়ি থেকে বাবা মাসকাবারের টাকা নিতে আসায় কাঁদতে কাঁদতে বাবার সঙ্গে ফিরে গেল। মেয়েটির বাবা এবং আমি নানাভাবে তাকে বুঝিয়েও ফেরাতে পারলাম না। কি যে করি, এই কয়েকদিন রোজই গিয়ে রুম্পাকে মার কাছে রেখে আসছি। এখন বাধ্য হয়ে শাশুড়িকেই কিছুদিনের জন্য আমাদের সঙ্গে থাকতে ডেকে পাঠিয়েছি। ওনার পক্ষে ঘর ছেড়ে আসা সত্যিই মুশকিল। কিন্তু উপায়ও তো নেই, না হলে যে আমাকে চাকরিটাই ছাড়তে হবে। এত পড়াশোনা করে সুবিধেমতো চাকরিটা পেয়েছি, ঘর-সংসার করা মেয়েদের এর চেয়ে সুবিধের চাকরি আর হতে পারে না- এক কথায় কি ভাবে চাকরিটা ছেড়ে দিই বলুনতো মামি?

মণিকাদের পাশের ফ্ল্যাটে আসা শান্তিদের বেশিদিন হয় নি। কিন্তু ওদের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি ঘণিষ্টতা গড়ে উঠেছিল। মণিকা খুব মিশুকে মেয়ে, ও এসে শান্তিকে মাসি বলে সম্বোধন করে আপন করে নিয়েছিল। মণিকা শান্তিকে দিদি না বলে মাসি সম্বোধন করায় শান্তি কিছুটা অবাকই হয়েছিল, তাঁর তো খুব বেশি বয়স হয় নি। মণিকা ওর থেকে খুব বেশি ছোট হবে বলে মনে হয় না। হয়তো নিজের বয়স লুকোনোর নারীসুলভপ্রবণতা এটা, তাঁকে দিদি বলে ডাকলে মণিকার বয়সও বেড়ে যাবে। কিন্তু মণিকা তাকে মাসি বললে কি হবে, ওর মেয়ে কিন্তু তাকে দিদিমা বলে না, মার মতোই মাসি বলে ডাকে। রুম্পা দিদিমা বলে অন্ততঃ তাকে অকালে বুড়ি বানিয়ে দেয় নি। মনে মনেই হাসে শান্তি।

সেদিন শান্তি মণিকাকে প্রস্তাবটা দিয়েছিল- মণিকা তুমিতো রুম্পাকে আমার কাছে রেখে যেতে পার। ও তো আমাকে বেশ সঙ্গ দেয়, আমার সঙ্গে থাকলেও আপত্তি করবে না বলেই মনে হয়। মণিকা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিল। সত্যি? আপনি রুম্পাকে রাখতে পারবেন? এর চেয়ে সুখের কথা তো আর কিছু হতে পারে না- কিন্তু....... মণিকার উজ্জ্বল হয়ে আসা মুখটা মুহূর্তেই ম্লান হয়ে আছে - কিন্তু মাসি, আমার যে এভাবে আপনাকে বিরক্ত করতে খুব খারাপ লাগবে। রুম্পা ভীষণ দুষ্ট, বড় চঞ্চল, আপনাকে যে ও ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। তাছাড়া একদিনের জন্য হলে কথা ছিল- আমি যে মনের মতো কাজের মেয়ে কবে পাব। অবশ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, আমি কলেজের চৌকিদারকে বলে রেখেছি, এমন কি গ্রাম থেকে রোজ ডেলি প্যাসঞ্জারি করা আমার কলিগদেরও বলে রেখেছি। ওএকইভাবে চেষ্টা করে চলেছে, আমার পয়সা বেশি দেব বলেছি। একদিন না একদিন পেয়ে যাব বলে আশায় রয়েছি।

শান্তি প্রায় মাসির অধিকার নিয়েই মণিকাকে মৃদু ভৎসনা করে উঠেছিল--- আঃ মণিকা, একটা সাধারণ কথা দিয়ে তুমি এত কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছ কেন? রুম্পা আর আমাকে কতটুকু বিরক্ত করবে ,দিনটা তো সে শুয়েই কাটায়। ওর খাবারটা তৈরী করে যেও, আমি ওকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখব। তোমার মতো চাকরি তো করি না, দিনটাতে আমার কি আর এমন রাজকার্য থাকে? রুম্পা থাকলে আমার বরং ভালই লাগবে, সময়টাও আনন্দে কেটে যাবে।

মণিকা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, 'আপনি আমাকে বাঁচালেন মাসি। কি বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞত জানাব!' .... যাইহোক, আমি এখন শাশুড়িকে জানিয়ে দেব কি আসতে হবে না বলে?

হ্যাঁ, জানিয়ে দাও। কষ্ট করে ওনার আসার আব কি দরকার। তাড়াতাড়ি জানিয়ে দাও।

এরপর একমাস পার পয়ে গেছে, মণিকা এখনও মনের মতো কাজেব মেয়ে বা রুম্পাকে রাখার মতো মানুষ খুঁজে পায় নি। তাই প্রতিদিনই কলেজে যাবার সময় রুম্পাকে শান্তির কাছে রেখে সসঙ্কোচ মণিকা বলে-রুম্পাকে তাহলে আপনার কাছেই রেখে যাই?........

সেদিনও একইভাবে রুম্পাকে রেখে যাবার সময় মণিকা প্রতিদিন বলা কথা কয়টিই পুনরাবৃত্তি করছিল-রুম্পাকে তাহলে আপনার ....রুম্পা বড দুড়ন্ত. ...... এত চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত .... কোন মতে রুম্পা তিন বছর....... ইত্যাদি ইত্যাদি। আব শান্তি প্রত্যুত্তরে বলছিল...... রুম্পা মোটেই দুরন্ত........ খাওয়ার সময়....... ইত্যাদি ইত্যাদি।

রুম্পাকে রেখে মণিকা কলেজে চলে গিয়েছিল। শান্তিও ধুলো ঝাড়া কাজ বাদ দিয়ে রুম্পাকে আদর করে কোলে তুলে নিল এবং বলল --'রুম্পা আজ তুমি দুষ্টুমি করবে না কিন্তু । কালকে তুমি আমার ভাতের থালায় কিভাবে গোটা নুনের বাটিটা ঢেলে দিয়েছিলে— আমার তো খাওয়াই হলো না। আরও একদিন তুমি আমার থালায় জলের গ্লাসটা উপুড় করে দিয়ে খাওয়া নষ্ট করেছিলে। আমার ভাতের থালায় তোমার এত নজর কেন রুম্পা? নিজে চডাই পাখির মতো খাও আর আমি রাক্ষসের মতো খাই বলে কি? .... কথাগুলি বলে রুম্পার দুই গালে চুমো খেয়ে ওকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল তার আগে একবার দেখে নিল-ফ্ল্যাটের দরজাটা বন্ধ করেছে কিনা। বাইরের জগতের সঙ্গে এই একটি দরজাই সংযোগ রক্ষা করে, এটা বন্ধ কবে দিলেই শান্তি নিশ্চিত কোনো চোর ঢুকতে পারবে না, অবাঞ্ছিত মানুষ ঢুকতে পারবে না , অবাঞ্ছিত মানুষ ঢুকতে পাববে না আর সবচেয়ে বড় কথা রুম্পা তাকে না জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারবে না।

শান্তির কথা রুম্পা যতটুকু বুঝতে পারল, তাতেই তার স্ফূর্তি জেগে উঠল, হেসে হেসে শান্তির কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে বলল-মাসি তুমি ভাত খাবে জল ঢালব, মাসি তুমি পড়বে-আমি বই টানব।

শান্তি ফিক করে হেসে উঠল, দুষ্টু মেয়ে কোথাকার, সব কথা বুঝতে পারে, সব মনে থাকে। নতুন বই একটাও শান্তিতে পড়তে পারে না, হাত থেকে টেনে নেয়। এখন ওঁর এই কথাগুলি মনে পড়েছে— সত্যি সাংঘাতিক মেয়ে, শান্তি রুম্পার ফুলো গাল দুটোতে আবার চুমু খায়। উত্তরে রুম্পা বলে মাসি তুমি খুব ভাল, মা খারাপ, আমি দুষ্টুমি করলেও তুমি মারো না, মা মারে।

শান্তি পুনরায় হাসল,-- দুষ্টুমি করলে এখন থেকে আমিও মাবব। এখন তুমি বিছানায় বসে বসে এই খেলানাগুলো দিয়ে খেলতে থাকো, দুষ্টুমি করবে না, আমি এই কাপড়গুলো ইস্ত্রি করে নিই।

রুম্পা তার সঙ্গে থাকতে শুরু করার পর থেকে শান্তির অবস্থাও প্রায় একজন জননীর মতোই হয়ে পড়েছে। আগে সংসারের কাজ চলত মন্থর গতিতে, বিশেষ করে স্বামী কৈলাশ মহন্ত অফিসে চলে যাওয়ার পর মণিকার সংসারে যেন আর কোন কাজ থাকত না বলে মনে হতো। ধীরে ধীরে এটা সেটা করে তার ঘরে অতি ধীরে ধীরে চলা সময়কে বিকেলেব দিকে ঠেলে দিত। সকালের দিকে অবশ্য তার ঘরেও সময় অত্যন্ত দ্রুত কাটে। স্বামীকে শুধু ভাত ডাল খাইয়ে পাঠানোই নয়, তাকে দুপুরের খাবারেব জন্য টিফিনও বানিয়ে দিতে হয়, মানুষটা বাইরের খাবার খায় না,কাবণ পেটের অসুখে ভোগে। স্বামী চলে যাবার পরই তার বিশ্রাম। তারপর সে ধীরেসুস্থে স্নান করে, খাওয়া দাওয়া করে, খবরের কাগজ চোখ বুলোয়, এবং কিছুক্ষনের জন্য ঘুমিয়ে থাকে। বিকেলে জলপানেরও প্রয়োজন নেই, মহন্ত অফিস তেকে ফিরে এসে চা বিস্কুটের বাইরে কিছুই খায় না। সহজে ''জম করতে পারে না, বিকেলে বেশি করে

খেলে বাতে আর ভাত খেতে পাবে না, তাই তাড়াতাড়ি করে ভাতটাই অল্প করে খেয়ে নেয়। দিনের ডাল বা মাছের তরকারী ফ্রিজে থাকেই, কোন একটা ভাজা আর ভাতটা রেঁধে নিলেই হল-অথবা ভাজা না করে ভাতের সঙ্গে কোন কিছু সেদ্ধ। মহন্ত পেটের গোলমালের জন্য সেদ্ধ জিনিসই বেশি খেতে চায়।

শান্তি কখনও ভাবে - অন্যান্য গৃহিনীদের ছেলেমেয়ে এবং স্বামীর জন্য কত কি সুখাদ্য বানাতে হয, তাকে তো সেরকম কিছুই করতে হয় না। তার নিজের অবশ্য নানা রকম সুখাদ্য খেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পেটের জন্য কার আর এসব বানাতে ইচ্ছে করে। তাছাড়া স্বামী যে সুখাদ্য থেকে বঞ্চিত , সে কিভাবে সেগুলো খায। তাই শান্তি একপ্রকারের গান্ধারীই ।

মন্থর সময় এখন অন্যান্য সংসারের মতো শান্তিব সংসারেও বড় গতিশীল হয়ে উঠেছে। রুম্পা তাঁর সংসারে একেবারে বিপ্লব বাঁধিয়ে দিল। এখন শান্তি ভোরবেলাতেই স্নান করে নেয়, তাই সকাল উঠতে হচ্ছে। পবে কববে বলে কোন কাজ ফেলে রাখতে পারে না, শান্তি মনে মনেই অল্প হাসে, তাঁর অবস্থাও দেখি দশটা সন্তানের জননীর মতোই হল।

ইস্ত্রিটা টেবিলের ওপর থাকে, সেখানে সে ইস্ত্রি করে। রুম্পা যেতে পারবে না। তবুও রুম্পা থাকা অবস্থায় সে ইস্ত্রি করে না, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় স্বামীর সঙ্গে তাঁর একজায়গায় বেড়াতে যাবাব কথা, যে কাপড়টা পড়ে যাবার কথা সেটা কিছুটা ভাঁজ পড়ে রয়েছে— না বেশি সময় লাগবে না — আমাব এখনই হয়ে যাবে রুম্পা! মনে মনে ভাবতে থাকা কথাটার শেষাংশটুকু শান্তির মুখে তাঁব অজ্ঞাতসারেই উচ্চারিত হয়ে গেল।

রুম্পা তখন সামনে নানা ধরনের খেলনা নিয়ে খেলছিল—- সেই খেলনাগুলো শুধুমাত্র মেয়েকে খেলার জন্য কিনে দেয়নি, তাতে শান্তিরও অবদান রয়েছে। আজকাল তার এই একটা নতুন সখ হয়েছে — বাজারে গেলে ফুটপাতে হকার বেলুন বেচতে থাকলে বা অন্য কোন খেলনা বেচতে দেখলে কিছুক্ষন থমকে দাঁড়াবেই, কোন কিছু একটা কিনবেই। স্বামীর সঙ্গে যে প্রায়ই বাজারে যায়, ভিডবাসে যেতে তাব ইচ্ছে করে না, আর রিক্সাওয়ালাগুলো তো যেতেই চায না, তার ওপর কিছুটা ভেতরে এই পাহাড়িয়া উঁচু জায়গাতে রিকসা আসতেই চায় না। স্বামীর স্কুটার রয়েছে, তাই সে স্বামীর সঙ্গে স্কুটারে করে বাজাবে যায়।

শান্তি যখন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রুম্পার জন্য বেলুন বা অন্য খেলনা কেনে, স্বামী কখনও অল্প বিরক্তি প্রকাশ করে এবং তখন শান্তি কিছুটা রুক্ষ স্বরেই বলে, কোন দামী লিওটয় কিনছি না, সাধারণ খেলনাই কিনছি..........

শান্তি ইস্ত্রি করতে রুম্পার নাম উচ্চারণ করায় রুম্পা তাতে সাড়া দিয়ে বিছানা থেকে এক ঝাপ মেরে পিছন থেকে শান্তিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল 'মাসি'।

অতর্কিতে রুম্পা এভাবে ধরায় শান্তি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে রুম্পাকে নিয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, কোনমতে টেবিলের কোনটা ধরে নিজেকে সামলে নিল। কিন্তু ইস্ত্রিটা প্লাগ থেকে তারের সঙ্গে খসে মাটিতে পড়ে গেল।

ইস্, রুম্পা আমাকে এভাবে কেন ধরলে? আজ তুমি আমি দুজনেই পড়ে যাচ্ছিলাম না কি হতো বলতো? শান্তির বুকটা কেঁপে উঠেছিল - আজকে যদি রুম্পার কিছু একটা হয়ে যেত, সে মণিকাকে কিভাবে মুখ দেখাত? শান্তির মনে মণিকার বন্ধু জ্যোৎস্নার বর্ণনা করা শিশুর রক্ত বিক্রি করা কলকাতাব সেই কাজের মেয়েটির ছবি ভেসে উঠলো। সেই ছবিটা কিভাবে যেন তার শরীরের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

শান্তি আঁচল দিয়ে মুখের টাটকা ঘাম মুছে রুম্পাকে কোলে তুলে নিল।

এর পরে শান্তি কিছুক্ষন সঙ্গে খেলল এবং তাকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেই নিজে ভাত খেতে বসল। সাধারণত কিন্তু সে রুম্পাকে খাইয়ে উঠেই নিজে খেতে বসে আর সামনের জলচৌকিটাতে রুম্পাকে বসিয়ে রাখে। কিন্তু রুম্পা আর কতক্ষণ শান্তিতে বসে থাকবে। সে বেশির ভাগ সময় টেবিলে উঠে বসে আর শান্তির ভারত খাওয়াতে নানা উপদ্রবের সৃষ্টি করে। আজ সে শান্তিতে ভাত খেয়েছে, কিন্তু তবুও মন অশান্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। আজ কতবড় ঘটনা হয়ে যেতে পারত।..... অল্প খাওয়ার পর শান্তির ভাত তরকারি বিস্বাদ লাগল, খাওয়ার টেবিলটা আজ এত নির্জন, সে ভাত তরকারিতে জল ঢেলে হাত ধুয়ে নিল।

শান্তি গিয়ে রুম্পার পাশে শুয়ে পড়ল। অন্যদিন রুম্পার সঙ্গে একসঙ্গে শোওয়া, শান্তির তাকে গান গেয়ে শোনাতে শোনাতে নিজেরও চোখ বন্ধ হয়ে আসত। সেই গান যেন তার চোখে ঘুমের কাজল মাখিয়ে দেয়...... কত ঘুমপাড়ানি গান.......... আমার ময়না শোবে .... নিদ্র যাওরে কানাই.......... সোনার পালঙে ও আমার সোনার চাঁদ। এই ঘুমপাড়ানির গানগুলো তার বুকের কোন সঙ্গোপনে লুকিয়ে ছিল এতদিন ?....... মণিকা বোধহয় তার মেয়েকে এভাবে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে শোওয়ানোর কথা শুনল হাসবে, হয়তো আশ্চর্য হবে......... কিন্তু রুম্পার সঙ্গে দিনটা কিভাবে শান্তি কাটায় সে কথার বিস্তারিত বিবরণ মণিকা পায় না, সে কেবল মন্তব্য করে........ শান্তি কেবল হাসে, তার মেয়ে যে কত উৎপাত করে, ঘরের কত কি ভেঙ্গেছে, কতদিন তার খাওয়া নষ্ট করেছে, এসব কিছু বলে না। সে যে অমৃতের আস্বাদ পেয়েছে, তার কাছে এইসব উৎপাত আর কতটুকু।

কখনও আবার মণিকা বলে, আমি নয়, আপনি আগের জন্মে রুম্পার মা ছিলেন। শান্তির বুকটা যেন কেউ মুচড়ে মুচড়ে রক্ত বের করে দেয় আগের জন্মে যদি আমি রুম্পার মা ছিলাম, এই জন্মে আমার কি পাপের জন্য আমার বুক থেকে রুম্পাকে কেড়ে নিলে ভগবান ?

মণিকা কখনো বলে-'আপনি যে রুম্পাকে এত ভালবাসেন মাসি, মা না হয়েও ওকে মার চেয়ে বেশি ভালবাসেন--আমার সত্যিই খুব অবাক লাগে।

মণিকা, ভালবাসা জিনিসটা মানুষের অন্তরের জিনিস। মানুষ বলে মার ভালবাসা রক্তের টান। আমি কখনও ভাবি কথাটা কতটুকু সত্য ? একটা কথা ভাবো তো, তুমি হাসপাতালে সন্তানের জন্ম দিয়েছ, নার্স ভুল করে অন্য একজন মায়ের বাচ্চার সঙ্গে তোমার বাচ্চার অদলবদল করে ফেলল। সে কথা কোনদিন জানতে পারলে না। তুমি অন্য মায়ের সন্তানকে নিজের ভেবে লালন পালন করলে- তখন কি আর প্রতি তোমার ভালবাসা কম হত, রক্তের কোন সংকেত থেকে টের পেতে কি যে সে তোমার পেটের মেয়ে নয়? তোমাকে আমি সেই রাশিয়ান সিনেমাটার কথা বলেছিলাম না মণিকা ? এই ধরনের সিনেমা আমি খুব কমই দেখেছি- সিনেমাটি দেখে আমার দুচোখ বেয়ে জল নেমে এসেছিল।

মণিকা কলেজে চাকরি করে। তাছাড়া সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম রয়েছে, তাই শুক্রবারের টিভিতে মধ্যরাতের সিনেমাগুলো কখনও দেখতে পায় না, কখনও দেখতে বসলেও চোখে ঘুম নেমে আসে। সেই আধো ঘুম জাগরণে দেখা স্বপ্ন এবং টিভির পর্দার দৃশ্যগুলি একসঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সেইজন্য প্রথমদিকে দেখার চেষ্টা করলেও এখন আর সেই চেষ্টা করে না- উপভোগ থেকে কষ্টই হয় বেশি। দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের আর কাজ নেই শুক্রবার মধ্যরাতে সিনেমা দেখায় দেখাতেই যদি চাও তাহলে শনিবার রাতে দেখাও না কেন ?

মণিকা মনের ক্ষোভটা শান্তির কাছেই প্রকাশ করে। সে সিনেমা দেখতে খুব ভালবাসে, কিন্তু ভাল কিছু সিনেমা মধ্যরাতে দেখিয়ে তার উৎসাহের গলা টিপে ধরে। অন্যদিকে শান্তি সবসময়ই শুক্রবারের মধ্যরাতের সিনেমা দেখে, তারপর পরেরদিন মণিকা আসে শান্তির কাছে সেই সিনেমার গল্প শুনে যায়।

- রাশিয়ান সিনেমাটা দেখার পর শান্তির মনটা ছটফট করছিল, মণিকা কখন কলেজ থেকে আসবে, সিনেমার গল্পটা বলবে, সে যেন আর অপেক্ষা করতে পারছে না।....

একজন মায়ের কি হৃদয়স্পর্শী কাহিনী প্রত্যেকের অভিনয় কি অপূর্ব, কি বাস্তব, কি সংযত, কোথাও বিন্দুমাত্র বাহুল্য নেই। প্যানপ্যানি নেই- তবুও শান্তির চোখের জলের ধারা নেমে এসেছি। সিনেমার নায়িকার একজন সৈনিকের সঙ্গে প্রেম ছিল, সৈনিকটি যুদ্ধে গিয়েছিল। সে সময় মেয়েটির একটি বান্ধবী এসে তার সঙ্গে ছিল আর বলেছিল যে সে যদিও কুমারী তবুও গর্ভবতী, তাদের ঘরে আশ্রয় দিল। যথাসময়ে বান্ধবীর একটি ছেলে হল এবং নায়িকাকে স্তম্ভিত করে শিশুটিকে অনাথ আশ্রমে ফেলে রেখে নিজে প্রেমিকের (যে তার সন্তানের পিতা নয়) সঙ্গে বিয়ে করতে চলে গেল। নায়িকা সহ্য করতে পারল না, শিশুটিকে আশ্রম থেকে নিয়ে এসে নিজে লালন পালন করতে লাগল। শিশুটির একবছর বয়সের সময় তার প্রেমিক যুদ্ধ থেকে ফিরে এল এবং মহা সমস্যায় পড়ে গেল। নায়িকার প্রতি তার গভীর প্রেম, কিন্তু রক্ষণশীল ঘরের ছেলে, বাড়ির লোক শিশুটিসহ মেয়েটিকে গ্রহণ করতে রাজি নয়, সৈনিক মেয়েটিকে অনেক কাকুতি মিনতি করেও শিশুটিকে অনাথ আশ্রমে ছেড়ে আসতে রাজি করাতে পারল না। ফলে বহু অশান্তি দ্বিধা ও বেদনার মধ্যে সৈনিকটি শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করতে অসমর্থ হল। দশ-বার বছর পার হয়ে গেল-নায়িকার বিয়ে হয়েছে এবং সন্তানটি তাদেরই। বান্ধবী তারপর আর আসার কারণটা জানাল-তার বিয়েটা ব্যর্থ হয়েছে, এখন সে অনাথ আশ্রম থেকে ছেলেটিকে নিয়ে যেতে এসেছে। নায়িকা শুধু বলল- তোমার আসার প্রয়োজন ছিল না। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি কোথা থেকে ফিরে এল এবং মা তাকে সেই নামে ডাকল যে নাম তাকে জন্মদাতা মা নিয়েছিল। বান্ধবীর মধ্যে নায়িকার জীবন সম্পর্কে সন্দেহ হচ্ছিল- এখন ছেলেটির নাম শুনে সমস্ত কথা হৃদয়ঙ্গম হল। যাই হোক, তারপর সে ছেলেটিকে বলল যে, সেই তার প্রকৃত মা। এখন তাকে নিয়ে যেতে এসেছে। কথাটা সত্য বলে ছেলেটি যখন বুঝতে পারল সে একটা বিকট আর্তনাদ করে ঘর থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল। বান্ধবী কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলল-সত্যি আমার ফিরে আসা উচিত হয় নি। আমাকে ক্ষমা কর। এবার সে কোনদিন ফিরে আসবে না জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সন্ধে হয়ে রাত হলো- নায়িকা তাঁদের নির্জন শহরের অলিতে গলিতে তন্নতন্ন করে খুঁজেও ছেলেটি সন্ধান না পেয়ে বিষণ্ণ মনে তাঁর নিঃসঙ্গ ঘরে ফিরে এল- ইতিমধ্যে তার মার মৃত্যু হয়েছে- অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে সোফা একটায় বসে রইল। রাত বাড়তে লাগল তারপর দরজার সামনে একটা ছায়ামূর্তি দেখা গেল। মূর্তিটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সমানে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল আর বললো 'মা', মা' । উত্তরে শুধু বলল-'Son, your dinner is getting cold'.

শান্তি মণিকাকে প্রায় নাটকীয়ভাবেই শেষের বাক্যটা বলেছিল তবে একেবারে অবরুদ্ধ স্বরে, কেউ যেন গলাটা চেপে ধরেছিল। মণিকা বলল, সত্যি বড় সুন্দর সিনেমা, আমি, রাতের ভাল সিনেমাগুলি মিস করি। ওই প্রকৃত মা-টা কিন্তু কম নয়, এরকম অবশ্য আমাদের এখানেও অনেকে অবৈধ সন্তানকে ত্যাগ করে, এমনকি জন্মের পর নুন খাইয়ে বা গলা টিপে মেরে ফেলে, ডাস্টবিনেও ফেলে রেখে যায়।

শান্তি মুখে আর কিছু বলল না মনে মনে শুধু বলল-মণিকা, তুমি মধ্যবাতের কিছু ভাল সিনেমা না দেখলেও কোন ক্ষতি নেই।

হঠাৎ একদিন কোন রকম খোঁজ খবব না জানিয়ে মণিকার শাশুড়ি, এসে উপস্থিত হল। সেদিন ছিল রবিবার। তাই মণিকা আর তার স্বামী ঘরেই ছিল। শান্তি মণিকাদের ঘরে আনন্দ উৎসাহের হৈ হল্লোড়, শুনে যখন টের পেল যে মণিকার শাশুড়ি এসেছে — তখন আর নিজেকে আটকে বাখতে পারল না, তখনও খুলে বাখা দবজার মধ্য দিয়ে সে মণিকাব শাশুডিব বলা কিছু শুনতে পেল।

তখন শাশুড়ি রুম্পাকে কোলে বসিয়ে বলল— তোর জন্যই এই বুড়ো বয়সে দৌড়ে এলাম। যেদিন তোর বাবার চিঠি থেকে জানতে পাবলাম যে একজন বন্ধ্যা নাবীর কাছে তোকে সারাদিনের জন্য রেখে দিয়ে তোর মা কলেজে যায় আমাব সহ্য হল না। বন্ধ্যা নারী আবার কবে সন্তানের যত্ন করতে শিখেছে।

শান্তি আচ্ছন্নের মতো কোন রকমে যখন ঘবে ফিরে এল। কি যে এক সন্মোহন তাকে ড্রইং রুমের শেলফে থাকা রিডার্স ডাইজেস্টের প্রতি টেনে নিয়ে গেল। মহন্ত ঘরে নেই, তথাপি শান্তির মনে হল মহন্ত যেন তাকেহাত নেড়ে বলছে এখন আমাব কথা বিশ্বাস হলো তো? তোমাকে এতবাব বলেছি যে মা হওয়া এত সহজ নয়, গর্ভে সন্তান না ধরলে কেউ মা বলে স্বীকৃতি দেয় না. কিন্তু না, তুমি তো আমার কথা মানবে না। আমি এমনকি তোমাকে আমাব দূব সম্পর্কীয় একজন পিসিব কথাও বলেছিলাম। তাঁব সন্তান না হওয়ায় একটি মেয়েকে দত্তক নিয়েছিল, মেয়েটি কোন দিন প্রকৃত সত্য জানানো হয় নি, কিন্তু আমাদেরই একজন আত্মীয় মেয়েটির সামনেই পিসিকে বলল, আমরা মেয়েটি দেখতে একেবারে তোর মতোই হয়েছে, কেউ বলবে না যেও তোব পেটের মেয়ে নয়.. . এই রিডার্স ডাইজেস্টে লিংকনস সেকেন্ড মাদার বলে একটি লেখা রয়েছে পড়ে দেখো। মাসি কি কষ্ট আর আদর করেই যে লিংকনকে লালন পালন করেছিল। লিংকন পরবর্তীকালে একবার বলেছিলেন যে তিনি যা হয়েছেন তার মূলে রয়েছেন তার দেবীস্বরূপা মা। হায় আমেরিকাবাসী সেদিন পর্যন্ত নাকি লিংকনের উল্লেখ করা মহিলাটিকেই তার প্রকৃত আর আসল মা বলে ধরে নিয়েছিল। বুঝেছ, অন্যের ছেলেমেয়েকে নিজের মতো মানুষ করলেও মানুষ সে কথা বিশ্বাস করে না, তাকে মন থেকে কোনদিনই স্বীকৃতি দেয় না। তুমি গর্ভে ধারণ করলেই প্রমাণিত হবে যে তুমি একজন জননী।

শান্তি হাতে রিডার্স ডাইজেস্টটা নিয়ে বসে পড়ল। ইস্ত্রিটা হাত থেকে পড়ে যাবার দিন তাব নিজেকে যেভাবে কলকাতার কাজ করা মেয়েটিব মতো মনে হয়েছিল, আজ রিডার্স ডাইজেস্টটা হাতে নিয়ে তাঁর ঠিক একইভাবে রিডার্স ডাইজেস্টেব লিংকনেব দ্বিতীয় মার মতো নিজেকে মনে হতে লাগল।

তামসিক

নবনীতা গগৈ

শ্রীলতা চৌধুরী আর তাব পুত্র অসিতাভের প্রসঙ্গ উঠলেই প্রভা দিদিমণিদের কণ্ঠস্বরগুলি উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। তাদের আলোচনা শেষ হয় বিক্ষিপ্তভাবে। আর আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখনকার দূরন্ত কিশোর অসিতাভের মুখ। স্কুলের ক্লাসঘর গুলিতে টিফিন পিরিয়ডে সাধারণত দুই-একজন মেয়ে ছাড়া আর কেউ থাকে না। একদিন টিফিনের সময় একা আমি যখন ক্লাসরুমে বসে রয়েছি অসিতাভ মাথায় মোষর শিঙের মত একজোড়া শিং লাগিয়ে আমার দিকে হৈ হৈ করে দৌড়ে এগিয়ে এল। শিঙগুলি সমেত ঘোর শ্যামবর্ণের অসিতাভকে সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। সেদিনই দুর্ঘটনাক্রমে শিঙজোড়া দিয়ে কাকে আঘাত করার জন্যে প্রিন্সিপাল স্যার অসিতাভকে শাস্তি দিয়েছিলেন। কাঠের পুতুলের মত প্রিন্সিপাল স্যারের রুমের সামনে হাঁটুগেড়ে নীলডাউন হয়েছিল সে। তার এ ধরণের শাস্তি হওয়ায় আমরা কেউ-ই খুব একটা দুঃখিত হইনি। কারণ কারো সঙ্গেই অসিতাভের বন্ধুত্ব ছিল না, সে একা থাকতেই ভালোবাসত। কিন্তু আমরা আনন্দিতও হচ্ছিলাম না কারণ সে একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল। শিক্ষকরা বলতেন, অসিতাভের মগজ নাকি ক্যামেরার মত। তবে অভাবনীয়ভাবে সেবার হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষায় কোনমতে দ্বিতীয়বিভাগে পাশ করেছিল অসিতাভ। তারপর গত বারো বছর স্কুলে কোন সহপাঠীর সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। অসিতাভের মত নিঃসঙ্গতাপ্রিয় একজনের খবর রাখার তো প্রশ্নই ওঠে না।

আজ প্রায় বারোবছর পরে সেই স্কুলটিতেই আমার শিক্ষকতা জীবন শুরু করেছি। সহপাঠী বন্ধু মিত্রা, ধীরাজদের সঙ্গে অসিতাভের মুখের ছবিও স্মৃতির লেন্সে ভেসে ওঠে। অসিতাভ, দ্য গ্রেট লনার। আমি কোনদিনই ভাবিনি যে একসময়ে এই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের সহপাঠী সম্পর্কে আমি

এভাবে কৌতূহলী হয়ে উঠব। ঝাঁক ঝাঁক ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে থেকেও সে কেমন যেন নিরুদ্দেশ ছিল। ক্লাস টেনের প্রথম পিরিয়ডে রোল কল করার পর অসিতাভ 'প্রেজেন্ট স্যার' বলতেই দত্ত স্যার বাট সাইকোলজিক্যালি অ্যাবসেন্ট' বলে তার মাথাটা গরম করে দিতেন। কত যে অদ্ভুত ধরণের বস্তুই সে আমাদের দেখাত, শক্ত বইয়ের নিচে রেখে চ্যাপ্টা করা বাদুড়, গণ্ডারের দাঁত আরও কত কি। আসলে ভালো ছেলেরা যে সমস্ত কাজগুলি সাধারণত এড়িয়ে চলে সে সেগুলিই করত। সেদিন শ্রীলতা চৌধুরী এসে আমাদের কমনরুমে উপস্থিত হল। অসিতাভের মা শ্রীলতা চৌধুরীকে এর আগে যখন দেখেছিলাম তখন তিনি একজন পরমাসুন্দরী মহিলা। এখন তার গায়ের রঙ পোড়া মাটির মত হয়ে গেছে। কাপড়-চোপড় নোংরা আর অসংযত। থুতনির নিচে আর কোমরে চর্বির ডেলা। তিনি এসে প্রভা দেবী এবং তার সমকালীন শিক্ষিকাদের বাহু জড়িয়ে ধরে কেঁদেকেটে অসিতাভের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য চাইছিলেন। আমি সে দৃশ্য দেখে স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত হলাম। মহিলাটি চলে যাবার পর দিদিমণিদের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হতে দেখে অবাক হলাম। প্রভাদেবী বলেই ফেললেন, 'এই যে মহিলাটি শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ না পরে ছেলেদের শার্ট পরে ঘুরে বেড়ায়, দেখলেই আমার ওটা ছিঁড়ে ফালাফালা করে দিতে ইচ্ছে করে। শার্টের বড় বড় স্লিভের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা বাহুদুটির দিকে তাকিয়ে দেখ, সূঁচ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কেমন কদর্য করে তুলেছে, দেখলেই ঘৃণা জন্মায়। এই অনাচারীর মুখ দেখতে নেই।' আমি মনে মনে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে অসিতাভের কী হয়েছে মা বলছে তার সাংঘাতিক ডায়াবেটিস। অথচ সিনিয়র শিক্ষয়িত্রীরা সেই ডায়াবেটিসকে উর্দ্ধকমার ভেতরে অসুখ বলে ঠাট্টা আর বিরক্তি প্রকাশ করছে। কী রহস্য রয়েছে তাতে, কী অসুখ অসিতাভের ?

শ্রীলতা চৌধুরী একদিন প্রভাদিদিমণিদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দিদিমণি একগাদা পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন। শ্রীলতা হঠাৎ দিদিমণির পা জড়িয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। পরের দিন তার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী, হাতে নাকি একটাও পয়সা নেই। প্রভাদেবী অত্যন্ত ভদ্র, অত্যন্ত সৌম্য ব্যক্তিত্বের মানুষ। তিনি শ্রীলতাকে চা-টা খাইয়ে চারশ' টাকা দিয়ে পাঠালেন। অনেকদিন পার হল। প্রভা দিদিমণিকে পথে ঘাটে দেখতে পেলে শ্রীলতা না দেখার ভান করতে লাগলেন। শুনেছি, শহরের মাঝামাঝি জায়গার অফিসগুলিতেও শ্রীলতা মাঝেমধ্যে যায়। কখনও বা একজন পুরনো পরিচিত মানুষের শরীরের উপর ঢলে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে। পুরুষ বা মহিলাটি তখন প্যান্ট শার্টের পকেট অথবা ভ্যানিটি ব্যাগ, যেখানে যত পয়সা থাকে দিয়ে ফেলে শ্রীলতাকে বিদায় করে। অস্বস্তিকর একটা দৃশ্যের সৃষ্টি করে পয়সাগুলি নিয়ে প্রসন্নচিত্তে চলে যায় শ্রীলতা। আমি নীরবে সমস্ত কথোপকথন শুনতে থাকি। অসিতাভের খবর পাবার জন্যে ভেতরে ভেতরে আমার ভীষণ কৌতূহল হয়। কিন্তু কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে ঠিক করে ফেললাম আমি নিজেই তার খবর সংগ্রহ করব।

স্কুল ছুটির পর একদিন শ্রীলতা চৌধুরীর ঘরের সামনে দিয়ে রিক্সা ঘুরিয়ে নিলাম। ক্লাস টেনে পড়ার সময়ই একবার সরস্বতী পুজোর দিন এই পথে এসেছিলাম। অসিতাভের জন্য সরস্বতী পুজোর দিনটা ছিল বন্ধের দিন। সে ঘর থেকে কিছুটা দূরে বিলের পারে একটা প্রকাণ্ড পাথরের উপর বসেছিল। অসিতাভের বাবা রজত চৌধুরী ছিলেন এক শিল্পীমনের অধিকারী। বাড়ির বিশাল জায়গা জুড়ে তিনি একটি অনুপম শৈলোদ্যান গড়ে তুলেছিলেন। ছোট-বড় নানা আকারের নানা রঙের পাথরগুলির ফাঁকে মাটি দিয়ে তাতে ফুলের চাষ করেছিলেন। এক স্বপ্নময় পরিবেশ বিরাজ

করত সেই অঞ্চলটিতে। এই পাথরগুলিও নিশ্চয় উদ্যানের কাজে লাগানোর জন্যেই এনেছিলেন রজত চৌধুরী। সেদিন সে পাথরের উপর বসে বিলের জলে কী যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিল। আমরা কয়েকজন কিশোরীর উচ্ছল কথাবার্তা, হাসিতে সে ভ্রূক্ষেপই করল না। অন্য কোন সহপাঠী হলে চিৎকার করে ডাকতাম। কিন্তু সে ছিল অসিতাভ চৌধুরী। পাথরটি এখনও সে জায়গাটিতেই রয়েছে। আর অসিতাভও বসে রয়েছে সেই একই জায়গাটিতে, একই ভঙ্গিতে। মাঝখানে যেন এতগুলি বছর পার হয়ে যায় নি। তার পরনে রয়েছে একটা মলিন সাদা পোষাক। এ যেন এক জাতিস্মরের কাহিনীই পাঠ করে উঠলাম আমি। আমার মনের সমস্ত কৌতূহলের জায়গা নিয়ে নিল গভীর শূন্যতাবোধ। কাঁধে বিশাল একটা ব্যাগ নিয়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায় শ্রীলতা চৌধুরী। কোনদিন সে একজন রিক্সাওয়ালাকে কাকুতিমিনতি করতে থাকে 'আমাকে ঘরে রেখে আস ভাই'। রিক্সাওয়ালাও ভাল করেই জানে এই যাত্রী কখনও পয়সা দেবে না। সে তাকে রিক্সায় ওঠাতে রাজী হয় না। শ্রীলতা পুনরায় বলতে থাকে, 'তোমার যত পয়সা লাগে ততই দেব, চল ভাই .... এই দেখ ঘুরে ঘুরে পা ফুলে গেছে (রাজপথের মাঝখানেই সে শাড়িটা যথেষ্ট উপরে তুলে ধরে, রিক্সাওয়ালা বিব্রত হয়ে মুখ ঘুরায়।) সেই সুযোগে শ্রীলতা রিক্সায় উঠে পড়ে। উপায়হীন রিক্সাওয়ালা রিক্সাটা চালিয়ে দেয়। অবশ্য ভাড়া আর দেওয়া হয়ে ওঠে না শ্রীলতার।

আমরা স্কুলে থাকতেই একদিন শুনেছিলাম অসিতাভের মা লাখপতি স্বামী রজত চৌধুরীকে ছেড়ে তার কোন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বন্ধুর সঙ্গে দ্বিতীয় সংসার পাতার জন্যে চলে গেছে। রজত চৌধুরী তখন চিকিৎসার জন্যে ঘনঘন বোম্বাই যাচ্ছিলেন। দুরারোগ্য অসুখ হয়েছিল তার। শ্রীলতা চলে যাওয়ার পর একদিন বোম্বাই থেকে বিমানে এসে পৌঁছল রজত চৌধুরীর অস্থিচর্মসার মৃতদেহ। কোন এক অজ্ঞাত কারণে দ্বিতীয় সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে শ্রীলতাও পুনরায় ফিরে এসেছিল অসিতাভের কাছে।

এখন শ্রীলতা চৌধুরী যে এভাবে স্থান কাল ভুলে হঠাৎ একজনকে জড়িয়ে ধরে প্যানপ্যানাতে শুরু করে— এ প্রসঙ্গটা উঠলেই প্রভা দিদিমণির কানের লতি আর নাকের অগ্রভাগটা রাগে টকটকে লাল হয়ে যায়। সত্যি সত্যিই মানুষটি বড় অসংযত আচরণ করে। এটা ওটা অজুহাত বের করে পয়সার খোঁজে নম্রভাবে মিনতি করা অবস্থায় অন্যের হাতেপায়ে, গালে মুখে যে তিনি হাত বুলোতে শুরু করেন, চুমু খেতে থাকেন। ক্রোধে লাল হয়ে উঠে প্রভাদিদিমণি বলে ওঠেন, 'ছিঃ অসভ্য কোথাকার। আমার কোন সহানুভূতি নেই এসবের প্রতি। ফাঁসি দেওয়া উচিত এদের।' আমি ভেবে কূলকিনারা পাই না।— প্রভা দিদিমণির মত শান্ত-সৌম্য মানুষেরও এত রাগ হতে পারে? শ্রীলতা চৌধুরী ড্রাগ এডিক্ট কিন্তু সেটাই কি একমাত্র কারণ? আবার রহস্য। ইতিমধ্যে আমার একটা রহস্যের ঘোর কেটে গেছে। অসিতাভের ডায়াবেটিস হয়নি। সে সম্পূর্ণভাবে নেশায় আসক্ত। হাতে একটা সিরিঞ্জ নিয়ে অনবরত শরীরের নানা অংশে খোঁচাখুচি করে। হাতপায়ের নানা জায়গায় কালো কালো হয়ে ফুলে ওঠা সঙ্গে পায়ের তালুতে প্রচণ্ড ব্যথা। বিছানায় অনেকদিন পড়েছিল সে। তার চিকিৎসার জন্যেই তার মা পয়সা ধার করে বেড়াত। উর্দ্ধকমার মধ্যে অসুখ সেটাই। কিন্তু প্রভাদেবীর রাগটা যে দুঃখমিশ্রিত। আর কী রহস্য থাকতে পারে? আমার মায়ের বয়সী প্রভাদিদিমণি। তা-ও তিনি আবার এক সময়ের শিক্ষিকা। সব কিছু জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না। বারবার আমার ছোড়দার কথা মনে হয়। অসিতাভের মতই ব্যতিক্রমী প্রতিভার ছাত্র ছিল সে। একদিন সে চোখ লাল করে ঘরে এল। না, সে টলমল করছিল না। কথাবার্তাও সঙ্গতভাবেই বলছিল। কেবল সে কথা

খুব ভুলে যাচ্ছিল আর গোগ্রাসে মিষ্টি খাচ্ছিল। প্রথমে আমি তাকে গোগ্রাসে মিষ্টি খেতে দেখে হেসেছিলাম। কিন্তু ক্রমশ সে কেমন যেন হয়ে পড়ছিল। অনেকদিন পরে তার মনটা কিছুটা স্থির হয়ে আসার পর সে আমাকে পাশে বসিয়ে অনেক কথা বলেছিল। আমরা মা-বাবার উষ্ণ আদরের মধ্যে প্রতিপালিত ছেলেমেয়ে। পরিবারে স্নেহভালোবাসার অভাবেই ছোড়দাদার প্যান্টের পকেটে সেই ছোট ছোট পুরিয়াগুলি জায়গা করে নিয়েছিল সেটা কিছুতেই বলা যাবে না। অথবা আমাদের শাসন করা থেকেও মা-বাবা কোনদিন বিরত ছিলেন না। তবুও..... । আসলে, কখনও কখনও কিছু কাজ মানুষকে নিজে থেকে করতে হয় না, কেমন যেন আপনা থেকেই হয়ে যায়। মানুষ বুদ্ধিমান, এক অতিশয় কৌতুহলী জীব। এহেন কৌতুহলী আর ধীশক্তিমান একটা জীব অনবরত নিয়ম-নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই থাকবে বলে কীভাবে ধরে নিতে পারি ? হয়তো মনের মধ্যে জমা হওয়া পাপবোধগুলি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই ছোড়দাদা আমাকে সেই দুই বছরের অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। কয়েকজন শুভাকাঙ্খী বন্ধুর কল্যাণস্পর্শে একদিন সে পুনরায় সুস্থ হয়ে উঠেছিল, পুনরায় পড়ার টেবিলে বসেছিল এবং অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে এম.এস.সি পাশ করেছিল।

সে ভাড়াঘরে থেকে একা একা পড়াশোনা করত। প্রথমে পড়াশোনা করত আর পরবর্তীকালে মাতাল হতে শুরু করেছিল স্বপ্নপুরীর স্বাদ গন্ধের আশায়। ওরা তিনটি ছেলে প্রায়ই মোটরসাইকেলে উঠে তীব্র বেগে সেটা চালিয়ে ঘুরে বেড়াত। একটা বিশেষ ধরণের ড্রাগ নেবার পরে এভাবে তীব্রভাবে মোটরসাইকেল চালালে যখন মাথায় খুব জোর বাতাস লাগে তখন নাকি সেই অমৃতের স্বাদ ভালভাবে অনুভব করা যায়। আমার বিস্ময়াবিভূত মুখের দিকে না তাকিয়েই ছোড়দাদা আরও একটা সাংঘাতিক কথা বলে বসল। সেদিন ছিল মাঘ বিহুর উরুকা। পরিকল্পনামতই তারা আটটা ছেলে তার ভাড়াঘরে জমায়েত হল। বোতলের ঝনঝনানিতে ছোড়দার কুঠুরি মুখরিত হয়ে উঠল। রাতের বেলা সে ক্লান্ত হয়ে মেঝেতে পড়েছিল। কিছুক্ষণ পড়ে থাকার পরে তার কপালে একটা অপরিচিত জিনিস স্পর্শ করল। সে জোর করে চোখ দুটি খোলার চেষ্টা করল। চোখদুটি জ্বালা করছিল, হঠাৎ বাহুতে, পিঠে এ কিসের অপরিচিত স্পর্শ ? একটি মেয়ে ? সে শিউরে উঠল। সর্বশক্তিতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। সত্যি সত্যিই তার পাশে বসে রয়েছে একটি অপরিচিত যুবতী, এতটা অধঃপতন হয়েছে তার। মেয়েটি তখনও রঙিন দোপাট্টা নাচিয়ে নাচিয়ে হাসিমুখে মেঝেতে বসে রয়েছে। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটি। আর তার পড়ার টেবিলে একটা, চেয়ারটাতে একটা, বিছানায় দুটো- যেখানে সেখানে মদের বোতলের মত তার ভোগালী বিহুর সঙ্গীরা পড়ে রয়েছে। এত স্পর্ধা ওদের ! তার ঘরে রাস্তা থেকে মেয়ে তুলে এনেছে ! সে বিকটভাবে চিৎকার করে লাফ মেরে গিয়ে পাশের ঘর থেকে মাংস কাটার ধারালো দা-টা নিয়ে এল। দা-টা হাতে নিয়ে সে থরথর করে কাঁপতে লাগল। তার চিৎকার শুনে দৌড়ে আসা প্রতিবেশীদের আড়াল দিয়ে মেয়েটি আর ছেলেগুলি দৌড়ে পালিয়ে বাঁচল সেদিন। ছোড়দাদা বলে, সেই তেরো চৌদ্দ বছরের মেয়েটি সেদিন পৌষমাসের শীতের রাতে ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে চারপাশে একদল অসুরের উপস্থিতিতে সেই যে জোর করে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়েছিল, সে ধরণের করুণ ছবি সে আর কখনো দেখেনি। সে সময়ে সে-ও হয়ত মুহূর্তের উত্তেজনায় দা-টা দিয়ে মেয়েটিকে কোপ বসিয়ে দিত। কিন্তু স্মৃতি যে বিধ্বস্ত হয় না। সেই হাসিটা সমস্ত পৃথিবীর করুণতার প্রতীক হয়ে তার দু'চোখের সামনে আজও ভাসতে থাকে। আমি ভাবি, ভেবে অবাক হই –সেই পিচ্ছিলতার কবল থেকে, তাও আবার সে রকম এক সঙ্গীন মুহূর্তে ছোড়দাদা কীভাবে মুক্ত হয়ে এলো ? সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রে সংক্রমণ হওয়ার পরেও তার

মানে রক্ত উল্টো স্রোতে বইতে পারে? বিশুদ্ধ রক্তের স্রোত? এই শুভ শক্তি কি অসিতাভের মধ্যেও নেই? প্রভা দিদিমণিদের যতই রাগ হোক না কেন পৃথিবীর সমস্ত নেশাগ্রস্ত মানুষকে আমি কখনও নির্বিচারে ঘৃণা করতে পারি না, যেমন ঘৃণা করতে পারিনা ছোড়দাদাকে অথবা ভুল বিচারে কারারুদ্ধ হওয়া কয়েদীর মত আহত ম্রিয়মান ভট্টাচার্য স্যারকে। স্যার প্রবেশ করলেই আমাদের মেজর ক্লাসের ছোট রুমটিতে ছড়িয়ে পড়ে মদ-সিগারেট আর কাঁচা পেঁয়াজের দুর্গন্ধ। আধা সচেতন অবস্থায় স্যার কী সুন্দর পড়াতেন কোলরিজের ডিসেকশন অথবা যখন তিনি গদগদ কণ্ঠে উদ্ধৃত করতেন টেনিসনের ইউলিসিস : 'Tis not too late to seek a newer world'। আমি এ ধরণের লোককে কেবল শারীরিক দুর্গন্ধের জন্যেই কখনও ঘৃণা বা অবজ্ঞা করতে পারি না।

প্রায়ই আসার মত একদিন আমাদের কমনরুমে এসে উপস্থিত হলেন শ্রীলতা চৌধুরী। অন্যান্য দিনের মত চোখের জল ফেলে মানুষের হাতেপায়ে ধরে পয়সা চাইলেন। কেউবা বিরক্তিতে উঠে অন্য জায়গায় চলে গেলেন। কেউবা ব্যাগের ভেতর বাইরে খুঁজে দু-এক টাকা তুলে দিলেন। আমার চেয়ারের পাশেই বসেন প্রভাদিদিমণি। শ্রীলতা চৌধুরী চলে যাওয়ার পরে দিদিমণির থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ সাহসের সঙ্গেই আমি বলে উঠলাম, 'আমরা জনগণ এ সমস্ত লোককে কেবল ঘৃণাই করতে পারি। এদের শুদ্ধ পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বটা তো আমাদের মত সুস্থ নাগরিকদেরই কর্তব্য। বিশেষ করে অসিতাভের মত একটা ট্যালেন্ট চোখের সামনে তিল তিল কবে নষ্ট হবে ভাবতে কষ্ট হয়।' আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রভা দিদিমণি বললেন, 'তুমি আসলে দূর থেকে এদের দেখেছ। আমি অনেক চেষ্টা করেছি ওদের কাদা থেকে তুলতে। সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। এখন আর অন্য কোন উপায় নেই। তুমি যদি সত্যি সত্যিই ওদের শুভাকাঙ্খী হয়ে থাক তাহলে ঈশ্বরের কাছে অচিরেই ওদের মৃত্যুকামনা করো। অনের শুভাকাঙ্খীই শ্রীলতা চৌধুরীকে সুপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। তাদের প্রত্যেকেই এখন বলেন ওদের কাছে গিয়ে কেবল নরকদর্শন করাই সার হল, অন্য কোন কাজ হল না। অন্য দু'জন সরস ভাষায় তাদের এক সন্ধ্যার আতঙ্কের বর্ণনা দিলেন। একদিন তারা শ্রীলতার দুঃখের দিনে সান্ত্বনা দেবার আশায় গিয়েছিলেন। মেঝের নোংরা কার্পেটের উপর মা-ছেলে দু'জনেই পড়েছিল। অতিথিরা তাদের ধরে মেঝে থেকে তুলে দাঁড় করালেন। কিছুক্ষণ পরেই শ্রীলতা বললেন, 'অন্ধকার হলো। অসিত যা। তুই এদের এগিয়ে দিয়ে আয়।' অসিতাভ তখনও ভাল করে চোখ মেলে তাকাতে পারছিল না। সে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে মাতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য প্রস্তুত হল আর অতিথিদের ঘরের বাইরে বের করার জন্য যত্নবান হয়ে উঠল।

পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা বাইরে চলে এল। অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়েই তার যত তাড়াতাড়ি পারে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু লম্বা লম্বা পা ফেলে অসিতাভ তাদের সঙ্গে ঠিক পায়ে-পায়েই আসতে লাগল। টলমল করলেও সে কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছিল না। কিন্তু সে এত জোরে হাঁটছিল যে মাঝে মাঝে তাল মিলাতে না পেরে হয় তাদের পায়ে পায়ে ঠোক্কর খাচ্ছিল অথবা তাদের শরীরের উপর ভর রেখে হাঁটার চেষ্টা করছিল। ছয়ফুট থেকেও বেশি লম্বা অসিতাভকে ঘন কুয়াশা এবং ফ্লুরোসেন্ট টিউবের আলোতে একটা দৈত্যের মত দেখাচ্ছিল। দৈত্য তাতে আবার নেশাখোর। আতঙ্কে প্রায় কেঁদে উঠল মানুষ দু'জন। আস্তে আস্তে একজন লোকের বাড়ির সামনে উপস্থিত হল তারা । এবার তারা অসিতাভকে মিথ্যে কথা বলল যে এই লোকটির কাছে তাদের বিশেষ একটা কাজ রয়েছে, তাই সে ফিরে যেতে পারে। তারা নিজেদের বাড়িতে একা একাই চলে যেতে পারবে।

কিন্তু সে কোনমতেই মায়ের কথা অমান্য করবে না। সে রাস্তার উপরেই স্ট্রীট লাটের নিচে ধপ করে হাত পা মেলে বসে পড়ল আর বলল যে তাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে সেখানেই অপেক্ষা করবে। লোকদুটি ঘরে ঢুকে গেল আর সমস্ত পরিস্থিতিটাকে বুঝিয়ে দিয়ে তারা খিড়কি দরজা খুলে দৌড়ে পালাল। তাদের অবস্থাটা কল্পনা করে আমরা হেসে উঠলাম। প্রভা দিদিমণি হাসলেন না। তিনি নিজের মনেই বললেন, 'ইস মায়ের কথা অমান্য করেনা! ভক্তি না কি? মা আমাদের সামনে কী বলে? আমরা তাকে ঘরে গিয়ে কি অবস্থায় দেখি? এই তার বাৎসল্য? প্রভা দিদিমণি সেদিন সমস্ত কথাই খুলে বলেছিলেন। সেই কথাগুলি বলার সময় তিনি কিন্তু কারো দিকে তাকাতে পারছিলেন না। শ্রীলতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা প্রায় প্রত্যেকেই জানত এই সমস্ত কথা। এ সমস্ত শুনতে শুনতে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

শ্রীলতা শুভাকাঙ্খীদের বলেন, 'জীবনে আর কে আছে অসিতাভ ছাড়া? আঠাশ বছরের দীর্ঘদেহী যুবক অসিতাভ। রক্তমাংসের অসিতাভ শ্রীলতা চৌধুরী তো একেবারে অ্যাডিক্ট হয়ে পড়েছে। এই দিনের আলো হল তার ঘোর শত্রু। আলোর স্পর্শে হাত-পা সব অচল হয়ে পড়ে। সমস্ত স্মৃতি জাগ্রত হয়ে নিরুপায় করে তোলে মানুষকে। কিন্তু একটা সময়ে তো অন্ধকার নামে। অন্ধকার তো নামবেই। অন্ধকারের মধ্যে বিজয়ের উল্লাস ঝলসে ওঠে শ্রীলতার চোখে। অন্ধকারে তার রুমের ভেতরে প্রতিটি প্রহরের সাক্ষী এবং সঙ্গী হয়ে পড়া যে দ্বিতীয় প্রাণীটি মজুত থাকে, সেই অসিতাভের মুখ তখন শ্রীলতার কোন কিছুতেই স্থির হয়ে থাকে না। শ্রীলতা তখন অসিতাভকে চিনতে পারে না। বিলুপ্ত হয় সমস্ত স্মৃতি আর শ্রীলতা চৌধুরী প্রবেশ করে মায়াপুরীতে। সমস্ত স্মৃতি থেকে মুক্ত হয়ে শ্রীলতা প্রতিটি রাতে দাউ দাউ করে নিজের হাতে জ্বালিয়ে দেয় অসিতাভের বাল্যকাল। জ্বালিয়ে দেয় নিজের গর্ভ যন্ত্রণা আর মাতৃত্বের সমস্ত স্মৃতি। তিনি নদী হয়ে ভেসে যান। আর স্রোতের নিচে পাথর হয়ে পড়ে থাকে অসিতাভ। খরস্রোতা নদী ক্রমশ পাথরের ধার কমিয়ে আনে। সে ঘূর্ণ্যমান হয়ে ক্রমশ পিচ্ছিল, আরও বেশি পিচ্ছিল হয়ে ওঠে।

আমার মনটা খুব বেশি বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল না। মাত্র বারবার অসিতাভ তার মাথায় পরে নেওয়া সেদিনের শিংজোড়ার কথা মনে পড়তে লাগল। একটা দীর্ঘ অন্ধকার করিডর দিয়ে সে যেন বাইরে বেরিয়ে আসছে। মাথায় শিং-জোড়া। গতি কিন্তু অত্যন্ত ধীর। জলে ভেসে থাকার মত ভেসে চলেছে সে। আমার হাতের অঞ্জলিতে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলে উঠেছে আর আলোর গন্ধ পেয়ে তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে সরে গেছে। তারপর আর কিছু দেখিনি। চারপাশের গাঢ় কুয়াশা আমাকে ঘিরে ধরেছে। অন্ধকার এবং কুয়াশার মধ্যে একটা পেন্টিং-এর মত নিথর হয়ে আছে প্রদীপটা।

শুভাকাঙ্খী হিসেবে এখন আমার অসিতাভের মৃত্যু কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত কি? করব কি? সেই সিদ্ধান্তটাই আমি নিতে পারছি না।

অন্ধকারে নিজের মুখ

নগেন শইকীয়া

ঘুম নেই—সারা রাত ধরে ঘুম নেই। গবমে গায়ের কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে তার মগজ থেকে সমস্ত চিন্তাকেও ছুঁড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা কবছে —তাকে ঘিরে ধরা সমস্ত শব্দ আর ছবি সে মন থেকে মুছে ফেলে ঘুমনোর চেষ্টা করছে। চোখ বুজলেই একটা ছোট ছেলের মুখ যেন এগিযে আসে। কিছু একটা বলার জন্য দুটো ঠোঁট গোল করে নেওয়া একটা মুখ। সে চোখ মেলে তাকায়। তার নিঃসঙ্গ ঘরটির ভেতবে আর বাইরে ছড়িয়ে থাকা গাঢ় নির্জনতার মধ্য দিয়ে যেন মানুষের শোভাযাত্রার শব্দগুলি ভেসে আসে--মনে হয় শব্দগুলির ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে গেছে আর তারা জীবন্ত হয়ে উঠেছে—ওরা তার অডিটারি নার্ভে চাপ দিতে আরম্ভ করেছে আর সে কাতর হয়ে উঠেছে। সে চোখ মেলে তাকায। নিস্তব্ধ শহরের বুকের উপর দিয়ে পার হয়ে যাওয়া নিঃসঙ্গ একটি গাড়ির শব্দে, দূরে পার হয়ে যাওয়া রেল হুইসেলের শব্দে, রেলের একটা ক্রম-বিলীয়মান চলন্ত গতির শব্দে, কোথাও ঘেউ ঘেউ করে ওঠা কুকুরেব বিরক্তিকর শব্দে—এ ধরণের শৃঙ্খলাহীন আর আকস্মিক শব্দের পুনরাবৃত্তিতে তার স্নায়ু উত্তেজিত। এই শব্দগুলির ফ্রিকোয়েন্সি খুব হাই, তাব তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কোন হিসেব বের করা সম্ভব নয। কারণ ধ্বনিগুলি বিভিন্ন দৈর্ঘ্য এবং ওজনের, আর একটা মিশ্রিত ধ্বনির বেহিসেবী প্রকাশেব মধ্যে ওদের ব্যক্তিগত বিচিত্রতা বিলীয়মান। তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিতে চাওয়া মুখের ছবিগুলি গলে যায় আর মুখের বিভিন্ন অংশ বিকৃত হতে থাকে। মনে হয়--দুই একটা মুখের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল।

২.

সে ভাবতে চায় না। সে ভুলে যেতে চায়। কিন্তু সমগ্র দিনের ঘটনাবলীর ছবিগুলি সারিবদ্ধভাবে তার মগজের দিকে এগিয়ে আসে—ঠিক যেন সার বেঁধে এগিয়ে আসা দুপুরের

মিছিলটা —ছোট বড বিভিন্ন মানুষের শোভাযাত্রা হাতে প্ল্যাকার্ড আর মুখে শ্লোগান। একসময় তারাও এভাবে শোভাযাত্রায় উৎসাহ এবং উত্তেজনায় যোগ দিয়েছিল। কিসের শোভাযাত্রা এখন ভুলে গেছে – সে তখন স্কুলের নিচু ক্লাসের ছাত্র – হাফ প্যান্ট আর হাফ শার্ট পরা তরতাজা একটা ছেলে--রোদে ঘেমে উঠেছিল, চিৎকার করে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল উপরের দিকে হাত তুলে ধ্বনি দিতে দিতে হাত ব্যথা করে উঠেছিল, তবুও ক্ষণিকের বিশ্রাম করার মত সময় নেই- সে না গেলে যেন দেশ রক্ষা হবে না--সে চিৎকার না করলে যেন তার কথা কেউ শুনবে না এই প্রত্যয়ে কিশোরের মুখমণ্ডলের কোমল মাংসপেশীতেও যেন একটা কাঠিন্যের ছবি ফুটে উঠেছিল। হঠাৎ কে যেন বলল, মনে নেই স্কুলের শিক্ষক হতে পারে ওপরের ক্লাসের বড় ছেলে হতে পারে অথবা অন্য কেউ হতে পারে, 'এই ছিঁচকাঁদুনেটাকে কেন নিয়েছ ?' সঙ্গে সঙ্গে কিশোরের পৌরুষে আঘাত লাগে ঃ 'আমি যাবই।' কেউ বলল, 'একে আগে দাও, মারটা এব মাথাতেই পড়ুক।'

৩.

অনেক ঘটনা বা অঘটনের খণ্ড খণ্ড চিত্র যেন ইমপোজড আর সুপারইমপোজড হয়ে গেছে- —এখন আর তাদের কোন কালানুক্রমিক শৃঙ্খলা সম্ভব নয়। তাছাড়া ওরা প্রায বিস্মৃত আর নতুন করে মস্তিষ্কের মধ্যে পুনর্গঠিত, যার ফলে অনেকেই তাদের মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলেছে। মৌলিকত্ব থাকলেও ওরা ক্রমশ অপরিচিত হতে চলেছে যেভাবে অ্যালবামের পুরনো ছবিতে পবিচিত মানুষের মুখেব ছবিব সাদৃশ্য আবিষ্কার করলেও সেই অতীতেব মুখের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক ছিন্নপ্রায় হয়ে ধবা দেয – সে ধরণের কিছু একটা। মনে হয ছবিগুলি মাতাল হয়ে উঠেছে--জায়গায় জায়গায় রঙ চটে গেছে, আর চিনতে পারা যাচ্ছে না—কিন্তু ছবিগুলি রয়েছে। মনে হয় নতুন ছবিগুলিও ধূসর এবং অস্পষ্ট।

৪

ঘটনাগুলি চিত্র আর ধ্বনি হয়ে তার চোখের সামনে ভিড করছে--সে ঠেলে দূরে পাঠাতে চাইলেও চলন্ত রূপে তাদের দ্রুত যাওয়া আসা ঃ আগের দিন রাতে কন্টোলরুমের সভা – ওপরের হুকুম আর সকালের দায়িত্ব। সকালবেলা তাকে একটা প্লাটুন ফোর্স দেওয়া হল আর সে প্রথমবারের জন্য তার শিরায় শিরায় অনুভব করল একটা উত্তেজনা— সে কোন মিছিলকে বাধা দিতে পারবে, ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ করাতে পারবে আর গুলি চালাতে পারবে। কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে এসে এই নতুন চাকরিতে জয়েন করার পর এই প্রথমবারের জন্য অনুভব করল--সে একটা দুর্বিনীত যন্ত্রের অংশবিশেষ—তার কোন স্বাধীন সত্তা নেই— অধিকার নেই—-ব্যক্তিত্ব নেই। শৈশবেব কিছু স্মৃতিতে দুলছে একটা সার্কাসের তাঁবু -ওপরে ঝুলে থাকা রশি আর রডে দেখা খেলা – আঃ কি ভয়ানক এই পড়ে -এই পড়ে! হঠাৎ পড়ে যেতে পারে। নিচে জোকারটার বাঁদরামি অসহ্য—ওপর থেকে একটা মানুষ পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা অথচ জোকারটা তা-না-না-না না-না সুরে বাঁদরামি আরম্ভ করেছে। মেয়েটি একটা রড ছেড়ে দিল আর পডতে পডতে নিচের একটা রডে ঝুলে রইল। সে তখন ছোট। হঠাৎ ওপরের দিকে তাকাতে গিয়ে সে চোখ বুজে ফেলল। সে মাকে বলল, চল, এখান থেকে বেরিয়ে যাই - আমি দেখব না আমি দেখব না।'

৫.

কি আশ্চর্য যখন একটা বিন্দুতে সবাব চোখ স্থির -একটা কিশোর-প্রাণ সেই বিন্দু দেখে শঙ্কিত। মা বলল- 'দেখ দেখ, কি সুন্দর খেলা খেলছে।'

সে কেঁদে ফেলল, 'মরে গেলে কি হবে?' সে বড় হওয়ার পর মা কখনও কখনও বলে, 'এর এত ভয় জানেন দিদি, ভয় নয়, ওর ভেতরে কি জানি একটা রয়েছে, সহ্য করতে পারে না।'

জ্যাঠা বলে, 'হবে নাই বা কেন?—বাবা যেমন ছিল—কারো শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্ত বেরোতে দেখতে পারত না। একবার কী হলো জান—'

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'আমি কি আর জানি না? কারো শরীর একটু গরম হলেই অস্থির হয়ে পড়ত। ও যখন ছোট, তখন একটু বেশি কাঁদলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ত, আমি জানি না—বেহাগ শুনতে শুনতে টপটপ করে চোখ থেকে জল ঝরে পড়ত। বলত কি জান? মানুষের ভেতরের চোখের জল সুর হয়ে ঝরে পড়ে— কিন্তু অবশেষে আমাকে কাঁদার জন্য রেখে—'

৬.

ভাসতে থাকে একটা মোরগের ছবি—কী তার অহংকার! মাথার ঝুঁটি নাচিয়ে, গলা ফুলিয়ে সে যখন রাজকীয় গাম্ভীর্যে আওয়াজ করে কক কক ক-অ, তার কান নড়তে থাকে, এদিক ওদিক তাকায় আর যেন কাউকে হুকুম দেয়। ওটা ছোট মোরগগুলির গার্জেন হয়ে ঘুরে বেড়ায়। দুলু মামা একটা নতুন জাতের মোরগ এনেছে। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল আগের মোরগটার আর কোন প্রয়োজন নেই। সন্ধ্যের অন্ধকারে রান্নাঘরের বারান্দায় যখন দুলুমামার হাতে ওটা কক কক করে ডাকতে লাগল, পাখা ঝাপটাতে লাগল, শব্দ শুনেই সে দৌড়ে গেল—সে দেখল দুলুমামার হাতের উপর মোরগটা শরীর ছেড়ে দিয়েছে—সে জোরে কেঁদে উঠল, 'কেন মারলে—কেন মারলে? বাঁচিয়ে দাও—বাঁচিয়ে দাও—'

অসম্ভব—বাঁচিয়ে দেওয়া অসম্ভব। জীবন কেবল নেওয়া যেতে পারে—দান করা যায় না। আঃ কী যন্ত্রণা—কেন এই ছবিগুলি বারবার মনে পড়ছে— সে বাধা দিতে চায়— কিন্তু তার মস্তিষ্কের স্নায়ুসন্ধি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে সক্রিয়—অনেক বিচিত্র ছবি প্রবাহিত হতে শুরু করেছে—মানুষের মুখ, জন্তুর মুখ, নৈসর্গিক প্রকৃতি— শহরের রাজপথ—কোথায় কি ছবি আর শব্দের প্রবাহ—দুঃখ আর সুখ—হাসি আর কান্না—

৭.

প্রতিটি মুহূর্ত কি ভয়ানকভাবে বিপজ্জনক। আঘাত অথবা মৃত্যু যেন অদৃশ্য হয়ে রাজপথের পাশে অপেক্ষা করছে—গায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে সে আসতে পারে--পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে আসতে পারে—আত্মহত্যার একটা প্রবল আবেগ হয়ে আসতে পারে—অপ্রতিরোধ্য আর অমোঘ। সে যেন দেখতে পায় তার কলেজ জীবনের বন্ধু রতনের মুখটা। সবাই বলে—কি অভদ্র ছেলে—বড় ছোট মানে না—মুখের লাগাম নেই—মেয়েদের খারাপ কথা বলে—রাস্তায় ভিখারিদের গালিগালাজ করে। কিন্তু কি অদ্ভুত, নিজের খাবারটা নিয়ে ভিখারিদের গালিগালাজ করতে করতে বিলিয়ে দিচ্ছিল। 'শালা তোদের জন্য কিছুই শান্তিতে খেতে পারি না, খেতে গেলেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবি।' সে রতনকে বলল—'তুই যদি ওদের খেতেই দিবি, তাহলে আর গালিগালাজ করিস কেন?' রতন সমান তীব্রতার সঙ্গে জবাব দেয়, 'আমি ওদের গালি গালাজ করছি কোথায়? আমি নিজেকেই গালিগালাজ করছি।' রতনের উত্তর শুনে তার বুকের ভেতরটা যেন ব্যথায় ভরে গিয়েছিল। হঠাৎ তার মনে হয়—সে-ই রতনকে যেন এইমাত্র একটা চলন্ত গাড়ি চাপা দিয়ে গেল—মনে হল রতন চিৎকার করে পড়ে গেছে—একটা বিকট শব্দে গাড়িটা থেমে গেছে— তার মাথাটা ভেঙে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে—মাথার ঘিলু ছিটকে পড়েছে—কলকল করে

রক্তের স্রোত বইছে—মনে হল গাড়িটাতে সে বসে রয়েছে। সে চিৎকার করে উঠল, 'র-ত-ন!' সুপার ইমপোজড হয়ে গেছে—একটার ওপর আরেকটা। পেছনের ছবি ফেড আউট হয়ে গেছে। 'আঃ'— সে মাথাটা চেপে ধরল।

৮.

যাঁতাকলের মত শব্দ হচ্ছে—কর্কশ শব্দ—পাথরের টুকরো গুঁড়ো হওয়ার শব্দ—সে যেন দাঁত শিরশিরানি অনুভব করছে মনে হচ্ছে মাখনীর মুখটা তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তার চিঠির আর্দ্রতা হারিয়ে গেছে আর সে একটা কাঠিন্য নিয়ে যেন পুনরায় বেরিয়ে আসছে। সে যেন ধিক্কার দিচ্ছে, 'ছিঃ ছিঃ কীভাবে হারালে বুকপকেট থেকে— এত অসাবধান! তুমি আর ফিরে পাবে বলে ভাবছ কি? আমি তখনই বলেছিলাম —যাবার দরকার নেই—কি দরকার—বেশি আশা করে কি লাভ.....'

মাখনীর মুখের শব্দগুলি যেন ভীষণ লো-ফ্রিকোয়েন্সিতে ধরা দিচ্ছে—অবশ্যই মাখনীর স্বরতন্ত্রীতে হাই ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব কিন্তু তবুও তার শব্দগুলি স্পষ্ট। কারণ মাখনী আবিষ্কার করেছিল যে তার ভেতরের কয়েকটা তন্ত্রী ভীষণ সংবেদনশীল। কারণ সে যখন ছোট—তাদের ঘর পাশাপাশি ছিল, আর তখনই একদিন বোধকরি বিজয় (এখন সে বড় ঠিকাদার) মাখনীর চোখে ধুলো মেখে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল—মাখনী কাঁদতে শুরু করল। আর সে-ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কাঁদতে শুরু করে। কারণ, তার মনে হয়েছিল—মাখনী কানা হয়ে যাবে--সে আর কোনদিনই কিছু দেখতে পাবে না—' শৈশবের ঘটনাগুলি শুনতে শুনতে সজীব হয়ে রয়েছে। মনে পড়ছে একবার মাখনীর জ্বরে যখন ওদের ঘরে ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, ঔষধের সমাগম, সে সময় সে মাখনীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে একান্ত মনে আর অধীর উত্তেজনার সঙ্গে লক্ষ্য করছিল—তার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ না হয়ে যায়। সে মনে মনে প্রার্থনা করছিল—মাখনী যেন ভাল হয়ে ওঠে। সে মাখনীর পাশ থেকে উঠতে চাইছিল না। মাখনীর মা বলেছিল, 'প্রদীপের মনটা দেখেছ, দিদি, কত কোমল।'

মা বলেছিল, ' একে নিয়ে যে আমার কত চিন্তা কি বলব। আজকের যুগে যে কীভাবে সংসারের পথে এগিয়ে যাবে জানি না।'

—'ইশ ওভাবে ভেবো না, সত্যি সত্যিই সে মানুষ হবে। তার মুখের কোমলতা দেখে এটা অনুভব করা যায়।' সে জোর করে চোখ বুজে নিল আর নিজের ভেতরেই যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করে উঠল, না না, আমার কোন কোমলতা নেই—মিথো কথা, মিথ্যে কথা—'

৯.

সে অনুভব করল— রাতের নগরের নিস্তব্ধতা মৃতের শ্মশানে রূপান্তরিত। তার রুমে থাকা ঘড়িটার টিকটিক শব্দ যেন অতিশয় কঠিনভাবে সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে দিচ্ছে। বাইরের ছায়া আর অন্ধকার ভেন্টিলেটারের কাঁচে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেছে—তার ছোট ঘরটা যেন একটা ছোট দুর্গে রূপান্তরিত হয়েছে। মনে হচ্ছে—চারপাশে দিনের মিছিলের মানুষগুলি এসে জমায়েত হয়েছে। তারা যেন একসঙ্গে চিৎকার করে উঠতে চাইছে—সে তাদের চিৎকার শোনে নি, কিন্তু চিৎকাররত চোখমুখের ছবিগুলি দেখেছে ঃ উত্তেজিত আর আন্তরিক। হাতের মুঠোগুলি ওপরে উঠছে, গলার শিরাগুলি ফুলে উঠেছে, মুখগুলি রোদে লাল হয়ে উঠেছে, ঘামে মুখগুলি চকচক করছে। ধীরে ধীরে

সে যেন তাদের মুখের শব্দগুলি শুনতে পাচ্ছে। তার মনে হয়—মানুষগুলির মধ্যে রতন আছে, মাখনী আছে, মাখনীর ফুটফুটে ফ্রকটা জ্বলজ্বল করছে, আর কি আশ্চর্য! যেন একটা হাফ প্যান্ট আর হাফ শার্ট পরে সেও তাতে রয়েছে। আলোতে মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে—ওরা একেবারে কাছে এগিয়ে আসছে--তার দিকে যেন হাতগুলি মেলে দিয়ে আসছে—সে ঘামছে, উত্তেজনায় ঠকঠক করে কাঁপছে আর হঠাৎ সে তার প্লাটুনটার দিকে ঘুরে তাকিয়ে দেখে লৌহ কঠিন কাঠিন্যে ওরা স্থির হয়ে রয়েছে। সে মানুষগুলির দিকে তাকাচ্ছে—তার দৃষ্টি উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছে—তার মাঝখানে যেন মায়ের মুখখানা, আর মা বলছে, 'এর মধ্যে কি জানি একটা আছে'— না না সে জোর করে চোখ মেলে ধরেছে—তীব্র রোদ তার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে—সে জোরে জোরে কাকে ধমকাচ্ছে—কি বলছে সে বলতে পারে না—কার কথা মনে পড়ছে –সে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠছে—

রোদের তীব্র আলোতে রাজপথের মিছিলের সামনে প্রদীপ—দু'হাতের মুঠির এক হাতে বিবেক আর একহাতে বারুদ। বর্মের মধ্যে আবৃত তার মুখমণ্ডল ইস্পাতের মত কঠিন। সে চিৎকার করে উঠল—বোধহয় সেভাবেই চিৎকার করে উঠল, 'ফায়ার।' মুহূর্তের মধ্যে দেখল—একটা ছেলে, কে জানে একসময় তার মত, কে জানে হয়ত পিতৃহীনও হতে পারে—মায়ের একমাত্র ছেলে হতে পারে—কে জানে তার নাম প্রদীপ হতে পারে, –কিছু একটা উচ্চারণ করার জন্য দুটো ঠোঁট গোল করেছিল মাত্র—'মা' বলে পড়ে গেল, জলের ছবি ভেঙে যাবার মত তার সামনের দৃশ্য একটা আর্তনাদ করে ভেঙে গেল আর একটা অসম্ভব হাই ফ্রিকোয়েন্সির কোলাহলে দুপুরের তীব্র রোদ বিদীর্ণ হতে থাকল।

১০.

তার বুকপকেট থেকে কি একটা মূল্যবান জিনিস হারিয়ে গেছে—মাখনী বলেছে, 'কীভাবে হারালে বুকপকেট থেকে এত অসাবধান তুমি, আর ফিরে পাবে বলে ভাবছ কি?' মাখনীর জায়গায় যেন সুপার ইমপোজড হয়ে ধরা দিয়েছে একটা মোবগ— কি অহংকার আর গাম্ভীর্য তার। পরমুহূর্তেই সে দেখেছে দুলুমামার হাত থেকে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে আর হাফ প্যান্ট পরা একটা ছেলে কাঁদতে কাঁদতে দাবী করছে—বাঁচিয়ে দাও—বাঁচিয়ে দাও--'

ছবির রীল শেষ হয়ে গেছে। একটা বিন্দুতে এসে স্থির হয়েছে। সে অন্ধকারের মধ্যেও যেন চোখ মেলে দেখছে—গতকাল দুপুরের সেই ছেলেটি আর কেউ নয়, আশ্চর্যের কথা, সে নিজে। তার পরনে হাফ প্যান্ট আর হাফ শার্ট—বোধহয় ঠোঁট দুটো গোল করে কিছু একটা সে বলতে চেয়েছিল আব ঠিক সেই মুহূর্তে সে তাকে, তার নিজের শৈশবকে, তুলে দিল দুলুমামার দুই কঠিন হাতে মধ্যে। অনুভব করল তার গলা দুটো হাতের মধ্যে ঢুকেছে।

(উপসংহার)

যীশু তা শুনে তাঁদের বললেন, নীরোগ মানুষের চিকিৎসকেব প্রয়োজন নেই, রোগীদেরই আছে। আমি ধার্মিক নয়, পাপীদেরই নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

কাহিনীর মতো

প্রশান্ত কুমার দাস

স্বাধীনতার জন্যে ওপারে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, খান সেনার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ। বাবার মুখে শোনা ওপারেব দেশের কাহিনী আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল, আর সেজন্যেই কাহিনীগুলি আবও বিস্তৃতভাবে বলার জন্যে অথবা আবার নতুন করে বলার জন্যে বাবাকে বারবার অনুরোধ করছিলাম। বাবার বলা সেই দেশ আর স্বাধীনতার কথা শুনে শুনে আমিও যেন তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। সে প্রেম ছিল কোন নিষিদ্ধ প্রেমেরে মতোই।

সীমান্ত থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে উঁচু পাহাড়ের নিম্ন সমভূমিতে ছিল আমাদের গ্রাম। গ্রামের প্রবেশ মুখের পথের পাশে একটা দোকানে দর্জিব কাজ করে বাবা আমাদের লালন পালন করছিলেন। সময় পেলে বাবা আমাকে প্রায়ই কাঁধে বসিয়ে পাহাড়টার উপরে উঠে যেতেন। পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু টিলাটির উপর উঠে বাবা অনির্দিষ্ট কোন এক দেশের দিকে আঙ্গুল তুলে বলতেন 'দেখ, ঐ জায়গাটিতেই ছিল আমাদেব দেশ।'

আর আমি বাবার মুখে প্রথম শুনেছিলাম দেশের কথা। কিন্তু দেশ মানে কী কোনকালেই আমি' বাবাকে জিজ্ঞেস করিনি। কী এই দেশ। আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার উপলব্ধির মধ্যেই আমি অনুভব করতে শুরু করেছিলাম দেশের অস্তিত্ব। সে সময় মোটামুটি বুঝেছিলাম যে দেশ মানে দিগন্তে বিলীন হয়ে থাকা একটা নীলাভ সবুজ সমতল ভূমি, যাকে পাহাড়ের উঁচু টিলার উপর থেকে দেখা যায়।

বাবার বলা দেশের কাহিনীগুলোকে কিংবদন্তী বলে মনে হত। বাবা বলেছিল- 'দেশে আমি করতাম দেশে আমি কখনো ওটা করিনি, দেশে এটা পাওয়া যায়, দেশে এর থেকে অনেক ভালো ছিল তা তোমরা আর কখনো বুঝবে না গো।' আমার মনে আছে একদিন কাজ থেকে ফিরে এসে

বাবা মা-কে বলেছিল, 'দেশে যুদ্ধ চলছে, খানসেনা আর থাকবে না। আমবা আবার দেশে ফিরা যাইতে পারুম।'

দেশে ফিরে যাবার বিহ্বলতা বাবার এতটা তীব্রতর হয়ে পড়েছিল যে কোন যুক্তি ছাড়াই তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন যে মুক্তিযুদ্ধের পরে দুটো দেশ পুনরায় একাকার হয়ে যাবে। একদিন পরম প্রত্যাশা আর উৎসাহের সঙ্গে যাত্রা করবেন দেশে, যেখানে তার শৈশব-কৈশোর আর যৌবনের রঙিন স্মৃতিগুলি ফেলে এসেছেন। বাবা কেন এমনটা ভেবেছিলেন আমি আজকেও বুঝতে চেষ্টা করি। একটা সাধারণ দর্জির কাজ করা আমার বাবা সে সময়ে শোনা অজস্র উড়ো খবরের আধারে এরকম একটা কল্পনা করে হয়তো নিজেকে তৃপ্ত করতে চেয়েছিলেন। তবুও 'দেশে ফেরার' এই অন্তহীন আশা বাবা মনের মধ্যে শেষদিন পর্যন্ত পুষে রেখেছিলেন।

গ্রীষ্মের এক দুপুরবেলা বাবার অনুপস্থিতিতে, মা'র অজ্ঞাতে স্কুল পালিয়ে মেলা দেখতে যাওয়া অবাধ্য ছেলের মতো পাহাড়টা অতিক্রম করেছিলাম আর এমন একটা দেশের মাটিতে পা রেখেছিলাম, যেখানে সত্যি সত্যিই কিছু একটা আরম্ভ হয়েছিল, যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের মতো। মুক্তির অদম্য কল্পনার মধ্যেই যে মনের মধ্যে কোন এক দেশের অস্তিত্ব গড়ে ওঠে, তা আমি বহুকাল পরে আবিষ্কার করেছিলাম। কাজের সন্ধানে সীমান্তের সেই ছোট্ট গ্রামটা ছেড়ে আমি চব্বিশ কিলোমিটার দূরের একটা মহানগরে চলে গিয়েছিলাম। আর নকসালাইট মুভমেন্টের এক বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীব সঙ্গে জড়িত হবার মধ্য দিয়ে আমি স্বাধীনতাবোধের ইতিহাস বিশ্লেষণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আর একটা সময়ে আমি যখন একটা দৈনিক খবরের কাগজে রাজনৈতিক নিবন্ধ লিখতে শুরু করেছিলাম, স্বাধীনতা চেতনার তাত্ত্বিক কথাবার্তার সঙ্গেও গড়ে উঠেছিল পরিচয়। কিন্তু সেই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলি আমাকে কোনমতেই বোঝাতে পারছিল না—কেন দেশ শেষ হয়ে যায়, কাঁটাতারে চিহ্নিত হয়ে একটা নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করার পর। আর কেন সেই সীমানাতেই শেষ হয় স্বাধীনতাবোধের ব্যাপ্তি।

আমি দেখেছিলাম—সীমান্তে ব্যগ্র ব্যাকুল জনতার ভিড়। তাতে এ ধরণের কিসের যেন গোপন প্রস্তুতি চলছিল, তা ছিল কোন নিষিদ্ধ প্রাপ্তির প্রস্তুতি। দিন রাত চলছিল অস্ত্রের প্রশিক্ষণ, যুদ্ধের কুচকাওয়াজ। এ পারের আর্মিরা হাতে বন্দুক নিয়ে লুঙ্গি পরে ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল আর বিলীন হয়ে গিয়েছিল ওপারের সেই মুক্তিপ্রয়াসী জনতার ভিড়ে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা আমি কৌতুহলের সঙ্গে উল্টোতে শুরু করেছিলাম আর দেখেছিলাম বিশাল জনসভায় ভাষণরত মুজিবর, হাত উত্তোলিত করে স্লোগান দেওয়া মানুষ, সারি সারি ট্যাঙ্ক, আগুন, শবদেহ, শকুন আর রেডিও-তে কান পেতে রাখা উৎসুক জনতার সারি, আর হাসিমুখে যুদ্ধ ফেরৎ মুক্তিসেনাকে ছুঁয়ে দেখার জন্যে জনতার আকুল ব্যাকুল মনোভাব। এই একই ঘটনাকে যেন বুঝিয়ে আমাকে কৈশোর কালের কোন কিংবদন্তী কাহিনীর মতোই শুনিয়েছিল। তাই কখনো কখনো এমন মনে হচ্ছিল—আমার ইতিহাস বইয়ে দেখা ছবি এবং অক্ষরে বর্ণিত কাহিনীগুলির সঙ্গে বাবার কাহিনীগুলি যেন একাকার হয়ে পড়েছে। আমার বাবার জন্যে দেশে দুবার স্বাধীনতা এসেছিল। একবার দেখার মধ্যে, একবার শোনার মধ্যে। কিন্তু দুটো উপলব্ধির মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। কিন্তু বৈপরীত্য ছিল না, কারণ তার আধার ছিল সেই একটাই দেশ, যেখানে অনেকদিন আগে মানুষ একত্রিত হয়ে স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছিল, হয়তো তারও অনেক আগে রাজপথে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল ফাঁসি কাঠে প্রাণ দেওয়া সিপাহীদের জন্যে।

বাবা যুবক অবস্থায় মৈমনসিঙের 'লক্ষ্মীনারায়ণ টেইলরিঙের বারান্দায় বসে কাপড় সেলাতেন। সেই দিনগুলিতে বাবা দেখেছিলেন রাজপথ দিয়ে অতিক্রম করে চলেছে সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা, দেখেছিলেন সত্যাগ্রহ, অনশন আর দেখেছিলেন কাছারিতে জ্বলে ওঠা লেলিহান অগ্নিশিখা। 'নয় আগস্টের' ঘটনায় বাবাও কাজ বাদ দিয়ে রাজপথের অন্তহীন মিছিলে সামিল হয়েছিলেন। তারপর সেই ভয়ঙ্কর আকাল 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'। হাতে শূন্য পাত্র নিয়ে লঙ্গরখানায় ক্ষুধার্তদের হাহাকার, মানুষের কঙ্কালসার চেহারা আর কেবল শবদেহ আর শবদেহ। পচা গন্ধ আর শকুনের সমারোহ।

তারপর একদিন মধ্যরাতে আমার বাবা দেখেছিল—হঠাৎ ধপ করে সব জায়গায় অন্ধকার হয়ে গেছে আর আচম্বিতে হাজার রঙীন আতসবাজিতে ভরে উঠেছে রাতের আকাশ, ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে উল্লসিত জনতার ঢেউ। বিস্মিত মোহমুগ্ধ আমার বাবাকে কে যেন বলে উঠল—'আমরা অহন থাইক্যা স্বাধীন হৈলাম।'

বাবাই বলেছিল এই গল্পটা। কিন্তু এই স্বাধীনতার মানে কি? স্বাধীনতার মাধ্যমে মানুষগুলি আসলে কী পেতে চেয়েছিল? স্বাধীনতা মানে নিজের অধীন? কে সেই নিজ? যে স্বয়ং? নিজের অধীন হওয়ার মধ্যেই সেই অন্তহীন মুক্তি? আল্টিমেট ফ্রিডম? আমি ভাবি আর মনে হয় যেন স্বাধীনতা মানে কিছুই নেই, কেবল এক উপলব্ধি, যা গড়ে ওঠে স্বাধীনতাহীন বলে ভাবা অন্য এক উপলব্ধির মাধ্যমে। কে জানে স্বাধীনতা কেমন। হয়তো এর চেয়েও ক্লান্তিকর, একঘেয়ে আর অসহনীয়।

তবু একটি নতুন দেশ বা স্বাধীনতার উপলব্ধি কী যে অদ্ভুত মাদকতায় ভরাতো আমি নিজেও পরবর্তীকালে অনুভব করেছিলাম। কাজের সন্ধানে মহানগরে দিশাহীন ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম আর একদিন একটি গোপন আস্তানায় হাজির হয়েছিলাম। কে যেন আমাকে ফিসফিস করে বলেছিল—'ঐ যে আমাদের চারু মজুমদার।' তারপর আমরা গোপনে যুদ্ধের পাঠ নিয়েছিলাম আর এ সমস্ত করার মাধ্যমেই আমি অনুভব করতে শুরু করেছিলাম অন্য এক দেশ, অন্য এক স্বাধীনতার। নেশার মতোই ছিল সে উপলব্ধি। নদীর পিচ্ছিল শুকনো বালিকণার মতোই ছিল স্বাধীনতা, যেন যত জোরেই মুঠি মেরে ধরে রাখার চেষ্টা করা যায়, ততই মুঠি আলগা হয়ে বেরিয়ে যায়। না-পাওয়ার মধ্যেই পাওয়ার সেই গভীর উপলব্ধি।

রেঙ্গুনবাড়ির মিটারগজ স্টেশনে সকাল সাতটায় রেলগাড়িতে উঠে কাজে যেতে হতআমার বাবাকে। কিন্তু সবখানেই যেন কেমন একটা থমথমে ভাব। বাবার দোকানে নতুন করে কামিজ সেলাই করার জন্যে কারোরই যেন কোন উৎসাহ ছিল না। আর একদিন রাতের বেলা রেলগাড়ি থেকে নেমে যখন শূন্য হাতে বাড়ি ফিরছিলেন, হঠাৎ এক দল লোক বাবাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল। 'তুমরা এইহান থাইক্যা যাওন লাগবো, এইটা অহন তুমাগো দেশ না।'

এই দেশ বলে জায়গাটা যে সত্যি সত্যিই কী অদ্ভুত ছিল। কেন মানুষ মাটির উপর আঁচ টেনে, সেই আঁচে আঁচে কাটাতার দিয়ে ঘেরাও করে এক একটি দেশ, মাইলের পর মাইল দৈর্ঘের সীমানার সৃষ্টি করে, ভাবতে শুরু করে—এই, এই আমার দেশ। জানার জন্যে চেষ্টা করার মধ্যেই এই সমস্ত আমার কাছে আরো অধিক দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। বাবার বলা কাহিনীগুলোকে অন্য রূপে দেখেছিলাম ইতিহাসের পাতায়—সীমান্ত অতিক্রম করে আসা সেই ট্রেন, কামরার ভেতরে বাইরে অগণিত জনগণ—যেন তা ছিল অনিশ্চয়তার অবসান ঘটানোর জন্যে অন্য এক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাত্রা করা। আর বাবা বলেছিলেন—'আমরা তহন শুনছিলাম ওইপার থেইক্যা ট্রেনে কইরা আইছিলো খালি লাশ আর লাশ।'

অনেকদিন পরে হিস্ট্রি চ্যানেলের 'দেশভাগ' নামে একটি ডকুমেন্টারিতে দেখেছিলাম কীভাবে বাবার কাহিনীগুলি দৃশ্যময় হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে, আমার চেতনায়। চট করে একটা আলো জ্বলে উঠেছিল আর দেখছিলাম—একটা ম্যাপ, যা ক্রমশ zoom in হওয়ার মতো সামনে চলে আসছে আর ক্রমান্বয়ে প্রকট হয়ে উঠছে একটা বিন্দু থেকে আঁকাবাঁকা পথে গতি করা একটা রেখা, যা পুনরায় বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। আমার মনে হচ্ছিল যেন—ডকুমেন্টারির সেই গ্রাফিকসের লাল রেখাটা যেভাবে মুহূর্তের মধ্যে দেশ নামে একটা ক্ষেত্রফল তৈরি করেছিল, তার চেয়েও কোন ধরণে পৃথক ছিল না লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে গড়া সেই দেশ সৃষ্টির উপলব্ধি। আমি অনুভব করতে চেষ্টা করছিলাম—একটা সময়ে যখন সেখানে কোন সীমা ছিল না, মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছিল। তারপর হঠাৎ একদিন অদৃশ্য এক আঁচ টেনে দেওয়া হলো তাদের ক্ষেতখামারের মধ্য দিয়ে, উঠোনের মধ্য দিয়ে, মাঠ ময়দান আর তাদের আসা-যাওয়া করার পথের মধ্য দিয়ে। আর হঠাৎ ভাগ হয়ে গেল তাদের দেশপ্রেম, স্বাধীনতাবোধ, আর এমনকি তাদের জাতীয়তাবোধের সেই উঁচু সৌধটাও। আচম্বিতে মানুষ ভূতগ্রস্তের মতো ভাবতে শুরু করল—'ওই দেশটা আমাগো এই দেশটা আমাগো না।'

একদিন ক্লান্ত বিষণ্ণ বাবা রাতের পথে কাজ থেকে ফিরে আসছিলেন। ঘরমুখী পথে যারা বাবাকে ঘিরে ধরেছিল, তাদেব মুখ বাবা অন্ধকারে চিনতে পারেন নি। কিন্তু কে জানে স্বাধীনতাব আগে তাদের কারো কারো জামা বাবা সেলাই করেছিলেন কিনা? কে বলতে পারে সেই নতুন জামা পরে সে বাবাকে ইফতারের নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল কি না?

ইতিমধ্যে মহামারীব মতো চারদিকে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ছিল। কে যেন পাড়াতে পাড়াতে আগুন জ্বালিয়ে গিয়ে গিয়েছিল, দা দিয়ে পুরুষদের কেটে ফেলছিল, মেয়েদের ধর্ষণ আব ছোট ছোট বাচ্চাদের ধরে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল। সেই আতঙ্কময় আর শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের পরিবারের অন্য এক জীবন শুরু হয়েছিল। বাবা ঘরের চালের খড় সরিয়ে নতুন টিন লাগিয়েছিল, একদিন দিন দুপুরবেলা একদল মানুষ এলো আর সেই টিন খুলে নিয়ে গরুর গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে চলে গেল। সেদিন রাতে ঘরের ভেতর থেকেই দেখা গেল অর্ধচন্দ্রের খোলা আকাশ। মা-বাবা একজন আরেকজনেব পাশে বসে যখন সারাটা রাত জেগে বসে কাটিয়েছিলেন ঠিক তেমনই এক সময়ে হঠাৎ দরজায় যখন টোকা পড়ল— 'দরজা খোল, এই যে আমি।'

—কে আমি?'

—আমি, তোমার দোস্ত।'

বাবা-ই দরজা খুলে দিয়েছিল আর উর্দ্ধশ্বাসে ভেতরে ঢুকে বাবার দোস্ত বলতে শুর করল—'জলদি কর, তোরা এইহান থেইক্যা পলাইয়া যাওন লাগবো অহন। ওরা আইতাছে।'

বাবার দোস্তের আনা ঘোড়ার গাড়িতে করে তার দুই বন্ধুর পাহারার মধ্যে রাতেব অন্ধকারে আমাদের পরিবার আরম্ভ করেছিল যাত্রা— দেশের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে অন্য দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা। গ্রেভেলিং করা ছোট একটা পথ দিয়ে শব্দ করে গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিল, কারো মুখে কোন কথা ছিল না। কানে আসছিল যেন বহু দূরে অজস্র মানুষ চিৎকার করে উঠছে। আর হঠাৎ দেখা যাচ্ছিল ছেড়ে আসা গ্রামের পথে আগুনের লেলিহান শিখা। সে আগুনে আমাদের গ্রামটা বা আমাদের ঘর পুড়েছিল কিনা তা আজও আমি জানতে পারলাম না, কিন্তু তার উত্তাপে মা-বাবার হৃদয় যে জ্বলে পুড়ে গিয়েছিল তা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলাম।

আমার বাবা বলেছিলেন আমরা নাকি খুব নিঃস্ব পরিবারের। আমাদের কোন জমিজমা ছিল না। আমরা একটা কায়স্থ পরিবারের আশ্রিত ছিলাম, তাদেরই জমি ছিল। আমার কবিরাজ দাদু অভাব থেকে উদ্ধার না পেলেও 'ঠাকুরদা' বলে সম্বোধনটাই ছিল তার একমাত্র আত্মতুষ্টির কারণ। আর দেখেছিলাম, পৈতৃক জীবিকা থেকে সরে এসে দর্জির কাজ করা আমার বাবাও এই আত্মতুষ্টির হাত থেকে রেহাই পান নি। তিনি প্রায়ই বলতেন – 'তোর মা কে সারা গ্রাম 'ঠাকরইন' বইল্যা ডাকত।'

রাত সাতটার মিটার-গেজ ট্রেনে উঠে মৈমনসিঙে যাওয়া বাবা স্বাধীনতার অনেক খবর নিয়ে আসতেন। সেলাই মেশিনের ঘরঘর শব্দের তালে তালে এক টুকরো কাপড় থেকে একটা নতুন জামা প্রস্তুত হওয়ার যে প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়ার মতই যেন দেশের স্বাধীনতার প্রস্তুতি চলছিল। দোকানের বারান্দায় মেশিন চালাতে চালাতে বাবা শুনেছিলেন— জিন্না সাহেব আসছে, জওহরলাল আসছে। আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা দেওয়া মানুষগুলি নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করছিল জওহরলাল না জহরলাল, নেহরু না নেহেরু।

একদিন লক্ষ্মীনারায়ণের সমস্ত কর্মচারী দোকানের বারান্দা থেকে অবাক আর ভীতগ্রস্ত দৃষ্টিতে দেখতে পেল—ক্ষুব্ধ মানুষের এক মিছিল, সবুজ পতাকা, আর সমবেত চিৎকার করে ওঠা শ্লোগান---'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।'

পাহাড়ের উঁচু একটা টিলায় বসে বাবা আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন সেই দিকে, যেখানে তার নিজের একটা দেশ আছে বলে ভেবেছিলেন। কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম দূর দিগন্তে বিলীন হওয়া সেই নীলাভ সবুজ রঙের সমতলভূমির দিকে, সেটা ছিল ক্যামেরা 'টিল্ট ডাউন' করে নেওয়া একটা ল্যাণ্ডস্কেপের মত।

বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'এইহান থেইক্যা তোমার দেশ কত দূর বাবা?'

'অনেকদ্দূর।'

আমি আজও বুঝতে পারলাম না এই অনেক দূর মানে ঠিক কত দূর। কত দূর চলে গেলে একজন লোক দেশ থেকে 'অনেক দূরে' অবস্থান করে? এই 'অনেক দূরত্বের' উপলব্ধির মধ্যেই নাকি বাবার মনে দেশের অস্তিত্ব তীব্র হয়ে উঠেছিল দিন দিন, যা ছিল দূরত্বহীন ভাবে কাছে। বাবা ভেবেছিলেন—তিনি দেশহীন, তাঁর আর এখন কোন দেশ নেই। এই নেই নেই এর মধ্যেই নাকি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাবার সেই দেশ। চেতনার মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়ান একটা নিজের দেশের ভব বাবাকে এতটাই ন্যুব্জ করে তুলেছিল যে আশ্চর্যকরভাবে সেই ভরের অসহনীয়তা যেন আমি নিজেও আমার মধ্যে অনুভব করেছিলাম। পাহাড়ের উঁচু টিলাটিতে উঠে দুই হাত মুঠি করে একটা বাইনোকুলারের মত করে সেই মুঠির ফুটোর মধ্য দিয়ে তাকিয়েছিলাম বাবার সেই দেশের দিকে। আর টিলায় বসে দৃষ্টির সামনে আঙ্গুল দিয়ে মেপে নিচ্ছিলাম সেই দেশের দূরত্ব, চার আঙ্গুলের বেশি যে দূরত্ব ছিল না। আমি ভেবেছিলাম যে দেশের দূরত্ব মাত্র চার আঙ্গুলের। আর চার আঙ্গুলেব এই ব্যবধানের ধারণার ভিত্তিতে আমি মুক্তিযুদ্ধকে অনুভব করতে শুরু করেছিলাম, অনুভব করছিলাম দেশের স্বাধীনতাকে। কোন এক অন্তহীন চূড়ান্ত মুক্তির প্রয়াসে একটা স্বাধীন দেশের খোঁজে গোপনে কুচকাওয়াজ করতে করতে একদিন মহানগরে আমি সেটেল্ড হয়ে গেলাম। আমার ছেলে মেয়ে হল। তারা স্কুলে যেতে শুরু করল। সত্রীয়া নাচের কোন এক স্কুলে নাম লেখাল আর একদিন দেশের গৃহমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এল একটা নোটিশ--দেশ ত্যাগের।

আমি অফিসে অফিসে বিভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। দৈনন্দিন হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও পি.আর.সি, রেশন কার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট, টেলিফোন বিল, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটাধিকারের লিস্ট— ঠিক এই ধরণের অনেক বিরক্তিকর কাজের জন্যে আমাদের লাইনে দাঁড়াতে হয়েছিল। কিন্তু তার পরেও কিছুতেই আমি প্রমাণ করতে পারছিলাম না যে আমি এখানেই, এখানেই আমার দেশ অথবা এখানকার সমস্ত কিছুর মধ্যেই আমি দেশকে ধারণ করে আছি।

আমার বাবা বলেছিল—গ্রীষ্মের এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে, হাতে ষাট টাকা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে মার সঙ্গে ট্রেনে উঠেছিল। শঙ্কিত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যাত্রীতে ভরে গিয়েছিল কামরাগুলি। দাঁড়ানোর জায়গা নেই, বসার জায়গা নেই। একটা নতুন দেশের অভিমুখে দূর দিগন্তে ট্রেনটা বিলীন হয়ে না যাওযা পর্যন্ত স্টেশনে ছিল বাবার দোস্ত। কামরার মধ্যে উপচে পড়া যাত্রীদের বুকের গভীর বোঝা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ট্রেন। বাইরে দেখা যাচ্ছিল—ক্রমশ মিলিয়ে যাওয়া ছেড়ে আসা দেশের ছবি—গ্রাম, মাঠ, নদী আর রেল লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিক্ষুব্ধ মানুষের ট্রেনের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে ফেলা পাথর-বৃষ্টি।

মা কোনদিন এত দীর্ঘ ট্রেনযাত্রায় ওঠেনি। মা ভাল করে জানতেনও না কোন নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে এই যাত্রা? কোথায় এই ইণ্ডিয়া? ইণ্ডিয়া কি অনেক দূরে? আর এটাও জানতেন না ইণ্ডিয়াতে কি রয়েছে সেই দেশ যাকে মা পেছনে ফেলে এসেছেন। হঠাৎ হুশ করে শব্দ একটার সঙ্গে সমস্ত ট্রেনটা অন্ধকার হয়ে পড়েছিল। মা চমকে উঠেছিলেন। আমাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন মা। আমি ছিলাম আরো গভীর অন্ধকারে, একটা ভ্রূণের স্থিতিতে। রাজমহল পাহাড়ের সুড়ঙ্গের অন্ধকারে হঠাৎ প্রবেশ করা সেই মুহূর্তটির কথা মা আমাকে অনেকবার বলেছিলেন ' মার মনে সেই অন্ধকারের অর্থ কি ছিল? মা কি ভেবেছিলেন যে অন্ধকার কেন সবসময় আলোর বিপরীত? দেশ ছেড়ে দেশের সন্ধানে যাত্রা করার মুহূর্তে সেই অন্ধকার হয়ে যাওয়া ক্ষণটিকে আর কোনদিনই মা-বাবা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। যা আসলে ছিল না আলোর বিপরীতে, তা ছিল অন্ধকার মনে হওয়া এক প্রকার আলো, আলোর মাঝেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া এক অন্ধকার।

দু'দিন পরে একটা স্টেশনে অস্ত পড়েছিল ট্রেনযাত্রার। স্টেশনের মাঝখানে হাজার পোটলা পুঁটলি নিয়ে পড়েছিল ক্লান্ত অনাহারী মানুষের দল। পরের দিন মা-বাবাকে রেললাইনের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল একটা শরণার্থী শিবিরে। কোন 'নো ম্যানস ল্যাণ্ডে' ছিল সেই শিবির। কিন্তু হাজার অনুসন্ধান করে আমি জানতে পারি নি—সেই শিবিরটার অবস্থান আসলে কোথায় ছিল—সীমার এপারে না ওপারে? এদেশে না ওদেশে? না কোথায় ছিল সেই শিবির, যেখানে কয়েকমাস পরেই আমার জন্ম হয়েছিল।

কর্ণেল এন্থনির এপিটাফ

প্রশান্ত রাজগুরু

কর্ণেল এন্থনি।

এই মানুষটি, সত্যি সত্যিই কর্ণেল ছিলেন কি না সেটা কারো জানা নেই। কিন্তু তিনি যে সেনাবাহিনীতে ছিলেন সে ব্যাপারটা নিশ্চিত আর উচ্চপদে থাকাটাও সমান সত্য। শহরের যে সমস্ত লোকরা কর্ণেল এন্থনিকে জানে, তারা দূর থেকে আগত অতিথিকে বেড়াতে বেরোতে নিয়ে পথে কর্ণেলকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বল তো ঐ লোকটির বয়স কত হতে পারে?' অতিথির পক্ষে হঠাৎ দেখা একটা লোকের বয়স নির্ণয় করা সহজ নয়। তখন গৃহস্থ গৌরবের সঙ্গে বলেন— 'বাহাত্তর। কেউ দেখলে বলবে কি এই লোকটির বাহাত্তর বয়স হয়েছে? দেখেছ, কি সুন্দর চেহারা!'

কর্ণেলের চেহারা থেকেও তার পরিপাটি নিত্য-নতুন সাজ পোষাক তাকে আকর্ষণীয় করে তোলে আর প্রতিদিনই তিনি হয়ে পড়েন এক নিত্য নতুন আকর্ষণ। প্রচণ্ড গরমেও তার গলা টাইয়ের কঠিন বাঁধন থেকে মুক্ত হয় না। মোটের উপর সুন্দর এক গোছা গোঁফ সহ কর্ণেল এন্থনি বয়স কাবু করতে না পারা একজন সুন্দর গঠনের পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি।

কিন্তু কর্ণেল এন্থনির পরিচয় কেবল ওটুকুই নয়। যারা কর্ণেলকে ভালভাবে জানেন, তারা কর্ণেলের এই পরিচয়ে সন্তুষ্ট হবেন না। কর্ণেল এন্থনিই আমি দেখা একমাত্র অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক যে আজ পর্যন্ত কোনদিনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিজের সাহসী যুদ্ধেব বর্ণনা দিয়ে যুদ্ধোত্তর যুগের অবকাশের সময়গুলি অপব্যবহার করেন নি। মোটের উপর কর্ণেলের মুখে আমি আজ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধ কেন তিনি বিশ্বযুদ্ধের সময় কোথায় ছিলেন তাও শুনতে পাই নি। কিন্তু তিনি যে সে সময় সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন সে ব্যাপারটা নিশ্চিত।

এম্বুনির পরিচয় এখনও অসম্পূর্ণ। এম্বুনির চরিত্রের বাহ্যিক দিকটার মাত্র পঁচিশ শতাংশ পরিস্ফুট হয়েছে। বাকি পঁচাত্তর শতাংশকে ঢেকে ফেলেছে 'শৃঙ্খলা' অথবা এম্বুনির নিজের ভাষায় 'ডিসিপ্লিন' শব্দটা। তাঁর দৃঢ় ধারণা তিনি একজন সাধারণ সিভিলিয়ান নন। তাই অবসরের পরেও তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলতে চেয়েছিলেন। ঘরের প্রত্যেকেই কর্ণেলকে বাঘের মত ভয় করতেন। তিনি নিজেও এই ভয় পাওয়া ব্যাপারটাকে বেশ উপভোগ করতেন আর সবার অজান্তে মুখ টিপে হাসতেন। হাসতেন,— স্ফূর্তিতে নয়, আত্মসন্তুষ্টিতে। মনে করতেন,- -'দেখ, কি সুন্দর শৃঙ্খলা আমাব ঘরে!' তিনি আশেপাশের সমস্ত কাজকর্মও শৃঙ্খলাবদ্ধ হওযাটা আশা করতেন। (কিন্তু তাঁর ইচ্ছেমতো কাজগুলি হতো না)। নাতিরা কিছু হলেই জোরে জোরে কান্না শুরু করে দিত আর এভাবে কাঁদতে শুনলেই দ্রুত ঘরে প্রবেশ করে চোখ বড় করে চিৎকার করে উঠতেন—'এই ডিসিপ্লিন।' সঙ্গে সঙ্গে নাতির কান্না ফোঁপানিতে পরিণত হত। কি মারাত্মক শৃঙ্খলা!

কর্ণেলের স্ত্রী কোথাও যেতে চাইলেও যেতে পারেন না। যাবার আগের দিন স্ত্রীকে একটা 'টাইম টেবিল' সাবমিট করতে হবে। তিনি কখন বেরিয়ে যাবেন, কাব ঘরে কতক্ষণ বসবেন, কখন ফিরে আসবেন সমস্ত কিছুই তাতে থাকতে হবে। উক্ত টাইম টেবিল কর্ণেলের মনঃপুত হলে তিনি গ্রহণ করবেন, আর ঠিক একইভাবে নিজের জন্যে একটা টাইম টেবিল তৈরী করবেন—স্ত্রী বেরিযে যাবার পরে তিনি কী কী করবেন, বন্ধু বান্ধবদের কখন সময় দেবেন—ইত্যাদি।

এতটা শৃঙ্খলার মধ্যেও, কখনও কখনও বিশৃঙ্খলা যে কর্ণেলকে বিরক্ত করে না তা কিন্তু নয়। ঘটনাটা ঘটেছিল ছেলে দীপু দিল্লিতে যাবার সময়। এক সপ্তাহ আগেই কর্ণেল ছেলেকে হুকুম করলেন—'টাইম টেবিল' তৈরি করবার জন্যে। দীপু এভাবে টাইম টেবিল তৈরি করল : রাত এগারোটার সময় মরিয়ানি থেকে ট্রেন দিল্লি অভিমুখে রওয়ানা হবে। সেই অনুসারে রাত সাড়ে আটটার সময় যোরহাট বাস আড্ডার উদ্দেশ্যে রিক্সায় যাত্রা করতে হবে। রাত ৯-৩০ মিনিটে বাস যাবে মরিয়ানি অভিমুখে, ১০-১৫ মিনিটে বাস মরিয়ানি পৌছাবে। মরিয়ানি প্ল্যাটফর্মে ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করলে ১০-৪৫ মিনিটে ট্রেন আসবে আর তাতে দীপক এম্বুনি ওরফে দীপু উঠবে। যথাসময়ে যাবার দু'ঘন্টা আগে দীপু কর্ণেলকে টাইম টেবিলটা দেখাল। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! কর্ণেল তা নাকচ করে দিলেন। কারণ বড় ছেলে মরিয়ানি স্টেশনের ক্রসিঙের প্রকাণ্ড গেটটির কথা ভুলে গেছে। কেন না, তিনসুকিয়া মেলের আগে আগে একটা মালগাড়ি আসার ফলে গেটটা দশ মিনিটের মতো বন্ধ থাকবে, আর স্টেশনে দীপু অপেক্ষা করার সময়টা ত্রিশ মিনিটের পরিবর্তে কুড়ি মিনিট হবে। তাই কর্ণেল এম্বুনি টাইম টেবিলটা পুনরায় তৈরি করার আদেশ দিলেন। এদিকে দীপু যাবার আর মাত্র দেড় ঘন্টা সময় বাকি আছে। রাগে-দুঃখে সে টাইম টেবিলের নিকুচি করে বাইরে চলে গেল।

কী ভয়াবহ ইনডিসিপ্লিন! এম্বুনি অবাক হয়ে গেলেন। সারা জীবন সাধনার কী মারাত্মক ব্যর্থ পরিণতি। রাগ করে কর্ণেল ছেলেকে বহু দিন যাবৎ কোন চিঠিপত্র লিখেন নি।

অন্য এক দিনের কথা। তারিখটা চব্বিশ ডিসেম্বর। বড়দিন উপলক্ষে পরার জন্যে এম্বুনি একজোড়া স্যুট বানিয়েছেন। চব্বিশ তারিখ বিকেল আটটার সময় এম্বুনি দ্রুত এসে ঘরে ঢুকলেন। দরজা বন্ধ করে নতুন স্যুটজোড়া পরে দেখলেন। কাপড়টা খুঁটিয়ে দেখার সময় তার মন আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়ল। সুন্দর। কিন্তু হঠাৎ জুতো জোড়া পরতে গিয়েই তিনি কিছুটা অসুবিধের সম্মুখীন হলেন। দেখা গেল তার পেন্টটা এক ইঞ্চির মত লম্বা। কী মারাত্মক ইনডিসিপ্লিন! কালকে এই খাপছাড়া প্যান্টটা পরে তাকে গির্জায় যেতে হবে, এ যে তার কাছে কল্পনারও অগোচর। সবাইকে

শুনিয়ে তিনি চিৎকার করে বললেন --'এই আমার নতুন প্যান্টটা এক ইঞ্চির মত লম্বা হয়ে গেছে, নিচের দিকটা কেটে এডজাস্ট করে দিবি।।

কথামাত্র কাজ। বড়দিনের ব্যস্ততার মধ্যে মিসেস এন্থনি প্যান্টটা এক ইঞ্চি ছোট করে কেটে সুন্দর করে সেলাই করে পুনরায় হ্যাঙ্গারে রেখে দিলেন। হঠাৎ মেজমেয়ে এলভিনার মনে পড়ল বাবার প্যান্টটার কথা। সঙ্গে সঙ্গে সে বাবার প্যান্টটা হ্যাঙ্গার থেকে নামিয়ে সে পুনরায় এক ইঞ্চি কেটে সুন্দর করে সেলাই করে রেখে দিল।

বড়দিনের দিল সকালবেলা। গির্জায় যাবার জন্য প্যান্টটা পরতে যেতেই রাগে তার মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। 'কী আশ্চর্য ইনডিসিপ্লিন!' ঘরের প্রত্যেকেই কেঁপে উঠল। এন্থনির জীবনের এই চরম সত্যটা শহরের অনেকের মুখে 'গাঁজা' হিসেবেই চলে আসছে। শেষ পর্যন্ত সমাধানটা অপুই বের করল। দাদা দীপুর বড়দিনে পরার জন্য নতুন বানানো থ্রী পিস স্যুটজোড়া বের করে দিল। লেটেস্ট ডিজাইনের এই স্যুটজোড়ায় বাহাত্তর বছরের এন্থনিকে গীর্জার লোকগুলি আবার নতুন রূপে দেখতে পেল। এন্থনিকে কেউ ক্ষেপায়, 'আঙ্কল পজার', কেউ খ্যাপায় 'ডন কুইকজোট' বলে। মোটের উপর কর্ণেল এন্থনি হলেন এমন একজন মানুষ যাকে আমি আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি।

কর্ণেল এন্থনির দৃঢ় বিশ্বাস তার একবারই অসুখ হবে আর সেই অসুখেই তার মৃত্যু হবে। কারণ জীবনের বাহাত্তরটা বছরের কোটি কোটি মুহূর্তের মধ্যে তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও অসুস্থতার সম্মুখীন হন নি। এর মূলে রয়েছে –তাঁর নিজেরই উদ্ভাবিত— ডিসিপ্লিন। কিন্তু তিনি হঠাৎ সেদিন অনুভব করতে লাগলেন, তাঁর শরীরের কোন একটি অংশে ঝিনঝিন করছে, শরীরের কোন কোন অংশ সহযোগিতা করতে অস্বীকার করছে, মুখ দিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েও তিনি বলতে পারছেন না। ধীরে ধীরে তিনি ঢলে পড়লেন।

ডাক্তার বললেন, উচ্চ রক্তচাপ। প্রায় পনেরো দিন পরে কর্ণেল ঘর থেকে বের হলেন। এইবার কর্ণেলের ধারণা দৃঢ় হল। দ্বিতীয়বার এরকম হলে তার মৃত্যু হবেই। কিন্তু এন্থনির মৃত্যুকেও ভয় করতে লাগল। ভয় এমনিতেই নয়,—এই কয়েকদিন বিছানায় পড়ে থেকে তিনি ঘরে যে ধরণের ইনডিসিপ্লিন দেখতে পেলেন, তা থেকে তার দৃঢ় ধারণা হলো যে তার মৃত্যুর পরে এই ঘরে ডিসিপ্লিন বলতে আর কিছুই থাকবে না। অন্য সময়ের কথা বাদই, তাঁর মৃত্যুর সময়েও ঘরে এক ভয়াবহ ইনডিসিপ্লিন বিরাজ করবে। তাই, কর্ণেল এন্থনি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিলেন, যে সিদ্ধান্ত পৃথিবীতে সেই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত কোন একজন দ্বিতীয় ব্যক্তি করতে সাহস করেছে বলে আমি অন্তত শুনিনি। কর্ণেল সিদ্ধান্ত করলেন যে, যে কফিনে ভরে তাকে কবর দেওয়া হবে সেই কফিনটা তিনি জীবিত অবস্থায় তৈরি করার জন্য অর্ডার দিয়ে যাবেন। সিদ্ধান্ত অনুসারেই কাজ। শহরের একটা সুন্দর ফার্ণিচারের দোকানে এন্থনি তাঁর মাপে একটা কফিন তৈরি করতে দিলেন। কিন্তু সমস্যাটা হল কফিনটা ঘরে নিয়ে যাওয়াটা নিয়ে। প্রতিটি লোক বেঁচে থাকতে কফিনটা কীভাবে বা বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। শেষ পর্যন্ত সমাধান বের হলো—কফিনটা কর্ণেলের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ফার্ণিচারের দোকানেই থাকবে। দোকানিও আপত্তি করলেন না। তবুও এন্থনির চিন্তার শেষ নেই। তিনি ভাবলেন—তাঁর কবরের এপিটাফের বক্তব্যটুকু নিয়েও ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক মহা ইনডিসিপ্লিনের সৃষ্টি হবে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন—তিনি নিজের এপিটাফটা নিজেই লিখে রেখে যাবেন। কথা অনুযায়ী কাজ হতে দেরি হলো না। বড়দিনের দুপুরবেলা ছেলে মেয়ে সবার সামনে কর্ণেল এন্থনি তার বহু আকাঙ্খিত এপিটাফের বক্তব্যটা ঘোষণা করলেন— 'কর্ণেল এন্থনি

একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক। সমগ্র জীবন এক সুন্দর 'ডিসিপ্লিনে' কাটিয়েছিলেন বলে জীবনে তিনি কখনও দুঃখ পান নি। তাঁর থেকে প্রাপ্ত ডিসিপ্লিনের শিক্ষা উত্তরসূরীদের কাছে পাথেয় হোক। এই ব্যক্তি ডিসিপ্লিনের মধ্যেই ....তারিখে পরলোক গমন কবেন। তাঁর আত্মা চিবশান্তি লাভ করুক।'

কর্ণেলের এই সমস্ত কাণ্ডকারখানাকে তার ছেলেমেয়েরা বয়সের দোষ বলে মেনে নিলেন। মেয়ে দুটি কর্ণেলের অজান্তে চোখের জল ফেললেন। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলার সাহস করলেন না। উক্ত এপিটাফের ছয়টা প্রতিলিপি বানিয়ে কর্ণেল পরিবারের প্রত্যেকের হাতে বিলিয়ে দিলেন।

ডিসিপ্লিন!

এভাবেই দুটো সপ্তাহ পার হয়ে গেল। পুনরায় বিশৃঙ্খলা। এন্থনির ভাষায় ইনর্ডিসিপ্লিন। কেউ কোনদিন না ভাবার মত ইনডিসিপ্লিন। এন্থনির যাবতীয় ধ্যান ধারণাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে দেওয়া ইনডিসিপ্লিন।

নতুন বছরের ১০ জানুয়ারীর দিন একটা কুয়াশায় আবৃত সকালবেলায় কফিনটা ঘবে আনা হল। এন্থনি ধীরে ধীরে কফিনটার সামনে গেলেন। তিনি একবার সেটা ছুঁয়ে দেখলেন। বুকের মধ্যে একটা ক্রসের আভাস দিয়ে তিনি সেটার ভেতরে ঢুকলেন। এর মধ্যে মিসেস এন্থনিব মৃতদেহটা সুগন্ধি আতরে স্নান করানো হয়েছিল। ফাদার জন কফিনটার নির্মাণ প্রণালীর প্রশংসা করলেন। কেউ বললেন—বড় ভাগ্যবতী মহিলা। মৃতদেহটা কফিনের ভেতর ভরে দিয়ে কফিনটা বন্ধ করে দেওয়া হল।

কিছুক্ষণের জন্য কর্ণেলকে বারান্দায় দেখা গেল। হাতে একটা ছোট্ট কাগজের টুকরো। ধীরে ধীরে কর্ণেল বারান্দা থেকে নেমে এলেন। বড়ছেলে দীপুর হাতে তিনি কাগজের টুকরোটা গুঁজে দিলেন। সেই এপিটাফ! যা তিনি নিজের জন্য লিখেছিলেন। সেটাই কেটে কুটে তিনি এভাবে লিখেছেনঃ মিসেস এন্থনি। একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকের স্ত্রী। সৈনিক স্বামীর সমস্ত রকম 'র্ডিসিপ্লিন'-এর অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছিলেন। তাঁর আকস্মিক বিয়োগ, এন্থনি পরিবারের কাছে এক সাংঘাতিক 'ইনডিসিপ্লিন' অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছিলেন। তাঁর আকস্মিক বিয়োগ, এন্থনি পরিবারের কাছে এক সাংঘাতিক 'ইনডিসিপ্লিন'। তাঁর আত্মা সদগতি লাভ করুক।'

দীপু কাগজটা থেকে মাথা তুলে বাবার দিকে তাকাল।

কর্ণেল এন্থনি এক দৃষ্টিতে বন্ধ কফিনটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

কাফন

প্রণবজ্যোতি ডেকা

ডাক্তারের ঘরের সামনের উঠোনে মানুষের বসে থাকাটা কোন নতুন কথা নয়। দুপুরের ভাত খেতে এসে ঘরে ঢোকার আগে ডঃ অলক দত্ত তবুও কিছুক্ষণ দাঁড়াল। তার মানে ও সকাল থেকেই এখানে বসে রয়েছে।'

'কী হে চুনু মিএগ, সকাল থেকেই এখানে বসে আছ নাকি?' সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডে রাখতে রাখতে দত্ত জিজ্ঞেস করল।

'না বাবু।'

চুনু মিএগর কথা সত্যি। ডাঃ দত্ত চোখ বুলিয়ে দেখে, সকালবেলা মিএগর সঙ্গে আসা তার মা, আর ভাইয়ের বউকেও দেখতে পেল না। কাক ডাকার আগেই চুনু মিএগ ভাইকে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। সঙ্গে দুজন মহিলা। একজন অজ্ঞান রোগীর দেহটা এই তিনজন মানুষ নদীর ঘাট থেকে এক মাইল পথ কীভাবে বয়ে এনেছে তা কেবল ভগবানই জানেন। রোগীকে এনে হাসপাতালের বারান্দায় একটা চাদর দিয়ে ঢেকে শুইয়ে রেখেছিল।

সকালবেলা চোখ মেলেই ডাঃ দত্ত হাসপাতালের চৌকিদার সুরথ কাউকে জোর গলায় শাপ-শাপান্ত করছে শুনে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দেখে এই অবস্থা। অসহায় মুখে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা আধবয়সী মুসলমান একজন কৃষক, রোগীর পাশে বসে থাকা মহিলা দুজনের সামনে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে চলছিল, যার মর্মার্থ হল ঃ সাড়ে আটটার সময় ডিসপেনসারি খুলবে। তারপর ডাক্তার এসে রোগী দেখবে। ডিসপেনসারির ডাক্তার লিখে দিলে তবেই সেই কাগজ নিয়ে রোগী হাসপাতালে আসতে পারবে। তার আগে হাসপাতালে ঢোকা তো দূরের কথা, হাসপাতালের চার সীমানায় কেউ পা রাখতে পারবে না। তাছাড়া দত্ত সাহেবের কড়া হুকুম আছে—যেন বারান্দায় কোন রোগীকে

থাকতে না দেওয়া হয়। সুরথের সামনে দাড়ানো মানুষটির বড় নির্বাক চোখদুটি বার বার ঘোরাঘুরি করছিল মাটিতে শুয়ে থাকা রোগীর দেহ থেকে চৌকিদারের মুখে, যেন বুঝতে চেষ্টা করছে সত্যি সত্যিই রোগীকে সেখান থেকে সরানোর প্রয়োজন আছে, না কি কেবলই নিয়মরক্ষা। নীল শাড়িতে গা-মাথা ঢেকে বারান্দার পাকায় বসে থাকা মহিলা দু'জনের শাড়ির নিচ থেকে বেরিয়ে ছিল শুধু চারটে শীর্ণ হাত। তারই দুটো হাতে ক্ষয়ে যাওয়া রূপোর একজোড়া বালা। অপর দুটি হাত খালি। মাটিতে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকলেও শাড়ির ভাঁজ দেখে বোঝা যায় বালা পরা মহিলাটির মধ্যপ্রদেশ ফুলে উঠেছে। অন্তত আটমাসের গর্ভ। ডঃ দত্তের মনে হল।

পায়জামা আর গেঞ্জি পরে বেরিয়ে আসা ডাক্তার দত্তকে সামনে দেখে সুরথ অস্বস্তির একটা হাসি হেসে বলল, 'দেখুন স্যার, কথা বললে শোনে না। যতসব ঝামেলা কোথা থেকে যে সকালবেলা এসে হাজির হয়—' সুরথ কথাটা শেষ করার সুযোগ পেল না। লোকটি ডাক্তারেব দিকে এগিয়ে এসে পরিচিত অপরিচিতের শঙ্কা মিশ্রিত একটা হাসি মুখে টেনে এনে বলে উঠল--'সালাম ডাক্তার সাহেব। চিনতে পারছেন আমারে?' দত্ত মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন। তারপর মানুষটার কপাল থেকে কানের নিচ পর্যন্ত দা দিয়ে কোপান এখন শুকিয়ে যাওয়া সাদা দাগটা দেখে মনে পড়ল এইজন চুনু মিএগ।

'কী হয়েছে মিএগ? কার কী হয়েছে?'

'আমার ভায়ের। জ্বর বিকার। দুদিন হল হুঁশ নেই। নিয়ে আসছি।'

ডাক্তার দত্ত মনোযোগের সঙ্গে লোকটির দিকে তাকালেন। দেখতে আধা বয়সী মনে হলেও বাস্তবে বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না। এখন শুকিয়ে যাওয়া দায়ের কোপটার আশেপাশের দাড়ি এবং চুলগুলি সাদা হয়ে যাওয়ায় বয়স বেশি বলে মনে হয়। লোকটা লম্বা, ক্ষীণ, নাকটা ধারালো। ফ্যাকাশে মুখের শীর্ণতা আধামুখ দাড়ি ঢাকতে পারে নি। মানুষটার কটা চোখগুলি বড় বড় কিন্তু নিষ্প্রভ। চোখের সাদা অংশটুকু হুঁকোর জলের রঙ ধারণ করেছে। লাল ছোট ছোট শিরাগুলি ফুলে উঠেছে, চোখের কোণের পিঁচুটি বোধহয় রাত্রি জাগরণের ফল। লম্বা-হাতা শার্ট, মাথায়া সাদা কাপড়ের টুপি। নিচের দিকে সবুজের উপরে সাদা কোঠা-আঁকা লুঙ্গি। সেলাই করার পর মাড় না দেওয়া ধোয়া শার্ট আর টুপিটা নিশ্চয় ঈদের পরে আর বাক্স থেকে বের করা হয়নি, কারণ ঘামের গন্ধ ছাড়াও মৃদু মাড়ের আর আতরের গন্ধও এসে দত্তের নাকে লাগল।

এতক্ষণ মনোযোগের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে থাকায় মানুষটির সন্দেহ হল ডাক্তার বোধহয় তাকে চিনতে পারেন নি। তাই আরও একবার অস্বস্তির হাসি হেসে বলল, 'আমারে চিনছেন না? সোনাচরের চুনু মিএগ আমি, ভাল নাম সোলেমান।' কোন চর থেকে এসেছে জানতে না পারলেও, ডাক্তার দত্ত লোকটিকে চিনতে পেরেছিল। এই অঞ্চলের অনেক মানুষকেই চরের নাম করলেই চিনতে পারে। বিস্তীর্ণ ব্রহ্মপুত্রের বুকে অসংখ্য বালি আর পলির চর সোনার চর, আলির চর, বড় মিএগর চর, ঘোড়া মারা চর এবং আরো অনেক। কোন কোন চর হয়তো আজ পঞ্চাশ ষাট বছরে ব্রহ্মপুত্রের বুকের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ চরেরই জীবনকাল মাত্র চার-পাঁচ বছরের জন্য। কে নাম মনে রাখে? সোনার চর অবশ্য পুরনো চর, কমপক্ষেও পনেরো কুড়ি বছর হবে চর পড়ার। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পার দিয়ে দশ পনেরো কিলোমিটার ভাটির দিকে যেতে হবে। ডাক্তার দত্ত মোটামুটি ভাবে এই অঞ্চলটা চেনে। বছর তিনেক আগে কলেরার প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন দেবার জন্য একবার বোধহয় ওদিকটায় গিয়েছিল। চুনু মিএগকে কিন্তু ডাক্তার চিনতে পারল কপাল

থেকে ঘাড় পর্যন্ত দা দিয়ে কোপানো দাগটার জন্যই। গত বছর, পুলিস চুনুমিঞাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল। কি এক মারামারি কাটাকাটি কেসের পরে চিকিৎসা করার জন্য। পুলিস না নিয়ে এলে সাধারণত চরের মানুষ ডাক্তারের কাছে আসে না। চর অঞ্চলে মহামারী প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন দিতে হলেও সঙ্গে পুলিস নিয়ে যেতে হয়। অসুখ হলে চরের মানুষের চিকিৎসা— ওঝার 'জড়ি বুটি', 'জলপড়া', না হলে সাপ্তাহিক হাটে ঔষধ বিক্রি কবা ব্যবসায়ীর বিভিন্ন ট্যাবলেট আর ক্যাপসুল।

এরকম এক পরিবেশ থেকে চরনিবাসী একজন মানুষ সাবা রাত ব্রহ্মপুত্রের উজানের জল ঠেলে দশমাইল নৌকা বেয়ে রোগীকে হাসপাতালে দেখানোর জন্য এনেছে, ডাক্তার দত্ত আশ্চর্য হওয়ার চেয়েও অভিভূত হলেন বেশি। সবুজ রঙের লাইন টানা নোংরা বিছানার চাদরে গা-মাথা ঢেকে হাসপাতালের বারান্দায় শুইয়ে রাখা রোগীর সামনে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ভাইয়ের কী হয়েছে?'

'জ্বর বিকার, দুদিন হল জ্ঞান নেই।'

মানুষের দুঃখ দৈন্য দেখতে দেখতে শক্ত হয়ে যাওয়া ডাক্তার দত্তের মনটাও মুহূর্তের জন্য নবম হয়ে এল, বিছানার চাদরটা সরিয়ে শুধু পাকা মেঝেতে শুইয়ে রাখা আছে—গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরা, সাতাশ-আটাশ বছর বয়সেব একটা মানুষের দেহ। রোগীর জ্ঞান নেই। চোখ বন্ধ। টেনে টেনে কষ্ট করে শ্বাস নেওয়ায় দীর্ঘ শিসের মত শোঁ শোঁ একটা শব্দ হচ্ছে। একটা তেলচিটে কালো বালিশের উপর এক কাত হয়ে পড়ে থাকা রোগীর মাথাটা ডাক্তার দত্ত ধীরে ধীরে ধরে ঘুরিয়ে দেওয়ায় দেখলেন একটা কান দিয়ে পুঁজ বেরিয়ে বালিশটায় জমাট বেঁধেছে। মানুষটা শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

'কে কৈল জ্বর-বিকার হৈছে?' ডাক্তার দত্ত নিজের অজান্তেই স্থানীয় ভাষায় বলে উঠলেন। চরের মানুষ অন্য কিছু হোক আর না হোক জ্বর-বিকার অর্থাৎ ম্যালেরিযা রোগ ভালভাবে চিনতে পারে। তাই সাধারণত সেক্ষেত্রে ভুল করে না।

'মোল্লা কৈছে, চৌধুরীও কৈছে।'

'জ্বর হওয়ার কতদিন হল?'

'তা হল ছয়-সাত দিন। কাল থেকে হুঁশ নেই।'

'রোগটা ম্যালেরিয়া নয়। যতটা সম্ভব অ্যানকেফেলাইটিস।' -ডাক্তার দত্তের মনে হল। বুকে একটা তীব্র ক্ষোভ জমা হয়ে উঠল। রোগ মারাত্মক। প্রায় শেষ অবস্থায় রোগীকে নিয়ে এসেছে। তার চেয়েও বড় কথা, এই রোগে মোটামুটিভাবে যে ঔষধটা দুটো কাজ করে, সে দুটোর একটাও বর্তমানে হাসপাতালের স্টকে নেই। কেন আসে এসব রোগী? কিন্তু তিনজন নীরব মানুষের আশাভরা চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারলেন না। সুরথকে ডেকে 'ইনডোরে' আরও একটা আলাদা বিছানা পেতে বারান্দা থেকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে সুলেমানের ভাইকে হাসপাতালের বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল।

হাসপাতালে নাম লেখানোর সময় জানতে পারল চুনু মিঞার ভাইয়ের নাম হাসমাৎ, বয়স পঁচিশ। প্রথমে কানের ব্যথা হয়েছিল। ওঝা ঝাঁড়ফুক করেছে। তারপরে জ্বর। রোগীকে আরও একবার পরীক্ষা করে, লাভ না হলেও ক্ষতি হবে না জেনে হাসপাতালের ভাণ্ডারে থাকা একটা 'টেট্রামাইসিন ইঞ্জেকশন' দিয়ে ডাক্তার দত্ত দেখলেন ঘড়ির কাঁটা আটটার ঘরে পৌছেছে। তখনও তার মুখ-হাত ধোয়া হয়নি। শরীরে সেই রাতে শোওয়ার গেঞ্জি আর পাজামা। একটা কাগজে

ঔষধের নাম লিখে, ছাব্বিশ মাইল দূরের বড় টাউন থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঔষধ দুটো কিনে আনার জন্য কাগজটা মিঞার হাতে দিলেন।

সেটা ছিল সকালবেলার কথা। তারপর ডাক্তার দত্ত আউটডোর আর ইনডোর শেষ করে, বাইরের রোগী কয়েকজন দেখে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন—আবার সেই চুনু মিঞা। দেহে জড়োসড়ো ভঙ্গী। মুখে একটা অসহায় কাতর ভাব।

'কি হে চুনু মিঞা। সকাল থেকে এখানেই বসে আছ নাকি?' সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডে রাখতে রাখতে দত্ত জিজ্ঞেস করলেন।

'না বাবু, ডাক্তারবাবু, আমার ভাইটা কী বাঁচবে?'

'বাঁচবে। বাঁচবে না কেন? তোমাকে যে ঔষধ আনতে বলেছিলাম এনেছ?'

'এনেছি বাবু। কম্পাউণ্ডারবাবুর হাতে দিয়েছি।'

'তাহলে ঠিক আছে। সকাল-বিকেল একবার করে খবর নেবে। চিন্তা করো না, ঠিক হয়ে যাবে।'

সাইকেলটা ইতিমধ্যে ঘরের কাজ করা ছেলে হরেন বারান্দায় নিয়ে তুলে রাখল। কখন দুটো বেজে গেছে। ডাক্তারকে এখন স্নান করতে হবে, ভাত খেতে হবে। স্ত্রী নিশ্চয় না খেয়ে অপেক্ষা কবে রয়েছে। কিন্তু মানুষটাকে এভাবে এখানে ছেড়ে যায় কীভাবে? দত্ত কী বলবে বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় উঠেছ?'

'মসজিদের পাশে একটা চালাঘর আছে, মোল্লা থাকতে দিয়েছে।'

'খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কী হয়েছে?'

'গ্রাম থেকে কিছু চাউল আর চিড়া এনেছি। আমাদের গরীব মানুষের আবার খাবার চিন্তা কিসের?'

'তুমি এই গর্ভবতী মহিলাটিকে কেন সঙ্গে নিয়ে এলে?'

'কি করব। মা আসতে চাইল। যুবতী ভাইয়ের বউটাকে তো আর ঘরে ফেলে রেখে আসা যায় না। ঘরে বাবা আছে, লোকে দশটা কথা বলবে।'

'আচ্ছা-আচ্ছা, আমাকে এখন স্নান করতে হবে, খেতে হবে। কিছু বলার থাকলে বিকেলে হাসপাতালে এসো'—স্নান করার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখল চুনু মিঞা বারান্দার এক কোণে বসে রয়েছে। ভাত খেয়ে উঠে লক্ষ্য করল সে বারান্দায় নেই। সেদিন ছিল প্রথম দিন। দ্বিতীয় দিন সকালবেলা ঘরের দরজা খুলেই দেখে বারান্দায় চুনু মিঞা, মুখে এক ঝলক হাসি।

'কী মিঞা, কী হল?'

'আসমতের রাতের বেলা হুঁশ এসেছে। জানতে চেয়েছে কোথায় আছে। জল খেয়েছে।'

'তুমি কী রাতে হাসপাতালে ছিলে?'

'হ।'

হাসপাতালে রাতে বাইরের মানুষ থাকাকে নিষিদ্ধ করে কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছেন। আগের দিন সারা রাত নৌকা বেয়ে আসা আর দ্বিতীয় রাত রোগীর পাশে বসে থাকা মানুষ একটাকে কড়া কথা বলতে ডাক্তারের ইচ্ছে করল না। বললেন, 'বলেছি তো ভাল হয়ে যাবে। সকালবেলা রোগীকে আমি একবার দেখব। তুমি 'আউটডোর' শেষ হলে আমার সঙ্গে দশটা এগারোটার সময় দেখা করবে?'

তৃতীয় দিনের দিন দশটা এগারোটার সময় ইনডোর থেকে বেরিয়েছেন ডাক্তার দত্ত, সিঁড়ির পাশেই চুনু মিঞা। মুখে একটা ম্লান হাসি। চোখদুটো চিন্তাক্লিষ্ট, 'সালাম বাবু।'

'কি চুনু মিঞা। দেখেছ, ভাই ভাল হয়ে গেল। কাল রাত থেকে সব সময়ই জ্ঞান রয়েছে।'

'আসমত ভাল হয়েছে?' মানুষটা যেন কথাটা বিশ্বাস করছে না।

'হ্যাঁ, ভাল হয়ে উঠছে বলতে পার।' ডাক্তার দত্তের মনে বেশ স্ফূর্তি। আশা ছেড়ে দেওয়া একজন রোগী ভাল হয়ে উঠলে সবসময় মনটা খুশি খুশি লাগে।

'তাইলে আমার ভাইরে ছাইরা দেওন যায় না হাসপাতাল থিকা?'

'কি বললে? পাগল হয়েছ নাকি? মরণাপন্ন একজন রোগীকে জ্ঞান আসার পরের দিনই ছেড়ে দেওয়া যায় নাকি?'

'বাবু, আমার ভায়ের কী হয়েছে?'

'ম্যালেরিয়া বলতে পার। মগজের ম্যালেরিয়া। বড় মারাত্মক অসুখ। তুমি ভাইকে হাসপাতালে এনে ভাল করেছ। গ্রামে থাকলে নির্ঘাৎ মারা যেত।'

'মগজের ম্যালেরিয়া। মগজের ম্যালেরিয়া।' কথাটা যেন চুনু মিঞা বুঝতে পারেনি। তার নিজের মগজে তখন অন্য কোন চিন্তা ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। 'তা হাসপাতালে কত দিন থাকতে অইব?'

'সেটা কীভাবে বলব? ছয়-সাতদিন তো হাসপাতালে লাগবেই, নয় দশদিনও থাকতে হতে পারে। তুমি ভয় করো না, হাসপাতালে থাকার দিনকয়টি ভায়ের চিকিৎসা, পথ্যের খরচ সমস্ত সরকার দেবে। কেবল আমার লিখে দেওয়া ঔষধগুলি.....'

'ছয়-সাত দিন। ছয়-সাত দিন!' দুবার নিজের মনেই বলে উঠল মিঞা। তারপর হঠাৎ ডাক্তারের উদ্দেশ্যে কাতরভাবে বলে উঠল—'বাবু, আমার যে ধানকাটার সময়। গ্রামের একটা লোকের সঙ্গে বাজারে দেখা হয়েছে। বলল জল বাড়ছে। আমার ধান কাটার আছে, পাট কাটার আছে। বুড়ো বাপটা এত ধান কাটতে পারবে না।'

'তা বলে তুমি হাসপাতাল থেকে নিয়ে লোকটাকে মেরে ফেলবে নাকি? আর মারতেই যদি চাও এখানে নিয়ে এলে কেন?' দত্ত ধমক মেরে বলে উঠলেন।

চুনু মিঞার মাথাটা নিচু হয়ে গেল। তার সমস্ত মনোযোগ পায়ের নীল রঙের হাওয়াই স্যাণ্ডেল জোড়ার উপর। অস্পষ্টভাবে বলে উঠল, 'আমার মায়ের পেটের ভাই। আমি কি তাকে মারতে পারি? দশ মাইল উজান ঠেলে নিয়ে এসেছি। ধান কাটতে না পারলে সবাই মিলে না খেয়ে মরব।

'আচ্ছা আচ্ছা, যা হোক একটা হবে। দেখা যাক কী করতে পারি, আর দুটো দিন দেখ। ঔষধটা এনেছ, লিখে দিয়েছিলাম যে?'

'আনি নি।' একটু রূঢ়ভাবেই জবাব দেয় চুনু মিঞা।

'কেন?' তার কণ্ঠের রূঢ়তা শুনে ডাক্তার দত্ত অবাক হলেন যদিও শান্তভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, 'টাকা কম আছে। বড্ড দাম ঔষধের। আমাকে লোকে বলেছে, সরকারী হাসপাতাল, সরকার গরীবদের বিনেপয়সায় ঔষধ দেয়।'

এই অভিযোগটা দত্ত আগেও অনেকবার শুনেছেন। তাই বোঝাবার চেষ্টা করলেন, 'ঔষধ দেয় সরকার। আমি দেয় না বলি নি। ঔষধটা থাকলে আমিও দিতাম। কিন্তু বুঝেছ, তোমার

ভাইয়ের যে দুটো ঔষধ প্রয়োজন, তা আমাদের হাসপাতালে নেই। আমি লেখালিখি করে ঔষধ আনতে গেলে কয়েকমাস লেগে যেতে পারে, বুঝেছ?'

'আমারে কৈছে, ডাক্তারবাবুরে দুইটা টাহা দিলে..' চুনু মিএগ্রা অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করে উঠল। 'হোয়াট? বের হ, বের হ তুই হাসপাতাল থেকে। ভাইকেও এখান থেকে নিয়ে যা। মরুক যেখানে খুশি। যত সব। বের হলি?' পরমুহূর্তে দত্তের রাগটা পড়ে আসে। কি হবে রাগ করে? কি হবে গালি দিয়ে? যা দেখে আসছে, শুনে আসছে চরের মানুষ এতদিন....।' কিন্তু, মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে আসা মানুষ একজনকে এত সহজে মরতে দেওয়া যায় না। আবার একবার কোমল সুরে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, 'শোন তোমার ভাইয়ের যে অসুখটা হয়েছে, সেই অসুখ খুব কম মানুষেরই হয়। সেজনাই তার ঔষধ আমাদের হাসপাতালে নেই। ঔষধ থাকলে কি আর আমি দু'টাকার আশায় রোগীকে ঔষধ না দিয়ে থাকি? তোমার তো নিজের ভাই, কিন্তু আমাদের কতখানি কষ্ট হয়েছে এই কয়েকদিনে ভাবো তো? নার্সের কথা ভেবে দেখ, অন্য ডাক্তারবাবুটির কথা ভাব। আমি নিজে প্রতিদিন তিনবার খবর নিচ্ছি, তোমার ওই দুটো টাকার জন্য নাকি? আমাদের মধ্যে কেউ কি তোমার কাছে টাকা চেয়েছে? তোমার মা আর রোগীর স্ত্রীর কথা ভাব। দুটো ঔষধ আনার পয়সা নেই ঠিক আছে, শুধু ইঞ্জেকশনটাই এনে দাও তা নাহলে।'

নদীর বাড়ন্ত জল আর তাতে তলিয়ে যাওয়া ক্ষেতের ধানের চিন্তা চুনু মিএগ্রার চিন্তাশক্তিকে লোপ করে ফেলেছে। দত্তের কথা শুনতে পাওয়ার কোন লক্ষণ তার আচরণে দেখা গেল না। নিজের মনেই সে যেন কি সব বিড়বিড় করে বলছিল। তার মধ্যে দত্ত যতটুকু বুঝতে পারল তা হল,--- 'বিবি-ছাওয়াল সকলে না খাইয়া মরব--- একটা মানুষের লাইগ্যা।' তারপর হঠাৎ সে বলে উঠল 'ঠিক আছে বাবু, আর দুটো দিন দেখছি।' বলেই চুনু মিএগ্রা চলে গেল। ডাক্তারকে রোজ করা সেলামটার কথাও সে ভুলে গেল। ছয়দিনের দিন ডাক্তার দত্তের নিজের একটা দুশ্চিন্তা আরম্ভ হল। হাসমতের তৃতীয় দিনের দিন ছেড়ে যাওয়া জ্বর আবার ফিরে এসেছে। অবশ্য কান থেকে পুঁজ আর বেরুচ্ছে না, রোগী জ্ঞানও হারায় নি। এই দুটো ভাল লক্ষণ। চুনু মিএগ্রা কি আর বুঝতে পারবে যে রোগী প্রকৃতই ভাল-র দিকে যাচ্ছে? সে কেবল জ্বরের কথাই ভাববে। এই দুটো দিন চুনু মিএগ্রা ডাক্তারের কাছ থেকে দূরে দূরে সরে থাকছে। ঔষধ কিনে কম্পাউণ্ডার বা নার্সের হাতে দিয়ে গেছে, কিন্তু ডাক্তারের সামনে আসে নি। রোগীর মা এবং স্ত্রীকে জড়োসড়ো হয়ে হাসপাতালের মেঝেতে রোগীর বিছানার পাশে বসে থাকতে দেখেছেন। সেই প্রথমদিন দেখা নীল রঙের শাড়িটা পরা, যখনই দেখেন সেই প্রথমদিনের মতই শাড়ির ভাঁজ থেকে বেরিয়ে থাকে চারটে শীর্ণ হাত--- দুটো রূপোর বালা পরা, দুটো খালি। ডাক্তার দত্ত নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, মহিলা দুটিকে কিছু বললে, বোঝালে বুঝেছে কি না জানার কোন উপায় নেই, কারণ তারা অপরিচিত পুরুষমানুষের সামনে মুখ খোলে না।

ইনডোর থেকে বেরিয়ে ডাক্তার দেখলেন তিনি যা ভয় করছিলেন সেটাই হতে চলেছে, হাসপাতালের সীমানার ভেতরে জামগাছটার নিচে পাঁচ-ছয় জন চরবাসী মানুষ বসে কথা বলছে। ডাক্তার দত্তকে ভেতর থেকে একজন মানুষ উঠে এলেন। দত্ত দূর থেকেই চুনু মিএগ্রাকে চিনতে পারলেন। আজ তার মাথায় প্রথমদিনের সেই টুপিটা। একনাগাড়ে ছয় দিন পরে বেড়ানো মেটে রঙ ধরা গায়ের শার্টটার তুলনায় মাথার টুপিটা অস্বাভাবিকভাবে সাদা মনে হল ডাক্তারের কাছে।

চুনু মিএগ্রা ডাক্তারের সামনে দাঁড়িয়ে কোনরকম ভণিতা ছাড়াই বলে উঠল, 'আমার ভাইরে লৈয়া যাইতে আইছি। ও বাচবো না।'

দত্ত ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কেন তুমি ভাবছ যে তোমার ভাই বাঁচবে না?'

'আবার জ্বর এসেছে আসমতের। গ্রামের গুণীন বলেছিল, চৌধুরী বলেছিল, এই জ্বর হলে মানুষ বাঁচে না। আল্লা মারছে তারে, তুমি মিছামিছি লৈয়া যাইতে চাইছ তারে আস্পাতালে। আমি কথা শুনলাম না। লৈয়া আসলাম ভাইরে আস্পাতালে। এইখানে আপনি তিনদিন কৈলেন, ছয়দিন কৈলেন, এখন হপ্তা হৈল, আবার তার জ্বর আইছে।'

'এই রোগে কখনও কখনও জ্বরটা ঘুরে আসেই। কিন্তু জ্বরের প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে পারলে, পরে সাধারণত রোগী মরে না।'

'তাইলে উয়ারে ছাইরা দেন, আমি লৈয়া যাই।' চুনু মিঞা যেন একটা রাস্তা খুঁজে পেল।

'সেটা কীভাবে হবে? রোগীর অসুখ ভাল না হলে আমি কীভাবে যেতে দিই? অসুখটা এখনও ভাল হয় নি, আরও কয়েকদিন দেখতে হবে। আগের এনে দেওয়া ঔষধ আজ শেষ হবে, আরও ঔষধ আনতে দিয়েছিলাম যে এনেছ?'

'আমি নাই। আমার হাতে টাহা নাই। সব ফুরাইয়া গেছে। আমি ভায়েরে লৈয়া যামু। গাঁও থিক্যা লোক আইছে।'

'বাইরে যে কয়েকজন অপেক্ষা করছে, তোমাদের গ্রামের নাকি?' দত্ত উত্তরটা জেনেও জিজ্ঞেস করলেন।

'হ'।

'লোকগুলিকে যেতে বলে দাও। রোগীকে আজ ছাড়ব না।'

'কেনে? আমার ভাই, আমি লৈয়া আইছি, আমি লৈয়া যামু। আমিই লোগ লৈয়া আইছি।' এ যেন আগের চুনু মিঞা নয়। ভয়ে, দুশ্চিন্তায় তাকে উদভ্রান্ত করে তুলেছে।

'কি? ফাজলামি পেয়েছ নাকি? এখানে, হাসপাতাল থেকে রোগীকে জোর করে নিয়ে যাবে?' ডাক্তার দত্তেরও রাগ উঠে যায়। 'তোমাদের গ্রামের লোককে এখনই হাসপাতালের সীমানা থেকে বেরিয়ে যেতে বল। এখনই। তা নাহলে আমি থানা থেকে পুলিস ডেকে আনব। ফাজলামি পেয়েছ এখানে। খুশি হলে রোগী নিয়ে আসবি, খুশি মত রোগী নিয়ে যাবি?' সাধারণত পুলিস শব্দটা চরের লোকদের মধ্যে মন্ত্রের মত কাজ করে, কিন্তু চুনু মিঞা বোধহয় ভয় পাওয়ার চেয়েও বেশি অবাক হয়েছে ডাক্তারবাবুর রাগ দেখে। হঠাৎ অত্যন্ত কাতরস্বরে সে বলে উঠল, যেন ভিক্ষে চাইছে, 'ছাইরা দেন বাবু আমার ভাইরে। উয়ারে মরতে দেন। নইলে গাঁয়ে বিবি, ছাওয়াল, বুড়া বাপ না খাইয়া মরব। ধানে পানি আইছে, আমি এইখানে বৈসা আছি। ছাইরা দেন বাবু উয়ারে, লৈয়া যাই। আপনার পা ধরছি।'

'দুটো দিন, আর দুটো দিন দেখ, আর মাত্র দুদিনের ঔষধ দেব। আমি বলছি, তোমার ভাই ভাল হয়ে যাবে। যদি তুমি থাকতে না পার, দুদিনের ঔষধ কিনে দিয়ে তুমি চলে যাও, তাহলে। দুদিনে যদি ভাল না হয় আমি তাহলে নিজের পয়সায় চিকিৎসা করব। তোমার ভাই সুস্থ হয়ে উঠলে তোমাদের গ্রামের দিকে যাওয়া কোন লোকের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।' ডাক্তার দত্ত এখন চুনু মিঞার কাছে মিনতি করছেন।

'আরও দুটা দিন, নদী বইসা থাইকব আমার লাইগ্যা। না-খাইয়া মরুম হক্কলে।'

ডাক্তার দত্তের কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুনু মিঞা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার দত্ত নিজের রুম থেকে চুনু মিঞাকে গ্রামের কয়েকজন লোকের সঙ্গে কি সব আলোচনা করতে করতে

ধীরে ধীরে হাসপাতালের সীমানা থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সন্ধ্যে বেলা হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় হাসমতের দেহে জ্বর নেই দেখে ডাক্তার দত্তের ভাল লাগল, কিন্তু নার্সের কাছ থেকে শুনে অবাক হল যে সারাদিনের মধ্যে চুনু মিঞা, রোগীর মা বা স্ত্রী কেউ একবারও রোগীকে দেখতে আসে নি। রোগী বারবার তাদের কথা জিজ্ঞেস করছে। এদিকে একটা মাত্র ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল বাকি রয়েছে। রাতের বেলা সেটা দিলে, সকালের জন্য আর থাকবে না। এ সময়ে ইঞ্জেকশন বন্ধ করা সম্ভব নয়। কোথায় গিয়ে মরেছে সব। না কি সত্যি সত্যিই রোগীকে ফেলে রেখে সব চরে ফিরে গেল? টাউন থেকে ঔষধ আনতে তো এতটা দেরি হবার কথা নয়। না কি রাস্তায় বাস খারাপ হয়ে গেল? দত্তের আরও একটা দুশ্চিন্তা শুরু হল।

রাত তখন ন'টার মত বাজে, ডাক্তার দত্ত ভাত খেয়ে, শোবার ব্যবস্থা করছেন, বাইরের বারান্দায় কয়েকজন লোক এসে দাঁড়াল বলে মনে হল তাঁর। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলেন, বারান্দার বিজলী আলোর আলোছায়ায় একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটির পেছনের আলো-আঁধারিতে আরও তিন-চারটে ছায়ামূর্তি।

'ডাক্তারব্যু'।

'চুনু মিঞা?' গলার স্বরেই ডাক্তার চিনতে পারলেন। তাই জিজ্ঞেস করলেন। 'ঔষধ আনলে? ভাইয়ের জ্বর নেই এখন। সামনে আসছ না কেন? অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে?'

'এইটা লন। আমি যাইগিয়া। রাইতে গেলে ফজরের আজানের টাইমে পৌছাই যামু।' চুনু মিঞার কণ্ঠস্বর যেন একই সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে রূঢ় অথচ বিষাদময়। মানুষটার এগিয়ে আসার কোন লক্ষণ না দেখে ডাক্তার দত্ত নিজেই বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে নেমে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দাও।'

দত্ত অবাক হলেন, যখন দেখলেন খবরের কাগজে মোড়া বড় পোঁটলা চুনু মিঞা তার হাতে তুলে দিচ্ছে। এটা তো ঔষধ নয়। এটা কি দিচ্ছে, দত্ত বুঝতে পারলেন না। আলোর দিকে দু-পা পিছিয়ে এসে, পোঁটলায় বাঁধা সুতোটা-টান মেরে খুলে ফেললেন। কাগজের প্যাক খুলে হাত থেকে খসে পড়ল, জ্যালজেলে, সস্তার, একটা সাদা কাপড়ের আঁচল ।

'এটা কি? কাপড় কেন এনেছ? ঔষধ কোথায়?' অবাক হয়ে ডাক্তার দত্ত বলে উঠলেন।

'আমার ভাই বাচবো না। আল্লায় ডাকছে তারে। পানি বাড়ছে, আমি এইখানে রৈতে পারব না। ই বাগার মুল্লা কৈছে, 'মুফতে গোর দিব তোমার ভাইরে। তবে কাফনের কাপড়টা দিয়া যাও। ' আমার কাছে ত্রিশটা টাহা আছে, দাবাই কিনলে কাফনের পয়সা নাই। ঘরের লোগে কৈছে কাফনটা আগে কিনবার লাইগ্যা। আমার ভাই মৈরা গেলে, মুল্লারে খবরটা দিয়া দিবেন। আমি যাইগ্যা। সালাম বাবু।'

অন্ধকারের মধ্যে একটা একটা করে ছায়াগুলি মিলিয়ে গেল।

শহীদ

পূরবী বরমুদৈ

প্রতিটি যুদ্ধকেই শেষ যুদ্ধ বলে কামনা করা হলেও কোন যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ হয় না।

শহীদের মৃতদেহ ঘরে আনা হল। শোকাকুল মা বলল, আমি আমার পুত্রকে দেশের জন্য উৎসর্গ করলাম। শহীদের পিতা বলল, আমি আমার পুত্রকে দেশের জন্য দান করলাম। ভাই বোন, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীরা বলল—ওকে আমরা দেশের জন্য উৎসর্গ করলাম। এমনকি শহীদের প্রেমিকাও বলল--ওকে দেশের জন্য উৎসর্গ করে আমি গৌরববোধ করছি। গাছের ডালে একটা পাখি গান করছিল। পাখিটা সামনের পাখিটাকে বলল—কি ধরণের উৎসর্গ এটা? এই যে আমরা নিজেকে গান গাইবার জন্য উৎসর্গ করছি, এটা কি সে ধরণের উৎসর্গ? ফুলের একটা কলি পাপড়ি মেলার জন্য অপেক্ষা করছিল। ফুলের কলিটা মনে মনে ভাবল—এই যে আমি পাপড়ি মেলার অপেক্ষায় পথ চেয়ে রয়েছি। পাপড়ি মেললেই ওই সুগন্ধে মধুকুঞ্জের খোঁজে মৌমাছি দু'টো আসবে, আমি উৎসর্গ করছি নিজেকে, এও বোধহয় তেমনি এক উৎসর্গ।

শহীদের মৃতদেহ শুইয়ে রাখা হয়েছে। ফুলে ভরে গেছে তার শরীর। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণপন যুদ্ধ করে যে শত্রুপক্ষের কাছে এক ভয়ঙ্কর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। তার অমিত বল-বিক্রম চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিয়ে শত্রুপক্ষ স্বস্তি বোধ করেছিল। সে শত্রুপক্ষের অনেক সৈন্য হত্যা করেছিল। তাই শত্রুপক্ষ তাকে চরম শাস্তির জন্য বিবেচিত করেছিল।

এদিকে শত্রুর দেশেও শোকদিবস পালন করা হচ্ছে। শত্রু হত্যা করে নিজে মৃত্যুবরণ করা অমর শহীদের মৃতদেহ ফুলে ফুলে সজ্জিত করে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। একই পরিবেশ। লোকে লোকারণ্য। শত্রুদেশের শহীদের পিতা বলছে---আমি আমার পুত্রকে দেশের জন্য উৎসর্গ করলাম। মা বলছেন--আমি একজন গরবিনী মাতা, যে নিজের সন্তানকে দেশের জন্য উৎসর্গ

করতে পারে। ভাই-বোন বলছে---আমরা ওকে দেশের জন্য দান করলাম। প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, দেশবাসী বলছে---এই ছেলেটা আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে। প্রেমিকা বলছে --পরম গৌরব এবং আনন্দের সঙ্গে ওকে দেশের জন্য উৎসর্গ করে আমি ভাবলাম, আমার প্রিয়তম নিজের জীবন দিয়ে আমাকে রক্ষা করে গেল। একটা পাখি গাছের ডালে বসে গান করছিল। পাখিটা সামনের পাখিটাকে বলল, লোকগুলির কথা শোন, কি ধরণের উৎসর্গের কথা বলছে ওরা? এই যে আমি গানের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছি, এটা কি সে ধরণের কোন উৎসর্গ? ফুলের কলিটা ভাবল-- কি ধরণের উৎসর্গ এটা? আমি যে বিকশিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি। ফুল ফুটলেই চারিদিক থেকে মৌমাছিরা ছুটে আসবে মধুর লোভে। আমি নিজেকে সবার জন্য উৎসর্গ করেছি, এটা কি সে ধরণের কোন উৎসর্গ?

দুই শহীদের মুখোমুখি দেখা। দু'জনেই প্রাণরসে ভরপুর তরতাজা যুবক। সমবয়সী। উজ্জ্বল চোখ, সরল বাহু, দীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত বক্ষ। প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে অভিবাদন জানাল, নমস্কার, আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আমার গুলিতে আপনার মৃত্যু হল। প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে দ্বিতীয়জন উত্তর দিল - 'না না, আমি, আমিই হত্যা করেছি আপনাকে। আমাকে ক্ষমা করবেন।'

কি বলছেন আপনি? প্রথমজন কিছুটা এগিয়ে এল। ক্ষমার প্রশ্নই ওঠে না, কে কাকে ক্ষমা করবে? আমরা কেউ কোনও দোষ করিনি। আসুন, আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করি। দু'জন শহীদই পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। দু'জনেরই বুকে বুক লেগে গেল। দু'জনেই দু'হাতে পরস্পরকে কাছে টেনে নিল। বুক দুটি তখন নিরুত্তাপ ছিল। কারণ দু'জনেরই বুকের স্পন্দন বহুক্ষণ হল বন্ধ হয়ে গেছে। আশ্চর্যের কথা, দু'জনের বুকেই একটা শব্দের উৎপত্তি হল- -এক পরম অপার্থিব শব্দের উৎপত্তি হল, আর সেই শব্দ পুনরায় সচল করে দিল দু'জনেরই হৃদয়ের অচল হয়ে যাওয়া কলকব্জা। 'এই মুহূর্ত' থেকে আমরা বন্ধু হলাম। আমাদের মধ্যে কোন শত্রুতা নেই, দু'জনেই শব্দ কয়টা উচ্চারণ করল। মৃত্যু আমাদের অনাদি অনন্তকালের বন্ধুত্ব প্রদান করল।

পাখিটা তখন গানের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছিল। ফুলের কলিটাও নিজেকে উৎসর্গ করছিল।

এদিকে দু'দেশেই তখন তুমুল কান্নার প্রতিযোগিতা জমে উঠেছে। দুই দেশের দুই শহীদকে শেষ সংস্কারের জন্য নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। দু'জনকে সামরিক অভিবাদন জানানো হয়েছে। পুত্র, ভ্রাতা, প্রেমিকা, প্রতিবেশী, বন্ধুবর্গ দু'টি দেশের মানুষই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে। ফুল এবং পতাকা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে শহীদের শরীর। শেষ বিদায় দেবার জন্য দুই শহীদের দুই মা-ই দুই মৃত পুত্রের কাছে উপস্থিত।

বড় কষ্ট করে শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করে তোকে আমি জন্ম দিয়েছিলাম পুত্র। তুই আমাকে বড় ভালোবাসতিস। শৈশবে আমি খাইয়ে না দিলে তুই খেতে চাইতিস না। রূপকথা বলে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে তোকে ঘুম পাড়াতে হত। আমাকে না দেখে তুই একমুহূর্তও থাকতে পারতিস না। বাইরে থেকে এসেই তুই দৌড়ে এসে আমার কোলে উঠে পড়তিস। আমার বুক খালি করে তুই কোথায় চলে গেলি? অ আমার বাপ, তুই কোথায় গেলি রে? শহীদের প্রেমিকার চোখে জল নেই। ...চোখের জল বুকে গুমরিয়ে উঠছে। শত্রুপক্ষকে ভয়ঙ্করভাবে ব্যতিব্যস্ত করে মৃত শহীদ। চোখের জলে তাকে শেষ বিদায় জানিয়ে অপমান করা অনুচিত। অপর শহীদের প্রেমিকার চোখেও জল নেই। বড় কষ্ট করে সে চোখের জল রোধ করেছে। অথবা বলা যেতে পারে বড় কষ্ট করে তাকে চোখের জল রুদ্ধ করে রাখতে বলা হয়েছে।

দুই শহীদের পুনরায় মুখোমুখি দেখা। দু'জনই প্রসারিত দু'হাতের মধ্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ হল।

—ভাল আছেন তো? প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করল।

—আপনি? কোমল ঘাসের উপর দু'জন পাশাপাশি বসল, একজন আর একজনের চোখের দিকে তাকাল। আমার প্রেয়সী বড় দুঃখের সঙ্গে আমাকে শেষ বিদায় জানাল।

- আমাকেও—দ্বিতীয়জন উত্তর দিল। তাকে চোখের জল ফেলতে দেখা গেল না। কিন্তু আমি তার হৃদয়ের অন্তস্থলে উঁকি মেরে দেখেছিলাম। চোখের জলের বান ডেকে যাচ্ছে সেখানে। বুকের মধ্যে কান্নার ঢল নেমেছে। একঝাঁক পাখি সেখানে বাসা বাঁধতে চেয়েছিল। বন্যার জল কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে একটাকে অপরটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

--এক কাপ চা খাবেন কি? আসুন এককাপ চা খাই।

দুই কাপ চা নিয়ে পাশাপাশি বসল দু'জন শহীদ। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। সূর্যটাকে হঠাৎ মেঘে ঢেকে ফেলল। বৃষ্টির সম্ভাবনা। একটু শীত শীত লাগছে। দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে বলল--চা'টা খান, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

প্রথমজন চায়ের কাপটা হাতে নিল। ঠিক তখনই আরম্ভ হল বৃষ্টি। ঝিরঝির বৃষ্টিতে বাইরের ঘাস ভিজতে লাগল। আকাশে এখন কেবলই মেঘের খেলা। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে সে আবার নামিয়ে রাখল।

—বৃষ্টির দিনে আপনি কি করতে ভালোবাসতেন?

—বৃষ্টির দিনে? আমি? বৃষ্টি বাদলের রূপকথার গল্প শুনতে ভালোবাসতাম। দ্বিতীয়জন মৃদু হাসল। হাসিটা স্পষ্ট না হলেও সমস্ত মুখমণ্ডল আলোকিত হয়ে উঠল।

—ছোটবেলার কথা মনে পড়ে? রাতে বৃষ্টি হয়। ঘরের চালে বৃষ্টিবিন্দুর ঐকতান। সামনেই শুয়ে রয়েছে মা....

—আমি কাকে জাগাব। ডাকি মা - ওমা, বৃষ্টি পড়ছে। মা কখনও জাগে, কখনও জাগে না। বৃষ্টির সঙ্গে মার গায়ের গন্ধটা মিলেমিশে যায়। মার বুকে নাকটা ডুবিয়ে গন্ধটা টেনে নিই। বৃষ্টিতে ভিজে থাকা মাটির গন্ধ মার শরীরে....

—তারপরও বহুদিন আমি বৃষ্টির গন্ধ পেয়েছি। বড় হয়েও....আজও। আমার শরীরের গন্ধ। ভিজে থাকা মাটির গন্ধ। বৃষ্টির গন্ধ।

দু'জনেই সমস্বরে কথাগুলি বলল। দু'জনেই চা খেল আর বাইরে বৃষ্টিতে বেরিয়ে এল।

—স্বপ্ন দেখছিলেন নাকি? দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে জিজ্ঞেস করল।

—অনেক...অনেক স্বপ্ন দেখেছি। ঘরের মানুষ, দেশের মানুষ, নদী নালা-পর্বত, বন-জঙ্গল, জলপ্রপাত, মরুভূমি। আপনি?

—আমিও। আমিও একই স্বপ্ন দেখেছিলাম।

--স্বপ্ন সফল হয়েছে কি আপনার?

দ্বিতীয়জন প্রথমজনের দিকে তাকাল এবং হাসল। স্বপ্ন? ভাল কথা জিজ্ঞেস করেছেন আপনি। আপনার গুলিতে মৃত্যু হল আমার। আপনার স্বপ্ন কি ফলেছে?

—একই কথা। আমাদের মত সাধারণ মানুষের স্বপ্ন পৃথিবীতে কখনও সফল হয় না। আপনার হাতেই তো আমার মৃত্যু হল। ভুলে গেলেন নাকি আপনি?

দু'জন শহীদ প্রাণ খুলে হাসতে লাগল। বৃষ্টি কমে আসছে। গাছের আড়ালে সূর্য ঝিকমিক করছে। গাছের পাতায় অল্প আগে পড়া বৃষ্টির জল টলমল করছে। দু'জনেই এগিয়ে যাচ্ছে। একজনের কাঁধে হাত রয়েছে অপরজনের। দুই শত্রুদেশের দুই মৃত মানুষ। এখন একজন অপরজনের পরম বন্ধু। মৃত্যু দু'জনকে পরস্পরের কাছে টেনে এনেছে।

—পৃথিবীটা বড সুন্দর।

—আমি পৃথিবীকে বড় ভালোবাসি। দেখুন, গাছের পাতার আড়ালে সূর্য কি সুন্দর ঝিকমিক করছে। বৃষ্টির বিন্দুগুলি গাছের পাতায় লেগে রয়েছে। আমার ছোট ভাগ্নীটা দেখতে এইটুকু হলে কি হবে, মান-অভিমান খুব বেশি। একটু কড়া করে কিছু বললেই হল, চোখের কোণে জল টলটল করতে থাকে। এই গাছের পাতায় পডা বৃষ্টি বিন্দুগুলির মতই।

—সবই একই। একই দুঃখ, একই আনন্দ। ঐ পাথরটাতে গিয়ে বসি চলুন। নৌকাটাও ভেসে গেছে। সূর্যটা নদীর বুকে গা ধুইয়ে নিচ্ছে। যাবেন নাকি?

দুইজন গিয়ে নদীর পাড়ের শিলাখণ্ডটার উপর বসল। পাথরটা বিশাল। পাথর নয়, যেন বিশাল একটা টিলা। পাথরটার ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে উঠেছে সুন্দর ফুলের গুল্ম। বৃষ্টিস্নাত আকাশে এখন পরিচ্ছন্ন সূর্য। নদীর জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে সূর্যরশ্মি।

—এটিই আমার দেশ। এই দেশের জন্যই উৎসর্গ করেছিলাম আমি আমার জীবন। আমার সুখ, আনন্দ আর যন্ত্রণা। প্রথমজন বলল।

না-না। আপনি ভুল বলছেন, এটি আমার দেশ, এই নদী, ঐ নীল পাহাড়, এই শিলাখণ্ড, শিলাখণ্ডের ফাঁকে গজিয়ে ওঠা বন্য ফুল, নদীর বালিতে উড়তে থাকা পাখির ঝাঁক। রূপালী জলে রূপালী মাছের খেলা—এইটি আমার দেশ। আমার দেশের লোক একমুঠো ভাতেব জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, আর দুঃখ ভোলার জন্য বিকেলে গান গায়। আমার দেশে জন্মগ্রহণ করা প্রতিটি শিশুই দেবশিশু। আমার দেশে দুর্বলের উপর চলে সবলের অত্যাচার। আমার দেশের মাটি শোষণ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনার ইতিহাস জানে। ইতিহাস তার সাক্ষী।

—অবিকল এক। দ্বিতীয়জন বলল। আমার দেশের লোকও মরতে জানে, আর মারতেও জানে। আমার দেশেও জন্ম হওয়া প্রতিটি শিশুই দেবশিশু। আমার দেশের প্রতিটি মা-ই নিজের সন্তানকে বুকে টেনে নেয় আর দুধ খাওয়ায়। আমার দেশেও প্রতিটি মা-র শরীরেই থাকে দুধের গন্ধ। আমার দেশেও দুর্বল মানুষের উপর চলে বলীর অত্যাচার। আমার দেশের মানুষও ভাগ্য ও ভগবানের কাছে নতজানু হয়। অদ্ভুত ধরণের মিল। আশ্চর্য!

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। নদীর ওপারে সূর্য তখন দুই পাহাড়ের মাঝখানে লুকিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজছে। দু'জন শহীদ-ই তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল সূর্যের এই লুকোচুরি খেলা। নদীর তরঙ্গায়িত জলে আছড়ে পড়ছে সূর্যের রঙ। কোথায় যে বয়ে চলেছে নদীটা। কোথা থেকেই বা আসছে! দু'জন শহীদ যেন একান্ত মনে সন্ধান করে চলেছে নদীর উৎস। মাটির গন্ধ বেরিয়েছে। মাটির গন্ধটা দু'জনেরই নাক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছে। দু'জনেই সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই গন্ধটা টেনে নিচ্ছে। 'আমার মায়ের গায়ের গন্ধ'— একজন অস্পষ্টভাবে কথাটা বলল। 'আমারও মার গায়ে মাটির গন্ধ। দুধের ঘ্রাণের সঙ্গে মিশে যাওয়া মাটির গন্ধ।' প্রথমজনের উচ্চারণ করা বাক্যটা দ্বিতীয় জন শোনেনি। কিন্তু একই ধরণের কথা বলছে। গাছের ডালে কোথাও পাখি ডাকছে। আকাশটা নদীর গর্ভে ঢুকে পড়েছে। আর আকাশকে ধারণ করে নদীর গর্ভও হয়ে উঠেছে উত্তাল।

–মরতে আপনার ভয় করছিল কি? দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছিল আপনার যখন আমার অজস্র গুলি বর্ষণ আপনাকে বিদীর্ণ করেছিল?

কি রকম লেগেছিল? প্রথমজন হাসল। মনে করি দাঁড়ান। আপনার দিক থেকেও গুলি ছুটে এসেছিল। আমি গুলি বর্ষণে অভ্যস্ত সৈনিক। আমিও গুলি বর্ষণ করেছিলাম। মনে হয় আমাদের দু'জনের গুলি একইসঙ্গে দু'জনকে বিদীর্ণ করেছিল। একসঙ্গেই আমাদের মৃত্যু হয়েছিল। তখনও রাত প্রভাত হয়নি। ভয়ঙ্কর শীতে আমরা দু'জন চিরদিনের জন্য স্থির হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, আকাশের সূর্য ভেঙেচুরে আমার বুকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আমার চোখ আর কখনও সূর্যের আলো দেখবে না। এক ভয়ঙ্কর অন্ধকারে আমাকে নিক্ষিপ্ত করা হল। আমার দেশের মানুষ, ভাই-বন্ধু, ভগ্নী, শরীরে মাটির গন্ধমাখা আমার মা, অরণ্যের গন্ধ থাকা আমার প্রেমিকার দেশ থেকে আমাকে নির্বাসিত করা হল। আপনার অস্ত্র থেকে নির্গত অবিরাম গুলি আমার বুকটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিল। আমি টের পাচ্ছিলাম রক্তের স্রোতের সঙ্গে আমি বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছি। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রচণ্ড শব্দ, আগুন, ধোঁয়া, আর কোলাহলের মধ্য থেকে হঠাৎ যেন আমার মুক্তি ঘটল। চারদিকে কাঁচা রক্তের গন্ধ। রক্তের গন্ধের কথা মনে পড়ে কি আপনার? বড় বীভৎস গন্ধ। মাথা ধরে যায়। আমার মত আরও কয়েকজন আহত হয়েছিল। একজনের খণ্ডিত হাত দূরে ছিটকে পড়েছিল। সে কোঁকাচ্ছিল। আমার সতীর্থরা খুব কষ্ট পাচ্ছিল। আমি তাদের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। পরমুহূর্তেই আমি বুঝতে পারলাম আমার কিছু করণীয় নেই। অথবা চোখের সামনে সব দেখতে পেয়েও আমি কিছুই করতে পারছি না। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারছি না বা তাদের তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে এক ফোঁটা জলও ঢেলে দিতে পারছি না। আমার সতীর্থদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবার মত শক্তিও আজ আমার নেই। হঠাৎ আমি একদম ভারশূন্য হয়ে পড়লাম কিভাবে? আমার কি হল? তারপরই আমি বুঝতে পারলাম --আমি বিতাড়িত হয়েছি। দেশের মাটি, জল, বাতাস, ফুল, নদী, পর্বত, অরণ্য, দেশের মানুষ---সবকিছু থেকেই আমি বিতাড়িত হয়ে পড়েছি। ঘড়ির সময়ের সঙ্গে এখন আর আমার সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক নেই পৃথিবীর কোন ঋতু, কোন অরণ্য, নগর, মহানগরের সঙ্গে। মাটির সঙ্গে এখন আমি সম্পর্কবিহীন। তারপর আপনার সঙ্গে মুখোমুখি।

আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন---প্রথমজন আবারও হাসল। শরীর থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমার ভয় করছিল নাকি জিজ্ঞেস করছিলেন। ভয়? মৃত্যুভয়ের শিক্ষা সৈনিককে দেওয়া হয় না। দেওয়া হয় মৃত্যুকে জয় করার শিক্ষা। দেশপ্রেমের শিক্ষা। শত্রুনিধনের শিক্ষা। কিন্তু কে না জানে জীবিত প্রাণী মাত্রই মৃত্যুকে ভয় করে। যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকার সম্ভবনা থাকে ততদিন পর্যন্ত কেউ মরতে চায় না। কিন্তু মাথা নত করে বেঁচে থাকার কামনাও বেশি মানুষ করে না। শত্রুর কাছে মাথা নত করে বেঁচে থাকা যায় না। কিন্তু আদর্শের কাছে? মানবীয় মূল্যবোধের কাছে? অথবা প্রেমের কাছে?

আমি শত্রু মানে অমানবিকতার কথা বলছি। আপনি শেষ মুহূর্তে কেমন অনুভব করেছিলেন?

মৃত্যুর অনুভব সবার কাছেই একরকম। আমিও অনুভব করেছিলাম সূর্যটা আকাশের সঙ্গে ভেঙে চুরমার হয়ে বুকের মধ্যে ঢুকে গেল। আর আমার কোন ভয় নেই। কারণ, সূর্যের আলো আর উত্তাপ আমার বুকের অন্ধকার নাশ করে জমা বরফ হয়ে যাওয়া বুকটি উত্তপ্ত করে

তুলেছে। যে উত্তাপ আর আলোর কথা আপনি বলছিলেন সেই একই উত্তাপ আর আলো। আমি যেন কালের সীমা অতিক্রম করে এক অপরিবর্তনীয় বৃত্তের বিশালতার মধ্যে ঢুকে গেছি। আপনি তার নাম দিতে পারেন প্রেম অথবা মৃত্যু অথবা অমরত্ব। কিন্তু পৃথিবীতে আমারও তো কিছু অপূরণীয় আকাঙ্খা থেকে গেল।

পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবে গেল। সূর্য খেলা সমাপ্ত করল। কিছুক্ষণ পাখিরা কোলাহল করতে থাকল। কিছুক্ষণ আকাশের শেষ রঙ নদীর জলে আলোড়িত হতে থাকল। দ্বিতীয়জন প্রথমজনের কাঁধে হাত রাখল। কিন্তু একটা কথা জানেন কি আপনি, পৃথিবীর কোন মানুষেরই আকাঙ্খা পূরণ হয় না। একটা আকাঙ্খা পূরণ হলেও আরও দশটা আকাঙ্খা জন্ম নেয়। পৃথিবীর সমস্ত মানুষই বড় অসহায় আর দুঃখী।

ঠিকই বলেছেন আপনি। প্রথমজন উত্তর দিল। এই যে আমার মৃত্যু হল---লোকে বলছে আমাদের দেশের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে---দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা মৃত্যুবরণ করেছি---যে যাই বলুক, আমাদের মৃত্যু কিন্তু পৃথিবীর একজন লোকেরও দুঃখ দূর করে আকাঙ্খা পূরণ করতে পারে না।

তবুও মানুষই আমাদের অমর করল। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এমনকি প্রেমিকাও আমাদের দেশের জন্য, দেশের কল্যাণে উৎসর্গ করেছে। উৎসর্গিত হয়ে আপনি সুখী তো?

মৃত্যুকে ভয় করি না বলেই অমর মুহূর্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। সূর্যটা আকাশের সঙ্গে ভেঙে চুরমার হয়ে বুকের মধ্যে ঢুকে যাওয়া মুহূর্তটির কথা বলছি আমি। আর উৎসর্গিত দেশের মানুষের বুকে যে আলোড়ন উঠেছে, সে আলোড়নের একটা কম্পনও মিথ্যে নয়। তারা আর একটা যুদ্ধ শুরু করার জন্য আমাদের উৎসর্গ করেনি। উৎসর্গ করেছে পৃথিবী থেকে যুদ্ধকে বিতাড়িত করার জন্য। যেমনভাবে পাখি নিজেকে উৎসর্গ করে গান গাইবার জন্য, এটাও তেমনই উৎসর্গ। আপনি কি মনে করেন?

জলে আলোড়ন তোলা সূর্যের রঙের খেলা শেষ হল। গাছের ডালে পাখিদের কোলাহলও শেষ হল। দেখা গেল---পশ্চিম আকাশে ঝলমল করছে চাঁদ। চাঁদের ঈষৎ হলদে আলো জলে পড়েছে। নদীর জল টলমল করছে।

আমার প্রেমিকার শরীরে জ্যোৎস্না স্নাত নদীর টলমল গন্ধ। হাত বাড়িয়ে আমি তাকে স্পর্শ করতে পারি না। প্রথমজন তাকে কথাগুলি বলল। কথাগুলির মধ্যে একটা অন্তহীন কারুণ্যের সুর। দ্বিতীয়জন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং মাথা নিচু করল। অনেকক্ষণ দুজনেই নীরবে বসে থাকল। কিছুক্ষণ পর একজন বলে উঠল, বলুন তো কি প্রয়োজন আমাদের উৎসর্গের? আমাদের মৃত্যু কি একজন লোকেরও দুঃখ দূর করতে সক্ষম হয়েছে? মা'র বুক ভেঙে দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? মা বোধহয় এখনও বৃষ্টি পড়লে বিছানা হাতড়ে দেখবে আমার উপস্থিতি। বোনটাও মনে মনে কাঁদবে। আর প্রেমিকা সমস্ত জীবন বুকের মধ্যে একটা ক্ষত নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। কি দরকার ছিল আমাদের উৎসর্গের? দ্বিতীয়জন নীরবে মাথা নিচু করে রইল। প্রথমজনকে কিছুটা উত্তেজিত মনে হল। আমার মায়ের মনের মধ্যে কেউ উঁকি দিয়ে দেখেছে কিনা জানি না। আমাকে উৎসর্গ করে আমার মা কতটুকু আনন্দিত হয়েছে? অথবা কি এক অসহনীয় যন্ত্রণা তাকে প্রতিদিন দগ্ধ করে চলেছে। এ কথাটা কেউ কি মাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছে?

আর্পনি ঠিক কথাই বলেছেন। কেন অপূর্ণ থাকবে পৃথিবীর সাধাবণ মানুষের সাধারণ আশা? আমাদের মত সাধারণ মানুষেরা আকাশের দিকে হাত বাড়ায় না। আমাদেব আশাগুলি মাটির বুকের ঘাসের মত, খুব একটা দীর্ঘ নয়। সাধারণ মানুষেব আশাগুলি পূরণ কবতে পারেনি--অথচ যুবকটিকে যেন বড় উত্তেজিত মনে হল। সে উঠে দাঁড়াল এবং তার মুখে-চোখে একটা অধীর ভাব ফুটে উঠল।

পৃথিবীর সমস্ত সাধারণ মানুষই একটা অসাধারণ আকাঙ্খা করে। তাবা কেউ যুদ্ধ কামনা করে না।

তাহলে কারা যুদ্ধ চায়? আর্পনি চান না, আমি চাই না পৃথিবীর সমস্ত দুঃখী অসহায় সাধারণ মানুষ চায় না—কে চায় যুদ্ধ? মুষ্টিমেয় লোক চায় বলেই যুদ্ধ হতে হবে নাকি? এক মায়েরও যদি চোখের জল বন্ধ না হয়, তাহলে কি লাভ আমাদের উৎসর্গিত হওয়ার? কেন আমাদের দেশের জন্য উৎসর্গিত হতে হল?

পাথরের উপর বসে থাকা দ্বিতীয়জন শহীদ উঠে এসে প্রথমজনের কাছে দাঁড়াল। তাকে বড় অধীর মনে হল। বলল—মানুষ মরেই। কিন্তু এই মৃত্যুর ব্যবসা –

প্রথমজন উত্তর দিল—বড় লজ্জাকব। বড় অমানবিক।

তাহলে আমরা কি করতে পারি? প্রতিটি মানুষের হয়ে আমরা প্রার্থনা কবতে পারি। কামনা করতে পারি। আমরা কেবল আশা করতে পারি।

আসুন তো, আমরা তাই করি।

দুজন শহীদ পুনরায় আলিঙ্গনাবদ্ধ হল। নদীর জলে জ্যোৎস্নার আলো চমকে উঠল। বিস্তীর্ণ অরণ্যও জ্যোৎস্নার আলোতে ঝলমল করে উঠল। নদীব বুকে প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি হল। খরস্রোতা হয়ে পড়ল নদী। নদীকে বাধা দেওয়া যায় না।

যুদ্ধ নদীকে বাধা দিতে পারে না।

কোথায় সেই অশ্রুজল
ফণীন্দ্র কুমার দেবচৌধুরী

কচুরিপানা ভরা পুষ্করিণীটা তোর মনে পড়ে কি? কচুরিপানা ভরা পুষ্করিনীটার কথা?

আমাদের ঘরের সামনের সেই পুকুরটা কথা, এখন ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে ভাই যে ফিশারি খুলেছে? তুই যে পুকুরটাতে একবার একটা ডাহুকের বাচ্চা ধরেছিলি?

অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল মিতুন। সেই শৈশবের দিনগুলি, বর্ষার বেগুনী রঙের কচুরিপানার ফুল, কালদিয়া নদীর পারের কাশবন—সে সমস্ত কিছুই মিতুনের স্মৃতির অতল গর্ভে চিরকালের জন্য নিমজ্জিত হয়ে গেছে। স্মৃতিহীন হয়ে কখনও কোন মানুষের বেঁচে থাকা কি সম্ভব?

আমি এক গোপন আশা নিয়ে মিতুনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। স্মৃতির এক সূক্ষ্ম পরীক্ষায় আমি যেন মিতুনকে বাজিয়ে নিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম, না, মিতুনের মৃত্যু হয় নি, সে এখনও স্মৃতির সমস্ত সজীবতা নিয়েই বেঁচে রয়েছে।

পরম ঔৎসুক্যের সঙ্গে আমি বলেছিলাম, তোর মনে নেই? তুই একটা ডাহুকের বাচ্চা নিয়ে এসে অনেকদিন পুষেছিলি। কেঁচো, পতঙ্গ ধরে ধরে এনে ওটাকে খাইয়েছিলি, নদীর জলে ওটাকে স্নান করিয়ে দিতিস।

বাঁ হাতে কপালের রুক্ষ চুলগুলি ঠিক করে, অসহায়ভাবে মিতুন বলেছিল, 'একেবারে মনে নেই, ভাই। ছোট ছোট কথাগুলি তুই-ই ভাল মনে রেখেছিস।'

'ছোট ছোট কথা'—এই কথাটা দ্বারা আমার সুদুর শৈশবের আবেগময় স্মৃতির টুকরোগুলিকে ও উড়িয়ে দিতে চাইছে নাকি, আমি আবার বলেছিলাম, 'একদিন সকালবেলা উঠে দেখেছিলাম, ডাহুকটা নেই। তোর সে কি কান্না। কে যেন বলেছিল পোষা বিড়ালটা ডাহুকটাকে ধরে নিয়ে গেছে।

সত্যি মিথ্যে জানতাম না। তুই একটা ছোট দা নিয়ে বিড়ালটাকে কেটে ফেলার জন্য পেছন পেছন দৌড়েছিলি। তোর মনে নেই?'

বিছানায় বসে ধাতব জিনিসটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকা মিতুনের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম। যদি তার দৃষ্টিতে একমুহূর্তের জন্য হলেও স্মৃতির ঝলকানি দেখতে পাই। মিতুনের দু'চোখ স্থির, কঠিন, মৃত মানুষের মতো স্মৃতিহীন। ঠিক সেদিন থেকেই মিতুনকে আমি ভয় পেতে শুরু করি। বুকটা কোথায় যেন ব্যথায় টনটন করে উঠেছিল। দু'চোখের সামনে যেন হতাশার এক দীর্ঘ ছায়া, যার স্মৃতি নেই, তার হৃদয় নেই। আমি মনে মনে ভেবেছিলাম।

পরের দিন সকালবেলাতেই সে চলে গিয়েছিল। আজ থেকে প্রায় দু'বছর আগে মাত্র একটা রাতের জন্য মিতুন আমাদের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। আমি আর পল্লবী ডাইনিং টেবিলে। ছেলেমেয়েরা গভীর ঘুমে অচেতন। হঠাৎ বাইরের জানালায় খট করে একটা শব্দ। কলিং বেলটা কে যেন বাজিয়েছিল। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখেছিলাম গেটের সামনে থেকে একটা মারুতি গাড়ি নিঃশব্দে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে আর বারান্দার সামনে দাঁড়ানো একটা ছায়ামূর্তি। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে শেষ দেখা হলেও ছায়ামূর্তির প্রোফাইল থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম, মিতুন, মানে মৃত্যুঞ্জয়ই হবে।

দরজা খুলে দিয়েছিলাম। 'মিতুন, স্ট্রেঞ্জ!' বারান্দার অন্ধকারের মধ্যেও আমি নির্ভুলভাবে বুঝতে পেরেছিলাম তার দু'চোখের অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টি। স্থির, কঠিন, চর্বিহীন শরীরের নমনীয়, ঋজু প্রোফাইল। দশ বছর আগে সবাইকে অবাক করে দিয়ে কলেজ থেকে হঠাৎ একদিন সে নিরুদ্দেশ হয়েছিল, প্রি-ডিগ্রির পরী নামে শান্ত নিরীহ একটি মেয়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধের কথাও সে সময়ে কেউ কেউ বলাবলি করছিল। সেই মেয়েটিকে মিতুন কিছুই বলে নি। মাঝে মাঝে কোন গোপন উৎস থেকে টুকরো টুকরো খবর ভেসে আসত : কেউ কেউ তাকে ডিব্রুগড় না দুলিয়াজানে একটা মোটরসাইকেলের পেছনে উঠে যেতে দেখেছিল, অথবা যোরহাটে একটা লাল মারুতির মধ্যে সে কারো সামনে দিয়ে দ্রুত পার হয়ে গিয়েছিল। অনেকদিন সে নাকি অসমে নেই, ট্রেনিংয়ের জন্য বার্মা গিয়েছিল।

কোনরকম ভণিতা না করেই, শৈশব এবং কৈশোরের বন্ধুত্বের দাবিতে আমার দুচোখে দৃষ্টি রেখে মিতুন বলেছিল, 'এক রাতের জন্য তোর ঘরে থাকব। আমার থাকার কথা বাইরের কেউ জানতে পারবে না।'

নিঃসঙ্কোচে ড্রইং রুমের ভেতরে ঢুকে যাওয়া মিতুনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। কতদিনের নিরুদ্দেশ জীবনের পরে হঠাৎ এভাবে একরাতের জন্য আশ্রয়ের খোঁজে আসা এই মিতুনকে কি সত্যিই আমি চিনি? ছোট ছোট রুক্ষ চুল, রোদে পোড়া রঙ, জ্বলে যাওয়া মুখ, জিনসের প্যান্ট-শার্ট, কাঁধের উপরে ঝুলে থাকা একটা ব্যাগ, দুই চোখ অভিব্যক্তিহীন, চাল চলন, আচার ব্যবহার অস্বাভাবিক ভাবে শীতল, আবেগহীন। এই শান্ত শীতলতাই শৈশবের দুই বন্ধুর মধ্যে নিজেদের অজান্তেই যেন এক দূরত্বের দেওয়াল তুলে দিয়েছে।

পল্লবীর সঙ্গে মিতুনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। এক শীতল নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টিতে সে পল্লবীর মুখের দিকে প্রয়োজনের চেয়েও অধিক সময় তাকিয়েছিল। সেদিন রাতে শোবার সময় পল্লবী বলেছিল, 'তোমার বন্ধুর দুচোখের দৃষ্টি কিন্তু অদ্ভুত। কোন কামনা বাসনা নেই, অথচ সেই দৃষ্টি বেশি সময় সহ্য করা যায় না।' আমি মজা করে বলেছিলাম, 'বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কতদিন বোধহয় নারীর সংস্পর্শে আসে নি, তাই তোমাকে প্রাণভরে দেখে নিয়েছে।' আরও বলেছিলাম, 'কলেজে থাকতে পরী নামের একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছিল।'

তারপর?'

পল্লবী কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। আমি বলেছিলাম, 'তারপর কলেজ থেকে হঠাৎ নিরুদ্দেশ। পরীকেও বলে যায়নি। তারপর কোথাকার প্রেম কোথায় পড়ে রইল, কি ঠিক।'

পেছনের বারান্দার ছোট স্টাডি রুমটিতে মিতুনকে থাকতে দিয়েছিলাম। সে ঘরে জয়ন্তু আর পিকলি অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন। বারান্দার রুমে ঢোকার আগে গেস্ট রুমে মিতুন নিদ্রাবিভোর ছেলে মেয়েদের উঁকি মেরে দেখছিল। আমি পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য বলেছিলাম, 'জয়ন্তু আর পিকলি। জয়ন্তুর পাঁচ বছর আর পিকলির তিন।'

ওরা প্রতিদিন আটটার মধ্যেই ঘুমে...। তুই বিয়ে করেছিস?

'বিয়ে? ধুর।' সামনের রাস্তা দিয়ে সে সময়েই একটা জিপগাড়ি পার হয়ে যাচ্ছিল। ক্ষণিকের জন্য হলেও আমার চোখে পড়েছিল মিতুন মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন সচকিত হয়ে উঠল। বাইরের গ্রিলে তালা লাগিয়ে যখন শুতে আসি, দেখি বাইরে মিতুন থাকা ঘরটিতে তখনও আলো জ্বলছে। মিতুনের কিছু লাগতে পারে ভেবে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছি মাত্র, একলাফে বিছানা থেকে সে এসে দাঁড়াল, হাতে তার কালো কুচকুচে ধাতব সামগ্রীটা। এক মুহূর্তের জন্য চমকে উঠেছিলাম।

'ওঃ তুই।'

ধাতব সামগ্রীটা বালিশের নিচে লুকিয়ে রেখে সে একটা একটা করে শব্দগুলি উচ্চারণ করছিল। 'সবসময়ে অ্যালার্ট হয়ে থাকাটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।' বিছানায় বসে থাকা মিতুনের দিকে তাকিয়ে মনে হল, সে যেন ভয় এবং আতঙ্কের গুহায় আবদ্ধ হয়ে থাকা এক অসহায় রুগী।

কোনরকম ভূমিকা না করেই তার সামনে বিছানায় বসে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুই কাউকে গুলি করে মেরেছিস? সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে কিছুসময় আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মুখটা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠেছিল, নাকের পাটা দুটো ফুলে উঠেছিল, একটা অপরিচিত হাসির ঢেউ খেলে গিয়েছিল তার মুখে।

তার মৌনতার সুযোগ নিয়ে আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করেছিলাম,'মানুষের মৃত্যুতে তোদের কি দুঃখ হয় না?'

ধাতব পদার্থটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে এবার ধীরে ধীরে মিতুন জবাব দিয়েছিল- - 'মানুষের মৃত্যুতে দুঃখ পেলে এই জিনিসটা হাতে নেওয়া যায় না। মৃত্যুতে আজকাল আর দুঃখ হয় না। আনন্দ হয় বরং। বিজয়ের আনন্দ।' মিতুনের মুখের দিকে তাকাতে আমার ভয় করছিল। আমার সূক্ষ্ম মন চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকা জন্তুর সঙ্গে তার তুলনা করতে চাইছিল। এই মিতুন আমার অপরিচিত। মিতুন এখন আর বেঁচে নেই।

শেষবারের মতো যেন তার দুচোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। তার দুই চোখে শৈশবের সেই কচুরিপানায় ভরা পুকুরটির জল প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠছে কি না দেখতে ইচ্ছে করছিল। বর্ষার সময় কচুরিপানার মধ্য দিয়ে ডাহুকের বাচ্চাগুলি ঘুরঘুর করে বেড়াত। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একটা হাফ প্যান্ট পরে ডাহুকগুলির পেছন পেছন দৌড়ে বেড়াচ্ছিল ছয়-সাত বছরের মিতুন। মিতুনের পাশে বিছানায় বসে হঠাৎ তাকে অবাক করে দিয়ে আমি গভীর আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কচুরিপানায় ভরা পুষ্করিনীটা তোর মনে পড়ে কি? কচুরিপানায় ভরা পুষ্করিনীটার কথা? তুই যে পুকুরটাতে একবার একটা ডাহুকের বাচ্চা ধরেছিলি? তোর মনে নেই?' সেই যে একটা রাত, তারপরের দিনই মিতুন চলে গিয়েছিল। দুই বছর পরে এই যে আমার গাড়ির পেছনের সিটে

নিঃশব্দে মিতুন বসে রয়েছে। তার কোলে ছোট একটা সাদা কাপড় দিয়ে পোটলার মত করে ঢেকে আনা একটা সদ্য মৃত ভ্রূণ। পেছনে বসে থাকা মিতুনের মুখের দিকে তাকাতে একটা তীব্র কৌতূহল অনুভব করলাম। না হল না। একটা সিগারেট জ্বালাব কি? সঙ্কোচ হল। মৃত্যু জীবনকে পবিত্রতা দান করে। আমার মনে হল এই নীরব পবিত্রতার সামনে একটা সিগারেট জ্বালানো যেন অঘোষিত অপরাধ। রাতের অন্ধকার কেটে কেটে অগ্রসর হবার মত করে আমি গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে চলেছি। গাড়িতে বহন করে এনেছি মৃত্যু। গাড়ির ভেতরে প্রায় অন্ধকার। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি। রাতের রাস্তা জনশূন্য, স্ট্রীট লাইটের একটা তারে বিদ্যুতের উজ্জ্বল চমক, হয়তো আগুন লেগেছে। বিদ্যুতের সেই ক্ষণিক ঝলকানিতে আয়নায় প্রতিবিম্বিত মিতুনের মুখটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মিতুন একটা মৃত শরীরের মত গাড়ির পেছনের সিটে পড়ে রয়েছে। তার বুকের উপর সদ্য মৃত সেই ভ্রূণটা হাত পা নেড়ে খেলা করছে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি বাঁ পা-টা ব্রেকের উপর চেপে ধরলাম।

'কি হল।'

পেছন থেকে মিতুনের কণ্ঠস্বর। অপ্রস্তুত হয়ে আমি বললাম, 'সামনে একটা গর্ত রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

'এখনও গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর সময় হয় নি?' সে জিজ্ঞেস করল। তার কণ্ঠে কোনরকম কম্পন নেই। মৃত্যুর মতই স্থির এবং স্বাভাবিক। আমি বললাম, 'একটু সামনে একটা লাইট পোস্ট রয়েছে। সেখান থেকে টার্নিং নিতে হবে।'

অবিরাম বৃষ্টি সামনের পথটা অস্পষ্ট করে তুলেছে। এইমাত্র শহরের এই অঞ্চল থেকে বিদ্যুৎ বিদায় নিয়েছে। লাইট পোস্টের পাশ দিয়ে নদীর পারের সঙ্কীর্ণ রাস্তাটা এগিয়ে গেছে। নদীর পারের বিস্তৃত বালুচরে মৃত মানুষের নিদ্রাভূমি। সেদিকে বাঁক নেবার জন্য আমি স্টিয়ারিঙে হাত দুটি প্রস্তুত করে নিলাম। বৃষ্টির ধূসরতার মধ্যে খুঁজতে লাগলাম লাইটপোস্টটা। শ্মশানের অপরিচিত অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সে যেন মানুষকে আলো দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

আমরা এখন আলো থেকে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। জীবনের আলোর রেখা অতিক্রম করে মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্যে যাবার জন্য গাড়ির পেছনের সিটে বসে মিতুন যেন আমাকে নির্দেশ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর জন্য মিতুনের কোন দুঃখ নেই। কোন দুঃখ নেই। কোন স্মৃতি নেই মিতুনের। মৃত্যু এখন মিতুনের জন্য বিজয়ের আনন্দ।

মিতুন কি মানুষ?

আজ রাতে যখন ভাত খাবার জন্য বসেছি ঠিক তখনই হঠাৎ টেলিফোনটা এসেছিল। পল্লবী ধরেছিল।

'তোমাকে চাইছে।'

'আচ্ছা, বলছি।'

'ফোনটা মিতুনের। আজও কোন ভূমিকা ছাড়াই স্থির, কম্পনহীন স্বরে মিতুন বলেছিল, 'তোকে ডমনিয়া নার্সিং হোমে আসতে হবে। একটা বেবী শ্মশানে পুঁতে রেখে আসতে হবে।'

'হোয়াট? কি বলছিস তুই? কার বেবী?'

'আমার।'

'তোর? তুই বিয়ে....'

'তুই আসতে পারবি কি?'

টেলিফোনে ভেসে আসা শব্দগুলি থেকেও আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, এক শীতল কঠিনতা শব্দগুলিকে স্পর্শ করে যাচ্ছে। কোন মানুষই বোধহয় নিজের সন্তানের মৃত্যুর সময়ে এভাবে শীতল কাঠিন্যে কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলেনি।

মিতুন মানুষ নয়। পল্লবীকে বলেছিলাম, 'আমি ডমনিয়ায় যাচ্ছি। কানু আর রজকে সম্ভব হলে পাঠিয়ে দিও তো।'

'কোথায়?' উদ্বেগের সঙ্গে পল্লবী জিজ্ঞেস করেছিল।

নার্সিং হোমে। মিতুনের ফোন। আমিও ভালভাবে কথাগুলি বুঝতে পারছি না। ফিরে আসতে আমার দেরী হতে পারে। গাড়িটা নার্সিং হোমের গেটের সামনে রাখার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে যেন হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিল মিতুন। মুখে শীতল স্বাভাবিকতা। মৃত্যুর কোন ছায়া নেই। ঠিক দু'বছর আগে এক রাতে আমাদের ঘর থেকে পুনরায় কোথাও নিরুদ্দেশ চলে যাওয়া মিতুনের সাথে এই মিতুনের কোন প্রভেদ নেই। এই জিনসের শার্ট-প্যান্ট, রুক্ষ চুল। স্মৃতিহীন। কখন কার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল। তার পেছন পেছন আমি নার্সিংহোমের করিডর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসা একজন নার্সকে সে যেন কি জিজ্ঞেস করল। আমাকে কিছুক্ষণের জন্য করিডরেই অপেক্ষা করতে বলে সে ডাক্তারের রুমে ঢুকে গিয়েছিল। দীর্ঘ করিডরটার একেবারে শেষের রুমটা থেকে কার চিৎকার ভেসে আসছিল। হাতে প্লাস্টার বেঁধে রাখা একজন বৃদ্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল, তারপরেই কিছুটা ইতস্তত করে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। বৃদ্ধের আন্তরিকতায় ভরা সান্ত্বনার বাণী যেন আমি এখান থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম।

ডাক্তারের ঘর থেকে হাতে একটা কাগজ নিয়ে বেরিয়ে আসা মিতুন বলেছিল, 'সব ফর্মালিটি হয়ে গেল।' করিডরের শেষের রুমটির দিকে সে অঙ্গুলিনির্দেশ করে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলেছিল, 'ওই রুমটিতে রয়েছে। এই এতটুকু বাচ্চা। তোর গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে আমরা দুজনে মিলে পুঁতে রেখে আসতে পারব।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে আমি মিতুনের দিকে তাকিয়েছিলাম। নার্সিংহোমের করিডর দিয়ে আমার আগে আগে যেন ঝপাং ঝপাং করে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন এক অতিকায় প্রাণী এগিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ব্যাপারটা কি বল তো? তোর বিয়ের ব্যাপারটাই তো জানি না।'

'পরীর একটা বাচ্চা হয়েছে গতকাল।'

'পরীর?'

চরম সংশয় এবং হতাশার একটা মুহূর্ত যেন আচম্বিতে কিছুটা আলোকিত হয়ে ওঠে। পরীর সঙ্গে তার বিয়ে এক কয়েনসিডেন্স না, প্রেমের পরিণতি। মিতুনের পৃথিবীতে প্রেম। আশ্চর্য!

'প্রিম্যাচিওরড। আমি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম বাঁচবে না। মৃত্যুকে আমি ভালভাবেই চিনি।' এক অদ্ভুত দৃঢ়তা মিতুনের কণ্ঠে। কত মৃত্যু দেখেছে মিতুন? সে যে পথে নিজেকে খুঁজতে গিয়ে ঘূর্ণিপাকে হাবুডুবু খাচ্ছে সে পথের প্রতিটি মোড়েই মৃত্যু ওৎ পেতে বসে রয়েছে। ঠিকই সে মৃত্যুকে ভালভাবেই চিনতে পারে। কিন্তু জীবন?'

পাগল হয়ে যাওয়া পরীর কোল থেকে মৃত শিশুটিকে ছিনিয়ে আনার সময়ও তো মিতুনের মুখে কোন বেদনার ছায়া পরিলক্ষিত হয় নি। পাশেই সেই অপরিচিত বৃদ্ধ আর একজন নার্স। মৌন, স্তব্ধ। সেই যে কলেজে শেষ দেখেছিলাম পরী নামের শান্ত, নিশ্চুপ মেয়েটিকে। দশ বছর আগের কি এক অসহায়, আকুলতায় ভরা বিশাল চোখ দুটির বাইরে যৌবনের কোন অবশিষ্ট এখন আর নেই।

কোন শরীরে মিতুনের জন্য এক যুগ ধরে সে প্রেমকে বাঁচিয়ে রেখেছিল? আর কেনই বা রেখেছিল? পরীর ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখ, অপত্য স্নেহের আকৃতির সামনে মিতুনকে ভয়ঙ্করভাবে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল।

'আমার সোনাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' মিতুন মাংসপিণ্ডটা ছিনিয়ে নিয়ে যাবার সময় পরী একবার শুধু চিৎকার করে উঠেছিল। আব তারপরেই তার অচেতন দেহটা বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিল। নার্সটা দৌড়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। মিতুন বলেছিল, 'চল দেরি করব না।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি অবাক হয়ে মিতুনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। মুখে ওটা কি বিষাদ না কঠিন এক বর্ম?

তিন চার বছর আগের কথা। স্কুলের অধ্যক্ষের কাছ থেকে দুপুরবেলা একদিন একটা ফোন পেয়েছিলাম। আমাদের বড় ছেলে জয়তু তীব্র পেটের ব্যথায় ক্লাসরুমে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। পল্লবী আর আমি ঝড়ের বেগে স্কুলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। দশ মিনিটের মধ্যে একটা নার্সিং হোমে জয়তুর ইমার্জেন্সী অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বন্ধ অ.টি-র বাইরে আমি আর পল্লবী প্রায় অর্ধঅচেতন। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর সান্ত্বনাবাণীও পল্লবীর দুচোখের প্লাবনকে বাধা দিতে পারছিল না। আমার চোখের জল জমাট বেঁধে গিয়েছিল।

মিতুন কাঁদছে না কেন? দুঃখ আর অশ্রুহীনতাও যেন মানুষের এক ধরণের রোগ। সেই ভয়াবহ রোগে মিতুন এখন আক্রান্ত। কোলে অবুঝ মাংসপিণ্ডটা নিয়ে মিতুন আমার পেছন পেছন নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে এসেছিল। বাইরে রজত আর কানু অপেক্ষা করছিল। কানু আমাদের অফিসের ক্যাজুয়াল লেবার, রজত জীপ চালায়। রজতকে কাছে ডেকে এনে বলেছিলাম, 'তোরা ঘর থেকে একটা কোদাল নিয়ে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যা। ছোট একটা গর্ত করিস। আমরা আসছি।'

লাইটপোস্টের পাশ দিয়ে আমি টার্ন নিলাম। এর মধ্যে বৃষ্টি কমে এসেছে। এখান থেকে মাটির রাস্তা শুরু হয়েছে। সোজা চলে গিয়ে রাস্তাটা শেষ হয়েছে নদীর ঘাটে। শহরে এখন বিদ্যুৎ নেই। আকাশ বিদ্যুতের ঝলকানিতে মাঝে মাঝে আলোকিত হয়ে উঠছে। সামনের নদীর জলে গাড়ির হেডলাইটের আলোটা পড়তেই মুহূর্তের জন্য জলটা যেন সচকিত হয়ে উঠল। নদীর পারে পারে কাশবন। সংকীর্ণ রাস্তার দু'পাশে বড় বড় ঢেঁকিয়া গাছ। প্রাকৃতিক অন্ধকার আর লাইটের আলোয় দোলায়িত হতে থাকা কাশ, ঢেঁকিয়া আর জলের ঢেউ মিলে মিশে এমন এক অপার্থিব রহস্যময়তার সৃষ্টি হল, আমি যেন মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেলাম আমার বাঁ-পাশে ওটা শ্মশান। চিরনিদ্রায় কত শত শত মানুষের অন্তিম আশ্রয়স্থল। মৃত্যুর ভিড়ের মধ্যেও কখনও দেখেছি এইভাবে সৌন্দর্যের ফুল প্রস্ফুটিত হয়।

রাস্তার একপাশে গাড়িটা রাখার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে থেকে ছায়ামূর্তির মত সামনে হাজির হল কানু আর রজত। বৃষ্টিতে ভিজে ওদের অবস্থা কাহিল। কানুর হাতে কোদালটা। গাড়ির দরজা খুলে কানুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'গর্ত খুঁড়েছিস? তিন ব্যাটারির টর্চ জ্বালিয়ে দিল রজত। বর্ষণসিক্ত ঢেঁকিয়া গাছের উপরে টর্চেব ভুতুড়ে আলো। নদীর জলের কাজলা রঙ। নদীর ওপারের বালিচরে একটা আলো মন্থরগতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বোধহয় বর্ষায় নদীর জলে মাছ ধরতে এসেছে।

রজত বলল, 'দক্ষিণের সেই কোণটিতে গর্ত খুঁড়েছি। গর্তে বোধহয় বৃষ্টিব জল ঢুকেছে।'

পেছনের দরজা খুলে মিতুনকে ডাকলাম, 'আয়, সব রেডি করাই আছে।' মিতুনেব কোলে সাদা কাপড়ে ঢেকে রাখা মাংসপিণ্ডটা। মাংসপিণ্ডটা দুহাতে তুলে নিয়ে মিতুন বসে থাকা সিটটাতে নড়াচড়া করল। 'ধব তো একটু।' সে বলল।

আমি দু'হাত প্রসাবিত করে দিলাম। এই বোধহয় আমি জীবনে প্রথম এভাবে দুই হাতে মৃত্যুকে স্পর্শ করছি। পায়ের নিচ থেকে মাথা পর্যন্ত একটা শিবশিরানি ভাব বয়ে গেল। রজত কৌতূহলী হয়ে মুখটার উপর আলো ফেলল। এক মুহূর্তেব জন্য বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। মনে পড়ল জয়তু আর পিকলুর কথা। গোলাপী রঙের এক টুকরো মাংসপিণ্ডে যেন তুলো দিয়ে কেউ মুখ, নাক, চোখের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। শিশুটির নিমীলিতদু'চোখের দিকে তাকিযে থাকতে ভয় করতে লাগল। কেন যেন মনে হল এটা যেন তার ইচ্ছেমৃত্যু। ভবিষ্যতের প্রতিটি মুহূর্তে যাব জন্য অপেক্ষা করছে কোন ঘাতকের হাতে অনিশ্চিত মৃত্যু, তার জন্য জীবন থেকে ইচ্ছামৃত্যুই কি বেশী আকর্ষণীয় নয়?

ফিসফিস স্বরে রজত বলল, 'ইশ, মুখটিতে বেদনার চিহ্নমাত্র নেই। যেন আনন্দ মনে শুয়ে রয়েছে।' মৃত্যুর এই অস্বাভাবিক আনন্দময়তা যেন আমাদের সবাইকে বিদ্রুপ করছে। আমরা বললাম, 'চল গর্তটা কোথায়?' গর্তটার সামনে সবাই এসে একটা সময়ে আমরা স্থিব হয়ে গেলাম। আমার হাতে এখনও কাপড়ে ঢেকে রাখা নিষ্প্রাণ মাংসপিণ্ডটা। কানুর হাতে কোদালটা আর রজতের হাতে টর্চটা। গর্তের ভতের টর্চেব আলো ফেলল রজত। 'হবে তো?'

আমার মিতুনের মুখের দিকে তাকাতে কেমন যেন ভয করতে লাগল। ঠিক ভয় নয, মনের মধ্যে গজরাতে থাকা একটা ক্ষোভ। মৃত্যুর সম্মানের জন্যও কি আজ মানুষের দু'চোখে দু'ফোঁটা অশ্রু নেই? মিতুন কি এতটাই নিঃস্ব আর পার্শাবিক হযে গেছে? মেঘলা আকাশের বিদ্যুৎ চমকে সাদা কাপড়ে ঢেকে রাখা মাংসপিণ্ডটা এক অপার্থিব দেবদূতে রূপান্তরিত হওয়া বলে মনে হতে লাগল। মিতুন যদি তাকে আজ দু'ফোঁটা চোখেব জল উপহাব দিত।

'মিতুন ---'

নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা মিতুনের মুখেব দিকে তাকালাম। নদীটা যেন শৈশবের কচুরিপানায় ভরা সেই পুকুরটা, ডাহুকের বাচ্চাগুলি কু কু করে এদিক থেকে ওদিকে দৌড়াদৌড়ি করছে, হাফপ্যান্ট পরে ডাহুকের বাচ্চাগুলোর পেছন পেছন দৌড়ে চলেছে মিতুন।

মিতুন।

মিতুন।

'ও'।

'নে'।

আমার হাত থেকে নিষ্প্রাণ মাংসপিণ্ডটা দু'হাতে তুলে মিতুন। তুলির আঁচড়ের মত তার দুটো নিমীলিত চোখে পরম মমতার সঙ্গে চুমু খেয়ে মিতুন মাংসপিণ্ডটা গর্তটার ভেতরে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিল।

মিতুনেব ফোঁপানির শব্দে অন্ধকারে ঘিবে রাখা রাতের শ্মশানটা যেন প্রাণ পেয়ে উঠল।

উপান্ত উপকূল

ফুল গোস্বামী

নাফামে রান্না করা মাসকলাইয়ের তরকারিটা নামিয়ে রাখল সুভদ্রা। কড়াইটা পরিষ্কার করে ধুয়ে পুনরায় বসিয়ে দিল। জ্যান্ত কৈ মাছগুলিতে হলুদ লবন মাখিয়ে গরম তেলে বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মাছগুলি ধনুকের আকৃতি ধারণ করল। মাছের দেহকোষগুলি মৃত্যুর বিরুদ্ধে আচরণ করতে চাইছে। সুভদ্রার দাদাও তাই করেছিল। মাছগুলি উল্টেপাল্টে দেবার পরে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল। থালায় নামিয়ে রাখার পরে দৃষ্টিহীন দৃষ্টিতে ওরা সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মৃত পিতার চোখ দুটিও ঠিক এইভাবেই তাকিয়েছিল আর মাছগুলির মতই বিশৃঙ্খলভাবে পড়ে ছিল। সে আজকাল এই মাছ খেতে পারে না। অরুণ কৈ মাছ ভাজা খেতে বড় ভালোবাসে।

গেটটা খোলার শব্দ হওয়ায় সে বাইরে বেরিয়ে গেল। কে জানে হয়তো অরুণ এসে গেছে। না, একটা ছাগল শিঙের সাহায্যে গেটটা খোলার চেষ্টা করছে। মাছগুলি ভাল করে ঢেকেঢুকে রেখে বারান্দার মোড়াটাতে বসল। অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। এরকম অন্ধকারে সেদিন রাতে তার দাদা অনেকদিন পরে বাড়িতে এসেছিল। সে তৎক্ষণাৎ করে দেওয়া চায়ের কাপটা হাতে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে হুইসেলের শব্দ হয়েছিল আর পেছনের দরজা দিয়ে তার দাদা অন্ধকারে দৌড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ শোনা গিয়েছিল আর তার মোটাসোটা শরীরটা কিছুসময় কৈ মাছ ক'টির মতই ছটফট করে চিৎ হয়ে পড়েছিল। বন্দুকধারী ভারী জুতো পরা মানুষগুলি তার দিকে দৌড়ে আসতে দেখে বাবা তাদেরকে বাধা দিতে গিয়েছিল আর তারা বাবাকে অনায়াসে মাটিতে ফেলে দিয়ে বন্দুকের নল দিয়ে খোচাখুঁচি করছিল আর বুট জুতো দিয়ে লাথি মারছিল। সে পেছনদিকের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে বাবার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত বের হতে দেখেছিল।

কে বুঝি গেটটা খুলছে। অরুণ এসেছে নিশ্চয়। সে শিহরিত হল। প্রায় পাঁচমাস হতে চলল সে অরুণকে দেখে নি। লোকটি কাছাকাছি আসাব পরে টের পেল অরুণ নয়, খবরের কাগজটা নিয়ে বাপুরুণ এসেছে। গতকালের খবরের কাগজগুলি ওদের গ্রামে পরের দিন সন্ধেবেলা আসে। নগর থেকে একটা মাত্র বাস তাদের গ্রামে আসে। খবরের কাগজ এসেছে মানেই বাসও এসেছে। কিন্তু অরুণ এল না। খবরের কাগজটা সে রেখে দিল—মোটেই পড়ার ইচ্ছে হল না।

বিছানায় পড়ে সে ভাবতে শুরু করল, অরুণ কি তাকে সত্যি সত্যিই ভুলে গেল? সে নিজের ইচ্ছায় দীপালির সঙ্গে অরুণের বিয়ে দিয়েছিল। কারণ তার কোন উপায় ছিল না। পৃথিবী যখন তার সঙ্গে ঘোর শত্রুতা করেছে, সে একা কী করতে পারে? শ্বাস প্রশ্বাস নিতে থাকা একটা জীবিত শরীর থাকা সত্ত্বেও সে জীবন থেকে সরে দাঁড়াল, মানে সরে দাঁড়াতে হল। দৃষ্টিহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা পিতার চোখ দুটো আর মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তের স্রোত দেখে সে-ও দাদার মতই পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বন্দুকধারী লোভী চোখের জল্লাদ পুকুরপাড়ের বকুল ঝোপের নিচে তার লম্বা বেণীটা ধরে টান মেরে ধরে পরনের পোষাকটা খুলে ফেলেছিল। ওদের দুর্গন্ধময় গরম নিঃশ্বাস তার ঠোঁট পুড়িয়ে দিচ্ছিল। তার থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে সে চেষ্টা করেছিল, যদিও তাদের জান্তব বাসনা পরিপাটি করে রাখা তার কুমারী শরীবটার শুচিতাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। শহরের হাসপাতালে সে চোখ মেলেই প্রথম অরুণকে দেখেছিল। বুকের মধ্যে অস্বস্তি হতে থাকা দুঃখগুলি উথালপাথাল লাগিয়েছিল। তার গভীর অরণ্যের বৃহৎ বনস্পতিগুলি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিল। গান গাওয়া পাখিগুলি নিথর হয়ে কৈ মাছের মত পড়েছিল। সমস্ত কিছুই উচ্ছন্নে গিয়েছিল। ইশ্, কী দুঃসহ জীবন। অরুণ তার হাতটা তুলে নিয়েছিল। দুচোখ বেয়ে নেমে আসা জলের ধারা মুছে দিয়েছিল। মার হাতে লাগানো ফণিমনসা আর তুলসীগাছের বেদীটার মতই সে-ও নিজের শরীরটাকে পবিত্র করে রেখেছিল। সময়মতো নিজেকে অরুণের হাতে তুলে দেবে বলে। অরুণের দিকে তাকিয়ে সে ভাবল—সে একেবারে উচ্ছন্নে গেছে, অরুণকে দেবার মত আর কিছুই বাকি নেই। সতেজ শশা খাবার মত করে তাকে কচকচ করে চিবিয়ে অশুচি করার পরেও অরুণ তাকে বিয়ে করেছে।

গত পাঁচমাস সে অরুণকে দেখেনি। শহরের কলেজে যখন পড়তে যেত তখন অরুণ এতদিন একনাগাড়ে না এসে থাকে নি। অরুণের অনুপস্থিতিতে সে কোন কিছুতেই মন দিতে পারছিল না। পথের পাশে খালের মধ্যে বিমলাদের সঙ্গে জাকৈ দিয়ে মাছ ধরার সময় সে প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল, জাকৈর মাছগুলি ডুলিতে না ভরে পুনরায় জাকৈটা জলে ডুবিয়ে দিচ্ছিল। সন্ধে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অরুণদের বারান্দার গিয়ে বসে আর হেলে পড়া আমলকি গাছের এক বিশেষ অংশ সে স্পর্শ করে দেখে। কারণ ঘরে থাকলে অরুণ বেশিরভাগ সময় সেখানেই বসে থাকে। আর অরুণ তার দিকে ভালোবাসার চোখে তাকিয়ে থাকে।

পুজোর ছুটি এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহমন তাদের বাড়ির পেছনদিকের কোমল কলাপাতাগুলির মত হয়ে পড়ত আর অরুণের বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে বরদৈচিলা সেই পাতাগুলিকে ছিঁড়ে ফেলত। তখন আর সে তার মধ্যে থাকত না।

ভাত খেয়েছিস সুভদ্রা?' কাকীমার কথায় সে নিজেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। 'খেয়েছি' সে মিথ্যে কথা বলল। 'মাসকলাই দিয়ে রান্না নাফামের তরকারি অল্প একটু রয়েছে, খাবে নাকি'--সুভদ্রা কাকীমাকে জিজ্ঞেস করল।

--'বেশি থাকলে দে' তরকারির কথা শুনে কাকীমা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল। ভাজা কৈ মাছগুলির সঙ্গে তরকারীটা পাঠিয়ে দিল। সাবাটা বাত মাছগুলি এভাবে দৃষ্টিহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে তার অসুবিধে হবে। পিতার শেষ সময়ের অসহায় দৃষ্টিটা তার সময়কে কঠিন করে তুলবে।

দরজাটা বন্ধ করে এক গ্লাস জল খেয়ে সে বিছানায় গেল। 'অরুণ তাকে ভুলে গেল' এই চাবটে শব্দ তাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। তার মনে হচ্ছে, তার অরণ্যের ভূপাতিত সেই বৃহৎ বৃক্ষগুলি ক্রমশ মাটিতে মিশে যাবার উপক্রম হয়েছে। সেখানে যে একসময় ঘন সবুজ অরণ্য ছিল তার শেষ চিহ্নটুকুও পর্যন্ত মিলিয়ে যাবার সময় এসেছে। কিন্তু অরুণ যে তাকে ভুলে যাবে এরকম কোন কথা তো ছিল না। অরুণের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সেই বিয়েটাতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। সেই তো দীপালিকে খুঁজে বের করেছিল। কারণ তার কোন উপায় ছিল না। অরুণ আর তার যুগ্ম জীবনকে কৃতকার্য করে তোলার জন্য তারা দুজনেই যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। হাতা-খুন্তির কাজকর্ম শেষ হয়ে যাবার পর তার অরুণ যখন তার কাছে ফিরে এসেছিল—সে অরুণের দিকে তাকিয়েছিল, এই কি তার অরুণ? এত সুখ পৃথিবীতে এখনও আছে?' অরুণ আলগোছে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে, বকুলের গন্ধমাখা সেই চিরপরিচিত, চিরআকাঙ্খিত চুম্বনের মাধ্যমে তাকে অরুণের জীবনে আহ্বান জানায়। পল-অনুপল করে সময় এগিয়ে যেতেই সে হঠাৎ অনুভব করে একটা গভীর অরণ্যের বৃহৎ বৃক্ষগুলি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে, গান গাওয়া পাখিগুলি মাটিতে ছটফট করতে করতে নিথর হয়ে পড়েছে আব তপ্ত দুর্গন্ধময় নিঃশ্বাস তাকে একদিক থেকে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

তপ্ত তেলে ছেড়ে দেওয়া জীবন্ত মাছের মতো অরুণের বাহুর মধ্যে তার দেহমন ধনুকের আকৃতি নিল। অরুণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল আর সুভদ্রাকে প্রকৃতিস্থ করে তোলার চেষ্টা করতে লাগল যদিও তার থেকে সুভদ্রা আর মুক্তি পেল না। তারপর থেকে প্রতিটি রাতেই তারা চেষ্টা করেছে অন্য দশজনের মত বেঁচে থাকতে। সুভদ্রা পারে নি। বিয়ের আগের অরুণের বকুলের গন্ধ মাখানো নিঃশ্বাসের সুখস্পর্শ সে মনে আনতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সুখস্পর্শের স্মৃতি দুর্গন্ধময় তপ্ত নিঃশ্বাসে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তার বড় ইচ্ছে করে সেই দিনগুলি ফিরে পেতে। অরুণের নিঃশ্বাসের সুখস্পর্শে সমস্ত শরীর নিবিড় হয়ে ওঠার সেই মধুর সময়।

আদর করে করে অরুণ কেঁপে উঠে ক্লান্ত হয় আর এভাবেই দিনমাস ঘুরে বছর পার হয়ে যায়। গ্রীকদেশীয় টেন্টালাসের মতো জলের মধ্যে থেকেও তারা দুজন জলের সন্ধানে হাহাকার করে বেড়ায়। জীবনের মধ্যে থেকেও তারা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে তার অক্ষমতাকে সে মেনে নিয়েছিল যদিও অরুণের জৈবিক প্রবৃত্তির নিশ্চুপ তাড়না অনুভব করে তার প্রাণমন নিংড়ে আসে। আঙুলের ফাঁকে আঙুল জড়িয়ে তারা রাতের অন্ধকারে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে, সহজ স্বাভাবিক জীবন আবার কি তারা ফিরে পাবে? সুভদ্রার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে। অরুণ সুভদ্রাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে আনে। অরুণের এই অবস্থা দেখা তাব পক্ষে দিন দিন অসম্ভব হয়ে উঠল। তার অক্ষমতার বোঝা কেন অরুণ বয়ে বেড়াবে? তাই নিজের হাতে সে অরুণকে দীপালির হাতে তুলে দিয়েছিল।

দীপালি সমস্ত আনন্দ উপভোগ করছে, অরুণ তার কাছ থেকে দূরে সরে গেল—এই সমস্ত ভেবে তার দুঃখ করে থাকার কোন মানে হয় না। সুভদ্রা নিজেকে বোঝাল। তার বিকল ঘ্রাণেন্দ্রিয় শুধু দুর্গন্ধময় নিঃশ্বাসের বাইরে অন্য কিছু অনুভব করতে পারে না। আজ অরুণ আসার কথা আছে

বলে কিছুটা উত্তেজিত হয়ে ছিল। মনে মনে ভেবে রেখেছিল নিজেকে একটা রঙলোভী ক্যানভাসের মত তুলে দেবে অরুণের হাতে আর অরুণ কপালে, ঠোঁটে, থুতনিতে রঙ লাগিয়ে যাবে। ছিঃ বড় অন্যায় হয়েছে। অরুণকে বিপদে ফেলা আর দীপালিকে কষ্ট দেওয়ার কোন মানে হয় না। বিজয়ার বিষণ্ণ সন্ধ্যায় বিসর্জিত প্রতিমার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব কি? নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে সচেতন করে তুলল সুভদ্রা। উচ্ছন্ন বনভূমির শূন্যতাকে দুঃসহ মনে হলেও মেনে নিতে হবে। তার মতো বেঁচে থেকেও জীবন থেকে বঞ্চিত নারীর জন্যে এই সহজ সত্যটাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। বাতের অন্ধকারে চলন্ত রেলে যেতে থাকা নিরীহ যাত্রীদেব আশা-আকাঙ্খায় ভরে থাকা বুকগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার অপরাধে হয়তো তারা দাদার মোটাসোটা শরীরটাকে নিথর করে দিয়েছিল। কিন্তু সে তো অন্যায় করেনি। তার কৃষক পিতা তো কোন অপরাধ করেনি। তার দোষ মাত্র এটাই ছিল যে সে সেদিন দাদাকে এক কাপ চা বানিয়ে দিয়েছিল। দাদাকে জন্ম দিয়েছিল বলেই বাবাকে বন্দুকের খোঁচায় মরতে হল। পৃথিবীর আর দশটি মেয়ের মত সে-ও লেখাপড়া শিখেছে। যেখানে জন্মেছে, তার আশেপাশেব ভাষা সংস্কৃতিতে নিজেকে পুষ্ট করে তুলেছে, তা সত্ত্বেও আজ সবার কাছ থেকে সে আলাদা হয়ে গেল। সুভদ্রার বুকটা ক্ষোভে, হতাশায় গুমরে উঠল। এই অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ কাউকে দেওয়া উচিত। বুকে বুক রেখে, ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়েও যে সে অকণের সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে পারল না তার জন্যে দায়ী কে? ওরা বলে 'আমরা' সবাই একই দেশের মানুষ। ওদের এই আমরা শব্দটি সুভদ্রার মত মেয়েদের বাদ দিয়ে কেন?

বেড়ার ফাঁক দিয়ে আসা রোদের আলোতে সে জেগে উঠল। পেটটা ক্ষুধায় কলকল করছে। গতকাল দুপুর থেকে তার পেটে কিছুই পড়ে নি। 'অরুণ আসবে' এই উচ্ছ্বাসে পেটের ক্ষুধার কথাও ভুলে গিয়েছিল। তারপর 'অরুণ এলো না' এই দুঃখ চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতে থাকতেই বাত পার হয়ে গেল। আজ রবিবার, স্কুল যাওয়ার তাড়াহুড়ো নেই। আজ সময় তার মত চলবে। মনের মধ্যে যদিও 'কিছুই নেই' এরকম একটা নিঃসঙ্গ বোধ কাজ করে চলেছে তবুও অরুণ না আসার ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। সময় একদিন অন্ধকার রাতের দুর্গন্ধময় তপ্ত নিঃশ্বাসের অনুভবটা মুছে দিতে পারবে কি?

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে সুভদ্রা খবরের কাগজটা মেলে বসল। হঠাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত কিছু আগুনের শিখা যেন তাকে স্পর্শ করে গেল। চাবুয়ার কাছে সৈন্যবাহিনীর হাতে বেশ কয়েকজন নারী ধর্ষিতা হয়েছে। বেড়ায় মাথাটা হেলান দিয়ে চোখ বুজে ফেলল সুভদ্রা। মেয়েগুলির নির্যাতিত শরীর মনের ছবি স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল সুভদ্রার চোখে। পৃথিবীর চরমতম দুর্ভাগ্যগুলির মধ্যে এই নির্যাতনও সমপর্যায়ের দুর্ভাগ্য। বহন করে চলতে হয় এই বোঝা, কিন্তু নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই। সেনাবাহিনী এখন উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেবে। ফলশ্রুতিহীন নির্দেশ। এ ধরণের কাগজের স্তূপে ভরে উঠেছে তাদের অফিস আদালতের ফাইল। এই পর্যন্তই। সেই দুর্ভাগা নারীদের অন্ধকারে চোখ রেখে দুর্গন্ধময় তপ্ত নিঃশ্বাসের শ্বাসরুদ্ধকর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে, ঠিক তার মতই। বাকি সমস্ত কিছুই চলবে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। সময় যদি এই গতিতে আরো কিছুদিন চলে ধর্ষিতা নারীর একটা শ্রেণী তৈরী হবে। জীবনকে উপভোগ করা মানুষের গলা চেপে ধরতে পারবে তারা আর জল্লাদদের যৌনাঙ্গ কেটে ভাজা কৈ মাছের মত নিথর করে ফেলতে পারবে। আঃ, কবে আসবে সেই সোনালি সুদিন? ভাবতে ভাবতে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সুভদ্রা।

একটাই মাত্র কাজ তার জন্যে বাকি থেকে গেল—জল্লাদের যৌনাঙ্গ কেটে সারি সারি কৈ মাছের মত ফেলে রাখতে হবে। আঃ, কবে আসবে সেই সোনালি সুদিন। সুভদ্রা উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

'সুভদ্রা, ছেলেটার খাতায় এই সমস্ত কী লিখতে দিয়েছিস?' জীতুলের বাবা খাতাটা সুভদ্রার দিকে এগিয়ে দেয়।

'বাবা-দাদা বন্দুকের খোঁচা খেয়ে, গুলি খেয়ে মরল, জেলে যেতে আর বেশিদিন নেই। এ সমস্ত কথা শেখালে আমার ছেলে তোর কাছে আর পড়তে আসবে না।' কথাগুলি বলেই জীতুলের বাবা হনহন করে বেরিয়ে গেল। সুভদ্রা খাতাটার দিকে একবার তাকাল। এ সমস্ত শ্রুতলিপি সে-ই লিখিয়েছিল। অবাক হয়ে যায় সুভদ্রা। জীতুলের বাবা একসময় তার দাদার পথপ্রদর্শক ছিলেন। পথটা কাঁটায় পরিপূর্ণ দেখে পুলিশের চাকরিতে ঢুকেছেন। এখন দু'দিক বজায় রেখে সামলেসুমলে চলেন।

'এ সমস্ত কথা শেখালে আমার ছেলে তোর কাছে আর পড়তে আসবে না'—কথাগুলি বারবার কানের কাছে বাজতে লাগল। দূরের ধূসর পাহাড়ে বাবার ভাজা কৈ মাছের মত দৃষ্টিহীন চাহনি আর মোটাসোটা একটা দেহ স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে। হুড়মুড় করে বড় বড় গাছগুলি উল্টে পড়ছে। 'এসমস্ত শেখালে...' এই শব্দগুলি বারবার তার কানের কাছে গুনগুন করতে লাগল। না, নিজেকে আরও ভালোভাবে শক্ত করে তুলতে হবে— এই ভেবে মনে মনে নিজেকে সামলে নেয় সুভদ্রা। পড়তে না এলেও কোন বাধা নেই। তার মতো উচ্ছন্নে যাওয়া জীবন নিয়ে আর কী শেখাতে পারে সে?

আর শেখাবেই বা কেন?

'দিদিমণি' শব্দটা সুভদ্রার সুখস্বপ্নের আমেজটা একেবারে ভাঙতে পারল না। 'দিদিমণি আমরা এসেছি।' সুভদ্রার কাছে পড়তে আসা ছেলেমেয়েরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল।

'চাটাইটা পেতে তোরা বই খুলে বস।' সুভদ্রা চায়ের কাপটা নিয়ে ভেতরে চলে গেল। ভেতর থেকে একটা মোড়া এনে বইটা টেনে নিয়ে তাদের কাছেই বসে পড়ল। 'আজ শ্রুতলিপি দেওয়ার কথা ছিল না, লিখতে থাক।' সুভদ্রা বইয়ের পাঠটা দেখল। ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি। বর্তমানে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। দেশের স্বাধীনতা অখণ্ডতা রক্ষা করা আমাদের মহান দায়িত্ব। ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। এটা পৃথিবীর অত্যন্ত প্রাচীন সভ্য দেশ।'

ক্ষোভে পূর্ণ হয়ে গেল সুভদ্রার মন। মায়ের মমতা দিয়ে দেখছে কি এই দেশ? বিমাতাসুলভ ব্যবহার কেন? স্বাধীন হয়েছি কি আমরা? যেখানে তথাকথিত দেশের লোকরা মা-বোনদের ধর্ষণ করে এরকম একটা দেশ কখনও সভ্য হতে পারে কি? না-না, ছেলেমেয়েদের এই অসত্যগুলি শেখালে তাদের শিক্ষা কখনও সুসম্পূর্ণ হবে না। ছোট্ট বাসন্তী এই সমস্ত কথা শিখে বড় হবে আর বড় হয়ে একদিন জানতে পারবে যে এই দেশের ভাইরা (?) তাকে লুন্ঠন করে বেঁচে থাকার অনুপযোগী করে তুলেছে। এই শিক্ষার প্রতি কি ভরসা থাকবে তার? গোকুলের ছোট্ট শরীরটাতে একদিন যৌবনের স্পর্শ লাগবে, একই দেশ বলে ভেবে নিজের অভাব-অভিযোগগুলি একদিন সে দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরবে, ওরা অবজ্ঞা করবে, সে চিৎকার করবে, প্রতিবাদ করবে আর তার মোটা মোটা শরীরটা ওদের বন্দুকের গুলি খেয়ে নিথর হয়ে যাবে। এই পাঠ পড়ে পাঠদাতাদের প্রতি কি আস্থা থাকবে গোকুলদের? এই মিথ্যে কথাগুলি কেন শেখাতে হবে ওদের?

'দিদিমণি লিখব,' ছেলেমেয়েগুলি ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। 'লিখতে থাকো।' অন্যমনস্কভাবে বলে গেল সুভদ্রা। সর্বতোপ্রকারে রক্ষণাবেক্ষণ দিতে না পারা ভূখণ্ডকে আমরা মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করতে পারি না। পাহাড়ের পাদদেশের সবুজ বনভূমি আমাদের দেশ। মাটি ফুঁড়ে বেরনো লতার মত আমাদের শরীরে এই মাটির আদিম গন্ধ। মানবতা রক্ষা করাটা আমাদের প্রধান দায়িত্ব। খলৈর মাছ—পুঁটিগুলির মত নির্ভয়ে আমাদের এখানে বিচরণ করার অধিকার পেতে হবে। সভ্য দেশে নারী ধর্ষণ, হত্যা, লুন্ঠন আমাদের দেশের মাটি সহ্য করতে পারে না। এই নামহীন সবুজ বনভূমির মধুর নির্জনতা বন্দুকের শব্দে ভাঙতে পারে না। এখানে নিষ্কন্টকভাবে বেঁচে থাকাটা আমাদের জন্ম সত্ত্ব অধিকার। আমরা..... থেমে গেল সুভদ্রা। পাশেই দাঁড়িয়ে মুকুল তাকে একটা চিঠি এগিয়ে দিল, 'অরুণদা দিয়েছে।' চিঠিটা নিয়ে ছেলেমেয়েদের বলল, 'তোরা এখন যা, বিকেলে আসিস।'

দীপালির শরীরটা ভাল না। কিছুই খেতে পারে না, খেলেই বমি হয়ে যায়। তাই আমি যেতে পারছি না। আশা করি.....।' চিঠিটা বন্ধ করে রাখল সে। দিপালীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগের চিঠিগুলিতে 'আদরের সুভদ্রা' বলে আরম্ভ করে 'তোর অরুণ' বলে শেষ করত। এই চিঠিগুলিতে আদরের আর তোর এই শব্দদুটি নেই। বাজারের তালিকার মতই 'আলু আধা কেজি, পেঁয়াজ আধা কেজি' —এভাবে লেখা। এতটাই ছোট হয়ে গেল অরুণ।

হঠাৎ সুভদ্রা নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে সচেতন করে তোলে। তাকে দৃঢ় হতে হবে। বিয়ের পরের দিনগুলিতে অরুণের ছটফটানি দেখতে তার কত কষ্ট হয়েছিল। সেই কষ্টের তুলনায় আজকের এই সংক্ষিপ্ত প্রকাশ তো একেবারেই নগণ্য। অন্তত অরুণের কাছে মানুষের কাছে বাধ্য হয়ে থাকার ভারী বোঝাটা আর নেই। দেশ বলে কোন ভূখণ্ডের প্রতি কোনরকম আনুগত্য নেই। মানুষের প্রতি কোনরকম দায়বদ্ধতা নেই। অরুণ ছোট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও সহজ হয়ে গেল গতিপথ।

মধ্যরাতের ঘন্টা-শব্দ

বিতোপন বরবরা

নিউইয়র্কের মেরিলিন টাওয়ারের ঘড়িতে এখন সকাল ছয়টা বেজেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই নিজ ফ্ল্যাটের সমান্তরালে থাকা সেই ঘড়িটার দিকে তাকানো একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল নিজান ফুকনের।

...হাতের 'ইনডিগ' ঘড়ির সবুজ ডায়ালে চোখ যেতেই ফুকনের মনে ভেসে ওঠে মেরিলিন টাওয়ারের ঘড়িটার দৃশ্য। রেলের কামরার মধ্যে ফুরফুরে বাতাসের সঙ্গে ইতিমধ্যেই অন্ধকার ঢুকে পড়েছে। ঘড়ির ডায়ালে সময় দেখে নিয়ে তৈরী হতেই ফুকনের মন প্রজাপতির মত কোথাও উড়ে যেতে চাইছে। কিন্তু তিনি তাকে আটকে রেখে ঘড়ির কাঁটার শব্দ কান পেতে শুনতে চাইছেন। তবে সেই শব্দ আর কোথাও শোনা যায় না। চলমান রেলের বিরাট বিকট নিরন্তর ছন্দোময় শব্দ—কল্লোলের মধ্যে আপাতত কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

ইচ্ছে করেই দিল্লিতে তিনি ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেসের এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাটিতে ঢুকে পড়েছিলেন। তবে এতে তিনি এক দণ্ডও শান্তিতে থাকতে পারেন নি। উৎকট গরম, চারপাশের কদর্য পরিবেশ, বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া, যাত্রী ফেরিওয়ালার হৈ হল্লা, গান-বাজনা....এই সমস্ত কিছুর মধ্যে তার সামনের আসনে হাঁপানি রোগগ্রস্তা এক বৃদ্ধা—যিনি মাঝে মাঝে জল থেকে তুলে আনা মাছের মতই অসহনীয় শ্বাসকষ্টে ধড়ফড় করছেন, মর্মান্তিক আর্তনাদে সমস্ত কামরা কাঁপিয়ে তুলছেন। আর তখন ব্যস্ত হয়ে তার পক্ককেশ স্বামী তার মুখে ইনহেলার গুঁজে ধরে স্প্রে করে দিচ্ছেন সালবুটামলের যৌগ। ধীরে ধীরে রোগিনীর উত্তেজনা শান্ত হয়ে আসে, নীরবে ঘুমিয়ে পড়েন আর ক্লান্ত ক্লিষ্ট ভঙ্গিতে বৃদ্ধ তার কুঞ্চনময় মুখাবয়ব জানালা দিয়ে ঢুকতে থাকা প্রবল বাতাসের সামনে পেতে দেন। অবশ্য এই কাণ্ডটির সঙ্গে মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন ফুকন। বরঞ্চ তিনি এখন

বেশ উপভোগই করছেন এই বৃদ্ধ দম্পতির সমস্ত কারবার। দুজনে কথা প্রায় বলতেই পারে নি। সমস্ত কথা ভাবভঙ্গি আর চোখমুখের ভাষাতেই বিনিময় হয়েছে.....আর এই দুর্যোগের মধ্যেও কোন কোন সময়ে দুজনের মুখেই ছড়িয়ে পড়ছে কি যে এক জ্যোতির্ময় হাসি। আর .... আর এই সমস্ত দেখে এক একটা সময়ে ফুকন গম্ভীর ভঙ্গিতে ভেবে উঠছেন, মানুষের মধ্যে এই দারুণ আত্মিক সম্পর্ক....এই মমতাময়তা.....এই সৌহার্দ্য.....কিভাবে সম্ভব হয়....কিভাবে?

এই চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতে ফুকন হাতের 'টাইম' ম্যাগাজিনের পাতাটা খুলেধরে। এই সংখ্যাটিতে বলা যায় একটা গভীর বিষয়—'ফিউচার অফ হিউম্যানিটি' মানে মনুষ্যত্বের ভবিষ্যৎ, তা নিয়ে পণ্ডিক গবেষকদের বিস্তর চিন্তা চর্চা। এলান হাবার্ড নামের একজন বলেই ফেলেছেন যে, 'হিউম্যানিটি ইজ ইন ডলড্রামস' আর অন্যদিকে লুইস ক্রেমার নামের একজন প্রবল আশাবাদী লিখেছেন—'হিউম্যানিটি উইল নট বি বিটেন।'....ফুকনের হঠাৎ মনে পড়ে যায়...আরে এটা তো চ্যাপলিনের কোন একটা বিখ্যাত সিনেমার সংলাপ....যাই হোক ওই প্রবন্ধটাই পড়ার জন্য সে প্রস্তুত হয়। ....উই শুড বি রাদার অপটিমিস্টিক...অফ ন'। হঠাৎ ফুকনের মুখে ছড়িয়ে পড়ে অপরিসীম বিরক্তি। ধীরে ধীরে কামরাটার করিডর দিয়ে এগিয়ে আসছে ইতিমধেও পরিচিত হওয়া সেই মুড়ি বিক্রি করে বেড়ানো বৃদ্ধের রুক্ষ কর্কশ স্বর .....গরম মুড়ি....তাজা মুড়ি....গরম মুড়ি।' রেলগাড়ি বাংলাদেশের সীমান্তে ঢুকতেই কোন এক স্টেশনে বৃদ্ধ গাড়িতে উঠে পড়েছিল আর একবার তো বৃদ্ধের চোখের সামনে যখন এই হাঁপানি রোগগ্রস্তা বৃদ্ধা শ্বাসকষ্টে ছটফটাতে শুরু করেছিল, বৃদ্ধ মুড়ির টিন মেঝেতে নামিয়ে রেখে সাহায্যের জন্য হাহাকার করে উঠেছিল। .... ইতিমধ্যে বৃদ্ধ এসে তাদের কেবিনটাতে থমকে দাঁড়িয়েছে। কিছুক্ষণ রুগ্না বৃদ্ধার যন্ত্রণাজর্জর মুখের দিকে আর তারপরে তাঁর স্বামীর দিকে করুণভাবে তাকিয়েছে আর সেই কর্কশ কণ্ঠে কী অপূর্ব কোমলতা এনে জিজ্ঞেস করেছে ঃ 'এখন কি আরাম পাচ্ছেন দাদা....সব ঠিক হয়ে যাবে...ঠিক হয়ে যাবে....ঠিক হয়ে যাবে। ভগবানের ওপরে বিশ্বাস রাখেন। ...সবই তো তাঁর লীলা।' তাদের আশ্বস্ত করার জন্য হয়তো বৃদ্ধ মুখে ফুটিয়ে তোলে একটা কোমল হাসি....আর একটু পরেই আগের ঢঙে আবার চিৎকার করে করে যাত্রীদের মুড়ি বেচার জন্য এগিয়ে যায় করিডর দিয়ে।

বাইরে অন্ধকার ভাল করেই নেমে এসেছে। বিরাট বিকট নিরন্তর শব্দ করে অন্ধকারের বুক চিরে রেলগাড়ি এগিয়ে চলেছে। জানালা দিয়ে কখনো কখনো অদূরের এক একটা আলোকোজ্জ্বল ঘর-বাড়ি চোখে পড়ে, ক্রমে তা পার হয়ে যায়। মাঝে মাঝে পার হয়ে যায় এক একটা যাত্রী ভর্তি ছোট স্টেশন, কোথাও লেভেল ক্রসিং-এ থেমে থাকা অনেক গাড়ির হেডলাইটের সুতীব্র আলো কামরার একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। নিজের অজান্তেই ফুকনের হাত ক'দিন ধরে না-কাটা দাড়ির জঙ্গলকে স্পর্শ করে, কামরার মধ্যে স্তিমিত আলোতে তাঁর চোখ সহযাত্রীদের মুখের উপর দিয়ে এভাবেই পিছলে যায়। তিনি মনে করেন, অনেক দূর যাত্রার পরেও ওরা তার সমস্ত ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে রাখছে, মধ্যে মধ্যে হাতকাটা স্পোর্টিং গেঞ্জি আর বারমুডার বাইরে বেরিয়ে থাকা তার ফর্সা অথচ রোমশ মাংসল হাত-পায়ের দিকে, তার গলায় ঝুলে থাকা সিডি প্লেয়ার আর হেডফোনটার দিকে—যা এখন সে ব্যবহার করছে, বলা যায় একধরণের প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে। কামরার ভেতরে অসনীয় হৈ-হল্লা হলে অথবা এই বৃদ্ধার কাতর আর্তনাদ উচ্চগ্রামে ওঠার আভাস পেলেই তিনি হেডফোন কানে গুঁজে অন করে দেন সিডি প্লেয়ারের সুইচ....আর সমস্ত হট্টগোলকে ছাপিয়ে কানের কাছে বেজে ওঠে 'বিটলস' অথবা 'স্মকির' গান।

আপাতত নিজান ফুকন এই পরিবেশে মোটেই খাপ খাওয়াতে পারছেন না—এই এক ধরণের আকস্মিক কক্ষচ্যুতি বা ছন্দপতনে। সুদূর নিউইয়র্ক থেকে এসে নিজের দেশের মাটি এবং বাতাসের সুঘ্রাণ তিনি ঠিকই পাচ্ছেন....হয়তো শেষ পর্যন্ত সেই সুঘ্রাণই তাকে টেনে নিয়ে এসেছে দেশের মাটিতে...কিন্তু ... কিন্তু তবুও তার মনে হচ্ছে তার চারপাশ, তার আশপাশের সমস্ত কিছুই যেন অপরিচিত, অনাত্মীয়। কেউ যেন এই মুহূর্তে এখানে তাকে আপন করে নিতে প্রস্তুত নয়...প্রস্তুত নয়। হয়তো সে জন্যই এরকম মনে হচ্ছে তার, সময় থেমে রয়েছে—থমকে রয়েছে....ঘড়ির কাঁটাগুলি ভারী হয়ে পড়েছে। তাই অপার সন্দিগ্ধতা আর অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে বারবার ঘড়ির ডায়ালে চোখ বুলিয়ে তিনি প্রত্যাখ্যাত এবং আহত হয়েছেন। তবুও বারবার তার ধৈর্যের বাঁধ খুলে গেছে, প্রত্যেকের প্রতি অবিশ্বাস মনের ভেতর চিৎকার করে উঠেছে....ইস হাউ স্ট্রেঞ্জ...হাউ স্ট্রেঞ্জ....।'

...এই মুহূর্তে, এই সকালে নিউইয়র্কে অবশ্যই আরম্ভ হয়ে গেছে প্রচণ্ড হৈ-চৈ, অন্তহীন হট্টগোল, সবেগ গাড়ি-মোটর, রেল ট্রামের যান্ত্রিক গর্জন। অদ্ভুত বিচিত্র অগণন মানুষের প্রাণান্তকর দৌড়। হৈ-হুল্লোড়, চিৎকার, আর্তনাদ। দিনরাতের হিসেব হারিয়ে যায়, উত্তুঙ্গ স্কাই স্ক্র্যাপারে বিদ্ধ সীমাহীন আকাশ যেন ঘড়ির ডায়ালে বন্দী হয়ে ধড়ফড়াতে থাকে, দিন রাতের পার্থক্য নিরূপণের দর্পণ হয়ে পড়ে। এই ঘড়ি....এই ঘড়ি....হয়তো নিউইয়র্কে এটাই ছিল সবচেয়ে ধীরে চলা একমাত্র যন্ত্র। মানুষের হৃদযন্ত্র থেকেও ধীরে ধীরে চলা যন্ত্র।

পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছর তখন। সে বয়সেই একদিন তিনি নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। ইশ্, মানুষ এবং পৃথিবীর প্রতি কি যে এক ভালোবাসা, কি এক আকর্ষণ ছিল তখন... একটা স্বপ্ন ছিল সারা জীবন মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার....মনুষ্যত্বের সেবায়.....আর সেই যাত্রা ছিল সেই স্বপ্নেরই একটা অংশ....অনেক কিছু শিখে দেশে ফেরার সংকল্প। কিন্তু...কি আশ্চর্য...কি আশ্চর্য.. একদিন কি এক মোহপাশে সেখানে বন্দী হয়ে গেলেন তিনি.....হয়ে উঠলেন ঘোর কেরিয়ারিস্ট কিন্তু নিউইয়র্ক তাকে প্রত্যাখ্যান করল না.....ভাসিয়ে নিল ভোগবিলাসের প্রাচুর্যের সোনালী সাগরে...একদিন হঠাৎ কি এক ভয়ঙ্কর অনুভব হল তার.....নিউইয়র্কের চারপাশের জলযান, কলকারখানার অন্তহীন উচ্চগ্রাম কলরোল, আর্তনাদ এবং চিৎকার-ধ্বনি, সর্বগ্রাসী এক অসহায় বীভৎস যান্ত্রিকতা এবং জান্তবতার মধ্যে তার চেতনা হাহাকার করে উঠল, ত্রস্ত-সমস্ত হয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, প্রচণ্ড শঙ্কা এবং আতঙ্কে তার সমস্ত শরীরের রোম শিউরে উঠল....বুকের ভেতর তার অজান্তেই কি যে কুরে কুরে খেতে লাগল....শেষ করে দিল তাকে। বুকের একটা অংশ একেবারে খালি হয়ে গেল...শূন্য গহ্বরের মত.... সেখানে এখন এক প্রচণ্ড ভ্যাকুয়াম....।

চলমান রেলে নিজের অজান্তেই ফুকন দুই হাতে আঁকড়ে ধরেন তার রোমশ বুক, তার মুখের মধ্যে ইতস্তত এক করুণ ভঙ্গি ছড়িয়ে পড়ে, অন্তরের গভীরে ধ্বনিত হতে থাকে গরম দীর্ঘশ্বাস। এই যে খালি হয়ে গেল বুকের একটা পাশ.....সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেল.... সেখানে আসলে কি থাকে, সেটা আসলে কি, তার কি কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাই নেই.....যা এমনকি কোন বৈজ্ঞানিক বা ফিজিসিয়ানও জানেন না.....এমনকি কি আশ্চর্য....তিনি নিজেও তো বুঝতে পারছেন না....যা হয়তো এক আশ্চর্য অনাবিষ্কৃত অস্তিত্ব বা অনুভব....আশ্চর্য....আশ্চর্য। অথচ এখন মনে হচ্ছে কি যেন একটা পরম সম্পদ কোথায় খসে পড়ল, হারিয়ে গেল সারা জীবনের জন্য....

না-না। নিজান ফুকন সচেতনভাবে এইসব চিন্তা ভুলে থাকতে চান। এইসব থেকে পালিয়ে বেড়াতে চান। আর তার তো মনেই হচ্ছে তিনি একজন পলাতক— 'ফিউজিটিভ'। নিউইয়র্কের

আদলে তৈরি প্রাচুর্যের জতুগৃহের মধ্য থেকে যথারীতি গড়ে তোলা সংসার থেকে এই যে না বলে কয়ে তিনি পালিয়ে এসেছেন দীর্ঘদিন পরে। সর্বকিছুই মায়া....মায়া....। তার কানের পাশে কে যেন ক্রমাগত গুঞ্জন করে চলেছে। তবু তিনি পরম বিশ্বাস এবং প্রত্যয়ের সঙ্গে ভাবছেন এই যে তাকে একপ্রকার অসুখী এবং উত্যক্ত করে তুলেছে.....বুকের মধ্যে অজানা এক শূন্য গহ্বর, এখানেই তিনি পুনরায় পূর্ণতা লাভ করবেন....এমনকি পুনরায় ফিরে পাবেন সেই পরিচিত বাতাস-জল-মাটির সুঘ্রাণ (যা ইতিমধ্যেই তার নাকে এসে লেগেছে)। .....আর....আর হয়তো এরাও একই রয়েছে, এঁরা —পরমেশ্বর, ভবানন্দ-বীণারা....ভালোভাবে ভাল জায়গাতেই রয়েছে....নিশ্চয় এদের সঙ্গেও দেখা হবে....আর যোগ...

তিনি তো আপাতত তাদেরই খোঁজে এসেছেন।

রাতের বেলা খুব ভালো ঘুম হল। কি শান্তি....বাণিজ্য এবং অর্থগমের চিন্তায় যখন প্রতি বর্গফুট মাটি, প্রতি ঘনফুট বায়ু দালালীকৃত, ডিজেলের ধোঁয়া, কল কব্জার ঘর্ঘর, লাভ লোকসানের চক্রব্যূহ আর ব্যয় সঙ্কুচিত ফ্লুরোসেন্ট ঔজ্জ্বল্যের নিচের যথেষ্ট ধূলি এবং কদর্যতা আর দুর্গন্ধ আবর্জনায় বায়ুমণ্ডল সম্পৃক্ত, সেরকম অবস্থায় পৃথিবীতে আজও রয়েছে একজন পরমেশ, এক জোড়া ভবানন্দ-বীণা, রিইনফর্সড কংক্রিটের রুচিবিবর্জিত আকাশচুম্বী ঔদ্ধত্য যাকে প্রভাবিত করে না, যার ভাড়াটিয়া লাগে না, মাসে অতিরিক্ত তিনশত টাকা লাগে না—বা হয়তো লাগে (কার না লাগে), কিন্তু যারা এখনও উপলব্ধি করে যে তার চেয়ে সুন্দর একটা কথা শ্রদ্ধেয় স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা, তার চেয়ে বড় কথা আত্মার নিঃশ্বাসের জন্য এক টুকরো খোলা আকাশ, প্রাণের স্পন্দনেব জন্য একটুকু মুক্ত বাতাস, চোখের শান্তির জন্য এক টুকরো সবুজ ঘাস, এক জোড়া বীণা গাছ যেখানে মনের মুকুল ফটবে, নিস্তব্ধ রাত এবং অলস মধ্যাহ্ন, একটা বারান্দা, একটা পুরনো গুঞ্জনধ্বনি, একটা বিলীয়মান প্রিয় পরিবেশ....নিজান ফুকনের মনে একটা বহু পুরনো ইমেজ কাঁপতে কাঁপতে স্পষ্ট হতে থাকে। তাঁদের ঘরেরই প্রেসটার এক কোণে বসে জেতুকি দিদি তারই একটা প্রিয় গল্পের অংশবিশেষ সীসের অক্ষরে বুনে চলেছে আর অন্য ঘর থেকে ভেসে আসছে ট্রেডল মেশিনের ঘটাং....ঘটাং শব্দ। আর এই সময়টাকেই তিনি পুনরায় ভাবছেন....আরও .... আছে ...এঁরা পরমেশ, ভবানন্দ ... বীণারা নিশ্চয় আছে ... আর এমনকি.... সেই বীণা কুটীরের লেখক....তিনিও আছেন। আছেন।

গরমে তিনি গলদঘর্ম হয়ে পড়েছেন। রেলের কামরার ছাদে ঘটাং ঘটাং শব্দে চলন্ত ফ্যান আর জানালা দিয়ে জোর বাতাসও তাকে স্বস্তি দিতে পারছে না। অথচ ফুকন দেখছে সহযাত্রীরা বেশ নির্বিকার। আশ্চর্য আর বিরক্তির সঙ্গেই তিনি তাদের দিকে তাকাচ্ছেন আর পরমুহূর্তেই চোখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন হাতঘড়ির সবুজ ডায়ালের দিকে। ...ইশ্, অনেক সময় পার হয়ে গেল...পার হয়ে গেল। তার দেখাদেখি তার পাশেই অনর্গল আড্ডা মারতে থাকা দুই যুবক বন্ধুর একজনও ঘড়িতে সময় দেখে বলে উঠল—'ইট ইজ অলরেডি টু লেট।....একদিকে নিউইয়র্কের কি এক প্রসঙ্গে কোন একজন তাকে বলেছিল এমনই এক বাক্য আর ..... তখনও....তখনও কেন জানি তিনি চমকে উঠেছিলেন। কিছুক্ষণের জন্য ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলেন। ফুকন এবার দুই তরুণ বন্ধুর কথাই নিবিড়ভাবে কান পেতে শুনতে লাগলেন। ওরা আমেরিকাকেই গালিগালাজ করছে আর বলছে যে, 'শালা বড় গ্লোবাল পুলিশ হতে আসছে।' সিগমণ্ড ফয়েডের কথাই ঠিক— 'আমেরিকা ইজ এ মিস্টেক, এ জায়ান্ট মিস্টেক।' তারপরেই বিষয়ান্তরে চলে গেছে। একজন জিজ্ঞেস করছে—'এই রলা বার্থ কি বিষয়ে

যেন থিওরি বের করছে ?? ফরাসীটা এত তত্ত্বপ্রবণ হলো কীভাবে, কোন আইডিয়া আছে? তারপরেই কিছুক্ষণ ওরা বেশ উদ্বিগ্ন, বিষয়টাও বেশ গম্ভীর। ওদেরই কোন একজন একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করে ঘোষণা করল---এক "বণের মেকানাইজড এনটিটিতে যে মানুষের ট্রান্সফরমেশন হয়েছে সেটা ঘটনা....' শেষ পর্যন্ত যা হয় বিষয়---সেক্স। তাদের গলার স্বর আপনা থেকেই খাদে নেমে এল। একজন কোন হিন্দি সিনেমার নায়িকার সঙ্গে নিজের গার্ল ফ্রেণ্ডের নিতম্বের তুলনামূলক বিচার করল আর একজন তার চেয়েও সরেস, কারো প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই বলে চলেছে যে, একবার সে বেশ্যাবাড়িতে গিয়েছিল, মেয়েটির দেহের সুষমা দেখেই একেবারে তুষ্ট---'বিশ্বাস কর তার বাইরে কিছুই করিনি।' রেলের কামরার মধ্যে এক ধরণের অসহ্য ভ্যাপসা গরম আর দমবন্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে নিজান ফুকন বেশ উপভোগ করলেন এই কথোপকথন। শেষ পর্যন্ত অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে চাইছিলেন--- কোনমতে নিজেকে সামলে নিলেন। কিন্তু সেই সময়েই পুনরায় 'অ্যান্টি ক্লাইমেক্স' ..... আচম্বিতে বৃদ্ধা ভয়ঙ্করভাবে আর্তনাদ করে উঠলেন, তার সমস্ত শরীর ধড়ফড় করে উঠল। ঘুমে ঢলতে থাকা বৃদ্ধ শশব্যস্তে জেগে উঠলেন.....ইনহেলারটা হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন....খুঁজে পেতেই সেটা বৃদ্ধার মুখে গুঁজে দিয়ে স্প্রে করতে লাগলেন.....কিন্তু....ঈশ্, হঠাৎ তার মুখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল.....আরে .... আরে এটাতো শেষ হয়ে গেল। হে প্রভু। কি হবে এখন আমার স্ত্রীর।' বলেই তিনি হাহাকার এবং অসহায় ভঙ্গিতে ফুকন আর ছেলেগুলির মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন....কামরার দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা ফ্লাস্কটিকেই টেনে এনে তার জল ঢেলে দিতে লাগলেন বৃদ্ধার মুখে।' 'আরে কি করছেন আপনি।' ফুকন হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠলেন। 'জল দেবেন না...জল দেবেন না। পাম্প সাম এয়ার...অফ আই মীন, উনার মুখে আপনার মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ ফুঁ দিতে থাকুন।' ইতস্তত ভঙ্গিতে বৃদ্ধ তাই করতে লাগলেন। বৃদ্ধা সামান্য আরাম বোধ করার পর ফুকনেরই নির্দেশানুসারেই বৃদ্ধ ডলতে থাকে পত্নীর বুক আর হতাশ করুণায় ভরা বিহ্বল কণ্ঠে বলতে থাকে ফুকনকে— বুঝেছেন, অন্ধ্রপ্রদেশে নিয়ে গিয়েছিলাম ওকে....ওই যে যেখানে মাছের চিকিৎসা করা হয়....মাছ খাইয়েছে.....আরাম তো পেলেন না। আসার সময় ভাবলাম দিল্লির 'এইমস' এ দেখিয়ে আনব। তবে কি করব, পয়সায় পোষাল না। টাকা-পয়সা না থাকলে আজকাল বুঝেছেন জীবনেরও কোন দাম নেই। পত্নীর বুকের হাড় আর শুকনো কুঞ্চিত স্তনের উপর দিয়ে বৃদ্ধের অবসন্ন হাত ঘুরে বেড়ায়। ধীরে ধীরে তার গালের উপর দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

বৃদ্ধের মুখাবয়ব থেকে চোখ ফিরিয়ে আনেন ফুকন। বস্তুত কোন কারণে তার মনে কোন অনুকম্পাই জাগেনি বৃদ্ধার প্রতি। অথচ তিনি জানেন যে কোন মুহূর্তে এখন এই চলমান রেলগাড়িতে তাদের সামনেই এই বৃদ্ধা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারেন....আর তখন হয়তো এই বৃদ্ধের হৈ-হল্লাতে এই কেবিনে থাকাটা আর সম্ভব হবে না....পোটলা পুঁটলি বেঁধে নীরবে অন্য একটা কেবিনে চলে যেতে হবে.....। অভ্যাসবশত তিনি ঘড়িতে সময় দেখলেন, যন্ত্রবৎ টাইমের পৃষ্ঠা মেলে ধরলেন....কয়েকটা বিজ্ঞাপন....আর সেই কবে থেকে পড়ব বলে রেখে দেওয়া সেই প্রবন্ধটা...'হিউম্যানিটি উইল নট বি বিটেন'....এমনকি একটি যুবতীর সুন্দর একটি 'ন্যুড ফটোগ্রাফের' উপরেও তার দৃষ্টি অলসভাবে ঘুরে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার দৃষ্টি সেখান থেকে সরে এল, পুনরায় নিবদ্ধ হল সামনের মৃতপ্রায় যন্ত্রণাক্লিষ্ট কঙ্কালসার বৃদ্ধার দেহে....। বৃদ্ধ এখনও কি যত্নে মালিশ করে চলেছে বৃদ্ধার ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠা বুক। ফুকন দৃষ্টিটাকে জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে মেলে ধরলেন। প্রবল বাতাস সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ, চুল, দেহের কাপড় এলোমেলো করে যায়....।

নারীর বুক....নারীর বুক ইশ্। অকস্মাৎ ফুকনের মন সেই সুদূর অতীতের দিকে পখা মেলে যায়। সেই রাণা মামার বিয়েতে হ্যাঁ হ্যাঁ ..বাসন্তী বরের সঙ্গে যাবার জন্য ঘর থেকে সেজেগুজে তার সঙ্গ ধরেছিল। গ্রামের পথে তাদেব ঘরের উদ্দেশ্যে যাবার সময় সেই বাঁশগাছের অন্ধকার ঝোপের কাছে এসে তার শরীরের উত্তাপ বেড়ে গেল, একধরণের উত্তেজনায় মুখের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ঘন হয়ে উঠেছিল শ্বাস। বাসন্তী চট করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক ফাঁকে হঠাৎ তাবে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে দুই হাতে খামচে ধরেছিল তার বুকের কোমলাঙ্গ....ইশ্ সে যে কি এক চমৎকার মুহূর্ত ছিল...তার নাকে বাসন্তীর গালের পণ্ডস পাউডাব, চুলের গন্ধমালতী তেলের সুগন্ধি সুবাস লেগেছিল....আর হঠাৎ 'নির্লজ্জ কোথাকার' বলে ধমকে উঠেই বাসন্তী দ্রুত হাঁটতে শুরু করেছিল.... পেছন পেছন অপরাধীর মত তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ইশ্, সেই দিনগুলি.... সেই দিন.. সেই বন্য উন্মাদনা... সেই অপূর্ব মাদকতায় ভরা দিন আজ কোথায় নিঃশব্দে হারিয়ে গেল। পরে নিউইয়র্কে কেরিয়ার গড়ার সময় বযস যখন ভাটির দিকে তার জীবনে স্থায়ীভাবে আসা টপলেস সংস্কৃতির সন্তান ইরানির দেহের সর্বত্র হাতড়াতে হাতড়াতেও খুঁজে পেলেন না সেই অপূর্ব মাদকতা... সেই গন্ধমালতী তেল, পণ্ডস পাউডারের সুবাস। আপাতত তখন পর্যন্ত হারিয়ে গেছিল জীবনের সমস্ত উচ্ছ্বাস, রহস্যের জট খোলার সমস্ত আগ্রহ। ইশ্, নিউইয়র্কের অন্তহীন দ্রুত তাল শ্বাসরুদ্ধ জঞ্জালময় জীবনের মধ্যে কী আশ্চর্যভাবে ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল শরীর এবং মনের সমস্ত রকম অনুভূতি....চারপাশের ঘর্ঘর ঘর্ঘর যন্ত্রের গর্জনের মধ্যে কি নির্মমভাবে এক ধরণের অ-প্রেম এবং হৃদয়হীনতা গ্রাস করে ফেলেছিল সমস্ত কিছুকে.....। নিউইয়র্কের সেই বিলাসী কামরাতেও মধ্যে মধ্যে যখন মুখে মদের গন্ধ নিয়ে এসে অদ্ভুত সুরে ইরিনা 'কাম অন ডার্লিং লেটস হ্যাভ আ কুইকি'-র প্রস্তাব দিত আর দুজনেই তখন মত্ত হয়ে উঠত এক আদিম খেলায়, সেই সময় ফুকনের প্রায়ই নিজেকে যন্ত্র মনে হত আর তখন তার মনে পড়ে যেত তখনকার সময়ে ঘরের প্রেসটিতে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকা চলমান ট্রেডল মেশিনটার কথা.....মনে পড়েছিল রাণা মামার বিয়ের কিছুদিন পরে একদিন বন্ধ ঘরের প্রায়ান্ধকারে অপার আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে অভিভূত হওয়া বাসন্তীর সরস, সুগোল, সুস্পষ্ট স্তনদুটির কথা....।

রেলের এক ঝাঁকুনিতে নিজান ফুকনের চিন্তার তরঙ্গে জট পাকিয়ে গেল। তার চোখের সামনে ইরিনা এবং তার ছেলেমেয়ে জিমি এবং জিনির মুখটা ভাসতে লাগল আর তার হঠাৎ তার দেহের আপাদমস্তক যেন শীতল হয়ে গেল এক ধরণের দুঃখে আর অপরাধবোধে। 'ইউ সন অফ এ বিচ...' টেলিফোনে শেষবারের মত অসহায়ভাবে গর্জে উঠেছিল ইরিনা। তিনি চমকে উঠেছিলেন হঠাৎ 'সন অফ এ বিচ'। 'অফ আই এম নট ইরিনা...' তবে এর মধ্যেই ইরিনা টেলিফোনটা ক্রেডেলে নামিয়ে রেখেছিল। কিছুক্ষণ তিনি চুপ মেরে বসেছিলেন। কিন্তু বিলিয়ার্ড বোর্ডের স্থির একটা বল হঠাৎ কে যেন একটা টোকা দিয়ে দিল....আর তার মনের মধ্যে নাচতে নাচতে ঢুকে এল একটা লাল বল....কি একটা নিশ্চয় হারিয়ে এসেছেন তিনি....না, না তারা ইরিনা, জিমি জেনি কেউ নয়....কি যেন এক অপার্থিব এবং অমূল্য....বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে কোথায় ছিটকে পড়ল.... যেন তার বুকের মধ্যেও সামনের বৃদ্ধার বুকের শুকনো স্তনের মত শুকিয়ে পড়ল এককালের সরস সুপুষ্ট দুটি স্তন....নিজের অজান্তেই তার চোখ থেকেও দু-ফোঁটা জল ঝরে পড়ল, গড়িয়ে নেমে এল তার দাড়ি ভরা গাল বেয়ে।

আসন থেকে ফুকন ধীরে ধীরে উঠে পড়েন। করিডর দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যান। চলন্ত রেলের দরজার মুখে দু'দিকের হ্যাণ্ডেলে ধরে তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েন আর তাব মনে হতে থাকে বাতাসের চেয়েও প্রচণ্ড আবেগ তার মন থেকে সমস্ত উদ্বেগ আর আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছে। তার নাকে নির্মল বাতাস স্পর্শ করে যায় আর পরম প্রত্যয়ের সঙ্গে ফুকন ভাবেন সবকিছুই ঠিক আছে এখানে, ঠিকই আছে.....এমন কি হয়তো তারাও....পরমেশ ভবানন্দ-বীণারাও ঠিকই আছে...ঠিকই আছে...

'কি খবর দাদা, আপনি কি এখানে হাওয়া খাচ্ছেন?'

আপন চিন্তায় মগ্ন ফুকন চমকে ওঠেন। নিজেকে পিছিয়ে নিয়ে তিনি দেখেন স্মিত আলোকে হাসতে হাসতে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সেই মুড়ি বিক্রেতা বৃদ্ধ। 'ওহো তুমি, দেখছ না বুড়ি কি ঝামেলা করছে, তাই এখানে দাঁড়িয়ে শরীরটাকে একটু ফ্রেশ করে নিচ্ছি।' বলেই তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন।....রাত ক্রমশ গভীর হতে চলেছে....গভীর হচ্ছে। বৃদ্ধকে তিনি জিজ্ঞেস করেন—'যথেষ্ট রাত হয়েছে বাড়ি যাবে না নাকি?'

'এই যে ফারাক্কা ব্রিজ আসছে না। তারপরের স্টেশনেই নেমে যাব। আজ ট্রেন অনেক লেট তো, তার জন্যই রাত হল। তবে ঘরে কেবল আমার স্ত্রী— সে তো অভ্যস্ত হয়ে গেছে।'

বৃদ্ধের মুখের রুক্ষ ভয়ঙ্কর কণ্ঠ শুনে স্পষ্টত বিব্রত হন ফুকন, হঠাৎ তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠে বৃদ্ধের মুখগহ্বর আর গলাটা দেখতে থাকেন—দেখি দেখি। তোমার গলার স্বরটা কেন এরকম? এদিকে এসো।'

—দেখে আর কী হবে? অনেক ডাক্তার, অনেক চিকিৎসা—কিছুতেই নিরাময় হচ্ছে না যে। গলায় আমার যা যন্ত্রণা...মুখে তবু হাসিটা রেখেছি, মুড়িটা তো বেচতেই হবে...হেঁ হেঁ।' কামরার স্তিমিত আলোর নিচে প্রায় জোর করেই ফুকন বৃদ্ধের মুখের ভেতর তাকাল। বৃদ্ধের মুখনিঃসৃত দুর্গন্ধ কোনরকমে সহ্য করে তারপর তিনি সযত্নে পাশের বেসিনে হাত ধুতে থাকেন। তখন তার দেহের উপরের দিকে একটা তপ্ত স্রোত যেন ধীরে ধীরে উঠে আসতে থাকে। ইস....বৃদ্ধের গলায় ক্যান্সারের পূর্ণগ্রাস...অথচ সেই গলিত বিষজর্জর গলায় চিৎকার করে করে, মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বৃদ্ধের সে কি সংগ্রাম, বেঁচে থাকার কী তাড়না....। ফুকনের মনের ভেতরের রাগ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, তিনি মনে মনেই গরজে উঠতে চান—'এরা এরা শালা, কী পেয়েছে। হ্যাঁ। অল বাঞ্চ অফ ক্রেজি ডগস....ননসেন্স। এভাবে অভিনয় করে করে, বাতাস আঁকড়ে আঁকড়ে বেঁচে থাকার কিসের এত তাড়না....কিসের এত মোহ? এরা বাঁচলেই কী না বাঁচলেই বা কী? এটা তো নয় যে এরা বেঁচে না থাকলে পৃথিবী হালকা হয়ে যাবে, নিরর্থক এবং নিরালম্ব হয়ে পড়বে। কেন এরা মৃত্যুকে জড়িয়ে ধরে না...সুইসাইড অথবা যুথানসিয়া....ইডিয়টস....ইডিয়টস...!'

হঠাৎ অনেক ধাতব শব্দের ঐকতানে রেলের শব্দ ডুবে যায়। ঘনঘন ঝাঁকানিতে এপাশ ওপাশ করে থাকে রেলের কামরাগুলি। জানালা আর দরজা দিয়ে তীব্র আলোকরেখা ঢুকতে থাকে। একটা সু-আলোকিত লৌহ পিঞ্জরের মত ব্রিজ দিয়ে রেল ক্রমশ এগিয়ে যায়। এই যে ফারাক্কা পৌঁছে গেলাম। আর কিছুটা গেলেই মালদহ স্টেশন এসে যাবে। বৃদ্ধের কথাগুলি ফুকনের কানে গেল। কিন্তু তার মাথায় উঠে আসা রক্ত তখনও নামে নি, বরঞ্চ একধরণের উত্তেজনায় তার দেহ ক্রমশ থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিল। রেলের দরজার সামনে থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে তিনি নিচের গঙ্গার গম্ভীর জলপ্রবাহের দিকে তাকান, এপাশ ওপাশ করে যাওয়া রেলের পেছন আর সামনের

দিকে তাকান আর পবক্ষণেই পিছিয়ে এসে দরজার করিডরেও চোখ বোলান..........আর হঠাৎ অদ্ভুত অবিশ্বাস্য তড়িৎগতিতে তার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে থাকা সেই মুড়ি বেচা বৃদ্ধের গলায় খামচে ধরে এক ধাক্কায় রেলগাড়ি থেকে ছিটকে ফেলে দেন গঙ্গার জলে। বৃদ্ধের টিন থেকে ছিটকে পডা মুড়িগুলি ধীরে ধীরে নিচের জলে পড়তে শুরু করেছিল..... সেগুলিকে শিউলি ফুলের পাপড়ি বলে মনে হতে লাগল।

আর এক মুহূর্তও ফুকন সেখানে দাঁড়ালেন না। 'বাঞ্চ অফ ইডিয়টস'.... ' ক্রেজি ডগস্' গজরাতে গজরাতে তিনি দ্রুতবেগে নিজের কেবিনটার দিকে এগিয়ে গেলেন। কামরার প্রতিটি মানুষ শুয়ে পড়েছে। তার কেবিনেও দুই যুবক বন্ধু আর অন্যান্যরা নিদ্রামগ্ন। এমনকি বৃদ্ধার দুঃখ দুর্দশায় জর্জরিত অবসন্ন বৃদ্ধ স্বামীও ঢলে পড়েছেন তারই স্লিপারে....অথচ বৃদ্ধার নাকে মুখে তখনও অবিরত যন্ত্রণার চাপা আর্তনাদ.....প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট। ফুকন মুহূর্তের মধ্যে তার ব্রিফকেসটা খুলে একটা স্টেথোস্কোপ বের করে নেন। তার একটা প্রান্ত দু-কানের মধ্যে গুঁজে নিয়ে অপর প্রান্তটা বৃদ্ধার বুকের মধ্যে চেপে ধরে....বৃদ্ধার বুকের দ্রুত ঢপঢপ শব্দ তার কানে আসে আর কেন জানি তার মুখে একটা ক্রুর হাসি ছড়িয়ে পড়ে। সন্দিগ্ধ আর সতর্ক ভঙ্গিতে তিনি চারপাশটা একবার পলকের মধ্যে দেখে নেন আর স্টেথোস্কোপের সামনেটা বৃদ্ধার গলার একপাশে নিয়ে গিয়ে ক্রমশ চেপে ধরেন.....প্রচণ্ড জোরে চাপ দেন....আফটার অল....তিনি তো ছিলেন নিউইয়র্কের এক বিখ্যাত 'সার্জন'। অভাবনীয় 'প্রিশিসান' ছিল তার হাতে....। বৃদ্ধার সমস্ত দেহটা একবার শুধু অদ্ভুত ধরণে লাফিয়ে উঠল আর তারপরেই নিথর হয়ে গেল। স্টেথোস্কোপটা ব্রীফকেসে ভরে তিনি প্রায় নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে বেসিনে হাত ধুয়ে এলেন। বৃদ্ধকে তার স্লিপারে শুতে দিয়ে তিনি বৃদ্ধার নিথর দেহের উপরের খালি হয়ে থাকা স্লিপারটিতে শুয়ে পড়লেন। যাইহোক, অবশেষে ... মুক্তি...মুক্তি।' তিনি সেই প্রবন্ধটা খুঁজতে লাগলেন আর একবারের চেষ্টাতেই তার চোখে পড়ে গেল শিরোনাম— 'হিউম্যানিটি উইল নট বি বীটেন...উই শুড বী রাদার অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট....।'

....চারপাশে হঠাৎ ঘটাং ঘটাং শব্দ, যাত্রী হকার-কুলির হৈ হুল্লোড-চিৎকার চেঁচামেচি...হাহাকার...গাড়ি তার মানে মালদহে এসে পৌছেছে। টাইমটা খুলে বুকের মাঝে চেপে ধরলেন প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্যেও তার কানে ভেসে এল স্টেশনের কোথাও যেন বাজতে শুরু করেছে ঢংঢং ঘন্টার শব্দ। হাতের ইনডিগ ঘড়ির সবুজ ডায়াল তিনি জ্বালিয়ে ধরলেন ..ও, ঠিক বারোটা বাজল....নিউইয়র্কে এখন দুপুর।

হাজারি তায়ে

বস্তি শেনচোওয়া

কপাল থেকে নাক পর্যন্ত নেমে আসা দীর্ঘ চন্দনের রেখা, পেছনে টেনে নিয়ে আঁচড়ানো একমাথা সুন্দর চুল, বকের মত সাদা মখমল কাপড়ের ধুতি আর তারই মত সাদা কামিজ। পায়ে বাটা কোম্পানীর বুড়ো আঙ্গুল ঢাকা কালো চ্যাপ্টা স্যাণ্ডেল। ক্ষীণ দেহ, পুরনো সাইকেল, আর এক নিয়মিত বাঁধা কাপড়ের একটা ঝোলা, আর তার সঙ্গে নির্দিষ্ট এক গতিবেগ। এই হল হাজারি তায়ে।

আর হাজারি তায়ে মানেই সেই নিটোল মালভোগ ধানের চিড়ার ফুরফুরে গন্ধ। পেটমোটা কলসে মাখন দই-দুধ, লিগিরী পুকুরের আঠালো গুড়। অঞ্চলটাতে হাজারি তায়ের আগমনের অর্থ নানা রকমের মুখরোচক জলপানের আগাম আয়োজন। বিয়েই হোক বা নামপ্রসঙ্গই হোক, এগারো দিনেই হোক বা এক মাসেই হোক হাজারি তায়ে অবিচ্ছেদ্য। বাতাসে খবর পায়, জেলা সদর থেকে তেল কোম্পানীর শহর সংলগ্ন পাকা রাস্তার মধ্যভাগে এই বস্তিতে হেলানো ভাবে রাস্তাটা নেমে এসেছে। পাকা রাস্তাটা বেশ ভাল রকম উঁচু। বস্তিটায় ঢালু রাস্তাটা দিয়ে নেমে আসতে আসলে প্যাডেলের কোন কাজ নেই। কিন্তু সেই একটুখানি পথ নেমে আসতেও যদি হাজারি তায়ের প্যাডেল বিশ্রাম না পায়, নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে যে তায়ে অর্ডারের গন্ধ পেয়েছে। অর্ডার নিয়ে ঘরমুখো হওয়ার সময় সাইকেলের গতিবেগই আলাদা, গভীর। সাইকেলের সূত্র ধরে পথে নানারকম ছেলের দল গল্পে মেতে যায়। তার মধ্যে রূপম এক নম্বরের।

'মণিপুরি তায়েদেব দেখছি। কোন কাজে এসেছিলেন?' হাজারি তায়ে, প্রত্যেকেরই একান্ত প্রিয়জন। গিরিসাই সাইকেল নামলেন তায়ে। শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্গিমায় দুই পা ক্রস, কোমরের কাছটাতে সাইকেল, কমিজের পকেট থেকে সিগারেট বেরোল। ততটুকু সময় মুখে কোন কথা বলবে না। উৎকণ্ঠা বাড়ানোর জন্য সময়টাকে দীর্ঘায়িত করে থাকে। কৃত্রিম উৎকণ্ঠা দেখিয়ে বাকি কয়েকজন

তায়ের কাছে চলে আসে। চুরুটে কয়েকটা টান দিয়ে তবেই তায়ে মুখ খুলবে।' কয়েক হাজার টাকার অর্ডার। অমুক বন্ধুর বাৎসরিক নাম-প্রসঙ্গ না পেলেই নয়। এবার কিন্তু চিড়া একেবারে ক্লাস ওয়ান পাবি বুঝলি। সোজা জয়খামদাঙ মাঠে বুক করে রাখা মালভোগ ধান। কারো ভাঁড়ারে সিঁদ কাটি নি। কয়েক হাজার টাকা দেনা।'

এই হল হাজারি তায়ে। হাজারের নিচে কোন কথাই নেই। কোন হিসেবই নেই। সবাই তাকে সম্বোধন করে মণিপুরি তায়েদেব বলে আর পেছন ফিরলেই বলে হাজারি তায়ে। প্রথমে যে তিনি কার আসল তায়ে ছিলেন তা বলা মুশকিল। পিতৃস্থানীয় কারো যে বন্ধু সে কথাও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। কারণ তাঁর সমবয়সীদের সঙ্গে সে ধরণের বন্ধুত্ব আমাদের চোখে পড়ে নি। আমাদের সঙ্গে বেশ সহজ সম্পর্ক। তাঁর চারটে ছেলেমেয়ের কোন না কোনটা কোন এক সূত্রে এই বস্তির কারো না কারোর সহপাঠী। দুদিন যদি একসঙ্গে স্কুলে আসা-যাওয়া করেছি, এটা সেটা কাজে সাহায্য করে দিয়েছি, মনের কথা দুয়েকটা পথের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলেছি, 'বন্ধু' পাতানোর জন্য মণিপুরি গ্রাম থেকে ডাক এসেছে। বন্ধু পাতা মানেই একটা এলাহি কারবার। হাজারি তায়ের ঘরেই হোক বা অন্য কারো ঘরেই হোক, দস্তুর একটাই। ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক– দুই বন্ধু এক থালায় একবার ভাত খেতেই হবে। ইতস্তত করলে প্রথমেই সন্দেহ করবে, 'একসঙ্গে খেতে যদি ভাল না লাগে, বিপদ আপদে আর কি দেখাশোনা করবি। তাহলে আর কিসের বন্ধুত্ব?' এরপর আর না করলে বুকের পাটা থাকে না। অর্থাৎ মণিপুরী গ্রামে কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতা মানেই একদিন ভালভাবে লালমাটির লেপা মেঝেতে বসে ডালার মত বিশাল পিতলের থালায় দুই বন্ধুকে দুদিকে বসে খেতেই হবে। মিষ্টি পুকুর থেকে তুলে আনা পদ্মের কোমল ভাজা, ঘন মুসুর ডাল, ছোট ছোট গোবিন্দভোগ চালের সুগন্ধিত ভাত। গ্লাসের মত ছোট পিতলের ঘটিতে দমকলের গন্ধ লাগা জল। সামনে, বুকে রঙীন শক্ত ফানেকের মেখনি পরে আমৈয়ে দেখাশোনা করবে। ব্যস, দুজনের মধ্যে ফর্মাল বন্ধুত্ব হয়ে গেল। যে সে কথা নয়। তায়ে-আমৈ তারপরে বসতে দিয়ে বোঝাবে, 'তোরা দুজন আজ থেকে জন্ম জন্মান্তরের বন্ধু হয়ে গেলি। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে একে অপরকে দেখতে হবে।' কোমল মনে এই অনুষ্ঠান রেখাপাত করে। গভীরভাবে দাগ কাটে। সহপাঠীর পর্যায় থেকে সম্পর্কটা বন্ধুত্বের পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়। এভাবে ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্ব পেতে দেওয়ার উদারতায় বোধহয় হাজারি তায়েদেব প্রত্যেকেরই তায়েদেব। কেবল অনুমান মাত্র। নিচের মহলের ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্ব উপরমহলের অভিভাবকদের মধ্যেও সহজেই বন্ধুত্বের ছায়া ফেলে। তাই বোধহয় বস্তির প্রায় প্রত্যেকেই হাজারি তায়ের বন্ধু। যেমন কোণের ঘরের বন্ধু, মধ্যের ঘরের বন্ধু, ওপারের বন্ধু, এপারের বন্ধু, স্কুলের বন্ধু, কোম্পানির বন্ধু, রেলের বন্ধু, ব্যাপারী বন্ধু ইত্যাদি ইত্যাদি।

গৃহস্থকে যেভাবে বন্ধু বলে সম্বোধন করে, গৃহস্বামিনীকেও সেভাবেই সম্মান এবং সহৃদয়তার সঙ্গে বন্ধুপত্নী বলে সম্বোধন করে। এ ধরণের সুন্দর এবং সুরেলা ধ্বনি আজ পর্যন্ত কানে আসে নি।

কেবল চন্দনের তিলকের জন্যই বা জনগণের তায়ে বলেই হাজারি তায়েদেব রোমন্থনের উপযুক্ত চরিত্র হয়ে পড়েছে কি? নিশ্চয় নয়। সবার কাছেই সে হাজারি। আমাদের কাছে হাজারি তায়ে। সামনে ডাকি মণিপুরি তায়ে বলে আর আড়াল হলেই হাজারি তায়ে। ব্যস। কিন্তু কখনও আপাততঃ কোনরকমের সংযোগ আশা না করেও হাজারি তায়েদেবের একেকটা অভিব্যক্তি জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়। আর সংযোগগুলিও আশ্চর্যরকমের। অভাবনীয়। ইণ্ডিয়ান রাইটিং ইন ইংলিশের ক্লাস। ডঃ এমানুয়েল নরিন্দর লাল ক্লাসরুমে আসার সময়েই অপূর্ব একটা রিদম সঙ্গে নিয়ে আসে।

সেই ছন্দে তাল মেলাতে মেলাতেই কোন ফাঁকে ক্লাস শেষ হয়ে যায় বোঝাই যায় না। ডিপার্টমেন্টের হেড ডঃ হোমচৌধুরি কথায় কথায় 'রাইট ইনডিড' বললেও কেউ তার নাম 'রাইট ইনডিড' ফেলল না। হেড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্তান তুল্য স্নেহ করেন বলেই নাকি আমরা তাকে সামনে 'পাপা চাও' বলতাম। শুনেও না শোনার ভান করে, আড়ালে তিনি তৃপ্তির হাসি হাসেন। এরকম আস্পর্ধা দেখে ডঃ লাল আমাদের স্নেহমিশ্রিত হাসিমুখে মৃদু তিরস্কারও করেন।

'পাপা চাও' থেকে সামান্য কড়া, ষোলআনা ভদ্রলোক এই অধ্যাপক ডঃ লাল মুরব্বি পদের তালিকায় দুনম্বর, তাই 'পাপা টু'। টমাস হার্ডিব হাতেব তালু থেকে নিয়তি পর্যন্ত টেনে নিয়ে আমাদের হার্ডির প্রেমে হাবুডুবু খাইয়ে দিতে পারা ডঃ নুরুল হাসান স্যারের নাম আমরা ততদিনে ভুলে গিয়ে তাকে 'হার্ডি ম্যান' বলার স্তরে পৌঁছেছি। পুরোপুরি ইংলিসাইজড আবহাওয়া। এমন সময়ই সামান্য সূত্র ধরে আচম্বিতে হাজারি তায়ের প্রবেশ। তাও আবার এত বছর বিরতির পরে। ময়ূরভঞ্জের হাড় কাঁপানো শীতে পাতলা ধূতি আর কামিজ পরে?

ডঃ লাল আমাদের 'কণ্ঠপুরার' কথা বলছেন। রাজা রাওয়ের একক শব্দ বিন্যাসের কথা। কর্ণার হাউস মুরথি, টেম্পল রাঙ্গাপ্পা, পোস্ট অফিস সূর্যনারায়ণ. ...এরকম সহজ আর স্পষ্ট প্রকাশ 'পাপা-টু' কোন ভারতীয় ভাষা সাহিত্যে তো দূরের কথা এমনিতেও অন্য কোথাও আছে বলে জানেন না। বোধহয়, পাপা টু এর মতে নেই। এটা রাজা রাওয়ের একান্তই নিজের কৌশল। আমরা জানি কি.....কোথাও আছে বলে?

পাপা-টু-এর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই বকের মত সাদা কামিজের পকেটে চুরুট খুঁজতে খুঁজতে হাজারি তায়ের আবির্ভাব। চুরুট বের করে কথা শুরু করার আগেই সে হাজারি তায়েকে আড়াল করে তার পক্ষ সমর্থনে নিজেই নেমে গেলাম। পর্বিচিতি দেবার এই ধরণ হাজারি তায়ের আছে বলে বোধহয় বলে ফেলেছিলাম।

পাপা টু, ডঃ লালের চোখে স্তব্ধ প্রশ্ন। তৎক্ষণাৎ কান মাথা ঝাঁকিয়ে হাজারি তায়ের জায়গায় 'আমাদের ভাষায়' বলে সংযোজন করে রাখলাম। অনেক বছর বিরতির পরে হাজারি তায়ে এভাবে ক্লাসরুমে বিচরণ করবে বলে মনের অগোচরেও ছিল না। রাজা রাওয়ের সমানে তাল দিতে পারা হাজারি তায়ের গরিমা আমাদের ভাষার করে ' পাপা টু' র কৌতূহল উদ্রেগ করতে পারলাম। 'ইণ্ডিয়ান রাইটিং, ইন ইংলিশ' হোক বা রাজা রাওয়েরই হোক, হাজারি তায়ের যোগসূত্র সেদিন থেকে থেকেই গেল। আজ অবধি। আমাদের হাজারি তায়ে।

ছেলেই হোক, বুড়ো হোক, আওয়াজ পেলেই সাইকেল থেকে নেমে পড়বে। যে কোন বিষয়ে কথা হোক না কেন শেষ করবে গিয়ে হাজারে। তা সে টাকা পয়সা সম্পর্কিতই হোক বা অন্য কিছুই হোক।

চেহারা-পাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় হাজারি তায়ে নিজেও হাজারের মধ্যে একজন। চেহারা মিষ্টি। স্পষ্ট উচ্চারণ। কথায় মিষ্টি আমেজ। গানে দক্ষ। মণিপুরী গ্রামের ঘরগুলির সৌন্দর্যই আলাদা। নিখুঁতভাবে মোছা লাল মাটির মেঝে। উঠোন পর্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উঠোনের বাঁ-পাশে তুলসী মঞ্চ। একপাশে ছোট ঢোঁক সহ একচালা। মোটাসোটা ঢেঁকিতে নতুন করে কোটা মালভোগ ধানের চিড়া। তার ফুরফুরে গন্ধে বাতাস আচ্ছন্ন। বাগানে অপ্রয়োজনীয় জিনিস নেই। সমান মাপের গাছগুলি। তুলসী গাছের মতো লম্বা হতে না হতেই, গাছে আমের ফলন বাড়ন্ত। ঘর নয় যেন কোন আশ্রম। সামনের মিষ্টি পুকুর থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বয়। আমি সেখান

থেকে পিতলের বালতিতে করে জল আনে। ভিজে থাকা বালতিতে রোদ পড়ে সোনার মত ঝকঝক করে। আমৈর এক মেয়ে কাইনাতন্বী ছন্দোবদ্ধ তালে ঢেঁকিতে চিড়ে কোটে। ঢেঁকির তাল না কি তালের সঙ্গে নাচা তার এক পিঠ কালো চুলের মোহে সেখানটিতেই পথিকের পথ চলার গতি শ্লথ হয়ে আসে। আমাদের সঙ্গের দুজনের সাইকেলের বিপত্তিও সেখান এসেই সৃষ্টি হয়।

সুর না ছবি, কোনটা বেশি মায়াবী?

তবে কেবল বিপত্তিতেই শেষ হয়। তার চেয়ে বেশি এক পা ও এগোনোর কোন সুযোগ নেই। কোন না কোন প্রকারে কইনাতন্বীর সঙ্গে বোনের সম্পর্কটা এসে পড়বেই। কারণ তায়েদেও মানে তায়েদেও। দিদির স্বামীকে অমুক দাদা বলে সম্বোধন করা যায়, পিসির স্বামীকে প্রয়োজনে আঙ্কল বলে চালানো যেতে পারে, ভাবী শ্বশুরকে বাবা না বলে, লজ্জার মাথা খেয়ে মেশোমশাই বলে কোনমতে পাশ কাটানো যেতে পারে। কিন্তু তায়েদেবের মর্যাদাই আলাদা। এমনকি পিতা বলে সম্বোধন করলেও সমকক্ষ হয় না। এহেন প্রতাপী 'তায়েদেবের' মেয়ে যখন বোন, তখন সত্যি সত্যিই বোনই। এর আর অন্যথা হতে পারে না। সম্পর্কের নড়াচড়া সম্ভব নয়। এর জন্য কব্জিতে রাখী বাঁধারও কোন প্রয়োজন নেই। কাইনাতন্বী সেরকমের বোন।

বেচারা রূপম। ময়ূরভঞ্জের কমপ্লেক্সে পাইনের মত উত্তাল হয়ে নাচা খাসি যুবতীর খোলা চুলও তাকে কম আকর্ষণ করেনি। তবে মণিপুরি গ্রামের কাইনাতন্বীর চুলের কথা একেবারেই আলাদা। ময়ূরভঞ্জের কেশবিন্যাস যদি কলকল পাহাড়ী ঝরণা, কাইনাতন্বীর চুলের ঢেউ ভৈয়ামেব নদীর হিসেবী, পরিমিত নাচন। গরমে লাল হয়ে ওঠা কণ্ডরা যদি বন্ধুভাবাপন্ন, আমাদের আমৈর কপালের দীর্ঘ চন্দনের ফোঁটায় মুখটিতে মাতৃভাব ফুটে উঠেছে।

আর কইনাতন্বী?

ছোট পোষাকে না ঢাকা, উঁচু হিলে সুশোভিত পায়ের তরল প্রশংসা রূপমের মুখে অনেকদিন শুনলাম। শ্রদ্ধা প্রধান যে কায়দায় সাদা পাটের মেখলার উপর ছোট ছোট ফুলতোলা চাদর গায়ে দিয়ে ক্লাসে আসে, সেই সাজ-সজ্জা দেখে হাজারো দুধে-আলতা কুমারী লজ্জা পাবে বলে তোষামোদ করতেও দেখলাম। তা সত্ত্বেও রূপমের সমস্ত হা হুতাশ কাইনাতন্বীর উঠোনে সাইকেলের চেইন পড়ার মধ্যেই আক্ষরিক অর্থে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। অকপটে সমস্ত কথা উজাড় করে বলে দিয়ে সে হয়তো আমাদের সাহায্যই চেয়েছিল। কিন্তু কি-ই বা করতে পারি? গল্পের শিরোনাম ঠিক করতে গিয়েই এটা নির্দ্ধারিত হয়ে গেল যে কাইনাতন্বী আমাদের গল্পের নায়িকা হতে পারে না। কাইনাতন্বী হিন্দি সিনেমার নন্দা হয়েই থাকবে।

রূপমকে আমরা কোনমতেই সাহায্য করতে পারব না। সে অন্য কোথাও চেষ্টাচরিত্র চালিয়ে দেখতে পারে। এই গল্পের মূল উদ্দেশ্যই হল হাজারি তায়েকে অমরত্ব প্রদান করা, না হলেও অন্তত বিশেষত্ব প্রদান করা। তাছাড়া রূপম কাইনাতন্বীর গাঁথা লিখলেও পাস্ট টেন্সে লিখতে হবে। প্রেজেন্ট টেন্সে তাকে নিশ্চয় এই সময়ে নার্সিংহোম, নার্সারি স্কুল, প্রমোশনের ফাইল, না হলেও খুব বেশি হলে পরকীয়ার ক্ষেত্রে দেখা যাবে।

ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে। হাজারি তায়ের বড় ছেলে খুব শীঘ্রই পড়াশোনার পাট চুকিয়ে এটা ওটা ব্যবসায় নেমে পড়ল। অরুণাচল থেকে ট্রাক ভর্তি করে কাঠ আসে। মাসের পর মাস জঙ্গলে থাকে। ম্যালেরিয়া মশা, ম্যালেরিয়া জ্বর ইত্যাদি ব্যাপারগুলি সব তায়ের কাছ থেকে শুনে শুনে আয়ত্ব করা। হাজারের হিসেবটা অবশ্য থাকছেই।

'হাজার হাজার টাকার কথা। কষ্ট করতেই হবে। সে যুবক ছেলে। অল্প বয়সে ফিল্ডে নেমেছে। হাজার টাকা আসবেই আসবে।' ট্রাকভর্তি কাঠের মধ্যে কাঠের মত নিশ্চল হয়ে একবার ব্রজবিহারী অর্থাৎ হাজারি তায়ের বড় ছেলে ফিরে এল। সমস্ত শরীর জালি শশার মত। সে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। হেসে খেলে বেরিয়ে যাওয়া ডাকাবুকো ছেলে কাঠ হয়ে ফিরে আসাটা তখন আর সাধারণ ঘটনার স্তরে নেই। অস্বাভাবিক বলেই হয়তো মণিপুরি গ্রাম লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ল। অমৈদের বির্ননির ভাষা বুঝতে না পারলেও সুরই পাষাণ প্রাণের লোকদেরও কাঁদতে বাধ্য করল। সমস্ত গ্রামের আকাশ বাতাস কান্নার সুরে আকুল হয়ে উঠল। তুলসীতলায় শোকাকুল জনগণ আর শ্যেন চোখের পুলিশের মধ্যে হাজারি তায়েকে কেউ দেখতে পেল না। বয়স্ক দুই একজন নিঃশব্দে হাজারি তায়ের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। উঁচু, পরিষ্কার করে মুছে রাখা বারান্দা অতিক্রম করে ঘরের ভেতরে মানুষের স্রোত বইতে লাগল।

হারমোনিয়ামের রীডে দ্রুত তালে আঙ্গুল চালিয়ে উৎকট কোন সুর তোলার চেষ্টা করছে হাজারি তায়ে। কোন জগতে বাস করছে বোঝা মুশকিল। মৃদঙ্গ কাঁধে নিয়ে বাতাসে তিন পাক খেয়ে হাজারি তায়ে আমাদের সেই চিরপরিচিত জন। তবলায় হাজারি তায়ে থাকলে আমাদের কারো স্টেজ-ফ্রাইট থাকে না। হারমোনিয়ামে হাজারি তায়ে বসলে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রাণ পায়। আজ হাজারি তায়ে হারমোনিয়ামে। উঠোনে যুবক ছেলের মৃতদেহ। আমাব কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। তায়ে নির্বিকার।

'কী হল, হাজার টাকা রোজগারেব জন্য পাঠিয়েছিলেন না ছেলেকে? তোর হাজার টাকা ছেলেকে বাঁচাতে পারল কি?' মাটিতে বসে থাকা তায়েকে টান মেরে এনে মুকুন্দ জ্যেঠা দাঁড় করিয়ে দিলেন। জ্যেঠার নিষ্ঠুরতার কোন তুলনা নেই। আমরা সবাই কোন জন্মেও মুকুন্দ জ্যেঠাকে মাফ করতে না পারার শপথ নিলাম। কি নির্দয়। যেন চোখ তুলে চাইতেও আমাদের লজ্জা হল।

তখনই শুনতে পেলাম, হাজারি তায়েদেব চিৎকার করে কাঁদছে। মুকুন্দ জ্যেঠার মত বিশাল দেহের অধিকারী মানুষটার বুকে একটা শিশুর মত দেখাচ্ছে তাকে। মুকুন্দ জ্যেঠাকে বটবৃক্ষের মত দেখাচ্ছে। দু'চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। এই ঘটনার অনেক দিন পর আমার সঙ্গে অ্যারিস্টটলের পরিচয়। এরপর যতবার ক্যাথারসিসের মুখোমুখি হয়েছি, ততবার হাজারি তায়েকে অবধারিতভাবে স্মরণ করেছি। অনেকদিনের জন্য ঘরটা বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। শুনলাম বাড়ির সবাই মণিপুরে চলে যাবে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না। উঠোনটা পার হলেই যেন ঢেঁকির আওয়াজ শুনতে পাব।

রূপম চুপ মেরে গেল। তায়েব পুরো পরিবার একমাসেরও বেশি মণিপুরে থেকে এল। তারপর এক পক্ষকার মাইবেলায়। সেখানেও নাকি একটা মণিপুরি পাড়া আছে। আমৈর মায়ের দিকের দুজন আত্মীয় থাকে সেখানে। একদিন আমাদের বস্তির ঢালু রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে সাইকেল চালিয়ে তায়ে অর্ডার নিতে এল। সম্বোধন একই থাকলেও তায়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। আড্ডা মারার স্বভাবটা আমাদের বন্ধ হল। হাজারি তায়ের অসন্তোষ বেড়ে চলল।

'হাজারের মধ্যে না বলা কথাটা হল, কোম্পানির বন্ধু নাকি নাম প্রসঙ্গে লুচি ভাজা করবে। কেবল নাম প্রসঙ্গে আসা ভক্তদের জনাই নাকি জলপানের ব্যবস্থা করবে। হাজারের হিসেবে আমার লোকসানের দিন।'

'আমার এত হাজার টাকার ধান পড়ে আছে। এই বিয়েতেও নাকি কারিগর রান্না করবে? হাজার হলেও জলপানের স্বাদ কী আর রান্না করা জিনিসে পাবে বন্ধু?'

'কাইনাতম্বীর জন্য ভাল ছেলে একটার সন্ধান পেয়েছি। হাজার টাকার চাকরি মাইবেলায়। কারো সঙ্গে আর কথাই বলে না।' আনন্দিত মনে একদিন হাজারি তায়েদেবকে বলতে শুনলাম। কাইনাতম্বী হঠাৎই একদিন আমাদের মাঝখান থেকে নাই হয়ে গেল। তায়ের দ্বিতীয় ছেলেটি চালাক-চতুর নয়। তিন নম্বরটা ম্যাট্রিকে অসমীয়াতে লেটার মার্ক পেতেই সমস্ত মণিপুরি গ্রামে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। হাজারি তায়েদেবের সাইকেলে হাজারটা অর্ডার নেওয়ার আনন্দকে ছাড়িয়ে গেল। লেটার, তাও আবার অসমীয়াতে, তখনকার সময়ে এটা সত্যিই উল্লেখযোগ্য।

'কখন ছেলে এত নম্বর পাবার মত করে কথা শিখল, জানতেই পারলাম না। হাজার টাকার কথাটা হল, স্কুলের মাস্টারমশাইদের একটা প্রণাম করে আসুক ছেলে। হাজার হাজার ছেলেমেয়েদের মধ্যে কত বড় একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলল দেখলি তো।...

তায়ের সুখের দিনে ভাগ নিতে গিয়ে সেবারই কাইনাতম্বীর সঙ্গে শেষ দেখা। কাইনাতম্বীও বোধহয় বিয়ের পরে সেবারেই প্রথম এসেছিল। আমাদের সবাইকে দেখে কেঁদে ফেলল। খুব অনুচ্চ স্বরে সে রূপমের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। কেউ একজন পাশ কাটিয়ে যাবার মত একটা উত্তর দিল। কাইনাতম্বীকে সামান্য হতাশ হতে দেখা গেল।

অনেক বছর পার হয়ে গেল। এই ক্ষুদ্র একটা অনুপলের প্রতিক্রিয়া কোন কারণে আজ অব্দি স্থায়ী হয়ে রইল। না কি সেই প্রতিক্রিয়া আমাদের প্রত্যাশিতই ছিল। এদিক থেকে দেখতে গেলে কাইনাতম্বীর নায়িকা হওয়াই উচিত ছিল।

কাল্পনিক। শেষ পর্যন্ত রূপমই সেই সম্ভাবনাতে জল ঢেলে দিল। কাইনাতম্বীকে নিষ্প্রভ করে, বেশ ভাল করে এবার সে হাজারি তায়েকে অন্য এক ধরণে স্থাপন করে গেল। স্বয়ং নায়ক বা সম্ভাব্য নায়ক যখন ঘটনা বা গুরুত্বের স্রোত অন্যদিকে ধাবিত করার চেষ্টা করে, কাহিনীকার বা চরিত্র সৃষ্টিকারী তখন অসহায়।

বাস্তবিকই সে-ও অসহায়। তবুও শেষ অঙ্কের সূত্রধর রূপমকেই হতে হবে। অন্যথা হওয়ার কোন সুযোগ নেই। ঘর ফেরত বাসে করে সে আসছে, চাকরি থেকে। মাছখোয়া না ফাঁসি বাজারে বাসটা কিছুক্ষণ দাঁড়াল। ফুটপাতে নামাবলী গায়ে একজন লোককে ঘিরে ধরে একদল মানুষ নিজেদের হাত বাড়িয়ে ধরেছে। রূপম ক্ষণিকের জন্য মুখটা দেখতে পেল। বড় আপন বলে মনে হল। কোথায় যেন আগে দেখেছে। ভাল করে দেখার আগেই মানুষের ভিড় আড়াল করে ফেলল।

'গাইডের দেবানন্দ। কন-ম্যান। অলস একটা বার্তা তার মগজে গেঁথে গেল। বাস চলল। ঘরে পৌঁছতে রাত হয়ে গিয়েছিল। প্রতিদিনই রাত হয়। এই নিয়ে মুনের সবসময় অসন্তোষ। সে মুখ গোমড়া করে চা-জলপান বানাল। বাথরুমে হাত-মুখ ধুচ্ছে সে। দুবার চোখেমুখে জল ছিটিয়ে আয়নাতে নিজের মুখের দিকে তাকাল রূপম। মুনকে মুডে আনতে হবে, কোনভাবে। আর আয়নার দিকে তাকাতে তাকাতেই সে চমকে উঠল। এতক্ষণে গিয়ে মনে পড়েছে।

দেবানন্দ কীভাবে হবে? এটা ফাঁসিবাজার। হিন্দি সিনেমার পর্দা নয়। হরি হরি। বেশি ভাবার সময় নেই। অটোরিক্সা করে যখন ফাঁসিবাজার ফুটপাতের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছল, তখন সেখানে নামাবলী গায়ে কোন মানুষকেই দেখতে পেল না। মানুষের ভিড়ও নেই। মুনের জেরার সম্মুখীন হবার জন্য বিমর্ষ হয়ে রূপম ফিরে এল। কে জানে হয়তো সে সময়টায় আধো ঘুম আধো জাগরণে ছিল। স্কুলে ফেরার সময় অজস্র হিন্দি সিনেমা দেখার ফল। ছিঃ ছিঃ। এভাবে যেখানে সেখানে রূপালী পর্দার মানুষকে দেখতে পেলে কীভাবে হবে?

একদিন সুস্থ আর স্থবির মগজ নিয়ে সে মাছখোয়া থেকে শুক্রেশ্বর পর্যন্ত অনুসন্ধানে নেমে পড়ল। চোখ আর মগজ শুধু একটা ট্র্যাকে রাখার জন্য বদ্ধপরিকর। একটা হেস্তনেস্ত হওয়া উচিত।

সুরেলা আওয়াজ। নিখুঁত ভাষা। সেদিন তাহলে দেরিতে বুঝতে পারা ব্যাপারটা ঠিকই ছিল। রূপমের চিনতে ভুল হয়নি। হাজারি তায়ে।

ভগ্ন স্বাস্থ্য, নামাবলী গায়ে। গাছের শিকড়, জন্তুর ছাল, একগাদা বাটিতে নানারকমের মাদুলি, কোলে একটা পুঁথি, কপালে চন্দনের রেখা। হাজারি তায়ে। জয়কামদং মাঠে কোন বন্ধু কোথায় লাল রঙের মালভোগের কঠিয়া ফেলে, তখন থেকে ধান পাকা পর্যন্ত উৎসাহে পথ চেয়ে থাকা হাজারি তায়ে আর এই যে ফুটপাথে বসে গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ন্ত্রণ করতে থাকা হাজারি তায়ে। যোগসূত্রটা ধরতে না পেরে রূপম গা-ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। সামনে গিয়ে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতেও পারছে না। মানুষ ভিড় করে ঘিরে আছে। ভাল লাগছে না।

অস্বস্তি আর অসন্তোষ নিয়ে সে তায়েকে ছাড়িয়ে এল। ঠিক তখনই সে তায়ের চোখে পড়ে গেল। নক্ষত্র নিয়ন্ত্রণকারী আলোর সাজ-সরঞ্জাম ছিটকে ফেলে দিয়ে, নামাবলী উড়িয়ে তায়ে রূপমের দিকে দৌড়ে এলেন।

'পোনাকন না? আমি হে বাবা। তোদের তায়েদেব। ভুলে গেলি? ভুলিস নি? জানি তো। হাজার হলেও কেবল দাঁতগুলি মাত্র পড়ে গেছে। বাকি সব তো সেই একই রয়েছে। পোনাবন, হাজারের মধ্যে তুই একটা হয়েছিস বটে, ভাল থাক। কুশলে থাক।'

রূপম দাঁড়িয়েই রইল। কী জিজ্ঞেস করবে, না করবে ভেবেই পেল না। গোপন মন্ত্রণা দেবার মত করে তায়েদেব তার পাশে চলে এল। জীর্ণ দেহ, একমুখ দাড়ি। সমস্ত মানুষটাই অনটনের জীবন্ত সাক্ষী। রূপমের চোখদুটি যেন জ্বালা করতে লাগল।

'বুঝেছ পোনাকন, নতুন করে বিজনেস করছি। পুরনো জিনিস নিয়ে বসে থাকলে চলে না। হাজার টাকার কথা। এই লাইনে প্রফিটেই প্রফিট। তুই দেখিস। নতুন করে আরম্ভ করেছি বলেই এই অবস্থা। হাজার গোটাচারেক খাটাতে পারলেই, রোজ হাজার টাকার কাজ হবে।'

'তোর দেখছি মন খারাপ পোনাকন। আরে বোকা, হাজার টাকা তো আমার মুঠোয়। ছেলেরা হাজার হাজার টাকা কামায়। মেয়েদেরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমৈ আমার চেয়েও বেশি বুড়ো হয়ে গেছে। আমি কারো গলগ্রহ হতে চাই না। তোরা তো ভাল করেই জানিস। তাছাড়া আমি দেখেছি এই লাইনটা বেশ লাভের ব্যবসা।'

'তায়েদেব, চলুন। আমি কীভাবে আছি দেখে আসবেন। আপনার বৌমাও খুশি হবে। নাতি দেখে আসবেন। চলুন, বাড়িতে গিয়েই কথাবার্তা বলা যাবে।'

'পোনাকন, পোনাকন। যাব যাব। আমি জানি তো, হাজার হলেও তোরা আমাকে ছাড়বি না। তোরা ছাড়া আমার আর কে-ই বা আছে? তবে আজ কীভাবে যাব বাবা? বৌমাকে প্রথম দেখব। একটা নাতিও রয়েছে। কম করেও হাজার টাকার বাজার করতে হবে। তুই ঘরের ছেলে, তুই তো বুঝতে পারবি।'

'তায়ে দেব, কি কথা বলছেন আপনি? তাহলে আমি আর দাঁড়াচ্ছি না। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।' তার চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। জোর করে তায়েদেবের হাত থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে চাইল রূপম। অস্থিচর্মসার দেহ নিয়ে তায়েদেব পেছন পেছন দৌড়ে এলেন। অসহনীয় দৃশ্য।

'পোনাকন, রাগ করিস না। আমি কোনমতেই খালি হাতে তোর ঘরে যাব না। তুই মাঝে মাঝে আসবি। নতুন বিজনেস বলেই এভাবে ফুটপাতে পড়ে আছি। লজ্জা করিস না পোনাকন, হাজার চারেক টাকা খাটাতে পারলেই দেখবি আমার এখানে কী বিশাল লাইন লেগে গেছে। কপাল ফিরবে নাকি, পোনাকন? তখন বলবি, তায়ৈ যে বলেছিল।

কানে কানে একটা কথা বলছি, শুনবি? তুই কাউকে বলিস না। নাহলে কয়েক হাজার টাকা ধার দিতে পারবি নাকি? প্রথমে হাজার টাকা খাটিয়ে নিই। প্রতিদিন হাজার টাকা রিটার্ন আসবে। কয়েকহাজার টাকা জমা করতে পারলে আমি আর এভাবে ফুটপাতে বসব না। হাজারের মধ্যে আসল কথাটা তোকেই বলে গেলাম, বুঝেছিস পোনাকন। হাজারের দেহ, হাজারের ব্যবসা, হাজারে পারলেই পারবি হে পোনাকন, হাজারে পারলেই পারবি........'

টীকা ঃ

তায়ৈ—পিতৃবন্ধু

আমৈ—তায়ৈ দেবের স্ত্রী

পোনাকন—ছেলেব বয়সীদেব স্নেহেব ডাক

সান্ধ্যভ্রমণ

ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া

সুমিত্রার বালিশের নিচে— সবসময় ঠিক নিচে নয়—নিচে বা সামনে একটা টর্চলাইট, কেবল পড়ার সময় প্রয়োজনীয় চশমাজোড়া, হাতঘড়িটা, একটা দেশলাই, একটা রুমাল, আর একটা বই থাকে। কখনও বা এরই কোন একটা না থাকলে বালিশে মুখ রাখার পরই সে টের পেয়ে যায়--কি যেন একটা নেই নেই বলে মনে হচ্ছে। তখন সে উঠে বসে, বালিশটা সরিয়ে জিনিসগুলি পরীক্ষা করে—ঠিক, দেশলাইটা আনা হয় নি। তখন সে প্রভাকে ডাকে না, গুঁজে দেওয়া মশারি তুলে নেমে যায়।

তার মাথার শিয়রের দিকে তোষকের নিচে ড্যাগার বলা যেতে পারে এমন একটা ছুরিও থাকে। সেটা সে কখনও গোটা মিষ্টিকুমড়ো, দু-ফালা, চার-ফালা করার মত কাজের জন্য বের করে নেয়। তারপর মুছে টুছে এমনিতেই একবার ধারটা পরীক্ষা করে নিয়ে পুনরায় তোষকের নিচে রেখে দেয়। সুমিত্রা একবার হঠাৎ রিভলবারের লাইসেন্সের খোঁজে ডি.সি-র অফিসে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। একটা ফর্মও এনেছিল, পরে আর ফিল-আপ করা হল না। রাতের বেলা কোন একটা শব্দের জন্য জেগে উঠলে সুমিত্রার কখনও কখনও প্রথমে ড্যাগারটার কথা মনে পড়ে, কখনও বা বইটির কথা মনে পড়ে— সেটা শব্দের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, যেমন—ভোরবেলা পাখির ডাকে ঘুম ভাঙলে তার ড্যাগারটার কথা মনে পড়ে না। কখনও বা বিনা কারণে অসময়ে ঘুম ভাঙলে তার বালিশের নিচের কোন জিনিসের কথাই মনে পড়ে না, তার বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর হয়েছে, এই পঁয়তাল্লিশ বছরের একচল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরের ভেতরের যে কোন একটা কথা মনে পড়ে। কথাটা ভাল না লাগলে, বা কথাটা তাড়াতাড়ি মন থেকে বেরিয়ে না গেলে তার বইটার কথা মনে পড়ে, বেডসুইচটাতে হাত পড়ে, লাইটটা জ্বললে চশমাজোড়ায় হাত পড়ে।

আজ তার ভেতরে ভেতরে একটা উত্তেজনার জন্য ঘুম ভেঙে গেল। সকাল ছয়টায় বাস ধরতে হলে থুত্থুরে বুড়োর যেভাবে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়, স্কুলের সরস্বতী পুজোয় পুজোর দায়িত্বে থাকা ক্লাস নাইনের মেয়েটির যেভাবে ভোরবেলাতেই ঘুম ভাঙে—ঠিক তেমনি। সে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল—কোনও পাখি ডাকছে নাকি? না ডাকছে না। তারপর সে দেওয়াল এবং সিলিং যেখানে মিলিত হয়েছে সেদিকটায় তাকাল—স্কাইলেট দিয়ে আলো আসছে কি? না, আসছে না। বেড সুইচটা টিপতে তার ইচ্ছে করল না। টর্চলাইটটা জ্বালাল, চশমাজোড়া পরল, হাতঘড়িটা দেখল—তিনটে বেজে পনেরো-সতেরো মিনিট হয়েছে। সে বুঝতে পারল—এখন আর ঘুম আসবে না।

প্রতিদিন ভোরবেলা সে বেড়াতে যায়। দুই কিলোমিটারের মত পথ হাঁটে। তার মনে হচ্ছে-—আজকাল সাড়ে চারটের সময় বেরুনো যেতে পারে। চারটে সতেরো মিনিট হলে সে উঠে পড়ত। বেডকভারটা গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে সে চিৎ হয়ে পড়ে রইল। আজ তার নতুন ঘরের খুঁটি পোঁতা হবে। গতকাল বিকেলে মহিউদ্দিন মিস্ত্রি নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে অন্য দুজন মিস্ত্রির সাহায্যে চারটে লোহা দিয়ে অদ্ভুত চেহারার একটা খাঁচা বানিয়ে নিয়েছে। সেটাই আজ খুঁটি হবে। সুমিত্রা সেগুলি কিছুই বোঝে না। মহিউদ্দিনের সঙ্গে তার বন্দোবস্ত—যা বোঝার সব বুঝবে, সুমিত্রা শুধু পয়সা দিয়ে যাবে, একা মেয়েমানুষ বলে তাকে যেন ঠকিয়ে না নেয়। মহিউদ্দিন রাজমিস্ত্রি ছিল, এখন ঠিকাদার হয়েছে। এখন সে নিজে কাজ করে না। সাদা পায়জামা, পাঞ্জাবী আর বড় একটা ঘড়ি পরে। কেবল কোন আনাড়ি মিস্ত্রি একই ভুল বারবার করলে সে রাগ করে বলে—'এই বুর্বক, দেখি দূর হ'—বলে নিজেই কাজটা করে দেখায়। না হলে সে ছায়ায় বসে পকেট ট্রানজিস্টার থেকে গান শুনতে থাকে। আজ একমাস আগে থেকেই সে জমিটার এক কোণে লোহা, ইট, বালি, শিলগুটি ইত্যাদি ফেলেছে, জমির এক কোণে টিন আর তরজা দিয়ে একটা ঘর বানিয়েছে, লোহা বাঁকা করার জন্য কাঠের ঘোড়া একটা পুঁতেছে। একদিন পর পর বিকেলবেলা সুমিত্রা কাণ্ডকারখানা দেখার জন্য এসেছে, মহিউদ্দিন তাকে বিচিত্র চেহারা, রং আর আকৃতির কিছু কাগজের কিছু টুকরো দিয়েছে। সেগুলি রসিদ। সেগুলির মধ্যে তাদের আধা আকৃতির কাগজও থাকে। সেখানে লেখা থাকে, গুণা-—এগারো টাকা। সুমিত্রা ব্যাগ থেকে বের করে মহিউদ্দিনকে পয়সা দেয়। সব কিছু সামলে নেবার মত গভীর সুরে জিজ্ঞেস করে—'আগামীকাল কী কী কাজ আছে?'

ইতিমধ্যে মহিউদ্দিন ঘরটার নকশা টকশা সব বুঝে নিয়েছে। প্রথমদিন সে ট্রেসিং পেপারে আঁকা নকশাটা ভালভাবে লক্ষ্য করে নি—উল্টোদিক থেকে দেখছিল। সুমিত্রা কাছে এসে বলেছিল, 'এদিক থেকে কী দেখছ? ঘুরিয়ে নাও।' যেন বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয় নি এরকম একটা ভাব করে মহিউদ্দিন বলেছিল, 'এদিক থেকেও একই দিদি। কেবল পূবদিকের ঘরগুলো পশ্চিমদিকে দেখাচ্ছে। বাকি সব ঠিকই দেখতে পাচ্ছি।'

'তবু ওপাশ থেকে দেখলে তবেই অক্ষরগুলি পড়তে পারবে।'

'এই অক্ষরগুলির সঙ্গে আমাদের খুব একটা কাজ নেই দিদি। আমি কেবল ভাবছি, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যে কুড়িটা পিলারের কথা বলেছেন, আমার তো মনে হয়—এই দুটি পিলার না হলেও চলে যায়।' কথাটা সুমিত্রা নকশাটা প্রস্তুত করা ফার্মের আর্কিটেক্টকে জিজ্ঞেস করে দেখেছিল। তিনি কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে বলেছিলেন—'হবে, এই দুটি পিলার না হলেও হবে।'

তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের যোগান দিয়েছে, আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, আজ সকালে আটটার সময় প্রথম খুঁটিটা পোঁতার জন্য গর্ত খোঁড়া হবে। মহিউদ্দিন এই লাইনে পূর্বপরিচিত একজনকে মোট পয়ষট্টি টাকা নগদ দিয়েছে, তা থেকেই খুঁটির গুঁড়িতে পোঁতার জন্য সোনা থেকে মাথায় মোড়ার জন্য শালুকাপড় কেনা হবে।

'কাজটা বন্ধ করে দেবে নাকি?'—সুমিত্রা একবার ভাবল। তার মনটা কেন জানি সায় দিচ্ছে না। কথাটা ভাল লাগেনি। এই মাটিটাতে ঘর বানাবে না কি? থাকার কথা ভাবলে তো সে কলোনির ঘরটাতে আরও চৌদ্দ পনেরো বছর থাকতে পারে। তার পরের কথাটা এখনও না ভাবলে চলে।

ছোট্ট পাখির সুরেলা একটা সুর তার কানে এসে বাজল। মাথাটা ঘুরিয়ে সে সিলিং আর দেওয়ালের সংযোগস্থলে তাকাল। একটু একটু আলো হয়ে এসেছে। সে উঠে পড়ল। পাঁচমিনিট পরে সে প্রভাকে ডাকল। প্রভাকে একবার ডাকলেই জেগে যায়। 'আমি ঘুরে আসছি। দরজাটা ভেতর থেকে লাগিয়ে রাখো।' বলে সে বেরিয়ে পড়ল। বাইরেটা কিছুটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। প্রভা, পাখি, আলো আর সুমিত্রার বাইরে কেউ জেগে ওঠে নি। শাড়ির সামনেটা গলায় পেঁচিয়ে নেবার মত শীত পড়েছে। দূরে ওটা আলো না কুয়াশা বোঝা যায় না। গেটের সামনে বড় বড় ঘাসে পা রাখতেই সুমিত্রা স্যাণ্ডেল থাকতেও টের পেল যে শিশির পড়েছে।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে প্রথমে তার জমিটার দিকে তাকাল। স্তূপীকৃত বালি, স্তূপীকৃত পাথর, কিছু লোহা, খুঁটির গাঁথনি, সাবি সারি করে রাখা ইটগুলি—সব শীতল হয়ে পড়ে আছে। তর্জার ঘরের ভেতরে বোধহয় মহিউদ্দিনের মানুষটা শুয়ে রয়েছে। ফুলতোলা লুঙ্গি আর গোলাপি রঙের রবারের পাম্প-শু পরা একটা মানুষকে দেখিয়ে মহিউদ্দিন গতকাল সুমিত্রাকে বলেছিল—ও আজ থেকে এখানেই থাকবে।

আর একটু আলো হলেই এগিয়ে যাওয়া ভাল হবে নাকি— তা ভেবে সুমিত্রা তার জমিটার সামনে রাখা রাস্তায় ধীরে ধীরে এদিক ওদিক করতে থাকল। ওদিকটাতে রেলিং দেওয়া বারান্দাটা হবে। বারান্দাটা থেকে দরজা দিয়ে ঢুকে গেলেই ওইটে তার বেশ বড়সড়ো শোবার ঘর। শোবার ঘরের পূবদিকের জানালাটার সামনে তার পড়ার টেবিলটা থাকবে। ওই ঘরটাতে বইয়ের আলমারিগুলিও থাকবে। সঙ্গে একটা ছোট (ম, সেখানে প্রভা ঘুমোবে। আওয়াজ দিলেই একজন আরেকজনকে কাছে পাবে। মাঝখানে ওটা বসার ঘর, তার ওদিকে পশ্চিমদিকে ওটা জিনিসপত্র রাখার ছোট স্টোর (ম। পথ থেকে ঘরের এ জায়গাটিতেই চোখ পড়বে। ছোট, পরিপাটি করে সাজানো ঘর। ভেতরে ক্লান্ত লাগলে বারান্দায় বেরিয়ে এসে বড় হেলান-চেয়ারটাতে—

ও হো। মহিলারা সামনের দিকে এভাবে এরকম চেয়ারে বসে না। আচ্ছা, নাহয় সাধারণ চেয়ারেই বসল, এখানে না বসে তার পড়ার চেয়ারেই না হয় বসল—কিন্তু এই ঘরটা। সুমিত্রা সামনের ঘরটার দিকে তাকাল। এই ঘরটা থেকেই সে কিছু(ণ আগে বেরিয়ে এসেছে।

দুই মাস আগে একদিন সে মহিউদ্দিনের সঙ্গে এখানটায় দাঁড়িয়ে ঘর বানানো সম্পর্কে প্রাথমিক কথাবার্তা বলেছিল। তখন জমিটাতে পরিচিত অপরিচিত বিভিন্ন ধরণের ছোট ছোট গাছ আর ঝোপ ছিল। ওর কথা বলা অবস্থাতেই একটা জীপ এস এই ঘরটার সামনে দাঁড়াল। ড্রাইভার গাড়িতে বসেছিল, আরোহী ঘরের বারান্দায় উঠে গিয়ে কলিংবেলের সুইচ টিপেছিল। জীপ থেকে নামার সময়ই লোকটি উৎসুক দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে তাকিয়েছিল। বারান্দার দরজাটা খোলার

অপে(ায় দাঁড়িয়ে থাকার সময়ও তাকিয়েছিল। ঘরটাতে কেউ ছিল না। কিছু(ণ পরে তা বুঝতে পেরে লোকটি জীপগাড়ির কাছে ফিরে এসেছিল। জীপে উঠতে গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর সুমিত্রাদের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন।

'নমস্কার, আমি নিরঞ্জন দত্ত। আপনি—'

'আমার নাম সুমিত্রা চৌধুরী—'

'বুঝেছি।' লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বলল। 'আমি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। আপনার সঙ্গে দেখাসা(াৎ হয় নি, কিন্তু আপনার কথা জানি।'

'কীভাবে? কী জানেন?' প্রশ্ন দুটি সুমিত্রার গলা পর্যন্ত উঠে এসে একটা জায়গায় আটকে গেল।

নিরঞ্জন পুনরায় আরম্ভ করলেন, 'আমি যখন এই জমিটা কিনি তখন খবর নিয়েছিলাম--এটা কার জমি? ভবিষ্যতে কে প্রতিবেশী হতে চলেছে সেটা জানার জন্য কৌতুহল থাকা খুবই স্বাভাবিক।'

নিরঞ্জন দত্ত আস্তে করে ভদ্রভাবে হাসলেন, তারপর বললেন, 'তখন কেউ আপনার বাবার কথা বলেছিলেন। তারপর যখন ঘরটা বানাতে শু(করি, তখন শুনলাম জমিটা আপনার নামে।'

'হ্যাঁ, বাবা জমিটা আমাকে দিয়েছেন।' সুমিত্রা শান্ত কণ্ঠে বললেন।

'ঘর বানাচ্ছেন নাকি?'

'দেখি, ভাবছি। ঘর বানানো নাকি বড় শক্ত(কাজ। চুল নাকি পেকে যায়।' হাস্কা একটা হাসি হেসে, অথচ গহীন সুরে সুমিত্র বললেন। হঠাৎ সুমিত্রার মত একজন মানুষের চুল পেকে যাবাব সম্ভাবনায় নিরঞ্জন দত্ত যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এর আগে কয়েকবার দেখা হওয়া মানুষকে বলার মত তিনি হালকা সুরে বললেন, 'না-না, এসব মানুষের কথার কথা মাত্র। আপনি তো শহরে হাজাব হাজার বাড়ি দেখেছেন। কিন্তু পাকাচুলওলা লোক আর কটা দেখেছেন?'

তারপর নিরঞ্জন দত্ত কথায় উৎসাহ আর অভয় মিশিয়ে বললেন—'কোন চিন্তা নেই, একবার আরম্ভ করলেই কাজ আপনা থেকেই এগিয়ে যাবে। কেবল মূল মানুষটা ঠিক হলেই হয়। আপনি তো লেবার কন্ট্রাক্টরকে দেবেন? এই নাকি ঠিকাদার? দত্ত মহিউদ্দিনের দিকে তাকালেন। মহিউদ্দিন হাতটা কপালে ঠেকিয়ে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। তারপর দত্তের কণ্ঠ একবাবে সরব হয়ে উঠল। সেদিনই সেখানেই ঠিক হয়ে গেল—কোন সাহায্যের দরকার হলে সুমিত্রা যেন দত্তকে জানাতে কুণ্ঠা বোধ না করে। দত্ত মানিব্যাগটা খুলে একটা কার্ড সুমিত্রার দিকে এগিয়ে দিলেন—তাতে তার টেলিফোন নম্বরটাও দেওয়া আছে। তিনি নিজেও ঠিকাদার মানুষ। বিশেষ করে সেতুব ঠিকাদার। অফিসের লোকেরা তাকে মজা করে সেতুবন্ধন করা মানুষ বলে ডাকে। সেতুর কাজ হলেও এই লোহালক্কড়, বালি সিমেন্টের সঙ্গে তার কারবার। তিনি নিজেই খবর নেবেন, তবু দরকার হলে সুমিত্রা যেন একটা ফোন করে। এই যে ড্রাইভারটা—ভরত, সেও তার সঙ্গে থাকতে থাকতে এসব কাজে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। সে-ও অনেক সাহায্য করতে পারবে।

তারপর একটা সময় কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল—সুমিত্রা সাত মাইল দূরে কলোনিতে থাকে। এত দূর থেকে ঘরের কাজ দেখতে আসাটাই তার প(বড় অসুবিধেজনক হবে। অথচ মাঝে মধ্যে খোঁজ না করলেও হবে না। প্রসঙ্গটার বেশিরভাগ কথাই দত্ত বললেন। অবশেষে কিছু একটা চিন্তা করে বললেন,—আরও দশদিন আগে আপনার সঙ্গে দেখা হলে খুব ভাল হত। এটা আমারই

চিন্তা করে বললেন,- -আরও দশদিন আগে আপনার সঙ্গে দেখা হলে খুব ভাল হত। এটা আমারই ঘর। শহরের গণ্ডগোল থেকে দূরে ছোট করে কটেজ টাইপের একটা ঘব বানানোর শখ ছিল, সেজনাই তৈরি করেছিলাম। এমনিতে ফেলে রাখার চেয়ে ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। তবে ভাড়াটিয়া এ মাসের শেষে যাবার কথা। তার সঙ্গে দেখা করার জন্যই এসেছিলাম। তিনি চলে যাবার পর আপনিই এই ঘরটিতে থাকলে নিজের ঘর বানানোর ব্যাপারে সুবিধে হত। কিন্তু গত সপ্তাহে আমার একজন বন্ধু ঘরটা খালি হচ্ছে জানতে পেরে আমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে, আমিও ঠিক আছে বলে দিয়েছি। ছিঃ একটা ভাল চান্স নষ্ট হয়ে গেল।' নিরঞ্জন দত্ত আক্ষেপ করলেন।

তার সাতদিন পবে একদিন নিরঞ্জন দত্ত সুমিত্রার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি তার বন্ধুর সঙ্গে কী একটা বন্দোবস্ত করে নিয়েছেন। ইচ্ছে হলে সুমিত্রা ঘরটা নিতে পারেন। সুমিত্রার নিজের ঘরের কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। ভাড়ার ব্যাপারে দত্ত একটা কথাও উচ্চারণ করলেন না। সুমিত্রার যা ইচ্ছে --।

কলোনি থেকে সুমিত্রার কলেজ চার মাইল, জমি থেকেও প্রায় ততটাই দূর। সেদিক থেকে নিরঞ্জন দত্তের ঘরটা ভাড়া নিয়ে থাকতে সুমিত্রার কোন অসুবিধে নেই, তাছাড়া সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ঘর তৈরির কাজটা তদারকি করতে পারা কম সুবিধের কথা নয়। তাই গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে সুমিত্রা এবং প্রভা এই বাড়িটাতে থাকতে এসেছে। নিরঞ্জন খবরাখবর নিচ্ছেন। গত সপ্তাহে মহিউদ্দিন এক নম্বর ইটের সমস্যায় পড়েছিল, দত্ত একটা স্লিপ দিয়ে তাকে এস. কে সিং-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেদিন বিকেলের দিকে দুই ট্রাক ইট সুমিত্রার বাড়িতে পৌঁছে গেল। অন্ধকারে ইটের রঙ চিনতে না পেরে, কিন্তু টংটং শব্দ শুনে কটেজের বারান্দা থেকে সুমিত্রার মত মানুষও যেন বুঝতে পারল --এক নম্বর ইট কাকে বলে।

চতুর্থদিন নিরঞ্জন দত্ত তার নিজের কাজের সাইটে এদিক দিয়ে যাবাব সময় জীপটা রেখে মহিউদ্দিনের কাছ থেকে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন, সিমেন্টের কী ব্যবস্থা হয়েছে জিজ্ঞেস করলেন, তারপর সুমিত্রার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করলেন- -ওকে যেখান-সেখান থেকে সিমেন্ট আনতে দেবেন না। পাঁচ বস্তার মত এনে কাজটা শুরু করুক, তারপর দেখা যাবে কী করা যেতে পারে। তারপর দত্ত সুমিত্রার অনুমতি নিয়ে পেছনদিকে বাইরে থেকে নিজেব ঘরটা দেখলেন। ঠিকই আছে। আগের ভাড়াটিয়া ঘরটা ভালভাবেই দেখাশোনা করেছিল। পেছনের বারান্দার মোড়ায় বসে ভরত প্রভার কাছে চেয়ে এক গ্লাস জল খাচ্ছিল, দত্ত পেছনে যেতেই সে উঠে দাঁড়াল।

নিরঞ্জন দত্ত হাতঘড়িটার দিকে তাকালেন। কিছুটা সময় হাতে আছে বলে তিনি সামনেব রুমটাতে একটু সময় বসলেন। সুমিত্রা বলার আগেই প্রভা তাকে এক কাপ চা দিল। পেছনের বারান্দায় ভরতকেও দিল। চায়ের কাপের চারভাগের তিনভাগ খেয়ে, চট করে বসার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নিরঞ্জন দত্ত বললেন,'আপনি ছেড়ে দেবার পর আমি আর ঘরটা কাউকে ভাড়া দেব না, বুঝেছেন। এমনিতেই পড়ে থাকবে। পাশে আপনারা থাকবেনই যখন চিন্তা কিসের? মাঝে মধ্যে দুই তিন দিন এসে কেবল শান্তিতে বসবাস করে যাব। কি বলেন?'

সুমিত্রা একটু দেরি করে একটু ম্লান হাসি হাসলেন। 'আসছি' বলে উজ্জ্বল একটা হাসি হেসে নিরঞ্জন দত্ত বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু পরের দিন বিকেলবেলা তিনি জীপ থেকে লাফ মেরে নেমে বড় বড় অস্থির পদক্ষেপে ঘবের বারান্দায় উঠে উত্তেজিত কণ্ঠে ডেকে বললেন, 'মিস চৌধুরী।'

প্রভা বেরিয়ে এল। দত্তকে হাসিমুখে বসতে বলে সে চট করে একবার রাস্তার জীপটার দিকে তাকাল, তারপর ভেতরে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ পরে সুমিত্রা বেরিয়ে এলেন। দত্ত সোজাসুজি আরম্ভ করলেন, 'আপনি তো বড় আশ্চর্য মানুষ। নিশি চৌধুরীর সঙ্গে আমি দুই বছর ওঠা-বসা করেছি, গতবার তার ছেলে ম্যাট্রিকে তিনটে লেটার দিয়ে পাশ করার পর তাঁর ঘরে নিমন্ত্রণ খেয়েছি, আপনি কেন বলেন নি আপনি নিশি চৌধুরীর বোন?'

সুমিত্রা একটু দেরিতে ম্লান হাসি একটা হাসলেন, তারপর বললেন, 'আমি তার দিদি হই। আপনার সঙ্গে যে তার পরিচয় আছে তা আমি কি করে জানব?' দত্ত সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আস্তে করে বললেন, 'দিদি হন। আপনি নিশ্চয় মজা করছেন।'

'কেন মজা করব।' সুমিত্রা শান্ত কণ্ঠে বললেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দত্ত যেন নিজেকেই শুনিয়ে বললেন, 'আশ্চর্য! বিশ্বাসই হয় না। তারপর তিনি সুমিত্রার চোখের দিকে তাকিয়ে শুধুমাত্র সুমিত্রাকে শুনিয়ে বললেন, সত্যি বলছি, কেউ বিশ্বাস করবে না। এমনকি আপনি ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়ে বললেও কেউ অবিশ্বাস করবে না।' কথাটা বলতে গিয়ে দত্তের মুখে রঙের আভা খেলে যায়।

তার জমির সামনেটাতে বার দশেক এদিক সেদিক ঘুরে সুমিত্রা বেড়ানোর জন্য এগিয়ে গেল। রাস্তাটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়, তারপর বাঁদিকে ঘুরেছে। এখন সেই বাঁকটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। কিছুটা দূর গিয়ে সুমিত্রা দেখল—ইলেকট্রিসিটির খুঁটি একটাতে তার দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের সমান একটা টিনের টুকরোয় বেঁধে রাখা আছে, তাতে লেখা রয়েছে—রত্নপুর পথ। তে-রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুমিত্রা দেখল—সেই রাস্তাটাও কিছুটা দূর গিয়ে বাঁদিকে ঘুরেছে। 'আজ এদিকে কি আছে দেখি তো' বলে সে রত্নপুরের পথে পা বাড়াল।

এখানটাতে বোধহয় কয়েকবছর আগে পর্যন্ত একটা প্রকাণ্ড মাঠ ছিল। বাড়ি আর পথঘাট দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এখানে-সেখানে কিছু গাছ ঘরের চালা পর্যন্ত উঠে গেছে। এই মানুষটার ঘরে দুটো নারকেল গাছ রয়েছে। এরাই বোধহয় এই অঞ্চলের পুরনো মানুষ। নিঃশব্দে নিস্তব্ধ ঘরগুলি দেখে হঠাৎ সুমিত্রার কেমন যেন ঘরের ভেতরগুলি দেখতে ইচ্ছে হল।

রূপক ভবন। এই ঘরে কে থাকে জান। রূপকই বা কার নাম? ছেলেটির নাম? ওইটেই শোবার ঘর হবে। ওখানে বোধহয় রূপকের মা-বাবা শুয়ে আছে। রূপক কোথায় শুয়েছে। এই ঘরের মানুষরা একটা ঘর বাড়িয়েছে। সামনে বালির স্তূপ পড়ে রয়েছে। বালির উপর শেফালী ফুল ঝরে পড়ছে।

বাঁ-দিকের বাড়িটার ভেতর থেকে মোটাসোটা একটা কুকুর সুমিত্রাকে দেখে ঘেউঘেউ করছে। সুমিত্রা গেটের লোহার ফাঁকগুলির দিকে তাকাল। না, পারবে না। কুকুরটা বেরিয়ে আসতে পারবে না। বাড়ির পেছন দিকে যাবার পথে, একটা লাইট জ্বলছে। নিরঞ্জন দত্ত এরকম একটা ঘরে থাকা মানুষ হতে পারে।

কী দুর্দান্ত মানুষ! লম্বা, সোজা দুটো সবল বাহু, ফর্সা মুখটায় রক্ত ফেটে পড়ছে বলে মনে হয়, কাপড়চোপড় ফিটফাট সুন্দর, হাসলে মুখে না কোথায় যেন—বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে বলে মনে হয়, কথা বললে মনোযোগ দিতেই হয়, উত্তর দেওয়া যায় না। সুমিত্রা এগিয়ে গেল। একটা ঘরের সামনের দিকে সিঁড়ির মাধ্যমে স্কুটার তোলার ব্যবস্থা রয়েছে। বারান্দায়, স্কুটারটা দাঁড় করানো রয়েছে। এই স্কুটারটা আজ একটা যুবক চালিয়ে যাবে কি? পেছনে বসে তার স্ত্রী, তাকে একটা হাতে

জড়িয়ে থাকবে কি? সেই মেয়েটিই একদিন তাকে এভাবে জড়িয়ে ধরবে বলে যুবকটি আগে কখনও ভেবেছিল কি? না কি সে অনেকদিন অন্য কোন মেয়ের কথা ভেবেছিল!

কি কষ্ট! না, কিসের কষ্ট?

সুমিত্রা এগিয়ে গিয়েছিল, একটা ঘরের সামনে এক গুচ্ছ ফুল দেখে সে থমকে দাঁড়াল, দু-পা পিছিয়ে এল। পাতাগুলিই লাল হয়ে ফুল হয়ে গেছে নাকি? ভাল লাগছে। এ ধরণের কিছু ফুল বাড়ির সামনের দিকে বুনতে হবে।

সুমিত্রা ভুলতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু কথাটা আবার তার মনে পড়ল। কষ্ট? কিসের কষ্ট? এখন আর কষ্ট বা সুখ বলতে কিছু নেই। এখন সুখ অর্জনের উপায় নেই। কেবল কষ্ট অর্জিত না হলেই হল।

ইলেকট্রিক তার থেকে একটা শালিখ নেমে এসে এক ঘর মানুষের বারান্দায় বসল। সুমিত্রা নিজের অজান্তেই এদিকে ওদিকে তাকাল---আরও একটা শালিক এদিক ওদিক আছে কিনা দেখার জন্য। এগুলি, ঠিক এগুলিই ছিল সেই আরম্ভের দিনের কথা। যখনই তিনি সকালে দুটো শালিব দেখবেন, সেদিনই তার দিনটি ভাল যাবে, মানে দিনটি তার বিপুলকে নিয়ে ভাল যাবে। হয়তো সেদিন বিপুলকে নিজের মনের মত করে পাবে, রাতে বিছানায় যেতেই আনন্দ আর শান্তিতে মনটা ভরে থাকবে। বাজে কথা। কে শিখিয়েছিল তাকে এই সমস্ত বাজে কথা? তারপর তো এরকম অনেকদিন পার হয়ে গেল---কয়েকটা রাতও পার হয়ে গেল---যেন সেই সমস্ত দিনগুলিতে সে সকালবেলা হাজার হাজার শালিক পাখি দেখেছিল। মিথ্যে কথা। সেই দিনগুলিতে তাদের শালিক পাখি দেখা দেয় নি, বিপুল তাকে দিয়েছিল, সে বিপুলকে দিয়েছিল।

একদিন বিপুল তাকে বলেছিল---কাউকে না জানিয়ে কোথাও দুদিন শান্তিতে থেকে আসি চল। হঠাৎ সুমিত্রার চোখে পড়ল---পাশের বাড়ির বাগানে একজন মহিলা বসে বসে কি সব করছে। সুমিত্রা এত ভোরে উঠবে বলে আশা করে নি। সামনে গিয়ে সে দেখল---একটু জমিতে কি শাক জন্মেছে, মহিলাটি শাকের থেকে আগাছা বেছে ফেলছে। সে-ও মহিলাটির দিকে তাকাল, মহিলাটিও তার দিকে তাকালেন। পুরনো মুগার মেখলা, রূপসী চাদর আর হলদে একটা ব্লাউজ পরা মহিলাটিকে সুন্দর, স্নেহময়ী একজন মায়ের মত মনে হচ্ছে।

সুমিত্রা এগিয়ে গেল। এই মহিলাটির মেয়ে সঙ্গের একটি মেয়ের বাড়িতে যাচ্ছি বলে বিপুলের মত একটি মানুষের সঙ্গে কোথাও গিয়ে দুদিন বাস করে এসেছিল না? তারপরে তার তিন মাস পরে একদিন সে চারপাশে অন্ধকার দেখেছিল না? নিজের শরীরের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা জন্মেছিল না? এক অবর্ণনীয় রক্তাক্ত যন্ত্রণায় তার দেহ-মন কাতর হয়ে পড়েছিল না? সেদিন থেকেই তার নিজের উপরে, সমগ্র পৃথিবীর উপরে বিতৃষ্ণা জন্মেছিল না?

দু'বার বাঁদিকে ঘুরে সুমিত্রা পুনরায় সেই লম্বা রাস্তাটায় উপস্থিত হল। সে দেখল---দূরে হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরা একটা লোক দৌড়ে চলেছে। দেখতে দেখতে মানুষটা অনেক দূরে চলে গেল। হঠাৎ সুমিত্রার এরকম মনে হল---ও যেন বিপুল পালাচ্ছে। ঘুমন্ত ঘরগুলির সামনে দিয়ে সুমিত্রা সোজা রাস্তাটা দিয়ে এগিয়ে চলল। বিপুল পালিয়ে যাবার পরে সে একটা বছর অসুস্থতার ভান করে ঘরেই পড়ে ছিল। সে বছরই সে জীবনকে নীরস করার, রুক্ষ করার পাঠ নিয়ে একদিন ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েছিল। অনেকদিন পরে, সে কলেজের চাকরি আরম্ভ করার দুই বছর পরে একদিন মা আর বাবা তার কাছে এসেছিল। 'এখন এভাবেই থাকবি নাকি?'---মা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

'এ সমস্ত প্রসঙ্গ ওঠাতে হলে আমার এখানে এসো না। আমি পছন্দ করি না।'---সুমিত্রা কড়া সুরে বলেছিল। তারপর তাবা আর কোনদিনই এই প্রসঙ্গ ওঠায় নি। মৃত্যুর আগে বাবা এই জমিটা আর পঁচাত্তর হাজার টাকা তাব নামে করে দিয়ে গিয়েছিল। সেই টাকাটা বোধহয় এখন দুই লাখ টাকার মত হয়েছে। অনেকদিন সুমিত্রা কোন খবর করেনি। ঘরটা বানানোর সময় প্রয়োজন হলে করবে। মাঝে মধ্যে বোনটা তার কাছে আসত। প্রথমে স্বামীর সঙ্গে, পরে একটা, দুটো তিনটে ছেলেমেয়ের সঙ্গে। সুমিত্রার পড়াশোনার কাজ থাকে, দুটো তিনটে ক্লাস থাকে। তার বড় বিরক্তি লাগে। বিশেষ করে বোনের বড় ছেলে দুটি বড় ফুল ছেঁড়ে। আজকার ওরা আসে না। সুমিত্রা নিজেই না-আসার সুবিধেটা করে দিয়েছে।

অনেকদিন পরে কখনও ভাই নিশি আসে। সে বেশিরভাগ সময়ই মনে মনে বসে থাকে, মাঝে মধ্যে দু-একটা কথায় সুমিত্রার ভালমন্দের খবর নেয়, এক কাপ চা খেয়ে চলে যায়। কয়েকমাস আগে সে আসার পর সুমিত্রা ঘর বানানোর কথা বলেছিল। কলোনিতে থাকতে তার ভাল লাগছে না। নিশি জিজ্ঞেস করেছিল, 'ঘরের প্ল্যানটা আমাদের অফিস থেকে করিয়ে আনব কি?'

সুমিত্রা বলল---'লাগবে না। এ সমস্ত কাজ করার অনেক ফার্ম আছে। পয়সা দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। ঘরোয়া কাজে ল্যাঠা বাড়ে।' কেউ তাকে বিনিপয়সায় সাহায্য করুক সুমিত্রা সেটা চায় না।

সাহায্য করতে এগিয়ে আসার মানুষের আর লেখাজোকা নেই। দার্জিলিঙ থেকে ভুটিযা কুকুরের বাচ্চা এনে দেওয়া থেকে শুরু করে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বেড়াতে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত- - গত সাতাশ বছরে দুই হাজারের মত সাহায্যকারী এগিয়ে এসেছিল নাকি। দিগন্ত নামে ফোর্থ ইয়ারের একজন ছাত্র এসেছিল---সুমিত্রা তাকে বাডিতে পড়ালে সে নাকি হোল লাইফ সুমিত্রাকে ভুলতে পারবে না। হোল লাইফ ভুলে না যাবার কথাটাকে বাদ দিয়ে সুমিত্রা তাকে পডানোর ব্যাপারটাতে কিছু গুরুত্ব দিয়েছিল।

কিন্তু সে ছিল একটা সাক্ষাৎ শয়তান। একদিন সন্ধ্যায় সে বলে কি---সুমিত্রা নাকি বড নীরস, শুকনো, কঠিন---

সুমিত্রা গর্জে উঠেছিল, 'হ্যাঁ আমি শুকনো, নীরস কঠিন, নিষ্ঠুর, নির্দয়---তুমি যাও।' তারপর থেকে বহুদিন সুমিত্রার ঘরের চালে ঢিল পড়তে শুরু করেছিল। সেই ছেলেটির জন্যই সুমিত্রা একসময় রিভলবার কেনার কথা ভেবেছিল। কেবল একটা সাহায্যের জন্য সুমিত্রা একজন মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ। লোকটি কলেজের চৌকিদার, বাবার বয়সী। লোকটি প্রভাকে এনে দিয়েছিল। প্রভার মা বাবা, ভাই-বোন কেউ নেই। সে মামার বাড়িতে থাকত। সুমিত্রা বুড়ো চৌকিদারকে বলেছিল- -'শোন, তুমি কুড়ি টাকা বেতনের কথা বলেছ, আমি পঁচিশ টাকাই দেব। মামার বাড়ির সামনের টাউনের ব্যাঙ্কে এই পঁচিশ টাকা দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে বলবে। মাসে মাসে সেই অ্যাকাউন্টে পয়সা জমা হতে থাকবে। ঘন ঘন পয়সার খোঁজে মানুষ আসতে থাকা, তাকে ঘরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা, এ সমস্ত আমি পছন্দ করি না।'

সেভাবেই কাজ হয়েছিল। সুমিত্রার সঙ্গে প্রভা এগারো বছর ধরে আছে। এখন সুমিত্রা ছাড়া প্রভা আর কাউকে জানে না। এখন প্রভা যে বয়সের, ঠিক সেই বয়সে সুমিত্রা শালিখের হিসেব আরম্ভ করে দিয়েছিল।

আরও কিছুটা হাঁটার পর সুমিত্রা দেখল--সেই ছোট হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরা মানুষটা দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে অতিক্রম করে যাবে। সুমিত্রা মাথা নীচু করে পথের কিনার দিয়ে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সাদা মোজা আর ক্যানভাস শু পরা পা দুটি তাকে অতিক্রম করে যেতে দেখল। একটা দুপ্‌দাপ্ শব্দ শোনা গেল। বড় স্বাস্থ্যবান পা। বড স্বাস্থ্যবান শব্দ। নিরঞ্জন দত্তের মত মানুষ দৌড়ালে এরকম শব্দ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

নিরঞ্জন দত্ত সুমিত্রাকে এখনও ইউনিভার্সিটিতে পড়তে থাকা মেয়ে বলে মনে করে? লোকটির ঘর-সংসার? না-না এসব খবরের কোন প্রয়োজন নেই। মানুষটার স্বাস্থ্যবান শরীর, চোখ, হাসি, কথা--সেই সঙ্গেই অনেক কিছুর আভাস ফুটে ওঠে। লোকটি সত্যি সত্যিই তার ঘরে মাঝে মধ্যে শান্তিতে দুই এক রাত কাটানোর জন্য আসবে নাকি? সন্ধ্যেবেলা নিজের ঘরের বারান্দায় শান্তিতে বসে থাকা সুমিত্রাকে মানুষটা তার বসার রুম থেকে জানালা দিয়ে হেসে হেসে বলবে নাকি?—'গুড ইভনিং মিস চৌধুরী। এক কাপ চা খাওয়াবেন না?'

আলো ফুটে উঠছে। দুই-একটা বাড়ির দরজা-জানালা খুলছে। শেষের পথটুকু সুমিত্রা দ্রুতবেগে চলল। নিরঞ্জন দত্তের বাড়ির বারান্দায় উঠতে তার গরম লাগল। প্রভাকে ডেকে দিয়ে সে শাড়ির আঁচলের সাহায্যে গলা আর মুখটা মুছে নিল। প্রভা দরজা খুলে দেবার পরে বারান্দায় একটা চেয়ার বের করে নিয়ে সুমিত্রা বসে রইল। অনেকক্ষণ।

মহিউদ্দিন তাড়াতাড়ি এল। তখন সুমিত্রা চা খাচ্ছিল। পেছনের বারান্দায় বসে মহিউদ্দিন চা খেল। সে চা খেয়ে উঠতেই সুমিত্রা ঘরের নকশা আঁকা কাগজটা নিয়ে তার কাছে গেল। 'একটা কাজ কর মহিউদ্দিন। এই কাগজটা উল্টে এদিক থেকে দেখলে ঘরটা যেরকম দেখায় সেভাবে বানাও। আজ সেভাবেই খুঁটি পুঁতবে।'

মহিউদ্দিন সুমিত্রার মুখের দিকে তাকাল। 'মানে এই বারান্দাটা, আমার পড়ার ঘর এখন পশ্চিমের দিকে পডবে। এই ছোট রুমটা পূবদিকে পডবে। সুমিত্রা ক্লাসে পড়া বোঝানোর মত করে পরিষ্কার সুরে বলল। মহিউদ্দিন চা খাওয়া বাসনগুলি নিতে এসে প্রভা কথাগুলি শুনছিল। কিছুক্ষণ পরে, বলব না বলব করে, আস্তে করে সে বলল, 'কিন্তু দিদি, ওদিকটাকে তো সামনে মস্ত বড় দালান রয়েছে। কিছুই দেখা যাবে না।' হ্যাঁ, সুমিত্রার জমির পশ্চিম সীমানায় সাত ফুট উঁচু দেয়াল একটা।

সুমিত্রা মহিউদ্দিনকে বলল, 'তুমি যাও। আয়োজন করগে।'

নিরঞ্জন দত্ত খুঁটি পোঁতা দেখতে আসার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ চীফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে সাইটে যেতে হওযায় আসতে পারল না। সে ভরতের হাতে দিয়ে কিছু মিষ্টি পাঠিয়েছিল। ভরত খুঁটি পোঁতার পরে চলে গেল।

বিকেল বেলা সুমিত্রা সামনের দিকের বারান্দায় চুপচাপ বসেছিল। এবার সে প্রভাকে কাছে ডাকল। বলল, 'এদিকে, এই জায়গাটায় ছোট রুমটা পড়বে তো, তুই তাতে থাকবি।'

রূপকথার সংলাপ

ভূমিধর তালুকদার

বেশ ভাল কুয়াশা পড়েছে। মনটাও সিক্ত হয়ে উঠেছে। ফসল ভাল হচ্ছে না, বুঝেছ। সব কিছুতেই নিঃস্বতা। বাসমতিটাও নিঃস্ব। রঞ্জিতও নিঃস্ব। মানুষের আর পথচলার উপায় নেই। দাদু ভাঙা কড়াইতে ছোট এক টুকরো বাঁশের গোড়া গুঁজে দিল। পায়ে যে স্যাণ্ডেল ছিল না। কি ছিল দাদু?

—এবার বড় ঠাণ্ডা পড়েছে, বুঝেছিস। এঁড়ির চাদরটাতেও শীত মানছে না। বান্দর টুপিটা ছোট জামাই কিনে দিয়েছে। বেশ গরম। পা আর মাথায় ঠাণ্ডা কম লাগছে। অসুবিধেটা পায়ের দিকটাতে। স্যাণ্ডেলজোড়া ক্ষয় হয়ে গেছে। ধুতিটাও ছোট। পা-দুটি যেন বরফ হয়ে যায়। বদনের বাবাকে যে সেই দাহ করতে নিয়ে গিয়েছিলাম, মনে আছে তোমার?

—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে।

—পা দুটি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। বরফের স্পর্শ বলে মনে হচ্ছিল। খড়ি দেবার সময় বেশ ঝামেলা হয়েছিল। আগুন জ্বলছিল না। এই জ্বলে তো এই নিভে যায়। আমার তো ভয় লেগে গেল, বুঝেছ। আধা পোড়া হলে তো মুশকিল।

—দাদু, একটা গল্প বলো না।

—একটু দাঁড়া। এক ছিলিম টেনে নিই আগে, তোর পরীক্ষা তাহলে শেষ হল।

—ভুলে গেলে নাকি দাদু। পরীক্ষা তো গতকালই শেষ হয়ে গেছে। তুমিই তো জিজ্ঞেস করেছিলে—'এলি। পরীক্ষা কেমন হয়েছে। তখন তুমি হুঁকো টানছিলে।

—ওহো, ভুলে যাই, বুঝেছিস।

—বল না দাদু।

—দাঁড়া আগুনটা নিভে গেছে। জ্বালিয়ে নিই, দাঁড়া।

—আগুনের আভায় জায়গাটা পুনরায় আলোকিত হয়ে ওঠে। কড়াইয়ের পাশে বসে নাতি, দাদু আর সঙ্গে লোকটির ছায়া স্পষ্টত নড়াচড়া না-করেই থাকে। আগুন পুনরায় ঠাণ্ডা হয়ে এলে নাতি হাত-পা নাড়ায়। হুঁকোর গুড়গুড় শব্দ বেরোয়। ঠিক এই সময়টিতে দাদু গল্প বলতে আরম্ভ করে।

বুড়োর গল্প। ঠাণ্ডায় কাঁপা বুড়োর গল্প। স্যাণ্ডেলবিহীন বুড়োর গল্প।

—ওহো, তুই কী বলতে বললি। বুড়োর গল্প। শুনেছ দাদা। ও বুড়োর গল্প শুনতে চাইছে। একবার হুঁকোটা দাও তো। টেনে দেখি। একদিন কী হল জানিস? গরুগুলো মাঠে নেই। মাঠে দড়ি বেঁধে রেখেছিলাম। সেখানে নেই। খুঁজলাম। খোঁয়াড়ে গিয়ে পেলাম। দশটাকা দিয়ে মুক্ত করলাম। ঘরে আনলাম। দানা দিলাম। বড় ছেলেটার মা কাঁদছে। মানে এর ঠাকুরমা। ছেলের বৌ ভাত দেবার সময় নাকি খারাপ ব্যবহার করেছিল।

—ইশ্, তুমি এভাবে বলছ ঠাকুরমা তো কাঁদছে না।

—তোরা দেখতে পাবি না। বুড়োরাই শুধু দেখতে পায়। দাদা তুমি দেখতে পাচ্ছ তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ পাচ্ছি।

—বড় ছেলে যখন আলাদা হয়ে যায় তখন দেখতে পেয়েছিলাম। আমি দেখতে পাব বলে মা পেছন ফিরে ছিল। আমি বলেছিলাম—কাঁদো, কাঁদো। মা হয়েছ যখন কাঁদো। আমারও চোখে জল এসে গিয়েছিল। বেরোয় না যে তা নয়। মা-কে আর কোথায় দেখাই। হলো না দেখানো। মা দুঃখ করেন, বড় দাদাকে জন্ম দিতে সাত দিন সাত রাত বিছানায় আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়েছিল। জন্মের সময় সে ছিল ক্ষীণকায়। মা যত্ন-আত্তি করে তাকে অন্যে কোলে নেবার মত উপযুক্ত করে তুলল। মায়ের আবার বুকে দুধ নেই। ডাক্তার বলেছেন যত পারো ছেলেকে বুকের দুধ খাওয়াবে। রাতের বেলা বড় ছেলে কাঁদে। মায়ের কষ্ট হয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমপাড়ানি গান শোনাতে হয়। রাত দুটোর সময় ঘুম ভেঙে গেলেও ঘুমপাড়ানি গান গাইতে হয়। মা ঘুমপাড়ানি গান গায়। কখনও বা আমাকেও গাইতে হয়। মা দুর্বল হয়ে পড়েন। বড় ছেলে বড় হয়। শক্ত সবল হয়। খেতে কষ্ট হবে বলে মা গায়ের চাদর কেনার টাকা থেকে একশ টাকা খরচ করে। বড় ছেলেকে হরলিক্স খাওয়ায়। সে বড় হয়। এখন আর মাকে চেনে না। আলাদা খায়। খোঁজখবরও করে না।

—দাদু, ঠাণ্ডায় কাঁপা বুড়ো লোকটার গল্প কই?

—দাঁড়া বলছি। এর ঠাকুরমা স্যাণ্ডেল পরার সুযোগই পেল না। মানে আমিও কোনদিন গুরুত্বই দিইনি। বড় ছেলে, ছেলের বৌ কেউ কোন গুরুত্ব দিল না। সকালবেলা মা স্নান করে। ঠাণ্ডায় পা-গুলি শক্ত হয়ে আসে। মা তাকে বলে না। ঠাণ্ডা লাগছে বলে বলে না।

দাদু একটু সময় অপেক্ষা করে আগুনটা দেখে নিল। দুটো বাঁশের গোড়া কড়াইটিতে চড়িয়ে দেয়। আগুনে ফুঁ দেয়। কিছুক্ষণের জন্য জায়গাটা আলোকিত হয়ে উঠল। তিনজনের অস্তিত্বই ক্ষণিকের জন্য আলো-ছায়ার মধ্যে আবার দেখা গেল।

—বিকেলের দিকে পা ধুয়ে এসে আমারটাই কিছুক্ষণের জন্য পরে। কষ্ট হলেও কিছু বলতেন না। হয়তো কিছু মনে করবে ভেবে বলত না। এখনও বুঝতে পারছি না। এই তুই ঠাণ্ডায় কাঁপা বুড়োর গল্প শুনবি? আচ্ছা দাদা, তুমি চলে যাবে না থাকবে?

—আচ্ছা থাকব। তুমি একে গল্প বলো তো।

—হ্যাঁ, কি হলো জানিস। সেবার তোর, ছেলেদের মধ্যেই জমি নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়ে গেল। ঝগড়া কিন্তু যেমন তেমন ঝগড়া নয়, দা-কুড়ুল নিয়ে ঝগড়া—সেটা তো আর চলতে দেওয়া

যায় না। বললাম, আমি থাকা পর্যন্ত জমির নামে হাহাকার করবি না। কাকে কোথায় দিতে হবে তা আমিই ঠিক করব। না, ওরা সেটা মানে না। ওদের মাটি চাই। কেবল মাটি। ঠাকুরমা কান্নাকাটি করল। বুড়ো সারা রাত জেগে রইল।

---কেন?

---ঘুম আসে না যে। বুড়োর কফটা বেড়ে গেল। একদিন সত্যি সত্যিই বড় ছেলে আর মেজ ছেলে জমি ভাগাভাগি করে নিল। মা-বাবার নামে জমি রাখার কথা তাদের মাথাতেই এল না। বুড়ো মনের দুঃখে ভাতই খেল না। সারা রাত ঘর ভেঙে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি চলতে লাগল।

---কেন নিল দাদু?

---নতুন জায়গায় নতুন ঘর বাঁধবে। পুরনো বেড়া, চালা-গুলিরও দরকার হয়। নিয়ে গেল।

--তুমি কিছু বললে না?

— বললাম, রাতে কষ্ট করার চেয়ে সকালে নিয়ে গেলেই তো ভাল হয়। আমার কথা শুনল না। নিয়ে গেল। নতুন ঘর বানাল। সকালবেলা দু-পাশটাই খোলা। দুটো ঘর ই নেই। ভিটে দুটি, তাতে বেড়ার ছালবাকলা উঠে যাওয়া মাটি, দুয়েকটা ঝরে পড়া কাঠিপড়ে রয়েছে। আমাকে দুজনেই ডাকল না। বুড়ো আর বুড়ি দুজনেই ছোট ঘরটার মধ্যে দুদিন বসে রইল। গ্রামের কেউ ঘটনাটিতে কোনরকম আগ্রহ দেখাল না। আমাকে ওরা নিজেদের বাবা বলে ভাবল না। মাকে মা বলে একবার ডাকল না। চলে গেল। তুই যে বলেছিলি, ঠাকুরমা কাঁদে না। সেদিনই কাঁদল, বুঝেছিস, বড় ছেলের যখন জণ্ডিস হয়েছিল তখন দিনরাত সেবাশুশ্রূষা করে নিজে অসুখ বাঁধিয়েছিল। ঠাকুরমা যে একটু ঝুঁকে হাঁটে, কেন জানিস?

---না, জানি না।

---বড় ছেলে, ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে স্নান করাতে কোমরের ব্যথা শুরু হয়। গোয়ালঘর সাফ করে করে কোমরে ব্যথার সূত্রপাত হয়। বড়ছেলের জ্বর হলে ঠাকুরমা মাথায় জল-পটি দিত। জ্বরের প্রকোপে ভুল বকলে তার পাশে শুয়ে পড়ত, বুঝেছিস। বড় হয়ে মাকে আর কোমরে মালিশ করল না। আমাকেও গালাগালি করে।

---দাদু, আগুনটা নিভে গেছে।

---ইশ্, নিভে গেল। দাঁড়া গোড়া একটু দিয়ে দিই। আগুন পুনরায় জ্বলে ওঠে। গোড়াগুলি টকটকে লাল অঙ্গার হয়ে ওঠে। উষ্ণতা নিতে নিতে দাদু পুনরায় ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকা বুড়োর গল্প শোনায়।

—কতটুকু পর্যন্ত বলেছিলাম? বাবাকে বাবা বলে ডাকে না। বৌ-এর কাছে আমার অজান্তে বলে—'বুড়ো আছে নাকি হে ঘরে? নিজের ছেলের কাছে তো আর কৈফিয়ৎ তলব করা যায় না। তার মধ্যে, সে আমার বড় ছেলে। আমাকে বললেও আমি কিছু বলি না তাকে। না বুঝেই বলছে বলে মনে করে নিই। জানিসই তো---বাবা ছেলেকে ভালোবাসে। নিজের ছেলে। দুঃখ পেলেও কিছু বলি না। —ও হ্যাঁ, তুই ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকা বুড়োর গল্প শুনবি। শোন।

—বুড়ো এখন বুড়ির সঙ্গে থাকে। ছেলে-ছেলের বৌ সঙ্গে থাকে না। দুজনেরই ঠাণ্ডায় গায়ে দেবার মত কাপড় নেই। ছেলেরাও দেয় না। অনেক বছরের পুরনো কম্বল আছে। বুড়ো রাতের বেলা ঠকঠক করে কাঁপে। বাঁশের বিছানায় পাশ ফিরে শুলে কম্বলটা কোঁচ খেয়ে যায়। বুড়ো খেয়ে-পরে বাঁচতে চায়।—দাদা, তুমি শুনছ তো?

—হ্যাঁ শুনছি, বলে যাও।

—জানিসই তো, পেটের ক্ষুধার চেয়ে পৃথিবীতে আর বড় কিছুই নেই। সেটা নিয়েই বুড়িব আপত্তি। ছেলে-ছেলের বৌ এদিকে তাকিয়েও দেখে না। কি আর করা যায়? একটা ঠেলা নিয়ে নিলাম। পুরনো ঠেলা। দেহে শক্তি থাকা পর্যন্ত টেনে যাব। বুড়ির জন্যে একজোড়া স্যাণ্ডেল কিনে দেবার সুযোগ খুঁজছি। ঠাণ্ডা লাগে তো। ঠেলা চালিয়ে যাচ্ছি। কষ্ট কিছু হয়। তবু টেনে চলি।

—দাদু, কাল তোমার ঠেলায় ওঠাবে?

—ওঠাবো। এত সকালে তোর মা তোকে আসতে দেবে তো?

—ইশ্, কেন দেবে না। আমি তোমার ঠেলায় উঠব বলে আসব।

—ইশ, দেবে না। আমি যে সকালবেলা বেরিয়ে যাই। তাড়াতাড়ি না এলে আমাকে পাবি না।

– বুড়োর গল্পটা বলো না।

—বলছি। শুনতে থাক তো। তারপর তোর হল কি, বুড়ো ভাঙা ঠেলাটাই চালাতে থাকে। মাল টানে। শ্বাসকষ্ট আর কাশি ক্লান্ত করে তোলে। উদাস হয়, খেতে শুতে কষ্ট পায়। তার মানে কি জানিস—বুড়ো নিঃসঙ্গ বোধ করে। মাঝে মাঝে মরাব কথাও ভাবে। বুড়ির কথা ভেবে মরতেও পারে না। বুড়োর কষ্ট হলেও সে কষ্টের কথা প্রকাশ করে না। বুড়িকে বলে না। ঠেলাটা খারাপ হয়ে যায়। পয়সা ধার করে মেরামত করে। বুড়ির স্যাণ্ডেল জোড়া আর আনা হয় না। ছেঁড়া স্যাণ্ডেলটাই দুজনে পরে। ছেঁড়া পুরনো কম্বল। ঠাণ্ডায় কাঁপে। কাশির প্রকোপ হলে কাশে। কাশতে কাশতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বুড়ি মালিশ করে। ছেলেদের তখন গালিগালাজ করে।

—দাদু, গল্পটা বলবে, না কি?

—বলছি দাঁড়া। বুড়ো ঠেলা চালানোর মত শরীরে আর জোর পায় না। এমনিতেই শ্বাসের রোগ থাকা অসুস্থ মানুষ।

—গাঁজার ছিলিম টানার জন্য শ্বাসকষ্টটা বেশি হয়তো, তাই কি দাদু?

—হতেও পারে। আগের চেয়ে বেশি হয়েছে। বুকটা টান মেরে ধরে। শ্বাসকষ্টের জন্য বুড়ো শুতে পারে না। বুড়ি পিঠে মালিশ করে দেয়, বুকে মালিশ করে দেয়। এই বুঝি বুড়োর কল্যাণে বুড়ির কপালের সিঁদুর মুছে যায়। দাদা হাসে, নাতি কিছুই বুঝতে না পেরে বুড়োর মুখের দিকে তাকায়। আগুন আবারো নিভে যায়। গোড়া পুড়ে গিয়ে অঙ্গার হয়ে যায়। পুনরায় গোড়া চাপিয়ে দেয়। কিছুটা আলো হয়। কড়াইর পাশে বসে থাকা তিনজনের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

—বুঝতে পারি নি দাদু।

—তার মানে, বুড়ি তোর বিধবা হওয়ার সময় হয়ে এল।

—বুড়োটা মরে নি নাকি দাদু?

—মরে নি। বেঁচে আছে। একদিন মরবে। তুমি কী বলছ দাদা? দুঃখ থেকে গেল বুঝেছ, মরার সময় ছেলেদের কাছে পাব না।

—সেটা তো হবেই। ভুলে যায়। আমাদের মেজটা শহরে গেল না। আমি মরলেও নাকি খড়ি দিতে আসবে না। এরা সব আঘাত না দিয়ে কথাই বলতে পারে না।

—ঠিকই বলেছ। তারপর বুড়োর অসুখ। বিছানাতেই পড়ে থাকে। খবর নেবার মত কেউ নেই। বড় ছেলে ঘরের সামনে দিয়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে যায়। সে বাপটা এখানো বেঁচে আছে কি

না তার খবর নেবারও প্রয়োজন অনুভব করে না। বৌমা একটু দুধ থাকলে এনে দাও। মৃত্যুর সময়ে শ্বশুরের প্রতি বৌমার মায়া-মমতা একটু বেশি হল বোধহয়। খেতে না চাইলেও জোর কবে খাওয়াবে। একটু খান তো। বুড়ো বেঁচে গেল। ভগবানের দয়াতেই হোক, দুধের কৃপাতেই হোক, বুড়ো বেঁচে গেল। দাড়ি কমা ছাড়াই বাঁচলেন। বিপদটা এল বাইরে ঘোরাঘুরির সময়। জল আনতে গিয়ে বাগানে পিছল খেয়ে পড়ল। ঘটি পড়ে রইল কোথায় আর মানুষটা রইল কোথায়? তুই হাসছিস!

—বুড়ো মানুষও পিছল খেয়ে পড়ে যায় দাদু? হা হা। বৃষ্টিতে আমরা যে পড়ে যাই।

—অ। তোদের বৃষ্টিতে পড়ে যাওয়া আলাদা। তোরা পড়লে বড় হয়ে যাস। বুড়োরা পড়লে ছোট হয়ে যায়।

—কেন?

—কোমরে ব্যথা পাওয়ায় উপুড় হয়ে যায়। বুড়ো ঠাণ্ডায় কাঁপে। বুড়ি ওদের নির্বংশ হওয়ার জন্য শাপ দেয়। শৈশবে ওদের কত নোংরা ঘেঁটেছি। আজ ওরা আমাদেরই আবর্জনা মনে করে। বুড়োরও চোখে জল আসে। বুড়ির দুঃখে কাঁদে।

—বুড়ো মানুষও কাঁদে দাদু?

—কখনও কখনও কাঁদে। বুকের মধ্যে হাহাকার জাগলে কাঁদে। বুড়ি গরম ভাতের সেঁক দেয়। কোমরে হলুদ বেটে লাগায়। ছেলেরা একবার দেখতে এল। ভাবল, বুড়ো মরে যাবার আগে একবার দেখে যাওয়া ভাল। গ্রামে-গঞ্জে নাহলে আবার বদনাম বেরোবে। লোকে বলবে—ছেলেরা বাবার চিকিৎসা করাল না। বড় ছেলে বাবাকে ডাকে। ডাক্তার ডাকাল। ঔষধ কিনে আনল। বুড়ো ঔষধ খেল। বৌমা আগের মত দুধ খাওয়াল। বুড়ো বাঁচল।

—বুড়ি কী করল দাদু?

—বুড়ি বুড়োকে পথ্য খাওয়ায়। ঔষধটা সময়মতো খেতে বলে। ভাত রান্না করে। মাঝেমধ্যে কাঁদে। বুড়ি কিছুটা বাইরের কথা জানে। ছেলেরা বুড়ির সঙ্গে কেন থাকে না সেটাও জানে। মাঝে মধ্যে দুঃখে গালিগালাজ করে। বুড়োকে ধরে বাইরে নিয়ে যায়, ফিরিয়ে আনে।

—দাদু, আগুনটা নিভে গেল।

—অ। দাঁড়া গোড়া দিচ্ছি।

—দাদু, গল্পটা বল না।

দাদু আগুনের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল। দাদু আবার আরম্ভ করল। তোর হল কি, বুড়োর সময় হয়ে এল। এই, তুই ভয় পাচ্ছিস নাকি?

—না দাদু, আমার ভয় লাগে না।

—খুব ভাল। শোন তাহলে। বুড়ো বারান্দার এক কোণে চুপ করে বসে থাকে। মাঝেমধ্যে হুঁকো টানে। যুবক-কালের কথা মনে করে। বড় ছেলে, ছোট ছেলেকে বড় করার কথা মনে করে। তাদের অভাব পূরণ করার জন্য জিনিস কিনতে না-পারার কথা ভাবে। বুড়ির স্যাণ্ডেল জোড়া কিনতে না-পারার কথা ভাবে। বুড়ি ছেলেদের জন্ম দেবার সময় কষ্টের কথা ভাবে। শ্বাসকষ্ট রোগটার কথা ভাবে। ওরা সঙ্গে থাকলে *ঠেলা-ঠেলি* না লাগার কথা ভাবে।

—তারপরে দাদু?

—তারপর বুড়ো বাঁশের গোড়ায় আগুন পোহায়। নাতিকে গল্প শোনায়। ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকা বুড়োর গল্প বলে। পাটের রশি দিয়ে ফিতে বেঁধে স্যাণ্ডেল পরা বুড়োর গল্প বলে। বুড়ো কাশে। হুঁকো টানে।

– দাদু, বুড়ো মরেছে না আছে?

—মরে নি। মরবে, দাঁড়া। বুড়ো কথা ভুলে যায়। চোখে কম দেখে। মাঝে মধ্যে চুপ করে বসে থাকে। দাঁড়া আগুনটা নিভে গেছে। বুড়োর বুকে সবসময় আগুন জ্বলতে থাকে। বাঁশের গোড়ার আগুন। গোড়া পুড়ে অঙ্গার হয়......।

—বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে দাদু?

—জ্বলে জ্বলে। তুই বড় হয়ে নে। তখন মা আর বাবাকে জিজ্ঞেস করবি। আগুন জ্বললে কী হয় জানিস? জানিস না। বুক থেকে আগুনটা উজিয়ে গলার দিকে এগিয়ে আসে। মনটা মরে যায়। নিজের উপরেই করুণা হয়। মনের কথা বলতে ইচ্ছে করলেও বলা যায় না। কাঁদতে চাইলেও কাঁদা যায় না। বুড়ো হয়ে যায়। বুড়ো হয়ে গেলে কাঁদতে কেন অসুবিধে....। বুকের আগুন চোখের জল শুকিয়ে ফেলে, বুঝেছিস। তখন কাঁদলেও চোখে জল আসে না। চোখের জল সব জমাট বেঁধে যায়। আগুন তো গলায়।

—দাঁড়া। আগুন নিভে যাচ্ছে। গোড়াটা দিচ্ছি। আগুন পুনরায় বেড়ে যায়। দাদু আর নাতির চেহারাটা আগুনের আলোতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পটা আরো একবার আরম্ভ হয়। বুড়ো আরম্ভ করে।

—তারপর বুড়োর গল্পটা জমাট বেঁধে যায়। জমাট বেঁধে শক্ত হয়। বুকের আগুন জ্বলে। জ্বলতে থাকে। জ্বলে অঙ্গার হয়। অঙ্গারগুলি দগদগে লাল হয়। বুড়ির কপালের সিঁদুরের মত লাল। বুড়ির কপালের ফোঁটার রঙ আঙ্গুলে লাগলে আঙ্গুল লাল হয়। অঙ্গার নাড়াচাড়া করলে আঙ্গুল পোড়ে। ফোস্কা পড়ে। ফোস্কা পড়লে টনটন করে। কাঁদতে চাইলেও কান্না আসে না। চোখের জল বেরোয় না। নিজের বিষণ্ণতার কথা বুড়িকে বিড়বিড় করে বলে—জানিস, ওরা দুঃখ দেবে ভাবি নি। এখন ভাবতে হচ্ছে। যখন বুকের আগুন অঙ্গার হয়ে গেছে। তুমিও বোঝ। দুঃখ করো না।

—দাদু, তুমি কাকে দুঃখ না করার জন্য বলছ?

—তোর, মানে গল্পটার বুড়ো বুড়িকে বলছে। বুড়ি বুঝেছে: এখন আর কাঁদে না। দুঃখও করে ন। গালিগালাজও করে না। বুড়ির স্যাণ্ডেলজোড়া পুরনো। বুড়োরও সেই একই। দুজনেরই ঠাণ্ডা লাগে, ঠাণ্ডায় কফ বাড়ে। কাশে। কাশতে কাশতে দুর্বল হয়।

—দাদু, বুড়োটা কোথায় থাকে?

—ঘরে।

—কোথায়?

—এই, তোর ওসব দিয়ে কী দরকার?

—বলনা দাদু, কোথায় থাকে?

—এই যে, তোর কাছে।

—কোথায়? এই যে? যাও, তুমি এমনি এমনি বলছ!

—এমনি কি বলব তোকে? দাঁড়া ফুঁ দিয়ে দিই। দুটো গোড়া গুঁজে দি, তার আলোতে দেখতে পাবি।

কাক, কাক, এবং কাক

•ভূপেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

ব্রুতা গার্ডেনের এক কোণে বসে একজন ভদ্রলোক ছুরি দিয়ে একটা তরমুজ ফালা করে কেটে খেতে খেতে বিকেলবেলায় উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ানো মানুষগুলির দিকে তাকিয়েছিল। সে সময়ে চশমা পরিহিত একজন যুবক হঠাৎ তার পাশে দাঁড়িয়ে দুই হাতে দেশলাইয়ের বাক্সে কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট খাওয়ার অঙ্গভঙ্গি করল, অর্থাৎ যদি দেশলাইয়ের বাক্স থেকে থাকে তাহলে কিছুক্ষণের জন্য সেটা ধার দেওযা যেতে পারে। ভদ্রলোক প্রথমে তার কথায় কোন গুরুত্ব দিলেন না। বিরক্তির সঙ্গে সামনের দিকে দেখিয়ে দিলেন। অর্থাৎ তিনি এখন তরমুজ খাচ্ছেন, বিরক্ত করবেন না। প্রয়োজন হলে অন্য কারো কাছ থেকে ধার করুন। লোকটির এ ধরণের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়ে, ক্রুদ্ধ হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে অশালীনভাবে বললেন--'যান যান, আপনার মত ভদ্রলোক অনেক দেখেছি, দেখতেই একেবারে ভব্যসভ্যের মত, কিন্তু সাধারণ সৌজন্যবোধটুকুও আজ পর্যন্ত শিখতে পারলেন না, অভদ্র কোথাকার! আপনার কাছ থেকে কি শোবার বিছানা চেয়েছি? সামান্য দেশলাইয়ের কাঠি একটা। সেটাও দিতে কেউ কৃপণতা করে? বাদ দিন। আপনার জিনিসে কোন দরকার নেই।' যুবক যে এতটা রেগে যেতে পারে, ভদ্রলোক ভাবতেই পারেন নি, তাই যখন যুবকটি পড়ে থাকা জুতো জোড়া নিয়ে সামনের ঘাসগুলির উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি কষিয়ে তাঁর সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করে সামনে থেকে চলে গেল তখন নিজেই তরমুজ চিবোনো বন্ধ করে নিজের বুড়ো আঙ্গুল মটকে মুখ দিয়ে একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ বের করলেন, 'চিট্ চিট্।

সামনে থেকে চলে যাওয়ায় যুবক তাঁর মুখের চিট চিট শব্দ বা আঙ্গুল মটকানোর শব্দও শুনতে পেল না। তাই ভদ্রলোক বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন—এই যে মিস্টার।

যুবক ঘুরে তাকাল।

তিনি তৎক্ষণাৎ সেদিকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। যুবক এগিয়ে এসে একেবারে তাব সামনে দাঁড়াল।

আপনি এত রাগ করছেন কেন? এই নিন দেশাইয়ের বাক্স--

সে বাক্সটা নিয়ে শার্টের উপরের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে দেখে প্যাকেটটা সম্পূর্ণ খালি, তাই ক্রুদ্ধ হয়ে সেটা দলা পাকিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেশলাই বাক্সটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল—'আমি বড় দুঃখিত মহাশয়, মিছেমিছি রাগারাগি হল, কিছু মনে করবেন না, খালি সিগারেটের একটা প্যাকেট নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, বলতেই পারি না। আসলে কখন যে কথার ফাঁকে বাক্সের সব ক'টি সিগারেট অফিসেব কলিগরা শেষ করে দিয়েছে টেরই পাইনি।

সেটাতে কিছু যায় আসে না। আমারও অনেকদিন এরকম হয়েছে। কখনও কখনও এভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সিগারেটের খালি প্যাকেট টেবিলে পড়ে থাকে, অথচ আমি ভুলে যাই যে ওটা খালি, আর সেই প্যাকেটটা থেকেই কখনও কখনও দপ্তবে আসা লোকদের সিগারেট দিতে যাই। লোকেরা বলে—আরে, এটা তো খালি প্যাকেট।

তবুও আমার প্যাকেটটা আগে দেখে নেয়া উচিত ছিল।

নিন, খান। আমি অবশ্য এখন খাব না, আগে ক্ষুধা, তারপরে নেশা, আমি অবশ্য নেশা কম করি। সে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে বাক্সটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে টানতে লাগল। পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্তায়মান, গাছের ডগাব পাতাগুলি হলদেটে হয়ে এসেছে। আলপথে মানুষের ভিড় বাড়ছে। হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি ক্রুতা গার্ডেন হয়ে সামনে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। যুবকটি প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটা কৃত্রিম হাসি হেসে সিগারেটের ধোঁয়া শূন্যে ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোকের দিতে তাকাল। ভদ্রলোকও এমনিতেই হেসে ফেললেন আর তরমুজ খেতে লাগলেন। প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য এখন আমার চেয়েও বেশি ভাল। কিন্তু আগে আমার মতই ছিল—এভাবে বলেই কুটিল হাসি হেসে সে দেশলাইয়ের বাক্সটা লোকটির দিকে এগিয়ে দিল।

তবে আমার স্বাস্থ্যের সঙ্গে পারবে না, প্রধামমন্ত্রীর থেকে আমার গায়ের রঙটা বেশি সুন্দর। ভদ্রলোকও এরকম বলে দুটো জিনিসই উপরের পকেটে রেখে দিয়ে পুনরায় ছুরি দিয়ে তরমুজ কাটতে লাগলেন। সত্যি সত্যিই সুন্দর। একেবারে লালটুস্। কিন্তু আমার আজকে মনটা ভাল নেই, তাই বিশেষ করে প্রাণ খুলে হাসতেও পারছি না। আসলে আজ ডিরেকটরের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছে। এদিকে মন খারাপ নিয়ে দুপুরের খাওয়াটাই হল না।

আপনার জীবিকা কি?

একটা কোম্পানিতে পাবলিক রিলেশনের কাজ করি।

আচ্ছা আচ্ছা, আপনার যদি আজ লাঞ্চ করা না হয়ে থাকে, তাহলে আমার কাছ থেকে একটু তরমুজই খান। আমি তো এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেবমাত্র ফলমূল খেয়েই থাকি। দিল্লিতে ফলমূল বেশ সস্তা।

যুবকের সিগারেট খাওয়া ইতিমধ্যে শেষ হয়ে এসেছিল।—

খাবেন নাকি? আমি অবশ্য মুখ লাগিয়ে খাইনি। ছুরি দিয়ে কেটে দিচ্ছি—(ভদ্রলোক বাকি তরমুজটা থেকে এক তৃতীয়াংশ কেটে দিলেন।)

তরমুজ টরমুজ এগুলি সব জলীয় জিনিস। আমার অবশ্য এ সমস্ত খেতে ভালো লাগে না। তবুও আপনি যখন নিজের হাতে দিচ্ছেন খেয়ে নিচ্ছি। (যুবকটি তরমুজ খেতে শুরু করল)।

ডিরেকটরের সঙ্গে মারপিট করেছেন নাকি?

না, তার ব্যবহারে আমি খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছি। তিনি আমাকে পছন্দ করেন না। অপছন্দের একটা লোকের সঙ্গে চাকরি করে আনন্দ কোথায়? তরমুজ চিবোতে চিবোতে যুবক বলল।

তিনি কি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন?

ঠিক, কথাটা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারছি না। মানে, ব্যাপারটা এরকমের। আজ সকালেই হঠাৎ আমার মা'কে মনে পড়ে গেল—

আপনার বাড়ি কোথায়?

সামনেই, আগ্রায়—

তারপরে?

সেজন্যই ভেবেছিলাম আর অফিস না গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। আগামীকাল ডিরেকটরকে খুব জ্বর এসেছিল বললেই হবে। সেই উদ্দেশ্যে পাবলিক বাসে উঠতে গিয়ে পথে নেমে মায়ের জন্য অল্প ভাল মিষ্টি নেবার জন্য মিষ্টির দোকানে ঢুকেছি। তখনি আয়নায় দেখি ডিরেকটরের প্রতিবিম্ব, ঠিক আমার পেছনেই। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়। তাঁকে দেখেই আমার সমস্ত উৎসাহ নিভে গেল আর রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তার মুখোমুখি হব না বলে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। তবুও তিনি আমার পেছন থেকে ডাকলেন—কি হে অচিন্ত্য, এগারোটা তো বাজতে চলল।' এরকম বাঁক ট্যারা প্রশ্ন শুনে ক্ষুণ্ণ হয়ে বুদ্ধি করে বললাম—'স্যার, আজ আবহাওয়া একটু মেঘলা হওয়ায় ঘুম থেকে উঠতে দেরি হওয়ার ফলে রুটি বানানোর সময় পাইনি, তাই এখানেই কিছু খেয়ে নিয়ে অফিস চলে যাব বলে ভাবছি।' আমার কথা শুনে হেসে আড়চোখে আমার দিকে একবার তাকালেন যদিও কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। প্রতিক্রিয়া না দেখে বড় চিন্তিত হলাম, আর সত্যি কথা বলতে গেলে ভেতরে ভেতরে কিছুটা ভয়ও পেয়ে গেলাম। প্রাইভেট কোম্পানি, যা খুশি ঘটতে পারে, অবশ্য সেরকম কিছু সম্ভাবনা নেই, আমাদের ইউনিয়ন বড় স্ট্রং। কিন্তু হলে কি হবে? আমার সঙ্গে ইউনিয়নের সেক্রেটারীর অহি-নকুল সম্পর্ক। শেষ পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটাকে স্থগিত রেখে তেত্রিশ নম্বর বাসে উঠে অফিসে পৌছলাম—যদিও মা'র মুখটা বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। অফিসে ঢুকে কাজেকর্মে মন না দিয়ে চেয়ারে বসে সময় কাটাতে লাগলাম। ভাবলাম, একবার ডিরেকটরকে ছুটির কথা বলে দেখব নাকি, কিন্তু বলতে গেলাম না। তাঁর ওপর আমার রাগটা হঠাৎ চড়চড় করে বেড়েই চলল।

তিনি কেন আপনাকে পছন্দ করেন না? ভদ্রলোক সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন।

জানি না—

তবুও, নিশ্চয় কারণ একটা রয়েছে।

অবশ্য, আমি না জানলেও অনেকে বলে—আমাকে দেখলেই নাকি তার মাথাটা কেমন করতে থাকে, এমনকি ঘৃণাও করে নাকি, বুঝতে পারি না কেন এরকম ঘৃণা করে। আমাকে দেখলে কি ঘৃণা হয়?

সে কথা আমি কীভাবে বলব ভাই, সেটা তো আপনার সমস্যা—

বুঝেছি, ঘৃণা করার আসল কারণটা। আমি যে বসের ঘরে ঢুকে তোষামোদ করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলি না। বেশিরভাগই কাজ-কর্ম না করে, এমনিতেই তার কাছে আড্ডা মারতে বসে থাকে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাইরে থেকে জর্দা-পান আনিয়ে ছাগলের মতো চিবুতে থাকবে আর যত সব অদরকারী কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালিয়ে যাবে এটা আমার কাছে একেবারে অসহ্য।

তারপর কি হল? ভদ্রলোক একই কথা পুনরাবৃত্তি করলেন—

এক ঘন্টা পরেই আমাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারী আমার কাছে এলেন আর আমি কেন অফিসে এসে এভাবে ভাবুকের মত বসে থাকি জিজ্ঞেস করলেন। সেক্রেটারীর ওপর আমার অনেকদিন থেকেই রাগ পুষে রাখা ছিল। তাই আমিও কায়দা করে বললাম—বোনাস দাও, মন ভাল হয়ে যাবে। সে আমার কথা শুনে হাসল। হাতের চুরুটটা টান মেরে নিয়ে কয়েকটা টান দিল আর তারপর কিছুটা ঠাট্টাব সঙ্গে জিজ্ঞেস করল—কেবল বোনাসের জন্যই, না অন্য কিছু? তার বলার ঢঙ দেখে আমার রাগটা আরো বেড়ে গেল। আমার রাগ হয়েছে বুঝতে তার অসুবিধে হল না। তাই সে অল্প পরে দেখা হবে বলে নির্লজ্জের মত হাসতে হাসতে আমারই দেওয়া সিগারেটটা ফুঁকতে ফুঁকতে বেরিয়ে গেল। তাকে আমি চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম—বোনাসটা এ মাসের শেষের দিকে পাওয়া যাবে কি? সে বলল—বলতে পারছি না। রাগের চোটে তাকে ডিরেকটরের চামচে বলে গালিও দিলাম। কিন্তু ওই নির্লজ্জটা আমার গালি শুনে কেবল হাসল। দশমিনিট পরে সে আমার কাছে ফিরে এল আর এক ধরণের সৌজন্যের অভিনয় করে একটা সিগারেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে খসখস করে কলম দিয়ে কাগজটিতে কি যেন লিখল। কী লিখল জানি না, অবশ্য জানার প্রয়োজনও অনুভব করলাম না। আমি সেই সুযোগে একপ্রকার অশ্লীল ভাষায় পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম—'বোনাস কখন হবে, দীপাবলি তো এসেই পড়ল।' সে কোন উত্তর না দিয়ে ক্রুদ্ধ চোখে আমার দিকে তাকাল। সেভাবে তাকানোয় আমিও তাকে গালাগালি দিতে লাগলাম। গালাগালিতে টিকতে না পেরে সেও দরজায় একটা লাথি বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার প্রত্যুত্তরে আমিও দরজায় একটা কষে লাথি ঝাড়লাম। অবশ্য বেরিয়ে যাওয়ায় ভালই হল, কারণ আমার রাগটা একেবারে ব্রহ্মতালুতে গিয়ে পৌঁছেছিল, থাকলে হয়তো মারপিট লেগে যেত। কিন্তু সে বেরিয়ে যেতেই পুনরায় মা'র মুখটা মনে পড়তে লাগল। আমার অফিস থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হল। ভাবলাম, কোন কারণে যদি আজ কোন মন্ত্রী টন্ত্রীর মৃত্যু হতো তাতে অন্তত হাফ ছুটিটা একেবারে নিশ্চিত ছিল আর তার ফলে মায়ের কাছে যাওয়ার আর কোন বাধাই থাকত না।

(নৈঃশব্দ)। (যুবকটি ভদ্রলোকের কাছে চলে এল)।

হঠাৎ কি হল জানেন, একটা ঘটনা ঘটে গেল। যেন আমার জন্যই ঘটনাটা অপেক্ষা করছিল। আমার অফিস ঘরের সেই কোণটিতে একটা স্টিলের আলমারি ছিল। আলমারিটার পেছন দিকে ছিল একটা পুরনো কাগজে ভরা বাস্কেট। আমি কিন্তু সেই বাস্কেটের অস্তিত্বের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। এমন সময় শুনলাম একটা চড়াই পাখির শব্দ। আমি কিন্তু প্রথমবার ব্যাপারটিতে একেবারেই আমল দিই নি, কিন্তু পুনরায় যখন চড়াই পাখির শব্দ শুনতে পেলাম, তখন সেই শব্দটা ঠিক কোন জায়গাটাতে হতে পারে তাই একবার অনুমান করে দেখতে চাইছিলাম। চেয়ারটা থেকে উঠে এদিক ওদিকে নিচু হয়ে খুঁজে দেখলাম। প্রথমে কিছুই দেখতে পাইনি কিন্তু তার পরেই একটা বিড়ালের লেজ দেখতে পেলাম বলে মনে হল। সত্যি-সত্যিই একটা বিড়াল এসে দরজার সামনে আমার দিকে তাকিয়ে লেজ মেলে বসে রয়েছে। সাধারণত অফিসে এরকম বিড়াল দেখা যায়না কিন্তু। এদিকে টেবিলে আমার একটুও মন বসছে না। কী করব, কী করব না এরকম একটা অস্বস্তিতে ভুগছিলাম। কিছুই খুঁজে না পেয়ে কিছু সময় বিড়ালের চোখ দুটির দিকেই তাকিয়ে রইলাম। বিড়ালের চোখে শিরশিরে দৃষ্টি। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল বিড়ালটি যেন আমাকে উপহাস করছে। বিড়ালের উপর আমার রাগ হল আর রাগে দিশেহারা হয়ে টেবিল থেকে একটা কাগজ নিয়ে সেটাকে গোল্লা পাকিয়ে

বিড়ালটার দিকে ছুঁড়ে মারলাম। বিড়ালটা মিউ মিউ কবতে করতে চলে গেল। ইতিমধ্যে আমি বাইরে কয়েকটা কাকের কর্কশ রব শুনতে পাচ্ছিলাম, ভেবেছিলাম কাক তো সবসময় এমনিতেই চিৎকার করে, তাই স্বভাববশত আজও চিৎকার করছে। কিন্তু কাকের চিৎকার ক্রমশ বেড়েই চলেছে বলে মনে হল। বিল্ডিংটার চারপাশে দলে দলে কাক আর তাদের কর্কশ শব্দ, একটা বিরক্তির আভাস, একটা অস্বস্তির আভাস---বাইরে কি হচ্ছে দেখার জন্য আমি তৎক্ষণাৎ জানালার পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম, যদিও চমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। জানালা দিয়ে একটা কাক উড়ে এসে আমার টেবিলটার উপর বসে ঘরের এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। টেবিলের ওপর তার পায়ের ধারালো নখের আঁচড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কাকের ঠোঁট, অনুসন্ধিৎসু চোখ এবং নখের আঁচড়ের শব্দকে সহজভাবে নিতে পারলাম না। বারবার একটা কথাই মনে হচ্ছিল---আজ এই অস্বাভাবিক আচরণ কেন। কাকটার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ভয়ভয় করতে লাগল। সেই ভয়টা কেন নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম।

দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম আর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গ্রাউণ্ডফ্লোরের দিকে থাকা ডিরেকটরের রুমটার দিকে তাকালাম। নিচে একদল মানুষ। ডিরেকটরের পাশে ষ্টেনো, আরও কয়েকজন সিনিয়র অফিসার। ডিকেটরের ব্যক্তিগত পিয়নটা চিৎকার করে বলছে---সেই গাছটার চূড়ায় থাকা অনেক দিনের পুরনো কাকের বাসাটা নাকি এইমাত্র ভেঙে ফেলায় কাকেরা রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

তার কথা শুনে ডিরেকটর ষ্টেনোর সঙ্গে ঘরে ঢুকে গেল। বোধহয় তিনি ডিকটেশন দিতে শুরু করেছেন। কমপিউটার অপারেটরও প্রোগ্রামারের সঙ্গে তারপরই চলে গেলেন। কিন্তু কাকের শব্দ বন্ধ হল না। ক্রমশ কাকের সংখ্যা বেড়েই চলল। চৌকিদার মাটির ঢিল যোগাড় করছে। ঢিল খেয়ে ভয়ে কাকগুলি উড়ে পালাচ্ছে কিন্তু আবার পরমুহূর্তেই ফিরে আসছে। দেখলাম, ডিরেকটার আবার বিরক্তমুখে বেরিয়ে আসছে। তার বিরক্তিতে বাকিদের মুখেও বিরক্তির ভাব ফুটে উঠেছে। তার মধ্যেই তাদের মুখে কিছুটা হাসির আভাস দেখা গেল।

এত বড় কাকের বাসা যে থাকতে পারে তা নাকি তার কল্পনারই অতীত ছিল---ডিরেকটার বললেন। বাকিদেরও কথার সুর একই রকম শোনা গেল। সত্যি সত্যিই তাদের কাকের বাসা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা যেন ডিরেকটারের মতই। কিন্তু বাকিরা সবাই তার সঙ্গে সুর মেলানোয় যেন ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছেন এভাবেই চৌকিদারকে ডেকে পাঠালেন---এদিকে আয়। সে ভয়ে ভয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল। তোরা সব কি করছিলি? সাবধান, আর কোনদিন এরকম হলে কিন্তু চাকরি থাকবে না। চৌকিদার ভয়ে হাত দুটি পেছনে রেখে মাথাটা নিচু করে তোতলাতে লাগল। তারপর দেখি ও মা, এতো আমাদের একজন অফিসার। তিনি কাকের বাসাটা হাত দিয়ে ধরে ডিরেকটারের ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসতে যেতেই রাগে উত্তেজিত হয়ে একটা কাক তার মাথায় একগুচ্ছ চুল ঠোকর দিয়ে নিয়ে পালাল। ভয়ে লোকটি 'মরে গেলাম, মরে গেলাম' বলে বারান্দা দিয়ে পালাতে লাগল। বাকিরাও পালাল।

তারপর? ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

কী আর হবে? আরও একজন আবার মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে কাকের বাসাটা ফেলার জন্য এগিয়ে এল। আসলে আর কিছুই নয়---এর দ্বারা ডিরেকটারের কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। কিন্তু পেছন থেকে যখন একজন কেউ কাক চোখ খুবলে নিয়ে যাবে বলে ভয় দেখাল তখন তিনি থমকে গেলেন।

আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

তিনতলার ব্যালকনিতে।

তারপর কী হল? আপনার রুমটিতে আর কেউ নেই নাকি?

আছে, আমরা পাঁচজন। বাকিরা একটা কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের ডেপুটেশনে গেছে, তাই গত একমাস ধরে আমি একা। আবার আমি রুমটিতে ঢুকলাম আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে পা দুটো চেয়ারের ওপরে তুলে দিয়ে কিছুটা আরামের ভঙ্গিতে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। দেখতে দেখতে মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল, আসলে বারবার মা'র মুখটা মনে পড়ছিল। এভাবে সিগারেট টানার সময় আলমারিটার পেছনে পুনরায় খপখপ আওয়াজ শুনতে পেলাম। এবার কিন্তু তক্ষুণি আলমারিটার পেছনের সংকীর্ণ পথটুকু দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম। গিয়েই একটা দৃশ্য দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলাম আর ঘটনাটা কীভাবে ঘটল তাই ভাবতে লাগলাম।

কী দেখতে পেলেন?

তিনটে কাকের বাচ্চা। ভালভাবে পাখা গজায় নি। মানে ডিম ফেটে বেরনোর হয়ত এক সপ্তাহও হয়নি। উড়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। বোধহয় কেউ ওদের বাসাটা ভেঙে দেবার পর মা বাচ্চাগুলিকে কোনভাবে এনে আমাদের সেই ঘরের বিমের ওপর রেখেছিল। সেখান থেকেই হয়তো বাচ্চাগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে এসে একটা একটা করে পুরনো কাগজে ভরা বেতের বাক্সটিতে ঢুকে পড়েছে। না হলে, মাও সেখান থেকে ঠোঁটে করে কামড়ে কামড়ে এনে পুরনো কাগজের সেই বাক্সটিতে সুরক্ষিত জায়গা ভেবে বসিয়ে রেখেছে। ব্যাপারটা অনেকদিক থেকেই চিন্তা করা যায়, ভাবাটাই সার, কিন্তু কাকের বাচ্চাগুলি কীভাবে সেখানে গিয়ে পৌঁছাল সেটা এখনও রহস্য রয়েই গেছে। যাই হোক না কেন, আমার মনটা আরও বেশি কুটিল হয়ে উঠল। কাকের বাচ্চাগুলিকে নিয়ে একটা কুবুদ্ধি মাথায় এল। যদি আমি এখান থেকে একটা কাকের বাচ্চা ছুঁড়ে ফেলি তাহলে তো সোজা গিয়ে ডিরেকটরের ঘরের কাছেই পড়বে। আর তখন চারপাশে হৈ-চৈ করতে থাকা শত শত কাক এসে বাচ্চাটিকে ঘিরে ধরবে। তিনতলার ব্যালকনি থেকে ফেলে দিলে যে বাচ্চাটা মরে যাবে তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। শেষ পর্যন্ত তাই হল, কাকের বাচ্চাটার মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল। একটা একটা করে শেষে এতগুলি কাক জমা হল যে গণনা করাই অসম্ভব হয়ে উঠল। ডিরেকটারের ঘরের সামনের সবুজ লনটা কালো হয়ে উঠল।

আপনি আগের জায়গাতেই অপেক্ষা করছিলেন নাকি?

ওহো, কেউ সন্দেহ করতে পারে ভেবে আমি আর সেখানে দাঁড়াই নি।

কোথায় গিয়েছিলেন?

ক্যান্টিনে। সেখানে আমাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারী কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে কি যেন আলোচনা করছিল। আমি গিয়েই সেক্রেটারীকে বললাম, কাকের উৎপাতে টেকা যাচ্ছে না, আজ অফিসে এসেই এ সমস্ত দেখে কাজ কবার মুড চলে গেছে, চল আমরা সবাই মিলে আজ হাফ-ডে ছুটি দেবার জন্য অনুরোধ করি—

এই সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া কি?

সেটা বুঝতে পারা বড় মুস্কিল। এমনকি আমি যখন হাফ ছুটি দেবার কথা উত্থাপন করলাম সে এভাবে হাসল যে মনে হল ক্যান্টিনটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। প্রথমে সে তার সেই চিরাচরিত স্টাইলটা নিয়ে জিজ্ঞেস করল—'হাফ নিয়ে কোথায় যাবে?' আমারও রাগ উঠেই ছিল, বলে দিলাম,

'সেটাতে তোর কী দরকার?' সে আমার কাছ থেকে এ ধরণের উত্তর পাবে বলে আশা করেনি। তাই চিন্তিত হল, কী করবে? তবুও সে তার নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার ভয়ে কিছুটা মুখ ভেঙচে বলল—'বাঃ কি মধুর উদ্দেশ্য। কাকের উৎপাতে থাকতে না পেরে কর্মীর দ্বারা বিক্ষোভ প্রদর্শন। আগামীকাল সকালবেলার খবরের কাগজের জন্যও এক মজার খবর। এ ধরণের ঘটনা পৃথিবীতে আর কখনও ঘটেনি বলে বোধহয় তুই এটা ঘটাতে চাইছিস্? এই ঘটনা তখন আর সাধারণ হয়ে থাকবে না। সেটা ইতিহাস হয়ে যাবে, তুই কি ইতিহাস করতে চাইছিস্? তার কথায় বাকি সবাই হো-হো করে হেসে ওঠায় আমি বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে কী ঘটছে দেখার জন্য মৃত কাকটার কাছে পৌছতেই পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, ডিরেকটার যেন বিরক্ত। তিনি যেন তখুনি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবেন।

আমার পাশ দিয়েই গটগট শব্দ করে চলে গেলেন আর তাড়াতাড়ি করে গাড়িতে বসে জানালার কাচগুলি উঠিয়ে দিলেন। তখনি স্টেনোও কাগজপত্র সামলে দ্রুত গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিল। বিপরীত দিক থেকে মেহতা আসছিলেন। ডিরেকটার গাড়ির দরজা জানালা বন্ধ করে ভেতরে বসে কী করছে তা তার জানার খুব ইচ্ছে হল।

শব্দ বন্ধ করে তিনি স্টেনোকে ডিকটেশন দিচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন না কাকের কী উৎপাত। .....একথা বলেই তিনিও ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। যা ভেবেছিলাম তা না হওয়ায় বড় হতাশ হয়ে পুনরায় নিজের রুমে গিয়ে জমানো কাজগুলি বের করে নিলাম। কিন্তু তাতে মন বসল না। কেমন যেন অসার বলে মনে হতে লাগল— যেন পৃথিবীটা আনন্দহীন এক বন্দীশালা মাত্র। তবুও মনে মনে একটা আশা কী জানি হয়তো কোন একটা পরিবর্তন হবে। একথা ভেবেই এবার বাকি কাকের বাচ্চা দুটি গাড়ির সামনের দিকে ছুঁড়ে দিলাম যাতে বুকে ধাক্কা লেগে দুটো বাচ্চাই মরে যায়। কিন্তু তারপরে আমি আর মুহূর্তের জন্যও সেখানে দাঁড়ালাম না। তখুনি আমার ঘরে ঢুকে এমনভাবে অভিনয় করলাম যেন আমি কখন থেকেই কাজের মধ্যে ডুবে রয়েছি। মনে মনে তবু ভয় কে জানে, কেউ হয়তো আমার দুষ্কার্য দেখতে পেয়েছে। বসে থাকতে পারলাম না, প্রতিক্রিয়া জানতে ইচ্ছে হল। বেরিয়ে এসে দেখি ডিরেকটারের সাদা মারুতিটার ওপরে অজস্র কাক। কাকের বাচ্চা দুটি এখনও মরে নি। কিন্তু দেখলাম গাড়িটা অফিস থেকে বেরিয়ে রাজপথে উঠেছে। মনটা কিছুটা শান্ত হল। এটা ঠিক, আজ আর ডিরেকটার ফিরে আসবে না।

ডিরেকটার যখন চলে গেছে তখন আর আমাকে পায় কে! নিজেও বেরিয়ে এলাম। তবুও মনে মনে ভয়, কে জানে কেউ হয়তো আমার দুষ্কার্যের কথা চুপিচুপি ডিরেকটারকে বলে দেয়—

ভদ্রলোক মজা করে বললেন, যদি আমি বলে দিই তখন?

যুবক হাসল। ঠিক সেই সময় ফলবিক্রেতা এক টুকরি আঙুর নিয়ে তার সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি তাকে ডাকলেন। ফলবিক্রেতা সামনে এসে দাঁড়াল। তিনি তাকে আঙুরের দাম জিজ্ঞেস করলেন।

আমি তাহলে যাই, দিল্লি প্যাসেঞ্জারটা এখনও গেলে পেয়ে যাব। চারঘন্টার ভেতর যখন কোন চিন্তা নেই। এখন গিয়ে সকালবেলা এসে আবার অফিস করতে পারব।

আঙুর খাবেন না নাকি?

আমি তো বলেছিই, এসব ফলটল আমার ভালো লাগে না, আমাকে যাবার অনুমতি দিন-

আচ্ছা, তাহলে আসুন। আবার কোথাও কখনও দেখা হবে।

'কিছু মনে করবেন না। আমি আমাব দুর্ব্যবহাবের জন্য ক্ষমা চাইছি।' একথা বলেই যুবক চলে গেল। যুবক চলে যাবার পরেই ভদ্রলোক ফলবিক্রেতার কাছ থেকে একটা আঙুর নিয়ে জিহ্বায় ঠেকিয়ে মিষ্টি না টক পরীক্ষা করলেন। কিছুক্ষণ জিহ্বায় রেখে ভেতরের রসটা তালু দিয়ে চেপে চেপে উপভোগ করতে করতে ফলবিক্রেতাকে আড়াইশো গ্রাম আঙুব ওজন করতে বললেন। ফলবিক্রেতা আঙুরটা ওজন করে কাগজ দিয়ে একটা শঙ্কু তৈরী করে তাব মধ্যে আঙুরটা ভদ্রলোকের হাতে দিল।

কিন্তু ভদ্রলোক পকেটে হাত ঢুকিয়েই বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজেব মনেই পাগলের মত প্রলাপ বকতে লাগলেন—তাহলে আজ ফ্রডেব হাতে পডলাম?

ফলবিক্রেতাও উঠে পড়ল। সামনেই গল্প কবতে থাকা দুই একজন মানুষও এগিয়ে এলেন।

আমার কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল -

যখন কাকটা আপনার কাছ থেকে উঠে গেল

কাক, কোথায় কাক?

ওকে আমরা কাক বলেই জানি। মানে আপনার কাছে বসে থাকা লোকটি - এখনও বুঝতে পারছেন না সাহেব?

ওহো, একেবাবেই বুঝতে পারিনি।

ও একটা পকেটমাব। অনেক ভেণ্ডাবই তাকে চেনে।

না, ও একটা কোম্পানির পাব্লিক রিলেশন অফিসাব

আপনি কি জিজ্ঞেস করেছিলেন কোন কোম্পানিতে চাকরি করে?

অবশ্য সেটা জিজ্ঞেস কবা হয়নি--

সে সবাইকে এরকমই বলে। আপনাব কাছে কি দেশলাইয়েব বাক্স চেযেছিল?

হ্যাঁ, চেয়েছিল—

তার হাতে একটা খালি সিগারেটের বাক্স ছিল কি?

হ্যাঁ, তাই তো।

তাহলে ধরে নিন আপনার মানিব্যাগটা সে-ই হাতসাফাই করেছে।

তুই ওর ঘর চিনিস?

ক্ষমা করবেন সাহেব। আমি তাকে কাক বলেই জানি, তার বাইরে আমি আব কিছুই জানি না। আর এখন আপনি তাকে ধরতেও পারবেন না।

কারণ?

সে যে আপনার মানিব্যাগ নিয়েছে তার কি প্রমাণ আছে আপনার কাছে?

একেবারেই নেই, মাত্র সন্দেহে।

কেউ আপনার কাছে বসলেই তাকে কাক বলে ধরে নেবেন?

সেটাও অবশ্যি সত্যি কথা—

কিন্তু মানিব্যাগটা সে-ই নিয়েছে! ফলবিক্রেতা আবার বলল।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী

মহিম বরা

ট্রেন তখনও এসে পৌঁছায় নি। সিগন্যাল পড়েছে। নিতাই স্টেশনের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ধীরে ধীরে পায়ে হেঁটে যাওয়া আসা করছে। স্টেশনটাকে সম্পূর্ণ নতুন মনে হচ্ছে তার। এই দুই বছরের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। ঈশান কোণের রেলপথটার ওদিকের সেই জায়গাটা ছোটখাটো একটা জঙ্গল হয়ে পড়েছিল। এখন লম্বা লম্বা মিলিটারি ব্যারাকে রঙচঙে হয়ে উঠেছে। সেগুলি শ্রমিকদের জন্য নতুন করে বানানো ঘর। তার ওদিকটায় একটা কারখানা— নতুন করে তৈরি। মোটামুটি যুদ্ধের এই দুটি বছরে ভালভাবেই পরিবর্তন হয়েছে। স্টেশনে যাত্রীদের প্রচণ্ড ঠেলাধাক্কা। টিকিট কাটার জন্য ছোটখাটো একটা যুদ্ধের কলাকৌশল প্রয়োগ করতে হয়।

কারো সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে কথা বলার জন্য তার ইচ্ছে হল, কিন্তু পরিচিত মুখ একটিও নেই। নতুন করে পরিচিত হয়ে কথা বলার জন্যও লোকগুলি যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করে। প্রত্যেকেই যেন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, অবসর নেই— সময় নেই। প্রত্যেকের পরনে মেটেরঙের জিনসের স্যুট আর মুখে সিগারেট। পায়ে ভারি বুটজুতো আর ডবল মোজা। মুখগুলি এত গম্ভীর- —কথা বলতেও ভয় হয়। প্রত্যেকেই একবার করে তার মলিন পোষাকটার দিকে চোখ বুলিয়ে গেছে। 'বিয়াল্লিশের জেল খাটা কর্মী'— তার সম্পর্কে সংক্ষেপে এতটুকুই কল্পনা করে নিয়ে প্রত্যেকে আবার নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। কেউ এসে উপযাচক হয়ে কথা বলেনি— বা তার সম্পর্কে জানার কোন আগ্রহও দেখা গেল না। নিত্যের মনে পড়ল দু'বছর আগের সেই উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলির কথা। গ্রামে গঞ্জে কী অভূতপূর্ব জাগরণই না দেখা গিয়েছিল। গ্রাম উজাড় করে মানুষ জেলে গিয়েছিল— আন্দোলন করেছিল। আর আজ দু'বছরের মধ্যেই কী পরিবর্তন। মানুষ টাকার জন্য পাগল। বিয়াল্লিশের আগুন ঝরা দিনগুলিও যেন স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে।

দূরে রেলগাড়ির কালো মাথাটা দেখা গেল। স্টেশনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। কুলিরা অনেক দূর থেকেই হ্যাণ্ডেলে ধরে রেখে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে আসছে। নিত্য এণ্ডির চাদরটা কাঁধে নিয়ে অন্য হাতে কাপড়ের ছোট পোঁটলাটা বগলের নিচে চেপে ধরে তৃতীয় শ্রেণীর একটা কামরার দিকে এগিয়ে গেল।

অনেক যাত্রী নামল। সুবিধে বুঝে নিত্য একটা বেঞ্চ দখল করে শুয়ে পড়ল। সেটা না করলে অন্য কেউ এসে দখল করে নেবে। ওপাশের বেঞ্চ কয়টি কিছু হিন্দুস্থানী পুরুষ-মহিলা দখল করে নিয়েছে। কামরাটা ভাজা বাদামের খোসা, নাসপাতির খোসায় ছয়লাপ হয়ে রয়েছে। তবু তার ভাল লাগল। শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে রইল। রেলগাড়ি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল।

সে মনে মনে একবার তার প্রোগ্রামটা আলোচনা করল। সোজাসুজি বাড়িতে না গিয়ে জয়াদের বাড়িতে যাওয়াটা দোষের কথা হবে কি না—সে ভাবে। জেলের শেষের দুটো মাস কী অশান্তিতেই না গেছে। দুই বছর জেলের যন্ত্রণা যেন সেই দু'মাসেই অসহ্য হয়ে উঠল। গত দু'মাস আর চিঠি পায় নি। হয়তো সেজন্যই সে সোজাসুজি পরিচিত ঘরটিতে না গিয়ে জয়াদের ওখানে যেতে চাইছে। জয়ার মা-ই তো ক্যাম্পে থাকা সেই তিন মাস মায়ের আসন পূরণ করেছিল।

তার হাসি ওঠে। ক্যাম্প থেকে গিয়ে জয়াদের ঘরে বসে থাকা অবস্থায় ঠাকুরমা এসে কোন অজুহাতে কান দুটো ধরে মোচড়াতে থাকবে। সে তার দোষটা কোথায় বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে থাকবে। তারপর যখন হাত ব্যথা করতে থাকবে, তখনই কি দোষের জন্য এই শাস্তি পেল সে দীর্ঘ বক্তৃতা থেকে বের করে নেবে। 'কিন্তু নায়ক হলেই, দেশের কাজ করলেই কি মানুষ চুল আঁচড়ানোর সময়ও পায় না। শরীরের দিকে তাকানো যায় না। দিন দিন রোগা হয়ে চলেছে। এই শরীর নিয়ে তোরা ইংরেজের হাত থেকে দেশ উদ্ধার করবি?'

জয়া হয়তো দূর থেকে তার অসহায় অবস্থা দেখে হাসতে থাকে। তারপর মা সরে যেতেই আয়না চিরুণি নিয়ে এসে তাকে ফিসফিস করে বলবে— 'এবার কানে ঢুকেছে তো? এখন সময় থাকতে মাথাটা আঁচড়ে নাও— না হলে আবার এসে বকবক করবে।' কিন্তু সে নিজে চিরুণি নেয় না, জয়াই আঁচড়ে দিতে বাধ্য হয়। জয়া ছিল 'প্রাথমিকা'-র সম্পাদিকা। ঘরের যুবক থেকে বৃদ্ধ কি যে উৎসাহ— কি ব্যস্ততা! ক্যাম্পে তার অধীনে ট্রেনিং নেওয়া ছেলেগুলির কথা মনে পড়ে। এত নির্ভীক অথচ এত সরল। দুদিনেই তাকে আপন করে নিল।

....সে রাতের কথা সে ভুলতে পারে না। সমগ্র অসম জুড়ে ১৪৪ ধারার রাজত্ব। ভারতের কয়েকজায়গায় গোলাগুলি চলেছে, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেছে। ওয়ারেন্ট আর গ্রেপ্তারের বান ডেকেছে। সেদিন ক্যাম্পের তার একজন সহকর্মীর উপর দিয়ে একটু বেড়াতে বেরিয়েছে। সঙ্গে দুজন স্বেচ্ছাসেবক। ফিরে আসতে বেশ রাত হয়ে গেল। জয়াদের বাড়ির কাছে পৌঁছতেই জানতে পারল সমগ্র গ্রাম মিলিটারি ঘিরে ফেলেছে। ক্যাম্পের অনেক ছেলেকেই অ্যারেষ্ট করেছে। কয়েকজন কোনমতে সরে পড়ল। ক্যাম্পে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গের ছেলেগুলিকে এদিক ওদিক পালিয়ে যেতে বলে সে জয়াদের ঘরে ঢুকল। ঘরে আলো জ্বালানো নেই। সে জয়া জয়া বলে ডাকতেই হাতে প্রদীপ নিয়ে জয়া বেরিয়ে এল। প্রদীপটা টেবিলের উপর রেখে, হন্তদন্ত হয়ে তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরেই জয়া বলে উঠল— 'আপনি কেন এলেন, আপনার নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে— আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে ....জয়া যেন প্রায় কেঁদেই ফেলবে।

সে আস্তে করে জয়াকে তার বাহুলগ্ন থেকে সরিয়ে একটা ধমক দিয়ে বলে উঠল-- 'তুমি সম্পাদিকা হয়ে এরকম অস্থির হয়ে উঠলে কীভাবে চলবে? আমরা বিদ্রোহ্ করব---আর ওরা জাপানের বিরুদ্ধে জীবনপণ নিয়ে করা এই যুদ্ধে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? যাও তোমার 'প্রাথমিকা'-র যেসব কাগজপত্র রয়েছে সব পুড়িয়ে ফেল বা অন্য কোথাও সরিয়ে নাও।' তখনই জয়ার মা এল। হাজার হোক মহিলা, এই প্রথম মিলিটারি দেখছেন। পুরনো হাসিঠাট্টা সব থেমে গেল। ফিসফিস করে বললেন— 'বেশ কিছু কাগজ ধানের ডুলিতে লুকিয়ে রেখেছি— বাকিটা তাঁতশালের খুঁটির ভেতর রেখেছি। এখনও কোনরকম ভয় আছে কি না বল?'

'কোন ভয় নেই, যান তাড়াতাড়ি করে রান্না করুন গিয়ে। আচ্ছা শুনুন -- প্রথমে আমার যাবার একটা ব্যবস্থা করুন---এক কাপ চা অন্তত....।' আমি চায়ের জল বসিয়ে এসেছি, তুমি বস।' বলে চলে গেলেন। জয়া টেবিল থেকে প্রদীপটা উঠিয়ে পুনরায় টেবিলে রেখে সামনে এগিয়ে এসে বলল — 'আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি, হে ভগবান দাদা যেন না আসে – মাঝপথে মিলিটারির খবর পেয়ে যেন ফিরে যায়। .... শুনেছ তো দাদা—নগাঁও, কলিয়াবর, চতিয়ার দিকে নাকি অত্যাচার করছে।' জয়ার তখনকার অবস্থাটা মনে পড়লে তার এখনও হাসি পায়। মিলিটারির অত্যাচারের কথা শুনেছিল....ভেতরে ভেতরে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাইরে সেই ভাব লুকিয়ে রেখেছিল। এখন সত্যি সত্যিই নিজেদের গ্রামে সেই মিলিটারি দেখে ধৈর্য হাবানোর উপক্রম হল।

'বয়স্করা সব কোথায় গেল?' সে জিজ্ঞেস করতে করতে ভেতরে ঢুকে গেল। 'কাগজপত্র নিয়ে ভোলাদেব ঘরে গেছে।' একটু জলপান খেয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা জয়াকে জিজ্ঞেস করল— 'পেছনদিকের মাঠে যাওয়া যাবে তো?' .....'পারবে' বলে জয়া কিছু একটা ভেবে ভেতরে চলে গেল।

'অ্যারেষ্ট হয়ে জেল খাটা তো লক্ষ্য নয়---আমাকে যেভাবেই হোক পালাতেই হবে।' একটু পরেই বাইরে দুপদাপ শব্দ শোনা গেল। জলপান আর খাওয়া হল না। তাডাতাড়ি করে চা-টুকু খেয়ে সে উঠে দাঁড়াল। জয়ার মা তাকে হাত দিয়ে ভেতর দিকে ঠেলে দিয়ে চায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জয়া ভেতর থেকে দুপদাপ করে দৌড়ে এল—হাতে একজোড়া রিয়া মেখেলা। 'খুলুন—পরে নিন, আসুন—' বলে জয়া তার গায়ের উপর উপুড হয়ে পড়ল। সে কাপড় পরা শুরু করতেই সে হাত ধরে ভেতরের রুমের দিকে ঠেলে দিল।

জয়া চলে গেল না। আরও একটু কাছে এগিয়ে এসে উত্তেজনা এবং ব্যাকুলতা মাখা সুরে বলল—'এভাবে, কোমরের এখানটার গিঁট দিন, ...না...এখানে.... দেখি আমি পরিয়ে দিচ্ছি' বলে নিজেই পরিয়ে দিল। আদেশ হল মহিলাদের বাইরে বেরোনোর জন্য, ঘর তল্লাশি করা হবে। তারা দুজনেই পেছনের বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর ধীরে ধীরে এসে মাঠে যাবার মুখটাতে এসে দাঁড়াল। মা-বাবা আর ছেলেমেয়েগুলি সামনের দিকে বেরুল। জয়া তার শরীরটা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে 'যাও, এই পথেই' বলে ফোঁপাতে লাগল। সে জয়ার হাতটা ধরে কী করবে বুঝতে পারছিল না। বোঝানোর মত সময় নেই। মাথায় হাত বুলিয়ে ধৈর্য ধর, আমার জন্য চিন্তা কর না' বলে সেই পথে সেই পোষাকে এগিয়ে চলল।

....তারপর... সে অনেক ইতিহাস....এক জায়গায় ভাত খেতে থাকার সময় তাকে সহকর্মীদের সঙ্গে গ্রেপ্তার করে। হঠাৎ জেগে ওঠার মত সে উঠে বসল। এতক্ষণ কি ঘুমিয়েছিল, না কি জেগে ছিল, না স্বপ্ন দেখছিল কিছুই বুঝতে পারল না। ট্রেন এসে একটা স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। সময়ের কোন

ঠিকানা নেই। গার্ডের ইচ্ছেই শেষ কথা। সে এক কাপ চা খাবার জন্য নেমে গেল। কোন একটি পরিচিত মুখ দেখার জন্য কামরাগুলির ভেতরের দিকে তাকাতে লাগল। ফার্স্ট ক্লাসের একটা কম্পার্টমেন্টে বসে আছে তখনকার আমলের সহপাঠী তপন চৌধুরী—সম্পূর্ণ সাহেবী পোষাকে। মুখে একটা দামী সিগারেট।

'চৌধুরী সাহেব না?' চৌধুরী কিছুসময় নিরর্থকভাবে সেই দাড়িগোঁফে আবৃত অপরিষ্কার মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'চিনতে পারলে না'—বলে নিত্য তার কাছে এগিয়ে গেল। চৌধুরী চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠল—'ওহো, নিত্য আয়, এখানে চলে আয়। নিত্য টিকিটটা বের করে দেখিয়ে বলল, 'তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী।'

'ধ্যাৎ তুই এখনও বিয়াল্লিশ সনের মানুষ হয়েই রয়েছিস। পরে নেমে যাবি যা।' মানুষের ঠেলা ধাক্কা সামলে সে কোনমতে উঠে গেল। জড়সড়ো হয়ে বসে তাকে কিছুটা জায়গা করে দিয়ে বলল—'আজকাল আর ক্লাস ডিসক্রিমিনেশন নেই। দেখছিস না ফার্স্ট ক্লাসের অবস্থা।' ফ্লাস্ক থেকে দু'কাপ চা ঢেলে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বল তোর খবরাখবর, মনে হয় জেল থেকে এসেছিস?'

'তোরও তো অনেক পরিবর্তন হয়েছে।'

সে এবার হেসে বলল—'তোরা কলেজ ছাড়লি, আমি বি.এ ফেল করে পাঞ্জাবীর সঙ্গে কনট্রাকটরি শুরু করলাম। এখন আমি নিজেই কনট্রাকটার।'

'বেশ ভালো খবর। এখন কোথায় যাবি?'

'যোরহাটে। মিলিটারি ক্যাম্পে কাজ আছে। তুই একা? বাড়ি না গিয়ে এদিকে কোথায় যাচ্ছিস?'

'আমিও যোরহাটে যাব। একটু কাজ আছে।' চৌধুরী দুটো মিকচার বের করে একটা নিত্যকে দিল। পাঁচবারের মতো চেষ্টা করে কাঠিটা জ্বালাল। নিত্য তার মিকচারটা সেই আগুন দিয়ে জ্বালাতে চেষ্টা করছিল। চৌধুরী জ্বলন্ত কাঠিটা বাইরে ফেলে দিয়ে তাকে দেশলাইটা এগিয়ে দিল।

'যা বাজে দেশলাই হয়েছে আজকাল।'

ট্রেনের হুইসেল পড়ল। সে তাড়াতাড়ি করে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

'এখানেই বসে থাক না...।' নিত্য তার দিকে তাকিয়ে শুধু হাসল। হাসিটাই যেন বলে উঠল-—'তৃতীয় শ্রেণী।' 'পরে আবার দেখা করব' বলে সে নেমে গেল।

জয়াদের বাড়ি তখনও বেশ কিছুটা দূরে। ইতিমধ্যে তার কাছে ট্রেনিং নেওয়া রত্নেশ্বর নামে ছেলেটির সঙ্গে দেখা হল। সে একপ্রকার জড়িয়ে ধরেই নিত্যকে বাড়িতে নিয়ে গেল। স্নান করে কিছু একটা খেয়ে নিত্য বিছানায় শুয়ে পড়ল। রত্নই কথা প্রসঙ্গে জয়াদের কথা ওঠাল। 'ও'—ওদের কথা? আর বলবেন না—রত্ন চেয়ারটাতে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল—'ওরা আজকাল বড়লোক।' নিত্য পাশ ফিরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল—'কেন?'

'আজকাল বড় বড় লোকদের সঙ্গে খাতির। মোটরওয়ালার সঙ্গে। সেই ক্যাম্পটার কনট্রাক্ট নিয়েছে।' তারপর কিছুটা থেমে বলল-–'অনেক টাকা করেছে।'হুঃ কি আর খারাপ করেছে—নাহলে যে ঘর চলে না।' নিত্য পুনরায় পাশ পরিবর্তন করল।

তা বলে ঘরেই প্রাথমিকের সেক্রেটারি হয়ে....'

'প্রাথমিকের সভাপতির বুঝি ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকতে নেই?' সে হাসতে হাসতে বলল। জানালা দিয়ে দূরের চুন দেওয়া ঘরগুলি তার চোখে পড়ল। সেদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল --'চুন দিয়েছে?'

'আরও অনেক ইট-কাঠ জড়ো করে রেখেছে, বড় ঘর বানাবে।' জয়াদের ঘরে পা রেখেই সে অনুভব করল কেবল বাইরেই নয় ভেতরেও অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সুন্দর করে সাজানো ছবিগুলির দিকে তাকাল। তাদের ক্যাম্পের গ্রুপ ফটোটা দেখল। মাঝখানে বসে থাকা ওই যে নিত্য। টেবিলে সুন্দর টেবিল-ক্লথ। দুটি আমেরিকান ফুলদানি। ঘরটা সাজানোর মধ্যে একটা বিশেষত্ব রয়েছে। যেন কোন অতিথিকে অভ্যর্থনা করার জন্য। কে জানে হয়তো সে আসবে বলে জানতে পেরেছে---সে মনে মনে ভাবল। কিন্তু কীভাবে? নিত্য কোন খবর দেয় নি।

ঠিক তখনি পর্দার ওপাশে জয়ার উঁকিঝুঁকি মারতে থাকা মুখের অংশবিশেষ দেখা গেল। পর্দাটা সরিয়ে চিনতে পেরে সে বেরিয়ে এল। হাতে কুরচা শলা আর একটা শরাইয়ের ঢাকনি। বিস্ময় এবং আনন্দে তার মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সংযত করে সহজভাবে বলে উঠল---

'নিত্য দাদা যে। আমি প্রথম দেখেই চিনতে পেরেছি---বসুন। আমি মাকে ডেকে আনি। আপনি ভাল তো?' কথা বলতে বলতে জয়া ভেতরে চলে গেল। জয়ার কথায় সে যেন নতুন একটা সুরের আভাস পেল---আধুনিক। জয়ার মা বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে কথা বলল, 'বাপু দেখছি বাইরে বসে রয়েছ, আস ভেতরে আস।' সে হাসতে হাসতে ভেতরে গেল আর মাথা নিচু করে একটা প্রণাম করল। কিন্তু আগের মত হাসি ঠাট্টা না করায়, কোথায় যেন সেই পুরনো সুরটা কেটে গেছে বলে মনে হতে লাগল তার। কিছুক্ষণ পরে জয়ার মা এল, হাতের থালায় নানাবিধ জলখাবার। জয়া সামনেই দাঁড়িয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে মা বলল, 'যা তো বসার ঘরটা একটু গোছগাছ করগে। নতুন দেখে দুটো টেবিলক্লথও নামিয়ে নে।'

জয়া চলে গেল। সে জলখাবারগুলি খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, 'বাঃ এগুলো তো বেশ ভাল বানিয়েছে। কে করেছে? জয়া নাকি? আজকাল চিনি আর ঘি-এর নাকি বেশ আকাল। কোথায় পেল?'

জয়ার মা মুচকি হাসলেন। নাক মুছতে মুছতে বললেন---'ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের সেরকম কোন আকাল হয় নি। তাছাড়া আজ একজন অতিথি আসার কথা। জয়া গত রাত থেকেই এসব বানিয়েছে।'

ঠিক, ঘরে পা দিয়েই সে এটাই অনুমান করেছিল। প্রসঙ্গটা আবার উঠে পড়ায় সে জিজ্ঞেস করল, 'কোথাকার অতিথি?'

'আর বলো না। পরে সবই জানতে পারবে। কেবল অতিথিই নয়, তোমাদের আশীর্বাদ থাকলে আর...অল্প' --বলে বাকিটুকু অসম্পূর্ণ রেখে অর্থপূর্ণ একটা হাসি হাসলেন। ঠিক তখনি বাইরে মোটরের শব্দ পাওয়া গেল। সমস্ত ঘরটাকে একটা ফিসফিসানি ছড়িয়ে পড়ল। মা দৌড়ে যাবার মত করে কিছুটা এগিয়ে গেলেন। সেভাবে যাওয়াটা খারাপ দেখাবে ভেবেই হয়তো পুনরায় ফিরে এলেন। তার কানের কাছে বললেন, 'বাপু তুমি খাও, কেমন? ঐ বাটাতে পান আছে। বাইরে কে যেন আসছে। আমি যাই।'

খাবার জিনিসগুলি কেমন যেন তার কাছে বিস্বাদ হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি করে এক গ্লাস জল খেয়ে সে উঠে পড়ল। সে তপন চৌধুরীকে আশা করেনি বা তপন চৌধুরীও তাকে আশা করেনি। কিন্তু দুজনেই দুজনের মনের ভাব লুকোতে গিয়ে অবাক হবার ভান করল। তোকে গতকাল এত খুঁজলাম। দেখা হল না। চল, আমাদের ক্যাম্পে যাই। আগামীকাল আমার মোটর যাবে, সেই মোটরে করেই চলে যেতে পারবি।' তপন বলল।

'না, আমাকে আজকেই যেতে হবে। দু'বছর পরে ছাড়া পেয়েছি—এখনও বাড়ি যাই নি।' ঠিক তখনি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মা বলে উঠল, 'আজ থেকে যাও বাপু, ভালই হবে। কালকে মোটরে করে আরামে চলে যাবে।' সে মুচকি হেসে তপনের দিকে তাকাল। তপন ট্রেনে দেখা হাসিটার সঙ্গে এই হাসিটার সাদৃশ্য দেখতে পেল। সে দেওয়ালের একটা ফটোর দিকে তাকিয়ে রইল। জয়া টেবিলে রাখার জন্য আনা বাটাটা থেকে সুপারি আর অল্প মশলা নিয়ে নিত্য বলল, 'এখন যাই।'

'যাও?'

'হ্যাঁ' বলে সে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলল। মা দরজার সামনে এসে ফিসফিস করে বললেন-—'সময়মতো জানাব —আসতেই হবে কিন্তু....।'

তিনজন ঘাতক এবং একটি কিশোরের কাহিনী

মদন শর্মা

১০৯৪ সন। কায়রোতে রাজধানী পেতে ইজিপ্ট থেকে সিরিয়া আর আরব পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড শাসন করা শিয়াপন্থী দল ফাতিমিদদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা, খলিফা আল-মুস্তানসিরের মৃত্যু হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফাতিমিদ খলিফাতন্ত্র দুইভাগে বিভক্ত হল। আল-মুস্তানসিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিজারেকে বঞ্চিত করে তার কনিষ্ঠ পুত্র আল-মুস্তালিস খলিফা হল। নিজারে দলবল নিয়ে দূরে গিয়ে বিদ্রোহী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে লাগল। নিজারের দুর্ধর্ষ অনুগামীরাই হল অ্যাসাসিন—মূল আরবীতে হাশ্বশ্বাশ্বিন। পারস্যের উত্তরে পাহাড়িয়া অঞ্চলে দুর্গ তৈরী করে অ্যাসাসিনরা গোপন হত্যার অভিযান চালিয়ে গেল। গোপন অভিযানে নিহত করল প্রাচীনপন্থী মুসলিম আর ধর্মযোদ্ধা খ্রীষ্টানদের, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে.....।

১৯৯৪ সন। ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তের রাজ্যের নদীর তীরবর্তী ছোট একটা শহর। শহরটির একমাথায় নদীর পারের বেঁটে পাহাড়টার মাথায় একটা রেস্ট হাউস। কুয়াশায় ঢেকে রাখা নদীটা এখন বরফের একটা চাদরের মত মনে হচ্ছে। টিলায় অবস্থিত সেই রেস্ট হাউসটা উঁচু শাল, সেগুন আর অন্যান্য গাছপালা দিয়ে ঘেরা। কেবল শীতকালে নিচের নদীটার পার থেকে গাছপালার ফাঁক দিয়ে ঘরটার কিছু অংশ দেখা যায়। বর্ষাকালে গাছ-জঙ্গল যখন বৃদ্ধি পায় ঘরটা লুকিয়ে থাকে সবুজের আড়ালে। যদিও দুর্গের সঙ্গে ঘরটির কোন সাদৃশ্য নেই, তবু বনে জঙ্গলে ঘিরে রাখা, রহস্যময় মনে হওয়া রেস্ট হাউসটা দেখলেই একটা দুর্গের কথা মনে পড়ে যায়।

জানালায় অস্বচ্ছ কাচ লাগানো অ্যানটা ধীরে ধীরে রেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে একদিক ঢালু পাকা রাস্তাটা দিয়ে নেমে আসছিল। ড্রাইভারের আসনে ওদের তিনজনেরই পরিচিত অফিসার এসে বসতেই ওরা বেশ অবাক হল।

অনন্ত জিজ্ঞেস করল, 'আপনিও যাবেন নাকি আমাদের সঙ্গে?'

তিনি হাসলেন, 'ওহো। ব্রিজের ওপারে ড্রাইভার অপেক্ষা করে আছে। সে ই সেখানে নিয়ে যাবে। ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালে চোখ রেখে জয়দীপ বলল, 'দশটার মধ্যে পৌঁছে যাব নাকি?'

'ভাল সময়েই পৌঁছে যাব। ঠাণ্ডা পড়েছে। গ্রামের লোকেরা ততক্ষণ জেগে থাকবে না?' অনন্ত বলল।

'জেগে থাকলেই বা কে বেরিয়ে আসবে—সবারই সাহস মরে গেছে শালা।' রমেনের ঘড়ঘড়ে গলার আওয়াজ শোনা গেল। কিছুক্ষণ সবাই নীরব। তারপর অফিসার বললেন, 'গাড়িটা কিন্তু সেই তে-রাস্তার সামনে ছাড়বে। ড্রাইভার যেন টের না পায়। কোন পরিস্থিতিতেই সে যেন গাড়ি ছেড়ে না যায় সেরকম আদেশ দেওয়া আছে ওকে। আর একটা কথা, তার সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলবে না।'

নীরবে সেতুটা পার হয়ে ওরা যেতে লাগল। ওরা তিনজনই একটা করে বাঁদর টুপি দিয়ে কান মাথা ঢেকে নিল। প্রায় পনেরো মিনিটের মত যাবার পরে রাস্তার পাশে গাড়িটা দাঁড়াল। অফিসারটি নেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে কুয়াশার মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসে একটা লোক ড্রাইভারের সিটে বসল। গাড়ি আবার চলতে শুরু করল।

তিনজনই চোখ বুজে একটু বিশ্রাম নিতে চাইছিল। তিন জায়গা থেকে তিনজনকে গোপনে এনে রাখা হয়েছিল শহরের জনাকীর্ণ অঞ্চলের একটা প্রকাণ্ড ঘরের ভেতর। ঘরের ভেতরে কী ঘটছে, কী রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, বাইরে থেকে তা জানার কোন উপায় নেই। চার রাত সেখানে কাটানোর পরে তাদেরকে এক রাতে রেস্ট হাউসে আনা হয়। তিনজনই যেন নজরবন্দী ছিল। বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরে খুশিই হয়েছে।

ড্রাইভারের পাশের সিটে অনন্ত। তিনজনের মধ্যে সে-ই বেশি পড়াশোনা করা ছেলে। এম.এ তে ভর্তি হবার পরেই সে নকুলের প্ররোচনায় ঘর ছেড়েছিল। ইতিহাস তার প্রিয় বিষয়। নকুলেরও। নকুল ছিল প্রকৃতপক্ষে সংগঠনটির বুদ্ধিজীবীদের মত। কখনও কখনও কথা বলতে থাকার সময় নকুলকে শিক্ষক বা অধ্যাপক বলেই মনে হত। দুর্ধর্ষ বিদ্রোহী বলে মনে হত না। নকুলই ওদের তিনজনকে এনেছিল, বলা যায়, দীক্ষা দিয়েছিল। সন্দীপনের সঙ্গে ক্ষমতা আর কর্তৃত্ব নিয়ে বহুদিন ধরে টানাহেঁচড়া চলার পর প্রায় আট মাস আগে নকুল সংগঠন ছেড়ে দিয়েছিল। নকুল বেরিয়ে আসার পরে তিনবার তার প্রাণ নাশের চেষ্টা করা হয়—সন্দীপনের ইঙ্গিতে। তিনবারই ওদের তিনজনের কোন না কোন একজন আগে থেকেই তাকে খবরটা দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল। সেজন্যই ওদের উপর চোখ রাখা হয়েছিল। নকুল বেরিয়ে আসার সময় অনন্ত উচ্চ অসমের একটি জেলাতে ধন সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত ছিল। কয়েক কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। তারই সামান্য একটা অংশ সে কৌশলে নতুন করে কেনা চা-বাগানটিতে ইনভেস্ট করেছিল। এর মধ্যে সে-ও বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে শুধুমাত্র সময় এবং সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বাগানের এক ম্যানেজারকে গুলি করে সে পাশের রাজ্যের জঙ্গলে প্রবেশ করেছিল। অফিসারটির ভাই সেই অঞ্চলে কয়লার কন্ট্রাক্টরী করত। তাকে নাকি সন্দীপন হত্যা করেছিল। সেটা কয়েকবছর আগের কথা। এখন সে কথাগুলি জানতে পেরেছে। যাই হোক সন্দীপন তাকে ধরিয়ে দিয়ে তার বিচার করার আগেই সে সারেণ্ডার করল।

সন্দীপনের ভাইকে সে দেখেছে। দাদার মত চেহারা নয়। শিক্ষক মানুষ। বড় জনপ্রিয়। সন্দীপনের খোঁজে পনেরো দিন- মাসে একবার আর্মি আর পুলিশের লোক তাদের বাড়ি এসেই থাকে, কখনও রাতের অন্ধকারে চারপাশ থেকে বাড়িটাকে ঘিরে ফেলে। এ সমস্ত কাণ্ড যতই ঘটে মানুষটির জনপ্রিয়তা ততই বেড়ে যায়। লোকে তাকে এমনকি এম.এল.এ পদে নির্বাচিত করার কথাও ভাবছে। হতেও পারে। হয়ত সেটাও একটা কারণ।

পেছনের সিটে বাঁদিকে জয়দীপ। সন্দীপনের প্রতি ঈর্ষা আর ক্রোধ থাকলেও সে এখনও দ্বিধাগ্রস্ত। এ ধরণের একটা কাজে জড়িত হতে তার বিবেক তাকে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু সে নিরুপায়। হত্যা করাটা তার কাছে খুব একটা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু......। মিনতিকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেবার জন্য সন্দীপনকে সে কখনও ক্ষমা করতে পারবে না। সন্দীপন হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয় তাকে মারার জন্যই বাগানে লোক পাঠিয়েছিল। পায়ে সিকিউরিটির গুলি লাগায় সে কোনরকমে বেঁচে গেল। তার একমাস পরেই সে ধরা পড়েছিল। সেই অফিসারটির সঙ্গে আসা প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা মানুষটি তাকে বলেছিল, 'ইউ ডু ইট অর গেট রেডি টু ডাই ইন এন এনকাউন্টার। অফিসারটি বলেছিল, সিদ্ধান্ত তোমার।' সিদ্ধান্তটা কীভাবে তার হল, কিসের সিদ্ধান্ত নিতে বাকি থাকল!

রমেন উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য দু'বার শাস্তি পেয়েছে। দুবারই বিচারক সন্দীপন। তারপরে তৃতীয়বার। মদের নেশায়, সে রাতে তাদের যে আশ্রয় দিয়েছিল তার যুবতী মেয়েকে বিছানায় টেনে নিয়েছিল। মেয়েটির চোখে ত্রাস, কান্না, উন্মাদ প্রতিরোধ কিছুই তাকে নিরস্ত করতে পারছিল না। বুড়ো যদি মাথায় সেই কোপটা না মারত....। তাকে সন্দীপন ডেকে পাঠিয়েছিল। বিচারে শাস্তি কি হতে পারে সে অনুমান করেছিল। সে তখনই অনন্তের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। সে-ও বেরিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল মুক্ত হল অবশেষে। কোথায় আর মুক্ত হল! সে সিটের পাশে রাখা বোতলটা তুলে নিয়ে দুই এক ঢোক গলায় ঢেলে নিয়ে বোতলটা জয়দীপের দিকে এগিয়ে দিল। জয়দীপ মাথা নাড়ল। অনন্তের হয়তো ঘুম পাচ্ছিল বা রিমঝিম করে নেশা ধরছিল। গাড়িতে ওঠার আগেই বেটা চার পেগের মত খেয়ে নিয়েছে। নেশা লেগেছে তার। আমারও চাই—নেশা, নেশা।

সে মায়ের বুকের উষ্ণতার মধ্যে শুয়েছিল। হঠাৎ জেগে উঠে শুনল অপরিচিত, অদ্ভুত শব্দ—একনাগাড়ে একের পর এক শব্দ, অন্ধকারে কোথাও কিছু পড়ে ভেঙে গেছে, কেউ চিৎকার করে উঠছে, মা তাকে বিছানা থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে জোর করে ঠেলে খাটের নিচে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কি যেন বলছে তাকে, সে শুনতে পায় নি, সে গুটিসুটি হয়ে বেড়ার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ঠকঠক করে কাঁপছে। মা-মা তার আওয়াজটা যেন গলা দিয়ে বেরুচ্ছে না। তাকে ঘিরে ধরে অবিরত ভয়াবহ কোলাহল। হঠাৎ অপার নৈঃশব্দ ঘরটিকে ঘিরে ধরল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যেন কেউ একজন ভেতরে প্রবেশ করছে,·তার থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে সেখানে টর্চের আলো পড়ছে। তার ভয়ার্ত চোখের উপর টর্চের আলো, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। তার দুটো ঠোঁট অসহায় কাঁপতে শুরু করল। মা-মা--সে চিৎকার করে উঠল। খট করে কিসের যেন শব্দ হল। কেউ যেন কাউকে চাপা স্বরে ডাকছে। ঘরটা পুনরায় নীরব হয়ে গেল। অন্ধকার আর যেন অনন্তকালের নীরবতা।

কাঁদতে কাঁদতে বোধহয় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, হয়তো সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সে জেগে উঠল, দু-পা এগিয়ে কিসের মধ্যে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল; পিছল কিসে যেন হাত লাগল, সে কাঁদতে লাগল, কোথায় মা, বাবা-ই বা কোথায়, ছোট পিসি কোথায়, কেউ আসছে না কেন! কেবল অনন্ত

নীরবতা। অনেক যুগের শেষে ভোর হল, মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সে চিৎকার করে করে কাঁদতে লাগল।

'আমি দেখলাম টর্চের আলোতে থরথর করে কাঁপতে থাকা তিন বছরের ছেলেটি, ঠোঁটটা কাঁপছিল, মা-মা করে ডাকছিল। আমি...আমি পারলাম না, আমার ভাইপোর মুখটা মনে পড়ে গেল, শাইলকের মতো সে, আমি পারলাম না। সে থামল আর এক নিঃশ্বাসে গ্লাসের তলানিতে পড়ে থাকা পানীয়টা নিঃশেষ করে ঠক করে গ্লাসটা টেবিলের উপর রাখল।

অবজ্ঞার সঙ্গে জয়দীপের দিকে তাকিয়ে রমেন বলল, 'সেজন্যই আরও একটু খেয়ে নিতে বলেছিলাম। যখন একটু নেশা হয়, অল্প গোলাপী নেশা হয়, অথচ হাত-পা কাঁপে না, সাহস বাড়ে। অনন্ত বলে, 'আর এখন হিন্দি সিনেমার মত সে ও বড় হয়ে হাতে তুলে নেবে অস্ত্র, মেরে নিঃশেষ করবে আমাদের।'

'কীভাবে চিনতে পারবে?' জয়দীপের কণ্ঠস্বরটা কাঁপছিল।

'বিশ্বাসঘাতকদের চিনতে বেশি সময় লাগে না জানিস তো!'

'কে বিশ্বাসঘাতক?'

'তুই...আমি...আমরা' বলে শব্দ করে হাসল রমেন।

'না' অনন্ত বলল, 'কেবল ঘাতক, গুপ্ত।'

'ঘাতক! শব্দটা শুনতে ভাল লাগছে না।'

'না লাগবারই কথা। ইংরেজিতে বলে অ্যাসাসিন...বুঝতে পারবে, অ্যাসাসিন মানে কি?' অনন্তের প্রশ্ন।

'কি?'

'আসলে হাশ্বশ্বাশ্বিন, মানে হাশ্বিশ্বসেবনকারী, হাশ্বিশ সেবন করে একেবারে ঘোরের মধ্যে ওরা হত্যা করে, মানে করেছিল। সেই হাশ্বশ্বাশ্বিন থেকেই অ্যাসাসিন—রাজনৈতিক ঘাতক....ইলেভেন্থ সেঞ্চুরির পারস্য আর কোথায় কোথায় যেন গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে খতম—বুঝলি—'

'আমরাও তাহলে...'

'হ্যাঁ।' তিনজনই নিঃশব্দে মদ্যপান করতে লাগল। প্রকাণ্ড ঘড়িটার টিকটিক শব্দ ভীতি সঞ্চার করে ক্রমশ বাড়তে লাগল।

'আচ্ছা, অ্যাসাসিনদের কী হল?'

'কী সব বাজে বকছিস।' রমেন বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল। 'প্রায় দুশো বছর ধরে অ্যাসাসিনরা এখানে ওখানে চালিয়ে গেল তাদের কাণ্ড কারখানা। তারপরে এলো মঙ্গোলরা, এলো মামলুকরা। তেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে অ্যাসাসিনরা নিঃশেষ হয়ে গেল। কেবল নামটা থেকে গেল।'

'আমাদেরও নাম থেকে যাবে, ঘাতক, গুপ্ত.....।' জয়দীপের নেশা লেগে এসেছিল।

'চুপ...।' রমেন অশ্লীল একটা শব্দ প্রয়োগ করে ধমক দিয়ে নীরব হয়ে গেল।

২০০৫ সাল। ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে ঘুম আসছিল তার। ধড়ফড় করে উঠে বড় বড় চোখ মেলে তাকাল। তার চোখের সামনের স্ক্রীনে লাল-নীল একটা ঘুড়ির গ্রাফিক্স। ঘুড়ি.....নীল আকাশে একটা লাল ঘুড়ি উড়ে বেড়াচ্ছে....সবুজ মাঠে ঘূর্ণি পাক খাওয়া বাতাস ঘুড়িটাকে ক্রমশ ঠেলে

উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে.....ঢিলে দে...সূতো ঢিলে দে' তার কানের পাশেই বাবার কণ্ঠস্বর। সে বাবাকে দেখতে পায়নি। একমনে সে ঘুড়িটার দিকে, কাঁপতে থাকা ঘুড়ির লেজটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ঘুড়িটা উপরে উঠছে, আরও উপরে, আকাশের নীলিমার মধ্যে। মেঘের মাঝখানে নীলটা যেন নীল নয়, যেন একটা গভীর পুকুরের নিস্তরঙ্গ জল। বড়শির শোলাটা ভাসতে থাকা....বাবা কোথা থেকে এসে যেন বর্ড়শি ফেলেছে, বড়শির শোলাটা ভাসতে ভাসতে দূরে গেছে, তলিয়ে যাচ্ছে-- একটু পরেই উঠে আসবে একটা বড় মাছ, অসহায় ছটফটানির সঙ্গে একটা মাছ. ..মাছের একটা চোখ, ক্রমশ বড় হতে হতে হয়ে পড়ল যেন একটা কুয়োর মুখ....প্রাচীন, গভীর, অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গ যেন। কুয়োর পারের বড় চ্যাপ্টা পাথরটার উপর উঠে সে ঝুঁকে দেখছে কুয়োর ভেতরটা। জলের জন্য বালতি নামাতে নামাতে বাবা বলছে, 'দেখি দেখি কী করছিস?' বাবা ঝুঁকেছেন, জলে তার প্রতিবিম্ব কাঁপতে কাঁপতে মিলে যাচ্ছে তার মুখের সঙ্গে। অনেক দূর থেকে মায়ের ডাকটা ভেসে এসে কুয়োর ভেতরে প্রতিহত হয়ে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে---জোনটি- জোনটি-জোনটি। সবকিছুই মনে আছে তার। সব নয়---টুকরো টুকরো ভাঙা স্মৃতি, অস্পষ্ট, জোড়া দিতে কত কষ্ট। অকস্মাৎ তার মনে হল – সে কত নিঃসঙ্গ...বিশাল আকাশে ঘুড়িটার মত....।

কাল তার চৌদ্দ বছরের জন্মদিন। মামার বাড়িতে সে 'শৈশব পার করে কৈশোরে পা' রাখল। বড়মামা কমপিউটারের ব্যবসা করে। তাকে খুবই স্নেহ করেন। তিনিই তাকে এই কম্পিউটারটা উপহার দিয়েছিলেন। স্কুলেও সে একটা সাবজেক্ট কম্পিউটার রেখেছে। সমস্ত স্মৃতি ঝেড়ে ঝুড়ে সে চেয়ারে ভালভাবে বসে নিয়ে খুলে যেতে লাগল জানালার পর জানালা। হঠাৎ একবার থেমে গেল। একটা গান বেজে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে একটার পর একটা দৃশ্য ভেসে আসতে শুরু করল....রঙীন, প্রাণ-প্রাচুর্যময় মানুষ, ঠোঁটে হাসি আর গান, দেহে নৃত্যের ছন্দ, লোকগুলির আগে আগে সলজ্জ মুচকি হাসির সঙ্গে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেই লম্বা চুলের ছেলেটি....এই সে নাকি...তার ঠোঁটে সেই গানের টুকরো....ওয়ান লাভ ওয়ান হার্ট ওয়ান লাভ ফীল অলরাইট...অলরাইট, কোথায় কখন...পলকের তরে সে চোখ বুজে নেয়, সে শুনল একটার পর একটা গুলির শব্দ দূর থেকে ভেসে আসছে, হঠাৎ যেন হাতে কি একটা পিছল তেলতেলে স্পর্শ, রক্ত...রক্ত। সে চোখ খুলে ফেলে...স্ক্রীনের উপর দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে হাস্যমুখ সেই ছেলেটি....ওয়ান লাভ ওয়ান হার্ট.... সে সাউণ্ড বক্সের ভলিউম বাড়িয়ে দেয়, গানটা গমগম করতে থাকল।

রাজধানী শহরটির একেবারে পূবদিকে শহরের উপকণ্ঠ আর জনজাতীয় লোকের ছোট্ট গ্রামটা পার হয়ে বিশাল নদীটার পারে একটা ছোট্ট টিলা। টিলাটির পাশেই হালকা জঙ্গলের মধ্যে দুই রুমের একটা অসম টাইপের পুরনো ছোট্ট ঘর। ঘরটিতে বিদ্যুতের সংযোগ ছিল না। বড় রুমটিতে তিনজন বসেছিলেন। তিনজনই এখন আর ছিপছিপে তরুণ নয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে মেদের পরিমাণ বেড়েছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নড়াচড়াও আগের থেকে শ্লথ হয়ে এসেছে। সামনের টেবিলটাতে একটা আলো জ্বলছিল। চিমনির উপর দিকটা কালো। ল্যাম্প থেকে বিচ্ছুরিত হলদেটে আলো ওদের চিন্তাক্লিষ্ট মুখগুলিকে অস্পষ্ট করে তুলেছে। নদীর দিক থেকে বাতাসের ছাট দরজা জানালার ফাঁক দিয়ে এসে ল্যাম্পের শিখাটিকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে তুলছিল।

সময় নেই। এখনই তিনজনকে তিনদিকে পালিয়ে গিয়ে অন্তত কিছুদিনের জন্য আত্মগোপন করতে হবে, অবশ্য যদি ঘরটা থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। কথাগুলি পুরনো বিস্মৃতির অতলে

হারিয়ে যাওয়া বলে মনে হচ্ছিল। কীভাবে আবার ফিরে এসেছে সবকিছু। সন্দীপন সংগঠন থেকে বেছে বেছে চারজনের একটা দল পাঠিয়েছিল ওদের খুঁজে বের করার জন্য। তখন ওরা রাজধানীর বাইরে ছিল। দুই বছর পরে ঘুরে এসেছিল। তার কিছুদিন পরে আবার ওদের খুঁজছে বলে জানতে পেরেছিল। তারপর কিছুদিন শান্তিতে পার হয়ে গেল। ওদের কাজে লাগান যে অফিসার তিনি কয়েকদিন ট্রান্সফার নিয়ে বাইরে গেলেন। দুজন একেবারে বিদেশ চলে গেল। কিন্তু আবার ওদের খোঁজখবর চলছে। কাকে বিশ্বাস করবে, কার কাছে যাবে। ওদের অস্তিত্ব এখন কেউ স্বীকার করতেই চায় না। এমন কি নকুলও।

পাহাড়টার ওপারের জনজাতীয় গ্রামের একটা ছেলে এসে খবর দিয়েছে—দুদিন ধরে কিছু অপরিচিত লোক ওদের গ্রামের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। নিশ্চয় ওদের সন্ধান পেয়েছে, কেবল উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে। কোথায় যাবে তারা? তখনই সামনে কোথাও একটা গাছের ডাল ভাঙছে মনে হল। তিনজনই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। হাতের পাশেই রাখা বন্দুক তুলে নিল। অনভ্যাসের ফলে ভারী বন্দুকটা সবসময়ের জন্য হাতে ধরে রাখাই কষ্টকর বলে মনে হতে লাগল।

পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে বলে মনে হতে লাগল। অনন্ত ছোট রুমটির জানালার পাশে গিয়ে মলিন পর্দাটা ঠেলে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। কিছু দেখতে না পেলেও অনুধাবন করতে পারল যে হালকা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ঘরটির দিকে কয়েকজন মানুষ সাবধানে এগিয়ে আসছে। কে তারা! কারা পাঠিয়েছে তাদের? ওরা কোনদিনই জানতে পারবে না। ওদের পক্ষে আর এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অনন্ত আগের জায়গাতে ফিরে গেল। সঙ্গের দুজন তার চোখের দিকে তাকাল, আর সবকিছুই বুঝতে পেরে গেল। ভয়, উত্তেজনা আর অসহায়তার মধ্য দিয়ে ওরা অপেক্ষা করতে লাগল অজ্ঞাত ঘাতকদের জন্য।

হৃদয়

মামণি রয়সম গোস্বামী

রবার্ট ঠাকুরদাস অন্যান্যদিনের মত আজও এসে কফি হাউসের নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসলেন। অন্যান্যদিনের মত আজও তিনি মাথা তুলে চারিদিকে তাকালেন। ঐ যে তার সামনে নানান দেশের ছাত্র। লম্বা, বেঁটে, ক্ষীণ, কালো, সাদা, মিষ্টি দেখতে ছাত্রের দল। একটা সময়ে ছাত্রদের চুল ছোট করে ছাঁটা হয়েছিল। তারা দাড়িও কামাত। সে সময়টায় প্রতিটি ছাত্রকেই রবার্ট ঠাকুরদাস জানতেন। আজকাল শতকরা আশিভাগ ছাত্রই চুল-দাড়ি বড় করে রাখে। তাই তিনি তাদের মুখের চেহারা ভালভাবে বুঝতে পারেন না। তাছাড়া আজকাল তার চোখের জ্যোতিও নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। তিন হাত দূরে থাকা ছাত্রকেও তিনি যেন ভালভাবে চিনতে পারেন না।

কফি হাউসের পরিচিত বেয়ারাটা 'স্যাণ্ডউইচ' আর কফি এনে দিল। এ সময়টায় তিনি কী খান সকলেই জানে। কফি খাওয়ার সময়েও তার কান দুটি উৎকর্ণ হয়ে রইল। কি জানি কোথাও হয়ত তিনি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেও পেতে পারেন। এভাবে একা একা খেতে তিনি মোটেই ভালবাসেন না। অথচ এখন তার এভাবে খাওয়া-দাওয়া করাটা অভ্যাসের মত হয়ে পড়েছে। বইপত্র তার সবসময়ের সঙ্গী ছিল। এখন কেবল একধরণের ভাবনাই তার সঙ্গে সবসময় ঘোরাফেরা করে।

কোটের পকেট থেকে চশমাজোড়া বের করে রবার্ট ঠাকুরদাস ভালভাবে মুছে নিলেন। এবার তিনি একদল ছাত্রছাত্রীকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন।

'গুড মর্ণিং স্যার।'

'গুড মর্ণিং, গুড মর্ণিং। তুমি যোগাল কিশোর (যুগল কিশোর) আর তুমি বিমলা নও?'

'হ্যাঁ স্যার। আমি ইণ্ডিয়ার এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে সুযোগ পেয়েছি, এখন প্রবেশন পিরিয়ডে আছি।' যুগলকিশোর হাতে থাকা হেলমেটটা বিমলার হাতে দিয়ে রবার্ট ঠাকুরদাসের পা স্পর্শ করার জন্যে এগিয়ে গেল।

রবার্ট সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। একেবারে অভিভূত হয়ে দাঁড়ালেন এবং যুগলের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। ছাত্রটির শরীর থেকে ভেসে আসা মোটরসাইকেলের পেট্রোল, ঘাম এবং পরিশ্রমেরই যেন একধরণের গন্ধ এসে তার নাকে লাগল। রবার্ট সাহেব ভাল করেই জানেন এই গন্ধ যার শরীর থেকে আসে সে কৃতকার্য হবেই। এটা পরিশ্রমের গন্ধ। পরিশ্রমই হল কৃতকার্যতার সোপান।

'খাও খাও, কী খাবে? কফি, কাটলেট.... Let's celebrate। শুধু কফি হাউসে বসাই নয় 'ক্যাভালেরি লাইনের' তার নিজের ঘরে দু'জনকেই রবার্ট ঠাকুরদাস নিয়ে এলেন। আজকে বহুদিন পরে রবার্ট সাহেব তাঁর প্রিয় একজন ছাত্রকে পেয়েছেন আর ভবিষ্যতে তার সহধর্মিনী হতে চলা মেয়েটির সঙ্গেও তার পরিচয় হল। তাঁর ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী জীবনে সফলতা লাভ করেছিল। মাঝে মধ্যে তাদেরই দুয়েকজন নিজের নিজের শুভ সংবাদ জানাতে আসে। এসমস্ত সময়ে রবার্ট ঠাকুরদাস একেবারেই অধীর হয়ে পড়েন। অন্যান্য ছাত্রীদের মত বিমলাও আজকে এই বৃদ্ধ অধ্যাপকের সেলফের বইপত্র ঠিকঠাক করে রাখল। টিন খুলে সে ভাললাগা 'ম্যাকরেস মাছের স্যাণ্ডউইচ' তৈরী করল। পালং শাক আর পেঁয়াজের 'চুরুহ্' বানানোতেও এই নতুন মেয়েটি যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছে। সে এই কাজগুলি করার সময় অধ্যাপক রবার্ট যুগল কিশোরকে শেক্সপীয়রের কিছু কাহিনী বড় উৎসাহের সঙ্গে বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি যখনই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে পড়েন তখনই তাঁর এই পৃথিবী বিখ্যাত পণ্ডিতের কথা মনে পড়ে। একপ্রকার অভিভূত হয়ে পড়েন তিনি।

'ক্যাভালেরি' লাইনের তাঁর এই বাসভবনের সামনে থাকা গুলমোহর ঝোপের নিচে বেতের চেয়ার টেবিলগুলি রবার্ট সাহেব আর যুগলকিশোর দুজনে মিলে বের করে আনল। আনন্দে অধীর হয়ে রবার্ট সাহেব শেক্সপীয়রের মনোরঞ্জক কাহিনী বলতে শুরু করলেন। যুগলকিশোরের করার মত অনেক কাজ ছিল যদিও, আজকে সে সমস্ত কিছুই ত্যাগ করল। রবার্ট সাহেবের কাছে সে অনেক কারণেই অনুগৃহীত। অভাবে পড়ে একবার সে কলেজে তিনমাসের ফি দিতে পারছিল না। রবার্ট সাহেব সে সময় তাকে সাহায্য করেছিলেন। একবার ডিটিসি বাস থেকে পড়ে গিয়ে 'উইলিং ডন' হাসপাতালে (এখনকার রামমোহন হাসপাতাল) তিনমাস শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। এই সমস্ত সময়ে তিনি তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। বেচারা এ সমস্ত কথা ভুলে যায় নি। সেজন্যই আজকের এই আনন্দের দিনে সে একটা 'ব্রায়ার কাঠের' পাইপ (আলজিরিয়ার একধরণের গাছের শিকড় দিয়ে তৈরী করা তামাক খাওয়ার পাইপ) আর 'হাভানা সিগারেটের' একটা বাক্স রবার্ট সাহেবের জন্য এনেছিল। রবার্ট সাহেব একেবারে মশগুল হয়ে পড়েছিলেন।

গুলমোহরের নিচে বসে কথা বলতে বলতে হঠাৎ রবার্ট সাহেব যুগলকিশোরকে প্রশ্ন করলেন--'তোমার পছন্দের মেয়েটি রূপসী। ভাল গৃহিনীও হবে। I am sure you have not slept with her yet' প্রশ্নটা শুনে বেচারা যুগলকিশোর থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু তাকে উত্তর দেবার কোন সুযোগ না দিয়ে অধ্যাপক নিজেই বললেন – 'শোন, শেক্সপীয়রও বিয়ের আগে যৌন বাসনায় লিপ্ত হওয়া নারী পুরুষকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। 'টেম্পেস্ট' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কি ছিল? ইশ্ কি যে ছিল... বুড়ো হয়ে গেছি তো, কথাগুলি আজকাল আর আগের মত মনে

থাকে না। তবু তুমি 'টেম্পেস্ট' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের উক্তিসমূহ ভালভাবে পড়ে নিও। যারা যৌনচেতনাকে এক আধ্যাত্মিক মায়াজালে ঘিরে রাখতে পেরেছে তারা বহুদিন পর্যন্ত বিবাহকে এক অপূর্ব শোভাযাত্রা করে রাখতে পেরেছে।' যুগলকিশোরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। (আই.এ.এস পাওযার পর দিল্লির এমন কোন জাঁকজমক হোটেল নেই, যেখানে বিমলাকে সঙ্গে নিয়ে যায় নি। এখন এমন কি বিমলার নাভির পাশের কালো তিলটি পর্যন্ত যুগলকিশোরের পরিচিত হয়ে পড়েছে।)

রবার্ট ঠাকুরদাস যুগলকিশোরের দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে বলল—

'একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছ দেখছি!' কোটের পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে অধ্যাপক যুগলকিশোরের দিকে এগিয়ে দিলেন। তারপর কথার গতি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে সেক্সপীয়রের জীবনেব কিছু রোমাঞ্চকর তথ্য বলতে শুরু করলেন। —'শোন, শেক্সপীয়রকে নিয়ে গণ্ডগোলের শেষ নেই। তার বংশপরম্পরাকে নিয়েও তর্কবিতর্কের সীমা নেই। যে বংশধরটির নাম নথিপত্রে পাওয়া গেছে তার নাকি ফাঁসি হযেছিল।'

'ফাঁসি?'

'ডাকাতির অভিযোগে ১২৪৮ সালে তার ফাঁসি হয়েছিল।'

'শোন, আস্তাবলে ঘোড়ার চামড়া পরিষ্কার করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি, কসাইখানায় তাকে কিছুদিন কাজও করতে হয়েছিল। তাছাড়া বেঁচে থাকতে কি তিনি সম্মানের মুখ দেখতে পেযেছিলেন? প্রত্যেকেই 'জনসনকে'-ই চাইতেন।— শোন একবার নাকি খুব একটা মজার ঘটনাও ঘটেছিল।'

গুলমোহরের নিচে বেতের চেয়ারে বসে, ইতিমধ্যে বৃদ্ধ অধ্যাপক দুটো হাভানা সিগার শেষ করলেন। কাজ করতে আসা গাড়োয়ালি বুড়ো দুবার এসে সিগারের ছাই দিয়ে ভর্তি হয়ে যাওযা অ্যাসট্রে পরিষ্কার করে গেল।

'কী ঘটনা ঘটেছিল স্যার?'

'তাঁর জীবনী লেখা একজন পণ্ডিত লিখে রেখে গেছেন—একটা কালো হরিণ চুরি করার অপরাধে নাকি শেক্সপীয়রের তিন মাসের জেল হয়েছিল।'

একটা সময়ে যুগলকিশোর এবং বিমলা খাওয়া-দাওয়া করে রবার্ট সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে গিয়েছিল। ঝড়ের মত দুজনে এসেছিল এবং চলেও গেল। এরকমই হয়। হ্যাঁ, এরকমই হয়ে থাকে। যারা কৃতকার্য হওয়ার পরে রবার্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসে তারা বেশি সময় কাছে বসতে পারত না। কিন্তু যে সমস্ত ছাত্র টাকাপয়সা বা অন্য কোন কাজে তার কাছে এসেছিল তারা সাহেবের কাছে অনেক বেশি সময় বসত। নিজের বিপদের কথা বিস্তারিত ভাবে বলতে চাইত। রবার্ট ঠাকুরদাস বড় ধৈর্যের সঙ্গে তাদের কথা শুনতেন, এটা যেন তার একপ্রকারের অভ্যাসেই পরিণত হয়েছিল। ইংরেজি ভাষার ছাত্রদের মধ্যে তাঁর এক বিশেষ স্থান ছিল এই জন্যেই যে, রবার্ট ঠাকুরদাসের বাইরে দিল্লির এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপকের কাছে ছাত্ররা নিজেদের বিপদের কথা বা ব্যক্তিগত কথা প্রকাশ করতে সাহস করত না। কিন্তু ধীরে ধীরে রবার্ট ঠাকুরদাস অনুভব করতে শুরু করেছিলেন যে তাঁর কাছে সব সৎ বা ভাল ছেলেরা আসে না, কিছু খারাপ ছেলেও আসে। এ ব্যাপারটা অবশ্য তিনি অনেক দেরিতে বুঝতে পেরেছিলেন আর এটাই এই নিঃসঙ্গ অধ্যাপককে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছিল। যুগলকিশোর এবং বিমলা যাবার পরেও

অনেক সময় রবার্ট ঠাকুরদাস গুলমোহরের নিচে বসে রইলেন। গাড়োয়ালি চাকরটি একটা সময়ে তাকে চিনি এবং দুধ ছাড়া চা দিয়ে গেল। একজন নতুন ব্রিটিশ লেখকের ইলিয়টের ওপর লেখা একটা বই তার কোলের উপর পড়েছিল যদিও তখনও তিনি বইটি পড়ে দেখেন নি। ইলিয়টের ভাবনার সঙ্গে তার সম্বন্ধ এতই গভীর ছিল যে এই আধুনিক এবং প্রচুর মেধাসম্পন্ন লেখকের 'ইলিয়ট' সম্পর্কে দেওয়া যুক্তিতর্কগুলি পড়ে তিনি অভিভূত হতে পারেন নি। বরং এ সমস্ত কিছুর মধ্যে এক অনন্য গভীরতার খোঁজ করে তার আত্মা মাঝে মাঝে যেন গভীরভাবে হাহাকার করে উঠত। 'না না, ইলিয়টের আরও গভীরে যেতে চেষ্টা কর, এভাবে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করো না, হৃদয় দিয়ে বিচার কর।' একই সঙ্গে বুদ্ধি এবং হৃদয়ের সমন্বয় থাকা গুণী সমালোচক কোথায় খুঁজে পাবেন তিনি? তবুও ইলিয়টের বিষয়ে লেখা বৃটিশ, জাপানী, আমেরিকান এবং ভারতীয় কোন লেখকের রচনা অধ্যাপক বাদ দেন নি।

ধীরে ধীরে বিকেল হয়ে এল। গুলমোহরের মধ্য দিয়ে দূরে দেখতে পাওয়া হাতির দাঁতের রঙের ভাইসরিগেল লজ (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার অফিস) এখন আরও যেন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বলে মনে হল। এই প্রাসাদ এখন যেন স্বয়ং এডুইনা মাউন্ট ব্যাটেনে রূপান্তরিত হয়েছে। এই প্রাসাদের চারপাশে যেন অহরহ এডুইনা মাউন্ট ব্যাটেনের আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন এখানকার ১৩ নম্বর কামরায় এডুইনার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় কথাগুলি শুনিয়েছিলেন...'তোমার প্রতি আমার প্রেম অটল।' বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী সমারোহে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন এসে এই কথাই বলেছিলেন।

'১৯২২ সনের সেই একই বছরে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। আমরাও আমাদের বিয়ের রজতজয়ন্তী ১৯৪৮ সালের এই বছরেই সম্পূর্ণ করলাম। এই প্রাসাদের রুম নম্বর ১৩-তেই আমি এডুইনাকে আমার হৃদয়ের কথা বলেছিলাম।' হ্যাঁ, সেদিন রবার্ট ঠাকুরদাস সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর চার পাশে হিন্দু, মুসলমান, পার্শি আর শিখ ছাত্রদের দল এসেছিল। প্রায় প্রত্যেকেই 'মালেশিয়া' কাপড়ের কুর্তা-পায়জামা পরেছিল। এই এই 'মালেশিয়া' অর্থাৎ কমদামী খদ্দরের কাপড় খুব কম মানুষই ব্যবহার করে। এই সমস্ত ছাত্রেরা জাতীয় আন্দোলনে ভাগ নিয়েছিল। কিন্তু সেদিন? বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তীর দিন? না না, ভাল করে কিছুই মনে পড়ছে না। ত্রিশ বছর আগে এডুইনা মাউন্টব্যাটেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সময় তাঁর স্বামী মাউন্টব্যাটেনের বলে যাওয়া কথাগুলি মার্বেল ফলকে খোদিত করে সেই ১৩ নম্বর ঘরে বসানোর উৎসবে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ইশ্, কী সুন্দর কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন---'অঃ দ্যাট ইজ এ ফাইন 'ফার ক্যাপ' অন ইয়োর হেড।' প্রত্যেকেই তাঁকে দেখছিল। ত্রিশ বছরের যুবক ছিলেন তিনি। পুরোহিত হবার মনের বাসনা মা জোসেফাইনের কথায় ছেড়ে দিয়ে ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক হয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন।

আঃ আঃ! এডুইনার সেই কণ্ঠ? দ্যাট ইজ এ....কী পরেছিল এডুইনা? ধোঁয়ারঙের স্কার্ট! টুইডের ছিল না মেট কাপড়ের ছিল, মাথার সাদা টুপিটা থেকে বেরিয়ে আসা একটা গোলাপি রিবন তাঁর ধবধবে সাদা গলাটার সঙ্গে যেন খেলা করছিল। সব মনে আছে, সব মনে আছে, হাতের গোলাপ ফুল, পায়ে হাইহিলের জুতো। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে, কিন্তু হাতির দাঁতের মত রঙের ভাইসরিগেল লজ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সব শেষ হয়ে যায়। কিছুই বাকি থাকে না। সব ভেঙে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। অনেকদিন পর্যন্ত নিজের মধ্যেই দুর্বলতার

মত পাণ্ডিত্যের অভিমান ধীরে ধীরে ভেঙে-চুরে নিঃশেষ হয়ে এসেছে, বিগলিত হয়ে এসেছে। তাঁর অন্তরাত্মা মানুষ খুঁজে বেড়িয়েছে যাকে সে সেবা করতে পারে, যাকে সে শুশ্রূষা করতে পারে। পাণ্ডিত্যের অভিমান, অর্থ কড়ি ইত্যাদি ভাবনার শ্মশান থেকে এক অন্য ফুল যেন প্রস্ফুটিত হয়েছে। এই পুষ্পই যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে 'যাও, আর্তজনের কাছে যাও।' এ ধরণের ভাবনা ঠাকুরদাসের শৈশবেও দেখা দিয়েছিল। পাদ্রী হয়ে তিনি সত্যি সত্যিই সন্ন্যাস নিতে চেয়েছিলেন। মা জোসেফাইন হাহাকার করে উঠেছিলেন---'না না আমার ছেলেকে পাদ্রীর রূপে দেখতে চাই না। আমার ছেলে পৃথিবীর সমস্ত সুখ ভোগ করবে।' গোদাবরী নদীর তীরে বাস করা তাঁর পূর্বপুরুষরা দুশো বছর আগেই হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টানধর্ম গ্রহণ করেছিল। মা তাকে বলেছিলেন যদি তিনি এই পদ গ্রহণ করেন অর্থাৎ পাদ্রীর জীবন অবলম্বন করে তাহলে....তাহলে?

মায়ের সেই ভয়াবহ সংকল্পের কথা এখনও মনে আছে রবার্ট ঠাকুরদাসের। নিকলসন সিনেট্রিতে মায়ের সমাধিতে প্রার্থনা করতে গেলে বারবার তাঁর হৃদয়ে একটাই প্রশ্ন ওঠে--- 'কী সুখ পেলেন তিনি? কী উপভোগ করতে পারলেন? তিনি না না, মায়ের সমাধিতে প্রদীপ জ্বালানোর সময় এই মনোভাব তিনি প্রকাশ করেন নি। সমাধিতে মাথা নুইয়ে তিনি সবসময় একটা কথাই বলতেন---'হৃদয় দিয়ে তুমি আমার সুখ চেয়েছিলে। তুমি মহান। পৃথিবীর আলো দেখার জন্যে তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছিলে।' আশ্চর্যের কথা! আশ্চর্যের কথা, ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধার মনে ক্রুরতার প্রতিমূর্তি নিকলসনের স্মৃতিতে ে়রি এই কবরস্থানে মায়ের সমাধিতে মাথা নোয়াতে এলেই তার অহরহ এই কথা মনে পড়ত --

'তিনকুড়ি বছর পার হয়ে গেল---কি উপভোগ করে সে শান্তি পেয়েছে? পবিত্র গ্রন্থ বাইবেলের একটা অংশও তাঁর এই সময়ে মনে পড়ে ঃ 'জীবনের দ্বারাই হউক বা মৃত্যুর দ্বারাই হোক, খ্রীষ্ট আমার দেহ মহিমান্বিত করবে। কারণ আমার জন্য জীবন খ্রীষ্ট আর মৃত্যুও লাভ। কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে জীবন ধারণ করা? একমাত্র তাহলেই যদি আমার পরিশ্রম সফল হয়, তাহলে কোনটা বেছে নেব, এই কথা আমি জানি না.....

আরও অনেক উক্তি, নিকলসনের কবরস্থানের পরিত্যক্ত শ্যাওলা পড়া কবরগুলির সামনে দাঁড়ালে রবার্ট ঠাকুরদাসের কথা মনে পড়ে। যতবারই রবার্ট ঠাকুরদাস এই পরিত্যক্ত কবরস্থানে মায়ের কবরে ঘিরে রাখা বন্য লতাপাতাগুলি পরিষ্কার করতে চেয়েছে, ততবারই সেই পবিত্র গ্রন্থের উক্তিগুলি তাঁর কানের কাছে এক জীবন্ত রূপ নিয়ে যেন গুনগুন করে ওঠে। বন্য লতার মত শরীর ঘিরে ধরে।

আঃ ধীরে ধীরে যেন একেবারে অন্ধকার হয়ে এল। 'ভাইসরিগাল লজে'-র একটা নিষ্প্রভ আকৃতি যেন তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। স্ট্রীটলাইটে করা আকৃতি একটা। আকৃতি নয় যেন ওক কাঠের নির্মিত এডুইনা মাউন্ট ব্যাটেনের কফিন! কফিনের বুকে এখন 'ভাইসরিগেল লজের' সম্রাজ্ঞী ঘুমিয়ে আছে।

রবার্ট ঠাকুরদাস এবার বসা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কাছের জামগাছটায় রাতে ফিরে আসা বুলবুলি পাখিগুলি চেঁচামেচি করছে। স্যার মরিস গয়ারের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই 'ক্যাভালেরি লাইনের' কোন পরিবর্তন হয় নি। ছোটখাটো শক্তসমর্থ চেহারার সেই মহান ব্যক্তিটি একদিন রবার্ট ঠাকুরদাসকে বলেছিলেন- 'আই হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট ইওর এক্সপার্ট নলেজ অন ইলিয়টস্ পোয়েট্রি। নাউ রিসাইট টু মি এ পিস অব পোয়েট্রি বাই এলিয়ট?'

হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ক্যাভালেরি লাইনে সেই জামগাছের নিচে স্যার মরিস গয়ারকে তিনি সেদিন দেখেছিলেন আর আফ্রিকায় নিহত ভারতের সৈনিকদের প্রতি ইলিয়টের লেখা কবিতাটি সেদিন তাঁর সামনে সুর দিয়ে আবৃত্তি করেছিলেন। সবাইকে চিনতে পেরেছিলেন স্যার মরিস গয়ার। ছোট থেকে বড় সবাইকে। ঝিণুকের পেট থেকে মাণিক কুড়নোর মত অধ্যাপকদের বিভিন্ন জায়গা থেকে বেছে বেছে এনেছিলেন। পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপটিকে তিনি পাল্টে দিয়েছিলেন। তিনি আসার সময়ে 'ভাইসরিগেল লজ'-এর রান্নাঘরের এক অংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান গবেষণাগার তুলে আনা হয়েছিল। 'প্রিন্স অব ওয়েলস' আসার সময় সাজানো ড্যান্সহলটা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি করা হয়েছিল। কাঠের মেঝের অবস্থা ভাল ছিল না। সিলিঙে বাসা বাঁধা বাদুড় দিনের বেলায়ও কোলাহল করত।

.....এক বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারাই পাল্টে গেল। সবাই আনন্দ করুক আর সাধনা করুক এটাই ছিল স্যার মরিস গয়ারের মনের বাসনা। তাঁর সময়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মাসিক বেতন ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের চেয়ে বেশি ছিল।

......গাড়োয়ালি চাকরটা ইতিমধ্যে রবার্ট ঠাকুরদাসের পানীয়ের ব্যবস্থা করে তাকে সংকেত দিল। এই সময়টাতে তিনি দৈনিক দুই পেগ ব্র্যাণ্ডি পান করেন। ওই যে সোডার বোতল খোলার শব্দ হচ্ছে। ভাজা কাজুর গন্ধও এসে নাকে লাগছে। ভাজতে সুবিধে বলে সে সবসময়ই কাজু ভেজে দেয়। মা থাকতে অবশ্য আলাদা কথা ছিল। তখন সপ্তাহে মাত্র দুইবার তিনি মদ্যপান করতেন। সঙ্গে খাবার জন্য মা বড় সুস্বাদু কাবাব তৈরি করে দিতেন।

......ধীরে ধীরে তিনি গুলমোহরের নিচ থেকে ভেতরে ঢুকে গেলেন। গাড়োয়ালি চাকর বাইরে থেকে চেয়ার-টেবিলগুলি ভেতরে তুলে আনল। মদ্যপান করার সময় গাড়োয়ালি চাকরটার রুক্ষ কণ্ঠ তিনি শুনতে পেলেন—'সাহিব সে অভি মিল নহী সকেগা।' কিছু সময় তর্ক-বিতর্ক করে বোধহয় ছাত্রটি চলে গেল। গাড়োয়ালি চাকরটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল—'ওহ্ লড়কা আয়া থা। উস দিন যো তোড় ফোড় কর গয়া উঁসি গিরহোকা হোগা। ম্যায়নে তো বতায়া থা পুলিশসে পাকড়াও। তুমনে মেরা বাত সুনা নহী। অভী তবহ্ করকে ছোড়েগা।'

রবার্ট ঠাকুরদাস উত্তর দেন—'তুম খামোখা পরেশান হোতা। কই মজবুরী হুয়া হোগা।' বসন্তে দাগ আর বয়সের রেখা মুখের আকৃতিকে একেবারে বিকৃত করে ফেলা, কুঁজো আর কানে ভাল করে না শোনা এই বৃদ্ধই ঠাকুরদাসের সঙ্গে বহুদিন ধরে কাজ করছে। ঢিলে হাফপ্যান্টটা কোমরের উপর পর্যন্ত টেনে নিয়ে ভারী জুতোর শব্দ তুলে বাইরে বেরিয়ে যাবার সময় সে মুখে বিড়বিড় করতে করতে গেল।

'মজবুরি-মজবুরি। সবকা মজবুরিকা হাল ঢুণ্ডনে ইঁহাতক পঁহুচ যাত হ্যাঁয়। আউর তুম্হে তবাহ্ করকে চলে যাতে হ্যাঁয়।' সেদিন উৎপাত করে যাওয়া ছেলেগুলির মধ্যে কোন একটা এসেছিল। কি ঠিক বলছি কিনা? গাড়োয়ালিটা চোখে ভাল দেখতে পায় না। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবতেই রবার্ট ঠাকুরদাসের মনে পড়ল একটা ক্ষীণ, মিষ্টি চেহারার ছেলে তাঁর কাছ থেকে ইলিয়টের দুটো বই চেয়ে নিয়েছিল। অনেকদিন পর্যন্ত ফিরিয়ে দেয় নি। এ বিষয়ে তিনি কিছুটা অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন সে এসে উপস্থিত হয়েছিল। বইদুটোতে খুব সুন্দর করে মলাট দিয়ে এনেছিল। হ্যাঁ, ছেলেটি কোন একটি ভাষায় গবেষণা করছে বলছিল। ইলিয়টের কবিতাও সে গেয়ে শুনিয়েছিল, 'জে অ্যালফ্রেড প্রুফকের প্রেমগান' আর এক বৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য রচনা করা কবিতা দুটি থেকে সে

দুটো স্তবক গেয়ে সত্যি সত্যিই সে একদিন তাকে মুগ্ধ করেছিল। ....হ্যা সেই ছেলেটিই হবে। রবার্ট ঠাকুরদাস এবার প্রথম পেগ শেষ করে দ্বিতীয় পেগ আরম্ভ করলেন। এই দ্বিতীয় পেগ গ্রহণ করার সময়ই তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল এই ছেলেটিই তার কাছে কিছু টাকাপয়সা নিয়েছিল, ফিরিয়ে দেয় নি। আঃ একবার নয়, দুই-তিনবার নিয়েছিল। সেজন্যই তার মনে আছে। একবার নেয়া ছাত্রদের কথা তার ভালভাবে মনে থাকে না। বড় অনুনয় করে বলার মত করে বলেছিল- --ইউ.জি.সি-র ছাত্রবৃত্তি আসে নি। বাড়ির অবস্থা খারাপ আর মায়ের --হ্যাঁ হ্যাঁ, মায়ের কি একটা অসুখের কথা বলেছিল। এখন সমস্ত কথা পরিষ্কার মনে পড়ছে রবার্ট ঠাকুরদাসের। এতদিনে নিশ্চয় ইউ.জি.সি-র গ্র্যান্ট এসে গেছে। রবার্ট ঠাকুরদাসের মনে সন্দেহ হতে শুরু করেছে।

......আঃ সেই স্নেহপূর্ণ মুখ, মাথার চুলে হাত বুলিয়ে ভালবাসা জানাতে ইচ্ছে করা ছাত্রদল। কী হয়েছে তাদের? কী হয়েছে? কেন আজকাল তিনি তাদের বুঝতে পারেন না? দেখাশোনা করা গাড়োয়ালি লোকটা এবার তার ভারী জুতোর শব্দ তুলে এসে বলল---'লড়কা ফিরসে আয়া থা। মুসিবত। লগতা হ্যাঁয় তবহা করকে ছোড়েগা। ম্যায়নে ভাগা দিয়া।' রবার্ট ঠাকুরদাস মুখে কিছু বললেন না। খোলা জানালা দিয়ে তিনি গুলমোহর ঝোপের উপরে স্থবির হয়ে থাকার মত জ্বলজ্বলে চাঁদটা দেখতে পেলেন। জ্বলজ্বলে চাঁদ? যেন সাদা ঘোড়ায় উঠে শিকার করতে যাওয়া 'প্রিন্স অব ওয়েলস্'।

অতীতের অনেক দূর পর্যন্ত রবার্ট ঠাকুরদাসের মন ভেসে গেল। সেটা ছিল ১৯৪৮সন। দক্ষিণের গোদাবরী, ডেল্টার ছোট গ্রাম চিরদিনের জন্য ছেড়ে মা জোসেফাইনের সঙ্গে তিনি দিল্লিতে এসেছিলেন। ঝিণুকের পেটের মুক্তো চেনার মত স্যার মরিস গয়ার প্রথম সাক্ষাতেই রবার্ট ঠাকুরদাসকে চিনতে পেরেছিলেন। সেদিন বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন-- রবার্ট ঠাকুরদাস উইল বি এ অ্যাসেট টু এনি ইনস্টিটিউশন।'

দেশ বিভাগের ভয়ানক দিন ছিল তখন। জুম্মা মসজিদ, দরিয়াগঞ্জ, শেখ সরাই উপদ্রবের কেন্দ্র হয়ে পড়েছিল। জুম্মা মসজিদের সামনের বৈরাম খাঁ মার্গ আর রাজিয়ার টুম্বের সামনে ঘুরে বেড়ানোর সময় একবার পাঠানের হাত থেকে কোনরকমে তিনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। ফতেপুর, কুদেশিয়া মার্গ, খারিবাউলির পথ হিন্দু আর মুসলমানের রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল। 'ভাইসরিগেল লজ'-এর সামনে বলাৎকার করে মেরে ফেলে রাখা একজন মহিলার মৃতদেহ একটা গোরুর গাড়ির সঙ্গে রশিতে বেঁধে ফেলে রেখে গিয়েছিল কেউ। পেশোয়ার, করাচি, রাওয়ালপিণ্ডি ইত্যাদি থেকে আসা ছন্নছাড়া শরণার্থীতে ভরে উঠেছিল দিল্লি। শরণার্থী ছাত্রদের মধ্যে হুলুস্থূল পড়ে গিয়েছিল। নর্থ ও ওয়েস্ট, ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স আর পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পালিয়ে আসা অধ্যাপকদের মন্দিরমার্গে অস্থায়ীভাবে তৈরি ক্যাম্প কলেজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পলিয়ে আসা অধ্যাপক জগতার সিং পরদেশি, ধনবর রাজপুতদের সঙ্গে আর্টস ফ্যাকাল্টি বিল্ডিঙে তিনিও কিছু ক্লাস নিয়েছিলেন। বিভাজনে পালিয়ে আসা ছাত্রদের মধ্যে হাহাকার লেগে গিয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে যেন ছাত্রের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে পড়েছিল। শরণার্থীদের এভাবে তাড়িয়ে নিয়ে রক্তের নদী বইয়ে দেবার জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেনকেও অনেকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রবার্ট ঠাকুরদাসের ভালভাবেই মনে পড়ছে সরকারের মতে দশ লাখ মানুষ এই ভয়ংকর বিপদে পড়েছিল। পাঁচ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। সরাই রোহিল্লার আলিতে একদিনেই দেড় কুড়ি মানুষের শবদেহ কুড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল। মা বারবার তাকে 'ভাইসরিগেল লজে'-র বলাৎকার করে হত্যা করে রেখে যাওয়া মহিলাটির কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

......ভারি জুতোর শব্দ তুলে গাড়োয়ালি পুনরায় একবার তার শোবার ঘরের ভেতরে চলে এল। ঢলঢলে হয়ে যাওয়া হাফপ্যান্টটা উপরের দিকে টেনে তুলতে তুলতে সে বলল 'ছোকরা ঔর একবার আয়া থা। ম্যায়নে ভাগা দিয়া। লগতা হ্যায় ওবাহ করকেহি ছোড়েগা।' রবার্ট ঠাকুরদাসের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে সে তার সামনে থেকে কাজুর খালি প্লেটটা তুলে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

......না। না আজ এই ছাত্রটির কথা ভাবতে তার ইচ্ছে করছে না। কে জানে গাড়োয়ালির ধারণা মত সেদিন উৎপাত করে যাওয়া ছেলেগুলির মধ্যে এই ছেলেটিও একজন হতে পারে। না না, সেই মিষ্টি ছেলেটি এই দলের হবে বলে মনে হয় না। সেদিন কেন এসেছিল ওরা?

গাড়োয়ালি বলছিল কিছু একটা বোঝার জন্য এসেছিল। বৈঠকখানায় বসে তার একটা পুরনো অ্যালবাম বের করে দেখছিল। তাতে সতীদেবীর ফটো ছিল। এই ফটোটা দেখার পর তাদের মধ্যে কি গণ্ডগোল হল? তাঁর আলমারি খুলে তারা ব্রাণ্ডি খেতে শুরু করল। সতীদেবীর ফটোটা দেখিয়ে তারা অশ্লীল ভাষায় কথা বলতে লাগল। মদ খেয়ে একেবারে মাতাল অবস্থায়....। গাড়োয়ালি যখন ডাণ্ডাধারী পাহারাদারদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল আর বাধা দেবার চেষ্টা করল, তারা খালি বোতল দিয়ে গাড়োয়ালির মাথা ফাটিয়ে দিল। এখনও সে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাহারাদাররা মিছিল বের করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যস্থতায় সে'সবের কিছুই হল না। কী কাণ্ড! ছাত্রসংঘের অফিসে সেদিন দিনদুপুরে বলাৎকারের মত বীভৎস ঘটনা ঘটে গেল। স্যার মরিস গয়ারের কল্পনার এই পূণ্যভূমিতে ছাত্রদের দ্বারা এই পাপকর্মও সংঘটিত হল! সেদিন সতীদেবীর ফটোটা নিয়ে ওরা চিৎকার চেঁচামেচি করছিল 'হমে সব মালুম হ্যায়। ইয়ে জি.বি রোড কা রাণ্ডি থী, তেরা সাহাবকা ইশক্ ইসীকে সাথ থা, ইয়ে বাত কিসীসে ছুপী নহী হ্যায়।'

......সেদিন তিনি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। দেড় কুড়ি বছরের কাহিনীও মানুষ মনে রাখে, অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে! মাটির কত গভীরে এই অস্ত্র লুকনো থাকে কেউ তা জানে না। কিন্তু থাকে একটা সত্যি কথা আর কখন কোন মুহূর্তে সে তার বীভৎস জিহ্বা বের করবে কেউ তা বলতে পারে না। রবার্ট ঠাকুরদাস এবার জ্বলজ্বলে চন্দ্রটাকে 'ভাইসরিগেল্ লজ'-এর পেছনে স্থিত গড় মীনার (সিপাহী বিদ্রোহের সময় মীরাট থেকে আহত হয়ে পালিয়ে আসা বৃটিশ সৈনিকরা এখানে আশ্রয় নিয়েছিল।) দেখতে পেলেন। এই কাঁটাঝোপগুলিকে এখন এই মুহূর্তে সিপাহী বিদ্রোহের সময় মৃত্যু হওয়া সৈনিকদের শুকনো হাড়ের ধ্বংসাবশেষের মত দেখাচ্ছে। জ্বলজ্বলে চন্দ্রের কিরণ এই হাড়-মাথাগুলি আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

দেশ-বিভাজনের এই ভয়ংকর সময়ে কেউ তাকে এনে হিন্দু কলেজে ভর্তি করে দিয়ে গিয়েছিল। স্যার মরিস গয়ারের অনুরোধে পাকিস্তান থেকে নতুন করে এসে যোগ দেওয়া ছাত্রদের একটা ক্লাস নেওয়ার জন্য তিনি সকালবেলা হিন্দু কলেজে গিয়েছিলেন। কাশ্মীর গেট থেকে উঠে আসা 'সেন্ট স্টিফেন্স' কলেজেও তিনি আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটদের একটা ক্লাস নিয়েছিলেন। দুটো কলেজেই তিনি 'জুলিয়াস সীজার' পড়াতেন। ছাত্ররা বড় মনোযোগের সঙ্গে ক্লাস করত। দেশ-বিভাজনের দুর্ঘটনায় সেখানে এসে পড়া ছাত্রদের এত ভিড় হয়েছিল যে কিছু ছাত্র দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনত, কিছু কিছু ছাত্র হাঁটু গেড়ে বসেও অনেক কষ্ট করে নোটস্ নিত।

একেবারে স্পষ্টভাবে মনে আছে, জুলিয়াস সীজারের কোন অঙ্কে, কোন সিনে সেই ঘটনা ঘটেছিল? "O mighty Caeser! I doest thou lie so low?"

হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানটাতে একটা ফোঁপানি শুনে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। মাথা তুলে তিনি কালো ঘাগরা, আর রূপোর 'মুকেশের' কাজ করা সিফনের চুন্নি পরা সতীদেবীকে দেখতে পেয়েছিলেন। সে ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখ দুটো চেপে ধরেছিল। তার দীর্ঘ বেণীটা সাপের মত পাক খেয়ে কাঠের বেঞ্চটাতে পড়েছিল। সেদিন জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুযন্ত্রণার ছবি দেখে তিনি কেঁদেছিলেন কি?

তিনি মাথা তুলে তার দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘটল সেই ঘটনাটা। কেউ গোলাপ, কেউবা গুলমোহর, কেউবা কবিতা লেখা কাগজের টুকরো সতীদেবীর দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে হুলুস্থুলের সৃষ্টি হয়ে গেল। তাঁর হাত থেকে জুলিয়াস সীজার কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়ল তিনি নিজেই বলতে পারলেন না। কোন ফাঁকে তিনি এসে মেয়েটিকে রক্ষা করার জন্য সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, সে কথা তাঁর মনে ছিল না। তাকে সামনে দেখে যেন আক্রমণ করতে যাওয়া ছাত্রের দলটা পিছিয়ে গিয়েছিল। ভীত সতীদেবী দ্রুত এগিয়ে এসে তার শার্টটা খামচে ধরেছিলেন।

একটা টাঙ্গা করে সেদিন তিনি নিজে সতীদেবীকে দিল্লির প্রখ্যাত 'রঙা বস্তি'-র জি.বি রোডের হলদে-কুঠিতে রেখে এসেছিলেন। 'একজিকিউটিভ কাউন্সিল' আর 'অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে' সতীদেবীর অ্যাডমিশন নিয়ে তর্কাতর্কি, ঝগড়া হয়েছিল। অ্যাকডেমিক কাউন্সিলের একজন মেম্বার অনেক যুক্তি দেখিয়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন—'এখন দেশবিভাজনের ভয়ানক সময়। পালিয়ে আসা ছাত্রদের আমরা ভালভাবে জায়গা দিতে পারছি না। এরকম অবস্থায় কলঙ্কিত রঙাবস্তি থেকে আসা দুশ্চরিত্রার বীজ এখানে ছিটকে পড়লে এই জায়গার পবিত্রতা ধ্বংস হয়ে যাবে। কোনভাবেই মেয়েটিকে হিন্দু কলেজে ভর্তি হতে দেওয়া চলবে না। সে একটি বেশ্যার মেয়ে—এই কথাটা ছাত্রদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে।'

তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রত্যেকেই গুনগুন করে বলে উঠেছিল ঃ 'শোন শোন, রবার্ট ঠাকুরদাস কী বলছে শোন।' কীভাবে শুরু করেছিলেন তিনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কীভাবে?

'শিক্ষা হচ্ছে আলো। এই আলো যদি আমাদের দেশের আনাচে কানাচে প্রবেশ না করে, তাহলে আমাদের স্বাধীন হয়েই বা কী লাভ? এই আলো প্রথমে সেখানেই ছড়িয়ে পড়ুক যে স্থান যুগ যুগ ধরে অন্ধকারে হয়ে রয়েছে। তাছাড়া মেয়েটির মা রঙাবস্তির বাসিন্দা ঠিক কথা, কিন্তু তার পিতা রামবাহাদুর রাণা একজন চরিত্রবান সাহসী সৈনিক ছিলেন। হিন্দুস্থানের শতকরা আশিভাগ মহিলা এরকম অভাবে পড়ে এই পথ বেছে নেয়। মেয়েটির মা-ও এরকম অভাবেরই বলি ছিলেন। ...একজন মেম্বার চিৎকার করে উঠেছিল—'রঙাবস্তি এলাকায় কি জন্য বাহাদুর সৈনিককে গুলি খেয়ে মরতে হল?'

'এর কারণও আছে। অসহায় কয়েকজন মহিলাকে গুণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে রামবাহাদুর রাণার জি.বি রোডের হলদে-কুঠিতে মৃত্যু হয়েছিল। সে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছে। একথা দিল্লির খবরের কাগজগুলিতে ভালভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কাগজগুলির কাটিংগুলিও সতীদেবী দিয়ে গেছে—আপনারা পড়ে দেখুন। একটি বিদ্যোৎসাহী বালিকা দিন-রাত পরিশ্রম করে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। কিছু বিদ্যোৎসাহী লোক তাকে এনে হিন্দু কলেজে ভর্তি করে গেছে আর....' কী বলেছিলেন তিনি? একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বাররা। একজন কমিউনিস্ট মেম্বার টেবিল চাপড়ে তার কথা সমর্থন করেছিল। মেয়েটি যাওয়া আসা শুরু করেছিল। কিন্তু সুখ ছিল কি? না-না, বিন্দুমাত্র সুখ ছিল না। এক অনন্য সৌন্দর্য ছিল মেয়েটির।

এরকম শিশুসুলভ কমনীয়তা আজ পর্যন্ত তিনি কোন নারীর দেহে দেখেন নি। ছাত্র-শিক্ষক সকলেই যেন একপ্রকার মোহিত হয়ে পড়েছিল। এমনকি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা দুর্দশাগ্রস্ত হতভাগা ছাত্ররাও সুবিধে পেলেই তার 'মুকেশের' কাজ করা চুন্নিটা ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করত।

হঠাৎ রবার্ট ঠাকুরদাসের চমক ভাঙল। গাড়োয়ালি পুনরায় তার ভারি জুতোসহ ধপ ধপ শব্দ করে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল-- -'আজ খানা খানেকা ইরাদা নহী। ম্যায় টেবিল সজাকর যা রহা হুঁ। ওহ্ লড়কা ফির আয়া থা। জরুর তবাহ্ করকে যায়েগা।'

রবার্ট সাহেবের উত্তরের অপেক্ষা না করে গাড়োয়ালি পুনরায় জুতোতে শব্দ তুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। মনটা যেন একেবারে ভেঙে গেছে এরকম মনে হতে লাগল ঠাকুরদাসের। সে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আলমারি খুলে একটা নতুন বোতল নিয়ে শোবার ঘরে এলেন। বাইরের দরজার হুকটাও এবার লাগিয়ে এলেন ঘরে যাতে কেউ এসে তাকে আর বিরক্ত করতে না পারে। খোলা জানালার সামনে পুনরায় তিনি বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসলেন।

এরকম অবস্থা আগে কখনও হয় নি। দুই পেগ থেকে বেশি খাবার অবস্থা কখনও হয় নি। বেশিরভাগ সময় তিনি গ্রন্থাগারেই কাটাতেন। সঙ্গী-সাথী আগেও খুব বেশি ছিল না। সতীদেবীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ছবি দেখে সেই প্রিয় সতীর্থরা? করাচি থেকে পালিয়ে আসা পণ্ডিত ধনবর রাজপুত, জগতার সিং পরদেশি, এই ক্যাভেলরি লাইনে একসঙ্গে বসবাস করা অধ্যাপক চার্লটন ব্রাউন সাহেব, ফুলব্রাইট স্কলার হান্টার সাহেব---না-না, কেউ তাঁর সঙ্গে বিকেলে আড্ডা দিতে আসতেন না। সেই বছরেই অর্থাৎ ১৯৪৮ সনে মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। মায়ের 'শেষ সার্ভিসে'-র জন্য খুব কম মানুষই এসেছিলেন। সতী দেবী মায়ের সঙ্গে এসেছিল। সে চুন্নি দিয়ে মুখ ঢেকে এসেছিল। সমস্ত কিছুই মনে আছে রবার্ট ঠাকুরদাসের। পরিবারের পুরনো বন্ধু বাটলার দম্পতিও এসেছিলেন।

কাউকে পরোয়া করতেন না রবার্ট ঠাকুরদাস। দিন-দুপুরে জি.বি রোডের রঙা-বস্তির এলাকাতে যেতেন। সতী তাঁর কাছে ইংরেজি পড়তেন। বড় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না মেয়ে ছিল। টাকা-পয়সারও সমস্যা ছিল। লালকুয়া হাউস খাসের সামনে থাকা একজন কাকা মাঝে মধ্যে এসে মা-মেয়েকে সাহায্য করে যেতেন। তাঁকে এই মানুষটি খুব সম্মান করতেন। একটা চোখ কানা একেবারে টাকমাথা এই লোকটি নাকিসুরে কথা বলতেন। তিনি কোন এক দূতাবাসে কাজ করতেন। কখনও কখনও তিনি হিন্দি শব্দের একটা তালিকা এনে তাঁর সাহায্যে ইংরেজী করিয়ে নিতেন। কি ধরণের ছিল সেই সমস্ত শব্দ?

বিনিময়-পত্র, স্বায়ত্বতা, মহালেখা পরীক্ষক, মহান্যায়বাণী, বার্ষিক বিত্ত বিবরণ, পঞ্জী, পৃষ্ঠাংকিত, অনুদান, পূর্ত, ফরিয়াদ ইত্যাদি অনেক দাঁতভাঙা শব্দের তিনি ইংরেজি অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। সতী দেবীকে নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে অনেক স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। ভারতের মহীয়সী নারীদের মধ্যে একদিন সতী দেবীরও স্থান হবে। তিনি প্রেম আর পাণ্ডিত্যে সেই কুখ্যাত জি.বি রোডের এই নারীকে মহীয়সী করে তুলতে পারবেন। এরকমেরই একটা স্বপ্ন ছিল তাঁর।

শেষের দিকে সেন্ট স্টিফেন্সের অধ্যাপক ফ্রেড্রিক হিউম, জোসেফ লেইতও বিকেলে তাঁর কাছে আসা ছেড়ে দিলেন। ফ্রেড্রিক হিউমের সঙ্গ তিনি ভালবাসতেন। তাঁর পিতা ১৯১৯ সনে সেন্ট স্টিফেনে পড়তেন, যে সময়ে পৃথিবীবিখ্যাত কর্ণেল লরেন্স অফ আরবিয়ার ভাই অক্সফোর্ডের ছাত্র লরেন্স এই কলেজের ছাত্রদের জেমস অ্যান্থনি ফ্রুডের রচনা পড়াতেন। প্রথম মহাযুদ্ধে দাদার মত তিনিও নাকি বিমান চালকরূপে পারদর্শিতা দেখিয়ে বীরগতি লাভ করেছিলেন।

সেই সময়ে সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ কাশ্মিরী গেটে অবস্থিত ছিল। ১৯১৮-১৯ সনে মহাত্মা গান্ধী অহরহ এখানকার অধ্যক্ষের বাড়িতে অতিথি হয়ে আসতেন। দেশ বিভাজনের সেই ভয়ঙ্কর দিনেই ঘটল সেই ঘটনা। টাঙ্গায় উঠে তিনি হাউস খাস হয়ে জিবি রোডে যাচ্ছিলেন। খাকি উর্দিপরা পাহারাদার প্রত্যেকে 'জিনার' কাছে দাঁড়িয়েছিল। লালকুয়ার গলি হিন্দু-মুসলমানের রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল। সেদিন করালবাগের প্রখ্যাত চিকিৎসক যোগীকে কেউ গুলি করে হত্যা করেছিল। কিন্তু না, এই জিবি রোডের রঙাবস্তির এলাকায় কোন গণ্ডগোল ছিল না। বিদেশী দূতাবাসে কাজ করা সতীদেবীর কাকাও এসেছিল। প্রত্যেকেই বৈঠকে বসেছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় ভালভাবে মনে আছে। সতীদেবীও স্নান করে এসে বৈঠকে বসেছিল। চুন্নি নেয় নি। ঘাগরার উপরে একটা ঢিলে কামিজ পরেছিল। লম্বা চুলগুলিকে সামনে এনে বারবার সে এঁটে নেবার চেষ্টা করছিল। কাকা শিখদের পরার মত চুড়িদার আর শেরওয়ানী পরেছিল। সতীদেবীর মা গ্লাসে ঠাণ্ডাই (বরফ, বাদাম, পেস্তা, দুধ দিয়ে তৈরি করা একপ্রকার পানীয়) সবাইকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। একেবারে শান্ত পরিবেশ ছিল। খারী বাউলী দরিয়াগঞ্জ বৈরাম খাঁ মার্গ, হজরত নিজামুদ্দিন এঞ্জগঞ্জ ইত্যাদিতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ভয়ঙ্করতার কোন চিহ্নমাত্রই সেখানে ছিল না। ঠিক তখনই একটা ঘটনা ঘটল। 'কোঠি' র সামনে দুটো পুলিসের ট্রাক এসে দাঁড়াল। হুড়মুড় করে নেমে এল পুলিসের দল। এসেই তারা দরজায় ধাক্কাতে লাগল। চিৎকার, চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। শেষে দরজা ভেঙে তারা ভেতরে ঢুকে পড়ল। একটা পুলিস ইন্সপেক্টর চিৎকার করে উঠল। —'কাহা গায়েব কর দিয়া গোরা সাহেবকো—নিকালো। নিকালো।'

—'নিকালো। নিকালো দেশকে গদ্দারোঁকো। কাহা হ্যাঁয় কাগজাত....?' চিৎকার চেঁচামেচি, কান্নাকাটি পড়ে গেল। কোথা থেকে জানি পুলিস ধরে নিয়ে এল দূতাবাসের গোরা-সাহেবদের। তিনি এখানেই বসেছিলেন, যদিও কোন কিছুই জানতেন না। বিস্ময়কর। বিস্ময়কর। এটা চোরাকারবারির আড্ডা। ছড়িয়ে পড়ল কাগজপত্র। ফরেন কারেন্সির বাণ্ডিল উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। পালা - পালা। ধর - ধর। মার পালা। ধর। কে যেন তার মাথায় ডাণ্ডা দিয়ে একটা আঘাত করল। তিনি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়লেন। কীভাবে জানবেন রবার্ট ঠাকুরদাসের মত অধ্যাপক যে এটা গুপ্তচরদের আড্ডা? এখানে সতী দেবী থাকেন। নির্মল-হৃদয়া সতী দেবী।

....তাঁকে কেউ ধরে উঠিয়েছিল। মাথায় জল ঢেলেছিল। জ্ঞান ফিরে আসতেই সেই জবরজং পুলিস ইন্সপেক্টার তাঁকে কিছু কাগজপত্র পড়তে দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত পণ্ডিত বলে জানতেন। সেজনাই বোধহয় ইন্সপেক্টর তাঁকে সেসব পড়তে দিয়েছিলেন। সেগুলি রাশিয়া থেকে 75 mm বন্দুক কেনার কোটেশন ছিল। সীমান্তে সৈনিকের মোতায়েন (Deployment of troops in the border) সম্বন্ধীয় কিছু অত্যন্ত গোপনীয় কাগজ পত্রও ছিল। তাঁর চোখের সামনে সেই সব আবিষ্কৃত হয়েছিল। নতুন করে স্বাধীন হওয়া ভারতবর্ষকে উলঙ্গ করে দেখতে চাওয়া এক শত্রু দেশের চক্রান্ত ছিল সেটা। শিকড় উপড়ে যাওয়া গাছের মত দরজার সামনে ছিটকে পড়া সতী দেবী কাঁদছিলেন। দৌড়ে গিয়ে তাকে তুলে ধরার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। জিবি রোডে জমায়েত হওয়া ভিড় ভাঙার জন্য পুলিস লাঠি চালিয়েছিল।

একটা রাত তাকে পুলিস স্টেশনে কাটাতেও হয়েছিল। একজন পরিচিত পুলিস কমিশনারের সহায়তায় কোনমতে তিনি মুক্ত হয়ে আসতে পেরেছিলেন। পুলিস তার ঘরে যাওয়া-আসা শুরু করেছিল। একদিন নয়, অনেকদিন পর্যন্ত আসাযাওয়া করেছিল। ডিপার্টমেন্টাল কাউন্সিল?

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ? অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ? হ্যাঁ, হ্যা এই ঘটনাটা নিয়ে সব জায়গাতেই তর্কাতর্কি চলেছিল। কিন্তু স্যার মরিস গয়ার যেন তাঁকে বুঝতে পেরেছিলেন। আর সতী দেবী ?

সতী দেবী ? লালকুয়া আর হাউসখাসের রিডিউজি একদলের সঙ্গে পরিবারটা পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিল।

.. .এখন মধ্যরাত। ব্রাণ্ডির বোতলটা রবার্ট ঠাকুরদাস শেষ করে ফেললেন। আজ তিনি একপ্রকার মাতালই হয়ে পড়লেন।

....খোলা জানালা দিয়ে তিনি পুনরায় চন্দ্রটা দেখতে পেলেন। রীজের কাঁটা গাছের জঙ্গলটা থেকে অনেক অনেক দূরে। চন্দ্র নয়, যেন একটা সাদা ঘুড়ি কেউ অনেক অনেক দূর থেকে উড়িয়েছে। 'জীতগড় মিনার' থেকে উড়িয়েছে। এই মিনার থেকে কামান দিয়ে গোলাবর্ষণ করে ফিরিঙ্গিরা লালকেল্লার প্রাচীর ছারখার করেছিল। এই নেশামগ্ন অবস্থায় রবার্ট ঠাকুরদাসের রাগ হল। এই পৃথিবীতে যেন বিবেকহীন লোকের সংখ্যা বেশি। এই মুহূর্তে সবাইকে তাঁর বিবেকহীন মনে হতে লাগল। জানালার গ্রিলে খামচে ধরে তিনি মদ্যপ মানুষের মত চিৎকার করতে লাগলেন —

Selfish! You are all stupid !

Selfish! You are all stupid !

নেশামগ্ন অবস্থায় হঠাৎ তিনি যেন নিজের বুকের ধুকপুকানি শুনতে পেলেন। না না, এটা তাঁর নিজের বুকের ধুকপুকানি নয়, কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে। তিনি কান পেতে শুনলেন—হ্যাঁ, কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে।

সত্যি সত্যিই রবার্ট ঠাকুরদাসের খুব রাগ হল। তাঁকে কেউ তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেয়নি। এই ছাত্রগুলি আর ইলিয়টকে নিয়ে তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় কাটিয়ে এলেন—সেই ছাত্রদের একটা দলই সেদিন তাঁর ঘরে এসে মদ খেয়ে সতীদেবীর কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেল। কি সম্বন্ধ ছিল তার সঙ্গে সতী দেবীর ? সতী দেবীকে তিনি কোনদিন স্পর্শ করতে পেরেছিলেন কি ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, টাকাপয়সা দিয়ে তিনি সতী দেবীকে সাহায্য করেছিলেন। 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে'-র পুরো একটা চেকবই তিনি সই করে সতী দেবীকে দিয়েছিলেন। কিন্তু কি সম্বন্ধ ছিল ? এই নেশামগ্ন অবস্থায় তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ হল। এরকম আগে-পরে কখনও হয় নি। আজ কিন্তু কিছু একটা হয়েছে তার।

....কম্পিত পদক্ষেপে তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। দরজা খুলে দিয়ে লাইটের আলোতে তিনি সেই লম্বা আর শক্তপোক্ত মিষ্টি ছেলেটিকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। রবার্ট ঠাকুদাস রাগে একেবারে পাগল হয়ে উঠলেন। 'গেট আউট। গেট আউট। অর আই উইল কিল ইউ।' কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছেলেটি থতমত খেয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। রবার্ট ঠাকুরদাস এবার দ্রুত ঘরে ঢুকে গেলেন। তারপর বৈঠকখানা থেকে একটা ফুলদানি এনে গায়ের জোরে ছেলেটির উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে মারলেন। ঢং করে শব্দ হল। ফুলদানিটা এবার বোধহয় তার কপালে লাগল।

- সকালবেলা গাড়োয়ালির জুতোর শব্দে রবার্ট ঠাকুরদাস জেগে উঠলেন। সে বিড়বিড় করছিল--'মুঝে মালুম থা তবাহ্ করকেহি ছোড়েঙ্গে। তবাহ্ হো গয়া হ্যাঁয়।' দরজা জানালা সব খোলা পড়েছিল। তিনি জুতো পরেই বৈঠকখানার সোফায় শুয়েছিলেন।

ঘুম থেকে উঠে রবার্ট ঠাকুরদাসের খুব দুর্বল লাগতে লাগল। অনেকদিন পরে তিনি গতকাল এভাবে মদ্যপান করেছিলেন। তাঁর তিনকুড়ি বছরের শরীরে এসব আর সহ্য হয় না এরকম একটা ভাব তার মনে হতে লাগল। তিনি কিছুটা গ্লানিও অনুভব করতে লাগলেন। বাইরে বেরিয়ে এসে

রবার্ট ঠাকুরদাস দেখলেন গুলমোহরের মধ্যে সকালের কুয়াশাগুলি ঢুকে পড়েছে। কুয়াশার মধ্যে লাল গুলমোহরের ফুলগুলি ধোঁয়ার মধ্যে থাকা জ্বলজ্বলে অঙ্গারের মত মনে হচ্ছে। এটা নভেম্বর মাস। এবার একটু তাড়াতাড়িই যেন ঠাণ্ডা পড়েছে। তিনি ভেতরে গিয়ে হ্যাঙ্গার থেকে একটা পুরনো ওভারকোট এনে গায়ে দিলেন। গাড়োয়ালি সেটা ঝেড়েঝুরে ঠিকঠাক করে রেখেছিল। মুখ-হাত ধুয়ে তিনি পুনরায় গুলমোহরের নিচে বসলেন। গাড়োয়ালি বাইরেই একটা টেবিল পেতে তাকে সকালের আহার দিল। হঠাৎ গাড়োয়ালি তাঁকে প্রশ্ন করল—'আজ সুবহ্ সে ওহ্ লড়কা দিখাই নহী পড় রহী হ্যাঁয়। পহলে তো ওহ্ রোজই 'ক্যাভালেরি লেন' মে দিন মে দশবারর চক্কর কাটতা থা। কাল রাত ফির আয়া থা?'

রবার্ট ঠাকুরদাস কোন উত্তর দিলেন না। বুকের কোন একটা কোমল অংশ যেন কেঁপে উঠল, এরকম একটা ভাব হল তার। না না, এ ব্যাপারটা তিনি বেশি সময় ভাবতে পারবেন না। আজ ১৯৮০ সনের ২৪ নভেম্বর। আজ সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের শতবার্ষিকী উৎসবের জন্য এগারোটার সময় 'প্রিন্স অব ওয়েলস' আসবেন কলেজ প্রাঙ্গনে। সেদিন কফিহাউসের চ্যাপলিন, রেভারেণ্ড ওয়েলস তাকে বলেছিলেন—'আসবে। পুরনো মানুষ নাই হয়ে গেল। তাছাড়া দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন গণ্ডগোল করার জন্য হুমকি দিয়েছে—তুমি আসবে...'

রবার্ট ঠাকুরদাস একটা সময়ে সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে যাবার জন্য তৈরি হলেন। ১৯৫৬ সনে তিনি এডুইনা মাউন্ট ব্যাটেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সময় এই শ্বার্ক স্কিনের স্যুটজোড়া পরেছিলেন।

কোটের 'লপলসের' কোথায় আর পরিবর্তন হল আজকাল। তবুও তিনি শ্বার্ক স্কিনের সাদা স্যুটজোড়া পরে এক অন্য ধরণের আনন্দ অনুভব করলেন। কোন কোন অংশ ঢিলে হয়ে পড়েছে, কোন কোন অংশ টাইট হয়ে গেছে। সঙ্গের ফ্যাল্টহ্যাটটাও অনেক জোগাড় যন্তর করে পরেছিলেন। এইবার 'ওয়ালনাটের' লাঠিটার খোঁজে তিনি চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলে। এই লাঠিটা আব্দুল গফর আনসারি অবসর নেবার সময় তাঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আনসারি তাঁর প্রিয় বন্ধু ছিলেন। এমনকি জি.বি রোডের সেই গণ্ডগোলের সময়েও তিনি একবার ঘোড়ায় টানা 'ভিক্টোরিয়া' নিয়ে তার কাছে এসেছিলেন। ১৯৫৭ সনের ১৫ আগস্টের দিন কিছু সংখ্যক রিফিউজির বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের গবেষণাগারটায় আগুন লাগানোর চেষ্টা বিফল করার জন্য ওয়াকার সাহেবের সঙ্গে যে কয়েকজন লোক প্রাণপন যুদ্ধ করে 'ঘায়েল' হয়েছিল, তাদের মধ্যে আনসারিও একজন ছিলেন।.... শেষে খোঁজ করে রবার্ট ঠাকুরদাস লাঠিটা বৈঠকখানা ঘরের কোণে গাড়োয়ালি সাজিয়ে রেখেছে দেখতে পেলেন।

....এই মুহূর্তে রবার্ট ঠাকুরদাসের মন বেশ মুক্ত মনে হতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে বাইরের বারান্দায় বসে গাড়োয়ালি তার জুতোজোড়া পরিষ্কার করছিল। এবার জুতোজোড়া রাখতে এসে তিনি বললেন—'ওহ্ লড়কে কা নিয়ত শায়দ আচ্ছা নহী থা। ক্যা ওহ্ পিছলী রাত আয়া থা?' একটা সময় রবার্ট ঠাকুরদাস সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ। ব্রীজের কাঁটা কুল আর কাবুলি লতাগুলির দিকে চোখ গেল তার। সেই মরিস গয়ার থাকা দিনগুলির মত 'ভাইসরিগেল লজের' (বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের) পেছনের এই অংশটা একেবারে নির্জন। ছলো বাঁদরগুলো দেওয়ালের উপরে উঠে ছটোপুটি করছে। মাঝে মধ্যে ওরা একেবারে মাঝখানে এসে ঘুরে যাচ্ছে। এখানকার আবহাওয়ার খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। এখানটাতে দাঁড়িয়ে তিনি রৌশনারা রোডের 'ফসহি' বিল্ডিং-এ হওয়া গোলাগুলির শব্দ শুনেছিলেন। 'ফসহি'

বিল্ডিং এ নাকি বারুদ আর আগ্নেয়াস্ত্রের একটা গোপন ঘাঁটি ছিল। রৌশনারার সমাধি থেকে লালকেল্লা পর্যন্ত থাকার মত ফসহি বিল্ডিং থেকে সব্জীমণ্ডি পর্যন্ত নাকি একটা সুড়ঙ্গ ছিল —এগুলি মানুষে বলা কথা মাত্র। তখনও বলত, এখনও বলে।

সেন্ট স্টিফেন্সের আলিটাতে তিনি এসে দাঁড়ালেন। ইশ্ ভেতরে যাওয়াই যেন মুশকিল। পুলিশ আর মানুষের ভিড়। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংঘের ছেলেদের মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে—

'ফিরে যাও। রাজকুমার ফিরে যাও।'

"Down with British Policy"

"Down with Radical discrimination" ইশ্ কী হুলুস্থুল, কিছু শোনাই যায় না।' কেউ একজন কালো পতাকা উড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে— 'ব্রিটিশ ইমিগ্রেশন পলিসি। হায় হায়।

....এই ভিড়ের মধ্যে ঢুকবেন না কি ঢুকবেন না? একটা সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় পড়ে বাস শেলটারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ই কেউ একজনের চিৎকার শুনতে পেলেন রবার্ট ঠাকুরদাস। কিন্তু ভালভাবে তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। আঃ কি হুলুস্থুল। কি হুলুস্থুল—

"Down with British Nuclear Policy"

"Ban the Bomb"

ঐ যে দিল্লি পুলিসের গাড়ি আসছে। ডেমনস্ট্রেটর আর পুলিসের মধ্যে লড়াই বেঁধে উঠেছে। —হ্যাঁ, কেউ একজন চিৎকার করে করে তাকে ডাকছে—স্যার, স্যার। রবার্ট ঠাকুরদাস স্যার।' ঐ যে ভিড় ঠেলে কেউ একজন এগিয়ে আসছে। সাহেব দেখলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উর্দু বিভাগের একজন অধ্যাপক তাঁকে উদ্দেশ্য করে এগিয়ে আসছে—'রবার্ট ঠাকুরদাস স্যার।' রবার্ট ঠাকুদাসের পুরনো একটা পেটের ব্যথা ছিল। এই মুহূর্তে তাঁর মনে হল সেই ব্যথাটা আবার চাগাড় দিয়ে উঠেছে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি খক খক করে কাশতে লাগলেন। তাঁর খোঁজে আসা অধ্যাপকটি এবার তাঁর হাত খামচে ধরলেন। অনেক সময় ধরে রবার্ট ঠাকুরদাস কিন্তু কাশতেই লাগলেন। তারপর মুখটা মুছে নিয়ে তিনি বললেন—

'কী হয়েছে?'

উর্দু অধ্যাপকটি বললেন—'আমি একটা খারাপ খবর দিতে এসেছি।' রবার্ট ঠাকুরদাস স্থির হয়ে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'কী হয়েছে?'

'ছাত্র মার্গের নতুন হোস্টেলের একজন ছাত্র সকালবেলা আত্মহত্যা করেছে। সে আপনার নামে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। ওয়ার্ডেন আপনাকে খবর দিতে বললেন।'

'আমার নামে চিঠি? আত্মহত্যা, You mean Suicide!'

না না কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

"Down with imigratin Policy, Go Back!"

....অধ্যাপকটির হাত খামচে ধরে রবার্ট ঠাকুরদাস দ্রুত পা ফেলে একটু নিরাপদ স্থানে অর্থাৎ রীজের মধ্য দিয়ে যাওয়া পাহাড়ী আলিটার উদ্দেশ্যে কিছুটা এগিয়ে গেলেন।

'ছেলেটি সিলিং ফ্যানে রশি বেঁধে আত্মহত্যা করেছে। গতরাতে ঘটেছে এই ঘটনা।'

'আত্মহত্যা? ছাত্রই..'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, গতরাতে ঘটেছে এই ঘটনা....পুলিস এবং ক্রাইম টিম পুরো দুই ঘন্টা তদন্ত করে এখন লাশটা সাব্জি মণ্ডির মর্গে পোস্ট মর্টেমের জন্য নিয়ে গেছে। যেহেতু ছাত্রটি চিঠিটা আপনার নামে লিখে রেখে গেছে, তাই পুলিস ইনস্পেক্টরটি আপনাকে একবার 'রৌশনারা পুলিস স্টেশনে যাবার কথা বলেছেন। ওয়ার্ডেন এই দায়িত্বটা আমাকেই দিয়েছেন। এই খবর দিতে আসার জন্য আমি দুঃখিত। আপনি প্রিন্স অফ ওয়েলসকে দেখার জন্য এসেছেন. .আপনি এই সুন্দর সাজপোযাক পরে এসেছেন, আপনি যান, ভেতরে যান...কিন্তু ঐ যে গেটে ধুন্দুমার লেগেছে। পুলিস আবার লাঠি চালাবে নাকি স্যার? রবার্ট ঠাকুরদাস স্যার....? রবার্ট ঠাকুরদাস স্যার কাশতে শুরু করলেন। খক খক খক খক করে তিনি কাশতে শুরু করলেন।

'রবার্ট ঠাকুরদাস স্যার, কী হয়েছে আপনার?'

'না না, কিছুই হয়নি।' খক খক। খক। রুমাল দিয়ে মুখের লালা মুছে নিয়ে রবার্ট ঠাকুরদাস বললেন, 'না না আমি ভেতরে ঢুকব না। আমাকে একবার তুমি হোস্টেলে নিয়ে চল।'

...দুজনেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন আর পুলিসের ভিড় ঠেলে 'ছাত্র মার্গের' দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। ছাত্র মার্গের এই হোস্টেলটা একেবারে নতুন। ছাত্র সংখ্যাও কম। যে কয়জন ছিল সে কয়জনও এখানে সেখানে দল বেঁধে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যেকেরই চোখ মাটির দিকে নিবদ্ধ ছিল।

· 'হতভম্ব। ত্রাসিত। মর্মাহত।'

...দুটি ছেলে ভাগাভাগি করে বসবাস করা ঘরটাতে কেউ একজন তাকে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। সঙ্গের ছেলেটি এক কোণে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

....ঐগুলি ছাত্রটির জিনিস, চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তার শার্ট, নোটবই, কয়েকটা বই, শুকনো রুটি। মেস ডিউজ দিতে না পেরে বোধহয় সামনের ধাবা থেকে রুটি এনে খেয়েছিল। একেবারে বাসি রুটি। দু'দিন হয়ত কিছুই খায়নি। ছবিও ভাল আঁকত বোধহয়। ওগুলি সব কিসের ছবি এঁকেছিল? পশু-পাখি....গুলমোহরের গাছ....না না আর দেখা যায় না। দেওয়ালে লাগানো আছে একটা পুরনো ঘড়ি।

রাতের ঘুমের ক্ষতি করে দুঃখে-ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া ওয়ার্ডেনটি রবার্ট ঠাকুরদাসের কাছে এসে একেবারে হাহাকার করে বলে উঠল—'ছেলেটির কেউ নেই বললেও হয়। মা নালন্দার যক্ষ্মা হাসপাতালে পড়ে রয়েছে। দাদা পুলিসের কাজের খোঁজে যাবার সময় হোসিয়ারপুরে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল। অনেক বছর ধরে সে বেকার ছিল। ঘর থেকে সনাক্তকরণের জন্য কেউ আসার সম্ভাবনা নেই। আপনাকে ইনস্পেক্টারের সাথে পোস্টমর্টেমের ঘরে গিয়ে সনাক্ত করতে হবে। কারণ ছেলেটি চিঠিতে আপনার নাম লিখে রেখে গেছে। মর্গে দেহটা ৭২ ঘণ্টার বেশি সময় তারা রাখবে না। সেবাসমিতিকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

এই নভেম্বর মাসেও শার্ক স্কিনের স্যুটজোড়া যেন তাকে নিঃশ্বাস নিতে না পারার মত করে চেপে ধরেছে- রৌশনারা রোডের পুলিস স্টেশনে বসে এরকমই মনে হচ্ছিল রবার্ট ঠাকুরদাসের। মাথার উপরেও ফেল্টহ্যাটটাও ভারি বলেই মনে হচ্ছিল। ছাত্রটি লিখে যাওয়া চিঠিটা তিনি পড়লেন- —'আমার প্রগ্রেস রিপোর্ট Satisfactory নয়। এজন্য বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেদিন কুড়িবার আমি সুপারভাইজারের কাছে গিয়েছিলাম। The system is so defective that

the Reseı ch Scholar ıs wholly dependent upon hıs superviser to get a satisfactory progress Report, অসহায় হয়ে আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম। দাদার মৃত্যুর পরে টাকা উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে রাজনীতির কথা কিছুই জানত না। অথচ রাজনীতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হিংসাকাণ্ডে সে বলি হল। স্যার রবার্ট ঠাকুরদাস আপনাকে নমস্কার। আপনার কাছ থেকে নেওয়া টাকা শোধ করতে পারলাম না। আমার প্রিয় ঘড়িটা আর আমার আঁকা ছবিদুটো আপনি রাখবেন। আমার অনুরোধ। ইতি— নির্মল ভট্টাচার্য।'

পুলিস ইনস্পেক্টরের সঙ্গেই রবার্ট ঠাকুরদাস সব্জীমণ্ডির শবগৃহের উদ্দেশ্যে একটা স্কুটারেই রওনা হলেন। রোশেনারা রোড ধরে গিয়ে বাঁ হাতের বরফখানার সামনে ছিল এই 'শবগৃহ'। সামনে ছিল ক্রাইষ্ট চার্চ। (মেথডিষ্ট মিশন ডাক্তার উইলিয়াম বাটলারের স্মৃতিতে পঞ্চাশ বছর আগে তৈরী গির্জাঘর)।

শবগৃহের সামনের ছোট অফিসটাতে ইনচার্জ বসেছিলেন। পুলিসের ভিড় তাকে প্রায় গিলে খাবার মত অবস্থা হয়েছিল। দুই নম্বর চৌকির রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়া 'আনক্লেমড' শবদেহের সংখ্যা কুড়িজনের মত হয়েছিল। ৭২ ঘন্টা পার হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত শবদেহ নিয়ে যাবার বিষয়ে অফিসারটি আর দিল্লি পুলিস অফিসারের মধ্যে তর্ক বেঁধে যাবার উপক্রম হয়েছিল। মৃতদেহ সনাক্ত করতে আসা দুইজন বুড়ি বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে হড়হড় করে বমি করছিল।

অধ্যাপককে দেখে এই গণ্ডগোলের মধ্যেও মোটাসোটা দেহের ইনচার্জটি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বেল টিপে শক্তপোক্ত একজন বেযারাকে ডেকে আনলেন। কামরার দরজা খুলে ফার্সের শবগুলির মধ্য দিয়ে পথ বের করে দে। ফার্সের রক্ত ধুয়ে দিবি। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানুষ, কাল রাতে মরা ছাত্রটির বডি দেখবে ...'

শক্তপোক্ত বেয়ারাটা সেলাম ঠুকে ভেতরে চলে গেল। অফিসারটি পুনরায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পুলিস ইন্সপেক্টারটি বসে থাকা একজন পুলিসকে উঠিয়ে রবার্ট ঠাকুরদাসকে একটা কাঠের চেয়ার এগিয়ে দিলেন। একেবারে অধৈর্য হয়ে পড়লেন রবার্ট ঠাকুরদাস। গলায় যেন কিছু একটা আটকে রয়েছে এরকম মনে হতে লাগল রবার্ট ঠাকুরদাসের। ঐ যে তার চোখের সামনে রিপোর্টগুলি সব স্তুপীকৃত করে রাখা আছে।

Form No 25-35 (1) STEREO I G P No 94C

Death report unnatural death by poisoning.

আঃ আর কী লেখা আছে? আঃ আর কী লেখা আছে?

Was deceased in good health previous to the attack?

What did the last meal cosist of?

আঃ পেছনদিকে ঐ যে মৃতদেহ পাওয়া জায়গাটার ছবিও আঁকা আছে। দুজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির স্বাক্ষরও নেওয়া আছে। এ সমস্ত কিছুই রবার্ট ঠাকুরদাস দূর থেকেই স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন। ঐ যে আরও একটি দরখাস্তের সঙ্গে দেওয়া ফর্ম। কিছু বাক্য একেবারে জ্বলজ্বল করে ঠাকুরদাসের চোখে পড়ল।

'Blood liquid or clotted ?' Where oozed from and what amount?

'Was there any rope or other article round the neck, or any mark of ligature on the neck ?'

'Are there any circumstances or rumours lending to show that deceased filled himself?'

ঐ শবটির পাওয়া স্থানের চিত্র নেই। না, এই মুহূর্তে তিনি মাথা তুলে কোন জিনিসই আর দেখতে পাচ্ছেন না। আঃ নিজের শরীরটাও এই মুহূর্তে ভারী ভারী লাগছে। ঐ যে ওরা সব্জীমণ্ডি এলাকার পুলিস ইন্সপেক্টর বোধহয়। একেবারে পচে যাওয়া শবদেহগুলি রাখা না-রাখা নিয়ে তর্কবিতর্ক চলছে। কিছু ছাত্রকেও তিনি বাইরে অপেক্ষা করে থাকতে দেখলেন। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠছে বলে মনে হল তার। ঠিক তখনই সেই শক্তপোক্ত কর্মচারীটা এসে খবর দিল— 'স্যার আপনি এখন আসুন।' রিপোর্টের স্তূপের উপর শকুন পড়ার মত পড়ে থাকা খাকি কাপড় পরা পুলিসের দলটি রবার্ট ঠাকুরদাসের দিকে একবার মাথা তুলে তাকাল। পুলিস ইন্সপেক্টারকে সঙ্গে নিয়ে এবার তিনি হাতড়ে হাতড়ে লাশটা দেখার জন্য শবগৃহের দিকে এগিয়ে চললেন। অন্ধকূপ সদৃশ ঘরটিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্গন্ধ তার নাকে এসে লাগল। এই ঘর থেকে কেউ এই দুর্গন্ধ মুছে ফেলতে পারবে কি? পারবে না। পারবে না। অসম্ভব কথা। এই ঘরের এই গন্ধই এরকম। অনেক বছর বন্ধ করে রাখা শ্যাওলা পড়া চাউলের কলসের বন্ধ মুখ খুললে যে ধরণের গন্ধ বের হয়, বাসি হয়ে পড়ে থাকা মানুষের মৃতদেহের গন্ধটাও ঠিক সেরকমই। রবার্ট ঠাকুরদাস যেন নিজের বুকের ধুকপুক নিজের কানে শুনতে পেলেন। কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীর মত অবস্থা হল তার।

জবাবদিহি?

কিসের জবাবদিহি?....

শবগৃহের বাইরে দল বেঁধে অপেক্ষা করতে থাকা কিছু ছাত্রের কণ্ঠস্বর তিনি শুনতে পেলেন।

'ঐ যে রবার্ট ঠাকুরদাস ভেতরে ঢুকলেন।'

'দাদার মৃত্যুর পরে ছেলেটা ভেতরে ভেতরে একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। সবার কাছ থেকে পয়সা ধার করে বেড়াত।'

'মুখ ফুটে কাউকে কিছুই বলত না। হয়ত আরও কিছু ছিল।'

'না না বলেছিল। রবার্ট ঠাকুরদাসকে হৃদয়ের কথা বলেছিল।' বুকের মাঝখানটায় এক টুকরো অদৃশ্য মাংস যেন নিচে খসে পড়ল। আরও সামনে এগিয়ে গেলেন রবার্ট ঠাকুরদাস। বাসি শবদেহের সেই শ্যাওলা পড়া চাউলের মত গন্ধ এবার তার হৃদয় কাঁপিয়ে তুলল।

তিনি আরও এগিয়ে গেলেন, চোখের সামনে তিনি পোস্টমর্টেম করার পাথরের খাঁজ-কাটা বিছানাটা দেখতে পেলেন। তিনি আসবেন জেনে হয়তো ধুয়ে রেখেছে, কিন্তু ঐ যে খাঁজগুলির মধ্যে রক্তের চিহ্ন এখনও স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। ইশ, ইশ্, ঐ যে দুটো শব। একটা কাপড় পর্যন্ত না ঢাকা দিয়ে এমনিতেই ফেলে রেখেছে। একটার কাটা মাথা অন্যটার বুকের ওপর রেখে দিয়েছে। অধ্যাপক সাহেব মর্গের ভেতর ঢুকবেন বলে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে বোধহয় সহকারীরা এরকম করেছে— কিন্তু নির্মল ভট্টাচার্যের শব কোথায়?

এই মেঝেটা? দুই নম্বর চৌকির রেল দুর্ঘটনার শবদেহগুলি এনে বোধহয় এই মেঝেটিতেই রেখে দিয়েছিল। রক্তের দাগ ওগুলি। ইশ্! কী গন্ধ.... কোথায় নির্মল ভট্টাচার্য?

'পরলী তরফ মুড়িয়ে সাহাব।'

কুৎসিত চেহারার বেঁটেখাটো লোকটির কণ্ঠে চমকে উঠলেন রবার্ট ঠাকুরদাস। 'ডরিয়ে মৎ ডরিয়ে মৎ। হামলোগোকো তো রোজই খুনসে হাত ধোনে পড়তে হ্যায়। চলিয়ে আগে চলিয়ে।'

....হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ যে নির্মল ভট্টাচার্য। মিষ্টি চেহারার লম্বা দোহারা শরীর। ইশ্, তার দেহেও কোন কাপড় নেই। .... এ কী হল-রবার্ট ঠাকুরদাসের! তিনি পরে থাকা শ্বার্ক স্কিনের কোটটা খুলে নির্মল ভট্টাচার্যের দেহে চাপিয়ে দিতে চাইলেন— 'বড়ে সাহাব ইসে তো কোট উতারকর কফন পহনা দিয়া, লেকিন য়হাতো ঐর নঙ্গে লাশ পড়ি হ্যায়, ইনকা ক্যা হোগা.....?'

রবার্ট ঠাকুরদাস ঝুঁকে পড়ে নির্মল ভট্টাচার্যের কপালটা পরীক্ষা করে দেখলেন। হ্যাঁ, সেখানে একটা চিহ্ন রয়েছে। রক্ত জমাট বেঁধে যাবার চিহ্ন রয়েছে। ফুলে ওঠার চিহ্ন রয়েছে - সে আঘাত পেয়েছিল। গত রাতে। আঃ গতরাতে তিনি ফুলদানিটা ছুঁড়ে মারাতেই সে এই আঘাত পেয়েছিল। হ্যাঁ, গতরাতে। আঃ গত রাতে তিনি ফুলদানিটা ছুঁড়ে মেরেছিলেন। হ্যাঁ, গত রাতে.....

বুকের মাঝখান থেকে অদৃশ্য কিছু যেন একসঙ্গে খসে পড়ল। এই যে নির্মল ভট্টাচার্যের শব, তার চোখের সামনে মর্গের শীতল মেঝেতে উলঙ্গ হয়ে পড়ে রয়েছে। এক পা- দু পা করে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাইরে অপেক্ষা করে থাকা পুলিস ইন্সপেক্টার বললেন— 'সনাক্তকরণের রিপোর্ট দেবার জন্য আপনাকে একবার সব্জিমণ্ডি পুলিস স্টেশনে যেতে হবে।' রবার্ট ঠাকুরদাস কোন উত্তর দিলেন না। বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি ডাক্তার উইলিয়াম বাটলারের স্মৃতিতে তৈরি ক্রাইষ্ট চার্চের উপরের ক্রুশের দিকে মাথা তুলে তাকালেন। মুখের ভেতরেই ঠাকুরদাস বিড়বিড় করে আওড়ালেন— 'ঈশ্বরপুত্র। তুমি বলেছিলেন নিজে নিজের ক্রুশ কাঁধে নিয়ে তোমরা আমার পেছন পেছন আসতে থাক।'

কিছুদিন রবার্ট ঠাকুরদাস আগের মতই আর্টস ফ্যাকাল্টি বিল্ডিঙে ক্লাস নিয়েছিলেন আর অবসর সময়ে ইলিয়ট পড়াতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি ক্লাস নেওয়া ছেড়েই দিলেন। সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে বসে তিনি অন্যান্যদিনের মত পড়াশোনা করা ছেড়ে দিলেন। অবসর গ্রহণ করে বাটলার রোডে বাস করা সম্বন্ধীয় বৃদ্ধ খ্রীষ্টান দম্পতির ঘরেও যাওয়া ছেড়ে দিলেন। অভাবগ্রস্ত ছাত্রদের নাম-ঠিকানা লিখে রাখা ছোট নোটবইটা নিয়ে তিনি বেরিয়ে যান। কখনও বা পায়ে হেঁটে, কখনও বা স্কুটারে এমনকি কখনও বা ডি.টি.সি বাসের ভিড়ের মধ্যেও তাকে ঠেলা-ধাক্কা করে উঠতে দেখা যায়। তাঁর সাহায্য চাওয়া এই অভাবগ্রস্ত ছাত্রদের তিনি বিভিন্ন স্থানে দেখতে পেয়েছিলেন।

টিউটোরিয়্যাল বিল্ডিং

রেফারেন্স লাইব্রেরি

আর্টস ফ্যাকাল্টি বিল্ডিং, এমনকি ছাত্র সংঘের অফিসেও এই ছাত্ররা কখনও তাঁকে ঘিরে ধরে নিজেদের অভাব অনটনের কথা বলেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন সবাই জেনে গিয়েছিল রবার্ট ঠাকুরদাস ছাত্রদের বন্ধু।

....দিল্লির খাইবার পাস এলাকার মজনু টিল্লা, এন্ড্রুজ-গঞ্জের এলাকা, বাটলার রোড, দুরের চিরাগ দিল্লি ইত্যাদি অনেক স্থানে রবার্ট ঠাকুরদাসকে পুরনো ওভারকোট পরে এই অভাবগ্রস্ত ছাত্রদের বাড়ির ঠিকানার খোঁজে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। কষ্টপীড়িত অনেক ছাত্রদের সঙ্গে তিনি দেখা করলেন।

ধীরে ধীরে তাঁর ঘরে ছাত্রদের স্রোত বয়ে চলল। কেউ হয়তো সত্যি সত্যিই অভাবগ্রস্ত হয়ে টাকা চাইতে এসেছিল। কেউ হয়তো শকুনের রূপ নিয়ে তাঁর মৃত-মনের সুযোগ গ্রহণ করেছিল। ইংরেজি ভাষায় দুর্বল একটা ছাত্রের দল তাঁকে এভাবে ব্যস্ত করে রাখল যে বিকেলের দিকে কাভালেরী

লেনে কেউ আর তার ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেল না। শুধুমাত্র ঘরের ভেতর গাড়োয়ালিব ভাবী জুতোর শব্দ প্রায়ই শোনা যেতে লাগল।

হ্যাঁ, কেউ সত্যিই অভাবগ্রস্ত হয়ে এসেছিল। লুটে পুটে শেষ করার উদ্দেশ্যেও কয়েকজন তাঁর ঘরের চারপাশে শিকারের গন্ধ পাওযা পশুর মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

একদিন সেন্ট স্টিফেন্সে কাজ কবা ববার্ট সাহেবের একজন পুরনো বন্ধু এসে বললেন,-- 'আপনি বলেছিলেন ইলিয়টের বিষয়ে বই লিখবেন? আমরা প্রত্যেকেই আপনার কাছ থেকে একটা ভাল বই পাব বলে আশা করেছিলাম কিন্তু এটা কী হচ্ছে? আপনি বুড়ো হতে চলেছেন.. .আপনার সঙ্গে আপনার পাণ্ডিত্যের..... ?'

কিছুসময় ঠাকুরদাস অধ্যাপকটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন - তারপর বললেন - 'তুমি সেই নির্মল ভট্টাচার্য নামে ছেলেটিকে জানতে কি? আত্মহত্যা করেছিল? জানতে তাকে? He was talking about the system! You Know about the system!"

১৯৮৪ সনের মে মাসে রবার্ট ঠাকুরদাস হিন্দুরাও হাসপাতালে ভর্তি হলেন। ক্যাভালেরী লেন অথবা 'ভাইসরিগেল লজ' থেকে হিন্দুরাও হাসপাতাল খুব একটা দূরে ছিল না। তিনি অহরহ ভুগতে থাকা পেটের যন্ত্রণাটা শেষ পর্যন্ত ক্যান্সার বলেই প্রমাণিত হয়েছিল।

তিনি হাসপাতালে থাকার সময় অনেক ছাত্র-ছাত্রী তাঁব সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। দু'একজন ছাত্র অভিভূত হয়ে তাব কাছ থেকে ধার করা টাকাপয়সাও ফিরিয়ে দিয়েছিল। একেবারে শেষের দিকে যুগলকিশোর নামে সেই মেধাবী ছাত্রটিও এসেছিল।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই রবার্ট ঠাকুরদাস যুগলকিশোর এবং তার সঙ্গে আসা নতুন মহিলাটির দিকে তাকিয়েছিলেন। এই মেয়েটি সেদিন তার ঘরে আসা হাসি-স্ফূর্তিতে সুরুয়া তৈরি করা বিমলা নয়। একটি অন্য মেয়েকে যুগলকিশোর বিয়ে করেছে। বিমলা বোধহয় দুঃখী ঘরের মেয়ে ছিল। আর এই মেয়েটি? এই মেয়েটি বোধহয় প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে যুগলকিশোর আই.এ.এস-এর কাছে উপস্থিত হয়েছে। এরকমই হয়। এই পৃথিবীতে এরকমই হয়ে আসছে।

যুগলকিশোর ডাকল--

'স্যার রবার্ট?'

তিনি চোখ মেলে তাকালেন। তাঁর মুখে কিছুটা যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। পচা কাঠে জন্মানো শ্যাওলার মত স্যাঁতসেতে হয়ে গেছে তার গায়ের রঙ। দীর্ঘদেহী মানুষটিকে আরও দীর্ঘ দেখাচ্ছে। একসময়ে রবার্ট সাহেবের মাথার চুল লাল আর কোঁকড়ানো ছিল। এখন সেই চুল পাটের রঙ ধারণ করেছে আর হালকা হয়ে গেছে। সুঁচলো নাকটা আরও সুঁচলো হয়ে পড়েছে। চোখে ছানি পড়া মানুষের মত দুটো চোখই একেবারে নিষ্প্রভ। বুকের হাড় একটা একটা করে গোনা যাচ্ছে। তাঁর দুর্বল দেহে কোনরকমে যেন প্রাণটা রয়ে গেছে।

'স্যার আপনার শেষ ইচ্ছে কী?'

'শেষ ইচ্ছে?'

'হ্যাঁ, শেষ ইচ্ছে।'

'আমার পারলৌকিক কাজ যেন যমুনা পারের ইলেকট্রিক ক্রিমিটোরিয়ামে করা হয়। সেখানে নির্মল ভট্টাচার্য নামে ছেলেটিকেও দাহ করা হয়েছিল। তোমার মনে আছে কি?'

যুগলকিশোর বলে উঠল— 'স্যার আপনি যে খ্রীষ্টান।

So what ? So what my boy ?

তিনি পুনবায় খকখক করে কাশতে শুরু করলেন। নিজেব মনেই তিনি বিড়বিড় কবে বলতে শুরু করলেন 'আমার সহপাঠী নিজামুদ্দিনকে নিগমবোধে দাহ করা নিয়ে বড় হুলুস্থুল হয়েছিল। 'ওয়াকফ বোর্ড' অনুমতি দেওয়া না দেওয়া নিয়ে বড় গণ্ডগোল হয়েছিল। ... কিন্তু এখানে ইলেকট্রিক ক্রিমিটোরিয়ামে কোন গণ্ডগোল হবে না— আমার জন্য কারো কোন কষ্ট হবে না। সেখানে নির্মল ভট্টাচার্যকেও দাহ করা হয়েছিল।

এবার বালিশেব নিচ থেকে রবার্ট সাহেব হাতড়ে হাতড়ে একটা কাগজ বের কবে আনলেন। যুগলকিশোব দেখল যে কাগজটা রবার্ট সাহেব বের করে আনলেন সেটা একটা Union Territory of Delhi ব একটা মৃত্যু প্রতিবেদন পত্র। পুনরায় তিনি কাশতে শুরু করলেন। কাশতে কাশতে কষ বেয়ে আঠালো বিজল বিজল পদার্থ কিছুটা বেরিয়ে এল। বালিশের পাশে রাখা একটা তোয়ালে দিয়ে তিনি মুখটা চেপে ধরলেন। এবার আবার তিনি বিড়বিড় করে কী যেন একটা বললেন। যুগলকিশোর তার কথা কিছুই বুঝতে পারলেন না।

পায়ের শব্দ

মনোজকুমার গোস্বামী

অতনু বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার শোবার ঘরের জানালায় দৃশ্যটা দেখল—তার স্ত্রী বিপাশাকে অনির্বাণ চুমু খাচ্ছে — খুব নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ দুজন। বিপাশার হাত অপ্রতিরোধ্য রিরংসায় অনির্বাণের পিঠ খামচে ধরছে। ধীরে ধীরে অনির্বাণ তাকে এক হাতে বেষ্টন কবে অন্য হাত দিযে তার শরীরে ব্যাকুল হয়ে কি যেন খুঁজে বেডাচ্ছে।

বারান্দায় কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে অতনু সেই দৃশ্যটা দেখল, এমনকি জানালার পর্দা যে গোটানো রয়েছে, দরজাও যে খোলা, সেদিকেও ওদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। দুজনেই যেন অন্য এক পৃথিবীতে নিমগ্ন। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে অতনু পিছিয়ে বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো। এদিক - সেদিক তাকিয়ে যতটা পারা যায় নিঃশব্দে সে গেটটা খুলে রাস্তায় নেমে এলো।

নিজের ঘর থেকে এভাবে পলাতকের মতো ফিরে আসাটা হাস্যকর, অতনুর চরিত্রের সঙ্গে তা খাপও খায় না। কিন্তু এর পরিবর্তে অতনু নিজের মনে কয়েকটি যুক্তির সৃষ্টি করে নিল। স্কুটারটা তার নতুন। ইঞ্জিনের শব্দ খুব কম। কিন্তু কেন তার জুতোর শব্দ হলো না? পায়ের শব্দ বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসছে শুনলে হয়তো বিপাশা এবং অনির্বাণ এধরণের একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করতো না। তার উপর হঠাৎ দুপুরবেলা আগে থেকে কোন খবর না দিয়ে ঘরে আসার অতনুর কি দরকার ছিল? সাধারণত অতনু অফিসে মাথা তোলারও সময় পায় না, কিন্তু আজ চ্যাটার্জী ছুটিতে থাকায় জি.এম তাকেই বলল পি এন বির পেমেন্টটার খবর করে আসার জন্য আর দুর্ভাগ্যবশত অতনুর বাড়িটাও ব্যাঙ্কে যাবার রাস্তাতেই।

সিগারেটটা জ্বালাতে গিয়ে সে দেখল দেশলাই বাকসটাতে একটাও কাঠি নেই। তাই পানের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে সে সিগারেটটা জ্বালাল। কিন্তু ঘরের সামনের পান দোকানটিতে এই

সময়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা অতনুর কাছে বড়ো নিরাপদ বলে মনে হলো না। দ্রুত পায়ে সে রাস্তাটা পার হয়ে পার্ক করে রাখা স্কুটারটাতে উঠল। নিজের পত্নীকে যখন কোন পরপুরুষের বাহু বন্ধনে দেখা যায়, তখন মানুষটির কি ধরনের আচরণ করা উচিত? যদি দুজনে পরস্পর নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয় তখন? খুব বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না কি? দুপাশের চলমান মহানগরের দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করে। আসলে সে কি নার্ভাস, বিব্রত হয়ে পড়েছিল? কি করা উচিত ছিল তার, কোন সাংঘাতিক ধরনের কিছু একটা? উন্মাদের মতো? ক্ষোভ, অভিমান বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা উচিত ছিল কোন ভাবে? তার পত্নী বিপাশা, আর তার একান্ত বন্ধু অনির্বাণের এই অবৈধ অন্তরঙ্গতা একজন ভদ্র সভ্য মানুষ হিসেবে তার কীভাবে নেওয়া উচিত ছিল?

বিয়ের পাঁচ বছর পার হয়ে গেল ওদের । বিপাশা সুন্দরী - উগ্র সুন্দরী না হলেও তার শরীর চাবুকের মতো, চোখ মুখের উজ্জ্বলতা হ্রাস পায়নি এখনও। তার শরীরী আর্কষণ হয়তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু এই যে বিপাশা অনির্বাণের পিঠ খামচে ধরেছিল, তীব্র আকুলতায় ঠোঁটে গুঁজে দিয়েছিল তার নিজের ঠোঁট, অতনু স্পষ্ট দেখেছিল তখন তার বুক কি দ্রুত ওঠানামা করছিল, তৃপ্তিতে চোখ বুজে আসছিল বিপাশার। — এ সমস্তই কি একদিনেই ঘটেছে? এক ধীর নিশ্চিত প্রক্রিয়াতেই কি এই সম্পূর্ণতার সৃষ্টি হয় নি?

রাস্তার বিশৃঙ্খল জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে অতনুর স্কুটার দৌড়ে গেল। অন্যমনস্ক সে। পেছন দিক থেকে একটা গাড়ি বারবার ওভারটেক করার জন্য হর্ণ দিচ্ছিল যা অতনু শুনেও শুনতে পেল না। ঠোঁটের মাঝখানে চেপে রাখা সিগারেটটাতে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল অতনু। বিপরীত দিক থেকে আসা বাতাসের ছাঁট লাগছে তার মুখে। সিটি বাস স্টপেজটাতে দুটো বাস সামনে পেছনে করে রাখা আছে, কয়েকজন হকারের বিরক্তিকর তৎপরতা, রাস্তার পাশের মাঠটাতে ভ্রাম্যমান থিয়েটারের একটা দল তাঁবু গেড়েছে। এক চটুল হিন্দি গান তার উগ্র বাজনাসহ ভেসে এলো, সামনের চৌরাস্তা দিয়ে হঠাৎ সাইরেন বাজিয়ে দুটো ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি, হয়তো কোথাও আগুন লে েছে ....

কখন আরম্ভ হলো এইসব? বহু বছর ধরে বিপাশাকে জানে অতনু, স্বামী হিসেবেই নয়, বন্ধু প্রেমিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনেও। বাইরে তার কঠিন আবরণের মতো যে ব্যক্তিত্ব তা ভেদ করে খুব সহজে যেকোনো একজন তাকে আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে বলেও অতনু মনে করে না। অতনু জানে তার সঙ্গে বিপাশা সুখী, তৃপ্ত — শারীরিক এবং মানসিক ভাবে। ইতিহাসে এম. এ. করে বিপাশা 'দি ইন্ডিয়ান মিডল ক্লাস, দেয়ার গ্রোথ ইন মর্ডান টাইমস' নিয়ে রিসার্চ আরম্ভ করেছে। খুব পরিকল্পিত ভাবে তারা সন্তানের জন্ম দেয় নি আর ভেবে রেখেছে বিপাশার থিসিস কমপ্লিট হবার পরেই ..... তাহলে কখন আরম্ভ হলো এসব? অনির্বাণ তার বাড়িতে এসেছে দেড় মাসও হয় নি। এর আগে বিপাশা তাকে জানতই না। এমনকি একদিন খুব সন্দেহ আর ঈষৎ বিরক্তি মিশ্রিত সুরে বিপাশা অতনুকে জিজ্ঞেস করেছিল — অনির্বাণ কি এভাবে আমাদের বাড়িতেই থাকবে?

তুমি অনির্বাণকে যা ভাবছ ও আসলে সেরকম ছেলে নয়। বিপাশা ভ্রূকুটি সহকারে হাসে, — কেমন?

ও খুব ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল জানো, প্রি ইউনিভার্সিটিতে স্ট্যান্ডও করেছিল। আমরা যখন কলেজে ক্রিকেট, বন্ধু বান্ধবী, সিনেমা, কোর্স নিয়ে মগ্ন তখন সে মার্কস্ আর লেনিন নিয়ে ব্যস্ত

হয়ে পড়েছিল। আমরা তো ওর সঙ্গে কথা বলতেও ভয় পেতাম। তখনই দেখতাম গ্রামে গঞ্জে গিয়ে ও সংগঠনের কাজে ব্যস্ত, সমদল বিক্ষোভের সামনের সারিতে সে, আর একদিন একটা বোমা বিস্ফোরণের কেসে ফেঁসে গিয়ে অনির্বাণকে জেলে যেতে হলো।

বিপাশা বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলো না। সে সমস্ত রোমান্টিকতা এক সময় প্রত্যেকের জীবনেই আসে — তার কথায় তখনো শ্লেষ। আর এক সময় মোহভঙ্গ, ফ্রাস্ট্রেশন্। এখন তাহলে কি অবস্থা তোমার সেই বিপ্লবী বন্ধুর? তোমাকে একটা চাকরি ম্যানেজ করে দিতে বলেনি কি? নতুবা বিজনেসের জন্য কোন কানেকশন করে দেওয়ার কথা?

অতনু ম্লানভাবে হাসল। তারপর বলল। — শোন, আমার কাছে এসো। অনির্বাণ এখনও ঘুমোয় নি। সে বিপাশার মুখটা নিজের রোমশ বুকের মধ্যে টেনে আনে, যেন তাকে অভয় দিচ্ছে। তারপর গলার স্বরটা খাটো করে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে সে বলে ওঠে অনির্বাণ এখনও ওয়ান্টেড। রাজ্যটিতে এক্স্ট্রিমিস্ট অর্গানাইজেশনটার একজন শীর্ষ পর্যায়ের নেতা সে, তার জীবনের উপর সরকার বহু টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এরমধ্যে ওদের সংগঠন ভেঙে গেছে অনেকেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অনেকে সারেন্ডার করেছে, এপর্যন্ত অনির্বান বহুবছর আন্ডারগ্রাউন্ডে রয়েছে, খুব বিপদজনক অনিশ্চয়তার মধ্যে তার জীবন ....

অতনু অবাক হলো এই ভেবে যে এত কিছু শোনার পরেও বিপাশা চমকে উঠল না। বিপাশা আগের মতোই শান্ত নিরুদ্বেগ। দেওয়ালের ওপাশের ঘরটাতে এরকম একজন বিপদজনক মানুষ রয়েছে, তাকে সে প্রায় উপেক্ষাই করল। এমন কি একদিন যখন অনির্বাণ স্নান করার জন্য বাথরুমে প্রবেশ করেছিল, অতনু বিপাশাকে অনির্বাণের শোবার ঘরে ডেকে এনে বিছানার তোষকটা তুলে দেখিয়েছিল।

— এটা দেখ। ছোট কিন্তু মারাত্মক। বিদেশী রিভলবার - ভেতরে গুলি ভর্তি।

নতুন করে কিনে আনা একটা অন্তর্বাস দেখার জন্য যতটুকু সময় নেয় তার থেকেও কম সময় রিভলবারটার দিকে তাকাল সে। তারপর তার সেই চিরপরিচিত অবজ্ঞা, আজকাল আর এসমস্ত কার হাতেই বা না থাকে, স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েদের হাতেও ...।

আসলে সহজে নিজের আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ হতে দেয় না বিপাশা। এতদিন ধরে অনির্বাণ তাদের ঘরে রয়েছে, কখনও বিপাশার প্রতি তার কৌতূহল, ঔৎসুক্য অতনু দেখতে পায়নি। এমনকি একদিন রাতে হঠাৎ বিপাশা তার বুকে মাথা রেখে বলেছিল — আমার এই সমস্ত ভালো লাগে না।

– কি? কোনগুলি?

– এই যে বাড়িতে আরও একজন মানুষ। তৃতীয় একটি লোক। আমার ভালো লাগে না।

- - আহা, যতটা সম্ভব নিজের স্বরটা খাটো করে অতনু বলে ওঠে, ওর কথাটাও ভেব। সারাটা জীবন ও দেশ আর সমাজের জন্য কতটা স্যাক্রিফাইস করে গেল, সেটাও ভাবো তো। এগুলো সে কার জন্য করছে?

বিপাশা কোন উত্তর দেয় না। তার ঠোঁটের কোণায় সেই অবজ্ঞা আর শ্লেষ মিশ্রিত হাসি। সেই ঠোঁটের উপরেই আলগোছে চুমু খায় অতনু। বিপাশার আলুলায়িত চুলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসে তার আঙুল ...

হঠাৎ সে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেছে দপাশের চলমান মহানগরী। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচণ্ড হোর্ডিংটা, ড্রাই ক্লিনার্সের সাইনবোর্ডটা রয়ে গেছে তার সামনে। অতনু এসে তার অফিসে পৌঁছে গেছে।

নিজের টেবিলে আচ্ছন্নের মতো বসে রইল অতনু। জানালা দিয়ে এক ঝলক রোদ এসে তার টেবিলে পড়েছে। হাতের আঙুলের ছায়া দিয়ে সে নকশা বানাবার চেষ্টা করল। সামনের টেবিলের বিরলকেশ সেনাপতির মাথায় রোদ পড়ে ছিটকে গেছে, অন্য দিন হলে এটা একটা কৌতুকময় পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারত, কিন্তু আজ অতনু আত্মমগ্ন হয়ে রইল। বার বার ঘুরে ঘুরে তার মনে একটাই প্রশ্ন দেখা দিতে লাগল, কখন কীভাবে কেন — এই সমস্ত আরম্ভ হলো?

অনির্বাণ থেকে সে দস্তুরমতো সু সাস্থ্যের, সুন্দর চেহারার। সে ইনটেলিজেন্ট, সাকসেসফুল, অন্তত অনির্বাণের থেকে যথেষ্ট সফল মানুষ। আট বছর হলো চাকরি করছে, এর মধ্যেই সে জমি কিনেছে, ঘর বানিয়েছে, উপরি আয় আছে, পুরনো স্কুটারটা বিক্রি করে একটা নতুন কিনেছে। একটা গাড়ি কেনার কথাও ভাবছে। আর এদিকে অনির্বাণ তো একটা ব্যর্থ বিপ্লবী, হয়তো কিছু পরিমাণে রোমান্টিকও। তার স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, গালের হনু বেরিয়ে গেছে, সাংঘাতিক অনিশ্চয়তা তার সামনে, সঙ্গের অনেকেই পুলিশের গুলিতে মরেছে, কে কখন বিশ্বাসঘাতকতা করে তার ঠিক নেই, সংগঠন যেভাবে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়েছে হয়তো পুনর্গঠন করা যাবেই না।

জি. এম. তাকে খুঁজছে। পিয়নটা এসে বলে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়েও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অতনু সেনাপতির উদ্দেশ্যে বলল, লক্ষ করে দেখবেন তো আমার পায়ের শব্দ হয় কি না। তারপর সে ধপধপ করে বারান্দা দিয়ে যেতে থাকল। জি.এম-এর কাছ থেকে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসতে গিয়ে অতনু প্রশ্নসূচক ভঙ্গীতে সেনাপতির দিকে চাইল।

—না, সেনাপতি চশমাজোড়া খুলে পাঞ্জাবিটা দিয়ে মুছে নিল, আপনার পায়ের শব্দ হয় না, একদম হয় না।

— কেন?

— কি জানি। কোন কোন মানুষের পায়ের শব্দ হয় না।

— কিন্তু তা বলে আমার পায়ের শব্দ হবে না। কেন? অতনু উত্তেজিত হয়ে পড়ে, আপনি জানেন কি আমার ওজন আটষট্টি কেজি, নিয়মিত ব্যায়াম করি। আপনি জানেন কি আগে যখন ক্রিকেট খেলতাম, বোলিং রান আপে আমার দৌড়ের শব্দ শুনে ব্যাটসম্যান কেঁপে উঠত। সেনাপতি কোন উত্তর দেয় না। কেবল মাথা দোলায়। কম কথার মানুষ সে। অনেক সময় নিয়ে ভেবে অতনু নিজেও বুঝতে পারে সত্যি সত্যিই আজকাল আর তার পায়ের শব্দ হয় না। সেই যে প্রায় দু'মাস আগে তার অনির্বাণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল -- সন্ধেবেলা সিটি বাস স্টপেজে। অনির্বাণের চোখে চশমা, শরীরে স্কার্ফের মতো একটা কাপড় জড়িয়ে রেখেছে। স্টপেজটায় অপেক্ষারত মানুষগুলি থেকে কিছুটা দূরে সরে দাঁড়িয়েছে সে। অতনু তার কাছে পেছন দিক থেকে এসেছিল, তার পিঠে একটা হাত রেখে অতনু বলে উঠেছিল, 'অনির্বাণ না?' তারপর যখন সে অতনুকে চিনতে পারল তখন তার মুখে স্বস্তি ফিরে এলো। সেদিনই অতনুর সঙ্গে অনির্বাণ তার বাড়ি এসেছিল। সেদিন থেকেই শুরু। কিন্তু অনির্বাণের সেই চমকে ওঠা, সন্ত্রস্ত মুখ আজও মনে রয়েছে অতনুর। হ্যাঁ সেদিনও তার পায়ের শব্দ হয়নি। শব্দ হলে অনির্বাণ এভাবে চমকে উঠত না।

সন্ধেবেলা একটু দেরি করে বাড়ি ফিরল অতনু। সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক, যেন কোথায়ও কিছু হয় নি। ডাইনিং টেবিলে অনির্বাণ বলল দু'দিনের জন্য সে থাকবে না। জরুরি কাজের জন্য একজায়গায়

যেতে হবে। তারপর বলল যে বিপাশাব রান্না করা খাবার ছাড়া তাব অনা জায়গায় খেতে রুচি হয় না। তখনও অতনু আড়চোখে তাকিয়ে দেখল যে বিপাশা অবিশ্বাস্য উদাসীনতায় একটা লেবু কেটে চারভাগ করছে। এমনকি অনির্বাণ সবসময় যেভাবে বুর্জোযা মিডলক্লাস সেন্টিমেন্টকে নিয়ে দুয়েকটা রসিকতা করে তাও বাদ গেল না।

রাতে বিপাশার শরীরের স্পর্শে শুয়ে অতনু ভাবল কীভাবে সে এতটা স্বাভাবিক হয়ে থাকে। এটা কি অভিনয়? অন্তর্মুখিতা ? কি বিশ্বাসে সে বিপাশার ঠোঁটে সেই অন্তরঙ্গতার সঙ্গে চুমু খাবে, যে ঠোঁট এখনও অনির্বাণের শরীরের উষ্ণতায় উষ্ণ? এই সমস্ত দুঃখ অতনুকে পীড়িত করতে পারত। কিন্তু বুকের এক কোণে অন্য এক বেদনা তাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। তার যে পায়ের শব্দ হয় না।

অনির্বাণ দু'দিনের জন্য বাইরে চলে গেল। তার গন্তব্য কী, লক্ষ্য কী—অতনু জানে না। কখনও বোঝার চেষ্টাও করে নি। অনির্বাণ যতটুকু জানিয়েছে ততটুকুই অতনুর কাছে যথেষ্ট। হয়তো সেজন্যই তার ঘরটা অনির্বাণের এক নির্ভরযোগ্য নিরুপদ্রব শেল্টার। মাঝে মাঝে অনির্বাণ এভাবে ডুব মারে, অতনু জানে সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে সংগঠনটাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে। কিন্তু খুবই নিঃসঙ্গ সে, হয়তো তার সফল হবার কোন আশাই নেই।

তারপর একদিন শীতের শেষের এক সকালে বারান্দায় হকার ছুঁড়ে ফেলা খবরের কাগজটাতে অতনু খবরটা পড়ল। গতকাল সন্ধেবেলা নিম্ন অসমের এক অখ্যাত রেলস্টেশনে পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় অনির্বাণ দত্ত ওরফে ...। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি বিদেশী রিভলবার। খবরটা স্টাফ রিপোর্টারের পরিবেশন করা। অনেকটা সময় খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে।

সকালে খুব ব্যস্ত হয়ে থাকে বিপাশা। অতনুকে অফিসে পাঠায়। কিছুটা পড়াশোনাও করে। খবরের কাগজটা সকালে পড়ার সময় পায় না সে। একটা খারাপ খবর আছে। সে সন্তর্পণে ঘরের ভেতর এসে বলল। বিপাশা তার একটা শার্ট ইস্ত্রি করেছিল।

— খুব খারাপ খবর।

– কি হলো?

— অনির্বাণ মারা গেছে। ধনেশপারা রেল স্টেশনে পুলিশ গুলি করে মেরেছে। কাল।

অতনু খুব সাবধানে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল। ইস্ত্রির সুইচটা অফ করল বিপাশা।

— তোমার কোন সমস্যা হবেনা তো? নির্মম কঠিন শোনা গেল বিপাশার কণ্ঠস্বর।

— না, কোন রকম ক্লু পেলে এতক্ষণে পুলিশ এসে হয়রানি করে যেত। সে একাই ছিল, অন দি স্পট মেরেছে।

ধীরে ধীরে বিস্ময় এবং হতাশা অতনুকে গ্রাস করে আনে। কেন বিপাশা সামান্যতম আবেগ, একটুও দুঃখ প্রকাশ করল না? ঐটুকু দুঃখ প্রকাশে সে কিছুই মনে করত না, উদারভাবে ক্ষমা করে দিত সে। অন্যান্য দিনের মতোই বিপাশা তাকে ভাত বেড়ে দিল, টিফিন ক্যারিয়ারটা রেডি করে দিল। এমন কি সে খবরের কাগজটা খুলে একবাব খবরটা পড়েও দেখল না।

অফিসের উদ্দেশে বেরুলো অতনু। আয়নায় নিজের চেহারা দেখল, প্রায় স্বাভাবিক। সর্বদা বলার মতো বিপাশা তাকে বলল, তাড়াতাড়ি এসো তো।

সামনের মেন গেটটা বন্ধ করে রাস্তায় উঠতে গিয়ে অতনু ভাবল, আরে সন্ধে হয়ে গেল যে, বিপাশাকে নিয়ে একটু বেরুলেই ভালো হবে। সিনেমা দেখা যেতে পারে, বা কোন রেস্তোঁরায় গিয়েও কিছুক্ষণের জন্য বসা যেতে পারে। সে কথাটাই বিপাশাকে বলার জন্য অতনু ফিরে এসে পুনরায় বারান্দায় উঠল, সামনের দরজাটা খোলাই রয়েছে। বেডরুমে বিপাশা।

বিছানায় মাথা নীচু করে বিপাশা পড়ে রয়েছে, চুল অগোছালো, হাতে খামচে ধরা খবরের কাগজটা বুকের পাশটাতে আঁকড়ে ধরেছে। বাঁধভাঙা কান্নায় সমগ্র শরীরটা তার কেঁপে কেঁপে উঠছে, ধীরে ধীরে বুক ভাঙা আর্তনাদের মতো বিকট এক শব্দ ঘরটা কাঁপিয়ে তুলছে।

অতনু এসে বিপাশার পাশে দাঁড়াল। বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত।

বিপাশা? সে তার কথা শুনতে পায় না। অতনু আলগোছে বিপাশার উন্মুক্ত পিঠে হাত রাখে, বিপাশা।

ধীরে ধীরে বিপাশা অতনুর দিকে তাকায়। তার সেই নিস্পৃহতা নেই। কি ভয়ংকর পরিবর্তন হয়েছে বিপাশার মুখের! আলুলায়িত চুল, গালে চোখের জলের দাগ, কাপড় চোপড় অবিন্যস্ত। সারা জীবনেও সে বিপাশাকে এমন রূপে দেখে নি। অতনু তাকে বুকে টেনে আনার চেষ্টা করে। — স্যরি, বিপাশা। ইট কান্ট বি হেল্পড।

— না-না-না-না। উন্মাদের মতো সে চিৎকার করে ওঠে। অতনুকে পাশ থেকে প্রচণ্ড জোরে ঠেলে সরিয়ে দেয়। — আই হেট ইউ। আই হেট ইউ।

অসহায়ের মতো অতনু বিপাশার দিকে তাকিয়ে থাকে। কী দোষ তার?

আমি তোমাকে ঘৃণা করি। আমাকে ছোঁবে না। বিপাশা নিখাদ নির্মমতার সঙ্গে বলে ওঠে, — আমি তোমাকে ঘৃণা করি। স্থাণুর মতো অতনু দাঁড়িয়ে পড়ে। কেন? কী হয়েছে? আমার কি দোষ?

তোমার পায়ের শব্দ হয় না। ক্রূর, নৃশংস ভাবে বিপাশা পুনরায় উচ্চারণ করে, তোমার পায়ের শব্দ হয় না।

অতনু স্তব্ধ হয়ে যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে নীরব একটা মুহূর্ত ঘরটাতে নেমে আসে।

লামবাদা নাচের শেষে

মৌসুমী কন্দলী

সৃষ্টির আদিতে যখন পৃথিবী ছিল নিষ্প্রাণ, প্রাচীন আলোগুলির সেই অপার নৈঃশব্দ, একদিন একটা আশ্চর্যময় মুহূর্ত জন্ম নিল। শূন্য বিস্তারিত অজস্র শাখা-প্রশাখায়, একটা বিচিত্র থাংথাং অর্থাৎ পানি অমরা গাছের ছায়ায়, একটা বিশাল আকারের জটায়ু পাখি ধপধপ করে নেমে এল। বপ্লাকপি নামের পাখিটা সেই মুহূর্তেই কয়েকটি ডিম পাড়তে শুরু করল। ডিমগুলি ফেটে গেল। আর তার থেকেই একটা করে মানুষের সৃষ্টি হল। বিভিন্ন প্রজাতির আদি পিতাস্বরূপ সেই মানুষগুলি, কালক্রমে পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সবচেয়ে শেষের ডিমটা ছিল আকৃতিতে সব থেকে বড়। অত্যন্ত মসৃণ এবং মনোরম। সেই ডিম ফেটেই সৃষ্টি হল মানুষের শেষ প্রজাতি--- কারবি।

পাতলা কুসুমের মত সেগুন ফুলগুলির ফাঁকে ফাঁকে ছিটকে আসা রোদের রেখাগুলিতে ভোরবেলাটা তিরতির করছে। কুয়াশার ধূসর আবরণের মধ্য দিয়ে ঝলমল করে ওঠা সকালবেলাটা---যেন শামুকের পেটের এক উজ্জ্বল মুকুতা। উরিয়ামের ঝোপে একটা কাঠঠোকরা পাখি ডেকে উঠল। চাংঘরের তলা থেকে একদল শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে পাহাড়ের নীচে নেমে গেল। রঙবেরঙের পাখি এবং বিচিত্র বর্ণের এক মোরগ অহঙ্কারী মেজাজে কক্ কক্ করে ডেকে উঠল। আর, প্রশস্ত উঠোনটার এক কোণায় জাম্বিলি আঠনের নীচে বসে মার্থেবুড়া সৃষ্টিতত্ত্বের পবিত্র মন্ত্র সুর করে জপ করতে লাগল। চমাংকণের তৃতীয় দিন, উৎসবের আনন্দময় সকালে উচ্চারিত আদিকথার সেই গম্ভীর আবেগসিক্ত সুর, তুলসী এবং ধূনোর ধোঁয়াময় গন্ধের সঙ্গে মিলেমিশে পাহাড়ের ওপারে বিস্তারিত হয়ে যেতে থাকল। সাগরের ঢেউয়ের মত গভীর উত্তাল ধ্বনির সেই সুরটি সমস্ত অরণ্যটা এবং পাহাড়গুলিকে প্লাবিত করে দিতে লাগল।

সুরের সঙ্গে সঙ্গে নিমগ্ন পায়ে মহিলাটি হাঁটছিল। পাহাড়ী পথটা আঁকাবাঁকা সরু। পথের দুপাশেই রয়েছে দীর্ঘ বেঁটে বিভিন্ন আকারের গাছগুলি, বাঁশ এবং বন্য লতাগুলি। সকালের ধূসর আলোতে আরও ঘন হয়ে আসে স্যাঁতসেতে অন্ধকার। পথের একটা ভাঁজে, সহস্র ফণা মেলে থাকা সাপের মত অদ্ভুত আকৃতির ফুল সমেত এক ঝকমকে নাগচম্পা। নীচের দিকে ঝুঁকে এসে একটা করে ঝরে পড়া ফুল কুড়িয়ে নিল। তার হাতের তালুতে লাল লাল অজস্র শুঙের এক সমতলে একটি হলদেটে সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে নড়েচড়ে উঠল।

লাল রঙ তার মনে এক ভয়ংকর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার আবেদন নিয়ে আসে। উগ্র, প্রগাঢ়। উত্তেজনায় ভরা অথচ কি আশ্চর্য সুন্দর। ডালিম ফুলগুলি, অস্তায়মান সূর্য, শুয়োরের কাটা অংশটি থেকে টপটপ করে ঝরে পড়া রক্তের ফোঁটা! লালের সেই ভয়ংকর উত্তেজক রূপটি সে প্রথম দেখেছিল একদিন দুপুরবেলা। কলাগাছের শাঁসের মত তার পেলব কাঞ্চনবর্ণের মসৃণ পা বেয়ে সেদিন উষ্ণ রক্তের স্রোত নীচের দিকে নেমে এসেছিল। ভয় আর শঙ্কায় সে ফুঁপিয়ে উঠেছিল। ঠিক এমন সময় পিঠে এক বোঝা পাহাড়ী খড়ি, বনকেচু, এবং বাঁশের চোঙায় জল ভরে জঙ্গল থেকে ফেরার পথে মা সেই কাঁচা রক্তের স্রোত দেখে চিৎকার করে উঠল। কী এক গুপ্ত মন্ত্র উচ্চারণ করার মত মা ফিসফিস করে বলল, তুই মানুষ হলি বুঝলি, এতদিনে একজন নারী হলি।

...পুরুষ্ট হলে ডালিম ফেটে পড়ে। মৃগনাভির গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বৃষ্টি হলে মাটিতে ধান জন্মায়। মেয়েদের শরীরও গাছের মত, মাটির মত। গাছ, মাটি, মেয়েরা প্রত্যেকেরই ভেতরে একটা রক্তের স্রোত বইতে থাকে। যতদিন পর্যন্ত সেই রক্তের স্রোত বইতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ঈশ্বরের পৃথিবীতে ফুল ফুটবে, ফল ধরবে, পাহাড়গুলি সবুজ হয়ে থাকবে।

অনেকদিন আগের কথা সেটা। বুকের মধ্যে কুলের মত দুটো ছোট ছোট চিহ্ন ফুটে ওঠার সময়। এখন তার মুখে মাকড়সার জালের মত অজস্র আঁকাবাঁকা রেখা, শরীরের অঙ্গে অঙ্গে ভাঁজ। তার মধ্যে রক্তের স্রোত শুকিয়ে এসেছে। নদীর প্রবল ঢেউয়ে খণ্ড খণ্ড করে ধ্বসে পড়া পাড়ের মাটির মত তারও দিনগুলি ক্রমশ ক্ষয় হয়ে আসছে। পথে পড়ে হলদে ঝরা পাতাগুলি সত্য হয়ে তার সামনে নেচে উঠছে।

'ফী, ঐ ফী, চমাংকানে গিয়েছিলি নাকি? হাংমিজি যায় নি? একদিক ঢালু পথটা দিয়ে বিড়ি টানতে টানতে পাহাড় থেকে নেমে আসা লংকী মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করল।

'তুই কোথায় যাবি?'

'রংনিহাঙে, মিটিং আছে সেখানে.....ইশ্ আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—'

হ্যাঁ, দেরি হয়ে গেছে, হলদেটে আলো ছিটিয়ে সূয পাহাড়ের ওপারে চলে যাচ্ছে। সূর্যটা কতদূর পৌঁছেছে, সে নিজের নিয়মে হিসেব করতে লাগল। বারো ফুট বাঁশের একটা নল দিয়ে যদি সেই পাহাড়টার সমতলের মাটি থেকে আকাশের সূর্যের মাঝখানের জায়গাটিকে জরিপ করা হয়, তাহলে মোটামুটি তিনটে বাঁশের প্রয়োজন হবে।

উত্তর দিক থেকে শোঁ শোঁ করে হাওয়া বইছে। পাকা গোমধানের গন্ধ বয়ে আনা বাতাসে গীর্জার ঘন্টাধ্বনি ক্রমশ ভেসে আসছে। পুরনো গীর্জাটার ক্রসটা পাহাড়ের চূড়ায় ঝলমল করে উঠছে। সাদা সাহেবদের আমলের গীর্জা ওটি। সেই তখন থেকেই লখিমী উৎসব হাচাকেকানর মন্ত্রের সঙ্গে গীর্জার ঘন্টাধ্বনি আর ক্যারলের সুরগুলি একসঙ্গে বয়ে চলেছে।

যখন ঘন কুয়াশা পাহাড়গুলি আবৃত করে রাখে, ঠকঠক করে কাঁপতে থাকা মানুষগুলি আগুনের কাছে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে, তেমনই এক শীতের রাতে, গীর্জার চূড়ায় একটা উজ্জ্বল তারা তিরতির করে ওঠে। সোঁদ বড়দিনের তারা। আর তখনই কাথার গ্রামপ্রধানের ঘরে, সকালের প্রার্থনা সভার শেষে সেই বড়দিনের ভোজ হয়। পাহাড়ের ওপারেই কাথার গ্রামপ্রধানের গ্রামটা। কাথারবুড়াব বাঁশের চাংঘরটার দেওয়ালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং রাজা পঞ্চম জর্জের ফটো ঝুলিয়ে রাখা আছে। তার পাশে আরও একটা ধূসর কালো-সাদা ছবি ঝুলে আছে। বহু পুরনো। দীর্ঘ স্বাস্থ্যবান এবং পেঁপে ফুল বরণের দুজন মিশনারী সাহেবের মধ্যে, বাঁশের টুপি, সাদা হাফশার্ট এবং হলুদ হাফপ্যান্ট পরা টগবগে যুবক ছেলেটিই এখন কাথার বুড়া।

একবার যে লুঞ্জেবুড়ার কেঁপে কেঁপে জ্বর উঠেছিল আর একটা কালো মুরগী এবং হরলাও সহিত দেবতার স্থানে পুজো দেবার পরেও মানুষটার যে একেবারে মর মর অবস্থা হয়েছিল, সেই তখনই ছবির সাদা সাহেব দুটিকে সে প্রথম দেখতে পেয়েছিল। হরিণ বরণের কোট, মোটা পাৎলুন আর রবারের ভারী জুতো পরা সেই সাহেব দুটোকে দেখে প্রথমে সে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। শুকনো চামড়ার একটা ব্যাগ থেকে তিতা একটা কি যেন ওরা তার পিতা লুঞ্জেবুড়োকে খেতে দিয়েছিল। সেই চামড়ার ব্যাগটা কতরকম জিনিসে যে পরিপূর্ণ ছিল! যীশুর পবিত্র বাণী খোদিত করা একটি বাইবেল, কিছু বিস্ময়কর বর্ণনায় পরিপূর্ণ নোটবই, সোনালী রঙের ঘড়ি, কিছু কুইনাইনের বড়ি। ওদের সামনের দিকের চাতালের শিমূলগাছের তলায় বসে, কী তন্ময়তার সঙ্গেই না সাহেব দুজন লুঞ্জেবুড়োর মুখে শুনেছিল কারবি রামায়ণ সাবিন---আলুনের সুমধুর কাহিনী। হ্যাঁ হ্যাঁ, সাবিন আলুনের সেই মনোরম বর্ণনা---'......জনক রাজার বাঁশের চাংঘরটি অত্যন্ত বিশাল, চাংঘরের মেঝেতে বসে কুমারী সীতা সুন্দর সুন্দর কাপড় বোনে, এখনও কোন পাহাড়ের মাঝে পাথরের সেই তাঁতশাল পড়ে রয়েছে। কোমরে কালো রঙের কারবি কাপড় পিনি আর বুকে রঙবেরঙের আঁকাবাঁকা কারবি চাদর পেকক জড়িয়ে নিয়ে কচি বাঁশগাছ বরণের খালি বাহুতে কুমারী সীতা কাঁচি হাতে নিয়ে মাঠে যায়। আর সকালবেলা উঠোনে ঝাঁটা বুলিয়ে কি করেই বা জনক রাজার লোহার ধনুকটি ছড়িয়ে রাখে! ইশ্, কী অপূর্ব সুন্দর রূপ সীতা-কুমারীর, কি কর্মঠ তাঁর শরীর। আর পাহাড়ের দুর্গম অরণ্যের মধ্যে নেংটি পরে হাতে তীর ধনুক নিয়ে ক্ষিপ্র বেগে হরিণ শিকার করে বেড়ানো দশরথ রাজার ছেলে দুটি---আঃ কি বলশালী, কি মনোরম সেই রূপ!'

হঠাৎ ধোঁয়াশা চোখের মহিলাটি সেই বলশালী ছেলে দুটিকে যেন সামনে দেখতে পেল! প্রকাণ্ড পাথর দুটির মধ্যে দিয়ে ঝরঝর করে নীচে নেমে আসা মিহি জলস্রোতটা ঝাঁপ দিয়ে পার হয়ে ছেলে দুটি তার দিকেই এগিয়ে আসছে। দুজনের গায়েই টি-শার্ট এবং টাইট জিনস্। ও---ওরা হাংমিজি আর স্যামসন! তাকে দেখে হাংমিজি নামের ছেলেটি চিৎকার করে উঠল, 'অ ফী তুই দেখি চলে এলি, আমরা যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি, রাত হয়ে গেলে সেখানে আজকে থাকব না, চমাং এসেছে ফী, বড় শহর থেকে, তার সঙ্গে দেখা করতে যাব।' চমাংকানে যাওয়া তার নাতি হাংমিজি আর সঙ্গেরটার দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

'...... ছেলেদুটির পোষাকগুলি হুবহু সেই সাহেব দুটোর মতই। তখনকার দিনের সেই রাম-লক্ষ্মণের মত নেংটি পরতে আজকালকার ছেলেরা লজ্জাই পাবে! ওদের পোষাকগুলি সাহেবের মত হলেও কাজগুলি কি সাহেবের মত হয়েছে?'

দুর্গম পাহাড়িয়া পথে, নিশ্ছিদ্র অরণ্যে একটা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঘোরাফেরা করা সেই মিশনারী সাহেব দুজন! কিসের তাড়নায় সেই মিশনারী সাহেব দুজন হাজারটা পাহাড় অতিক্রম করে নিজের দেশ ছেড়ে এসে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সহজ সরল নিরক্ষর মানুষগুলিকে শিক্ষার আলো বিতরণ করেছিল—ভাবলে সে অবাক হয়ে যায়। বপ্লার্কাপ নামে জটায়ূ পাখিটির ডিম থেকেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রতিটি মানুষই তো একই পাখির ডিম থেকেই জন্ম নিয়েছে। আর সে জন্যই প্রত্যেকেরই অন্তরটা, এক অদেখা সূতার বাঁধনে বাঁধা রয়েছে। বৈঠালাঞ্চের কাছে টিকা পাহাড়ের সমতলে কবরটা এখনও রয়েছে। মুকিন্দন পাহাড়টায় পৌঁছে হউন সাহেব কি কাচাই মহিলার করুণ বিলাপ শুনতে পেয়েছিলেন?

যখন কোন আত্মা পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, তার মৃতদেহটা একটি ঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়। মৃতের মাথার পাশে সাজিয়ে রাখা হয় পান-তামোল, শুকনো লাউয়ের পাত্রে মদ। আর মৃতদেহের কাছে কাচার্হে মহিলারা অতি করুণ সুরে ইনিয়ে বিনিয়ে মৃতের যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়ে যায়। পৃথিবীর সীমার ওপারে দুটো পথের মাঝখানে রয়েয়ে সুবিশাল পাহাড়। ডানদিকের পথটা স্বর্গের, বাঁ-দিকের টা নরকের। ভাঙা দোতারায় ছড় ঘষার আওয়াজের মত সেই বিলাপের সুর একদিন তার উঠোনেও শোনা গিয়েছিল।

দপদপ করে জ্বলতে থাকা আগুনের পাশে কৃষ্ণপক্ষের তিনি রাত চমাংকানের ঢোলের তালে তালে মাতাল হয়ে নাচার পর, যখন সুস্বাদু শুয়োরের মাংস এবং হরলাঙের নেশাসক্ত গন্ধে বাতাস মাতাল হয়ে উঠেছিল, তখনই একটি মানুষের আগে আগে, প্রকাণ্ড একটি কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর এক ঝাঁক মুরগীর ককন্যানির মধ্যে পায়ে হেঁটে এসে একটি চাংঘরের মইয়ে সে পা রেখেছিল। তারপর দিনগুলি, ঢেঁকিতে ধান ভানার শব্দ, তাঁতশালের খটমট এবং রাতের বেলা বাঁশের চাঙের কের কের—এ ধরণের অজস্র শব্দে ভরে গিয়েছিল। একটি দুটি করে চারটি পাহাড়ে জুম ক্ষেতের আগুন জ্বালাতেই একদিন হঠাৎ তার মরদ মুকিন্দন পাহাড়টা দেখতে পেল। আর ভাঙা দোতারায় ছড় ঘষার আওয়াজের মত সেই বিলাপের সুর তার উঠোনেও বেজে উঠল।

হঠাৎ এক তীক্ষ্ণ গোঙানির শব্দে সে চমকে উঠল। কে যেন খাবার উদ্দেশ্যে কোথায় শুয়োর মেরেছে। মাটিতে উপুড় করে ফেলে শুয়োরটার বুক থেকে পেট পর্যন্ত চিরে ফেলে, দপদপ করতে থাকা হৃদপিণ্ডটার মধ্যবর্তী অংশ পর্যন্ত ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা হয়। আর তখনই মরা-শুয়োরের বাতাস ফালাফালা করে ওঠা তীক্ষ্ণ গোঙানিটা ভেসে আসে। কয়েকদিন আগে মৃত শুয়োরের মত হত্যা করা একটি মানুষ গাঢ় রক্তে মাখামাখি হয়ে জঙ্গলের মধ্যে চিৎ হয়ে পড়েছিল। এই পাহাড়ে আর কখনও এরকম কোন ঘটনা ঘটেনি! দিনগুলি যেন ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে। 'বাইরে সব কিছু নিস্তব্ধ মনে হলেও ভেতরে ভেতরে কেমন যেন গুম গুম ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ছোটবেলায় দাদুর মুখে শোনা একটা কথা তার মনে পড়ে গেল। অরণ্যের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছগুলির ডালের জোড়ের মধ্যে মাকড়সা জাল বোনে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছিটকে আসা নমনীয় আলোতে পাতলা মিহি জালগুলি চিকমিক করতে থাকে। একবার সেরকম একটি জালে একটি পাখি আটকে থাকা অদ্ভুত অস্বাভাবিক একটা দৃশ্য তার দাদু দেখতে পেয়েছিল! পাতলা মাকড়সার জালে ছটফট করতে থাকা একটা পাখি! কি বিস্ময়কর! দাদু বলেছিল, এভাবে মাকড়সার জালে পাখি আটকে থাকা দেখতে পেলে পৃথিবীতে অস্বাভাবিক সব ঘটনা ঘটে। তার মনে হল, কোথায় যেন একটি চড়াই মাকড়সার জালে আটকে ছটফট করছে। যেন সাতদিন সাত রাত মেঘের গর্জন আর প্রবল বৃষ্টি সহ

মহাপ্রলয হবে। তাব শেষ হয়ে যাওয়া ঋতুস্রাবের মত যেন মাটির নীচের রক্তের স্রোতটাও শুকিয়ে যাবে। অরণ্যটা মৃত হয়ে যাবে। কারবিদের আদি রাজা সৎ রেস ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন-- 'প্রজাদের মধ্যে যখন খামখেয়ালি, মড়ক হবে, তখন একদিন ভীষণ অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হবে। ডিম থেকে গাছের সৃষ্টি হবে, জলে শিলা ভাসবে, লঙ্কার আকার বৃদ্ধি পাবে, আকারে তা মানুষের চেয়েও বৃদ্ধি পাবে।' তার শরীরটা শিউরে উঠল। অস্ফুট স্বরে সে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল, হে প্রভু, হেম্ফদেবতা যেন পৃথিবীটাকে রক্ষা করে। আর পৃথিবীর মসৃণ কামনায় তার চোখ দুটি প্রার্থনার ভঙ্গিতে বুজে এল।

পৃথিবী নামক এই ঘূর্ণায়মান গোলকটির বর্ণময় বিস্তারে, বিভিন্নতা এবং বৈচিত্র্যের অনেক সমান্তরাল ছায়াচিত্র অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। দুপুরের তামার বর্ণের উৎকট সূর্যটা এবং তার নীচের অপরূপ নৈসর্গের মধ্যে, সৃষ্টিতত্ত্ব মুছেরাকেহিরের মুহূর্ত থেকে কাচার্হের করুণ বিলাপ পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা নিমগ্ন ভাবনায়, পাহাড়িয়া আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে আসতে থাকা মহিলাটি, পৃথিবী নামে এই ঘূর্ণায়মান গোলকটিতে অঙ্কিত এ ধরণেরই ছায়াচিত্র। সহজ সরল পুরাতন চিত্রশৈলীতে অঙ্কিত। ধাতব যান্ত্রিকতার নিঃশ্বাস চেপে ধরা ক্ষিপ্রতা এবং সংকোচন থেকে যোজন মাইল দূরে। নিভাজ শান্ত নৈরাজ্যে জীবন ধীর শিথিল গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। উত্তেজনাহীন অথচ সাবলীল। নিস্তরঙ্গ অথচ গভীর ছন্দোবদ্ধতায় আবদ্ধ। প্রকৃতির বহুমাত্রিক সংরচনা শৈলীতে জীবন এত নিবিড়ভাবে তাতে একাত্ম হয়ে থাকে যে তার স্বকীয় স্বাচ্ছন্দ্যকে অনুভবই করতে পারে না। একটা জোনাকির মত। শরীরে জ্বলতে থাকা রূপালী আলোর সঙ্গে সে নেচে নেচে উড়ে বেড়ায়—অথচ তার শরীর থেকে নির্গত সেই আলোর উৎস, রাসায়নিক সংশ্লেষণের জটিল প্রক্রিয়াটির বিষয়ে অবগত হওয়ার তার কোন অবকাশ থাকে না—।

জোনাকির মত সেই মহিলাটিও তার সরলরৈখিক ভাবনায়, সেই প্রকৃতির মধ্যে উপবিষ্ট তার জীবন থেকে আত্মলব্ধ আলোর দ্যুতিতে পূর্ণ হয়ে থাকা কয়েকটি ছোট ছোট সত্য আহরণ করেছিল। আর তার পাশে পাশে ঘুরে বেড়ানো, হাংমিজি নামের একটি টগবগে ছেলে তার বলতে থাকা কথাগুলি শুনছিল। গাছে ফল আসার গুপ্ত রহস্যের কথা, রঙগুলির মধ্যে নিহিত থাকা অর্থের কথা, গাছের ডালের পাতলা মাকড়সার জালে আটকে থাকা পাখির কথা। কথাগুলি তন্ময় হয়ে শুনতে থাকার মধ্যে মধ্যে সে এককেবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মানসিক অবস্থার পরিমাপে, সে বর্তমানে সেই অংশে রয়েছে, যেখান থেকে দুই মেরুর সমান দূরত্ব। একদিকে আরণ্যক রহস্যময়তার নিভাঁজ নৈসর্গে সেই মহিলাটি আর অন্য মেরুটিতে, ধাতব পারিপার্শ্বিকতায় বৈদ্যুতিক আলো আর ইলেকট্রনিক সিম্ফনিতে মুখরিত উচ্ছল উন্মাদ যান্ত্রিক দৃশ্যাবলী। একটি দুর্বার ইচ্ছা, দুটি স্বপ্ন আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কয়েকটি বোধের টানা-হেঁচড়ায় অস্থির হয়ে সে দুটি বিন্দুর মধ্যবিন্দুতে থেমে আছে।

বাঁশঝাড়ের ওপারে সূর্যটা ধীরে ধীরে অস্ত গেল। ঝিঁঝিঁ-পোকার ডাকের সঙ্গে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ঝিল্লির ডাক চারদিকের নৈঃশব্দকে আরো গভীর করে তুলেছে, উনুনের পাশে বসে থাকা কুকুরটা কু-কু করে উঠল। এমন সময়েই, ভারী জুতোয় চাংঘরটা কাঁপিয়ে 'ফী ঐ ফী'-- বলে দিদিমাকে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে ধপধপ আওয়াজ করতে করতে হাংমিজি উপরে উঠে এল। বাইরের উঠোনে, টুংটাং টুংটাং শব্দ, হাসি আর গহীন শব্দের চিৎকার। মহিলাটি বাইরে বেরিয়ে এল। ওহো—ওরা গীটার নিয়ে এসেছে। হাংমিজিরও এই বাজনাটা আছে। ক্ষীণকটির মত চ্যাপ্টা সোনালী রঙের এই বাজনাটা প্রথম যখন হাংমিজি শহর থেকে এনেছিল, সে আশ্চর্য হয়ে দেখেছিল। মনের

আনন্দে, বাজনাটা সামনে হেলিয়ে রেখে তারগুলিতে টুং টাং করে আঙ্গুল বুলিয়ে সে পরিচিত সুরটা বাজিয়েছিল - শৈশবে দিদিমা গেয়ে শোনানো হুদু চড়াই ডাকের ঘুম পাড়ানোর গানটা—

দুদু! দিদি-দুদু!
বিক্রম পিথা ছাইছ
ছাইন পিথা ছাইছ দুদু.....

গলা পর্যন্ত জলে পরিপূর্ণ একটি মাটির কলসীর মত তার অন্তরটা ছেলেগুলির প্রতি মমতায় উপচে উঠল। উঠোনে হৈ-চৈ করতে থাকা ছেলের দল--যেন কিচিরমিচির করতে থাকা এক ঝাঁক শালিক পাখি। তাকে দেখতে পেয়ে শালিকের ঝাঁক কোলাহল করে উঠল—'অ ফী আজ রাতে আমরা ফীস্ট করব, শুকনো মাছ আছে তো? আর মুরগীও মারতে হবে। চমাং শুয়োরের মাংস নিয়ে এসেছে -।'

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত, ঝিল্লির ডাককে ছাপিয়ে গীটারের আওয়াজ ভেসে এল। চাংঘরের পাশে, উঠোনের এক কোণে হাংর্মজির ঘরের মেঝেতে জ্বলতে থাকা আগুনের সোনালী রঙের কম্পমান শিখার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, চমাঙ ধাড়ির উপরই উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। আজ কতদিন পরে সে গ্রামে এসছে। নস্টালজিক ভাবনায় তার মনটা সিক্ত হয়ে উঠেছে। শিলঙের সেন্ট অ্যাডমন্টসে পড়ার সময়, শীতের বন্ধে সে প্রায়ই গ্রামে আসত। চারবছর আগে, একদিন রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে নেমে দিল্লি মহানগরীর গ্রেটার কৈলাশের কারবি ভবনের ডরমিটরির দরজার সামনে দাঁড়ানোর পর থেকে সে আর গ্রামে আসে নি। ডরমিটরি থেকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ ক্যাম্পাসে থাকা সেন্ট স্টিফেনের হোস্টেলে কয়েকদিন পরে সে চলে গিয়েছিল।

'Hey Chamang - come on - dance' কে যেন তাকে টান মেরে নিল। ব্যাটারিচালিত টেপরেকর্ডারটিকে বেজে ওঠা হার্ডরকের দ্রুত উচ্ছল সুরের মূর্চ্ছনায় রাতটা যেন দুলতে শুরু করেছিল। হুইস্কি আর ওয়াইনের গোলাপী নেশায় ঝিমঝিম করে ওঠা মাতাল শরীরের ছেলেগুলি উন্মাদের মত উদ্দাম গতিতে হেলেদুলে নাচতে শুরু করল। সাপের মত শরীর মুচড়ে, মেঝেতে বড় বড় করে পাক মেরে ঢেউয়ের মত শরীরটা একেকবার ওঠানামা করে এক অপূর্ব নৃত্যরত ভঙ্গিমায় চমাঙ নাচতে নাচতে এবার লেদারের জ্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলল, তার পেশল মেদহীন ঘর্মাক্ত শরীর আগুনের তাপে ঝলকে উঠল। দিল্লির একটি ড্যান্স স্কুল থেকে সে ডিসকোথ্যাক, বলরুম ছাড়াও আলাদা আলাদা দেশের কিছু ভিন্ন ভিন্ন নাচ শিখেছে। প্রথমে সে বলরুমের নাচগুলি নেচে গেল। ব্রেক, জাইভ, রক এণ্ড রোল, গ'গ, বুগি, ওয়ালজ এবং তারপরে লোকনৃত্যগুলি-- স্পেনিশ পলার, ল্যাটিন আমেরিকার চাম্বা—। বিস্ময়কর! একটার পরে একটা অবিরাম গতিতে, সাংঘাতিক ক্ষিপ্রতা এবং অদ্ভুত শরীরী সঞ্চালনে সে নাচগুলি ক্রমশ নেচে যাচ্ছে। মাটি থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে ধরে থাকা একটা বাঁশের তলা দিয়ে একটা সরীসৃপের মত সে পিছলে পার হয়ে গেল। বাকিবা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল। কী আশ্চর্য! চমং যেন ক্রমে এক অপরিচিত, কোন অনন্য এক মানুষে রূপান্তরিত হতে চলেছে, তার শরীরের সৌন্দর্য এবং অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায়। অবাক বিস্ময়ে ছেলেগুলির মন অভিভূত হয়ে পড়ল। আর শেষে, মধ্যরাতের অন্ধকার কাঁপিয়ে এক অচিন দুর্বোধ্য সুর বাতাসে বেজে উঠল। লামবাদা! ব্রাজিলিয়ান লামবাদা।

এমন উন্মাদের মত এক অচিন সুরের তালে তালে আরও একদিন চমাঙ নেচেছিল। অচলা চাঙে নামের অপূর্ব Upto date vital statistics এর সেই নৃতত্ত্বের ছাত্রীটিব সামনে, এক

মিডনাইট ডিসকোথ্যাকের নাচের আসরে। তার মঙ্গোলীয় মুখের অবয়ব, প্রাচীন রক্ত বয়ে যাওয়া তার সুঠাম শরীরটা মেয়েটি অবাক দৃষ্টিতে লেহন করে যাচ্ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, রোশনারা বাগ, বুদ্ধ গার্ডেন, মোগল বাদশাহের মকবরা, সাবিত্রী চকিজের 'ব্লু লেগুন' কনট প্লেসের 'নিরোলাজ' আর 'লা-বহেইমার কক-অ-ভিনের স্বাদে পরিপূর্ণ সেই নিবিড় রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলির ফাঁকে ফাঁকে সেই মেয়েটির সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর সময়ও সে যেন সেই অচিন সুরের তালে তালে নেচেই যাচ্ছিল। নেচেই যাচ্ছিল। অবিরাম--।

চমাঙের সঙ্গে সে এবার আসতেই চেয়েছিল নৃতত্ত্বের গবেষণার জন্য উপাদানের খোঁজে। সঙ্গে কিছুটা চেঞ্জ, কিছু রহস্য, কিছু বন্যতা আর কিছু অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে। অবশ্য এবার তার পরিবর্তে এসেছে তার সাংবাদিক বন্ধু সুদীপ্ত নন্দী। রহস্যঘন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিষয়ে একটি রোমাঞ্চকর স্টোরি করার আগ্রহ যার। একদিন অচলা চমাঙকে একটা প্রাইভেট কোম্পানির ম্যানেজারের কাছে নিয়ে গেছিল। কোম্পানিটা ফ্যাশন, মডেলিং শো গুলি স্পনসর করে। ম্যানেজারকে চমাঙের জন্য কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দেবার জন্য অনুরোধ করেছিল সে। নীল ফেডেড জিনসের উপর তার পরে থাকা চমাঙের কারবি জ্যাকেটটা একবার হাত দিয়ে স্পর্শ করে ম্যানেজার সাহানি অচলার গালে একটা ঠোক্কর মেরে বলেছিল, Ethnic? How beautiful! সেদিন সন্ধেবেলা, লিডবারে কিছুক্ষণ বসে মেয়েটির ঘরে ফিরে যাবার পর অচলা সান্তে তাকে আরও একটা সারপ্রাইজ উপহার দিয়েছিল।

বর্ণময় চাকচিক্যে ভরা এক অন্য জগতের কল্পনায় বিভোর, উত্তেজিত চমাঙ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অবশিষ্ট হুইস্কিটা গলায় ঢেলে তার সেই বিশেষ নিষিদ্ধ অভিজ্ঞতাটার বর্ণনা দিতে শুরু করল। লিডবারের সন্ধেটা সে একটা ব্ল্যাক ডগের বোতল এবং অচলা Old Fashioned এর কয়েকটি পেগ নেবার পর নীলাভ আলোর কোঠাটিতে ঘন ঘন নিঃশ্বাসের মেঝেতে, তাদের শরীরী বিন্যাসের স্থিতিস্থাপকতাকে মুনলাইট সোনাটার সিম্ফনিটা বেষ্টনী পাকিয়ে ধরেছিল। একটার পরে একটা নিষিদ্ধ মুহূর্তগুলির সাবলীল বর্ণনা সে দিয়ে গেল। কেবল, প্রাপ্তির চরম মুহূর্তের শেষে, অবরোহনের অলস ক্লান্তিকর আমেজ, অস্ফুটস্বরে অচলার বলতে থাকা কথাগুলি বর্ণনা দিতে সে অসমর্থ হল।

পাতলা গোলাপী রঙের বেডকভারটা দিয়ে শরীরটা ঢেকে নিয়ে অচলা অলসভাবে বিছানায় শুয়ে থেকে তাকে রাঘবনের কথা বলছিল। রাঘবন টেক্সাসের একটা বিশাল কম্পিউটার ফার্মের ম্যানেজার। তারও এক নিজস্ব স্টাইল, জগতকে দেখার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এই যে টেক্সাসে রাঘবন থাকে, অহর্নিশি অফুরন্ত পরিশ্রম করে, সেখানে নিশ্চয় সে অবসর বিনোদনের জন্য অনবরত ঘরে শুয়ে বসে 'ওয়্যার অ্যাণ্ড পিস' বা 'সঞ্চয়িতা' পড়ে কাটায় না। টগবগে সেই সুঠাম পুরুষ রাঘবন সেখানে সময় কীভাবে কাটাবে, সেটা নিশ্চয় অচলা নির্ধারণ করে দিতে পারে না। তার করা সম্ভব বা উচিতও নয়। 'But yes, He is my finance ' মোটের উপর রাঘবন এবং তার মধ্যে সেই বোঝাপড়ার কথা, আর সেই বোঝাপড়ার আধারেই চমাঙ এবং অচলার বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয় কথাগুলি অচলা ধীরে ধীরে সেদিন তাকে বলে গিয়েছিল। কেউ কারো অধিকার খর্ব না করা, আর নিজস্ব অধিকার এবং দাবীগুলির বিষয়ে প্রশ্ন না করার সেই চুক্তিটির কথা। এ ধরণের অদ্ভুত চুক্তির একটি ভাষা, অনুচ্ছেদ এবং উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করার মানসিক স্তর এবং চিন্তার দৈর্ঘ, তার চারপাশে বসে থাকা এই সহজ সরল ছেলেগুলির এখনও হয় নি। চিন্তার সেই বিন্দুটা পাবার জন্য ছেলেগুলিকে আরও কিছুটা ভণ্ডামি এবং আত্মকেন্দ্রিকতার হিসেবনিকেশ জানতে হবে।

--'বা ও তোকে বিয়ে করবে, কি লাক!'

চমাঙ কোন উত্তর দিল না। উত্তর দিতে গেলেই ওদের সারমোনাইজ করা হবে। একটি পেডান্টের মত। অজস্র পাক থাকা সূতোর গিঁট খুলতে গেলে কখনও বা সুতোটাই ছিঁড়ে যাবার ভয় থাকে। এখন কোন জিনিসই নির্দিষ্ট পরিমাপে নির্ণয় করার মত নিশ্চিত সংজ্ঞা হয়ে থাকে নি। কথাটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। 'এশিয়ান এজ' নামের খবরের কাগজটির রবিবারের পরিপূরক পাতায় প্রকাশিত সেই What's in - What's out কলামটির মত। প্রতি সাতদিন পরে পরে in গুলি out গুলি in!

-'তার মানে তুই আর ফিরে আসবি না? সেখানেই থেকে যাবি? কিন্তু কথাগুলি কি এতই সহজ? যেন শুয়োর ভেজে রাখা আছে, শুধু মুখে পুরে নিলেই হল--' অনেকক্ষণ পরে হাংমিডি জিজ্ঞেস করল। সেই যে এক সময় ওরা কিছু কাজ করবে ভেবেছিল, গ্রামের জন্য, জায়গাটার জন্য, মানুষগুলির জন্য, ছোট ছোট কিছু কাজ—পুরনো সেই কথাগুলি চমাঙকে জিজ্ঞেস করতে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল হাংমিজির। কিন্তু তা মনে মনেই রইল।

-'বোর করিস না হাংমিজি—কে বলেছে সহজ বলে, আজকাল একটা শিশুও জানে—survival of the fittest. চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তোর তো সেই ইচ্ছেটাই নেই। কত বড় একটা অ্যাকসিডেন্ট হবে--আমাদের সঙ্গের একজন মিলিন্দ সুমন, মার্ক রবিনসনের সঙ্গে পোজ দেব, সে কি এখানে বসে বসে পচতে থাকবে? তুই একটা সিনিক শয়তান—আসলে তোর কমপ্লেক্স দেখা দিয়েছে, তুই জ্বলছিস, চমাঙ একটা হাইফাই জিনিস মৌজ করতে পেয়েছে--এবার দেখিস রাতের বেলা সে তার কথা ভাবতে ভাবতেই সেই কাজটা করবে- -'জড়তা মাখান জিভে আওড়ে গেল স্যামসন।

হাংমিজি কোন উত্তর দিল না। কেবল দপদপ করে জ্বলতে থাকা আগুনের অস্থির হলদে শিখাগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মাংসের হাড়ের টুকরো চিবোতে থাকল। শিমূলের উঁচু ডালে বসে নীচের দিকে নিরীক্ষণ করতে থাকা একটা বুড়ো শকুনের মত এতক্ষণ এক কোণে বসে থেকে একা হরলঙ খেতে থাকা সুদীপ্ত নন্দী হঠাৎ আগুনের পাশটাতে উঠে এল। হাংমিজির পাশে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে সে একটা সিগারেট জ্বালাল। ধোঁয়ার রিংগুলি শূন্যে নিক্ষেপ করতে করতে সে বলে চলল —'বাইরের সেই দুরন্ত পৃথিবীটার অংশীদার হতে তোমার ইচ্ছে করে না? তুমি না চাইলেও, একদিন এই পৃথিবী তোমার খোঁজে আসবে। ট্যুরিস্ট গাইডবুকে হাসতে থাকা সেই বিশুদ্ধ-নির্ভাজ-স্বচ্ছ জনজাতীয়টি আর তার সেই exotic কুমারী পৃথিবীটা সবসময়েই থাকবে বলে তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর? আজকের এই পৃথিবীতে তুমি সেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপটা কোথায় খুঁজে পাবে হাংমিজি - যেখানে তোমাকে নির্বাসন দেওয়া যেতে পারে?'

সুদীপ্তের ঠোঁটে বেরিয়ে আসা শব্দের আওয়াজ একটি কোবাল নদী বয়ে আনল। হাংমিজির চোখে ফুলে ফেঁপে ওঠা সেই নদী ক্রমশ ভাসিয়ে নিল একটি পৃথিবী। এক হাজার বছরের প্রাচীন পৃথিবী। এক হাজার বছরের প্রাচীন পৃথিবী। প্রাচীন অরণ্যগুলির সেই ঢেউয়ে ডুবে গেল--ডুবে গেল তার প্রচণ্ড ঘূর্ণিপাকে এক দল মানুষ। কয়েকজন পিঁপড়ে সাঁতার কাটার মত সাঁতরে চলল আর একদল কয়েকটা ভেলা বানাল - কে জানে সেই ভেলা কোথায় নিয়ে যাবে ওদের—কালের কোন পারে গিয়ে পৌছাবে তারা ......

ধীরে ধীরে আগুনটা নিভে এল। ছাইয়ের মধ্যে শুধু স্ফুলিঙ্গগুলি জ্বলতে লাগল। আর উৎসবের শেষে ক্লান্ত পদক্ষেপে টলতে টলতে ছেলেগুলি অন্ধকার ভেদ করে চলে গেল। নিস্তব্ধ নিঝুম রাতের গভীরতাকে আরো বাঙ্‌ময় করে ঝিল্লির ডাকটা বাজতে থাকল। মাঝে মাঝে একটা পেঁচা চিৎকার করে উঠছে—।

বাঁশের চাঙে একা একা পড়ে থেকে হাংর্মিজিব ঘুম আসছে না। এলোমেলো চিন্তার ভারি ভারি পাক লাগা কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের-বোধের টানাপোড়েনে সে পুনরায় দুই মেরুর মধ্যবিন্দুতে অস্থির পদক্ষেপে এসে দাঁড়িয়েছে। দুই মেরুর মধ্যের দৈর্ঘ্যের শূন্যতায় রশি টানা খেলার গিঁট তার মত দুটো বিপরীত শক্তির টানাটানিতে সে ক্রমশ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে। এক মেরুতে, সেই নীরব নিসর্গে অপেক্ষা করতে থাকা মহিলাটি, তার ঘুমপাড়ানি গানগুলি, চমাঙকান মুসেরাকেহির পবিত্র মন্ত্রে অরণ্য এবং পাহাড়গুলির মধ্যে একটি প্রাচীন জনগোষ্ঠী, যা ক্রমে বিবর্তিত হতে শুরু করেছে এক অন্য সংমিশ্রিত রূপে অথবা কোন পর্যটন কোম্পানির প্রস্তুত করা বিশেষ কার্যসূচীর প্রতিলিপিতে, যা ক্রমশ হয়ে উঠবে এক পণ্য – Commodity -আর আর এরকম অনেক ধূসর ছায়াছবি -।

আর অন্য এক মেরুতে, ধাতব চিকমিক, বৈদ্যুতিক আলো, আর ইলেকট্রনিক সিম্ফনির উচ্ছ্বলতা আর চাকচিক্য ভরা এক যান্ত্রিক দৃশ্যাবলীর উজ্জ্বল রঙীন ছায়াছবি—!

ধীরে ধীরে এক অচিন সুরের লহমায় যেন সে-ও নাচতে শুরু করেছে। আর সেই সুরটি তাকে তার মধ্যবিন্দুর স্থিতি থেকে এক প্রান্তের চিকমিক আলোর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে –

এলোমেলো চিন্তার জট লাগা টানাটানির মধ্যে সারা রাত জেগে থাকার পর, ভোর রাতের দিকে তার ঘুম এল। আর সে একটা স্বপ্ন দেখল—

দুটি পথের সংযোগস্থলে, একটা পাহাড়ের উপত্যকায় সে অপেক্ষা করে রয়েছে। একটা রাস্তা ডানদিকে অপরটা বাঁ-দিকে গেছে। ঠিক এমন সময় ভাঙা দোতারায় ছড় ঘষার আওয়াজের মত একটা করুণ সুর ভেসে এল-

তার ফী কোথা থেকে কাচার্হের বিলাপের সুরে যেন ধীরে ধীরে গাইছে—

'হে পবিত্র আত্মা
তুমি যেতে যেতে মুকিন্দন পাহাড়টা পাবে
তার উপত্যকায় দুদিকে দুটো পথ
বাঁ-দিকে যাবে না
বাঁ-দিকে যাবে না
সেদিকে নরকের পথ--

টীকা ঃ

কার্বি—অসমের এক জনজাতি

ফী--দিদা, দিদিমা

হরলঙ—চালের তৈরী এক ধরণের মদ

কাচার্হে--কান্দালি

চমাংকান--পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধ

প্রেম-গাঁথা

মনোরমা দাস মেধি

চিরন্তন অনুভূতিগুলির কথা চাপা পড়ে গেছে। সেই নির্মল প্রেম, স্নিগ্ধ মমতা, দুর্বার মায়া, কেউ আজকাল আর এ সমস্ত নিয়ে কাহিনী লেখে না। কেবল বোমা-বন্দুক, বিত্ত-লোভ আর বঞ্চনা। সত্যি সত্যিই এটা খুব খারাপ হয়েছে।

সত্যজিৎ বরা একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি মানুষের মনে সেই স্বর্গীয় অনুভূতিগুলিকে জাগিয়ে তোলার জন্য চেষ্টা করবেন। এর দ্বারাই তিনি বর্তমানের অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন। কী অদ্ভুত কথা! মানুষ প্রেম প্রীতি, মায়া-মমতা ভুলে গেছে। পাথর হয়ে গেছে নাকি মানুষের বুক? হবে না, এভাবে হবে না। সত্যজিৎ বরা এ ধরণের গল্প রচনা করবেন - যা মুমূর্ষ অনুভূতিগুলিকে পুনরায় সঞ্জীবিত করে তুলবে।

এখন প্রথম প্রয়োজনটা হল একটা উপযুক্ত প্লটের। তবে ফাজলামি না। এই যুগে একটা বালা-পরা আধুনিক যুবতী কল্পনা করা আর পর্বতশীর্ষে কাছিমের ডিম একইরকমের দুরূহ ব্যাপার। তাহলে উপায় কী? একটাই মাত্র উপায় রয়েছে। অতীতের দিকে ফিরে তাকানো। সেটাই করা যাক। নাহলে বোমা-বন্দুকগুলি তার রচনায় পুনরায় হত্যাকাণ্ডের সৃষ্টি করবে।

অতীত বললেই সত্যজিৎ বরার মনে পড়ে গ্রামের বাড়ির কথা। বিশেষ করে তার বারান্দাটার কথা। বেশ প্রশস্ত। গ্রীষ্মকালের জ্যোৎস্না, শীতকালের রোদ। কোথাও একটুকরো নোংরা নেই। কেবল বিরিনা বনের ঝাড়ু দিয়ে আঁকা বাঁকা রেখাগুলি।

ঝাড়ুটার কথা মনে পড়তেই সত্যজিৎ বরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। সড়াৎ সড়াৎ শব্দ তুলে বারান্দাটা ঝাড়ু দেওয়া সেই মেয়েটি। মুহূর্তের মধ্যে তার নামটাও মনে পড়ে গেল। কলি। মেয়েটির দাদা একদিন মারতে মারতে এনে রেখে গিয়েছিল। সারাটা রাস্তাই মারতে মারতে এনেছিল

কিনা সত্যজিৎ বরা জানেন না। তিনি তখন খুবই ছোট ছিলেন। সামনের বারান্দায় মার্বেল খেলছিলেন। হঠাৎ একটা হুমকি এসে কানে পড়ল। 'কথা শুনবি কি না?' ঐ রোগা-পটকা লোকটা দাঁত কিড়মিড় করছে একটা লাথিও কষিয়েছে। এক লাথিতে মেয়েটি ছিটকে এসে পথের পাশের খুঁটিটা ধরেছে। কী কান্না!

একমাত্র সেদিনই কলিকে কাঁদতে দেখেছিল সত্যজিৎ বরা। আঃ আরও মনে পড়ছে। চ্যাংড়া একটা ছেলে যে কলিকে সবসময় ক্ষেপাত। কী ছিল ওটা? আহাহা! সুন্দর হবে। একটা প্রেমের গল্প হয়ে যাবে। প্রথমদিকে পার্থিব প্রেম। তারপরে স্বর্গীয় প্রেমের অনুভব। বোমা, বন্দুক, ধর্ষণ, অপহরণ নেই। কেলেঙ্কারিও নেই। সুন্দর হবে। মানুষের মনে এটা এক ধরণের শীতল প্রলেপ দান করবে। সত্যিই বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নাহলে মানুষ হয়তো পাগল কিংবা পাথর হয়ে পড়বে।

চোখ দু'টি বন্ধ করে সত্যজিৎ বরা চিন্তা করে দেখলেন। কলি বললে তার চোখে দুটো দৃশ্য ভেসে ওঠে। বারান্দায় গোবর জল ছিটানো অবস্থায় কলি, আর চপচপে গোবরে আছাড় খেয়ে পড়া কলি। আর কিছু মনে পড়ে কি? সেই দুটিই দৃশ্য। কিন্তু দৃশ্য দু'টির ব্যঞ্জনা সাংঘাতিক। কলিকে পুরোপুরি ধরে ফেলেছে, গো খোজায় নভোমণ্ডল। সত্যজিৎ বরা দেরী না করে হাতে কলম তুলে নিলেন।

২.

বিরিণা বনের ঝাড়ু। কলি সড়াৎ সড়াৎ করে উঠোন ঝাড়ু দিচ্ছে। ঝাড়ু দেবার পর, বারান্দার এক পাশে উপুড় করে রাখা এনামেলের পাত্রটা হাতে নিল। ভাঁজ পড়া এনামেলের গামলা। মুহূর্তের মধ্যে গোয়ালঘরে গিয়ে পৌঁছল। দুই দলা গোবরের টাল মণ্ডলামারির নিচ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। তার থেকে এক দলা নিয়ে গামলাটাতে রাখল। এবার গিয়ে খালের ধারে উপস্থিত হল। দু'মগ জল তেমনি করে গামলায় ঢেলে একটা হাত দিয়ে মাখিয়ে নিল। বেশ। গোবর-জল তৈরী। গ্রামদেশের মায়েরা যেমন কাঁখে শিশুকে নেয় তেমনি করে গামলাটাকে নিয়ে সে বাঁ হাতে গোবর জল ছিটোতে লাগল। এক পা এগোয়, কিছুটা ছিটোয়। আরো এক পা এগোয়, আরও একটু গোবর-জল ছিটোয়। তার সমস্ত মনোযোগ গোবর জলে। যেন গোবর জল ছিটিয়ে ছিটিয়েই সে এই পৃথিবীতে সকালটা নামিয়ে আনছে। তা না করলে যেন সূর্য উঠবে না, পাখি উড়বে না, শেফালি ফুলগুলি গাছের নিচে ঝরে পড়বে না। একেবারে যোগসাধনা করার মত মনোযোগ। তখনই ছড়ার গানটা কানে এল—

'কলিমলি কলাপাতা
কলি খায়না খালি ভাত,
আয় কলি হাটে যাই
কলিকে বেচে মিষ্টি খাই।

চমকে উঠে কলি অবাক চোখে তাকাল। ঝাঁকুনি খেয়ে কিছুটা গোবর জল মেখলার উপর দিয়ে উপচে পড়ল। কী গান! হাটে মিষ্টি খাওয়ার গান। কে গাইছে! ঐ যে মহেশ ধিঙিঙা। কী গাইছে এই বোকাটা। কত ভাল গান রয়েছে।

বেরিয়ে আস শচীপ্রভা
রাজার প্রধান মহিষী,

সোনার কলসীতে
জল আন গিয়ে।'

আরও একটা আছে। সেটি বড় ভাল গান।

'কে ফুটন্ত কদম গাছের নিচে
মধুর স্বরে বাঁশী বাজাল ঐ।' ও ভাল গান জানলে তবে তো। ইশ্, বড় মিষ্টি সুর গানটায়। গা- -যা খুশি গাইতে থাকুক। আমার কী আসে যায়, মানুষ তোকে নিয়েই হাসবে! এই ভেবে সে আবার গোবর-জল ছিটিয়েই চলল।

ঐ দিকে সে আবার গলা সাধতে শুরু করেছে।

'কলিমলি কলাপাতা
কলি খায় না খালি ভাত ...'

কলিও মাথা তুলে আবার তাকাল। সে দেখছি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। হাসছেও। । তার মানে....'অ'...। ক্ষেপাচ্ছে। বোকার হদ্দ। না। মুখ ফুটে বলে নি। মনে মনেই বিড়বিড় করছে। আর খপ খপ শব্দ করে গোবর-জল ছিটিয়ে যাচ্ছে।

'এই যে শুনছ? বরার পত্নী জিজ্ঞেস করল। 'শর্মার ঘরের দিকে দেখি মানুষের স্রোত বয়ে চলেছে।'

'কোথাকার মানুষ?'

'কোথাকার আবার! এই পাড়ারই মানুষ। কোন বিপদ আপদ হয়েছে কি না কে জানে!'

'তুমিই গিয়ে একবার দেখে আসো না কেন?'

'আমি যেতে পারলে আপনাকে আর বলতে যাব কেন? কড়াইতে ভাজা বসিয়ে দিয়েছি। আপনি নাড়তে পারবেন তো?'

কী ঝামেলা! সত্যজিৎ বরা কলমটা রাখলেন। একটা গল্প শান্তিতে লেখার উপায় নেই। বিষয় বিষধর। শঙ্করদেব একেবারে খাঁটি কথাটা লিখে রেখে গেছেন। শার্টটা পরে তিনি বেরিয়ে গেলেন। পথে আহমেদের সঙ্গে তার দেখা হল। তিনিই বললেন—

'অঙ্কুরকে ফিল্ডে জগিং করার সময় ধরে নিয়ে গেছে।'

'অঙ্কুর?'

'হ্যাঁ, শর্মার যে ছেলেটা.....'

'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ধরে নিল কারা?'

'পোষাকটা নাকি আর্মিরই ছিল।'

'তাই নাকি? কিন্তু আর্মিরাও তাকেই ধরার জন্য বেছে নিল?'

আহমেদ গলা খাটো করে বলল—'আর্মি বলেই কীভাবে নিশ্চিত হবেন, আজকাল গণহত্যাগুলিও তো আর্মির পোষাকেই হয়ে থাকে।'

শর্মার ঘরেও একই ধরণের কথাবার্তা। কোন নিশ্চিত খবর নেই। এটা হতে পারে, অমুক কারণের জন্য নিয়ে যেতে পারে, তমুক কে একবার ব্যাপারটা জানিয়ে রাখা ভাল হবে নাকি...'

শর্মা ইতিমধ্যে থানায় গিয়ে পৌঁছেছে। শর্মার স্ত্রীকে সবাই আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে সত্যজিৎ বরা তার মুখটা ভাল করে দেখতে পেল না। ঘিরে থাকা মানুষগুলির মুখগুলিই কেবল চোখে পড়ল। হঠাৎ চমকে উঠলে চোখ দু'টি যেভাবে স্থির হয়ে যায়, ঠোঁট ঠাণ্ডা আর গলা

শুকিয়ে..., ঠিক তেমনই চেহারা। তার নিজেবও ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। হঠাৎ তার নিজের ছেলের কথা মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি করে বাড়িতে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন- 'সোনামণিকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'সে তো গতকালই পিসির বাড়িতে গেছে। এর মধ্যেই ভুলে গেলে?'

'একটা ফোন কর তো?' ভালোভাবে গিয়ে পৌঁছেছে তো?'

'ফোন করেছিলাম তো, ভালভাবেই পৌঁছেছে।'

শর্মার বিপদ নিয়ে কিছুসময় কথা বলে বরা চিন্তামগ্নভাবে এক কাপ চা খেলেন। তাবপর কাপড় বদলানোর জন্য নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন। হাতঘড়িটা বাখতে গিয়ে চোখে পড়ল– গল্পটা সেভাবেই মেলে রাখা রয়েছে। 'থপথপ করে গোবরজল ছিটিয়ে চলেছে।' ছিঃ ছিঃ একেবারে শুরুতেই আটকে রয়েছে। একটু এগিয়ে রাখা ভাল। সময় হাতে নেই। এদিকে গত সংখ্যাটিতে তার গল্প সম্পর্কে আগেই ঘোষণা করে রাখা আছে। উপায় নেই। শর্মার ঘর থেকে নিজের মনটা কোনমতে ফিরিয়ে এনে সেই বড সড় উঠোনটিতে উপস্থিত হবার জন্য তিনি চেষ্টা করলেন। পারতেই হবে। ভূমিকম্প চলার সময়েও নাকি তার ঠাকুরমা ছেলেমেয়েদের জন্য ভাত রেঁধে দিয়েছিলেন। প্রদীপের বাতিদানটা প্রচণ্ড জোরে কেঁপে ওঠায় প্রদীপটা নিভে গিয়েছিল। তবু রেঁধেছিলেন। সেটাই তো যত্ন। সত্যজিৎ বরা কলমটা হাতে তুলে নিলেন।

৩.

কলির মুখটা গোমড়া। যেন এক গ্লাস ঘোলা জল। গোবরের কাজটা শেষ করাব পরেও চেহারায় একটা গোবর গোবর ভাব। সে সাজিটা নিয়ে বাগানে ঢুকল। দু'ধরণের শাক, একটা বড দেখে মিষ্টি কুমড়ো, কয়েকটি কচি বেগুন। এবার এসে শিমগাছের মাচাব নিচে দাঁড়াল। মাচাটা একটু উঁচু। সে কোনমতে লাফ দিয়ে দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে। চারদিকে কালো পিঁপড়ে। সে অবশ্য পিঁপড়েকে ভ্রূক্ষেপ কবে না। কিন্তু পিঁপড়েগুলিও তো তাকে লক্ষ্যই করছে না। হাতের উপর দিয়ে বেয়ে বাহুমূল পার হয়ে এখন জামার ফাঁক খুঁজছে। তাতেও সন্তুষ্ট না থেকে পিঠে একটা কামড বসাল। সে উঃ করে পিঠের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। তখনই ছেলেটা সুর করে বলে উঠল,

'কলি মলি কলাপাত..'

সঙ্গে খিকখিক করে হাসি।

সে-ও তেড়ে গেল। 'মায়ের মাথা।'

সজোরে দু'টি লাথি বসিয়ে দিল মাটিতে। পা বেয়ে উঠতে থাকা পিঁপড়েগুলিকে ঝেড়ে ফেলার জন্য। এদিকে ছড়ার গান আর খিকখিক হাসিটা উল্টে পাল্টে চলছেই।

'আয় কলি হাটে যাই
কলিকে বেচে মিষ্টি খাই...'

৪.

বরা বাজারে বেরিয়ে গেলেন। পরের দিন চব্বিশ ঘন্টাব একটা বন্ধ রয়েছে। ছোট ছোট পিঁপড়ের মত অজস্র মানুষ। এখন এই ভিড়ের মধ্যে একটা বোমা ফাটলে হয়। কথাটা মনে হওযাব সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরটা শিরশির করে উঠল। এ সমস্ত ভাবকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে নেই। গুরুত্ব দিলেই গুরুত্ব বেড়ে যায়। তিনি মনটা শক্ত কবে নিলেন আর শাক-সব্জি, মাছ, আদা কাঁচালঙ্কার স্তূপেব মধ্যে ঠেলা ধাক্কা করে ঢুকে পড়লেন।

ফিরে আসার সময় শর্মার ঘরেও একবার ঢুকে এলেন। কোন খোঁজখবর নেই। মা-বাবা নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। সম্ভব হলে, দু'জনেই খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদতেন। কিন্তু কান্নার সাহসটুকুও তারা আজ হারিয়ে ফেলেছেন। যদি তাতে কোন অমঙ্গল ডেকে আনা হয়। তাদের দেখে মনে হয়, যেন বাতাস স্থির হয়ে পড়েছে। লোহার মত ভারী। নাক দিয়ে টেনে ফুসফুসকে সজীব করে তোলাই যেন একটা প্রাণান্তকর পরিশ্রম।

৫.

তেল-ঘি'তে চকচক করা কাঁসার বাসন। পিছলে পড়ে গেলে বাসনের ঝনঝনানি থেকে মুখের ঝনঝনানি বেশি করে বাজবে। কলি সাবধানে এগুচ্ছে। যাতে বাসন ফসকে না পড়ে আর এঁটো কাঁটা কাপড়ে না লাগে। ভেতো কুকুর দু'টির কী উৎপাত। চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে যেন তাকে মাটিতে ফেলে দেবে। তাই সে খুব সাবধানে একটু একটু করে এগোচ্ছে। বাসনে কুকুর মুখ দিলে তাকেই গালাগালি শুনতে হবে। হাতে একটা লাঠি নিয়ে কেউ যদি সঙ্গে আসতেন তাহলে সে এই ভেতো কুকুরগুলির হাত থেকে রক্ষা পেত। কে আর আসবে! কোনমতে বাসনগুলি জলে ডুবিয়ে রাখতে পারলেই সে কুকুরগুলিকে ভাল করে পেটান লাগাবে। অত্যন্ত সাবধানে সে চলছে। ঠিক তখনই বাউণ্ডুলেগুলির কথা কানে ভেসে এল।

'কলি খায় না খালি ভাত ...'

ঐ যে, গরুকে জল খাওয়াচ্ছে। তার রাগটা খালি উঠেছিল। তখনই দেখতে পেল একটা বাণী চড়াই ছোট একটা ঝোপে এসে বসেছে। এমন সুন্দর হলদে। বড় দিদির বিয়েতে স্নান করানোর জন্য কাঁচা হলুদের মত। তার চোখদুটি কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তখনই আবার তার সেই কথাটা

'আয় কলি হাটে যাই...'

সে তখুনি ঘুরে তাকাল। ট্যারা চাহনি। গালাগালির জন্যই মুখ খুলেছিল। ভাল করে আর খোলা হল না। বিড়বিড় করে মনে মনে বলে, 'নির্লজ্জ কোথাকার!'

—'শুনুন তো, শর্মার ঘরে কেমন যেন কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে মনে হচ্ছে না?' সত্যজিৎ বরা একলাফে উঠে বসলেন। শার্টটা পরার সময় স্ত্রী বলল—'আমিও যাব দাঁড়াও।' দু'জনেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত পাড়ার লোকজন জমা হয়েছে। শর্মার পরিবারের সদস্যরা এখন জোরে জোরে কান্না ছেড়ে ফুঁপিয়ে চলেছে। লোকগুলি ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ' খোলাখুলি বলছে না। বোধহয় দাবী-টাবি রয়েছে।'

ফিরে আসার পথে আহমেদ বললেন -'আমিও সেরকমই একটা কিছু আঁচ করছি। নিশ্চয় ব্যাপারটা গোপন রাখার নির্দেশ রয়েছে।'

. বরার স্ত্রী এতটা ঘোর-প্যাঁচের ধার ধারেন না। তিনি সোজাসুজি জানতে চাইলেন -'টাকা চেয়েছে নাকি? সত্যজিৎ বরা চমকে উঠলেন। চট করে আশপাশটা একবার দেখে নিয়ে আস্তে করে বললেন – 'মনে মনে থাক তো।'

অশরীরি রূপ নিয়ে বিকেলটা নেমে এল। প্রতিটি মুহূর্তই যেন শিকারীর ফাঁদ। ঘরটা যেন ঘর নয়। অরণ্যের মাঝখানে রয়েছ বলে মনে হচ্ছে। বরার পত্নী ডালে নুন দিতে ভুলে গেলেন। ভাজায় বোধহয় দু'বার দিলেন। বেচারী। সত্যজিৎ বরার বড় মায়া হল— এই সহজ সরল মহিলাটির

জন্য। ব্যাপারটাকে হালকা করার জন্য তিনি চেষ্টা করলেন। 'ছোটবেলায় একটা বই পড়েছিলাম জানো- - নামটা ছিল অভিশপ্ত চম্বল। চম্বল উপত্যকায় রোমহর্ষক ডাকাতির বর্ণনা।'

'আমিও পড়েছিলাম।'—স্ত্রী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বললেন।

'পড়েছিলে?' বরা উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। 'কি রকম মনে হয়েছিল তখন? বলো তো?'

'কি জানি।' স্ত্রী ক্ষীণ স্বরে বললেন।

'কি জানি মানে? হৃদয ধ্বক ধ্বক করে ওঠে। একেকটা বর্ণনা পড়ে স্তব্ধ হয়ে থাকি। একটাই প্রশ্ন। বারবার মনে এসে ধাক্কা মারে। কীভাবে আছে মানুষগুলি সেখানে? এখন কী জানি জান, হয়তো সে জায়গার লোকগুলি আমাদের কথা ভাবে। অসম? বাপরে বাপ। ডাকাতির জায়গা।

'সামনের দরজাটির দিকে ভালোভাবে তাকিয়েছিলে?' স্ত্রী কথার মধ্যেই জিজ্ঞেস করল।

'কি হয়েছে?'

'উপরের হুকটা ভালো করে লাগানোই যায় না।' স্ত্রী বলল।

'হুক লাগিয়েই বা কী করবে।' বরার আওয়াজটাও নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে গভীর হয়ে এল। ঘুম আসে না। তিনি উঠে বসলেন। ছটফট করার চেয়ে বরং লেখার চেষ্টাই করা যাক। টেবিলের পাশে এসে তিনি কাগজটার দিকে তাকালেন। শেষ শব্দ দু'টি- 'নির্লজ্জ কোথাকার!' কলম খুলে পরের অংশটা লেখার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন।

৬.

মহেশ অঘোণার সঙ্গে বসে দড়ি পাকাচ্ছে। কি সব বলাবলিও করছে। দুই একটা কথা কলির কানেও এসেছে। 'কাজলীকে খুঁজতে খুঁজতে একেবারে পোড়োবাড়িতে গিয়ে ঢুকেছি।'

'সন্ধের পর কি?'

'হ্যাঁ তো। তাতেও তার কী চোট। পেছন পেছন ঘুরে বেড়াতে গিয়ে শরীরের বাঁদরের হুল লাগল।' অযথা খিক খিক করে হেসে বলল--'কেমন মজা?'

'আর বলিস না। কি ঘ্রাণ। আজ তাকে এটা দিয়ে বেঁধে নরাতলীতে একটা খুঁটি পুঁতে ....'

কলি গোবর-জল ছিটিয়েই চলেছে। তবে সে তাকে লক্ষ্যই করে নি। কেবল কথা বলছে আর দড়ি পাক দিচ্ছে। গোবর অত্যন্ত আঠালো জিনিস। হাত ধুলেও গন্ধ যায় না। সে ঝরে পড়া চালতা দিয়ে রোজ হাত দুটি ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে। তবুও গন্ধটা গিয়েও যেতে চায় না। তবে মা বলেন, গোবর-জল ছিটালে নাকি বাসি উঠান শুদ্ধ হয়। বাসি উঠোন পুরুষদের মাড়ান নিষেধ। আয়ু ক্ষয় হয়। কলি ভাবল--কাল থেকে সে আরও তাড়াতাড়ি উঠবে। বাউণ্ডুলেটা জেগে ওঠার আগে বাসি বারান্দাটা শুচি করে তুলবে।

আজ তো দেখছি তাকে ক্ষেপাচ্ছে না। সে দুটো কান খাড়া করে রেখেছে। সুযোগ খুঁজছে। তবে কি-ই হবে। গামলাটাই এবার কাত হয়ে বেশ কিছুটা গোবরজল এক জায়গাতেই পড়ে গেল। তবুও তাকে ক্ষেপাচ্ছে না। কলি এক গাদা বাসনও ধুয়ে ফেলল। ডেকচিটার নিচে মাটির প্রলেপ দিতে দিতে ঘন ঘন তার দিকে তাকাল। কথা বলেই চলেছে বাউণ্ডুলেটা। হঠাৎ তার ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে উঠল। তারা দুজন যেখানে বসে রয়েছে সেখানে সে খুব ধীরে সাবধানে এগিয়ে গেল। কথা এবং কাজে মশগুল হয়ে এবারও সে ফিরে তাকাচ্ছে না। পা টিপে টিপে কলি এগোচ্ছে।

শেষেব দিকে ঝাঁপ মেরে নিল, যেন একটা শালিখ। আর অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে সে বাঁ হাতটা তার গালে আবছা করে বুলিয়ে নিল। তার মুখে রঙ খেলতে থাকা যুবতীর হাসি। সে চমকে উঠল। তখনই আঘেণা খিক খিক করে হেসে উঠল। 'দেখ দেখ ঐ দেখ। এর মুখে লেপ দিলে ঐ কলি মেয়ে।' দড়ি টড়ি ফেলে দিয়ে মহেশ দৌড়ে গেল। কলিও দুপ দাপ দৌড় লাগাল। একহাতে লেপা ডেকচিটা। হঠাৎ চপচপে গোবরে সে পা রাখল। সঙ্গে সঙ্গে ডেকচিটা ছিটকে চুল-টুল মেলে উপুড় হয়ে পড়ল।

৭.

বাতে রাতে পাহারা চলছে। যার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত ছিল তার থেকে অনেকটা দুরে দাঁড়িয়ে জোট বাঁধা লোকগুলি সমস্বরে প্রশ্ন করছে। 'ডিউটিটা আসলে কার। পাহারার জন্যই তো সরকার তোমাদের বেতন দিয়ে রেখেছে। আমাদের ডিউটি আলাদা। সারাটা রাত পাহারা দিয়ে দিনের বেলা কাজ করা সম্ভব কী?' একটা সুপুরি চিবুতে চিবুতে আহমেদ কিছুটা রস করল -'রামসিংহ বলে যায়নি একই অসমীয়ায় নৌকা চালায়, বন্দুক চালায়, যুদ্ধ পরিচালনাও করে। আপনিও তো অসমীয়া। লাচিত বরফুকনের বংশধব। কেন পারবেন না?'

সত্যজিৎ বরাও পাহারা দিচ্ছেন। তিনদিন পর পর ডিউটি। জ্বালা করতে থাকা রক্তাক্ত চোখে সকালে ক্লাসরুমে ঢুকে শঙ্করদেব, মাধব দেব পড়ান। প্রতিদিন একই কথা বলে যান। পাহারা দেবাব পরের দিন রাতে অ্যানেস্থেশিয়া দেওযা রোগীর মত নিঃসাড়ে পড়ে পড়ে ঘুমোন। তাবপরের দুটো রাতে ভূতের মত এগিয়ে আসা ডিউটির রাতটার জন্য অস্বস্তি অনুভব করেন। কোন সুখের অনুভূতি নেই। উদ্দীপনা নেই। একেকবার অর্ধেক লেখা গল্পটার চিন্তা অস্বস্তিটা বাড়িয়ে দিয়ে যায়। একদিন বিকেলবেলা নিজেকে ছেঁচড়িয়ে নিয়ে যাবার মত করে সত্যজিৎ বরা টেবিলের পাশে যান। শেষের বাক্যটা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। 'চুল টুল মেলে উপুড় হয়ে পড়ল।' ববার অকস্মাৎ মনে হল যেন কলি নামের মেয়েটা নয়, গল্পটাই উপুড় হয়ে পড়েছে। নিঃশ্বাসটা ধীরে ধীরে ছেড়ে দিয়ে তিনি ভাবতে শুরু করলেন। এখন আসলে একটা প্রেমের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু চপচপে গোবরে পড়ে থাকলে কীভাবে প্রেম হবে! কলিকে অন্তত উঠে দাঁড়াতে হবে তো। কীভাবে তাকে দাঁড় করানো যায়। মহেশকে দিয়ে তোলা যাবে না। জলো সিনেমার মত বিস্বাদ লাগবে। যদি মালকিনের হাত দিয়ে তাকে ওঠানো যায় বিশ্বাসযোগ্য হবে না। না কি নিজে নিজেই উঠে বসবে। কিন্তু তা করতে গিয়ে কলিও তো কম ঝাঁকুনি খায় নি। এদিকে দোষও করেছে। লেপা ডেকচিটা ছিটকে ফেলেছে। কোনরকমে উঠে বসলেই গৃহস্বামিনীর বকুনিতে কান ঝালাপালা হবে।

সত্যজিৎ বরার মন চাইছে—কলি উঠে বসুক। উঠলেই কাহিনীটা এগিয়ে যাবে। কিন্তু উপায় নেই। ঘন ঘন আড়মোড়া ভাঙতে লাগলেন তিনি। ক্রমশ তার বিরক্তি বাড়ছিল। দুর। এ সমস্ত নিয়ে গল্প লিখতে যাওয়াটাই ভুল। নোংরা কোথাকার। পড়তে জানে, উঠতে জানে না। বুর্বক!

পরের দিন পাহারা দিতে যাবার আগের মুহূর্তে হাতঘড়িটা পরার সময় গল্পের শেষ অংশটা আবার চোখে পড়ল— 'উপুড় হয়ে ছিটকে পডল।' চট করে রাগ উঠে গেল। দুনিয়াটা ওলোটপালট হয়ে গেছে। সে এখনো চুল খুলে পড়ে রয়েছে। থাক পড়ে, গোবরে লেপ্টে থাক।

৮.

হঠাৎ মানুষগুলি আতঙ্কে কেঁপে উঠল। সামনেই একটা লাইনে বোমা পাওয়া গেছে। পুরুষমানুষেরা থানা, স্টেশন, মিলিটারি, সি.আর.পি.এফের ক্যাম্প যে যেদিকে পারে খবব দেবার

জন্য মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। মহিলারা ছেলেমেয়ে এবং শিশুদের চিলে খাপ মেরে নিয়ে যাবার মত করে যতদূরে পারা যায় সরে গিয়ে সভয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। সেদিন সত্যজিৎ বরার পাহারা নেই। তবুও চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই। গল্প-টল্পের কথা ভুলেই গেছেন। তাই কলি উপুড় হয়ে পড়েই রয়েছে।

৯.

একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে। থানা থেকে শর্মা এবং শর্মার স্ত্রীকে সনাক্তকরণের জন্য ডাকা হয়েছে। বেরিয়ে যাবার সময় সত্যজিৎ বরা দু'জনের দিকেই তাকালেন। শর্মার স্ত্রীর মুখমণ্ডলে জীবিত মানুষের কোন লক্ষণ নেই। নিস্তেজ, নিঃসাড়। যেন একটা মৃতদেহ চলাফেরা করছে। শর্মাকে দেখে মনে হল যেন কোন শাইলক মেপে মেপে তার বুকের মাংস কেটে নিয়েছে।

বরার আজ পাহারা নেই। তবুও বিছানায় যেতে ইচ্ছে হল না—ঘরের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। একবার টেবিলটার পাশে যান। কোন কিছু পড়ার জন্য বা লেখার জন্য নয়। এমনিতেই, অজান্তে। আবার দূরে সরে যান। কলির কথা ভুলেই গেছেন। সে যে গোবরে লেপ্টে পড়ে রয়েছে, তা আর বরার মনে নেই। তিনি ভুলে গেছেন। বরার স্ত্রীর চোখেও ঘুম নেই। এমনিতেই বিছানায় কাত হয়ে পড়ে আছেন। একবার বলে উঠলেন—'ঘুমোতে চেষ্টা করো তো। কালকে আবার পাহারার ডিউটি আছে।'

তিনি কোনরকম উত্তর দিলেন না। কথাটা বোধহয় কানেই ঢুকল না। চেয়ারটাতে বসে টেবিরে কনুই রেখে হাতের তালুর উপর মুখমণ্ডলের ভারটা ছেড়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখজোড়া ঘুমে জড়িয়ে এল। দুশ্চিন্তার চাপে তিনি বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

১০.

সকাল সাতটা বাজল। শেষরাতের দিকে ঘুমিয়েছেন বলে সত্যজিৎ বরা গভীর ঘুমে অচেতন। আহমেদ দ্রুত এসে ঢুকল। এসেই কোন ভূমিকা ছাড়াই বললেন—'বিরাট ঘটনা ঘটে গেল যে।' বরার স্ত্রীর বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল। চট করে ভেতরে গিয়ে স্বামীকে জাগিয়ে দিলেন। আহমেদ বলছে—'পাল-পাড়ায় বিরাট কাণ্ড। শোনেন নি কেউ?'

'না তো!'

'রাতের বেলা দশজন মানুষকে গুলি করে মেরেছে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, নয়টার সময়।'

'আশ্চর্য! আমরা তো কোন শব্দ শুনতে পেলাম না!'

'শব্দ হলে তবে তো। আগের মত দু-নলা বন্দুক তো নয়।'

বরা এবং তার স্ত্রীর অবাক লাগল। তখন দূরে হট্টগোল শোনা গেল। শ্লোগান নয়। চিৎকার চেঁচামেচি। বরারা বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। দেখলেন আশেপাশের সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে কী যেন শুনতে চেষ্টা করছেন। আওয়াজটা মেন রোডের দিকে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। মাইক ছাড়া কথাও শোনা যাচ্ছে না। তবে এটা তো শুধু কথা নয়। বাঁধ ভেঙে সজোরে বেরিয়ে আসা নদীর ঢলের মত এটাও আওয়াজের ঢল।

হঠাৎ গুলির আওয়াজ শোনা গেল। বরা দৌড়ে এসে ফোনটা তুলে নিলেন। থানার পাশেই তার শালীর ঘর। তাকেই জিজ্ঞেস করলেন কী ঘটেছে। ফোনটা রেখেই পুনবায় দৌড়ে এসে উত্তেজিত স্বরে বললেন---'থানা ঘেরাও করতে গিয়েছিল অজস্র মানুষ। টিয়ার গ্যাস চালিয়েছে।'

১১.

শহরের মেন রোডের দু'পাশে কার্ফিউ। বরাদের ওখানে নেই। তবুও ভয়াল পরিবেশ। গাড়ি মোটরের চলাচল নেই। মানুষের স্বাভাবিক কর্মব্যস্ততা ব্যাহত হয়েছে। তবুও বেঁচে থাকতে হলে খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত তো করতেই হবে। সকালের চায়ের কাপে বরা এক চুমুক দিয়েছেন। ঠোঁট দুটি বিকৃত না করে যথাসম্ভব শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন--'চিনি নেই?'

'শেষ হয়ে গেছে।'

'দু'দিনের কার্ফ্যুতেই এই অবস্থা? একেবারে শেষ হয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করে থাক কেন?'

'গতকাল মিসেস চালিহা এক কাপ চেয়ে নিয়েছে। চা খাবার সময়ই রান্নাঘরে উঁকি মেরেছে। না বলি কিভাবে?'

'এই কয়েকদিন একটু হিসেব করে না চললে বিপদ হবে।' বরার পত্নী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন— 'এখন বলছ কেন? কাল দুপুরবেলা যখন আহমেদেরা এসেছিল তখন তুমিই তো চা চা করে হুলস্থুল লাগিয়েছিলে?' একজন দুজন নয়, ছ'জন মানুষ।'

বরা জব্দ হলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন---'আমি একটু আসছি, দাঁড়াও।'

'কোথায় যাচ্ছ।'

'আহমেদ দের ওখানে।'

স্ত্রী কিছুটা রসিকতা করলেন--'চিনি-চা খাবার জন্য নাকি?

'দাড়াও হে।'

১২.

আহমেদের ঘরে ভট্টাচার্যও বসেছিলেন। তিনি দুঃখ করে বললেন - 'সব বন্ধ হয়ে যাক। কিন্তু খবরের কাগজ আসাটাও যে বন্ধ হয়ে গেছে।'

বরা বললেন -- 'টিভির মতে তো সাতজনেব মৃত্যু হয়েছে। দত্তকে জিজ্ঞেস করায় বললেন 'দশজন। আবার সেদিক থেকে কোনমতে লোকের বাড়ির আনাচ কানাচ দিয়ে অনেক কষ্ট করে আসা লোকটি বলে উঠলেন 'চৌদ্দ জন। বলা মুশকিল।'

'দত্তের কথাটাই নির্ভরযোগ্য। তিনি তো খবরের কাগজের রিপোর্টার।' আহমেদ যুক্তি দেখালেন।

ভট্টাচার্য হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন-- 'মন্টু দোকানিকে চিনতেন কি? সেই মানুষটাও মারা গেছে।'

'মন্টু দোকানি?

'সেই যে বাজারের পাশে ছোট পানদোকানটা, সামনে একটা কামারশাল রয়েছে।-

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। নাম দিয়ে মানুষ চিনতে পারি না।'

'আমিও চিনতাম না। একদিন হাবিজাবির মধ্যে সস্তির একটা দোকানে আমার হাহাকাব

অবস্থা। চার টাকা খুচরো নেই। এ পকেট থেকে ও পকেট খুঁজে বেড়াচ্ছি, নেই। সব্জিটাই ফিরিয়ে দেবার জন্য ব্যাগটা তুলে ধরেছি, তখনই সেই দোকানী বলল—'নিন স্যার। এই যে চার টাকা। আমার নাজেহাল অবস্থা। বললাম—'কাল সকালবেলাতেই তোমাকে দিয়ে দিতে পারব, হবে তো?' সে হেসে বলল- 'হবে স্যার। আমি তো আছিই। আপনিও আছেন। কেউ কোথায়ও তো আর হারিয়ে যাচ্ছি না।' বলতে বলতে ভট্টাচার্য চুপ করে গেলেন। বরা এবং আহমেদ দুজনেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। তার অর্থ- 'বেচারা'।

১৩.

সত্যজিৎ বরা বিছানায় শুয়ে ছিলেন। কয়েকটা গুলির শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। দরজার হুকে হাত দিতে যেতেই পত্নী বাধা দিলেন 'দাড়াও তো।' হুক খুলতেই বরা বললেন - 'চৌধুরীরা পাহারা দিচ্ছে তো।' অসহায়ভাবে স্ত্রীও পেছন পেছন বেরিয়ে গেলেন। দেখলেন সবাই বেরিয়ে পড়েছে। চৌধুরীরা ডিউটিতে তো ছিলেনই। তারা সবাই কাছাকাছি চলে এলেন। না। আর শব্দ নেই। যেন একটা সূঁচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে। কিছুক্ষণ পরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। বোধহয় পুলিশ এবং আর্মির।

১৪.

বাতাসে খবর ভেসে আসছে। গুলির ঘটনাটা মিলনপুরের। আটজন মারা গেছে। একটা খালের মতো রয়েছে যেখানে, সেখানেই সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে গুলি করেছে। আহমেদ বললেন 'গতরাতেই আরও একটা ঘটনা ঘটে গেছে। বনগাঁও এ মানুষ মেরেছে। বাবা মা, ছেলে, নাতি সব মিলিয়ে সাতজন।' সত্যজিৎ স্বগতোক্তি করার মত বললেন 'কে জানে, আরও কোথায় কত ঘটেছে।'

১৫.

লোকগুলি হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। প্রত্যেকের হাতে একটাই জিনিস—থলে। সারা দিনের জন্য কার্ফ্যু শিথিল করা হয়েছে। সত্যজিৎ বরাও বাজার করে আনলেন। এসেই দেখলেন হকার এক বাণ্ডিল খবরের কাগজ বারান্দায় ফেলে রেখে গেছে। এক সপ্তাহের জমানো কাগজ। প্রত্যেকটিরই প্রথম পাতায় তাঁর নিজের জায়গার নামটা জ্বলজ্বল করছে। সোনালী অক্ষরে নয়, রক্তের দাগে। পালপাড়া, মিলনপুর, বনগাঁও। নিহতদের নাম এবং বয়সেরও উল্লেখ রয়েছে- সুভাষ পাল (৫৬), ধীরেন কুণ্ডু (২৫), জয়া (২বছর ২মাস) ......

সত্যজিৎ বরা থমকে গেলেন। দুই বছর বয়সে সোনামণি আলনার নিচের ড্রয়ারটা টেনে কাপড়গুলি মেঝেতে ফেলে দিত। তার দাড়ি কাটার সরঞ্জাম বিছানায় উঠে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিল। একদিন মায়ের কানের দুলজোড়াও ফেলে দিয়েছিল। অত্যন্ত উৎপাত। অথচ অতি আদরের।

বনগাঁওয়ের মৃতদের নামগুলি পড়ার সময় বয়সের সামঞ্জস্য না থাকা সত্ত্বেও সোনামণির মুখটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। মৃত্যু ভয় অথবা পুত্রহারা হবার ভয়। যেন এটা বায়ুমণ্ডল নয়। ভয়মণ্ডল। প্রতিমুহূর্তে নাক দিয়ে ফুসফুস পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। তার ঘুম আসছে না। পাহারার ডিউটি পড়লে তো কথাই নেই। না পড়লেও জেগে থাকেন। সাপে কাটা মানুষের মতো

অবস্থা। সত্যজিৎ বরা যখন কিশোর তখন কাকীমাকে সাপে কামড়েছিল। কাকীমা ঘুমে ঢলে পড়তে চাইছিলেন, কিন্তু ওঝার নির্দেশে সবাই মিলে তাকে জাগিয়ে রাখে। তখনই কথাটা জানতে পেরেছিল। সাপে কাটা মানুষকে ঘুমোতে দিতে নেই। ঘুমোলে ঘুমিয়েই পড়বে। আর কোনদিন জাগবে না।

তিনি দু'দিন আগের খবরের কাগজগুলি দেখলেন। বনগাঁওয়ের খবরটা রয়েছে। এখানেও নাম আর বয়স দেওয়া হয়েছে। মহেশ দাশ (৬০), অরুণ দাস (২৮), কলি দাস (৪৭) ....।

তিনি থমকে গেলেন। কলি দাস? তার গল্পের কলি? হতে পারে, মহেশ নামটাও তো রয়েছে। তার উপাধি কী ছিল - তিনি জানেন, কিন্তু দুটো নামই একই পরিবারে কীভাবে হতে পারে? কীভাবে? তার মানে— কলি গোবর জল থেকে উঠে এসেছিল নাকি? মানুষটিকে একবার দেখার জন্য তার খুব আগ্রহ হল। নিজের অজান্তেই শার্টটা পরে নিলেন। তিনি দেখতে চান---এই কলিই সেই কলি কি না। হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে। স্কুটারে করে গেলে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসা যাবে।

স্কুটারে হাত রেখেই মনে পড়ল--তিনদিন পার হয়ে গেছে। কলি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে ছাই হয়ে গেছে। হতাশভাবে তিনি ফিরে এলেন। নিজের ঘরে ধীরে ধীরে ঢুকে গেলেন। টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন। কাগজের স্তূপটার উপরে ধূলির আস্তরণ পড়েছে। তবুও শেষের বাক্যটার দিকে তার চোখ পড়ল --'চুল-টুল খুলে উপুড় হয়ে ছিটকে পড়ল।'

দৃশ্যটা তার মনে জেগে উঠল। তারপরেই মনের মধ্যে দুটো প্রশ্ন দেখা দিল। তার চুলের গোছা খুলে গিয়েছিল কি? উপুড় হয়ে ছিটকে পড়েছিল না চিৎ হয়ে? কাপড়ে ওটা তো গোবরজলের দাগ নয়, রক্তের দাগ।

অর্ধসমাপ্ত গল্পটির শেষ বাক্যটির উপরে সত্যজিৎ বরা ধীরে ধীরে হাতটা বুলোতে লাগলেন। বুকের মধ্যে কিছু কথা গুমরে উঠতে লাগল –'তার মানে তুই গোবরজল থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিলি। প্রেম দিয়েছিলি। প্রেম নিয়েছিলি। কিন্তু রক্তের স্রোত থেকে তুই আর উঠে দাঁড়াতে পারলি না। কলি ..। সেই ছড়ার গানের কলি!

লিয়াকৎ

মণিকুন্তলা ভট্টাচার্য

যখন আমি স্কুলে পড়তাম, আমাদের স্কুলে লম্বা, বেঁটে, কালো-সাদা, শক্ত-ক্ষীণ অনেক ছেলেমেয়েরা পড়ত। বেশিরভাগই ছিল মুসলমান। স্কুলটির নামটাও ছিল মক্তব। একটি ক্ষীণ অথচ সুগভীর নদীর পারে সকাল দুপুর আজানে মুখরিত হয়ে থাকা একটা মসজিদ আর তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল আমাদের আদরের স্কুলটি। দরজা-জানালা না থাকা একেবারে সাধারণ স্কুল---মক্তব। স্কুলটির প্রতি আমার আদরের ঔৎসুক্যের সীমা ছিল না, কিন্তু স্কুলের নামটির জন্যেই আমি কিছুটা অসুবিধেয় পড়েছিলাম।

আমরা হিন্দু, তাতে আবার ব্রাহ্মণ। কর্মসূত্রে আমার বাবাকে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল বলেই হয়ত তিনি কিছুটা উদার মুক্তমনা ছিলেন। কিন্তু আমার কাকা, জ্যেঠা বা মামার বাড়ির দিকের আত্মীয়-স্বজনরা যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিলেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য হিন্দুদের থেকেও তারা দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন। কোঁচ, কেওট, কৈবর্ত ইত্যাদিদের থেকেও তারা বেশ দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন। সে জায়গায় মুসলমান হলে তো আর কোন কথাই নেই। তাই আমার স্কুলটাকে নিয়ে তারা এক ধরণের চিন্তাতেই ছিলেন। কারণ, বাবার চাকরিস্থল সেই অঞ্চলটির আশেপাশে আর কোন ভাল স্কুল ছিল না। বড় নিরুপায় হয়ে আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কখনও কখনও তারা বলে ফেলতেন---'মক্তবেই পড়তে হল, মিঞাদের স্কুলে!'

তীক্ষ্ণ একটা শেল যেন আমার বুক ভেদ করে আমাকে আহত করে তুলত। আমি রীতিমত অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করেছিলাম। আমার আদরের দাদুর আধি ক্ষেতির মিঞা কৃষকদের কৃশ মুখগুলি আমার চোখের সামনে পেণ্ডুলামের মত দুলতে থাকত। ভাবতে ভাবতে মনে বড় দুঃখ হত। মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু শরীরের, হৃদয়ের, স্নেহ ভালোবাসার কোন পার্থক্যই দেখতে পেতাম না। মনে মনে আমি আমার আত্মীয়স্বজনের এই মনোভাবকে মেনে নিতে পারছিলাম না।

হ্যাঁ, নিজের অজান্তেই সেই শৈশবে বুকের মধ্যে রোপিত হয়েছিল জাত পাতের অনেক উর্দ্ধে মানবপ্রেমের বীজ। নিজের অজান্তেই মক্তবকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম। শুনেছিলাম অন্ধকারে সাপের মাথার মণি থেকে এক স্বর্গীয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। আর সে রকম এক স্বর্গীয জ্যোতিকেই কল্পনা করে মাঝে মধ্যে আমি আমার হাতের তালুতে একটা মটরদানার মত গোল মুক্তার মণি উজ্জ্বল রোদে তুলে ধরার কল্পনা করতাম। তার থেকে বিচ্ছুরিত হওয়া সর্পমণির মত স্বর্গীয় রূপের চোখ ঝলসে দেওয়া জ্যোতি। ধীরে ধীরে সেই মুক্তার আকার বেড়ে গিয়ে আমার স্কুলঘরের আকার নিচ্ছিল। মক্তবের প্রকৃত অর্থ আমি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে জানতে চাইনি। রোদে তুলে ধরা মুক্তার যে স্বর্গীয় রূপ আমি কল্পনা করেছিলাম মক্তব মানেও আমি সেই অর্থেই ধরে নিয়েছিলাম।

মক্তবে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়াশোনা করত আব্দা। সেই শৈশবে তার যে ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছিল, তাতে আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলাম। হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে তাকে অনুসরণ করতাম। সেই ছোট শহরের একজন নামী ব্যবসায়ী আব্দার আব্বাজানের সঙ্গে আমার পিতার সহৃদয়তা গড়ে উঠেছিল। উৎসবাদিতে আমরা একত্রিত হতাম। সম্পূর্ণরূপে রুচিবান সেই মানুষটির কাছে যাওয়ার সুযোগ পেলে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পডতাম। আর তেমনই কোন আনন্দঘন মুহূর্তে আমি আব্দাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম--'তোমার আম্মা কেন সিঁদুর পরে না?'

—'উচিত নয়, তাই পরে না।'

—'পরলে কী হবে?'

—'কিছুই হবে না, কিন্তু আমার ধর্মে নিষেধ রয়েছে বলেই পরে না।'

তার ধর্মজ্ঞান দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। নিজেকে বড় অবোধ, বোকা বলে মনে হচ্ছিল। আর ধীরে ধীরে আমার নিজেরও আমার ধর্ম সম্পর্কে ঔৎসুক্য বেড়ে চলছিল। ধর্মীয় উপাখ্যানগুলি পড়ার পরে আমিও আমার পিতাকে অজস্র প্রশ্ন করে আমার ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলাম।

আমাদের স্কুলটা মসজিদের পাশে বলেই দুপুরের টিফিনের ঘন্টা বাজলেই নামাজের জন্যে একদল ছাত্র সবসময়েই মসজিদে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে থাকত। শুক্রবারে সেই সময়টা আরও বেশিক্ষণের জন্য হত। এমন কী আশ্চর্য আকর্ষণীয় রূপ আল্লার, যা দেখার জন্য ছেলেরা তাদের প্রিয় খেলাধূলা ছেড়ে মসজিদের উদ্দেশ্যে ছুটে যায়? আমি চিন্তিত হয়ে পড়ছিলাম। খুব ইচ্ছে করত মসজিদের ভেতরে থাকা আল্লাকে দেখার জন্যে। কিন্তু আমি যে হিন্দু। মসজিদের মধ্যে কোন হিন্দু প্রবেশ করলে কোন জনাব টিটকিরি দেবে ভেবে আমি সঙ্কুচিত হয়ে পিছিয়ে এসেছিলাম।

আরও একদিন অনুচ্চস্বরে আমি আব্দাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোমাদের মসজিদের ভেতরে আমাকে একদিন নিয়ে যাবে? ....সবার অজান্তে আমি একবার আল্লাকে দেখব। মাত্র একবার... ।'

আব্দা শুধু আস্তে করে হেসেছিল। কোন উত্তর দেয়নি। হায়, আব্দার মাধ্যমে মসজিদের ভেতর ঢোকার আশা আমি একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু বড় সঙ্গোপনে বুকের মধ্যে লালন করছিলাম সেই আশা। খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম সোনালী সুযোগ।

অবশেষে একদিন সেই সুযোগ এসে গেল। স্কুলে বাৎসরিক পরীক্ষার শেষদিন আমরা সব ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলের বাইরে খোলা জায়গায় খেলতে গিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে একটা ভ্যাবলা ছেলে পড়ত। যেখানে সেখানে সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত। কেউ আস্তে করে একটা ধমক দিলেও

সে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিত। সেদিন পরীক্ষা শেষ হওয়ার আনন্দে, কি জানি কি ভেবে তাকে ক্ষেপানোর জন্যে তার হাত থেকে পিচবোর্ডটা কেড়ে নিয়ে আমি উপর দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা ঘুরে গিয়ে পাশের মসজিদের সীমানার ভেতর পড়েছিল। ছেলেটির চিৎকার করে কান্না শুনে চৌকিদার দাঁত কড়মড় করে তাড়া করে এসেছিল— 'কে? কে ফেলেছে ওটা?'

'আমি। এখনই আমি ওটা এনে দিচ্ছি। বলেই আমি মসজিদের উদ্দেশ্যে দৌড় লাগিয়েছিলাম। পেছন থেকে করুণ চিৎকার করছিল—'ঐ যাস না, চলে আয়। ওখানে ভূত আছে। চলে আয়, চলে আয়। কিন্তু আমি এহেন সুবর্ণ সুযোগটা ছাড়তে চাইছিলাম না। কারো কোনরকম ওজর আপত্তি না শুনে মসজিদের সীমানায় পা রেখেছিলাম। পিচবোর্ডটা ঘাসের উপরে পড়ে থাকতে দেখেও সেটাকে পেরিয়ে আমি এক নিঃশ্বাসে মসজিদের ভেতর ঢুকে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। ....নাই। কোনকিছুই ছিল না। ভগবানের মাথার পেছন দিকে স্বর্ণাভ রশ্মিতে চোখ ঝলসে দেওয়া সাইকেলের রিঙটার মতো উজ্জ্বল একটা রিঙের কথা কল্পনা করে নিয়েছিলাম। আর মসজিদের ভেতর কোন ধরণের প্রতিমা বিগ্রহ না থাকলেও চরকির মতো অবিকল একটা রিঙ শূন্যেব মধ্যেই ঘুরতে থাকার উদ্ভট একটা কল্পনা আমার মাথার মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল।

স্কুল থেকে মসজিদ পর্যন্ত দৌড়ে যেতে ধুকপুক করতে থাকা আমার বুকটা যেন স্তব্ধ হয়ে যাবে মনে হচ্ছিল। কিছুই যে ছিল না সেখানে। আঃ শূন্যের মধ্যেই ঝুলে থাকা স্বর্ণাভ রশ্মি ছড়ানো চরকির মতো ঘুরতে থাকা সাইকেলের রিঙটার মত রিঙ একটা তো থাকতে পাবত তাতে। যে দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে প্রিয় খেলাধূলার আকর্ষণ ছেড়ে সমবয়সী ছেলেরা স্কুলেব বিশ্রামের সময় মসজিদের উদ্দেশ্যে ছুটে যায়। বার বার। বড় হতাশার সঙ্গে আমি আমার দৃষ্টিটাকে মেঝের মধ্যে নামিয়ে এনেছিলাম। কোথাও কিছু ছিল না। কেবল বারান্দায় উঠে দুটো শালিখ পাখি কথা বলছিল তখন।

এই বিষয়ে আমি কাউকে যদিও কিছুই বলিনি, আব্দাই যেন আমার মনের হতাশার কথাটা টের পেয়ে গিয়েছিল। ওদের ঘরে যাবার জন্যে ঘনঘন তাগাদা দিচ্ছিল।

লিয়াকৎ নামে আব্দার এক ভাই ছিল। সূঁচলো নাক, গোলাপী ঠোঁটেব সেই ভাইটি দেখতে খুব সুন্দর ছিল আর ভাঙা ভাঙা স্নেহময় সুরে সে আমার সঙ্গে কথা বলছিল। আব্দার নানী ভিজে কাপড় রোদে শুকোতে দেবার মত করে সেওয়াই মেলে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে সে ধূপকাঠিও তৈরি করত। নানীর খাটিয়ার আশেপাশে একটা ছোটখাটো ধূপকাঠির ব্যবসাই গড়ে উঠেছিল। কণ্ঠা বের করা ছেঁড়া গেঞ্জি পরা দুটো লোক সাইকেলে বোঝাই করে সেগুলিকে বেচার জন্যে নিয়ে যাবার দৃশ্য এখনও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। ধূপের প্যাকেটের উপর লেখা উর্দু না আরবী অক্ষরগুলিকে উড়তে থাকা এক ঝাঁক পাখির মতো মনে হয়েছিল আমার। আগরের ব্যবসা করা আব্বাজানকে প্রায়ই আগ্রাতে থাকতে হত। তিনি কথার মধ্যে উর্দু শব্দ ব্যবহার করতেন। আর দু'চোখে সুর্মা এঁকেছিলেন। অত্যন্ত বিনয়ী সেই লোকটির সঙ্গে আমার পিতার সহৃদয়তা ছিল অত্যন্ত গভীর। সেই ছোট শহরটিতে দুয়েক বছর থাকার পরে আমরা অসম ছেড়ে চলে এসেছিলাম। দিল্লি, বেনারস, তারপর আগ্রায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। আর একদিন পুনরায় অসমের বাইরে আব্দাদের পরিবারটির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সময় এগিয়ে যাচ্ছিল। পরিবর্তিত হয়েছিল বিভিন্ন ঋতুর উৎসব। আব্দার নিকাহ হয়ে গিয়েছিল। সে সাহারানপুরে থাকতে শুরু করেছিল। নানীর মৃত্যু হয়েছিল। আর লিয়াকৎ জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়াতে ছিল। অনেক বছর পরে ঈদের সময় তার সঙ্গে আমার তাদের

বাড়িতে দেখা হয়েছিল। তার সেই সুকোমল রাজকুমারের মত চেহারা পরিবর্তিত হয়ে পরিণত পৌরুষদীপ্ত চেহারায় পরিণত হয়েছিল। বুকের অতল গহ্বর থেকে তার কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসছিল। মুখমণ্ডলে তার সবসময় সন্তোষের আভা ছড়িয়ে থাকত। ... গ্রীক দেবতার মতো দুচোখের পাতা নমনীয় করে হঠাৎ সে একদিন তার দু'হাত দিয়ে আমার দুই বাহু খামচে ধরে বলে উঠেছিল--'আমি তোমাকে ভালোবাসি নয়না। .. দেখ, আমার চোখের দিকে তাকাও। আমি তোমাকেই ভালোবাসি। ' দুরন্ত গতিতে যেতে থাকা গাড়ির ক্লাচ ব্রেক সজোরে থামিয়ে দেওয়ার মত আমি চমকে উঠে মাথাটা পেছনদিকে হেলিয়ে দিয়েছিলাম। আর সেই হেলানো মাথা যে কখনো সোজা করতে পারব, সে আশাটাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। অনেকদিন পর্যন্ত মনের মধ্যে তুফান বইছিল। মাঝে মাঝে মন্দির এবং মসজিদের মধ্যে একটা কংক্রীটের দেওয়াল গড়ে উঠেছিল। হায়, কেবল ধর্মের জনাই সেই ভালোবাসাকে গভীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমি আমার হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারব না। তুফানই ছিল। আর কখনও বা প্রেম ভালোবাসার স্নিগ্ধ অনুভবে সেই তুফান মলয় বাতাসে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছিল। একটা স্বর্ণালী জ্যোতির সাইকেলের বিণ্ড, গ্রীক মাধব মন্দির এবং পোয়া মক্কার মধ্যে অহরহ আসাযাওয়া করছিল।

হায়, ভালোবাসার অনুভূতি নিয়ে যমুনার বালকাবেলায় লিয়াকৎ বড় উদগ্রীবতার সঙ্গে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সজারুর মত কান খাড়া করে পরম ঔৎসুক্যতার সঙ্গে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। যমুনার বুকে সূর্যাস্তের কোমল আভায় বর্ণময় ছোট ছোট ঢেউগুলির দিকে তাকিয়ে আমি ডাইনে বাঁয়ে ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়ছিলাম। আঃ হঠাৎ যেন মরালী। খোলা জামার ফাঁক দিয়ে জ্বল জ্বল করতে থাকা গ্রীক দেবতার মত তার প্রশস্ত বুকটার দিকে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে সে পাগলের মত না না করে তার অনুরাগের তীব্রতার দোহাই দিয়ে কীসব বলে যাচ্ছিল। কিন্তু তখনও অন্য হাতটা দিয়ে আমার হাতটা খামচে ধরেছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা যেন সত্যিই..............! উত্তেজনায় দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দূরের একটা বালির স্তূপ প্রচণ্ড লাথিতে ভেঙে রেখে তারপরেই ফিরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তার হৃদয়ের বিধ্বস্ততার অনুমানে আমার ভেতরের মানুষটা জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল। হায়, লিয়াকতের অনুরাগে রঞ্জিত হতে চেয়েও আমি জ্বলে পুড়ে গিয়েছিলাম। হাড়ে হাড়ে, ধমনী শিরায় দুরন্ত গতিতে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল ধর্মের দোহাই। আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকা লিয়াকৎ ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে বসে আমার পা দুটিতে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। আর ভেঙে ছিঁড়ে জ্বলে পুড়েও তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। সন্ধ্যার যমুনার স্নিগ্ধ সমীরে আমার শাড়ির নীল আঁচল লম্বা চুলের সঙ্গে মুক্তভাবে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

গভীর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, লিয়াকতের ভালোবাসাকে গ্রহণ করেও কার জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম আমি। ধর্ম, হায় ধর্মের জন্যেই। পিতা নিয়মিত জপ করতেন। দুবেলা কালীর সহস্র নাম জপ করতেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার মা উপোস করতেন। প্রত্যেক শুক্রবার সন্তোষী মা'র, প্রত্যেক মঙ্গলবার হনুমান চালিসার দস্তুরমতো শ্রবণ কীর্তন হত আমাদের বাড়িতে। প্রত্যেক সোমবারে উপোস থেকে আমি শিবপুজো করতাম। বাড়ির একমাত্র সন্তান বলে আমার উপরেও কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর তা কখনও ছাড়তে না পারা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কালী, তারা, সরসী, ভুবনেশ্বরী, মাতঙ্গী, কমলা, ভৈরবী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, মা কালীর এই দশনাম সব সময় জিহ্বার অগ্রভাগে নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। 'নমঃ ত্রাম্বকম যজামহেঃ সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম, উর্বরোকামিদং বন্ধনাৎ মৃত্যুমুখীনাং মা মৃতৎ স্বাহা।' আহা, কী অপূর্ব সেই

মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। যা আমার শিরায় শিরায় রক্ত হয়ে টগবগ করছে। পাবব না, পারব না নিরাকাল আল্লা, মক্তব, লিয়াকৎ সবাই সঙ্গে থাকলেও সেই রক্ত হারিয়ে গেলে আমি যে বেঁচে থাকতে পারব না। একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়তে হবে যে।

লিয়াকতের অনুরাগ কানে বাজলেই জোরে জোরে আমি ইষ্টদেবতার নাম নিতে শুরু করেছিলাম। আমার হৃদয়ের সকাতর আতুরতাকে অগ্রাহ্য করা এক ধর্মভীরু কঙ্কাল হয়ে পড়ছিলাম আমি। আর, আর বুকের মধ্যে তুফানের তাণ্ডব নিয়েই আমি আগ্রা থেকে পিতার কর্মসূত্রে কাঞ্চীপুরমে পৌছেছিলাম। দিনগুলি গতানুগতিক ভাবে পার হয়ে যাচ্ছিল। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি দর্শনশাস্ত্র নিয়ে এম.এ পাশ করেছিলাম। ইতিমধ্যে আমাদেব সামাজিক পরম্পরাতেই আমার অপরিচিত কোন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের অপরিচিত এক যুবকের সঙ্গে আমার বিয়ের বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল।

বিয়েতে লিয়াকৎ আসেনি। একটা জরির কাজ করা নীল শাড়ি আর এক বাক্স ফিরোজা মণির অলঙ্কার আম্মীর হাত দিয়ে পাঠিয়েছিল। হাত পেতে প্রসাদ নেবার মত করেই লিয়াকতের শুভেচ্ছা গ্রহণ করেই আমি দৌড়ে গিয়ে বাথরুমে ঢুকেছিলাম। বোঝাতে না পারা এক অব্যক্ত অনুভূতিতে আমার ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছিল। মোম হয়ে আমি যেন ধর্মের নামে জ্বলছিলাম। আর হৃদয়টা গলে গলে ছাই হয়ে গিয়েছিল পোড়া ম্যাগনেসিয়ামের ছাইয়ের মত। আঃ কী যে অবর্ণনীয় হাহাকার সেটা। দুহাতে মুখ ঢেকে আমি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। আর তার দুদিন পরেই অসমের, শহরের আমেজ থাকা দুলিয়াজানে স্বামীর সঙ্গে এসেছিলাম। প্রথমদিন এসেই বেসিনে মুখ ধুতে গিয়ে আমি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। কোথায় যেন আজান দিচ্ছিল। সুরটা যেন আগ্রা থেকে একটু অন্য ধরণের। পরের দিন সকালবেলাতেও শুনেছিলাম। মাঝে মাঝে আমি বড় অবাক হয়ে যাই যে আজান দেয় তার কণ্ঠে কোন ধরণের জড়তা থাকে না। অডিশনে পাশ করা কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডাতেও কি জড়তাবিহীন কণ্ঠস্বর! আজান শুনলেই আমি পাথর হয়ে যাই। রুদ্ধশ্বাসে নিশ্চল হয়ে আমি যেন অনন্তকাল ধরে আজান শুনতে থাকব, দাঁড়িয়ে থাকা জায়গাতেই। এটা আসলে কী হলদে করবীর কলি ছিঁড়ে এনে চুষে চুষে আকণ্ঠ মধু পান করার মত এক অনন্য শ্রুতিমাদকতা। তা যে স্বর্গীয় বন্দনা। যেখানে একাকার হয়ে যাবে সমস্ত মানুষের প্রার্থনা।

তবে তা সম্ভব নয়। কেমন সুললিত বন্দনা মানুষকে বিভোর কয়ে রাখতে পারলেও একাকার করতে পারে না। হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই তা পারে না। রাম জনমভূমি, বাবরি মসজিদের ইস্যু নিয়ে লোকেরা পাগল হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর ধর্মীয় বোঝাবুঝি তথা প্রতিসম্মানগুলি যেন কোথাও মুখ থুবড়ে পড়েছিল। খবরের কাগজগুলি অশান্তিতে ভরে উঠেছিল। পৃষ্ঠাগুলিতে বাদানুবাদ ছাড়াও সর্বসাধারণের দুঃখ দুর্গতির সংক্ষিপ্ত আভাসও প্রকাশিত হচ্ছিল। তার মধ্যে প্রধানত তিনটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটি নিহতের, দ্বিতীয়টি আহতের আর তৃতীয়টি নিরুদ্দিষ্ট হওয়া লোকজনদের। তৃতীয় তালিকাটিতে একদিন চোখ বুলোতে গিয়েই চোখের সামনে সমস্ত কিছু একাকার হয়ে এলো। হ্যাঁ, লিয়াকৎ, লিয়াকতের নামই ওটা। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মত আমি মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। দৌড়ে গিয়ে বিছানায় আছাড় খেয়ে পড়লাম। বুকের ভেতরটা সাইক্লোনে যেন তোলপাড় করে তুলছিল। পরের মুহূর্তেই অনুভব করছিলাম এক বিরাট শূন্যতা। নিরাকার আল্লার মত লিয়াকতের জন্যও আমি হৃদয়ে এক অনামী আসন পেতে রেখেছিলাম। যমুনার বালিতে দাঁড়িয়ে স্থিতপ্রজ্ঞের মত লিয়াকৎ কে আমি বলেছিলাম, 'হয় আমার মুসলমান হওয়া উচিত ছিল,

নাহয় তোমার হিন্দু হওয়া উচিত ছিল।' আমার কথা শোনামাত্র ধর্মগুরুর মত গদগদ কণ্ঠে সে যেন ঘোষণাই করছিল, 'হিন্দু মুসলমান এসমস্ত কোন কথাই নয় নয়না। তুমি কেবল আমার ভালোবাসাকে স্বীকৃতি জানাও। জান কি তুমি, তুমি জান কি ভালোবাসা কী করতে পারে? ভালোবাসা ঈশ্বর আল্লা একাকার করে। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে এসমস্ত কী ছিল? রাম জনমভূমি, বাবরি মসজিদের মত ঘটা পাগলামিগুলি?

লিয়াকতের প্রতি আমার উদ্বিগ্ন মনোভাব আমি একাই অনুভব করছিলাম। কারো সঙ্গে সেই মনোবেদনা ভাগ করে নেবারও কোন উপায় নেই। এদিকে আমার গর্ভে আশ্রয় নিয়েছিল ছোট্ট একটি প্রাণ। ক্রমশ স্ফীত হয়ে ওঠা আমার উদরের টনটনে ভাবটা আমাকে রাতের বেলা শুতেও দিচ্ছিল না। কেবল আজানের স্বর্গীয় বন্দনা শুনলেই যেন শিশুটি ঘুমিয়ে পড়ত। সারাটা রাত এপাশ ওপাশ করতে করতেই সময়টা বড় শ্লথভাবে পার হয়ে যেত। আর এমনই ক্লান্তিকর সময়গুলিতে ইষ্টদেবতার নাম নিতে গিয়ে বার বার আমার লিয়াকতের কথা মনে পড়ত। কী হল লিয়াকতের? তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে কি? যদি এখনও তাকে না পাওয়া গিয়ে থাকে, তাহলে কোথায় কীভাবে সে আছে? হে আমার ঈশ্বর, সে যেখানেই থাকুক না কেন তাকে অক্ষত রেখো। তার পেশীবহুল গ্রীক দেবতার মত শরীর যার মধ্যে থাকা হৃদয় কেবর আমারই জন্যে স্পন্দিত হত তা যেন অটুট থাকে। সে যেখানেই থাকুক না কেন, কোনভাবে আমাকে সেটা জানিয়ে দাও। একই পরমপিতার সন্তান আমরা। কেউ বা আকারের মধ্যে খুঁজে বেড়ায়, আর কেউ বা নিরাকারের মধ্যে। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য একটাই। পথটা কেবল ভিন্ন। তাই যদি হয় তাহলে কার জন্যে কে কাকে হত্যা করে? কেন এরকম হয়!

হ্যাঁ, একমাত্র প্রেম, একমাত্র প্রেমই ঈশ্বর-আল্লা সব একাকার করে দিতে পারে। তুমি ঠিকই বলেছিলে লিয়াকৎ। যার হৃদয় প্রেমময় হয়ে পড়ে, যার শরীরে সেই হৃদয় বাস করে, সেই শরীরই তো ধর্মগুরুর মত গদগদ কণ্ঠে বলতে পারে, দেখ আমি মানুষ। আমি প্রেম। আমি প্রেমময় মানুষ।

ইশ্, লিয়াকৎ এ সমস্ত কী বলেছিল, যুক্তিতর্কের তুফানের অনেক উর্দ্ধে দাঁড়িয়ে এসমস্ত কীসের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছিল সে। তার আল্লার সঙ্গে আমার ঈশ্বর যদি একাকার হতেন, তাহলে নিশ্চয় প্রেমের মহৎ বীজ বপন করতে পারতাম। না না, তা বলে কোনদিন তার সঙ্গে এক বিছানায় শোবার স্বপ্ন কোনদিন আমার কল্পনাতেও আসেনি। প্রভাতের সোনালী সুযোগ আমি যেন পেয়েও হারিয়েছিলাম। লিয়াকতের প্রতি অনুভূত হওয়া এক অহেতুক প্রেম আমাকে মাকড়সার জালের মত চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল। আমি যেন উত্তাল হয়ে হাতে খোল-করতাল নিয়ে বৃন্দাবনের সংকীর্তনে মেতে উঠেছিলাম। হে পরমপিতা, হে সর্বশক্তিমান একাকার কর, ঈশ্বর আল্লা একাকার কর.....।

সমস্ত রাতের অনিদ্রাজনিত যাতনা, লিয়াকতের প্রতি সঙ্গোপন বিষাদগ্রস্ততা আমাকে পিষে আঁখের ছিবড়ের মত করে ফেলেছিল যেন। স্বামী আমাকে কাঞ্চীপুরমে নিয়ে যাবার কথা ভাবছিলেন। আর একদিন আমরা কাঞ্চীপুরমে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের জন্যে মা রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে উঠছিলেন। তাই আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে থাকা পিতাকেই আমি অকস্মাৎ লিয়াকতের খবর জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

অনেক কথায় উন্মুখ হয়েও যেন অকস্মাৎ নির্বাক হয়ে পড়েছিলেন তিনি। হাতে ধরে আমাকে পাশে বসিয়েছিলেন আর ধীরে ধীরে উচ্চ বণ করেছিলেন নিয়তির অমোঘ বক্তব্য।

লিয়াকৎ, গ্রীক দেবতার মত শরীরে প্রেমময় হৃদয় ধারণ করা, আমার অহেতুক প্রেমের স্বপ্ন লিয়াকতের মৃত্যু ঘটেছিল। তাকে ঈশ্বরের নামে হত্যা করা হয়েছিল। রাম জন্মভূমির নামে। তার ফার্ম হাউসের পাশেই ডেডবডি পড়েছিল। যে মৃত শরীরের মাথাটা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি। সমস্ত শরীরে মাছের কাঁটার মত ধারালো অস্ত্র দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছিল। হাতে পায়ে একটাও আঙ্গুল ছিল না।.....না না, সে লিযাকৎ হতে পারে না। তা অন্য কারো শরীর হবে। বুকের মধ্যে সঙ্গোপনে বয়ে বেড়ানো আমার বিষাদগ্রস্ততা খানখান হয়ে বুক ভেঙে চোখের জল হয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। আমি আর্তনাদ করে উঠেছিলাম- না না সে লিয়াকৎ নয়। সে লিয়াকৎ হতেই পারে না। লিয়াকৎ সবসময়ই ঈশ্বর আল্লা একাকার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। তখনই রান্নাঘর থেকে মা বেরিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। হ্যাঁ, সে লিয়াকতই ছিল। আম্মী সনাক্ত করেছিল। বাহুতে বাঁধা তাবিজ, পিঠের কালো তুলসী, হাঁটুর নীচে ছোটবেলায় সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে সেলাইয়ের মস্ত দাগ। হায়, ওটা লিয়াকতেরই মৃতদেহ ছিল। মার সঙ্গে আগ্রায় গিয়ে আম্মীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ঘোর ঠাণ্ডায় জীর্ণ হয়ে যাওয়া লতাপাতাহীন গাছের মত খুঁটিতে হেলান দিয়ে তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলেন। নানী, লিযাকতের কাছে না থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আব্বাজানও ছিলেন না যে। হজ করতে গিয়ে সেই পুণ্যাত্মা তখনও ফিরে আসেন নি। ধীরে ধীরে আমার মুখের উপর থেকে নিচের দিকে নামিয়ে আনা আম্মীর উদাস চাহনি আমার মধ্য শরীরের ফুলে ওঠা অংশটাতে এসে কেমন যেন চমক খেয়ে থমকে গেল।

'আমার ছেলে মরে নি নয়না। সে আসছে। আমি জানি। করুণ হাসিতে আম্মী আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। কোন ধর্মীয় কংক্রীটের দেওয়ালকে গ্রাহ্য না করে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। বাধাহীন ভাবে বয়ে চলেছিল দুই নিঃস্ব নারীর শোকাশ্রু. ...নিচের দিকে। চোখ থেকে আমাদের শরীর অতিক্রম করে একেবারে দাঁড়িয়ে থাকা ভূমিখণ্ডের নিচে পর্যন্ত। যে ভূমি কখনও রক্তে রঙীন হবে না। যেখানে একাকার হয়ে যাবে রাম, জনমভূমি, বাবরি মসজিদ। আর সেই পুণ্যভূমিতে একদিন জন্ম নেবে আমার সন্তান। আম্মীর লিয়াকৎ। আমার লিয়াকৎ, যে ঈশ্বর আল্লার একাকার হওয়াকে বাস্তবায়িত করে তুলবে একদিন।

পাঞ্চার পাঁচালি

রবীন শর্মা

প্রভু নারায়ণ, একটুখানি দয়া কর। জন্মের পব থেকেই কপালদোষে কত ভুগলাম - একটু মুখ তুলে তাকাও দয়াময়। আমার মনে আছে প্রভু— সেই যে বড মেয়ের জন্মের সময় একটা মানত করেছিলাম, অভাবের দোষে সেটা পূরণ করতে পারি নি। মেয়েব মা পিতৃ-মাতৃহীন হওয়ার সময়েও মানত করেছিলাম— ভেবেছিলাম ফসলটা করতে পারলে দুটোই একসঙ্গে পাতব। পারলাম না প্রভু। পাগলাদিয়া নদীর ঢল আমাব জমিব উপর দিয়ে বয়ে গেল। আমার জমিটাই বুইকার বিলে পরিণত হল। জমিটাও এভাবেই গেল। এখন হাজিরা খেটে কোনোরকমে দিন গুজরান করছি। এবার চোখ মেলে তাকিয়ে কিছু একটা উপায় করে দাও দয়াময়।

অধর্মে থাকব না। ধার করে খেয়ে কেউ কি বেঁচে থাকতে পারে? আমি বুঝতে পেরেছি, এগুলি সব শনির দশা। জমিটা জ্যেঠা কচুরিপানা দিয়ে ভরে ফেলল, আমাদের গ্রামের মেম্বারই বলল, দাদি দরখাস্ত করলে সরকাব থেকে কিছু টাকা পাবে। আমি বললাম —আমরা হলাম গণ্ডমূর্খ, কোথায় কী পাওয়া যায় তা আমরা কীভাবে জানব? তুই বাপু ঠিক করে দে না। সে বলল, দাঁড়াও দাদি, কালকে নলবাড়ি যাব। পরের দিন গেলাম নলবাড়ি, মস্ত বড় দোতলা ঘরটায় মেম্বার একমাথা আরেক মাথা যাওয়ার পর রাসোর গোঁহেকে দেখতে পেলাম। একজনের কাছে যাই, একটা নমস্কার করে কাগজটা এগিয়ে দিই, আরেকজনের কাছে গিয়ে বুড়ো আঙুলে কালি লাগিয়ে টিপসই দিয়ে দিই, এভাবেই সারা দিন পার হয়ে গেল। টাকা কিন্তু পেলাম না। আমি বলি— মেম্বার, হাজিরা করলেও ষাটটা টাকা পেতাম। সে বলে দাদি, সরকারকে কি ঝোলায টাকাপয়সা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ঠিকাদার পেয়েছ নাকি? লেখা পড়া হয়েছে, মণ্ডল কানুনগো মাটি দেখবে, তারপরে হে টাকা।

.হাঁট চেটে ঘরে ফিরে এলাম। তখন একজায়গায় দেখি— কপালে ফোঁটা কেটে, পুঁথি-পাঁজি নিয়ে হাত দেখা একজন গণক পথের পাশে বসে রয়েছে। ঘরের পরিবার জমিটাতে ফসল নষ্ট হওয়ার পর থেকেই বলে আসছিল—গণৎকার বামুনকে হাতটা একবার দেখিয়ে নাও না কেন? সবাই তো তাই করে। আমি বলি—হাতটা গণককে দেখিয়ে কী হবে, পাগলাদিয়া নদীকে দেখানো উচিত ছিল। আমার জমিটার উপর দিয়ে বন্যার ঢলটা যাবে কি না...

গণৎকার বামুনকে দেখেই চট করে বৌ এর কথাটা মনে পড়ে গেল। মনটাতে কেমন যেন উসখুশ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত মেম্বারকে কথাটা বলেই ফেললাম। মেম্বার বলল, এ সমস্ত কিছু মেনে চলা দরকার, ঈশ্বর কি আর হাতের রেখাগুলি এমনিতেই সৃষ্টি করেছেন? ভরসা পেয়ে গণৎকারকে জিজ্ঞেস করলাম –বলি ভাই দেখতে পারবে তো? সে বলল –হাল বাওয়া হাত, হাতে রেখাই নেই। আমি বললাম - যে কয়টা আছে তা-ই দেখে দে। দেখে দিল সে। কি একটা চশমার মত বের করে, সেটা দিয়েও দেখল। দেখে বলল আমি ঠিকই ধরেছি –শনির দশা। আমি বলি —এর প্রতিকার কি? আর কত বছর থাকবে? সে বলল—কুড়িতে লেগেছে---আরও পাঁচ বছরের মত ভোগাবে। আমি বলি কী করলে তাড়াতাড়ি যাবে? সে বললে, নবগ্রহে একটা পূজো, হয়গ্রীবের মন্দিরেও একগাছা মালা সহ এক থালা ভোগ, শনিবারের উপোস থেকে কামাখ্যা মন্দিরে সাদা কবুতর একজোড়া। আমি বলি, এ সমস্ত কিছু দেবার জন্য আমার হাতেও কিছু সম্বল আসা প্রয়োজন-- সেটা পাবো কোথায়? সে বলে—আধুলিতে এর চেয়ে বেশি জানা যায় না।

তবে প্রভু, অধর্মে থাকব না। গণকের কথাই ঠিক—শনির দশা। তা নাহলে কি আর মেম্বার এভাবে মাটিটা নেয়? জেলায় গিয়ে ঐ যে কাগজে টিপসই মেরেছিলাম সেখানেই ল্যাঠা লেগেছে। পরের দিন দুপুরবেলা মেম্বার এসে বলে কি না—বুড়ো আঙ্গুলটাতে কালি লাগিয়ে এখানে একটা টিপসই মেরে এই টাকাটা গুনে নে।টাকা দেখে আমার মনটাও আনন্দে নেচে উঠল। বললাম, ঠিক-–এই না হলে গ্রামের মেম্বার, বয়সে সে আমার থেকে ছোট হলে কী হবে, চট করে ওকে একটা প্রণাম করে নিলাম। বুড়ো আঙ্গুলটা দিয়ে সে দেখিয়ে দেওয়া জায়গাটায় টিপসই মেরে টাকাটা গুনে দেখি দশকুড়ি। আমাদের মত ফকিরকেও সরকার দশকুড়ি দিয়েছে? মেম্বার বলে দাদি, কচুরিপানায় ভর্তি জমির বেশি দাম পাওয়া যায় না। আমি বলি, বলিস কী? সে বলে- হ্যাঁ দাদি, জমিটা নামজারি হয়েছে। আমি বলি—আমি তো মাটি বেচিনি? সে বলে সেদিন নলবাড়ি গিয়ে কাগজে কিসের টিপসই দিয়েছিলে? আমি বলি, শালা বুর্বক, তুই বলেছিলি না সরকার কিসের সাহায্য দেবে? সে বলে—দাদি, সাহায্যের টাকা সামনের বছর এক কুড়ি পেতে— এতে তো বেশি পেলে। আমি বলি-–ধীরুর মা, মোটা বেতটা বের করে আন, সে বলে—রক্তের গরম দেখিও না।

সমস্ত গ্রামের লোক আমার উঠোনে এসে জড়ো হল। কয়েকজন আমাকে চেপে ধরল, কয়েকজন মেম্বারকে। কয়েকজন আমাকে বোঝাল –পাগলা, তুই করছিস কী? মেম্বার পুলিশ নিয়ে আসবে। আমি বলি—ছেড়ে দে, আজ ওরই একদিন কি আমারই একদিন। শেষ পর্যন্ত মেন্ধি এসে দুজনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পঞ্চায়েত ডাকার ব্যবস্থা করল। আমি টাকাগুলি মেম্বারের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম—বললাম তোর টাকার দরকার নেই আমার.....সন্ধে বেলা গোঁহের ঘরে পঞ্চায়েত বসল। আমি গোটা ব্যাপারটা জনগণের কাছে বললাম। কয়েকজন হুঁকো টানতে লাগল - পাগলার কথাই ঠিক, এই বেটা মেম্বার গ্রামেরই মানুষ হয়ে বুকে কামড় বসাল। পরে মেম্বার কাগজপত্র বের করে জমিটা বিক্রি করেছি বলে সবাইকে বুঝিয়ে দিল। মেন্ধি, মাস্টার এবং লেখাপড়া জানা কয়েকজন

কাগজগুলি পড়ে দেখে বলল --ঠিকই তো, পাঞ্চা তো জমিটা বিক্রি করেই দিয়েছে। আমি বললাম-- এই পঞ্চায়েত মানি না। মেম্বার বলল- -জনগণকে অপমান করার জন্য দুই টাকা জরিমানা দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নে। আমি বলি-- কিসের জনগণ, গ্রামের মধ্যে কি আর মানুষ আছে?

শেষ পর্যন্ত সমস্ত দোষ আমার উপর চাপিযে দেওয়া হল। সাতদিন একঘরে করে রাখল আমাকে। আমি বলি অধর্মে থেকে জমিটা নিলি- সাতদিন একঘরে করে রাখলেও আমাকে পুনরায়....

...হ হ হ হৈয়া।

ঐ যে আসে, স্বর্গেশ্বরী কালসেনা

ঢুকল বাসরঘরে ঐ যে ঢুকল বাসরঘরে ..

ঐ যে সিন্দুরের রেখা

তাহার নিকট কালী ছিদ্র পাইল দেখা

মুখের থু থু দিয়ে কালী গুছিয়ে করাল

সূতোর মত হয়ে কালী পশিলা ভেতব .

...হ হ হ হৈয়া।

ওঝা---এই বুলি কালী বাসরঘরে প্রবেশ করিলা---

ডাইনা---আর আমাদের পাঞ্চা রূপেশ্বর গোঁহাইর চরণেতে ধরিলা....

ওঝা--ঠিক তো?

ডাইনা---হ্যাঁ ওজা।

ওঝা---কী ভাবে?

তবে দয়াময় অধর্মে থাকব না। শনিতে পাওয়া মানুষ নাকি যখিনী পাওয়া মানুষের মত আচরণ করে, আমার অবস্থাও সেরকমই হয়েছে। আমাদের নারপেরার পাঠকে গাওয়া গানে শুনেছ না---আমারও নলরাজকে শনি যেভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল, সেই দশাই হয়েছে। শনির কোপে মরা শোল মাছ জীবন্ত হয়ে জলে ভেসে বেড়ায়। এমনিই বিধির লিখন। আমারও অবস্থা নলরাজার মত হয়েছে।

পঞ্চায়েতে কোন মীমাংসা হল না। একদিন রূপেশ্বর গোঁহের সঙ্গে পথে দেখা হল। এই অঞ্চলে রূপেশ্বর গোঁহকে একডাকে সবাই চেনে। সাতটা হালের খেতি, ছেলেমেয়েরাও বেশ ভাল চাকরি করছে। গোঁহে দেখতে পেয়েই কাছে ডাকল - বলি ও হতচ্ছাড়া, মামলা করছিস না কেন? আমি বলি---প্রভু সেদিনের সব কথাই তাহলে জানতে পেরেছ? গোঁহে বলল-- বেটা মেম্বার টিনের ঘর তুলে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। সেবার দেখলি না---আমার ছোট ছেলের সঙ্গে জিদ করে কীভাবে পঞ্চায়েতে ভোটে ভূতোকে দাঁড় করাল। ---আমি বলছি তুই এবার ছাড়বি না, আমি তো আছি তোর সঙ্গে। আমি বলি- -এ এলাকায় আপনার কথা প্রত্যেকেই শোনে, আপনিই একটা কিছু করে দিন না প্রভু।

প্রভু বলে - এখন বয়স হয়েছে না, সব কাজ আর নিজে করতে পারি না। আমার কথা হল তুই আমার ছোট ছেলেটার সঙ্গে শহরে যা। আমার বড় জামাই উকিল, বেশ নামডাক রয়েছে। তাকে সব কিছু বুঝিয়ে বললে মামলাটা হাতে নেবে যা। আমার জামাই তো এই গ্রামেরই জামাই, তাই নয় কি?

আমি বললাম—প্রভু চোখ মেলে তাকালে কিছু একটা হবে বলেই মনে হচ্ছে। গোঁহে বলল-—এভাবে বলিস না। তোদের আশয়বিষয় তো আমার কাছেই বন্ধক থাকে। তোদের কি আমি ভুলে যেতে পারি? তবে মেম্বারের চালাকিটার কথা মনে রাখিস, এখন থেকেই সবাইকে বলে রাখবি, এই বেটা মেম্বার সমস্ত গ্রামটাকে লুটেপুটে খাবে। আমি বলি—হবে হবে, সেটা আর বলতে হবে না, আমাদের হাতে প্রমাণ আছে। তাহলে প্রভু টাউনে কবে যাব? প্রভু বলে দাঁড়া, এভাবে তাড়াহুড়ো করিস না। কোর্ট কাছারির কথা, কিছু টাকাপয়সা তো লাগবেই। আচ্ছা, তোর ছেলেমেয়ে কয়জন? আমি বলি, প্রভুর কৃপায় পাঁচটা। বড় মেয়ে, তারপরে তিন ছেলে। সবচেয়ে ছোট মেয়েটি বুকের দুধ ছেড়েছে। তা বড় মেয়েই তো গত জ্যৈষ্ঠ মাসে যৌবনে পা রেখেছে। ছেলেদের মধ্যে বড় ছেলেটা গোরু চরাতে পারে, বাকি দুটো গাছের নিচে বকুলের গুটি খেলতে থাকে। প্রভু বলে—ঈশ্বরের কৃপায় কোনরকমে বেঁচে থাকতে পারলেই হল। আচ্ছা তোর বৌ কি করছে? আমি বলি —কোলেরটা হওয়ার পরে সূতিকা হয়ে মরমর অবস্থা হয়েছিল, আমাদের মধু কবিরাজের ঔষধে সুস্থ হয়েছে। এখনও শরীরে জোর নেই, পাটকাঠির মত দেখতে। প্রভু বলেন—ওকে আমাদের বাড়িতে রেখে আসিস না কেন, ছোট বউয়ের সন্তান হবে, সেখানে ও কাজকর্ম করে খাবে। আমি বললাম—আপনি বলছেন যখন রেখে আসব, একটা পেট কমলেও অনেকটা রেহাই।

তার দুদিন পরেই গোঁহের ছোট ছেলে নরেনের সঙ্গে শহরে গেলাম। ছেলেটা বড ভাল, দুঃখীর দুঃখ বোঝে। বাসে ওঠার সময় আমি বললাম, বাবা, তুমি পেছনে ওঠো না, খুব ঝাঁকুনি লাগবে। ছেলেটি বলল, দাদি, তুমিও আগে ওঠো, যা ভাড়া হয় আমি দেব। আমি মনে মনে ভাবলাম- দেখেছ, এরকম একটা ছেলেকে ভোটটা না দিয়ে সেবার কোন বুদ্ধিতে মেম্বারকে রাজা করে দিলাম! ব্যাটা নির্বংশ হোক।

শহরে গিয়ে উকিলকে সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলতেই উকিল বললেন—কোন আইনে লেখা আছে— আমি তা জানি না, এভাবে ঠগিয়ে মাটি নেবে! তুমি দেখবে তাকে গোরুর গলায় যেভাবে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয় সেভাবে আইনের প্যাঁচ দিয়ে আমি পেঁচিয়ে ধরব। আমি বললাম —হবে তো? উকিল বলল- তবে কিছু টাকা খরচ হবে। শ্বশুর মশাইয়ের গ্রামের লোক বলে আমি তোমার ফিস নেব না। তা হলেও মুহুরির খরচ, ওকালতনামা, স্ট্যাম্প.. .আরও কত কি আছে। আমি বললাম—- মোট কত টাকা হলে হবে? উকিল বলে—-এই গোটা ব্যাপারটা সামলাতে গেলে একহাজার টাকার মত লাগবে। সব টাকাই তো কাছারিতে জমা দিতে হবে। ফিরে আসার সময় নরেন বলল, দাদি টাকা যোগাড় করতে পারবে না? আমি বললাম --কোথায় পাব এত টাকা? সে বলল—-বেচার মত কিছু কি নেই আর? আমি বললাম— জমিটা যখন চলে গেল তখন হালের গোরু দুটি রয়েছে। পরিবারের আংটিও একটা রয়েছে। সে বলল—-বেচতে হবে না দাদি, আমি বাবাকে বলব—তুমি বন্ধকে রাখ। জামাইবাবু বলেছেন যখন মামলাটা ভাল হবে। তখন বন্ধক ছাড়িয়ে আনতে পারবে। আমি বললাম তোরা বলছিস যখন তা ই হবে।

সেভাবেই হল। হালের গোরুজোড়া যখন বের করে নিতে যাই বউ ছেলেমেয়েগুলি হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। আমি বললাম কাঁদিস না, উকিল বলেছে না- -মামলাটা ভাল হবে, তখন সুদে মূলে টাকাটা উঠে আসবে। বড় ছেলের গরু দুটির প্রতি বড় মায়ামমতা। সে গরুদুটির পায়ের কাছে প্রণাম করে বলল --বাবা, গরু দুটিকে নিয়ে যাস না গাড়িতে জুড়ে হাটে মাল নিয়ে যাব। আমি বললাম -ছিঁচকাঁদুনে ছেলে, তোদের এসব ভাবার সময় এখনো হয় নি। গোযাল থেকে গরু

দুটি বেরিয়ে আসতে চাইছে না। আমি দাঁড়িতে ধরে টানি অবোধ জীবগুলি হাম্বা হাম্বা করে এদিক সেদিক তাকায়। আমারও চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। অবোলা জীব হলে কি হবে ওবাও তো আমার শরীরেরই মাংস। বুকের মধ্যে কে যেন কাঁটা দিয়ে খোঁচাচ্ছে...

ওঝা ঃ এমনকি কালীনাগ লখিন্দরের রূপ গ্রহণ করে

ডাইনা ঃ পদ্মা বলে বেটা তুই লখিন্দরের রূপ বননাবাক গেলি আনছো না

ওঝা ঃ তখন কালীনাগ ফণা তুলে ধরে

ডাইনা ঃ কেন কি

ওঝা ঃ সাক্ষী করে কালী নাগ যত দেবগণ
ব্রহ্মা বিষ্ণু হৈবা সাক্ষী কুবের বরুণ
অষ্টবসু হবে সাক্ষী যত দিকপাল
চন্দ্রসূর্য হৈবা সাক্ষী কাল যে বিকাল
এতেক কহিয়া কালীনাগে সাক্ষী যে করিবল
প্রদীপের তৈল আনি লেঙ্গুর সানিলা
প্রদীপের আগুনে কালী লেঙ্গুর সৌঁকিলা
লখাইর বিনা আঙ্গুলিত চিহ্ন এক দিলা
যেতিখনে কালীনাগে তৈলক ঢালিকা
কোমল শরীর লখাইর ফুলি উঠিলা
পদ্মাক আরধি কালী মনে করি আর
লখাইর কিনা আঙ্গুলিত মারিলা কামাব
কামাব মারিয়া তিনি হলাহল বিষ শরীরে ঢালিলা..
কি এহে.. ...হ হ হ হৈয়া.. ..।

প্রভু দয়াময় চোখ মেলে একবার তাকাও। রাগ ওঠায় কখনও কানা বলে গালিগালাজ করলেও দায়-দোষ ধর না। অধর্মে থাকব না। এরকম হবে জানলে উকিলের কাছে কখনও যেতাম না। গরু জোড়া গেল, কাঁসার বাটিগুলিও গেল, পরিবারের আংটিটাও গোঁহেরাই নিয়ে নিল। এই আংটিটাও আমার গলায় কাঁটা হয়ে বসেছে.....

আংটিটা পরিবারের মায়ের দেওয়া। মেয়েকে যখন পরের দিন গরুর গাড়িতে তুলে দিয়েছিল, মা কাঁদতে কাঁদতে গাড়ির পেছন পেছন গিয়েছিল। আমাদের গাজি সেদিন গাড়ির গাড়োয়ান ছিল। সে বলেছিল— 'পাধ্ঞা, বিয়ের কনে অনেক এনেছি, তোরটার মত একটাও দেখলাম না। মায়ের কান্নার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েও গাড়ির ভেতর বসে যেভাবে কাঁদছিল তা দেখে আমারও চোখ ছলছলিয়ে এসেছিল। বলেছিল, আমি তার মেয়েকে যেন কখনও দুঃখ না দিই।

দুঃখ কি আমি দিয়েছি, এ সমস্তই কর্মফল। আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি পাধ্ঞা পরিবারের উপর কখনও হাত তুলেছে। আংটিটা দেবার সময় পরিবার কেঁদে কেঁদে বলল-- যা গেছে গেছে, এটা বেচো না। এটা আমার মায়ের চিহ্ন। দুদিন পরে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তখন এটাই আমি তাকে দেব বলে যত্ন করে রেখে দিয়েছি। আমি বলি কাঁদিস না। এ সমস্ত মোহের জিনিস আমাদের জন্য নয়। মামলাটায় জিততে পারলে বন্ধক ছাড়িয়ে আনতে পারব। আমিও সবার অজান্তে চোখের জল মুছতে মুছতে আংটিটা গোঁহের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। গোঁহে বলে, দুঃখ করিস না। নল রাজার

কথা শুনেছিস তো। কত দুঃখের শেষেও রাজপাট ফিরে পেয়েছিল। ধর্মে মন রাখ, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমিও তাই ভেবেছিলাম। তবে ভাবলে কী হবে, বিধাতা কপালে যা লিখে রেখেছেন তাই হবে। মামলায় হেরে গেলাম। হেরে গেলাম মানে খরচ পোষাতে না পারায় মামলা উঠিয়ে নিলাম বলে উকিলকে লিখে দিতে হল। গোঁহের কাছে সমস্ত কিছু বিক্রি করে দেবার পরও চল্লিশ কুড়ি টাকা ধার থেকে গেল। সেদিন কারো ভাত খাওয়া হল না। রাতের বেলা ঘরে প্রদীপও জ্বলল না। বড় ছেলে আমাকে বলল—বাবা আমাকে কারো বাড়িতে দিয়ে দে। আমি বলি—তুই পারবি না এসব। সে বলে—বাবা না পারলে তো চলবে না। আমার বুকটা ব্যথায় মুচড়ে ওঠে। হাজার হোক নিজের ছেলেকে এই কম বয়সে পরের ঘরে কাজ করতে দিতে মন সায় দেয় কি? পরিবার তখন বিছানা থেকেই জবাব দেয়—চানাবাপথের বড় ছেলে আমাদের মেয়েকে শহরে নিয়ে যেতে চায়। আমি বলি, কেন? আমি মানুষটা তো এখনও বেঁচে রয়েছি।

তারপরের দিনই পরিবার বলে— এই যে শুনছ, আমি আংটিটা এনেছি। আমি বলে উঠি- কিসের আংটি? কে দিয়েছে? পরিবার বলে আমার আংটি যা গোঁহেকে দিয়েছিলে। আমি বলি-- কীভাবে আনলি? পরিবার বলল--গতকাল মেজ ছেলের বউ চাদরটা ধুতে দিয়েছিল, তারই আঁচলে বাঁধা ছিল। পরিবারের কথা শুনে আমার সারা শরীরের রক্ত মাথায় উঠে এলো। গোঁহেকে কত টাকা দেবার বাকি আছে, একটা পয়সাও সুদ ছেড়ে কথা বলবে না। আমি বলি—শালি তুই চুরি করবি? পরিবার বলে—আংটিটা তো আমারই। শয়তানি করে সর্বস্ব গ্রাস করেছে—এই আংটিটা চুপচাপ রেখে দিলে কোন কিছু হবে না। আমি বলি—তুই বলছিস কী? দেখচে পাচ্ছিস না আমি কীভাবে গোঁহের কাছে ঋণে একেবারে ডুবে আছি। পরিবার বলল—মেম্বার আর গোঁহ মিলেমিশে আমাদের সর্বস্বান্ত করেছে। এভাবে ভক্ত হয়ে ভালমানুষের মত সব ছেড়ে দিলে চলবে না। গোঁহের ঘরে যেখানে আমি কাজ করি সেখানে গোঁহে আর মেম্বারের মধ্যে ফিসফাস ষড়যন্ত্র করতে দেখেছি আমি। আমি বলি, সেসব আমাকে বোঝাতে হবে না। আংটিটা বের করে দে। পরিবার বলে —দেব না।

সঙ্গে সঙ্গে আমারও খুব রাগ হয়ে গেল। দৌড়ে গিয়ে লাঠিটা এনে খুব করে একচোট বসিয়ে দিলাম। বলি—শালি আংটিটা বের করে না দিলে গোঁহে সহজে ছাড়বে না। দে বের করে দে।

সে কাঁদতে কাঁদতে বের করে দিল। এমনিতেই সে সূতিকাতে ভোগা বারোমেসে রোগী। মার খেয়ে তার পিঠটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কলাপাতার মত পড়ে গেল। তা দেখে আমার বুকটা ব্যথায় বিদীর্ণ হয়ে গেল। কপালে হাত রেখে আমি মাটিতে বসে পড়লাম। বিকেলের দিকে ছেলেকে নিয়ে আমি গোঁহের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভেবেছি হাত-পায়ে ধরে আংটিটা দিয়ে আসব। বৈঠকখানা ঘরে বসে গোঁহে হুঁকো টানছিল। আমাকে দেখেই বলে উঠল--এই যে পাগুা, তোর পরিবার আমার আংটিটা নিয়েছে নাকি? আমি চট করে গোঁহের দুটি পা জড়িয়ে ধরে বললাম, প্রভু দোষ নেবেন না। মোহে পড়ে নিয়েছিল, আমি ফিরিয়ে দিতে এসেছি—এই বলে আংটিটা বের করে দিলাম। প্রভু বললেন, এসব আমি পছন্দ করি না। তবে তুই নিজেই যখন দোষ স্বীকার করে নিয়েছিস, আমি মাফ করে দিলাম যা।

আমার মন তখন গিয়ে কিছুটা হালকা হল। প্রভু ছেলেকে দেখিয়ে বললেন- -এটা কি তোর নিজের? আমি বলি--বড় ছেলে প্রভু। প্রভু বললনে -কি করছে? আমি বলি -বেকার বসে আছে

প্রভু। প্রভু বললেন—একে আমাদের কাছে রেখে আসনা কেন, গোরু ছাগল দেখতে পারবে। তোর কাছে পাওনা তো বেশ হয়েছে, তাই না? যা আমি সব শোধবোধ করে দেব। কি রে ছেলে, থাকবি তো? আমি বলি—ওকে জিজ্ঞেস করে কী হবে? রাখতে চাইছেন যখন রাখবেন। তাহলে কাল ভোরবেলাতেই পাঠিয়ে দিবি—বলেই গোঁহে হুঁকাতে টান দেয়।

হ হয়। হারে হে—

--হ হ হৈয়া।

ওঝা ঃ পদ্মা নিদ্রার বাণ মারে বেউলাকে

ডাইনা ঃ হুঁশ নেই। আমার পাঞ্চার মত—

ওঝা ঃ হয় না, কি হলো না?

ডাইনা ঃ পাঞ্চা ছেলেকে রাখল গোঁহের কাছে, নিজে করে হাজিরা, পরিবারকে রাখে চানা বাপার বাঁদী করে--

ওঝা ঃ তারপরে?

প্রভু দয়াময়, বিছানায় পড়ে তোমাকে আমার দুঃখের কথা শোনাচ্ছি। আমি তো আগেই বলেছি, শনির দশা লেগেছে না হলে এভাবে সবাই আমাকে পেয়ে বসে। ছেলেটাকে গোঁহের কাছে রেখেছিলাম, আজ বিকেলে সে কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে এসেছে। আমি তখন হাজিরা থেকে এসে ছিলিমে কেবল টান দিয়েছি। পরিবার ঢেঁকিতে রাতের চাউল কুটছে। ছেলেটা এসেই বলল—বাবা আমাকে বিছানায় নিয়ে যা। আমার বুকটা কী এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। ছিলিমটা ছুঁড়ে ফেলে দৌড়ে এসে বললাম—তোর কী হয়েছে? ছেলে বলল—বাবা, আগে আমাকে বিছানায় নিয়ে চল। ছেলের মা ঢেঁকি ফেলে দৌড়ে এল। বলল—বাবা, তোর কী হয়েছে? ছেলে গেঞ্জিটা খুলে পিঠটা দেখিয়ে বলল—বাবা দেখ আমার কী অবস্থা করেছে। দেখি লাঠির কোপে সমস্ত শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আমি চিৎকার করে উঠলাম—কে? কে আমার ছেলেকে এভাবে মারল? ছেলে বলল, গোঁহেদের নরেন দাদা মেরেছে। ছেলের রক্তাক্ত পিঠ দেখে ছেলের মা চিৎকার করে লোকজনকে ডাকতে লাগল---ওগো, তোমরা দেখে যাও। কসাইরা কীভাবে আমার ছেলেকে মারধর করেছে তোমরা সবাই এসে দেখে যাও.....

পরিবারের চিৎকার শুনে আশেপাশের কয়েকজন দৌড়ে এল। বলল—পাঞ্চা, কীভাবে হয়েছে এসব? মা বলল---দেখুন গোঁহেরা কীভাবে আমার ছেলেকে মেরেছে। বাপটি ছেলের পিঠের দিকে তাকিয়েই বলে--ইশ্, জ্বর আসছে, বিছানায় নিয়ে যা। বতলা বলে—পাঞ্চা, তুই চেয়ে রয়েছিস কেন? জনগণকে ডাক।

ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিতে দিতে আমি জিজ্ঞেস করি—তুই কিছু করেছিলি কি? ছেলে বলল---বাবা, আমি গোরু চরাচ্ছিলাম। গোঁহেদের কাজলা গোরুটা আমাদের বন্ধকে রাখা গোরুটাকে গুঁতোতে লাগল। আমি দুটো লাঠি মেরে কাজলাটাকে দূরে সরিয়ে দিলাম। গোঁহেদের নরেনদার ছোট ছেলেটা ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছিল। সে দৌড়ে এসে 'আমাদের কাজলাটাকে কেন মারলি' বলেই আমাকে সজোরে ঘুষি মেরে দিল। আমারও রাগ উঠে যাওয়ায় লাঠি দিয়ে দুটো কোপ বসিয়ে দিলাম। সে দৌড়ে বাবাকে বলতে গেল, নরেন দাদা এসে আমাকে মাঠের মধ্যে ফেলে লাঠি দিয়ে ইচ্ছে মত পেটাল, বলে কিনা 'গোঁহেদের গায়ে হাত তুলেছিস.......

ছেলের কপালে হাত দিয়ে দেখি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। বতলা বলল—পাঞ্চা, কালিদ্রোর কাছ থেকে কয়েক পুরিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নিয়ে আয়। ছেলের মা সেবা-শুশ্রূষায় লেগে গেল। রাতের বেলা তিন পুরিয়া খাওয়ালাম। ইশ্, জ্বর মোটেই নামছে না। মাঝে মধ্যেই ছেলে চিৎকার করে উঠছে। বলে—বাবা, আমাকে ওদের কাছ থেকে নিয়ে আয়। আমি গোঁহেদের কাছে থাকব না। মাঝে মধ্যে বলছে—বাবা, আমাকে মারবে ওরা—আমাকে নিয়ে আয়।

তার কথা শুনে আমার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। আমি বলি আমার কাছ থেকে তোকে কে নিয়ে যাবে। ছেলে বলল, বাবা তুই আমার পাশটিতে ঘুমো। ঘুমালাম। সে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে—বাবা, আমাকে নিয়ে আয়, ওরা আমাকে মারবে। আমাকে নিয়ে আয়.....আমি বলি কে কে....

হ হ হ এ—

কি এহে—হ হ হ হৈয়া

ওঝা : নিদ্রার কোলে বেউলার হুঁশ নেই।

ডাইনা : এদিকে কালী নাগের বিষে লখাই ছটফটিয়ে মরে।

ওঝা : মনের দুঃখে লখাই বলে—

.... বেউলা ওঠ ও-হে বেউলা জাগ
আমার প্রিয়া কত নিদ্রা যাস
আমাকে খেল কালীনাগে
চোখ মেলে দেখ
বেউলা জাগ—ও হে—

প্রাতঃভ্রমণ

রাজেন্দ্র শর্মা

স্কুলজীবন থেকেই বন্ধুত্বের সূত্রপাত। প্রায় দশ বছর আগে অবসর নেবার পর দু'জনেই অভিন্নহৃদয় বন্ধু হয়ে পড়ে। জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদ থেকে অবসর নেয়া প্রসন্ন ভট্টাচার্য আর সরকারী কার্যালয়ের বড়বাবু হয়ে অবসর নেওয়া হরমোহন কাকতি— দুজনেরই প্রাতঃভ্রমণের সময়টা সঞ্জীবনীর মত কাজ করে। পাড়া প্রতিবেশী ঘুম থেকে ওঠার আগেই তারা আরম্ভ করে। ভট্টাচার্য প্রায় দুই ফার্লং এসে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কাকতির সঙ্গ ধরে। তার থেকে এক ফার্লং দূরে এসে তারা পাড়াটা অতিক্রম করে রাজপথে ওঠে। এর পরেই চার বিঘার মতো মাটির ....ঘিরে রাখা ইটের দেওয়ালটা দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ রুমাল বের করে নাক চাপা দেয়। জায়গাটার তিনদিক ইটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। রাস্তার সমান্তরাল দিকটাতে দেওয়াল নেই। দৈনিক বাজারে যাবার মত ছোট একটা রাস্তার গায়ে লেগে থাকা ওদিকটাতে তর্জার বেড়া দেওয়া অস্থায়ী ঘর আর কিছু দোকান গড়ে উঠেছে।

হাঁটা আর আস্তে আস্তে কথা বলা। এক অদ্ভুত আমেজ অনুভব করে দুজন। ভট্টাচার্য জ্ঞানী মানুষ। কখনও কাকতির শঙ্কা উদ্বিগ্নতার বিষয় নিয়ে ভট্টাচার্য সমসাময়িক কথাবার্তা দিয়ে সমালোচনাও করে। কাকতিরও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই—ভট্টাচার্য সাহসী মানুষ, নৈতিকতার কাছে তাঁর জীবনজোড়া আনুগত্য। নিজের সাধারণ জীবনটাতে সাহস আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি শব্দের গণ্ডিতে যে তিনি কোনদিন প্রবেশ করেন নি, তা মেনে নিতেও কাকতির কোন সঙ্কোচ নেই।

—'বুঝেছ কাকতি, সাহসের অভাব থাকা মানুষ সাহসী হতে চাইলে নাকি সাহসপূর্ণ কাজ নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েও বারবার করতে হয়। কিন্তু তোমার আমার সুবিধে কোথায়?'

—'বলতে পারি না। তুমি তো সাহসী মানুষ। আমি ভীতু কিনা জানি না, কিন্তু সাহসী বলে দাবি করতে পারি না। সাহসিকতাপূর্ণ কোন কাজের ধারণাও আমার নেই। সেজন্যই বোধহয় তোমার সঙ্গে থেকে আমি সাহস জোটাতে চেষ্টা করি।' কার্কতি স্বীকারোক্তির সুরে বলে।

—ভয় অনেক প্রকারের আছে, কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে কার্কতি— ভয় একজন মানুষের মানসিক অবস্থার বাইরের আর কিছুই নয়।

—আমি সেই সমস্ত জানি না ভাই, মাত্র একটাই কথা জানি যে একটা বন্দুক নিয়ে কেউ যদি আমাদের দুজনের দিকে ধেয়ে আসে তাহলে আমি তোমাকে এগিয়ে দিয়ে তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে যাব।

—হাঃ হাঃ বন্দুকের কথা বাদ দাও, বন্দুক দিয়ে মানুষকে মেরে ফেলা যায় না। সেটা বুঝতে পারলেই বন্দুকের ভয়টা নগণ্য হয়ে যায়।'

—মানে? বন্দুকের গুলিতে মানুষ মরে না নাকি?'

—মরে না, বন্দুকের গুলিতে মানুষ মারা যায় না। মাথায় বা বুকে গুলি চালিয়ে মানুষকে মেরে ফেলা যায়? মানুষকে মারার জন্য তার চেয়েও বেশি গভীর, অনেক শক্তিশালী জিনিসের প্রয়োজন।

—মানে?'

– মানে ভয়, শঙ্কা আর কোন কোন ক্ষেত্রে তার সঙ্গে জড়িত শোক, বেদনা, অপমান, অনুশোচনার অন্তর্দহন— এ সমস্ত কিছুরই প্রয়োজন মানুষকে মারার জন্য।'

- কিন্তু এই যে গুড়ুম করে ফাটলো, বুক বা মাথা বা গলা ফুটো করে ফেলল, মানুষটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিঃসাড় হয়ে গেল, পরে সবাই মিলে নিয়ে জ্বালিয়ে দিল বা পুঁতে ফেলল সেটাই বা তাহলে কী?'

—সেটা হল কেবল দেহাবয়বটার অস্তিত্ব উপড়ে ফেলা। ঘূর্ণি বাতাস যেমন হঠাৎ কখনো এক একটা গাছ উপড়ে ফেলে, তারপর থেকে সেই জায়গাটাতে গাছের অস্তিত্ব যেমন নাই হয়ে পড়ে, ব্যাপারটা অনেকটা তেমনই। কিন্তু মৃত গাছ দেখেছ? গাছটার বৃদ্ধি হয় না, পাতাগুলি শুকিয়ে ধীরে ধীরে ঝরে পড়ে। সেটাকেই বলে মরে যাওয়া।'

—এত কিছু বুঝতে পারি না ভাই। মোটামুটি ভাবে আত্মার অমরতার কথা বলছ সেটা বুঝতে পারছি।'

—না না, সেটা বলছি না, আমি বলতে চাইছি ভয়ের কথা। কষ্টের প্রতি ভয়, যন্ত্রণার প্রতি ভয়, হিংসার প্রতি ভয়, মৃত্যুর প্রতি ভয়—আসলে এই ভয়েরই অন্য নাম মৃত্যু। শোন, আমাদের পিতৃ পিতামহরা গ্রাম থেকে উঠে এসেছিল। বাবা ছোটবেলায় বলেছিলেন, মনে পড়ে- -একবার নাকি গ্রামে কোন একজন বৃদ্ধ ভাঁড়ার-ঘরের পেছন দিকে বিকেলের দিকে কিছু একটা খোঁজ করার সময় কিছুতে আটকে থাকা একটা বাঁশের কঞ্চিতে পা রাখতেই সেটা ছিটকে এসে পায়ে আঘাত করে। লোকটি সাপে কেটেছে ভেবে ভয়ে মূর্চ্ছা যায়। সেই পড়ল আর উঠতে পারল না, হার্টফেল।'

—বুড়ো নিশ্চয় হৃদরোগে আক্রান্ত ছিল।'

--না, বুড়ো নিজের অজান্তেই ভয় রোগে আক্রান্ত ছিল। হ্যাঁ, ভয় —মৃত্যুর ভয়।'

—কিন্তু মৃত্যুকে ভয় করাটা তো স্বাভাবিক।'

শোন কার্কতি, মৃত্যুভয়কে জয় করতে গেলে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া দরকার। মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখতে পেয়েছ, তার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিও না। মৃত্যুকে তুলে এনে দেখ, উপলব্ধি কর, বিশ্লেষণ কর। মৃত্যুভয়কে তুলোধুনো করে মন থেকে বিতাড়িত কর।'

পুনরায় একটা উপ-পথের বাঁদিকে ঢুকে তারা হাঁটার গতি কমিয়ে দেয়। উপ-পথটাতে ঢুকেই বাঁ হাতে চা-বিস্কুট-কেক পাউরুটি আর অন্যান্য খুচরো জিনিসের দোকানেব মত একটা চালা। ভট্টাচার্য আর কার্কতি সেখানে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে দোকানের দরজা খুলে যায়। দোকানের মালিক অমায়িক বাঙালী ছেলেটি পাম্প দেওয়া স্টোভে জল বসিয়ে দিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে একটা সম্ভ্রমসূচক মুচকি হাসি হাসে; আর তারা দোকানের সামনে রাখা বেঞ্চিটাতে ক্ষণিকের জন্য বসে। ওখান থেকে দুই ফার্লংয়ের মতো এগিয়ে গেলেই তাদের পাড়াটায় প্রবেশ করার উল্টোদিকের পথটা পাওয়া যায়। তাই ঘরে পৌঁছে গেছি ভেবে এখানটাতে বসে তারা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নেয়। নিজেদের অজান্তেই তুচ্ছ দৈনন্দিনতার থেকে দুজনেরই মন তখন অনেক উপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। উপর থেকেই যেন তারা নিজেদের জায়গাটা, এমন কি নিজেদের জীবনটাও নতুন করে দেখা পুরনো জিনিসের মত পুনরায় দেখতে চায়। দশ-পনেরো মিনিট পরে দুজনেই হাঁটতে শুরু করে, বাড়ির অভিমুখে।

এভাবেই চলছিল। এভাবেই সকালের অপূর্ব মাধুর্য আর মাদকতার শীতল বৃষ্টিতে নিজেকে স্নাত করে নিয়ে দিনের বাকি সময়টুকু দুজনে নিজের দেহ-মন শীতল আর স্নিগ্ধ করে রেখেছিল। এমন সময় আচম্বিতে আর অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটা একটা ঘটনাই তাদের প্রাতঃভ্রমণের ছন্দপতন ঘটাল।

মেঘলা আবহাওয়ার জন্য সকাল সাড়ে চারটের সময়ও প্রায় অন্ধকার হয়ে আছে সেদিন। ভট্টাচার্য আর কার্কতি দুজনেই তাই অন্যান্য দিন থেকে ধীরে ধীরে হাঁটছে। অন্ধকারে ভালভাবে হাঁটতে তাদের অসুবিধে হচ্ছিল। পাড়াটা থেকে বেরিয়ে রাজপথে উঠে বাঁ-দিকের ইটের দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা জায়গাটায় পৌঁছে নাকে রুমাল চেপেছিল মাত্র, হঠাৎ টের পেল, পেছন থেকে একটা গাড়ি আসছে। সাদা মারুতি গাড়ি একটা। কাকতি রাস্তার একপাশে সরে যেতে কিছু সময় নেওয়ায় গাড়িটা তাদের সামনে এস গতিবেগ কিছুটা কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। ততটুকু সময়ের মধ্যে ভট্টাচার্য আর কার্কতি লক্ষ্য করল গাড়ির ভেতরে পেছন দিকে বসে থাকা তিনজন যুবকের ভেতরে একজন কান্নাব সুরে কাতর কণ্ঠে বাকি কয়েকজনকে কি যেন অনুরোধ করে চলেছে। ভট্টাচার্য আর কার্কতি পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটা জায়গাতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। ইটের দেওয়াল যেখানে শেষ হয়েছে, তার থেকে পঞ্চাশ-ষাট মিটার এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা এবার থেমে গেল। ড্রাইভারটা পেচ্ছাব করার জন্য নেমেছে। হঠাৎ গাড়ির ভেতর কিছু একটা হুলুস্থুল হচ্ছে বলে ভট্টাচার্য আর কার্কতি অনুমান করতে পারল। মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল আর দেখা গেল দুটো যুবক ছেলে জাপটা জাপটি করে মাটিতে ছিটকে পড়েছে। চোখের নিমেষের মধ্যে তাদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে কার্কতি আর ভট্টাচার্যের দিকে দৌড়ে এল। ইতিমধ্যে অন্যটিও মাটি থেকে উঠে তাড়া করেছে। গাড়ির ভেতরে থাকা আর পেচ্ছাব করতে থাকাটাও দৌড়ে এসেছে আর পেছন পেছন ছুটে যেতে যেতে চিৎকার করছে— আরে ধন মার। কি দেখছিস গুলি চালা।'

ভট্টাচার্য আর কার্কতি জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দৌড়ে পালিয়ে আসা যুবকটি অদ্ভুত একটা চিৎকার করে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভট্টাচার্য আর কার্কতিকে বলল- 'আমাকে

বাঁচান, আমাকে ওরা মেরে ফেলবে....' ভট্টাচার্য নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক অজানা ভয়ে শিউরে উঠলেন। কার্কতি মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতিটা অনুধাবন করে বুঝলেন সময় একেবারে কম। মুহূর্তের মধ্যে তিনি ইটের দেওয়ালের দিকে ইশারা করে ফিসফিস করে ছেলেটিকে বললেন—'ঝাঁপিয়ে পড়।' ইতিমধ্যে দ্রুতবেগে অনুসরণ করে আসা ছেলেটি চিৎকার করে বলছে, 'বকুল, পালাস নে, আমি আছি—তোর কিছুই হবে না। পালালেই কিন্তু মরবি।' বকুল নামের ছেলেটি ঝাঁপ দিয়ে ইটের দেওয়ালের উঠতেই গুড়ুম গুড়ুম করে দু'বার গুলির আওয়াজ হলো। তার গায়ে লাগে নি। সে দেওয়াল পার হয়ে যাবার পরেই পেছন পেছন আসা ধন নামের ছেলেটিও একই রকম ক্ষিপ্রতায় না হলেও কষ্ট করে দেওয়ালের ওপরে মাথা গলিয়ে চিৎকার করে বলল, 'ধন, অনুসরণ কর ওকে, পালাতে দিস্ না। আমরা ওপাশ দিয়ে ঘুরে আসছি।' ইটের দেওয়ালের অর্ধেক পর্যন্ত ওঠা অবস্থা থেকে লাফিয়ে নেমে গাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরে যাওয়া ছেলে দুটি ভট্টাচার্য আর কাকতির পাশে এসে অবাক হয়ে দাঁড়াল। ভট্টাচার্য আর কাকতি স্বপ্ন দেখার মত অর্দ্ধচেতন অবস্থায় সমস্ত কিছুই দেখছিলেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেওয়ালের ওপার থেকে পুনরায় গুলির আওয়াজ শোনা গেল। হাতে পিস্তল নিয়ে থাকা ছেলে দুজনের একজন জিজ্ঞেস করল—'কে আপনারা?' সঙ্গে সঙ্গে অপরজন পিস্তলের নলটা ভট্টাচার্যের কপালের মাঝখানে ঠেকিয়ে বলল—'ওর সঙ্গে কী কথা বলছিলেন? দূর থেকে ঠিক কে কথা বলছিলেন বুঝতে পারি নি। মুখের কথা হারিয়ে যাওয়া ভট্টাচার্য নিজের অজান্তেই কেবল একটা শব্দই নিঃশব্দে জপ করে যাচ্ছিলেন—'দুর্গা-দুর্গা-দুর্গা....

মৌন ভট্টাচার্য আর কাকতির দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ছেলেটি সঙ্গীর দিকে তাকাল।

—'না বাদ দে, জলদি চল।' সঙ্গী বলল। দুজনে দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠার পর বায়ুবেগে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পরে কাকতি আর ভট্টাচার্যের সম্বিৎ ফিরে এল। পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে সামান্য সহজ হওয়ার পর উদ্বিগ্নতার সঙ্গে কাকতি ভাবলেন পরের বার ইটের দেওয়ালের ওপারে শোনা গুলির শব্দটার কথা—পরের গুলিটা কি ছেলেটার শরীরে লাগল?

—এই ভট্ট, পরের বারের গুলিটা কি ছেলেটার শরীরে লাগল?'—জিজ্ঞেস করতে গিয়েও কাকতি থমকে গেল। ভট্টাচার্য কেমন যেন করছেন, তার চোখদুটো ছোট হয়ে গেছে, মানুষটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কার্কতির সামনেই মানুষটা মাটিতে বসে পড়লেন।

—ভট্ট কি হয়েছে? তোমার শরীর খারাপ লাগছে নাকি?—ওরা সবাই চলে গেছে। কোন চিন্তা করো না, ওঠো।'

—কাকতি, আমার বিছানা দরকার, আর এক গ্লাস জলের দরকার ছিল।' ভট্টাচার্য বিড়বিড় করে বললেন।

কাকতি চিন্তিত হল। উচ্চ রক্তচাপের মানুষ। আচম্বিতে আসা উত্তেজনা কত রকমের ক্ষতি করতে পারে। সে ভট্টাচার্যকে ধরে ধরে বাড়ি নিয়ে এল। আসার সময় ভট্টাচার্যকে সাহস এবং সান্ত্বনা দিয়ে কত কিছু বলতে বলতে--যদিও মনে মনে তিনি ভেবে এলেন, ভট্টাচার্যকে ঘরে রেখেই কাজের ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে দেওয়ালটার ওপাশে ঘটনাটা সবিস্তার জানার জন্য একবার যাবেন।

কিন্তু বাড়ি ফেরার সময় ভট্টাচার্য হাঁপাতে হাঁপাতে অনুরোধ করলেন, 'বাড়িতে কিছু বলো না, জানো তো বাড়িতে আমার উপর কত বিধি শাসন রয়েছে।' বিছানায় শুয়েই ভট্টাচার্য পুনরায়

ভয় ধরিয়ে দিলেন। তাঁর অর্ধেক কথা বের হয়, অর্ধের অস্ফুট থাকে। প্রায় অর্ধচেতন অবস্থায় সে কাকতির একটা হাত খামচে ধরে থাকে। ডাক্তার এল। বিশেষ চিন্তার কারণ নেই, রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছিল। দেওয়ালের ওদিকটায় গিয়ে বিস্তারিত খবর নেওয়ার সুযোগ কাকতি আর পেল না।

ঘটনাটা কাকতি আর ভট্টাচার্যের মনকে বেশ কিছুদিন অধিকার করে রাখল। বকুল নামের সেই ফর্সা স্নেহ উদ্রেগ করা ছেলেটির ভয়ে কাতর মুখটা, শঙ্কা আর উৎকণ্ঠা বিস্ফোরিত করে তোলা তার চোখ দুটো বারবার সেই কয়েকদিন ভট্টাচার্য আর কাকতির চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল। ছেলেটি কে, তার ঘাতক হবার জন্য দৌড়ে অনুসরণ করা ছেলেগুলিই বা কারা শেষ পর্যন্ত ছেলেটির কি হল—এই প্রশ্নগুলি আলাদা আলাদা ভাবে চাবুকের মত ভট্টাচার্য আর কাকতির মন দুটিকে অহর্নিশি তাড়া করে বেড়াতে লাগল। কাকতি একটা সময়ে খুব তাড়াতাড়িই নিজেকে সামলে নিল। কিন্তু সমস্যাটা দাঁড়াল ভট্টাচার্যকে নিয়ে। ভট্টাচার্যের মনে নানা ধরণের অবান্তর প্রশ্নের উদয় হয়ে তার দৈনন্দিন জীবনকে পঙ্গু করে তুলল।

ভট্টাচার্য শারীরিক ভাবে সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত দুদিনের জন্য প্রাতঃভ্রমণ বন্ধ ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে ওঠার পরেও মানুষটার প্রাতঃভ্রমণের প্রতি আগ্রহ কমে গেল। নানা রকম অজুহাত খুঁজে সে বের হতে চায় না। কাকতি দেখল ভট্টাচার্য দিন দিন কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছেন। বিষণ্ণতার সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন, আগের সেই প্রগলভ, আত্মবিশ্বাসী মানুষটির জায়গায় এক দুশ্চিন্তায় জর্জরিত, বেদনাগ্রস্ত বৃদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন ভট্টাচার্য। কাকতি বুঝতে পারলেন—মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হতে পারা বা সে ধরণের অন্য অনাহুত পরিস্থিতি সামলাতে পারা একজন সাহসী লোক বলে নিজের ওপরে থাকা বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেই উপলব্ধি ভট্টাচার্যের আত্মবিশ্বাস চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে আর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে, নিজের সম্বন্ধে থাকা ধারণাগুলিতে তাঁর নানান বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ সে কাকতিকেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না।

নিজ ঘরের বারান্দায় কাকতির সামনে বসে কয়েকদিনই ভট্টাচার্যকে সেই ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে এক একটা প্রশ্ন করতে দেখা গেল। কথায় কথা বেড়ে প্রসঙ্গের পরিবর্তন হয় আর ভট্টাচার্যের মুখে কখনও না শোনা কিছু দুশ্চিন্তার কথা শোনা যায়।

—আচ্ছা কাকতি, আমার কপালে পিস্তলটা রাখার পরে সেদিন ছেলেটি যদি ট্রিগারটা টেনে দিত, তাহলে আমি মরে যেতাম?'

—'হ্যাঁ, মৃত্যু নিশ্চিত ছিল।'

—'কাকতি, এই সত্তর বছরে না ভাবা অনেক কথা আমি এই কয়েকদিনে ভেবেছি, আর ভেবে ভেবে অনেক নতুন কথা আমি আবিষ্কার করেছি। বুঝেছ কাকতি, যতগুলি ভয় আছে, তার মধ্যে মৃত্যুভয়টাই সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠুর প্রকৃতির। মৃত্যুভয়ের অনুভূতি মানুষের মনে যে আলোড়নের সৃষ্টি করে, আর কোনকিছুই তা করতে পারে না। পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক করে তোলার জন্য কাকতি বললেন—'সে সমস্ত বড় বড় কথা আমি জানি না ভাই, রোগ-শোক যদিও আমার বিশেষ নেই, তবুও একটা মৃত্যুভয় আমার মনের ভেতর বাসা বেঁধেছে বলে টের পাই।'

—'মৃত্যুর চেয়েও মরার আগের ভয়টাই বেশি মারাত্মক কাকতি। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি অর্থাভাবে না পড়ে, স্বনির্ভর হয়ে কয়েকটা দিন পার করতে পারবে কি না—সেই চিন্তাতেই মানুষ মরে।'

ভট্টাচার্য সবিস্তারে বলল না এই কয়েকদিন ধরে এ ধরণের চিন্তা তাকে কীভাবে কাহিল করে ফেলেছে। ঘন ঘন সে চিন্তা করেছে, পরমুহূর্তেই আবার উল্টোভাবে ভেবেছে—নিজের ছেলে দুটির প্রতি আমার মনে অবিশ্বাস জেগে উঠেছে নাকি! না না সে ধরণের অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই। কিন্তু তবু...ঘরের সঙ্গে জমিটাও অবশ্য সম্পূর্ণ নিজের বলতে এখনও আমার রয়েছে। কিন্তু বড় ছেলে সেদিন বলেছে—ঘরের সংলগ্ন জমিটাতে আর সি সি বিল্ডিং বানানোর প্ল্যান সে করছে। ব্যাঙ্কের লোনও নাকি পাবে। ব্যাঙ্কের লোনের জন্য জমির বন্ধকে সই করব না তো আর বলা যায় না। তিন তলা বানিয়ে একতলায় মাকে আর আমাকে নাকি থাকতে দেবে। মা সেদিন বলেছে—আগে বানাক তো, তারপর আর.সি.সি ঘরে থাকতে ভাল না লাগলে আমরা এই পুরনো ঘরে থাকব। একটা তলা তো ভাড়াও দেওয়া যাবে।—কিন্তু আর.সি.সি-টা হয়ে গেলেই যদি পুরনো অসম টাইপ ঘরটা ভেঙে তাতে ব্যবসার উপযোগী ঘর বানাব বলে যদি ছোটটাও প্ল্যান করে? সন্তানের দ্বারা ভিটে থেকে বিতাড়িত হওয়ার ঘটনা এই আসামে তো বিরল নয়।

কাকতি সান্ত্বনার সুরে বলল—'হতে পারে ভট্ট, অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার শঙ্কা এই বয়সে কিছু পরিমাণে আসাটা স্বাভাবিক।' বলেই অবশ্য কাকতির মনে হল—ভট্টকে সান্ত্বনা দেবার কথা নয়, আমার ক্ষেত্রেও এটা স্বাভাবিক হতে পারে। একমাত্র ছেলে স্থানীয় একটা কোম্পানীর ম্যানেজার, উপার্জন ভালই। ছেলে, ছেলের বৌ ঠিকই আছে, কিন্তু কীভাবে বলব—এতদিন পর্যন্ত বোঝা হয়ে উঠিনি বলেই ঠিক চলছে, কাল যদি বোঝা হয়ে পড়ি, ঔষধপত্র এখনও পর্যন্ত নিজেই সামলাচ্ছি, কাল যদি এটা সামলানো আমার ক্ষমতার বাইরে চলে যায়! পরমুহূর্তেই আবার কাকতি নিজের মনেই পেছন হাঁটেন—কে না বুড়ো হবে? প্রত্যেকেরই তো বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য খারাপ হয়। তার জন্যই মাথায় সব রকম দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরতে হবে তার তো কোন মানে নেই। ছেলে ছাড়াও আমার তো দুটি মেয়ে এবং জামাই রয়েছে। আর তার চেয়েও বড় কথা ভগবান বলে একজন, যাকে সকাল-সন্ধে অর্চনা করি, তিনিই বা তাহলে কেন রয়েছেন? না, না, মৃত্যুর আগে দারিদ্র্যে পতিত হওয়ার কোনরকম দুশ্চিন্তাকে মনে স্থান দেবার মানে হয় না।

—'এ বয়সের আরও একটা স্বাভাবিক অনুভূতি আমার মনে দেরী করে উদয় হয়েছে কাকতি; অনিশ্চয়তা। বুড়ো বয়সে শারীরিক আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দুটিই যে নেই হয়ে যাবে না তার নিশ্চয়তা? কোথায়, ছেলেদের কাছে ভবিষ্যতে যে সবরকম সাহায্য পাওয়া যাবে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? -বলতে বলতেই ভট্টাচার্য ভাবেন- হুঁ, ঘরে যদি বলি, ওদের মা বলবে অহেতুক চিন্তা করার কোন মানে হয় না। ওরা তো আপনারই সন্তান, তাই নয় কি? তার ক্ষুদ্র মগজে সে কীভাবে বুঝতে পারবে যে সন্তান একটা বয়সের পরে আসলে কেবল এক পরিচিত সহচর হয়ে যায়। খুবই কাছের পরিচিত মানুষ--তার বেশি নয়। আর পরিচিত মানুষ পরিচিত মানুষকে ঠকানোর উদাহরণ খুব একটা খুঁজতে হবে কি? মানুষকে অন্য মানুষ থেকে সুরক্ষা দেবার জনাই তো মানুষ নিজের মগজ থেকে ভেবে, ভেবেচিন্তে আইন প্রণয়ন করেছে। ওদের মা র মাথায় এ সমস্ত কথা ঢোকে না। নিজের মস্তিষ্কের ব্যবহার জীবনে খুব একটা করতে হয়নি বলে তার সমস্যাও অনেক কম। সমস্যা যত সব আমার। কিন্তু তা বলে, সবার কাছে কৃপার পাত্র হয়ে থাকতে হবে না কি? সত্তরের কাছাকাছি বয়স হয়েছে বলেই নিজের বিষয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে কথা বলতে হবে নাকি আমাকে?

—'কিসের স্বাধীনতা নাই হয়ে যাবে হে ভট্ট? শারীরিক আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এই বয়সে আমাদের কতটুকুই বা প্রয়োজন? কথাটা ভট্টাচার্যকে সান্ত্বনা দেবার সুরে বললেও কাকতির

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—ভট্টের কথা একেবারে অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া তো যায় না। অর্থাগমন সীমিত জেনেই তো শারীরিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অনেক জায়গায় বেড়ানোর পরিকল্পনা বাদ দিতে হয়েছে, বাধ্য হয়ে ছেলেমেয়েদের কথাই মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ভাবল—তবে ধন সম্পত্তি যতটুকু অর্জিত হয়েছে তা দিয়েই তো সারাজীবন চলে গেছে, আবার সেই দুশ্চিন্তাকে মনের মধ্যে গেঁথে নেবার কোন যুক্তি আছে কি? কোন পরিকল্পনা বাদ পড়ে থাকলে পড়ল, আত্মসংযম থাকতেই হবে। আর আমার আত্মসংযম তো রয়েছেই। জ্ঞান-বুদ্ধি আর আত্মসংযম আমার আগের চেয়ে নিশ্চিতভাবে বেড়েছে। বুড়ো হবার জন্যই বেড়েছে। তাহলে আবার বুড়ো বয়সটাকে বাধা বা অক্ষমতা বলে কীভাবে অভিহিত করা যায়? না না, কেবলমাত্র বুড়ো হবার জন্য কোন ধরণের ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক না, এই বুড়ো বয়স আমার জন্য ভগবানের এক মহান আশীর্বাদ।

কার্কতির মত ভট্টাচার্য অশুভ চিন্তাগুলিকে বশ করতে পারেনি জানতে পেরে কার্কতির একটা সময়ে বিরক্তি লাগল। সে প্রায় নিশ্চিত হল যে ভট্টাচার্য ভয়ের শিকার হয়ে পড়েছে। সারাটা জীবন ভট্টাচার্য ভয়ের বিষয়ে পড়েছেন, শুনেছেন, বুঝেছেন - কিন্তু কোনদিনই তাকে প্রকৃত ভয় লাগা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় নি। তাই সেদিনের সেই ঘটনাটি তাকে এভাবে কাহিল করে ফেলেছে। শারীরিক ক্ষতির ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাকে কেন্দ্র করে তাঁর চেতনার চারদিকে চক্রাকারে ঘুরছে অন্যান্য ভয়-- বার্ধক্যের ভয়, অসুস্থতার ভয়, দারিদ্র্যের ভয়, পরনির্ভরশীলতার ভয়। ভয়, দুশ্চিন্তা, সন্দেহ আর অনিশ্চয়তা মানুষটিকে কাবু করে ফেলেছে। বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে কাকতির দুঃখও হল। এই সৎ, সুন্দর জ্ঞানী বন্ধুটির এই বয়সে অহেতুক মানসিক চাপের শিকার হওয়াটা তাকে ব্যথিত করল। আর এক সপ্তাহ পরে কার্কতি প্রায় জোর করেই ভট্টাচার্যকে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরোল। কিন্তু লাভ নেই, ভট্টাচার্য পাল্টে গেছেন। দুদিনই কার্কতি লক্ষ্য করল, কোন বিষয়ের উপর ভট্টাচার্য আর আগের মত মুখর হয়ে উঠছেন না। বরং তিনি তার নিজের দুশ্চিন্তার কথাগুলিই স্বগতোক্তির মত বলে যেতে থাকেন। দুদিনই ইটের দেওয়ালটার পাশে যেখানে সেদিন ঘটনাটা ঘটেছিল, পৌঁছতেই ভট্টাচার্য ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন আর বললেন- 'সেদিনের সেই ছেলেটির কি হল কার্কতি? সে বেঁচে আছে কি? তার ঘরে মা-বাবা কোন কিছু জানতে পেরেছে কি? কি জানি ছেলেটি সেদিন হয়তো সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, মা-বাবা হয়তো টেরই পায়নি।'

প্রথম দিন কার্কতি কিছু বলেনি যদিও, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে কিছুটা বিরক্ত হয়েই সে বলল—'বাদ দাও ভট্টাচার্য, একটা কথাকেই মনে ধরে রেখো না। তার থেকেও অনেক মারাত্মক ঘটনা আজ সমাজ জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কোনটাতে কতটুকু আর মাথা ঘামাবে?'

-'না না কার্কতি, কি ধরণের বোঝা আমি বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি তুমি বুঝতে পারবে না। তুমি শুধু নিজের কথা ভাবছ। কেবল আমাদের মর্ণিং ওয়াক আর তার আনন্দটুকুতেই তুমি মনোনিবেশ করেছ। এতটা স্বার্থপর হয়ো না কাকতি।' কার্কতির সাধারণত রাগ ওঠে না। ভট্টাচার্যের মতো বন্ধুর উপর কোনদিন রাগ করেছে বলে মনে পড়ে না। আজ কিন্তু তার ভীষণ রাগ হয়ে গেল। এই কয়েকদিন ধরে ভট্টাচার্যের উপর তার প্রচণ্ড রাগ হলেও অনেক কষ্টে সে ধৈর্য ধরে রেখেছিল। এখন কিন্তু তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। রাগের চোটে তার মুখ দিয়ে আশ্চর্য ধরণের কথা বেরিয়ে এল।

-কি বললে তুমি? আমি স্বার্থপর? আমি যদি বলি সেদিন যদি ছেলেটি না বেঁচে থাকে তাহলে তুমিও সমানভাবে দায়ী—তাহলে? ভট্টাচার্য ভয়ঙ্কর কিছু একটা দেখার মত কার্কতির মুখের দিকে তাকালেন।

—'শোন ভট্ট, আমি সেদিন তোমাকে ঘরে রেখে ছেলেটির খোঁজে পুনরায় দেওয়ালের কাছটাতে যেতে চেয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি কয়েকজন লোক নিয়ে সেখানটাতে যেতে পারলে কে জানে হয়তো ছেলেটির পক্ষে ভাল হত। কিন্তু তুমি আমাকে ছাড়লে না, কারণ তুমি ভয় পেয়েছ, আর আমি ভয় পেলাম তোমাকে দেখে। বুঝেছ, ছেলেটির ক্ষতির চেয়েও নিজের শারীরিক ক্ষতির জন্য তোমার মনে সুপ্ত থাকা ভয়ের রূপ সেদিন তুমি দেখলে, আমিও দেখলাম, তারপরেও তুমি আমাকে স্বার্থপর বলো কীভাবে?' কথাগুলি বলেই কাকতি ফুঁপিয়ে উঠল। ভট্টাচার্য বিস্ফারিত চোখে কাকতির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ পেছন ফিরে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন। বিকেলের দিকে কাকতি অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে ভট্টাচার্যের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাবার জন্য বেরোতেই দেখল ভট্টাচার্য নিজেই তার ঘরের দিকে আসছেন।

—'চল, সামনে থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।' ভট্টাচার্য গম্ভীর সুরে বললেন। দু'জনে গিয়ে প্রাতঃভ্রমণের সময় রোজ বসা চা-বিস্কুট বিক্রি করা চালাঘরটার সামনে বেঞ্চটায় বসলেন। ভট্টাচার্যকে দেখলেই বোঝা যায় ভেতরে ভেতরে মানুষটি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন।

—'কাকতি, তুমি সকালে হঠাৎ রাগের চোটে যে কথাগুলি বলেছ তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আমি আজ সারাদিন ভেবে ভেবে আসল কথাটা অনুভব করেছি। আসলে আমরা একজন আরেকজনের কাছে একটা আয়না হয়ে উঠেছি।'

—'মানে?'

—'মানে তুমি আমার মধ্যে নিজেকে দেখ, তাই আমার সাহস আর আত্মবিশ্বাসের জন্য আমাকে প্রশংসা কর, আর আমি তোমার মধ্যে আমাকে দেখে ভয় আর অনিশ্চয়তার জন্য মাঝে মাঝে তোমার সমালোচনা করি। সেভাবেই আমরা এতদিন চলছিলাম। বুঝেছ তো?' কোন এক দুর্ঘটনার খবর দেবার সুরে ভট্টাচার্য বললেন।

হঠাৎ ভট্টাচার্যের গলার স্বরটা কেমন যেন সিক্ত হয়ে উঠল। চারপাশের কোলাহলের মধ্যে তিনি কাকতির হাতটা ধরে বলে উঠলেন—'কাকতি ভাই—আমাকে সাহায্য কর, ভয় সন্দেহের এই মারপ্যাঁচ থেকে আমাকে উদ্ধার কর। তুমি ছাড়া আর এই ক্ষেত্রে সাহায্য করার মত কে আছে বল?' মৌন কাকতি একটা হাত দিয়ে ভট্টাচার্যের কাঁধে সজোরে একটা চাপ দিলেন।

পরের দিন বিকেলবেলা কাকতির অনুরোধে বেরিয়ে গিয়ে পুনরায় তারা একই বেঞ্চে বসলেন। গত চব্বিশ ঘণ্টায় কাকতি একটা নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 'মনে পড়ে কি বন্ধু' বেঞ্চে বসেই কাকতি আরম্ভ করলেন, 'তুমিই একদিন বলেছিলে, সাহস যোগাতে হলে প্রয়োজনে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েও সাহসিকতাপূর্ণ কাজ জোর করে করা, কিন্তু আমাদের সেরকম কোন সুবিধেই নেই।—শোন, এখন সে সুযোগ এসেছে। আমি তোমাকে নিয়ে সাহসিকতাপূর্ণ কাজে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েও একবার আত্মনিয়োগ করে দেখতে চাই।'

—'কি কাজ?' ভগ্নপ্রায় ভট্টাচার্য একপ্রকার অবিশ্বাসের সুরে বললেন।

—'আমাদের বকুলের সন্ধানে বেরোতে হবে। শেষ পর্যন্ত তার কি হল, বাকি কয়েকজন তাকে কোথায় নিয়ে কি করল সেটা অনুসন্ধান করে বের করতে হবে। আমাদের মনে সমস্ত অশান্তি সৃষ্টির মূলে যে ঘটনা, তার অনুসন্ধান বিপজ্জনক হলেও সাহসিকতাপূর্ণ কাজ।' কাকতি কথাটা বলার সময় ইচ্ছে করেই তোমার না বলে আমাদের বলল।

—'কিন্তু কীভাবে?'

— 'সেটাই তো চ্যালেঞ্জ। চারপাশে ঘোরাফেরা করে খবর বের করতে হবে। বিভিন্ন উৎস থেকে খবর যোগাড় করব। ওরা কোন অন্য গ্রহ থেকে আসা প্রাণী নয়, এখানকারই ছেলে। ওদের বিষয়ে জানা, ওদের চিনতে পারার মত মানুষ বা বন্ধুবান্ধব খোঁজ করলে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। অনুসন্ধানের প্রাথমিক খবর অন্তত আশেপাশের অঞ্চল থেকে নিঃসন্দেহে যোগাড় করা যাবে।'

কাকতি লক্ষ্য করল ভট্টাচার্যের মুখটা কিছুটা আলোকিত হয়ে উঠেছে। সুদূরে চোখ রেখে মানুষটা কী যেন চিন্তা করছে। মানুষটার চোখে এক নতুন জ্যোতি ফিরে এসেছে। কি এক দুর্লভ বস্তুর পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনায় মানুষটা যেন এক পুলকজড়িত শিহরণ অনুভব করছে। হঠাৎ কাকতির হাতটা ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজের একটা হাত মুষ্টিবদ্ধ করে অন্য হাতের তালুতে সজোরে একটা আঘাত করলেন।

—'ঠিক আছে, তাহলে সেটাই হবে। এই মুহূর্ত থেকেই বকুল নামের সেই যুবকের সন্ধানে বেরুলাম আর তার কোন খোঁজ খবর না বের করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধু কাজে হাত দিলেন। প্রথমে সামনের চা-বিস্কুট বিক্রি করা চালাঘরটা থেকেই তারা শুরু করলেন। বকুল নামের একটি ছেলে, এরকম চেহারা, এতটা লম্বা, চুলের কাটটা এ ধরণের—জানেন কি? বিকেল হওয়ার আগেই তারা সম্ভাব্য কয়েকটি জায়গায় জিজ্ঞাসাবাদ করে নিল। দ্বিতীয় দিন খেলার মাঠে বিকেলে কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করল—একটা সাদা মারুতি ভ্যান, ধন নামের একটা ছেলে, কখনও কখনও হাতে পিস্তল থাকে, জানেন কি? কোথায় থাকে, কি বৃত্তান্ত জানাতে পারবেন কি? তৃতীয় দিন দুই কিলোমিটার দূর পর্যন্ত ক্লাব ঘর বা যুবক ছেলেদের আড্ডাস্থল গুলিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। দেওয়ালের ওপাশটাকে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা দোকানঘরেও জিজ্ঞেস করা হল।

প্রত্যেকদিনই নিজেদের অভিযান শেষে তারা ঘুরে এসে চা-বিস্কুট বিক্রি করা চালাঘরটার বেঞ্চে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন আর পরের দিন কোথায় কোথায় ঘুরবে তার পরিকল্পনা শেষে বাড়ি ফিরে আসে। কাকতি লক্ষ্য করে এই কয়েকদিনেই ভট্টাচার্য অনেকটা সামলে উঠেছেন। হৃত উদ্যম তার একটু একটু করে ফিরে আসছে। কিন্তু অন্য একটা জিনিস লক্ষ্য করেই কাকতি কিছুটা শঙ্কিত হয়ে পড়ল। সমস্ত যুবকদের প্রতিই ভট্টাচার্যের মনোভাব যেন কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে। যুবকদের সঙ্গে কথা বলতে হলেই সে যেন অহেতুক উষ্মা প্রকাশ করে আনন্দ লাভ করে। কি এক ক্ষতিপূরণ লাভের তাড়নায়, নিজের কাছেই নিজের সম্মান ফিরে পাবার তাড়নায় যুবকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ভট্টাচার্য কেমন যেন অধৈর্য হয়ে ওঠে।

একটা জায়গায় কয়েকটি যুবক জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনারা কেন এই ছেলেগুলির খোঁজখবর করছেন?'

--'আমাদের চাই।' ভট্টাচার্য বেশ একটু রুক্ষতার সঙ্গেই বললেন।

—'আপনারা এসবের মধ্যে না জড়ালেই ভাল বলে মনে হয়।'

ভট্টাচার্য চেপে ধরলেন। 'কেন, কেন না জড়ানোই ভাল? কি বলতে চাইছ তুমি?'

--'না মানে......

--'তুই জানিস ওদেরকে, কিন্তু বলছিস না কেন? গুলি করবি?' কাকতি সঙ্গে সঙ্গে ভট্টাচার্যকে হাতে ধরে টানতে লাগলেন। 'ছিঃ ভট্ট, চলে আসুন তো। অনর্থক মানুষকে প্ররোচিত করে কি লাভ?'

ইতিমধ্যে ব্যাপারটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। পরের দিন রাতের বেলা ভট্টাচার্যের ছোট ছেলে বাড়ি ফিরে জানাল—'বাবা নাকি কয়েকদিন ধরে কার্কতি কাকুর সঙ্গে কোন ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?'

—'না না, আজকাল সন্ধেবেলা বেড়াতে বেরোচ্ছি। সেদিন পরিচিত ছেলে দুটিকে রাস্তায় পেলাম। এখানে কোথায় নাকি একটা প্রতিষ্ঠান খুলেছে। ঠিকানাটা কি বলেছিল ভুলে গেছি বলেই কাকতি আর আমি দুই একজনকে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করে দেখছিলাম, ব্যস, এতটুকুই।' মনের ভেতর সন্দেহ নিয়ে ছোট ছেলে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন কার্কতি বলল— 'দুদিনের ভেতরই কিছু একটা করতে হবে। তাঁর ছেলেও জানতে পেরেছে। দরকার হলে একবার পুলিশের কথাটাও পুনরায় ভেবে দেখতে হবে। অনেক ভাবনাচিন্তা করেই তারা পুলিশকে এখনও কিছুই জানায় নি। পুলিশের কাছে গেলে সমস্যা বাড়ারই সম্ভাবনা বেশি—এই ছেলেগুলির খবর আপনাদের কেন দরকার? ওদের সঙ্গে আপনাদের কী ধরণের সংযোগ?' নানা প্রশ্ন উঠতে পারে।

সেদিন ভট্টাচার্য আর কাকতি খুব দৌড়ঝাঁপ করলেন। বাড়িতে জানতে পেরেছে যখন তখন তাদের অভিযানের সমাপ্তি ঘনিয়ে আসছে, আর খুব বেশি দেরি নেই। হাঁটাপথে ছাড়াও সেদিন মাঝেমধ্যে রিক্সায়, কখন বা অটোরিক্সায় উঠে শহরের প্রায় প্রতিটি মদের দোকান, রেস্তোরা, সিনেমা হলে দুজনে ঘুরে বেড়ালেন। বিকেলে বেঞ্চে বসে নিরাশ কার্কতিকে ভট্টাচার্য সান্ত্বনা দিলেন— 'না না, পেয়ে যাব কার্কতি। আর একটু ধৈর্য ধর, কিছু একটা সমাধান পেয়ে যাব -আমার মন বলছে। ' ভট্টাচার্যের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে তারা খুব শীঘ্রই একটা সমাধানে পৌছতে পারবে। নিজের হৃতসর্বস্ব পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় রোমাঞ্চিত হয়ে থাকা মানুষটা যেন শহরটা তন্ন তন্ন করে ঘুরে বেড়ানোর সময় একটু একটু করে হারানো সাহস এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে। তিনি এই খুঁজে বেড়ানোর যেন সমাপ্তি হয় তাই চাইছেন, যদিও মনের সঙ্গোপনে চাইছেন এটা যেন এভাবেই চলতে থাকে।

ভট্টাচার্যের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ভুল বলে নি। অভিযান আরম্ভ করার পঞ্চম দিন বিকেলের দিকে শ্রান্ত ক্লান্ত ভট্টাচার্য এবং কাকতি রিক্সা থেকে নেমে চা-বিস্কুট বিক্রি করা চালাঘরের বেঞ্চটাকে সবেমাত্র বসেছেন, একটা ছেলে এসে বলল, 'আপনাদের সঙ্গে একজন লোক দেখা করতে চাইছে। ' ছেলেটির হাতের ইশারাকে অনুসরণ করে তারা দেখল ত্রিশ ফুট দূরে রাস্তার সামনের দিকে একটা টাটা সুমো গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

— 'কোথাকার মানুষ? কেন ডাকছে?' কার্কতি জিজ্ঞেস করল। গলার স্বর কিছুটা উপরের দিকে তুলে ভট্টাচার্য বললেন, 'তাকেই এখানে ডেকে নিয়ে এসো।'

—'আপনারা বকুলের খবর জানতে চেয়েছেন তো? সে এই বিষয়ে সমস্ত কিছুই জানে। কার্কতি ভট্টাচার্য প্রায় দুজনেই এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। কার্কতি আর ছেলেটিকে পেছনে ফেলে ভট্টাচার্য দ্রুত এগিয়ে গেলেন।'

—'আসুন, বসে কথা বলি।' গাড়ির ভেতর থেকে কথা ভেসে এল। কার্কতি ভট্টাচার্য কিছু টের পাবার আগেই দেখল যে তারা গাড়ির ভেতর বসে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা দ্রুত চলতে শুরু করার পরেই তাদের হুঁশ ফিরে এল। দেখতে পেল ডাইনে বাঁয়ে মিলিয়ে মোট ছয়জন মানুষ রয়েছে। অন্ধকার হয়ে আসছিল বলে কাউকে বিশেষ করে খুব একটা বেশি পরিচিত বলে মনে হল না। যদিও সেদিনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকা একজনকে ওরা সামনের দিকে বসে থাকতে দেখল। 'ভয়

পাবেন না। আমরা কোন ক্ষতি কবব না। কেবল কিছু কথা জিজ্ঞেস কবব।' পাশে বসে থাকা ছেলেটি বলল, 'আমরা কেবল জানতে চাই এই কয়েকদিন আপনারা কেন আমাদেব খোঁজ করছেন?'

'তোমার খোঁজ তো করিনি, আমরা বকুলকে খুঁজছিলাম। তার কি হল না হল সেটা জানতে চাই।' কাকতি বলল।

— 'কেন? বকুল আপনাদের কি হয়?' ছেলেটি কথার মধ্যে গাম্ভীর্য আরোপিত করে বলল। ভট্টাচার্য নিজের মুখে ধীবে ধীরে এক ঝাঁক বক্ত উঠে আসা অনুভব করল 'সে আমাদের ছেলে, হল তো?' কাকতি কিছু ভাবাব আগেই ভট্টাচার্য হুট করে বলে দিলেন।

--'আপনারা দুজনেই তার বাবা নাকি?' পাশের ছেলেটি সামান্য নাটকীয় ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস কবল।

— 'হ্যাঁ, আমরা দুজনেই তার বাবা, তাতে কী হল?' ভট্টাচার্যের ক্রমশ রাগ হচ্ছে। উত্তর দেবার সময় তার গলার স্বর ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হচ্ছে।

সামনে বসা ছেলেটি এবার গাড়ির ভেতরের লাইটটা জ্বালাতে নির্দেশ দিয়ে পেছনে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, একবাব পেছনে তাকান তো, এটিই আপনাদের ছেলে কি না?' কার্কতি আর ভট্টাচার্য দেখলেন পেছনে বসে হাসি মুখে বকুল তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার পাশেই সেদিন ভট্টাচার্যের কপালে রিভলবার তাক করা ছেলেটি। 'আপনাদের ধন্যবাদ, সেদিন দেওয়াল পার হয়ে পালিয়ে যাওয়ার বুদ্ধিটা না দিলে কিন্তু আমি নির্ঘাৎ গুলি খেয়ে মারা যেতাম। কিন্তু আপনারা এখন আমাকে কেন খুঁজে বেডাচ্ছেন? শুনুন আপনারা মিছামিছি এসবের মধ্যে নাক গলাবেন না, বিপদ হবে। এ সমস্ত ঝগডাঝাঁটি আমাদের মধ্যে হয়েই থাকে।' বলেই সে সামান্য হাসে।

- 'কি?' ক্রোধ আর উত্তেজনায় ভট্টাচার্য থরথর করে কাঁপতে থাকে। কাকতি কিছু বলার আগেই ভট্টাচার্য শেষ লাঠিটাও ছুঁড়ে দিলেন— 'কুকুর, লজ্জা নেই তোর? এদেরই হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তুই সেদিন আমাদের কাছে আকুল হয়ে কাঁদছিলি না? এদের গুলির হাত থেকে সেদিন বেঁচে গেলি কি না সেটা জানার জন্যই আজ পাঁচদিন ধরে এই দুই বুড়ো হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর তুই কিনা আবার ওদের সঙ্গেই মিশে আমাদেরই উল্টো উপদেশ দিতে আসছিস?' ভট্টাচার্যের কথায় বকুলের হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

—'তোর কথা ভেবে, তোর মা-বাবার কথা ভেবে এই কয়েকদিন আমরা যেভাবে হাহাকার করে বেড়িয়েছি, তোর বাবা-মা হয়তো তা কল্পনাও করতে পারবে না।' কাকতি বললেন।

— 'বাবা মা ঠিকই করেছেন। তোকে ছেডে দিয়েছেন গুলি খেয়ে মরার জন্য। আমরা আসলে বোকা। এখন বুঝতে পারছি, তুই সেদিন মরে গেলেই ভাল ছিল, বেঁচে যাওয়াটা অন্যায় হয়েছে।' ভট্টাচার্যের কথার সুর সপ্তমে। সামনেব ড্রাইভিং সিটের পাশের ছেলেটি হাতের পিস্তলটা সামান্য তুলে নিযে বলল, 'আপনাদের আওয়াজটা কিন্তু বেশ জোর হয়ে যাচ্ছে।'

ভট্টাচার্য তেড়ে উঠলেন, 'কী করবি? মারবি? মার।' সামনের দিকে ঝুঁকে খপ করে তার পিস্তল ধরা হাতটা টেনে এনে নিজের বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে দিলেন। ছেলেটি এই ধরণের প্রতিক্রিয়ার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে হাতটা জোর করে টেনে নিয়ে সামনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল। বকুল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'আপনাবা শান্ত হয়ে বসে থাকুন, আমরা আপনাদের আগের জায়গায় ছেড়ে আসব, এই গাড়ি ঘুরিয়ে নে।'

—'গাড়ি ঘোরানোর কোন প্রয়োজন নেই। নিয়ে চল কোথায় নিয়ে যাবি। বাবার বয়সী এই বুড়ো দুটোকে কোথায় নিয়ে মারবি, নিয়ে চল।' কাৰ্কতির স্বরও ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ছেলেগুলিরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল। তারা যে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তা তাদের বিড়বিড় করে বলা অশ্লীল গালাগালি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল।

—'চুপ করে বসে থাকুন। অনেক হয়েছে, আর একটি কথাও উচ্চারণ করবেন না।' গাড়ি চালাতে থাকা ছেলেটি নির্জন রাস্তায় গাড়িটা ঘুরিয়ে বলে উঠল।

—'চুপ করব না, কী করবি?' কাৰ্কতি বলল।

—'তুই নিজে চুপ করে থাক!' ভট্টাচার্যের কণ্ঠস্বর। ছেলেগুলি এবার সোজাসুজি অশ্লীল ভাষায় বলে চলল। তারা ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছ এই দুই বুড়োকে তারা কোন কিছুই করতে পারবে না। দুই বুড়ো অনর্থক ঝগড়ায় মেতে উঠেছে। আধ রাস্তায় যে তাদের নামিয়ে দেবে সেই সাহসও তাদের নেই। মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, কোন সমস্যার সৃষ্টি না করে বুড়ো দুজনকে আগের জায়গায় কোনরকমে নামিয়ে দিতে পারলেই যেন তারা রক্ষা পাবে। তাই ফিরে আসার সময় অশ্লীল কথাবার্তার দ্বারা নিজেদের ক্ষোভ প্রশমিত করতে চাইছে তারা। অশ্লীর কথার দ্বারাই যেন তারা দুই বুড়োর মুখ বন্ধ রাখতে সমর্থ হবে।

—'কুকুরের দল, তোরাই কেবল অশ্লীল কথা বলতে পারিস? আমরা পারিনা বলে ভেবে রেখেছিস নাকি? তোদের মতো যুবক না হয়েই আমরা বুড়ো হয়েছি বলে ভেবেছিস নাকি? বলেই ভট্টাচার্য কেবল কাকতির দিকে তাকিয়েছে—'মারে পোহাই।' কাকতি শুরু করে দিয়েছে। গড়গড় করে কাকতির মুখ দিয়ে এরকম অশ্লীল শব্দ নির্গত হতে দেখলে নিশ্চয় অবাক বিস্ময়ে ভূত দেখার মত তার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। এখন কিন্তু এমন নির্বিকার ভাবে তিনি বসে রইলেন যেন কাৰ্কতি খুব স্বাভাবিক ভাষায় কথা বলে চলেছেন।

ভট্টাচার্যের এ ব্যাপারে শব্দভাণ্ডার কম। তিনি কাকতির দুটো অশ্লীল শব্দেরই পুনরাবৃত্তি করলেন। যুবক বয়সে শোনা আরও কিছু অশ্লীল শব্দ মনে করার চেষ্টা করলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছেলেগুলির হাসি উঠল যদিও, কেন জানি না খোলাখুলি ভাবে হাসতে সাহস করল না তারা। গাড়ির ভেতরে কম আলোতে ভট্টাচার্য আর কাকতি দেখল সামনে বসে থাকা ছেলেটি তাদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে তাদের কথায় সায় দেবার মত করে মাথা নাড়ছে। অশ্লীল একটা শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে ছেলেটি মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ভট্টাচার্যের দিকে তাকিয়ে বলল—'খুব বেশি তেল হয়ে গেছে, তাই না?' সঙ্গে সঙ্গে পাশে বসে থাকা গম্ভীর আওয়াজে কথা বলতে থাকা ছেলেটি 'এই দাঁড়া' বলে তাকে চুপ করে থাকতে বলল। কিন্তু সেই মুহূর্তে চট করে ভট্টাচার্যের একটা বিশ্রী গালি মনে পড়ে গেল। কাকতি শব্দটার উচ্চারণ পুরোপুরি শুদ্ধ হয়নি বলে বুঝতে পেরেও তার শ্লেশটা ঠিকই কাজ করবে জেনে চুপ করে গেল।

তীব্রগতিতে এসে গাড়িটা চা-বিস্কুট বিক্রি করা সেই চালাঘরটির থেকে পঞ্চাশ মিটারের মত দূরে দাঁড়িয়ে গেল। 'নামুন।' দরজা খুলে এ মাথায় থাকা ছেলেটি নামার সঙ্গে সঙ্গে অপর দিকে থাকা ছেলেটি ভট্টাচার্য আর কাকতিকে সজোরে ঠেলা মারল। যাতে পড়ে না যান তার জন্য কাৰ্কতি তৎক্ষণাৎ নিজেও নেমে পড়লেন আর ভট্টাচার্যকেও তক্ষুণি টেনে নামিয়ে দিলেন। ভট্টাচার্য গাড়িটার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'এইবার ছেড়ে দিলাম যা, এর পরের বার বুকে গুলি না ঢোকা পর্যন্ত নামব না মনে রাখবি।'

তীব্রগতিতে চলে যাওয়া গাড়িটার ভেতর থেকে ছেলেগুলি কথাটার অর্ধেকটা শুনতে পেল। ভট্টাচার্য আর কাকতি এসে রোজ বসা বেঞ্চটাতে বসলেন। হো হো করে হাসতে থাকা দুজনের মনেই এর মধ্যে যে রাত হয়ে গেছে, সে কথাটাও ঢোকার কোন অবকাশ পেল না অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

দুই আর দুই তিন

রত্না ভরালী তালুকদার

ঘটাং করে গেট খোলাব শব্দে তন্ময়তা ভেঙে গেল। ঘড়ির দিকে তাকালাম। সাড়ে নয়টা বেজেছে। সুদৃশ্য গেটটা খুলে দেখি পার্ট টাইম কাজের মেয়ে দুলারী ভেতরে আসছে। অন্যদিনের তুলনায় আজ সে কিছুটা দেরী করে এসেছে। সকাল নয়টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত আমার ঘরে তাব ডিউটি।

এই সময়টিতে দুলারী সবসময় আসে। কিন্তু আজ তাকে দেখতে পেয়ে আমি বিরক্ত হয়েছি। অথচ, তাকে দেখার আগে পর্যন্ত আমাব মন সন্তুষ্টিতে পরিপূর্ণ ছিল। আমি ছিলাম আত্মতুষ্টিতে বিভোর হয়ে। কিছু সময় আগে মহিলা পত্রিকার জন্য একটা লেখা তৈরী করেছি মাত্র। আমার আত্মতুষ্টির উৎস ছিল এই লেখা। আমার লেখার জনপ্রিয়তাই আজকাল আমাকে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি দান করে।

লেখার চমৎকার সমাপ্তি ঘটেছে। মাতৃ, ভগ্নী, প্রেয়সী বা পত্নীর পরম্পরাগত ভূমিকা পালনের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত নারীরাই একদিন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে। সমাজ পরিবর্তনের এই বিশেষ দিনটির জন্য আমবা প্রতীক্ষা করছি। যেখানে পুরুষ আর মহিলা উভয়েই বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ কবেছে, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। .....এই পবিবর্তনের জন্যই আজকের নারী নিজের পথ নিজেরাই তৈরি করে এগিয়ে চলেছে।

সমাজের পরিবর্তন —হয়তো যার অন্য নাম হতে পারে বিপ্লব। সর্মাবকাশের জন্য, বিপ্লবেব জন্য পথ তৈরি করে এগিয়ে গেছে নারী। সমাজ পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে সম্পাদকের তাগিদে, ফরমায়েশে। চমৎকার। আজকাল লেখা সৃষ্টি কবি না, তৈরি করি। সৃষ্টি এক কঠিন কাজ, কিন্তু তৈবি করা সহজ। একজন ঠিকাদার একটা ঘব বানানোর ঠিকে নেবার মত। ঘবেব ডিজাইন, বাস্তুশাস্ত্রেব

উপদেশ, অথবা স্বামী কোথা থেকে টাকা যোগাড় করেছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই, আমি ঘরটা বানানোর ঠিকা নিয়েছি, আমায় দেখতে হবে ঘরটা যেন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়। আমি একদল আধপেটা খাওয়া শ্রমিকের সস্তা শ্রম, নিস্ফল ক্রোধ, অথচ এক ধরণের বাধ্যতামূলক আনুগত্যের মুনাফায় মালিককে তাড়াতাড়ি করে ঘরটা বানিয়ে দিয়েছি। কোন মাথাব্যথা নেই, উদ্বেগ নেই। সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ কারিগর হিসেবে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, প্রতিষ্ঠা বেড়ে গেছে। একজন লেখকের সৃষ্টিশীল জীবনের আয়ু কতটুকু? যতদিন পর্যন্ত আপনার ভাবনা পাথুরে পাহাড় দিয়ে কুলুকুলু স্বরে নেমে আসা ঝরণার মত স্বতঃস্ফূর্ত বা গর্ভবতীর দুরু দুরু উৎকণ্ঠার মতো, কোথায়ও একটা কাঁটার খোঁচার মত বিঁধে থাকা একটা তাগিদের কষ্টদায়ক অথচ সুমধুর যন্ত্রণা। আপনি সৃষ্টিশীল লেখক, তাই আপনি খিটখিটে, কারণ আপনার সৃষ্টি আপনাকে সন্তুষ্টি দিতে পারে নি। সৃষ্টিকর্তা সর্বদাই অসন্তুষ্টির ভাণ্ডার– তিনি তাঁর অসন্তুষ্টিই পাঠকদের বিলিয়ে দিতে পারেন।

অথচ আমি বলতে পারছি, সন্তুষ্টিতে মন ভরে আছে বলে।

সৃষ্টির যন্ত্রণা না থাকলেও আমি সফল লেখিকা, আমার লেখার কারিগর। আমার লেখা আকর্ষণীয় করার জন্য আমি নিত্য নতুন টেকনিক আয়ত্ত করেছি, সুযোগ বুঝে পাঠককে চমক দিচ্ছি বা বিভ্রান্ত করছি, বিভ্রান্তি দূর করে আবার পথের সন্ধান দিচ্ছি, যদিও বা সেই পথ বিমূর্ত, অথবা সেই পথ সম্পর্কে আমি নিজেও নিশ্চিত নই।

সত্যি কথা, যে পথের কথা আমি আমার লেখায় বলি, সে পথ সম্পর্কে এমনকি আমি নিজেও ভাল করে জানি না। আমি যখন নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছি, তখন এই নারীদের মধ্যে দুলারী থাকবে কি থাকবে না, অথবা আমার এখানে কাজ করা পার্টটাইমারের তেমন এক সুদিন আমি নিজেই সহ্য করতে পারব কি না—সে বিষয়ে আমি নিজেই স্পষ্ট নই--তবুও আমার লেখার জন্য আমি প্রচুর ফিডব্যাক পেয়েছি, তাগিদ বেড়েছে আর সংবেদনশীল লেখিকা হিসেবে আমার প্রতিষ্ঠাও বেড়েছে। বেড়ে চলা প্রতিষ্ঠা। স্বাস্থ্যবান স্বামীর উত্তাপ এবং নিরাপত্তা। পুত্রধন। অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক আমেজ।

তাছাড়া সৃষ্টির উৎস শুকিয়ে যাবার পরেও যদি আমি লিখে যেতে পারি তাহলে আফশোষ কোথায়? স্বাভাবিকভাবেই আমি তৃপ্ত। তাছাড়া সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছাড়া, সাংসারিক দিক থেকেও আমি সেই অল্প সংখ্যক নারীদেরই প্রতিনিধিত্ব করছি—যার জীবন স্বামী প্রায় এক অলৌকিক শক্তিতে সমস্ত জাগতিক উপাদানে সমৃদ্ধ করে তুলেছে, সমৃদ্ধির এক অপূর্ব মায়াজাল এনে দিয়েছে প্রিয়তমার ভালোবাসা এবং আব্দারের সুকোমল আবেশের আবেষ্টনীতে, যা চাওয়ার চেয়েও বেশি, যে আবেষ্টনী ভেদ করে অভাব, অসন্তুষ্টি বা না-পাওয়ার বেদনার মতো নৈরাশ্যের শব্দরাজি প্রবেশ করবার সুযোগ উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা নেই।

. এই মায়াজাল অতিক্রম করতে আমার স্বামী দস্তুরমতো তাঁর বিবেককে বিসর্জন দিয়েছে, হয়তো তার জন্য আমিই স্বামীকে প্ররোচিত করে আসছি—কিন্তু এ ধরণের অস্বস্তিকর চিন্তাকে আমি প্রশ্রয় দেব না। সেভাবে, সমৃদ্ধিতে আমার জীবন উপচে দেবার প্রতিদানে আমার অজ্ঞাতে, নিভৃতে পুষে রাখা তাঁর কয়েকটা গোপন অভিসারের আভাস পেয়েও আমি নির্বোধের মত চুপ করে রয়েছি। আমি সন্তুষ্ট, কারণ সকালের ব্রেকফাস্ট থেকে মধ্যরাতের নীরবতা পর্যন্ত তিনি আমার কাছে আমার ইচ্ছানুযায়ী সপ্রতিভ, তরতাজা আর চঞ্চল। আমি জানি যে, এই চঞ্চলতা একেবারেই নির্মল নয়, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে আক্রোশে আমার হৃদয় দগ্ধ হয় না।

কারণ, তাঁর মতই আমিও আমার বিবেকের কাছে জবাবদিহি করিনি, তাছাড়া তাঁর চঞ্চলতা যদি নির্মল নয়, আমিও জনক নন্দিনীর মত সতীত্বের অগ্নিসাক্ষী দেবার মত অবস্থায় নেই। তাই এই প্রবঞ্চনার খেলায় আমি দুই আর দুইয়ে চার, আর প্রকাশ্য অঘটন না ঘটা পর্যন্ত আমি নিরাপদ---এই বোঝাবুঝি নিরাপদ, এই মিথ্যাচারও নিরাপদ।

এই সমস্ত মুহূর্তগুলিতে আমি পার্টটাইমার কাজের মেয়ের মুখোমুখি হতে চাই না। আমার পার্থিব বৈভব, আত্মতুষ্টি বা গোপন হিসেব নিকেশ রোমন্থন করা এই দুষ্প্রাপ্য সময়টা একান্তই আমার নিজের। এ সময় দুলারীর মতো অন্তহীন কায়িক শ্রমে বেঁচে থাকা নারীর মুখোমুখি হওয়াটা একান্তই বিরক্তিকর।

কারণ দুলারি এক জীবন্ত চরিত্র---রূঢ়, এবং বিমর্ষ এবং নিজেকে ঢেকে রাখতে না পারার মত অপরিশীলিত। কিন্তু দুলারী নিজের কাছে শুদ্ধ। আমার কাছে আমারই কাজ করা মেয়ের বাহ্যিক মূঢ়তা এবং অন্তরের শুদ্ধতার বৈপরীত্য বড় অস্বস্তিকর। তাছাড়া দুলারী একটা কাল্পনিক চরিত্রও নয় যে তার জীবনটাকে আমিই তৈরি করে দেব। সে একটা রক্তমাংসের চরিত্র, যে সারা জীবন ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে। জীবনে অলৌকিক কোন এক ভেলকিবাজী সংঘটিত না হলে এই লড়াই সে সারা জীবন চালিয়ে যাবে---আর তার জন্য সে প্রস্তুত।

কিন্তু আমার বিলাসিতা, আমার বৈভবের সামনে দুলারীর রুক্ষ আর বিমর্ষ উপস্থিতি আমার কাছেই বড় প্রত্যাহ্বানমূলক। তার এই উপস্থিতি যেন আমাকে আমার উত্থানের সুড়ঙ্গটির কথা মনে করিয়ে দেয়। যদিও এই ছিদ্র দৃশ্যমান নয়, আমি জানি যে আমার প্রতিষ্ঠাও আসলে এক সামাজিক ব্যাধি মাত্র, নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার আর নিজের কাছেই ধরা পড়ার। আমি চমকে উঠি।

স্বরূপ এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করার একটা উপায়ও ভাবতে পারি। কিন্তু এই দুটির একটাও আমি করি নি বা করব না। কারণ এক বিশেষ দিক থেকে সে আমার জীবনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

আমি খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সে সযত্নপালিত দুই সারি টবের ফুলগাছের মাঝখান দিয়ে সুদীর্ঘ উঠোনটা পার হয়ে এসে অভ্যেসবশত কলিংবেলটা টিপছে। স্বামী অফিসে ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে আটটা বাজতে না বাজতেই অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছে। যাবার সময় ছেলেকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যাবে বলে ছেলেকে নিজের গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে গেছে। ঘরে কোন লোক না থাকায় আমিই এসে দরজা খুলতে বাধ্য হয়েছি আর দরজার কাছে বেঁটেখাটো মানুষটির চোখের নিচের কালো বেগুনী রূপ নেওয়া দাগটিতে আমার চোখজোড়া স্থির হয়ে গেল। সুদীর্ঘ আট বছর ধরে আমার ঘরে কাজ করা দুলারী, অর্থাৎ আমি আমার এই কাজ করা পার্টটাইমারকে আমার জীবনে এক বিশেষ ভূমিকা দান করেছি। আমার ভোগসর্বস্ব জীবনে দুলারী এক জীবন্ত দর্পণ, যার দ্বারা আমি মহানগরের বস্তি এলাকাগুলির এক অর্ধ-বন্য জীবনের স্বাদ লাভ করেছি। সে আমাকে মহানগরীতে দশফুট বাই দশফুট ভাড়াঘরে মাসে আঠারোশ' টাকায় চলা পাঁচজনের একটা সংসারের সংগ্রাম উপভোগ করার অ্যাডভেঞ্চার এবং পরিতৃপ্তি দান করে আসছে।

হিংস্র, উন্মত্ত আর অনন্ত হাহাকারের নামান্তর বস্তির এই জীবন, কিন্তু নদীর বিশাল জলরাশির মতই চলমান, ছন্দিত এবং দুর্জেয়। যখনই প্রয়োজন হয়েছে, তখনই অর্ধ-বন্য জগতের কিছু সতেজ চিত্র বাস্তব জগত থেকে আমি তুলে নিয়েছি আর আমার লেখায় আমি ব্যবহার করেছি, যা সংবেদনশীল লেখিকা হিসেবে আমার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে---যা আমার জীবন বিলাসিতার এক মহার্ঘ উপাচার। সেদিক থেকে আমি দুলারীর কাছে কৃতজ্ঞ।

যেহেতু এই দুর্লভ অবদান সম্পর্কে দুলারী একেবারেই অজ্ঞ, তাই সে সবসময়ই আমার কাছে একেবারে জড়সড়ো হয়ে থাকে। এই আট বছরে আমি নারী স্বাধীনতা বিষয়ক কিছু তত্ত্বের জ্ঞানও দুলারীকে দিতে চেষ্টা করেছি। আমি জানি এই তত্ত্ব তার জীবনে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু এভাবেই আমি তার কাছে ধীরে ধীরে আদর্শ নারী হয়ে উঠছি। অন্ততঃ সে নিজেকে আমার কাছে এভাবেই উপস্থাপিত করে আর সাংসারিক জীবনের বিভিন্ন উপদেশ আমার কাছ থেকে গ্রহণ করে। আমার অন্যান্য বিলাসিতার সঙ্গে এই সন্তুষ্টিটাকেও আমি আহ্লাদের সঙ্গে উপভোগ করি।

কিন্তু এখন দুলারীর চোখের নিচের কালো বেগুনী দাগটা আমাকে বড় অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। এই দাগটা বলতে গেলে আমার জীবনের হিসেব নিকেশগুলি ওলোটপালট করে দিয়েছে। কারণ, এই দাগটা তার বেঁচে থাকার আধারটিতে আলোড়নের সৃষ্টি করে তাকে একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করেছে।

সমাজের নিম্নতম স্তরের আধা-শ্রমিক জীবনের প্রতীক দুলারী। একটা স্থির সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তার এই মানসিক স্থিরতায় আমি বড় বিচলিত হয়েছি। আমারও ভয় হচ্ছে—কারণ তার সিদ্ধান্তই আমাকে তার কাছে অনেকটা হীন করে তুলেছে, আর আমার নিঃস্ব বাস্তবকে উলঙ্গ করে দিয়েছে। শরীরের সঙ্গে ছায়ার যে সম্পর্ক, আমার আভিজাত্যের সঙ্গে আমার নিঃস্বতার সম্পর্কও তার থেকে আলাদা নয়। কিন্তু রাতের ক্লাব, সকালের অ্যারোবিকস্, অভিজাত বার, শৌখিন গাড়িতে পরিপাটি ড্রাইভার ইত্যাদি অজস্র বিলাসী উপকরণের প্রলেপ মেখে সেই রূপটিকে আমি নিজেই দেখতে না পারা করে লুকিয়ে রাখতে পারি।

অথচ, দুলারী তার জীবনের বিশেষ সন্ধিক্ষণে নেওয়া একটামাত্র সিদ্ধান্তই সেই প্রলেপ দূরীভূত করে আমার নিঃস্বতাকে আমার সামনে বড় স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। স্পষ্টতা আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে, আর আমি নিজেকে প্রবোধ দিতে পারছি না।

অথচ, এই সেদিন পর্যন্ত দুলারীর জীবনের এরকম অজস্র দাগ, বা তার অপদার্থ স্বামীর মারধরের প্রতি সে নিস্পৃহ ছিল। তার জীবনটা স্বামীর মারধরে সৃষ্টি হওয়া এরকম অসংখ্য কালো-বেগুনী দাগের মধ্যে। তার শ্রমজীবী জীবনে প্রাপ্য দেনা-পাওনাগুলি থেকে এই অত্যাচার পৃথক নয় বলেই সে ধরে নিয়েছিল।

এই সমস্ত অত্যাচারের বিনিময়ে সে ছিল তার অর্ধ শ্রমজীবী সংসারের মালকিন। নিত্য মারপিট, চিৎকার, ক্ষুধা আর মদ্যপ স্বামীর বিকৃত যৌনাচার আর অসংখ্য হাহাকারের নামান্তর সেই সংসার আর সে সেই সংসারের চার সীমায় বন্দী। এই মালকিনের বন্দীত্বকেই স্বয়ং সে প্রাণভরে উপভোগ করত।

বাসন মাজা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, ঘর মোছা বা কাপড় ধোওয়ার বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে দিয়ে দুলারীর সংসারের টুকরো খবরগুলি আমার অভিজাত জীবনের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। তিনটে সন্তানের অপুষ্টি, বস্তির সামগ্রিক কাঁচা পায়খানা দুর্গন্ধ, মাছির ভনভনানি, ঘন ঘন ডায়েরিয়ার টুকরো খবর। দিনে হাড়ভাঙা খাটুনি, রাতে বিছানায় ধর্ষকামী আর মদ্যপ স্বামীর অত্যাচার।

কাজ কর্মে যত নিখুঁত, সংসারের বিশৃঙ্খলা ততটাই বাঁধনছেঁড়া। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই দুলারীর সব কয়টি সন্তান নিয়মিত ভাবে স্কুলে যাওয়া আসা করে। মাঝে মাঝে সরকার থেকে স্কুলে ওদের প্রত্যেকের নামে দুই কেজি করে চাল দেওয়া হয়। তাই খুব আশা নিয়ে সে ছেলেদের স্কুলে পাঠায়।

জীবনের অসংখ্য না মেলা ছন্দের মধ্যে দুলারী আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে তার এই হাহাকার তার জন্য গৌণ, তার জীবন দুই আর দুই চার বা নিরাপদ বোঝাবুঝি নয়, কিন্তু তারও বেঁচে থাকার একটা আধার আছে---এই আধারটির নাম বিশ্বাস। বস্তির আধাশ্রমিক চলমান জীবনেও পতি পত্নী উভয়ের নৈতিকতায় বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর সংসার এগিয়ে চলেছে। যেহেতু তুমি বিশ্বাসের পাত্র, তোমার বিকৃত যৌনাচার চরিতার্থ করার জন্য বস্তির অন্যান্য পুরুষের মত তুমি অন্য নারীর খোঁজে যাওনি তাই তোমার চোলাই মদ, আমার শরীরে তোমার বিকৃত যৌনাচারগুলিকেও আমি মেনে নিয়েছি, এই বিশ্বাসের নামে আমি ধৈর্যশীলা বসুমতী। আশ্চর্য যুক্তি, কিন্তু এই গোঁয়ার নারী তার বিশ্বাসে দৃঢ়। আপাতত দুলারীর সঙ্গে আমার কোন তুলনা হয় না। তার জীবন টাটকা ঘামের দুর্গন্ধ আর আমি সুগন্ধিত সুরভি। কিন্তু যখন সে তার এই বিশ্বাসের কথা আমার কাছে অহংকার করে বলে, তখন সে আমার কাছে ঐশ্বর্যবতী হয়ে পড়ে। আর আমিও আমার কাছে দুষ্প্রাপ্য এই সামান্য সম্পদের জন্য তাকে ঈর্ষা করতে বাধ্য হই।

স্বভাবত রুক্ষ হলেও দুলারীর জীবন গাছের মত সরল এবং পরিচ্ছন্ন। লুকোচুরিহীন। এই পরিচ্ছন্নতাই আমার মনে ঈর্ষার দাবানলকে দিনদিন বাড়িয়ে চলেছে। আমি এক অবুঝ আক্রোশে দিনদিন জ্বলেপুড়ে মরছি। অথচ আপেক্ষিকভাবে আমি তার প্রতি সহানুভূতিশীল, দয়াপরবশ। কিন্তু ঈর্ষার এই অদৃশ্য, এক-পাক্ষিক লড়াইতে সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। তাকে পরাজিত করার জন্য আমি যেন দীর্ঘদিন ধরে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছি।

অবশ্য আমাকে আমার কাঙ্খিত সুযোগের জন্য খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় নি। চলমান জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনাবলীর মতই, আধা শ্রমিক জীবনের পঙ্কের মধ্য থেকে সেই সুযোগ এসে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছে। আর এই সুযোগ দুলারীর জীবনে এনেছে প্রলয়ের ঘূর্ণি। এই ঘূর্ণিবাতাসে দুলারীর গাছের মত সবল জীবনটা শিকড় পেড়ে বসতে পারে নি - সে তার বেঁচে থাকার আধারটিকে উপড়ে ফেলেছে। সে তার আধা-শ্রমিক জীবনের অহংকারটাকে ধরে রাখতে পারে নি।

আচম্বিতে দুলারী একদিন বুঝতে পেরেছে তার বিশ্বাসের অহংকারকে চূর্ণ করে দিয়ে তার পতি তার ঘরে অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বস্তির অন্য একজন কমবয়সী মেয়ের গর্ভে তার দু'মাসের সন্তানের বীজ রোপন করে এসেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় দিক্‌বিদিক-শূন্য দুলারী আমার কাছে দৌড়ে এসেছে। আমি লক্ষ্য করেছি, পতির অত্যাচারের সাক্ষী হয়ে তার চোখের নিচে তখনও জ্বলজ্বল করছে একটা লম্বা দাগ।

দুলারীর জীবনের এই আলোড়ন আমাকে তৃপ্ত করেছে। অকস্মাৎ তার প্রতি অনুকম্পায় আমার হৃদয় দগ্ধ হয়েছে। জীবনের এক বিরল ঐশ্বর্যকে হারিয়ে এবার সে আমার স্তরে নেমে এসেছে।

এই জন্যই তার প্রতি আমার এই সরল অনুকম্পা জেগেছে নাকি— একসঙ্গে আমি এখন কয়েকটা হিসেব মিলিয়ে দেখছি। এই মুহূর্তে দুলারী, তার পতি, সংসারে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি--এই চরিত্রগুলির সামগ্রিক সমন্বয় বড় আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তার হাহাকারের এই সমন্বয়বর্তী থাকাটা আমার জন্য জরুরী,--আমি হাত বাড়ালেই সহজে পেয়ে যাওয়া এই চরিত্রগুলি আমার লেখিকা জীবনের উত্থানের জন্য বড় সুবিধেজনক।

তাই, যদিও দুলারীর বিশ্বাসের আধারটিকে আমি ঈর্ষা করেছিলাম, এই চরিত্রগুলিকে নেড়েচেড়ে দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হবার জন্য আমি এখন তার সংসারের ভাঙনটাও চাই।

না। সবদিক বক্ষা করে আমি তাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি? আমার জীবনের নিরাপদ বোঝাবুঝির সূত্র তাকে সাহায্য করবে কি? কৌশলে আমি আমার প্রগতিশীলতার তত্ত্বকে বর্জন করেছি আর দুলারীর কাছে পরম্পরাগত নারী হয়ে দাঁড়িয়েছি। আমি নিশ্চিত যে, আলোছায়ার এই খেলা বুঝতে পারার মতো দুলারীর মানসিক উত্তরণ হয়নি।

আমি তার জন্য এক মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছি। তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া অর্থাৎ বস্তির সেই মহিলার গর্ভপাত বা সে ধরণের ন্যূনতম খরচের একটা সহজ ব্যবস্থার প্রস্তাব, কিছু ক্ষতিপূরণ, এবং পতিব্রতা নারীর অন্তরের সীমাহীন উদারতার পরিচয় দিয়ে তার পতিকে ক্ষমা প্রদান, যা বস্তির হাজার হাজার ঘটনার মতই-- এই পরামর্শকে আমি তার জন্য তুলে ধরেছি আর আমার উদার এই মানসিকতার পরিচয় দিয়ে দরকার হলে সেই খরচের কিছু অংশ আমি নিজেই বহন করতে চাই বলে জানিয়ে দিয়েছি।

আমি তাকে বুঝিয়েছি যে পুরুষ জাতিটা ভোমরা, যারা চোষার জন্য সবসময় ফুলের রেণুর খোঁজ করে। তোমার শরীর নিয়ে তুমি যদি সেই রেণুর যোগান দিতে ব্যর্থ, সেই ভোমরা অন্য ফুলের কাছে যাবেই। আর, জীবনটা একটা বোঝাপড়া মাত্র- এ মান অভিমান বা তোমার সামর্থ্যের বাইরের একটা পদক্ষেপ নয়, আর তিন সন্তানকে নিয়ে দুলারীর অবস্থা যেহেতু পতির উপার্জন ছাড়া চলতে পারার মত নয়, তাই বরং একটা বোঝাবুঝিতে আসাটাই মঙ্গলের।

আমি নিশ্চিত যে যেহেতু আমি তার আদর্শ নারী (সে নিজেকে আমার সামনে এভাবেই উপস্থাপিত করে আসছে) আর সে এ সময়টায় দিগবিদিক শূন্য, তাই এ সময়ে সে আমার উপদেশ গ্রহণ করে নেবে।

কিন্তু আমার হিসেব ধূলিস্যাৎ করে দুলারী এবার একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। তার বিশ্বাসকে মূল্য দিতে অক্ষম পতি নামের অবলম্বনটিকে বর্জন করে সে এবার স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার পথ নিতে চলেছে। দুলারীর এই সিদ্ধান্তে আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি। কারণ সে আমার কল্পনার চরিত্র নয়। আমি একজন শিক্ষিতা এবং অভিজাত লেখিকা এবং সে আমার ঘরে কাজ করা কাজের মেয়ে মাত্র।

এই পার্টটাইমের কাজের মহিলাই এখন মালকিনের বোঝাবুঝির সূত্রকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে জীবনের গতানুগতিকতাকে পরিহার করেছে আর এই মধ্যবয়সেও এক নতুন জীবন আরম্ভ করার সংকল্প গ্রহণ করেছে। সে আমাকে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে একবার বিশ্বাস ভঙ্গ হওয়ার পরে সে পতিকে শরীর এবং মন থেকে একেবারে বর্জন করে দিয়েছে। তাকে আবার গ্রহণ করা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।

দুলারী আমাকে বলেছে যে কিছুক্ষণ আগে আমার ঘরের কলিংবেলটা টেপার আগে সে ইতিমধ্যেই তিনটি সন্তানকে নিয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে আর আলাদা একটা ভাড়া ঘরে নতুন ঠিকানায় সংসার আরম্ভ করেছে। দুলারী ভেবে রেখেছে, তার নতুন জীবনে তার নিজের উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দুই সন্তান সকাল বেলা খবরের কাগজ বিলি করে রোজগার করবে আর রাতের স্কুলে পড়া চালিয়ে যাবে। তার তৃতীয় সন্তান এখনও উপার্জন করার মত বয়স অর্জন করেনি।

আমার চোখের সামনে সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে অনায়াসে অতিক্রম করে সে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে তার জীবন ক্ষণিকের মধ্যে বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে। এই সন্ধিক্ষণে ক্ষণিকের

জন্য হলেও তার জীবন নতুন দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জীবনের নির্মমতা এবং সত্যকে এবার দুলারী ঠিকই সনাক্ত করেছে। হয়তো সে বুঝতে পেরেছে যে দীর্ঘকাল ধরে স্বামী যেভাবে তাব চেতনাকে আঘাত করে আসছে, সেভাবে একমুঠো বদানাতার বিনিময়ে অক্টোপাসের মত আমিও তাকে শোষণ করে এসেছি মাত্র। আমার ভয় লাগছে, কারণ অপরিপাটি করে হলেও শোষক এবং শোষিতের শ্রেণীভিত্তিক একটা ধারণাকে হয়তো সে সনাক্ত করেছে, যেখানে আমি ধরা পড়ে গেছি।

আমার লেখনীর প্রেরণায় নয়, সম্ভ্রান্ত মহিলা পত্রিকাব সম্পাদকের ফরমাইশে নয়, দুলারী তার আধা-শ্রমিক জীবনের চোরাকুঠির কঠোর অভিজ্ঞতা থেকেই জীবনের নতুনত্বকে উপলব্ধি করেছে আর আমার ক্ষুদ্রতায় মোক্ষম আঘাত হেনে পরম্পরার খোলস ভেঙে এগিয়ে গেছে।

দুলারী আর আমার তুলনা কোথায়?

ঐতিহ্য
শীলভদ্র

খুব কম মানুষেরই ভূমিধর বরুয়ার কথা মনে আছে। কারও মনে নেই বললেও ভুল হবে না। ভূমিধর বরুয়া খুব বড় মানুষ ছিলেন বললে আজ আর কেউ আপত্তি করবে না। হতে পারে, এতদিন পরে কে কার খবর রাখে আজ ভূমিধর বরুয়া-ভবনের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা তার প্রমাণ আকারের তৈলচিত্রটা দেখলে মানুষের মনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমীহের ভাব উদ্রেগ হবে। পরনে গিলেকরা ধুতি, বগলের নীচে দিয়ে পাক মেরে নেওয়া শরীরে একটা মূল্যবান কাশ্মিরী শাল। একটা হাতে সুন্দর একটা লাঠি, খুব সম্ভব হাতির দাঁতের, অন্য হাতটা রাজ-সিংহাসনের মত একটা চেয়ারের পেছন দিকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভূমিধর বরুয়ার চেহারাটা সত্যি সত্যিই খুব সুন্দর ছিল। বাকিগুলো হল কলকাতার প্রতিকৃতি আঁকা বিখ্যাত চিত্রশিল্পী একজনের কীর্তি। কাশ্মিরী শাল বরুয়া সারাজীবনে ছুঁয়ে দেখেছেন কি শীতের দিনে সাধারণত একটা নোংরা ফাটা এণ্ডির চাদর শরীরে জড়িয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। শেষ পর্যন্ত সেই চাদরটাও তিনি রাখতে পারলেন না। কখন যেন জমিদার দয়া করে তাকে পুরনো পরিত্যক্ত কাপড়-চোপড় দিয়েছিল। সেভাবে পাওয়া বড় হাতার একটা সোয়েটার আর শরীরে আঁটোসাটো হওয়া একটা কোটও তিনি পেয়েছিলেন। সেগুলির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। ভাঙা হোক, ছেঁড়া হোক.....। তবে কথাটা সত্য নয়। সে রকমের পাটের কাপড় দৈন্যকে অধিকতর প্রকট করে তোলে।

যারা ভূমিধর বরুয়াকে জানতেন তারা বরুয়ার এই প্রতিকৃতি দেখে হো-হো করে হেসে উঠবেন। তাঁদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে ফাটা নীল লুঙ্গি পরা, ইতস্তত করতে থাকা একজন মানুষের ছবি।

ভূমিধর বরুয়া ভবন। এই কিছুদিন হয় বিশাল আকারের একটা প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সেখান থেকেই তিনি হলঘরটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। এক বিরাট ব্যক্তিত্বের

উপস্থিত সবাইকে অভিভূত করে রেখেছে ভবিষ্যতে ভূমিধর বরুয়া ভবনে নন্দন বরুয়ার বাবার ব্রোঞ্জের একটা প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করারও ইচ্ছে রয়েছে। নন্দন বরুয়া একজন কর্মকুশল মানুষ। সে সমস্ত কাজই পরিচ্ছন্নভাবে করে। এই ভূমিধর বরুয়া ভবনটা স্থাপন করাটাও তাঁর সুশৃঙ্খল কর্মকুশলতার এক সার্থক অভিব্যক্তি, সফলতার প্রতীক। জীবনের প্রতিটি দিকেই তিনি সফল হয়েছেন। এমনকি তিনি এক যোগ্য পিতার উপযুক্ত সন্তান বলেও গৌরব করতে পারেন। এক অপদার্থ পিতার পুত্র হওয়াটা গৌরবের কথা নয়। নন্দন বরুয়ার পিতা যদিও বড় মানুষ ছিলেন না, নন্দন বরুয়া তাকে বড় মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ভূমিধর বরুয়ার কথা আজ আর কারো মনে নেই। অতীত তাকে নাগাল পায় না। রামেশ্বর ডিহিদারের কথা নন্দন বরুয়া ভুলে গিয়েছিলেন। ভুলে যাবারই কথা। মানুষটা ঘর থেকে বেরোয় না। লোকে বলে তার নাকি মাথার দোষ হয়েছে। কোন কথা নেই। নিশ্চয় গোপন করে রাখা সিফিলিসের বিলম্বিত আক্রমণের ফল। খুব একটা আদর্শ চরিত্রের মানুষ তো ছিলেন না। ডিহিদার ছিলেন ভূমিধর বরুয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অর্থাৎ একই ধরণের পালক থাকা পাখি।

কোন এক সহজাত অনুভূতির প্রেরণার বশবর্তী হয়ে ভূমিধর বরুয়া ভবনের দ্বারোদঘাটনের দিন রামেশ্বর ডিহিদার ভবনটিতে এসে উপস্থিত হলেন।

'বাঃ বাঃ সুন্দর।' ভূমিধর বরুয়ার প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়তে থাকা দেখে নন্দন বরুয়া ব্যস্তভাবে তার সামনে এল।

'কাকা, আপনি এখানে? কোথা থেকে এলেন, আসুন আসুন, এদিকে আসুন।' গণ্যমান্য লোক জমায়েত হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার আসার সময় হয়েছে।

'ভেরি গুড, ভেরি গুড। একেবারে ভদ্রলোকের মত দেখাচ্ছে, তুমি বলে কে বলবে একেবারে চেঞ্জ হয়ে গেছে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। আমরাই শুধু একরকম থেকে গেলাম, লোম খসে পড়া রাস্তার কুকুর। ডাকতো তাকে, কেমন ভদ্রলোক হয়েছে দেখি।' মহা জুলুমের কথা। মানুষের সামনে কোথায় কী বলে বসে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। আসুন তো, আসুন এদিকে আসুন। নন্দন বরুয়া কৌতুহলী জনতার কাছ থেকে তাকে সরিয়ে আনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'না, এভাবে হবে না, মিষ্টি খাওয়াতে হবে। এত উন্নতি তোমার বাবার, বাপরে!'

নন্দন বরুয়া তর্কাতর্কি না করে একটা দশ টাকার নোট বের করে তাঁর হাতে গুঁজে দিলেন।

'এই যে ভাই। সামনের দোকানটাতে মদ রাখে কিনা বলতে পার?'

'বলতে পারি না, আসুন আপনি।'

এবার সে হাত ধরে ডিহিদারকে টেনে বার করে আনল।

নন্দন বরুয়ার মানসিক প্রশান্তি নষ্ট হয়ে গেল। ভূমিধর বরুয়ার প্রতিকৃতিটার দিকে তাকিয়ে তার নিজেরই এমন একটা ধারণা হয়েছিল যে তাঁর পিতা সত্যি সত্যিই একজন বড় মানুষ ছিলেন। এখন ডিহিদার দেখতে থাকা ছবি একটা প্রতিকৃতিটার উপর আধা আরোপিত হয়ে সেটা বিকৃত করে তুলতে লাগল। ডিহিদার দেখতে থাকা ছবিটা সে মুছে ফেলতে পারে না। ডিহিদার জানে। কেন জানবেন না, একসঙ্গে বসে মদ খেয়ে হুলুস্থুল করা মানুষ ভূমিধর বরুয়া মদ খেয়ে হুলুস্থুল করেছিলেন। তিনি যে কত উচ্চ বংশের সন্তান—পথেঘাটে সে কথা প্রচার করে টলতে টলতে বাড়ি এসেছিলেন।

হিঃ হিঃ হিঃ। দাদা কোন অংশে কম ছিলেন না। সুন্দরী মেয়ে বৌ চোখে পড়লে নাকি ঘরের মানুষকে হুকুম দিতেন, 'আজ রাতে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি।' কারো সাধ্য ছিল না সে হুকুম অমান্য করার। বাঘ ছিলেন, বাঘ। সেজন্যেই মানুষ বাঘ বরুয়া বলে ডাকত।'

ভূমিধর বরুয়া সাধু ছিলেন না। খুব বড়জোর তাকে শেয়াল বলা যেতে পারে। মাটি-বাড়ি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি শেষ। পাওনাদারদের কাছ থেকে তিনি পালিয়ে বেড়াতেন। মদ খেয়ে সঙ্গীদের সামনে পাওনাদার এবং নিজের পূর্বপুরুষের আপেক্ষিক অবস্থা নিয়ে মজার কথা বলে হাসতেন। হিঃ হিঃ হিঃ। উত্তমর্ণের উৎপাত বেশি হলে মানুষটাই কিছুদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে পড়তেন। নিজের খাওয়াদাওয়ার কোন চিন্তা নেই। চেহারা ভালো। কথাবার্তা বলে মানুষকে মোহিত করতে পারতেন. কোন একজন জমিদারের ঘরে উঠলেই হল। জমিদারদের মোসাহেবের প্রয়োজন রঙ তামাশা করার জন্যে সঙ্গীর দরকার মদ খাবার জন্যে সঙ্গী চাই। তাই ভূমিধর বরুয়ার কোন চিন্তা নেই। ঘরে কী হচ্ছে, কীভাবে চলছে, তা নিয়ে তার কোন উদ্বেগ নেই। কোনরকমে চলে যাবে।

লোকে বলে নন্দন বরুয়ার ওপরে তার বাবার কোন প্রভাব পড়ে নি। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। শৈশবে নন্দন বরুয়া সমালোচকের দৃষ্টিতে বাবার প্রতিটি ভঙ্গী লক্ষ্য করেছিলেন, আর তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি কখনও বাবার মত হবেন না। ভাবাবেগহীন কর্মঠ, সংযমশীল, হিসেবী এর একটাও গুণ ভূমিধর বরুয়ার ছিল না। নন্দন বরুয়ার বর্তমান অবস্থা ভূমিধর বরুয়ার জন্যই। তাঁর লেখা-পড়া বিশেষ হল না। তামারহাটের সুধীর মিত্রের বিশাল কারবার। নন্দন প্রথমে তার কর্মচারী হিসেবে ঢুকেছিলেন। পরে নিজেই একটু একটু করে ধান-চালের কারবার শুরু করলেন। যুদ্ধের সময় সপ্তাহের মধ্যেই ধানের দাম দ্বিগুণ তিনগুণ বেড়ে যেতে লাগল। ভেতরের দিকে দুর্গম অঞ্চলের উপজাতিরা এ-সব কথা টের পায় না। ওজন সম্পর্কেও তারা খুব একটা সচেতন নয়। কিছুদিনের মধ্যেই নন্দন বরুয়া সত্যি সত্যিই ফুলে ফেঁপে উঠলেন। হাতে একবার টাকা জমা হলে আর কিসের চিন্তা? কর্মক্ষম মানুষ, কারবার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে পড়ল।

নন্দন বরুয়া নামী লোক। ধন সম্পত্তি, মান-সম্মান সমস্ত কিছুই তিনি নিজের চেষ্টায় আহরণ করে নিয়েছেন। অপদার্থ, দায়িত্বজ্ঞানহীন পাওনাদারের তাগিদায় পালিযে বেড়ানো পিতার ইতিহাস বদলে দিতে পারলেই তার আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। রামেশ্বর ডিহিদার আর কতদিন বেঁচে থাকবেন? নন্দন বরুয়া অনেক টাকা খরচ করেছেন। প্রয়োজনে আরও সামান্য কিছু টাকা খরচ করতে তিনি দ্বিধা করবেন না। মাঝে মাঝে দশ টাকা ছুঁড়ে দিলেই প্রতিকৃতিটায় যেভাবে দেখানো হয়েছে ডিহিদারও তার বাবাকে সে রূপেই দেখবে। ছবিটা দেখলেই টের পাওয়া যায় যে তিনি একজন অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন।

নন্দন বরুয়া তার দাদু আর জেঠাকে দেখেনি। তাঁদেরকে বড় মানুষ বলে কল্পনা করতে তাঁর খুব একটা অসুবিধে হয় না। মদ খেয়ে পয়সা দিতে না পেরে পালিয়ে বেড়ানোর সময় সীতানাথ খপ করে ধরে ফেলায় এণ্ডি চাদরটা তার হাতেই রেখে এসে সারাটা শীতকাল কাঁপতে থাকা বাবার ছবিটাই নন্দন বরুয়ার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

পিতা সন্তানকে মানুষ করে। পিতাকে শুধু মানুষ নয়, বড় মানুষ করে তোলার দায়িত্ব নন্দন বরুয়া নিজের হাতে নিয়েছেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে সফল হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও সে সফল হবে।

এখানে সেখানে জীবন

শিবানন্দ কাকতি

অগভীর জলের নদীটিতে স্রোত একেবারে না থাকার মতই। নিশারী, একটি ছোট নদী। পাহাড় এবং বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়ে একে-বেঁকে নদীটি কপিলিতে পড়েছে। যে জায়গাটিতে বাঁক নিয়ে নিশারী পশ্চিমে কপিলির দিকে চলে গেছে, তার এই মাথায় রাস্তার পাশের প্রাইমারি স্কুলটিতে আশ্রয় শিবিরটা। শুধু মাত্র স্কুলের বারান্দা বা মেঝেতেই নয়, স্কুলের সমস্ত সীমানা জুড়েই এই শিবিরটা। শিবিরটিতে প্রায় তিনশ পরিবার, মানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থেকে শুরু করে ক্যাম্পে জন্মানো সদ্যোজাত দুই তিনটে শিশু পর্যন্ত এর বর্তমান বাসিন্দা। বিভিন্ন ধরণের জরুরীকালীন আসবাব, পোঁটলাপুটলি। মেঝেতে খড় দিয়ে সামগ্রিক বিছানা করা যদিও তার মধ্য থেকে এক একটা পরিবারের নির্দিষ্ট জায়গাটুকুকে ঠিক সনাক্ত করা যায়। আজ প্রায় দু'মাস ধরে এই শিবিরটা চলছে। এ ধরণের শিবির এই অঞ্চলটিতে প্রায় বিশ-পঁচিশটা হয়েছিল। শুরুতে হা-হুতাশ আর কান্নার রোল সব সময় শিবিরের পরিবেশ ভারী করে রেখেছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক নেতা বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের লোক এলেই এর প্রাবল্যও বৃদ্ধি পেত। এখন অবশ্য প্রথম পর্যায়ের সেই দুঃখ আর ক্ষোভ ধীরে ধীরে হালকা হয়ে এসেছে। সময় দুঃখের গাঢ়তা ক্রমশ কমিয়ে এনেছে। ধীরে ধীরে পুনরায় চারপাশের ব্যবহারিক পৃথিবীতে সংস্থাপনের সমস্যা আর জীবন চালিয়ে নেবার বাস্তবতা সবাইকে কিছু পরিমাণে হলেও আবেগঘন জগত থেকে সরিয়ে এনেছে। কেবল শিবির নির্ভরতা ভয় এবং শঙ্কাকে পুষে রাখার অস্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি করে। তাছাড়া সরকারের ক্ষীয়মাণ অর্থভাণ্ডার এবং বহু প্রচারিত স্বাভাবিকতার দাবীর জন্য শিবিরগুলি অস্বস্তিকরও ছিল।

শিবিরের বিছানায় পড়ে থেকেও হারাণ অনেক সময় পর্যন্ত ঘুমোতে পারত না। পাশেই গভীর ঘুমে অচেতন দুই ছোট নাতি, সুকুমার এবং গৌতম। কোন নির্দিষ্ট ধারণায় এই সমস্ত ঘটে

যাওয়া ঘটনাগুলিকে সে পরিষ্কার ভাবে সাজিয়ে দেখতে পারে না। ভাবতে পারে না। কারণ, এই পুরো সময়টিতে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনাই তার কাছে অস্পষ্ট, ধূসর। যেন মেঘ পাহাড়ের আলো ছায়ার খেলা। ছেলে রাখাল এবং পুত্রবধূ মায়াকে নিয়ে কোনমতে চলা হারান মণ্ডলের এইমাত্র ভেঙে পড়া ছোট ঘরটির ছবিও তার কাছে এখন অস্পষ্ট।

এক সপ্তাহ পরে নিশারীর পারের এই শিবিরটাও সরকার উঠিয়ে দেবে বলে ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে। জিলা উপায়ুক্ত এবং অন্যান্য মানুষ শিবিরে থাকা প্রায় সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলে গিয়েছেন। প্রাপ্য সরকারী অনুদানের ভবিষ্যতের আশ্বাসও দিয়ে গেছেন। দুটো সম্প্রদায়েরই মাতব্বর গোছের মানুষরা এসে নিরাপত্তার কথা বলে গেছেন। এরকম ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে আর কখনও না ঘটে সে কথাটাও জানিয়ে দিয়েছেন। দোষী করায়ত্ত হয়েছে, নির্দোষী ঘটনার জন্য অনুতপ্ত।

বিছানায় ছটফট করতে থাকা হারাণ একটা নদীর তীরে বেরিয়ে এসেছে। নিশারীর পারে বসে সে তাদের ক্যাম্পটার দিতে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। ক্যাম্পে এখন প্রায় কেউ আর জেগে নেই। বাইরে পাহারা দিতে থাকা কয়েকজন বসে বসে ঘুমে ঢলে পড়ছে। নদীর পারে জেগে বসে রয়েছে হারাণ, তার সামনে ঘটিত এবং অঘটিত ঘটনার অস্পষ্টতা এবং বিস্মৃতির মধ্যে। সে ভাবছে কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যে।

রাতের অন্ধকার শীর্ণ নিশারীর অগভীর জলে খুব ম্লানভাবে ঝিলমিল করছে। নদীর দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল কী ধরণের সাক্ষী হয়ে রয়েছে এই গোটা অঞ্চলের ছোট বড় নদীগুলি, কী নির্বিকারভাবে তাকিয়ে রয়েছে মাত্র একশ দেড়শ বছরের ভেতরে এই সমগ্র অঞ্চলটিতে নদী-মাটি-ঘাম-রক্তের মিশ্রণে গড়ে ওঠা এই বিস্তীর্ণ জীবন এবং সমাজ। কীভাবে নদীগুলি তাকিয়ে রয়েছে এর তীরের স্থানীয় লোকগুলির সঙ্গে এসে এই মানুষগুলির কুড়িয়ে নেওয়া আশা আর নিরাশার দিকে। নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে আসার দুঃখ এবং নদীর তীরে লাভ করতে পারা নিরাপত্তার সুখ ।বিশেষ করে নিশারী, কপিলী এবং যমুনা এই ছোট নদী কয়টির বিস্তীর্ণ উপত্যকাই আপন করে নিয়েছিল সবাইকে।

মা-বাবার সঙ্গে আসার সময় হারাণ ছিল মাত্র সাত বা আট বছরের। এখন এই কিছুদিন আগেই বোধহয় সে সত্তরের কোঠা পার করেছে। ওরা এখানে আসার কয়েকমাস আগে এসেছিল আব্দুল, ফজল আর জলিলরা। ওদের পরে বিভিন্ন সময়ে আরো অনেকে এসেছিল। দীনবন্ধু, জগৎ, মতলিব, জাকির, প্রমোদ এবং আরো অনেকে।

নদীর জল একই ছিল। একই ছিল এর তীরের পলিমাটি. বর্ষার দু-কূল ভরা বন্যা এবং তাদের প্রত্যেকেরই পরিশ্রমলব্ধ মাথার ঘাম। এখানেও সেই একইভাবে সৃষ্টি হয়েছিল মালিক, মহাজন, মাতব্বর আর এভাবেই তারা বঞ্চিত হয়েছিল তাদের কষ্টোপার্জিত যথোচিত মূল্য থেকে। আর্থিক দৈন্য এবং সামাজিক হীনমন্যতায় ওরা প্রত্যেকেই এই অঞ্চলটিতে এক মিশ্রিত জীবন গড়ে তুলেছিল।

কিন্তু এই সমস্ত সাদৃশ্যের মধ্যেও এই মানুষগুলি দ্বিধাবিভক্ত ছিল নিজ নিজ কর্মের দ্বারা.। কোন সময়ে অত্যন্ত তীব্র এবং সংবেদনশীল আবার কোন কোন সময় নিজেদের অজান্তেই। একই মাঠে একই কাদায় লুটোপুটি হয়ে ওরা হাল বায়, ধান বপন করে, এক ঘরের কাঠিয়া শেষ হলে অপর ঘর থেকে কাঠিয়া আনে, নিজের অর্জিত ফসল সাপ্তাহিক হাট বাজারে ব্যবসায়ীদের হাতে যখন

তুলে দেয় বা অঞ্চলের মহাজনদের উঠোনে বসে তাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করে সে সময়ে তাদের মধ্যে কোন ভেদজ্ঞান থাকে না, ওদের পরিচয় তখন একটাই, কারণ তখন তাদের একটাই মাত্র জাত। কিন্তু প্রায়ই নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দ্যুতক্রীড়ার সময় ওদের সংবেদনশীলতা প্রচণ্ডভাবে জাগ্রত হয়। একই গ্রামের মানুষ, একই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করা, একই মাঠে একসঙ্গে কাজ করা মানুষগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে পরম শত্রু হয়ে পড়ে, নীরবে গোপনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

আসলে কী হয়েছে প্রথমে কেউ বুঝতে পারেনি। দিনদুপুরে অনেক দূরের গ্রাম থেকে আগুনের ধোঁয়া এবং স্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। তারপর চিৎকার চেঁচামেচি, অনেক মানুষের এদিক ওদিকে দৌড়াদৌড়ি। সাপ্তাহিক বাজারটা আধঘন্টার মধ্যে জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। ব্যবসায়ীরা দৌড়াদৌড়ি করে জিনিসগুলি নিয়ে বাস ট্রাক যেখানে যেভাবে পারে সেখানেই উঠে যাবার জন্য তাড়াহুড়ো লাগিয়েছিল। দলবদ্ধ লোক যে যেদিকে পাবে দৌড়াতে শুরু করেছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কে কোনদিকে দৌড়াবে সেটাও যেন নিশ্চিত হয়ে গেল। কোন দল কোথায় দৌড়ে গিয়ে কী করবে সেটাও আলাদা আলাদা করে জেনে গেল। মানুষ মারার জন্য ব্যবহৃত যে কোন অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত কিছু নির্দিষ্ট হিংস্র দল এ গ্রাম থেকে পাশের গ্রামে এগিয়ে যেতে লাগল। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য পরস্পর পরস্পরকে যখনই সুবিধে সুযোগ মত পাবে আক্রমণ করবে। অবশেষে ঘটনাগুলি অবধারিতভাবে ঘটে গেল। এখানে সেখানে পড়ে রইল অনেক মৃতদেহ। আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া অনেক ঘর আর হাম্বা রবে ডাকতে থাকা গোয়ালের গরু ছাগল। একটা সময়ে এসে উপস্থিত হল পুলিশ-প্রশাসন, শান্তি সমিতি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জায়গায় জায়গায় গড়ে উঠল অনেক আশ্রয়শিবির। আর্ত, বিধ্বস্ত মানুষের শিবিরগুলি পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সংশয়াচ্ছন্ন আর দ্বিধাগ্রস্ত মানুষ, নিজের বাসস্থান ছেড়ে চলে আসা অসহায় মানুষ। আহত আর নিহত মানুষের দুঃখে দুঃখিত পরিবারবর্গ। আর খুঁজে না পাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, কোথাও কোন সূত্র না খুঁজে পাওয়া আত্মীয় স্বজনদের জন্য সারা দিনরাত দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠায় ভরে থাকা বিভ্রান্ত পরিবার।

পাগলের মত হারাণ সবার কাছে দৌড়েছিল। রাখাল আর মায়া সকালবেলাতেই ডবকার দিকে গিয়েছে, এখনও আসেনি। রাখালের হাজিরার কাজ। মায়ার শরীরটা দু'দিন ধরে খারাপ। হাজিরার পয়সা থেকে একবার মায়াকে ডাক্তার দেখানোর কথা। মাত্র ছয় বছর আর দুই বছরের নাতি সুকুমার আর গৌতমকে নিয়ে হারাণ ছিল ঘরে। দৌড়াদৌড়ি, হাহাকার, চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে গ্রামের সবাই তাড়াতাড়ি করে নিজের পোঁটলা-পুটলি বেঁধে নিয়ে শহরের দিকে দৌড়েছিল, প্রাণপনে। হতভম্ব হারাণ প্রথমে কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। ছোট ছোট নাতি দুটিকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে সে ঘরের ভেতর বসে থাকা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তার মতো বুড়ো লোকের কে আর কী ক্ষতি করবে? অন্তত রাখাল-মায়ার না আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে। কিন্তু পরে যখন হিংস্র কোলাহল প্রচণ্ড তুফানের মত ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল আর মহিলা শিশুর আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠল, হারাণ আর দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকার কথা ভাবতে পারল না, তার বুড়ো শরীরটার জন্য না হলেও নাতি দুটোর জন্য। ইতিমধ্যে প্রাণের মায়ায় পলায়ন করা মানুষের সারি প্রায় ক্ষীণ হয়ে এসেছে। গৌতমকে কোলে নিয়ে আর সুকুমারকে আঙুলে ধরে হারাণ পথে বেরিয়ে পড়ল, যতটুকু সম্ভব।

উৎকণ্ঠিত হারাণ আশ্রয় শিবিরের প্রতিটি মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে বারবার একটাই প্রশ্ন করতে লাগল, 'আমার রাখাল কই? রাখালকে দেখেছ?' সঙ্গে বাচ্চাগুলির মা, মায়া নাতি

দৃটিতে দেখিয়ে দেখিয়ে হারাণ সবার কাছে যায়। প্রত্যেককে একই প্রশ্ন করে ক্যাম্পে আসা সরকারী অফিসার পুলিশ মিলিটারি প্রত্যেককেই রাখাল মায়ার নাম, বয়স আর অন্যান্য বিবরণ লিখে নেয়। তারপর আজ প্রায় দু'মাস পার হয়ে গেল। আর এক সপ্তাহ পরে এই আশ্রয় শিবিরগুলি সরকার বন্ধ করে দেবে। এই কয়দিনের মধ্যে হারাণ এই সমস্ত অঞ্চলের সমস্ত ক্যাম্পগুলিতেই গিয়েছে। কোথাও যদি কোনভাবে ওদের কোনরকম সূত্র পেয়ে যায়। ওদের না পেলে তার অবস্থা কী হবে? ভয়ে আর আশঙ্কায় হারাণ আরও শুকিয়ে যায়। শুধুমাত্র এই ছোট ছোট ছেলে দুটিকে সঙ্গে নিয়ে সে এখন কী করবে? একমাত্র উপার্জনক্ষম রাখালকে তার খুঁজে বার করতেই হবে, তাকে পেতেই হবে।

ঘটনার আভাস পেয়েই নদীর ওপারের বস্তির মধ্য দিয়ে ওরা দুজনেই দৌড় মেরেছিল, রাখাল আর মায়া। কিন্তু ওদের দৌড়াতে ইতিমধ্যে অনেক দেরী হয়ে গেছে। বিপরীত দিক থেকে দৌড়ে আসা মত্ত দলটার সামনেই ওরা পড়ে গিয়েছিল, ওদের সঙ্গে প্রাণ নিয়ে দৌড়ে পালানো অনেক লোকই পড়েছিল, ঠিক বস্তির মধ্যিখানটাতেই। সামনের ঘরটা দাউদাউ করে জ্বলছিল। ভাঁড়ারটার সামনেই থাকা শুকনো খড়ির বৃহৎ স্তূপটাতে আগুন লেগেছিল। খড়ির আগুনে ভীষণভাবে লাল হয়ে উঠেছিল সমস্ত ঘর, পাশের উঠোন। নদী দিয়ে ভেসে গিয়েছিল অনেক মৃতদেহ। আগুন থেকে ভেসে আসছিল মানুষ পোড়ার গন্ধ। অবোধ আশা, দুর্বল বিশ্বাস আর প্রবল সন্দেহ এর মধ্যে মিলে মিশে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে হারাণ।

চাঁদটাকে একটা প্রকাণ্ড কালো মেঘের টুকরো ধীরে ধীরে ঢেকে ফেলেছে। হঠাৎ ক্যাম্পের মধ্যে কিছু একটা নড়াচড়ার শব্দ শোনা গেল। বসে থাকা অবস্থাতেই হারাণ ক্যাম্পের দিকে তাকাল। নারায়ণ ঘুমের মধ্যে চমকে উঠে হঠাৎ চেঁচামেচি শুরু করেছে, 'বাবা আমাকে বাঁচাও, বাবা আমাকে বাঁচাও।' এই নারায়ণ তুলনমূলকভাবে তার চেয়ে সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা, হারাণ এখনও সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে নি, কারণ ক্যাম্পে আসা প্রতিটি লোকই নারায়ণকে সবচেয়ে বেশি দুর্ভাগা মনে করে। ফজলদের গ্রামের এক মাথায় যে কয়েকঘর মানুষ ছিল তার একেবারে পাশেই ছিল নারায়ণদের ঘর। ঠিক ভর দুপুরবেলা সে মাঠ থেকে আসছিল। ঠিক তখনই সেই চিৎকার, চেঁচামেচি আর হুলুস্থুল। নারায়ণদের দিকে তাড়া করে করে এসেছিল অন্য একটি গ্রামের মারাত্মক উন্মত্ত বর্বরেরা বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। নারায়ণ নিঃশ্বাস ফেলারও সময় পায়নি, কেবল ঘরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, 'পালাও পালাও।' নারায়ণের স্ত্রী, আর ছোট সাত বছরের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ওরা গ্রামের মাঝখানের দিকটিতে পালিয়েছিল। অবশেষে দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত নিরুপায় ওরা বছিরুদ্দিনের ঘরেই আশ্রয় নিয়েছিল। দৌড়ে এসে প্রথমেই সামনের কোঠাটিকে ঢুকে নারায়ণ ঝাঁপ মেরে ধানের ডুলিতে আশ্রয় নিয়েছিল আর সঙ্গে সঙ্গে বছিরুদ্দিনের স্ত্রী ডুলিটাকে আশ্চর্যভাবে ঢেকে রেখেছিল। কিন্তু সময়ের কী নিষ্ঠুর অভাব। নারায়ণের স্ত্রী আর মেয়ে কোনমতেই এসে ডুলিটাতে ঢোকার অবকাশ পেল না। উন্মত্ত দলটা ততক্ষণে ঘরে এসে ঢুকে পড়েছে। নারায়ণ স্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছিল তার স্ত্রীর চিৎকার আর ছোট মেয়েটির কাতর আর্তনাদ 'বাবা আমাকে বাঁচাও।' ডুলির ভেতরেই সে মূর্চ্ছা গিয়েছিল।

তারপর থেকে নারায়ণ প্রায়ই এভাবে চিৎকার করে ওঠে। পিতৃত্ব অথবা স্বামীর কর্তব্য পালন করতে না পারার হীনমন্যতা আর তাৎক্ষণিক আত্মরক্ষার স্বার্থপরতার মোহে জর্জরিত, নারায়ণ হয়তো বা নিজের বিবেকের দ্বারা দংশিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রায় পাগল হয়ে যাওয়া নারায়ণ আজও ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠেছে : 'বাবা আমাকে বাঁচাও, বাবা আমাকে বাঁচাও।

' কিন্তু তবুও হারাণ নারায়ণকে সৌভাগ্যবান বলেই মনে করে অন্তত তার থেকে তো বটেই। নারায়ণের দুঃখ করার মত একটা কারণ আছে, বিবেকের দংশনে ভোগার জন্য একটা অপরাধবোধ আছে। কত কষ্টে আর দুঃখে নারায়ণের স্ত্রী আব মেয়ে মরেছে তা সে বলতে পারে। কিন্তু হারাণ তো জানে না কী অদ্ভুত যন্ত্রণায় তার রাখাল বা মায়া মরেছে। বা কি কষ্টে তারা এখনও কোথাও বেঁচে রয়েছে। বিশ্বাস আব সংশয়ের মাঝামাঝি এখন হারাণ তার পুত্র এবং পুত্রবধূ আছে বলেও ভাবতে পারে না, নাই বলেও দুঃখ করতে পারে না। হারাণ নারায়ণকে সৌভাগ্যবান ভাবার অন্য একটি কারণ হল নারায়ণের সরকারী সাহায্য পাওয়ার সন্দেহাতীত নিশ্চয়তা। এখন পর্যন্ত ফিরে না আসা রাখাল বা মায়ার সম্ভাব্য মৃত্যুর সরকারী মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনাও হারাণের কাছে অনিশ্চিত হয়ে রয়েছে। অথচ তার ব্যবহারিক বাস্তবের জন্যই তো রাখাল মায়ার মৃত্যুর নিশ্চয়তা অথবা সরকারীভবে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এখন অনেক জরুরী, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেজনাই নারায়ণ হারাণের চোখে অধিক সৌভাগ্যবান, কম দুর্ভাগা, সব দিক থেকেই।

সরকারী সাহায্য পাবার মত, আহত বা নিহত কোন তালিকাতেই হারাণেব নাম স্বাভাবিকভাবেই নেই। সাহায্য কিছুদিনের মধ্যেই আসার কথা। নিহতদের পরিবার কম করেও এক থেকে আড়াই লক্ষ টাকা পাবে বলে ক্যাম্পে কানাঘুযো চলছে। এক সপ্তাহ পরেই লোকগুলি যে যার ঘরে চলে যাবে। আর প্রায় প্রত্যেকেই নিয়ে যাবে বিভিন্ন পরিমাণের মোটা অঙ্কের সরকারী সাহায্যের এক নিশ্চিত এবং সুনির্দিষ্ট আশ্বাস। কিন্তু হারাণ? সে কী নিয়ে যাবে? কী নিয়ে যাবার মত বাকী রয়ে গেল তার? মাত্র দুটো ছোট ছোট নাতি, এক নিশ্চিত নিরাপত্তহীন দারিদ্র্য আর পুত্র রাখাল, পুত্রবধূ মায়ার ফিরে না আসার নিরাশা। অথবা তাদের মৃতদেহ দুটো উদ্ধারে তার লাখ টাকা সাহায্য না পাওয়ার নিশ্চয়তা।

তবু ওরা নেই বলে হারাণ বিশ্বাস করতে চায় না। কে জানে কোনদিন হয়তো রাখাল এসে উপস্থিত হবে, হঠাৎ এসে উপস্থিত হবে ব্যাকুল মায়া বা একদিন তারা দু'জনেই এসে উপস্থিত হবে। এই কয়েকদিন সরকারী অফিসার, রাজনৈতিক নেতা আর অনেক সংগঠনের আশ্বাস আর সান্ত্বনার বাণী সে শুনেছে। প্রথম পর্যায়ে সকলেরই কাছে, সে যে-ই হোক না কেন হাউমাউ করে কেঁদেছিল। এখন আর সে কাঁদতে পারে না। প্রথম প্রথম ভয় আর অনিচ্ছায় এগিয়ে যেত থানা এবং হাসপাতালে পড়ে থাকা অসনাক্ত মৃতদেহগুলি দেখার জন্য, কে জানে হয়তো রাখালেরই লাশ এসেছে। কিন্তু পরে সেই সংবেদন শঙ্কা আর সঙ্কোচ অনেক পরিমাণে কমে গেছে। অবশেষে যখন সে স্পষ্ট করে বুঝতে পারল রাখাল বা মায়ার মৃতদেহ না পেলে সে তাদের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী সাহায্যের টাকাটাও হারাবে, তখন সে অধীর আগ্রহ আর আশায় পুলিশ বা সরকারী অফিসারের পথ চেয়ে বসে থাকত। যে কোন মানুষের মুখের দিকে উদ্বেগ ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত, কেউ যদি বলে কোথাও কারো একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে, বেওয়ারিশ লাশ। প্রথমে দূর থেকে, তারপর একেবারে সামনে গিয়ে উল্টে পাল্টে লাশগুলিকে দেখতে পারত সে। কিন্তু কোথাও কিছু হল না। সম্ভব আর অসম্ভবের মাঝখানে ঝুলে রইল সে। কিন্তু এখন, আজকের এই সত্যকে হারাণ ভালভাবেই বুঝতে পারল। এক সপ্তাহ পরে ক্যাম্পে শেষদিন, সরকারী রেশন আর আশ্রয়ের শেষ দিন। তারপর সবকিছুই আবার নিজের দায়িত্বে। সে অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল ক্যাম্পে শেষ পর্যন্ত সে থাকবে না। এই দুঃখের মধ্যেও নিশ্চিত আশ্বাসের অংশ লাভ করা মানুষদের সঙ্গে সে আর নিজেকে জড়াতে চায় না। এদের সঙ্গে তো তার মিল নেই। কিছুই না থাকা মধ্যেও ওদের কিছু একটা আছে, হারানোর মধ্য দিয়েও ওরা

কিছু একটা পেয়েছে, কিন্তু এই জর্জর বৃদ্ধ বয়েস আর মাত্র দুটি ছোট ছোট শিশুর বাইরে তার আর কী আছে, সে নিজেই একা যুদ্ধ কববে। বড নাতি সুকুমারের বযসেই সে বাবার আঙুল ধরে দেশ থেকে এসেছিল। এখন সে আবার তার নাতিকে নিয়ে যাবে, তাদের সদ্য-বিধ্বস্ত ঘরে, পুনরায় নতুন করে গড়ে তোলার জন্য। সেজন্যই সে কালকেই একা চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিল।

অবশেষে নিজের অজান্তেই হাতে একটা বড় পাত্র নিয়ে শহরের রাজপথে হারাণ দাঁড়িয়েছিল। তার কিছুদিন পরেই সামনের ডাকবাংলোতে নিহত মানুষের নামে তাদের নিকট আত্মীয়দের টাকা বিলানো হচ্ছিল। আহত মানুষদেরও মোটা অঙ্কের টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হচ্ছিল। রাজনৈতিক নেতা, জেলার উপায়ুক্ত, ব্যাঙ্কের অফিসার সবার উপস্থিতিতে ডাকবাংলোর সামনেটা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। একজন অফিসার নিহত আর আহতদের নামেব তালিকা পড়ে যাচ্ছিলেন। লোকগুলিকে চেক আর ফিকসড ডিপোজিটের কাগজ বিলানো হচ্ছিল। আহত লোকগুলি শুকিয়ে পড়া ঘা-গুলি দেখছিল সবাই। জিজ্ঞেস করছিল এখনও যন্ত্রণা আছে কি না। ছোট নাতি দুটিকে সঙ্গে নিয়ে হারাণ দূর থেকে দৃশ্যটা দেখছিল। কোথাও আঘাত বা ব্যথা না থাকা হাবাণ ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে পড়েছিল।

বাবা বা দাদুর কাছে হারাণ দেখেছে বাস্তুহারার উদ্বাস্তু জীবন কীভাবে গড়তে হয়, কীভাবে চারপাশে মৃত্যুর মাঝেও বেঁচে থাকা লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। সে-ও সেভাবেই বেঁচে থাকতে চাইছে। শুধু সুকুমার বা গৌতমের দিকে তাকিয়ে সে ভাবে, কতটুকু নিরাপদ এরা! মানুষকে হারাণের একটুও ভয় নেই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক মানুষেব সমষ্টিকে? সে যেন সবসময় মৃত্যুর ঘন্টাধ্বনি শুনতে থাকে, যখনই সে নাতিদের উজ্জ্বল কোমল মুখগুলির দিতে তাকাতে যায়।

নিশারী, যমুনা বা কপিলী এই সবগুলি নদীর ওপর দিয়ে অনেক জল বয়ে গেল। অনেক ধূলো আর তুফানের বাতাস-বৃষ্টি সমগ্র বিস্তীর্ণ অঞ্চলটিকেই ধুয়ে নিয়েছে। কয়েকবারই পরিষ্কার শুকনো চারপাশ হারাণের চোখের সামনেই উদ্ভাসিত হয়েছে। নিজের অজান্তেই অ্যালুমিনিয়ামের বড় বাটিটা তার হাতের মধ্যে চকচকে সাদা হয়ে গেল। ভাঙা পয়সার শব্দেই সে বুঝতে পারল সেটা আধুলি না সিকি। হোজাই র সিনেমা হলের সামনের ব্যসস্ট্যাণ্ডে বা চৌরাস্তার কোণে ছোট নাতি গৌতমের সঙ্গে বসে থাকা হারাণের সামনে দিয়েই অনেক সময় পার হয়ে গেল। সুকুমার হাইস্কুলে যেতে পারার মত হল। এখন রাখাল বা মায়া আসবে বলে সে আর ভাবে না। কেবল সবসময় তার এই নিঃস্ব অবস্থার কথা ভেবে ভেবে হারাণের নিজের উপরেই কেমন যেন করুণা হতে লাগল। বেঁচে থাকা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে, হারাণ এখন মরার মত অবস্থাতেও নেই।

ঝপাঝপ হঠাৎ দোকানঘরগুলির দরজা বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। একটা একটা করে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সবগুলিই বন্ধ হয়ে গেল। হারাণ ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারল না। দিনদুপুরে এ-সমস্ত কি হতে চলেছে? কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরটা জনশূন্য হয়ে পড়ার উপক্রম হল। দৌড়াদৌড়ির মধ্যেই কোন এক পুলিশের গাড়ি তাকে তুলে নিয়েছিল, দুটি পুলিশ প্রায় চ্যাংদোলা করে বুড়ো হারাণ আর ছোট নাতি গৌতমকে গাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

আবার একটা ক্যাম্প। এবারও হারাণের সেই একই উৎকণ্ঠা। একই তার সমস্যা। সুকুমার আসেনি। সে তো স্কুলের উদ্দেশ্যে সকালেই বেরিয়ে পর্ড়েছিল। স্কুল থেকে অনেক ছেলেকেই পুলিশের গাড়ি বাড়ি দিয়ে এসেছে। কিন্তু সুকুমার কোথাও নেই। একই জীবদ্দশায় এত কম সময়ের মধ্যে হারাণের পুনরায় একই জিজ্ঞাসা। এবার সুকুমার, সুকুমার কোথায়? হতভম্ব হারাণ একজন থেকে

অনেকজনকে, প্রত্যেককেই জিজ্ঞেস করল কিন্তু তার প্রশ্নের উত্তর সে কোথাও পেল না। নিশারীর জলে দুটো নীল ইউনিফর্মের মত শার্ট কেউ নাকি ভেসে থাকতে দেখেছে। কিন্তু সঠিক জবাব পাবে কোথায়? একটা সময়ে হারাণ একটা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হল। সুকুমারকে খুঁজে বেড়ানোর চেয়ে সে মানুষের খোঁজে যাবার সিদ্ধান্ত নিল, তার পরিচিত মানুষগুলোকে, আজ রাতের মধ্যে। সমস্ত অঞ্চলটিতে ছড়িয়ে পড়া উত্তেজনা আর বিভীষিকার মধ্যে হারাণকে কেউ বাইরে বেরোতে দিচ্ছিল না। কিন্তু ভোরবেলার আগে সে ক্যাম্প থেকে পালিয়ে গেল। মাঠের মধ্য দিয়ে অন্ধকারে অন্ধকারে সে গ্রামটার দিকে এগিয়ে চলল। কোলে গৌতম। রাতের অন্ধকারের নিজস্ব আলোতে সে সমস্ত মাঠ ঘাট আর আশেপাশের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামগুলির দিকে কাতরভাবে তাকাতে তাকাতে যেতে লাগল। এই পরিচিত মানুষগুলিকে সে আজ চিনতে পারবে না কি, না কি চারপাশের সমস্ত মানুষজনের কাছে আজ সে অপরিচিত হয়ে পড়বে। কেউ তাদের চিনতে পারবে না সুকুমার গৌতম বা তাকে তবুও মাঠের জল কাদা ভেঙে ভেঙে সে যেতে থাকল।

ফজরের নামাজ তখনও শেষ হয় নি। মসজিদ আর তার পাশের মাঠ জুড়ে মানুষগুলি একসঙ্গে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছিল। মসজিদের আজান দেবার মিনারটা এত উঁচু ছিল না। তার ঠিক বিপরীতে রাস্তাটার এপাশে গাছের গোড়ার পাশে হারাণ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল। মসজিদটার দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ঠিক তখনই নামাজ শেষ হল। কেউ কিছু বলার আগে প্রত্যেকেরই মনে হল রাস্তার এপাশটায় মিনারটার প্রায় মুখোমুখি করে গাছের গোড়ার পাশে কেউ একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবাই এগিয়ে এল। বসির সবার আগে। গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা হারাণ কাতরভাবে সবার দিকে তাকাল। সকালের আলো আঁধারিতে সে প্রায় সবাইকে চিনতে পারল আর বাকিরাও সবাই হারাণকে চিনতে পারল। হারাণ নিজের শরীরে হাত দিয়ে আর কোলের গৌতমকে দেখিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ওগো, তোমরা আমায় তাড়াও গো। মেরে তাড়াও।' তারপর দুটো হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে কাতরভাবে বলে উঠল, 'আর না হলে সুকুমারের লাশটা আমায় এনে দিও, অনেক কষ্টে আছি গো।'

সমস্ত পরিবেশটা কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বসির এসে হারাণের বাহুটা খামচে ধরল। প্রভাতের আলোর সঙ্গে সঙ্গে ওরা প্রত্যেকেই তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল সুকুমারের খোঁজে। নিশারীর নদীতে তখন দু কূল উপচে পড়া জল।

ধমনীতে সরীসৃপ

শৈলেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

ছেলেটির বয়স বড়জোর ছয় বা সাত বছর। নাক দিয়ে তার সিকনি গড়িয়ে পড়ছে। মুখে কোন রকম রক্তের চিহ্ন নেই। লির্কালিকে পা দুটি ঢোলের মত পেটটার ভার সইতে পারছে না। বারান্দা থেকে নেমে সে কোনরকমে উঠোনে পৌঁছেছিল মাত্র, দু'হাতে পেটটা খামচে ধরে ধপাস করে মাটিতে বসে পড়ল। তারপরই হড়হড় করে বমি করতে শুরু করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ঠা ত্যাগ। দৌড়ে এসে মা ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। দেখতে দেখতে চোখের পলকের মধ্যে পোষা কুকুরটা এসে চেটে চেটে বিষ্ঠাটা খেতে শুরু করে দিল, কেউ বাধা দেবার মত কোন সুযোগই পেল না।

গ্রামের নাম বগুইহাবি। এই গ্রামে কৃষি-ঋণ নেওয়া ক্ষেত্রগুলি আমি পরিদর্শন করতে এসেছিলাম। আমার পরিদর্শনের প্রতিবেদনের উপরেই লোকগুলির কৃষিঋণ পাওয়া নির্ভর করে। শহর থেকে বেশ দূরে এই গ্রাম। গ্রামে পৌঁছানোর শেষ এবং একমাত্র বাসটি থেকে নেমে আমি সন্ধে হওয়ার আগে আগে বশিষ্ঠ শর্মার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আজ আর ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কাল সকালবেলার বাসটিই একমাত্র ভরসা। তাছাড়া ক্ষেত্র পরিদর্শনের ব্যাপারটা তো রয়েছেই। বশিষ্ঠ শর্মার ঘরের বারান্দায় হাতলভাঙা একটা চেয়ারে আমি বসেছিলাম। দৃশ্যটা আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলাম। আমার রক্তের মধ্যে অনুভব করছিলাম একটা ভয়ঙ্কর ড্রাগনের আস্ফালনের কিলবিলানি। পেছন থেকে কেউ আসছে বলে মনে হতেই দেখি হাতে এক পেয়ালা চা আর প্লেটে চিড়ে-গুড় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে একটি নিস্তেজ যুবতী। ঐ পরিস্থিতিতেও সে স্বাভাবিকভাবেই দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটির চোখদুটি উজ্জ্বল ছিল সত্যি, সেখানে হয়তো অসংখ্য সবুজ স্বপ্নও ছিল। তবে কোন এক কারণে যেন সেই উজ্জ্বলতা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে, স্বপ্নগুলি মূর্চ্ছা গেছে—এরকমটাই মনে হল আমার। আমি আমার পেটে, রক্তে অনুভব করছিলাম শুধুমাত্র একটা সরীসৃপের অস্তিত্ব।

বেরিয়ে যাবার মত পথ কোনদিকে সে খুঁজে পাচ্ছে না। হৃদয়ের থেকে পেটে, পেট থেকে হৃদয়ে সে যেন দুরন্ত গতিতে আসা যাওয়া করছে, ধড়ফড় করছে।

'চা খান '

সামনে একটা কাঠের টেবিল ছিল। নড়বড়ে। সেখানে কাপ-প্লেট রেখে কথাগুলি বলে মেয়েটি চলে গেল। আমার মনে হল পেয়ালার গায়ে একটা চুল লেগে রয়েছে। পেটটা আমার গুলিয়ে উঠল। ক্ষুধা পেয়েছিল যদিও, মুহূর্তের মধ্যেই তা দূর হয়ে গেল। বমি করতে থাকা ছেলেটিকে ধরে মা ভেতরে নিয়ে গেল। চারপাশে আমি চোখ বুলিয়ে নিলাম। ছোট ছোট কয়েকটি ছন-বাঁশের ঘর ঘিরে রাখা প্রশস্ত উঠোনটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটি পাখি। অল্প দূরেই বেঁধে রাখা রয়েছে একটা খাসি।

একজন বয়স্কা মহিলা বেরিয়ে এলেন। ক্ষীণাঙ্গী মহিলাটির সামনের কয়েকটি দাঁত নেই। বয়সের চেয়েও তাকে যেন বেশি ক্লান্ত দেখাচ্ছে এমন মনে হল। 'কোন শহর থেকে কে এসেছে একটু দেখি তো।' বলেই তাড়াতাড়ি করে আমার দিকে এগিয়ে এলেন আর তার শিরা উপশিরা বের হয়ে পড়া হাতটা দিয়ে আমার দুই গাল ধরে কপালে টপ করে চুম্ খেয়ে ফোকলা মুখে ভাঙা ভাঙা স্বরে বললেন, 'বামুনের ছেলে বলে শুনলাম। আমরাও বামুন। ভালই হল। এই অঞ্চলে বামুনের সংখ্যা কম। গোটা জায়গাটাতেই মুসলমান আর মুসলমান।'

হঠাৎ আমার মহাভারতের একটা আখ্যান মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল বকরূপী ধর্ম জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করা একটা প্রশ্নের কথা। ঠিক তখনই বেরিয়ে এলেন বশিষ্ঠ শর্মা। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন- 'বাবা, কাপড় জামা ছেড়ে ধুতি পরে মুখ হাত ধোও। এক মুঠো সেদ্ধ ভাতই খাও।'

তিনি আমার পাশে এসেই বসলেন। তিনি ঘরের কর্তাব্যক্তি। বসেই তিনি একটা বিড়ি ধরালেন। গন্ধটা পুনরায় আমার ভেতরের সরীসৃপটাকে জাগিয়ে তুলল। চোখ গেল তার শিরা বের হওয়া পা দুটোর দিকে। তাতে একটা ঘা। বোধহয় দাদ। আমাকে নীরব দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ভাবছ বল।'

আমার রক্তে জন্তুটার কিলবিলানি। আমি বললাম, 'হবে মিঃ শর্মা। এখন বিকেল পাঁচটা হয়ে গেছে। পথে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়েছি। আমরা এখন তপসেরের ঘর থেকে ঘুরে আসি চলুন। তিনিও তো আমাদের কাছ থেকে ঋণ নিতে চেয়েছেন।'

'আমাকেও যেতে হবে নাকি?' সামান্য বিরক্তির আভাস শর্মার মুখে।

'চলুন। আমি তো বাড়ি চিনি না। তাছাড়া একসঙ্গে বসে আলোচনা করা যাবে।'

তিনি চুপ করে রইলেন। ঋণদাতাকে তিনি অসন্তুষ্ট করতে সাহস করলেন না। এমন সময়ে রান্নাঘর থেকে সেই মেয়েটির কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'গরম জল হয়ে গেছে বাবা।'

'আচ্ছা মা। বোপার সঙ্গে একজায়গায় যেতে হবে। ফিরে এসেই স্নান করব।' বশিষ্ঠ শর্মা মেয়েটিকে ডেকে বললেন।

আমি বাধা দিলাম। 'আপনার তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। গরম জল হয়েছে যখন স্নানটা সেরে নিন।' 'না বাবা, ফিরে এসেই স্নান করব। জানই তো। বামুন মানুষ। ক্রিয়াকর্ম নিয়ে থাকি।' ছোট ছেলেটির আবার বমি করার শব্দ ভেসে এল। 'শর্মা বাবু, ছেলেটির চিকিৎসার কী ব্যবস্থা করেছেন?' লোকটি দাঁড়িয়েছিলেন। আমার কথার উত্তরে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে তিনি বললেন,

'গতকাল থেকেই গ্রাম্য ঔষধপত্র দিয়েছি। অনেকদিন থেকেই অসুস্থ। কথাটা বলেই তিনি প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে আমাকে বললেন---'বাবা, তুমি একটু বসো। আমি ঘুরে আসছি। তপসেরের ঘরে যেতে হবে তো।'

পায়ের খা গুলিতে সজোরে চুলকোতে চুলকোতে তিনি ভেতরের দিকে চলে গেলেন। ছেলেটির অসুস্থতাকে তিনি খুব একটা গুরুত্বই দিলেন না -যেন গাছের পাতা একদিন হলদে হয়ে ঝরে পড়বেই তাতে আর চিন্তিত হওযার কি আছে। বারান্দার মাঝখানটায় আমি বসেছিলাম। কিছুটা দূরেই কাপড় মেলবার একটা তার। সেখানে মেলে দেওয়া হয়েছে দুটো ছেঁড়া মলিন কম্বল আর একটা লেপ - কয়েকটা ছেলেমেয়ে মিলে প্রায় টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেল। নেবার সময় একটা কম্বলের নিচের অংশটা সেই ছেলেটির বমিতে কিছুটা মাখামাখি হয়ে গেল। ছেলেরা জিনিসটা লক্ষ্য করল না।

'বাবা, মা দেখছি ভাতটা করেই ফেলেছে। একটু কিছু মুখে দিয়ে গেলেই ভাল হত না কি' - বলতে বলতে শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বশিষ্ঠ শর্মা ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। কাঁধের উপর সাত রাজ্যের নোংরা লাগা একটা এণ্ডির মলিন চাদর। তার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি মহিলাটিও বেরিয়ে এলেন। বামুনের ঘরে একমুঠো খেয়ে যাওয়াই ভাল নাকি' --বলেই তিনি আমার দিকে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আশাভরে তাকিয়ে রইলেন।

হায় হায় কিসে পেয়েছে। আমি তো আগেই বলেছি। তবু.... । প্রকাশ্যে কড়া ভাবে কিছু না বলে সন্তর্পণে বললাম, 'পথে খেয়ে এসেছি বলে এখন একদম খেতে ইচ্ছে করছে না মা।' তারপর দাঁড়িয়ে থাকা শর্মার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'শর্মাবাবু, চলুন আমরা তপসেরের বাড়ির দিকে এগিয়ে যাই। আপনি প্রস্তুত তো?'

'হ্যাঁ, প্রস্তুত। দেরি না করে আমরা বেরিয়ে এলাম। তপসের আলির বাড়ি পৌছতে সূর্য ডুবে গেল। উঠোনে পা রাখতেই আমার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। আমার বক্তেব নদীর সেই সাপটা তখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। আঁটোসাটো চেহারার একটি যুবতী পথের দিক থেকে একটা মুরগীকে তাড়িয়ে এনে বাড়ির গোয়ালে ঢোকাল। বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই সহযাত্রী শর্মা আমাকে বললেন, 'বাবা, কিছু মনে করো না। আমি আর যাচ্ছি না। তোমাকে বাড়িটা দেখিয়ে দিলাম। তুমি বসো গিয়ে। কথাবার্তা বল গিয়ে।' তারপর কিছু দূরের একটা দোকানের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে আমাকে বললেন- -'ঐ দোকানটা আমাব সম্পর্কিত ভাই শূলপানি শর্মার। তার দোকানেই আমি থাকব। তুমি আমাকে সেখানেই পাবে।'

'আপনি কী বলছেন শর্মা? একসঙ্গে এসেছি, আলাপ আলোচনা শেষ করে একসঙ্গেই ফিরে যাব।' আমি জোর দিয়ে বললাম। আমাকে তিনি অখুশি করতে চাইছিলেন না। অন্য কেউ হলে তিনি নিশ্চয় এভাবে আসতেন না। শর্মার কথা ভাবলাম। তাকে সংবেদনশীল বলব, না গোঁড়া বলব। শেষ পর্যন্ত তিনি আমার সঙ্গে তপসের আলির ঘরের মধ্যে এলেন।

'ইয়া আল্লা। বশিষ্ঠ দেখছি। না আসা মানুষ এল আজ। খোদার কী মেহেরবানী। কিন্তু অতিথি? এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে বুড়ো মানুষটি আমাদের দিকে তাকালেন। থুতনিতে সাদা পাকা দাড়ি। মুখটা একেবারে পরিপক্ক। তার হাতে একটি লণ্ঠন।

'আপনি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি ইকবাল আলি। তপসেরের আব্বাজান।' তখন তপসের বেরিয়ে এল। সফল তরুণ তপসের। আমাকে সে আগে থেকেই জানে। এখানে সেখানে আমাদেব বসতে দেবার পর পিতা পুত্র দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য ভেতরে গেলেন। আমরা নীরবে বসে রইলাম। চারপাশে চোখ বুলিয়ে

মনটা ভাল হয়ে গেল। বশিষ্ঠ শর্মার ঘরের সঙ্গে আলির ঘরের তুলনা করলাম। একটা নতুন ছবি ফুটে উঠল। তপসেরদের মাটির ঘরের মেঝে সুন্দর করে লেপে-পুঁছে রাখা হয়েছে। বেড়ার কোথাও মাকড়সার জাল নেই। অনেকদিন আগে আমি মিঃ হুসেইন নামে একজন মানুষের ঘরে গিয়েছিলাম। মানুষটি সম্পত্তিশালী ধনবান। কিন্তু বড় অপরিষ্কার। তপসেরদের আর্থিক অবস্থান বশিষ্ঠদের থেকে নিচে। তবুও কী সুন্দর তাদের ঘরের চারপাশ।

যাবতীয় কথাবার্তা শেষ হওয়ার আগে তখন মুরগীর পেছনে ধাওয়া করা যুবতীটিকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। মেয়েটি তরপসেরের বোন। হাতে তার দু-প্লেট ধোঁয়া উঠতে থাকা ভাঁপে সিদ্ধ পিঠে। মেয়েটির পেছন পেছন তাদের মা। ভদ্রমহিলার হাতে দু-পেয়ালা চা। পেয়ালা দুটি চকচক করছে। তেমনই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মহিলাটিও।

'আমার জন্যে কেন চা এনেছ?' হঠাৎ বশিষ্ঠ শর্মা শশব্যস্ত হয়ে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন। আমি অপ্রস্তুত হলাম।

'খান না।' তপসের বলে উঠল। এবার বশিষ্ঠ শর্মাকে রীতিমত বিরক্ত হতে দেখা গেল। তিনি কিছুটা কর্কশ স্বরেই বললেন—'আমাকে কেন জোর করছ তপসের। জানোই তো কাজকর্ম নিয়ে থাকি।'

জোর করা হল না। চায়ের পেয়ালাটা সন্তর্পণে মেয়েটি সরিয়ে নিল। ভেতর থেকে ধূপ-ধুনোর সুন্দর গন্ধ নাকে এসে লাগল। আমার রক্তের মধ্যে তখন সরীসৃপটার কিলবিলানি নেই। আমি ভাপের পিঠেতে একটা কামড় বসালাম।

শীতের কুয়াশা আর ক্রমশ নেমে আসা অন্ধকারের বুক ভেদ করে তপসেরের ঘর থেকে যখন ফিরে এলাম ততক্ষণে গ্রামটা একেবারে নিঝুম হয়ে পড়েছে। কোথাও যেন গাছের উপর অচিন পাখির কলকাকলি। এখানকার লোকগুলি সন্ধেবেলাতেই শুয়ে পড়ে। শর্মা বললেন, কোথাও কোথাও নাকি রাতের বেলা উগ্রপন্থী বেরোয়।

'উগ্রপন্থী?'.

শর্মা কিছুই বললেন না। কিছুক্ষণের জন্য তিনি নিজস্ব ভাবনায় ডুবে গেছেন। কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন, 'বরুয়া বাবা, মুসলমানের বাড়িতে আমি খাই না তো বলেছিই। ওরা ব্যাপারটা জানেও, তারপরও এভাবে জোর করার মানে কী? আমি জাতিতে বামুন।'

শর্মার প্রশ্নে ক্ষোভের আগুন। আমি বললাম, পরম্পরাগত ভাবে জনগণ সমাজে যে নিয়মনীতি মেনে আসছে তা একদিনে পরিবর্তিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু ....'

'পরিবর্তন করা মানে? তুমি পরিবর্তিত হবার কথা বলছ? তার মানে আমাদের তপসেরের ঘরে খেতে হবে? আমাদের গ্রামের বলীন নামের একটি ছেলে ম্লেচ্ছের মত যেখানে সেখানে খেয়ে বেড়ায়। শেষ পর্যন্ত একটা নীচকুলের সঙ্গে কি সব ফস্টিনষ্টি করেছে। জনগণ তাকে নাকে খৎ দিয়ে ছেড়েছে।'

শর্মার কথা শুনে আমি বললাম—'গ্রামের সমাজে এরকম ঘটনা ঘটবেই। নগরেই কোথাও কোথাও হচ্ছে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে। যতদিন পর্যন্ত সামাজিক পদ্ধতি মানুষের মনে চেতনার উন্মেষ ঘটাতে পারবে না....'

'চেতনা? কোন চেতনার কথা বলছ তুমি?' শর্মা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'তুমি কি বলতে চাইছ আমি বুঝতে পেরেছি। আমাদের ম্লেচ্ছদের হাতেও খেতে হবে, তাই তো?'

'আমি কিন্তু সেভাবে কিছু বলতে চাইছি না শর্মাবাবু। বলতে চাইছি বৈজ্ঞানিক চিন্তার কথাটা। আমাদের ওঠাবসা, থাকা খাওয়া সামাজিক আচার নীতি রক্ষা করা —সমস্ত কিছুতে বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রভাব পড়াটাই বাঞ্ছনীয় হবে। এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথাটাই ধরুন না। যে প্রকৃতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সে মুসলমানই হোক, আর বামুনই হোক—তার সঙ্গে মেলামেশা করায় বোধহয় কোনরকম আপত্তি থাকতে পারে না। নোংরা কাজ করা জমাদারও শুচি হতে পারে যদি....'

'রেখে দাও হে। তুমি তোমার সম্প্রদায়কেই নীচু করার বুদ্ধি করছ। চাকরি বাকরিতেও আজকাল আমাদের কোনরকম জায়গা নেই। দেখতেই পাচ্ছ। সে ক্ষেত্রে ...'

'শুনুন শর্মা। আপনি বলা শেষের কথাটির সত্যতা অস্বীকার করতে পারছি না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যারা চাকরি পায় নি বা চাকরি পাবার ক্ষেত্রে প্রকৃত মেধার বিচার না করে জাত-সম্প্রদায়ের বিচার করে তাদের কার্য নিশ্চয় নিন্দনীয়। কারণ একটা সম্প্রদায় বা জাতিই একটা দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। আবার অনুন্নত জাতি বা সম্প্রদায় বলে বছরের পর বছর ধরে একটা সম্প্রদায়ই সুবিধে ভোগ করবে সেটাও অন্যায়। বুঝতে পেরেছেন শর্মাবাবু। উপযুক্ত ব্যক্তিই দেশের কাজ করতে পারে। সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই তো ধনী-গরীব থাকে। পরিস্থিতি সাপেক্ষে সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সৎ এবং অসৎ ব্যক্তি থাকতে পারে। আর্থিক সাহায্যও দেওয়া উচিত অর্থনীতির ভিত্তিতে। তাই সাম্প্রদায়িকতার বিচার নির্লজ্জ কাণ্ড। কেন শঙ্কর গুরু তো মুসলমান শিষ্য চান্দসাঁইকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। মহাভারতেও রয়েছে বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে ব্রাহ্মণ কে বলে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, সৎ জনই ব্রাহ্মণ বলে। শর্মাবাবু, আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার, প্রথম শ্রেণীর চাকরিজীবী সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ গড়ার চেষ্টা করা হয়নি।'

চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শীতের ঘন কুয়াশা। বশিষ্ঠ শর্মা তন্ময় হয়ে আমার কথাগুলি শুনতে শুনতে আপনমনে যাচ্ছিলেন। অন্ধকারে সহযাত্রীর মুখটা দেখতে আমার অসুবিধে হল। আমার মনে হল—কথাগুলি তাকেও হয়ত ভাবিয়ে তুলেছে। না হলে এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজের ভাবনাতেই মগ্ন।

শর্মার ঘরের বারান্দায় পা রেখেছি, ঠিক তখনই ভেতর দিক থেকে ভেসে আসা একটা করুণ আর্তনাদে আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম। 'কি হয়েছে কণমাই।' বলে শর্মা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ভেতরে ঢুকে গেল। আমিও প্রায় একই গতিতে ঢুকে গিয়ে ঘরের দরজার সামনে পা রেখে দেখলাম—বমি আর বিষ্ঠা ত্যাগ করে কাতর হয়ে পড়া শিশুটিকে কোলে নিয়ে শিশুটির মা হাউমাউ করে কাঁদছে।

'কি হল শর্মা?'

আমি দৌড়ে শর্মার কাছে হাজির হলাম। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঠিক তখনই হাতে একটা প্রদীপ নিয়ে হুড়মুড় করে বুড়ি ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসে হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়লেন। নিজেকে সামলে নিয়ে দুহাতে পেটটা খামচে ধরে কাতরাতে শুরু করলেন।

'তোর কী হয়েছে মা?' শর্মা মাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন। বিস্ময়াভূত আমার দুচোখও তার উপরে। বুড়ি শ্বাস নিতে নিতে বললেন—'গ্যাস্ট্রিক। গ্যাস্ট্রিকে পেয়েছে আবার। বমি বমি লাগছে।'

ছেলের অবস্থা কাহিল। মায়ের নাকি সুরে কান্না। বুড়িও অর্ধচেতন। চার পাঁচটে খুদে উলঙ্গ ছেলেমেয়ে বুড়িকে ঘিরে ধরল। ওরা নাকি বুড়ির নাতি-নাতনি। আমার রক্তের মধ্যে সরীসৃপটি বারবার আস্ফালন করে আমার দেহ-মন বিব্রত করে তুলল। রাতে আমাদের কারো ঘুম হল না।

.দে। রইলাম। অঞ্চলটিতে বোধহয় অনেক মাইল জুড়েও ডাক্তার কবিরাজ কেউ নেই। ছেলেটিকে একটা জায়গায় শুইয়ে দেওয়া হল। সে কাহিল হয়ে পড়েছে। শর্মাও একটা জায়গায় বসে হাউমাউ করে কাঁদছে। বুড়িকেও ইতিমধ্যে একটা বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। মায়ের নাকিসুরে কান্না বেড়েই চলেছে। বাইরের কলাগাছটায় একটা পেঁচা ভয়জাগানো সুরে ডেকে চলেছে। আমি সে অবস্থায় উপায়হীন হয়ে মরণকেই শরণ জেনে শর্মাকে ডাকলাম – 'শর্মাবাবু।' কাঁদতে থাকা অবস্থাতেই মাথাটা আমার দিকে ঘুরিয়ে বললেন,– 'বল বরুয়া বাবা। দেখতেই পাচ্ছ আমাদের কপাল পোড়া।'

'একটু ধৈর্য্য ধরুন। বলুন তো সামনে কোথাও ডাক্তার কবিরাজ পাওয়া যায় কি না? এবার শর্মার শোক দ্বিগুণভাবে উথলে উঠল। পাবে না, বাবা পাবে না। এখানে কিছুই নেই। কিছুই নেই।' পুনরায় বিহ্বলভাবে মানুষটি মাথা নত করে বসে রইলেন। ফোঁপাতে থাকলেন।

রাত তখন প্রায় এগারোটা বাজে। আমার বুকে ব্যথা করতে লাগল। বারান্দার কাছে আমি বেরিয়ে এলাম। একটু দূরেই বাড়িগুলির দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। দেখি ঘরের ভেতর থেকে লণ্ঠনের আলো ছিটকে বাইরে আসছে। আশেপাশের দু-একটি গ্রামে যদিও বিদ্যুতের আলোর সুবিধে রয়েছে বঙ্গাইহাবিতে এখনও সেরকম কোন সুবিধে হয় নি। বেশিরভাগ লোককেই অন্ধকারে ডুবে থাকতে হয়। আমি লোকগুলির দিকে তাকিয়ে ভাবলাম বশিষ্ঠ শর্মার ঘরের কান্নাকাটি কি আশেপাশের লোকের কানে যাচ্ছে না? এতটা নীরব কেন তারা? কোথাও কোনরকম সাড়াশব্দ নেই। আমি একটা বাড়ির বারান্দা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম। দরজায় করাঘাত করলাম। বেরিয়ে এলেন একজন শীর্ণ দেহের দীর্ঘাবয়ব ব্যক্তি। মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কাকে চাই।

'আমি বশিষ্ঠ শর্মার ঘর থেকে এসেছি। তার বাড়িতে বড় বিপদ। ছেলেটির এখন তখন অবস্থা। এদিকে....'

'আমাদের কি করতে হবে। আমাদের যাওয়া-আসা নেই। জল অচল।' বলেই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। শীতের রাত। ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। আমার পরনের সোয়েটারটা সেই ঠাণ্ডা হাওয়াকে আটকাতে পারছিল না। আমি লোকটির আচরণে হতভম্ব হয়ে গেলাম। নীরবে বেরিয়ে এলাম। বাকি বাড়ি থেকেও একই উত্তর পেলাম। এক বাড়িতে একজন বললেন, 'বশিষ্ঠ আমাদের আত্মীয়। তবে কী আর বলব, কোন এক নীচ কুলের....বলেই তিনি মৌন হয়ে রইলেন। তারপরে আমাদের জল চলে না বলেই তিনি কর্কশভাবে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।'

রাত প্রায় বারোটা বেজেছিল। পেটে আমার ক্ষুধা। মনটা অস্থির হয়ে গেল। দুঃখিত মনে ফিরে এসে দেখলাম শোকসাগরে সাঁতরে বশিষ্ঠ শর্মা ছোট ঘরটির পাশে একটা তক্তপোষে আমার শোবার আয়োজন করছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'বাবা, তুমি কিছু একটা খেয়ে এখানেই শুয়ে পড়। আমাদের সঙ্গে উপোস দেওয়ার কোন দরকার নেই।'

আমি বললাম, 'শর্মা, আমার জন্যে ভাববেন না। এই বিপদের মধ্যে আপনি আর কি করতে পারেন?'

'হলেও বাবা, তুমি আমাদের অতিথি।' বিছানার পাশেই আমাকে একটা থালায় সিদ্ধ ভাত একমুঠো বেড়ে দিলেন। আমি বাঙ্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। পেটে ক্ষুধা থেকেও আজ আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। সে জায়গায় স্থান করে নিয়েছে সরীসৃপের তাণ্ডব। আমি বিছানায় নীরব হয়ে

পড়ে রইলাম। একটু একটু তন্দ্রার মত ভাব হল। কিছুক্ষণের জন্যে বোধহয় নীরব নিস্তব্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল সম্ভবত শেষ রাতে সবাই ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিল। দব থেকে কুকুরের ডাক কানে এসে পড়ল। সকাল হতে বোধহয় আর বেশি দেরী নেই। ভাবতে ভাবতে চোখটা কেবল বুজেছি। এমন সময় নারী কণ্ঠের হৃদয় ভাঙা করুণ আর্তনাদ আমাকে উঠতে বাধ্য করল। উঠে এসে দেখি নিথর হয়ে যাওয়া শিশুটিকে জড়িয়ে ধরে মা চিৎকার করছে 'চলে গেল, আমার সোনামণি চলে গেল।' যে যেখানে ছিল সবাই দৌড়ে এসে উপস্থিত হল। বুড়ি উঠতে পারলেন না। মাথা ঘোরায় আবার শুয়ে পড়লেন।

মৃতদেহটা পাশে রেখে পুনরায় কান্নার বিলাপ। আমার অসহ্য বোধ হতে লাগল। বেরিয়ে এলাম। মনের মধ্যে আমার আগুন জ্বলছে, রক্তে সর্বাঙ্গে কিলবিলানি। পূব দিক ফরসা হয়ে এল। পথে বেরিয়ে এসে কাউকে দেখা যায় নাকি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম বিপরীত দিক থেকে তপসের আসছে। চোখে চোখ পড়ায় সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার এত সকালে যে। গত রাতে কোথায় ছিলেন?'

'বশিষ্ঠ শর্মার ঘরে। তবে একটা বড় ঘটনা ঘটে গেছে রে তপসের। শর্মার ছেলেটা মারা গেছে।'

'কি বললেন স্যার? একমাত্র ছেলে। ইশ্ বেচারা। বলে সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপরে কীভাবে কী হল সে সম্পর্কে আমার থেকে বিস্তারিত জেনে নিল। আমি যখন গতরাতের ঘটনাটা তার কাছে বর্ণনা করলাম তপসের বলল- 'কী বলব স্যার। দেড় বছর আগে বশিষ্ঠের এক মেয়ে বিহামপুরের দিকের একটা কৈবর্ত ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেল। মেয়েটির নাম আইমানু। ছেলেটির নাম ধনীরাম দাস। বশিষ্ঠকে তাই তার আত্মীয় স্বজনরা একঘরে করেছে। গ্রামের একই কুলের অন্যদের কথা বাদই দিলাম। ধনীরাম লোকটি খুব একটা সাধের ছিল না। তবে জানেন কী স্যার, আমাদের দলের যুবকরা কিন্তু বশিষ্ঠের এই ভাবে একঘরে হয়ে থাকাটাকে সমর্থন করে না।

'আমাদের দলের মানে?'

'মানে স্যার, আজকের গ্রামগুলির কলুষিত রূপ দেখে আমরা আশেপাশের গ্রামের কয়েকজন যুবক ছেলে একত্রিত হয়ে একটা নতুন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। স্বেচ্ছাসেবী একটা দল গঠন করে জাতপাতের ভেদাভেদ দূরে সরিয়ে রেখে মানুষের সেবা করার কথা ভাবছি। সেই যে বলীন। সে ভালোবেসে নীচ কুলের একটা মেয়েকে না হয় নিয়েই এল, তা বলে তাকে একঘরে করা হবে স্যার? বলীন বড় উস্তাদ কারিগর। তার সেই দক্ষতাটা তো অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই স্যার, আমরা তাদেরকেও রক্ষণাবেক্ষণ করার চেষ্টা করছি।'

'তোমরা এ কাজে বাধার সম্মুখীন হও নি?'

চার পাশ থেকেই বাধা আসছে স্যার। এ সমস্ত কাজের জন্যে গ্রামের মাতব্বর বুড়োদের কাছ থেকে বাধা তো আসছেই। এদিকে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে হাতে বন্দুক তুলে নেওয়া আমাদের গ্রামের যুবক যুবতীরাও তাদেরকে সমর্থন না করার জন্যে আমাদের হুঙ্কার দিচ্ছে। গ্রামের যুবক যুবতীরা আজকাল ক্যাসেটের হুল্লোড়মুখর গান শুনে। পিধানামী হয়, মেয়েরাও জিনস পরে। লোক সঙ্গীত বিহুসঙ্গীত বিয়ানাম হারিয়ে যাচ্ছে। গ্রামে কড় কেউ ভিডিও ক্যাসেট এনে ব্যবসাও শুরু করেছে। সে সমস্ত ছাব সপারবারে উপভোগ করার মত ধৃষ্টতা আমাদের নেই স্যার। রূপান্তর অনমীনার্গ পর অন্ধ অনুসরণ অপসংস্কৃতি ..'

'তপসের, পৃথিবীটা অনেক ছোট হয়ে গেছে, বুঝেছ। দূরদর্শন মানুষকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। পশ্চিমী সংস্কৃতির ঢেউ যুবক যুবতীদের চঞ্চল করে তুলেছে। আমি তোমার কারণ বুঝতে পেরেছি।'

কথাটা বলে আমি তপসেরের মুখের দিকে তাকালাম। পূর্ব আকাশে লাল আলো ছড়িয়ে দিয়ে সূয মিষ্টি হাসছে। পুব আকাশের সেই আলোর আভা যেন তপসের নামের এই যুবক ছেলেটির প্রশস্ত হৃদয ভেদ করে তার সমগ্র মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে।

'স্যার, গতকাল বোধহয় আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়নি। চলুন স্যার। ওই দোকানটির দিকে যাই। মুখ হাত ধুয়ে চায়ের সঙ্গে কিছু একটা খেয়ে নিন। দোকানটা আমাদেরই। আমার কাকাব, মানে রহিমচাচার দোকান।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু তপসের, এই মুহূর্তে আমার বশিষ্ঠ শর্মার কথা ভেবেই খুব দুঃখ হচ্ছে।'

'আপনি আসুন, চা-টা আগে খেয়ে নিন। তারপরে আমি তার ব্যবস্থা করছি।' রহিম চা আর কেক এগিয়ে দিল। আমরা দুজনেই তৃপ্তি করে খেলাম। তপসের আমাকে বলল, 'আপনি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমি বশিষ্ঠ শর্মার ঘরের সমস্যাটা সমাধানের জন্যে কয়েকটি যুবক ছেলেকে ডেকে আনি।' একটা সাইকেলে করে সে সামনের গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। আমি বসে রইলাম। বশিষ্ঠ শর্মাই বা আমার সম্পর্কে কী ভেবেছে। হয়তো খোঁজাখুঁজি করছে। কে জানে হয়তো বা দুঃখে মূক আর মৌন হয়ে রয়েছে।

একঘন্টার মধ্যেই তপসের ফিরে এল। তার সঙ্গে এসেছে পাঁচজন কোমল মুখাবয়বের তরুণ। তাদের চোখগুলিতে যেন আশা নিরাশার অন্ধকার আর আলোর লুকোচুরি। তপসের আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। এই হল সুবীর রায়, এ হল ইরসাদ হুসেইন, এই হল রণজিৎ সিং আর....' আমি দেখলাম অসমীয়া, বাঙালী, হিন্দু, মুসলমান সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে তাদের এই দল, যে দল কেবল মানুষের মনুষ্যত্বের পূজা করতে চায়। তাদের প্রাণ যেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তপসের আমার কানে কানে বলল, 'আমি পরে যাব স্যার। এদের নিয়ে আপনি শর্মার ঘরে যান। একটা কথা। শর্মাকে জাতপাত সম্পর্কে খুলে কিছু বলবেন না। এদেরকে শর্মা চেনে না।'

বশিষ্ঠ শর্মার বাড়িতে পৌছে দেখি শর্মা একা একা বাঁশ কাটছে। একটা ধাড়িও যোগাড় করে নিয়েছে।

'শর্মা।' আমি ডাকলাম। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। আমার মনে হল চোখদুটি লাল হয়ে উঠেছে। সারা রাত জেগে থাকার চিহ্ন। 'তুমি এত বেলা পর্যন্ত কোথায় ছিলে বাবা।' বলেই তিনি যুবক কয়জনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কে?' 'এরা বিহামপুরের দিকের ছেলে। ধরে নিন আমাদের কার্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছেলে। আপনার সেবা করার জন্য এসেছে।' আমি উত্তর দিলাম।

ছেলেগুলি নমস্কার জানাল। তারপরে যে যার নিজের কাজে লেগে গেল। শর্মা আমাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেল। আমার কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, 'এদের মধ্যে বিজাতীয়' অর্থাৎ আমাদের বিপরীত সম্প্রদায়ের কোন সভ্য নেই তো?'

'না না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। অপ্রীতিকর একটা পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার ভয়ে আমি মিথ্যে কথা বললাম।

ইরসাদের সঙ্গে তপসেরের একজন আত্মীয় আমীর হুসেইন দলে ছিলেন। আমার মনে হল বশিষ্ঠ শর্মারা নিজেদের সংকীর্ণতার মধ্যে বন্দী করে রেখেছে। সেই সংকীর্ণতা যে পৃথিবীর গতির তুলনায় কত তুচ্ছ তা তারা নিজেরাই জানে না।

দূরের শিমুলতলা শ্মশানে মৃত ছেলেটির অগ্নিসংস্কার হয়ে গেল। মাটিতে বিলীন হয়ে গেল ভবিষ্যতের একজন পুরুষ। আগুন আর মাটি ছোটবড় বিচার করে না। প্রত্যেককেই আশ্রয় দেয়। শ্মশান থেকে বাইরে এসে দেখি কিছুটা দূরে সহজেই চোখে পড়ার মত একটা জায়গায় তপসেব অপেক্ষা করছে। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখি তার মুখে দুই ধরণের অভিব্যক্তির সমাহার। একদিকে বশিষ্ঠকে সাহায্য করার আনন্দ, অন্যদিকে কী এক দুঃখের কালো ছায়া।

'স্যার, কাজ হয়ে গেছে তো?'

'হয়ে গেছে। তোমাদের শুভেচ্ছা সাহায্য করেছে।' উত্তর দিয়ে আমি তপসেরের মুখের দিকে তাকালাম। তার হৃদয় জুড়ে একটা নীলাকাশ।

বিকেলের দিকে বশিষ্ঠ শর্মার পরিবারের দুঃখে নিজেকে একাত্মীয়ভাবে বেঁধে আমি বিদায় নিলাম। পুনরায় আবার কান্নার রোল উঠল। বেরিয়ে এসে আমি তপসেরের সঙ্গ ধরলাম। আমি বিদায় নিতে গেলে সে বলল, ' স্যার আমাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে এখন বাস চলে না। সকালবেলাতে যাবেন। বাস ধরতে গেলে আপনাকে পাঁচমাইল পথ অতিক্রম করতে হবে।'

'যেতে তো হবেই।' আমি বললাম। তপসের এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'আমি আমার সাইকেলটা দিয়ে দিচ্ছি। পথের মোড়ে আমার আত্মীয় হাবিব আলির দোকান। সেখানে রেখে ট্রাঙ্ক রোডের বাসে উঠবেন স্যার। আমার কথা বলবেন। আমি পরে গিয়ে সাইকেলটা নিয়ে আসব।'

সাইকেল নিয়ে আমি বেরুনোর জন্য প্রস্তুত হলাম। আমাকে কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্যে তপসেরের দলটিও বেরোল। ইরসাদ, রঞ্জিৎ, সুধীর এবং সঙ্গের অনেকজন। সঙ্গে তপসের। পথের পাশের বাঁশগাছগুলির দিকেও চোখ গেল। সেই জায়গাটিতে বাঁদর-বাঁদরীর দল। মা-রা কোলে বাচ্চা নিয়ে নিরাপত্তা প্রদান করছে। দু একটা উঁকুন বাছায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওদের সমাজটা শান্তিময় মনে হল। কে শ্রেষ্ঠ? বাঁদর না বিবেকবান মানুষ। মানুষ না বাঁদর--আমি আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম। পেছন থেকে কেউ আসছে বলে মনে হল। বেল বাজিয়ে দূরন্ত গতিতে সাইকেল চালিয়ে কোন যুবক আসছে। সে চিৎকার করছে- আব্বাজান, আব্বাজান!'

ইরসাদের সঙ্গে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়লাম। আগন্তুক ইরসাদের ছেলে।

'সবির দেখছি, কী হয়েছে?' ইরসাদ জিজ্ঞেস করল। প্রায় লাফ মেরে সে সাইকেল থেকে নামল। হাঁফাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল--আব্বাজান, তোদের ঘরের পেছন দিকের ডোবাটায় একটা মৃতদেহ ভেসে উঠেছে। দু ঘন্টা আগে একটা লোক দেখতে পেয়ে সবাইকে খবর দিয়েছে। মৃতদেহটি নাকি ধনীরামের। বশিষ্ঠ শর্মার যুবতী মেয়ে আইমানুকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া ধনীরাম দাসের মৃতদেহ। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতেই আগন্তুক বলল, মৃতদেহের জামার পকেটে--পলিথিনের প্যাকেটে মুড়ে রাখা একটা কাগজ পাওয়া গেছে। তাতে লেখা আছে বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি।

তার মানে, আইমানুর বা....'

হতচকিত হলাম। মরণ যেন এখন বড় সহজলভ্য। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মত যেখানে সেখানে ওৎ পেতে থাকে। মানুষ কখন কী রূপ ধরে বলা মুশকিল। জন্তুদের মধ্যে হিংসা এক জন্মগত প্রবৃত্তি। এক প্রাকৃতিক অভিযোজনা। কিন্তু বিবেকবান মানুষের মধ্যে মানুষ যেন কৃত্রিম রূপে মরণের জাল দিয়ে ঘেরা।

আমার রক্তের মধ্যে পুনরায় সরীসৃপটার আস্ফালন। একই আস্ফালন যেন নাড়িয়ে দিয়েছে ইবশাদ ওপেসেরের দলটিতেও। আমার ফিরে যাওয়া হল না। সাইকেল ঘুরিয়ে আমিও ইবসাদের সহযাত্রী হলাম। তাদের গ্রাম বিহামপুরের অভিমুখে।

জন্মদিন

সৌরভ কুমার সলিহা

কাগজে লিখেছে যে আজ এক রাজ্যের এক মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর ষাট বছরের জন্মদিন। সেই উপলক্ষে সরকারী কর্মচারীদের অতিরিক্ত আড়াই শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করা হয়েছে আর সরকারী অফিসগুলিতে আধা দিনের ছুটি দেওয়া হয়েছে। রাজধানীর প্রধান রাজপথগুলি শাসক পার্টির পতাকা আর মহিলার প্রতিকৃতি দ্বারা সাজানো হয়েছে। সন্ধেবেলা সেই জায়গাগুলি রঙবেরঙের লাইট দিয়ে আলোকিত করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে একটা জমকালো প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। প্রায় দুই হাজার ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, বিভিন্ন মন্ত্রী, বেশ কয়েকজন সাংসদ আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, নামকরা চিত্রতারকা আর খেলোয়াড়, মাফিয়া ডন, আর ডিকস জকি ইত্যাদি খবরের কাগজের মতে কাজটাতে কম করেও দুই কোটি টাকা খরচ হবে। ষাট বছরপূর্তির জন্মদিন বলে 'মেরিডিয়েন' গ্রুপের বিখ্যাত সুইস 'শেফ' প্রস্তুত করবে ষাট কিলোগ্রাম ওজনের এক বৃহদাকার বার্থ ডে কেক..

এই মহিলাটির বিভিন্ন স্ক্যাম, বিলাসবহুল জীবনধারণ আর দুই হাতে জনগণের টাকা খরচ করার খোলাখুলি প্রবণতার কথা প্রত্যেকেই জানে, খবরটা পড়ে খুব একটা অবাক হলাম না। অবাক হলাম এই কথাটি মনে পড়ে যাওয়ায় যে আজ দেখছি আমারও জন্মদিন। কি যে এক সমাপতন, একটা যুগপৎ ঘটনা, যাকে ইংরেজীতে বলে Coincidence।

ভদ্রমহিলা থেকে আমার বয়স প্রায় দশ বছর বেশি হবে, কিন্তু অবশ্যই, আমার ক্ষেত্রে কোন সত্তর কিলোগ্রাম ওজনের কেক এর প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু কেউ যদি দিনটা স্মরণ করে, অন্তরের অন্তঃস্থলে আমিও কি খুশি হব না? কিন্তু তার সম্ভাবনা কতটুকু?

আমার জন্মদিনের কথা অবশ্য আমার নিজেরই মনে থাকে না, অন্যের তো দূরের কথা। বস্তুত আমি এবং স্ত্রীও বোধহয় চট করে বলতে পারব না, আমাদের পরস্পরের জন্মদিন কবে কবে।

আমাদের গ্রামের বাড়িতে এভাবে জন্মদিন পালন করার কোন পরম্পরা ছিল না, যদিও ছোটবেলায় দুই একবার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে, পিকনিকে যাওয়া হয়েছে, ফটো তোলা হয়েছে। শহরে আসার পরে দেখাদেখি আমরাও আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্মদিন পালন করেছি, আশেপাশের ছেলেমেয়েদের ডেকে এনে আনন্দ-ফূর্তি করেছি—তারপর ধীরে ধীরে সেগুলি বন্ধ হয়ে গেছে, ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেছে, তারপর বিয়ে-থা করে চাকরির জের সামলাতে বিদেশ চলে গেছে (ছেলে দুটি ইঞ্জিনিয়ার আর ডাক্তার, দুজনেই এখন আমেরিকায়, মেয়েটি কম্পিউটার বিজ্ঞানী জামাইর সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায়)। আমি নিজেই বিয়ে করেছি বেশ বয়স হবার পর। রীতা কোন ধরণের আড়ম্বর না থাকা ঘরের মেয়ে, কোন ধরণের বিলাসিতা নেই, পরস্পরের জন্মদিনের কথা তো দূর, বিবাহবার্ষিকীর দিনটির কথাও আমাদের কারো মনে থাকে না—কোন বছরে রীতার হয়তো হঠাৎ মনে পড়ে, তখন কিছুটা অপ্রস্তুতভাবে কিছুটা লজ্জার সঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে একটা উদযাপন করি, ততটুকুই। তার বাইরে একটা দিন অন্য একটা দিনের মতই, সমস্যা এবং শূন্যতায় ভরা দৈনন্দিনতার আবর্তে অলক্ষিত, উপেক্ষিত হয়ে পার হয়ে যায় জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, নববর্ষ--হয়তো সাময়িক দুই একটা ব্যতিক্রমের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে প্রাত্যহিকতা বাজার-টাজার, বিদ্যুতের সমস্যা, জলের পাম্প বন্ধ হয়ে যাওয়া, ফ্রীজের একটা তার ইঁদুরে কেটে দিয়েছে, বৃষ্টির ফলে পেছনের বারান্দায় জল জমেছে, গ্যাস শেষ হয়ে গেছে, টেলিফোন বিকল, মিউনিসিপাল ট্যাক্স, হঠাৎ একদিন 'বন্ধ', কারো বিয়ে, কারো মঙ্গলাচরণ, কেউ মারা গেছে, সর্দি জ্বর, ডায়াবেটিস, মাথাব্যথা, ভাইরাল ফিভার—কিন্তু তবুও দেখছি সময় কাটে না, একবার পায়চারি করি, একবার আরাম চেয়ারে লম্বা হয়ে শুই, আড়মোড়া ভাঙি, খবরের কাগজটা পড়ি, তারপরে খবরেব কাগজের ক্রসওয়ার্ডটা করি, ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাই—পড়ার ইচ্ছে ছিল বিজ্ঞান, কিন্তু আই.এস.সি-তে খারাপ ফল হওয়ায় বিজ্ঞানে সিট পেলাম না, পড়লাম অর্থনীতি। কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয়ে এখনও কৌতূহল রয়েছে। মাঝে মধ্যে বিজ্ঞানের দু-একটা বই পড়ি (গেমো, আসিমোভ ইত্যাদি), কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী পড়তেও ভালোবাসি (এইচ.জি.ওয়েলস, জুল ভার্ন, আর্থার সি.ক্লার্ক ...), একটা আলাদা জগতে যেন প্রবেশ করি, একঘেয়ে নিরানন্দ সময় যেন বিচিত্র ধরণের সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়ে ওঠে.....আঃ 'সম্ভাবনা', অ-সম্ভাবনা' র কথাও পড়ে আবিষ্ট হই, ঠিক বুঝি না, কিন্তু নিজের মনোজগতেই যেন নানারকমের সম্ভাবনার উন্মেষ এসে পড়ে— 'সম্ভাবনা' কথাটা আজ আর একটা ধোঁয়াশা, বিমূর্ত জিনিস নয়। গণিতজ্ঞরা সম্ভাবনার ধারণাটা দিয়ে নাকি একটা প্রণালীবদ্ধ বিজ্ঞানই নির্মাণ করে ফেলেছে, হতে পারে—না হতে পারে ধরণের অস্পষ্ট অনির্ণেয়তা নয়, কোন ঘটনাটা হতে পারে বা পারে না তার সম্ভাবনা এখন সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায়—অবশ্য আমি শুধু তার ছোট ছোট দু'টি উদাহরণ বুঝতে পেরেছি, যেমন, একটা টাকা যদি উপরের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয় (টস করা হয়) সেটা মাটিতে পড়লে দুটো জিনিস দেখাতে পারে, এপিঠ বা ও পিঠ (হেড বা টেল), অর্থাৎ হেড পড়ার সম্ভাবনা হল দুটোর একটা, অর্থাৎ ১/২, সেভাবে টেল পড়ার সম্ভাবনাও হল ১/২, যাকে বলা হয় ফিফটি ফিফটি চান্স। একই ভাবে ৫২পাতার তাসের একটা বাণ্ডিল থেকে যদি কোন একটা তাস টেনে নিই, তাহলে হাতে আসা তাসটিব ৫২টি সম্ভাবনা আছে, হাতের তাসটির জন্য তারই একটা মাত্র, অর্থাৎ তাসটা হরতনের ছয় (বা ইস্কাপনের গোলাম বা অন্য কোন) হওয়ার সম্ভাবনা হল ১/৫২, আর হরতনেব ছয় না পাওযারও সম্ভাবনা হল ৫১/৫২। কেননা, 'হরতনের ছয় নয়'--সে'ধরণের তাস ৫১টা..ইত্যাদি। মোটকথায় পাওয়া না পাওয়া' বা 'হওযা না হওয়া' দুটো সম্ভাবনার ভগ্নাংশ দুটো মিলে হবে ১ (যাকে বলা হয় নিশ্চয়তা আমার এবং মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন

মিলে যাবার সম্ভাবনা কতটুকু নিশ্চয় সেটাও একটা সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা যায়. ..। এভাবেই অলস অসংলগ্ন চিন্তার সময় পার হয়ে যায়—দুই একজন অভ্যাগত অবশ্য মাঝে মধ্যে আসে, অন্য নিজের মানুষ খুব একটা আসে না, আত্মীয় স্বজন বলতে আজ আর তেমন বেশি কেউ নেই, থাকেও দূরে দূরে, বয়স্করা বেশিরভাগই মারা গেছেন, নতুন প্রজন্মের খুব একটা বেশি আসা-যাওয়া নেই, বয়স্কদের মধ্যে বাকি রয়েছি আমি আর যোগেশ কাকা আর মাইকণ মাসি (মেসো কিছুদিন আগে মারা গেছেন)। মাইকণ মাসিকেও অনেকদিন ধরে দেখিনা—বয়স বা কত হয়েছে—এখন কয়েকদিন হয় গোলাঘাট থেকে এসেছে রীতার ভাইয়ের মেয়ে রুণুমি, এবার ম্যাট্রিক দিয়েছে, রেজাল্ট বেরোয় নি, ঘরটার শূন্যতা কিছুটা ভরেছে, ঘরের আবহাওয়ায় নতুন ধরণের শব্দ ধ্বনিত হয়েছে, রুণুমি পিসিকে এটা ওটা ঘরোয়া কাজে সহায়তা করে দেয়, দুজনে মিলে শৌখিন বাজার করে, কারো কারো বাড়িতে বেড়াতে যায়, নতুন ক্যাসেট এনে শোনে, আমি তাকে পাশে বসিয়ে জিজ্ঞেস করি, কিসে কিসে লেটার পেতে পারে (ফার্স্ট ডিভিশন তো পাবেই), স্টার মার্ক পাবে কি না, এখন কী পড়বে .....

কাগজটা ফেলে দিয়ে ভাবছি এখন কোথায় যাব, তখনই দেখি রীতা রুণুমির দুই কাঁধে হাত রেখে পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে, মুখে একটা স্মিত হাসি, রুণুমিকে দেখে ধারণা হল যেন এইমাত্র স্নান করে ভেজা চুল মেলে এসেছে, কি ব্যাপার বলে জিজ্ঞাসু মুখে চাইতেই রুণুমি নিচের দিকে ঝুঁকে চট করে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

'আরে রুণুমি, কি হল?'

'না, একটুখানি লাজুক হেসে রুণুমি বলল, 'আজ আমার জন্মদিন।'

'ও, আজ বুঝি তোর জন্মদিন।' একেবারে অবাক হয়ে গেলাম, যুগপৎ তিনটে জন্মদিন! 'বাঃ বাঃ ভাল কথা—মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস—বেশ বেশ— এ কত নম্বর জন্মদিন হে (সতেরো পার হয়ে আঠারোতে পা রেখেছে—রীতা বলল) এ তাই নাকি, বেশ বেশ—ইশ্, কালকেই বললি না কেন, আজ কিছু একটা আয়োজন করা....'

'সেটাই তো বলতে চাইছি। রীতা বলল, তোমাকে এখন একবার বেরোতে হবে। রুণুমিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, এই যে আমি এই লিস্টটা করেছি— সালোয়ার কামিজের কাপড় পাঁচ মিটার, ও-ই পছন্দ করুক, ভবানী স্টোর্সেই পেয়ে যাবে, আর একটা লেডি ডায়না সেন্ট, সিটি বেকারি থেকে আইসিং দেওয়া একটা ভাল বার্থ ডে কেক, হ্যাঁ, চকলেট আর বেলুনও লাগবে, রিংকু— বাবলিদেরও ডাকব তো (প্রতিবেশীর ছেলেমেয়ে), মুর্গীও লাগছিল —না, লাগবে না, বসুন্ধরা কেবিন থেকে চিকেন কারিই নিয়ে এসো, টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে যাও—হ্যাঁ, আর মিষ্টির মধ্যে—'

আমার জন্মদিনের কথা রীতা উল্লেখই করল না। নিশ্চয় মনে পড়ে নি।

রুণুমির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করলাম—ভবানী ষ্টোর্সে তার পছন্দের কাপড় পাওয়া গেল না, মডার্ন ক্লথ হাউসে যেতে হল—মাঝখানে আবার মাইকণ মাসির কথা মনে পড়ল, মনে মনে ভাবলাম, বিকেলে রুণুমির জন্মদিনে মাসিকেও ডাকব নাকি? কিন্তু মাসির বয়স হয়েছে, কয়েকবছর আগে বুকে একটা পেসমেকারও বসিয়েছেন, ঘুরে বেড়াতে কষ্ট হয়, এতো দূর থেকে আসতে গিয়ে কষ্ট হবে, ছেলেরা গাড়িতে করে না নিয়ে গেলে কোথাও যান না—আর ডাকলে তো ছেলে ছেলের বৌকেও ডাকতে হবে, রীতার পক্ষে পুরোটা সামলানো সম্ভব হবে কি না—আচ্ছা, ঘরে গিয়ে রীতার সঙ্গে আলোচনা করে দেখব....অনেকদিন আগে। মাইকণ মাসিই আমার জন্মদিনের আয়োজন করেছিলেন,

আজ আর আমার জন্মদিনের তারিখটা মাসির মনে আছে কি? তার সম্ভাবনাই বা কতটুকু? নিশ্চয় সেটাও একটা সংখ্যা গণনা করে বের করা যেতে পারে? যদি একটা লুডোর ছক্কা ফেলি, তাহলে একটা চার পাবার সম্ভাবনা হল ১/৬, কেননা ৪ হল পাশাটিতে অঙ্কিত ৬টা সংখ্যার একটা—তেমনই চার না পাবার সম্ভাবনা হল ৫/৬, কেননা, ৪নয় তেমনি সংখ্যা হল পাঁচটা। অর্থাৎ একবার পাশা চালালে একটা সংখ্যা পাবার চেয়ে না পাবার সম্ভাবনাই বেশি আর এখানেও দুটো সম্ভাবনা মিলে হবে ১, অর্থাৎ দুটো সম্ভাবনার যে কোন একটা হওয়ার নিশ্চয়তা.....

মাইকণ মাসিকে আর কতদিন পাব না পাব তার সম্ভাবনা কত পরিসংখ্যাবিদরা কি এই বয়সের এই মানুষ আর কত বছর বেঁচে থাকবেন তার সম্ভাবনা হিসেব করে বের করে দিতে পারে (বিমা কোম্পানীগুলি নাকি কোন মানুষের জীবনবিমা করার সময় এ ধরণের সংখ্যার তালিকা চায়), যেমন গণনা করে সংখ্যার সাহায্যে বলে দেওয়া যায় সম্ভাবনা কতটুকু, যে আজ বৃষ্টি আসবে, কাল এই গোলাপ গাছে ফুল ফুটবে, আগামী এক সেকেণ্ডের মধ্যে এই তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম পরমাণুটির বিভাজন হবে কি না ....রুণুমি আর আমার জন্মদিন একসঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা কতটুকু? জর্জ গেমোর একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞান বইয়ে সেরকম একটা জন্মদিনের উদাহরণ ছিল—কী ছিল ভুলে গিয়েছি-বইটা আবার একবার দেখতে হবে.....মাইকণ মাসিকে টেলিফোন করব কি না....একটু বিরতি দিই--দুজনেই একটা দোকানে দাঁড়িয়ে দুটো আইসক্রিম খেয়ে নিলাম.. এই যে রিডার্স বুক স্টল, এখানেও একবার ঢুকি, রুণুমিকে আমি একটা বই ই উপহার দিই, সে ই পছন্দ করুক—হ্যাঁ, আমিও একটু খবর করে দেখি নতুন কোন সায়েন্স ফিকশন এসেছে কি না..

দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে উঠে ভাবলাম একটু বিশ্রাম নিই, তারপর মাইকণ মাসিকে ফোন করব। তখনি মনে পড়ল গেমোর বইটির কথা আলমারির ভেতর খুঁজে খুঁজে বইটা বের করলাম, পাতা ওল্টালাম,হ্যাঁ এই যে—জন্মদিনের কথা--গেমোই লিখেছেন 'মনে করুন তো, কখনও একসঙ্গে আপনি দুটো জন্মদিনে আমন্ত্রিত হয়েছেন কি? আপনি হয়তো বলবেন সেরকম ডাবল নিমন্ত্রণের সম্ভাবনা বড় কম, কারণ সে ধরণের নিমন্ত্রণ করতে পারার মত আপনার বন্ধু আছে ২৪ জন। আর ৩৬৫দিনে বছর, যে দিনগুলিতে তাদের জন্মদিন পড়তে পারে। তাই এতগুলি সম্ভাব্য দিনের মধ্যে আপনার ২৪জন বন্ধুর ২জন একই দিনে তাদের কেক কাটার সম্ভাবনা খুবই কম—কিন্তু অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটা একেবারে সত্যি যে আপনার সিদ্ধান্ত একেবারে ভুল' —গেমোই তারপরে সংক্ষিপ্ত ভাবে সম্ভাবনা গণিতের সূত্র প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে আমার এই দুই ডজন বন্ধুর দুজনের জন্মদিন একই তারিখে না পড়ার সম্ভাবনা হল ০.৪৬ (অর্থাৎ ৪৬/১০০, মানে অর্ধেক থেকে কিছুটা কম) অর্থাৎ সেই দুজন বন্ধুর জন্মদিন একই তারিখে পড়ার সম্ভাবনা বল ০.৫৪ (মানে আধা থেকে কিছুটা বেশি, ফিফটি ফিফটি থেকে বেশি)। তাই গেমোই মন্তব্য করেছেন আপনি যদি কখনও একই দিনে দুটো নিমন্ত্রণ না পেয়ে থাকেন তাহলে আপনি এটাই প্রবল সম্ভাবনা বলে ধরে নিতে পারেন যে হয় তারা ঠিকমতো জন্মদিন পালন করেন না, না হয় আপনাকে ডাকেন না।

....ঘুম আসছে, চোখ বুজলাম....মানে আমার পরিচিত মানুষদের মধ্যে একই দিনে দুজনের জন্মদিন না পড়ার চেয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি সব কিছুই সম্ভাবনার কথা—সম্ভাবনাগুলিই নিয়ন্ত্রণ করছে জীবন--এবং জগত—আধা ঘুম জাগরণে অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল কোথায় যেন পড়েছিলাম একজন বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানীর কথা, জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (তিনিই নাকি আবিষ্কার করেছিলেন যে আলো হল এক প্রকার বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গ, ত ⸪ বা রঞ্জনরশ্মি বা রেডিও তরঙ্গের

...। তবে বিভিন্ন গবেষণা পড়েছিলাম ... সূর্যসিদ্ধ, ... এক জায়গায় বলেছেন যে বিশ্বের প্রকৃত যুক্তিবিচার নাকি রয়েছে সম্ভাবনার গণিতে। The true logic of this world is in the calculus of probabilities. সম্ভাবনার গণিত ... চোখ বুজে আসছে। ঘুমিয়ে পড়লাম। ক্রিং। ক্রিং। জেগে উঠলাম টেলিফোন বাজছে।

'হ্যালো?'

'এই যে বাপু অর্ণব? আমি মাইকণ মাসি বলছি।'

'আচ্ছা মাইকণ মাসি।' অবাকই হলাম। 'ইশ বাম, আমিও আপনাকেই ফোন করব বলে ভেবেছিলাম। হ্যাঁ, তারপর- আচ্ছা প্রথমে হ্যাঁ, মাসি শরীর কেমন আছে, ঘরে সবাই ভাল তো?'

'ঠিকই আছে। তোরা?'

'ভালই। হ্যাঁ, তারপর—'

'হ্যাঁ, কথাটা হল, তুই আর বীণা বিকেলে একবার এখানে আসবি।'

'আজ বিকেলবেলা, কেন?'

'এ— মানে জন্মদিন বলে একবার—'

কান থেকে রিসিভার অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে একবার টেলিফোনটার দিকে তাকালাম। তা হতে পারে কি যে আজ এত বছর পরে মাইকণ মাসির মনে পড়ল যে আজ আমার জন্মদিন। এ রকম একটা আশ্চর্য ঘটনা সম্ভব কি? বললাম, 'জন্মদিন? কার জন্মদিন?'

'কার আবার, আমারই।'

'আপনার?' স্তম্ভিত হলাম, 'আপনার জন্মদিন সম্পর্কে তো আজ পর্যন্ত কিছুই শুনি নি। আজ কীভাবে?'

'এ বলিস না আর। কথাটা হঠাৎ কাল বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সোনটি আর জোনটি জন্মদিনের ব্যবস্থা করে ফেলেছে, মানী এবং ভান্টুও এসেছে (মাইকণ মাসির ছেলেমেয়ে), আচ্ছা আগে তোরা আয় তো, এখানেই বিস্তারিত বলব।'

হতভম্ব ভাবটা তখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তবুও চেষ্টা করে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললাম, 'না—মাসি, তবে কথাটা হলো, আজ তো আমরা যেতে পারব না, আমাদের এখানেও কিছু একটার আয়োজন করা হয়েছে—মানে গোলাঘাট থেকে রুণুমি এসেছে, আজ নাকি তারও জন্মদিন। সেজন্যই আমরাও এখানে বিকেলে কিছু একটা করব ভেবেছি।'

'রুণুমি এসেছে? কবে?'

'আজ এক সপ্তাহের মত হল।'

'আচ্ছা, তাই নাকি? ও এবার ম্যাট্রিক দেবার কথা ছিল না? পাশ করেছে?'

'না, পরীক্ষা দিয়েছে, রেজাল্ট বেরোবে আগামী ২৭ তারিখ।'

'আচ্ছা, তাই নাকি। আজকে রুণুমিরও জন্মদিন? এভাবে একদিনেই ঘরের সবার জন্মদিন পড়লে কীভাবে হবে! যাই হোক ওকে আমার কথা বলিস, আশীর্বাদ জানাচ্ছি বলিস।'

'আচ্ছা বলব।'

'যাই হোক তোদের ওখানে শেষ করেই একবার এখানে আয়। বীণাকেও নিয়ে আয়।'

'না তা হবে না। আশেপাশের কয়েকটি ছেলেমেয়েকেও বলেছি। ওদেরকে ফেলে কীভাবে যাব। কাল কোন একসময় যাব। হবে তো?'

'এঃ জন্মদিন হল আজকে, কালকে এসে আর কী হবে, সেরকম হলে অল্প দেরী করে হলেও তুই একা অন্তত চলে আয়---'

'আচ্ছা, দেখছি কী করা যায়।'

ফোনটা নামিয়ে রাখলাম। মনে পড়ল যে একজায়গায় পড়েছিলাম যে একদিন একটা রাস্তার সবগুলি ঘড়ির দোকানে যতগুলি লোক ঘড়ি ঠিক করতে এসেছিল তার সবগুলিই ছিল কেবল বিভিন্ন মডেলের ওমেগা ঘড়ি। সে ধরণের একটা সমাপতন বা কো-ইর্নসিডেন্স ঘটার সম্ভাবনার সংখ্যাও নিশ্চয় কোন গণিতজ্ঞই বের করেছে, কিন্তু ধারণা হয়েছে, আমার জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে একসঙ্গে তিনটে জন্মদিন পড়ার সম্ভাবনাটা বোধহ্ গেমই দুই ডজন বন্ধুর ক্ষেত্রে হিসেব করে বের করা).৫ সংখ্যাটাও ছাড়িয়ে গেল, বোধহয় ফিফটি ফিফটি থেকেও বেশ পরিমাণে বেশি—

রুণুমি একটা বরগীত গাইল, তারপরে আমি ছোট ছেলেমেয়েদের ভিডিও-তে দুটো কার্টুন ফিল্ম দেখালাম, খুব মজা পেল, ওদের বিদায় দিয়ে হালকা হতে প্রায় সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেল, রীতাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, রুণুমিরও একটু পেট কামড়ানোর মত মনে হচ্ছে, দুজনই আব আমার সঙ্গে বেরোতে চাইল না—রীতা মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে একটা প্যাকেট বেঁধে দিল, সঙ্গে তার বানানো গাজর না কিসের হালুয়া যেন এক বাটি, সেসব নিয়ে আমি একাই বেরিয়ে পড়লাম। রাতের বেলা আমি আজকাল আর গাড়ি চালাতে পারি না, একটা অটো নিয়ে নিলাম, বিবাট ট্র্যাফিক জ্যাম, গিয়ে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে গেল, মাইকণ মাসিব ঘর নীরব, বেশিরভাগ লাইটই নেভানো, মানী এবং ভন্টিরাও চলে গেছে, সোনটি-জোনটি তাদের রেখে আসতে গেছে, একটা ছোট টেবিলের ওপরে কয়েকটা উপহারের সামনে মাসি একা একা বসে বয়েছে.....

মাইকণ মাসির মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল (দাঁতগুলি এখনও ভালই রয়েছে, চোখের ক্যাটারেক্ট অপারেশন করা হয়েছে, কিন্তু চশমার সাহায্যে এখনও কাগজ-বই পড়তে পারেন, অবশ্য চুল আগের থেকে আরও সাদা হয়ে গেছে), বলল, 'ও বাবা, এলি, এত দেরি কবলি—রীতাদেরও আনলি না?' রুণুমির জন্মদিনের পার্টিটাব কথা বললাম আর মাসির জন্মদিন—আবিষ্কারের বৃত্তান্ত শুনলাম। গতকাল কোন এক প্রসঙ্গে জীবনবিমার কথা উঠেছিল (এতদিন পর্যন্ত তার কথা ভাবাব কোন প্রয়োজন হয় নি) সোনটি মেসোর পুরনো ফাইল থেকে মাসির জীবনবিমার কাগজ পত্রগুলি বের করল, তাতে দেখতে পেল যে মাসির জন্মের তারিখ লেখা আছে আজকের দিনটিতে। এতদিন মাইকণ মাসির জন্মতারিখ বা জন্মদিনের কথা সোনটিদের কেউ ভাবেই নি, এখনই তারা যেন সবিস্ময়ে উপলব্ধি করল যে তাদের মায়েরও দেখছি একটা জন্মদিন আছে! সঙ্গে সঙ্গে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যে আজ তারা মায়ের জন্মদিন পালন করবে, তখনই মানী আর ভন্টিদের ফোন করেছে—

'কত বছরের জন্মদিন হতে পারে, বলতো?' মুচকি হাসি হেসে মাইকণ মাসি বললেন।

'হ্যাঁ—কত?'

'আশি পার হয়ে একাশিতে পা রাখলাম।'

'একাশি!'

'হ্যাঁ, ভাবো তো একবার?' একমুখ হাসি নিয়ে মাসি আমার দিকে তাকালেন, মুখটা যেন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, যেন নবজীবন লাভ করেছেন, 'এটাই আমার প্রথম জন্মদিন।' বলেই একটু অপেক্ষা করলেন, বললেন, 'আর কে জানে হয়ং .শষ জন্মদিন—'

আরণ্যক

সুরেশ চক্রবর্তী

ফোঁপাতে ফোঁপাতে কাঞ্চী খবরটা দিল। বারান্দায় দুই তিনজন মানুষকে সে দেখছিল, কিন্তু তাতে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে অন্যান্য দিনের মতই সে ভেতরে চলে এসেছিল। গিয়ে যে দৃশ্য দেখল, শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতে ভুলে গিয়ে সে এক লাফে বাইরে চলে এলো। রান্নাঘরের সামনে বড় বড় করে শ্বাস নিতে নিতে সে প্রথমে অশোককে জিজ্ঞেস করল – শর্মাবাবুর কি কোন অসুখ ছিল? আশা জানে না বলার পরে সে আসল খবরটা দিল। আশা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে ভয়ে ভয়ে খবরটা নীরেনকে দিল। কাগজটা রেখে নীরেন বেড়ার উপর দিয়ে বরাদের জিজ্ঞেস করল—সত্যি নাকি? বরা দাসকে জিজ্ঞেস করে জানাল—সত্যি।

একজন দু'জন করে কলোনির মানুষ এসে হৃদয় শর্মার ঘরে উপস্থিত হল। আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে আবৃত হয়ে হৃদয় শর্মা শুয়ে রয়েছে। পায়ের নিচটা সিঁদুরে মাখামাখি হয়ে আছে। মিসেস শর্মা তুফানে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া কলাগাছের মত শর্মার পায়ের কাছে বসে রয়েছে। ছেলেমেয়েগুলি এদিক ওদিক বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাইরের মানুষগুলি নিজেদের মধ্যে কথা বলছে ঃ অফিস থেকে ফিরে শর্মা স্ত্রীকে শরীরটা ভাল লাগছে না বলছিলেন। মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে বলে মনে হচ্ছিল। হাত-মুখ ধুয়ে চা-জলপান করে কিছুক্ষণের জন্য বিছানায় শুয়েছিলেন। মিসেস শর্মা নাকি সচেতন করে দিয়েছিলেন—দাস ফার্মেসী থেকে ঘুরে এসো গিয়ে। অনেকদিন ধরে প্রেসারটা দেখানো হয় নি। কোন ফাঁকে যে লোকটি ঘর থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন কেউ বলতে পারে না। বাজার করে ঘরে ফিরে এলে জানতে পেরেছিলেন। রুই মাছ, টম্যাটো আর ফুলকপি এনেছিলেন। মিসেস শর্মাকে রুইমাছের সঙ্গে টম্যাটো দিয়ে তরকারী রাধতে বলেছিলেন। অল্প কিছুক্ষণের জন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পড়াশোনার আলোচনা করেছিলেন। দূরদর্শনের খবরটা শুনতে

'দূর, আমি বললাম- এটাতো কেবল আরম্ভ হে, লাইফ বিগিনস এট এইটটি—'

'যা হোক গে। তোরই বা কত হল হিসেবই রাখা হল না—'তোর জন্মদিন বা কবে ছিল সেটার তো কোন হিসেবই রাখা হল না, এতদিন—

'আমার? তাড়াতাড়ি করে প্রসঙ্গটা বদলাবার চেষ্টা করলাম।' না-না, আজ আর এসব কথা ওঠাবেন না, আজ শুধু আপনার জন্মদিনের কথা—'

কাজের মেয়েটিকে ডেকে মাসি জলযোগের ব্যবস্থা করলেন, জিজ্ঞেস করলেন—'ডায়াবেটিসের ওষুধ খাচ্ছিস তো? তোর সুগার কত এখন?'

'ভাল নয়, একটু বেড়েছে।'

'তাই নাকি? একটু সাবধান হবি। বড় বাজে জিনিস, ডায়াবেটিস। তবুও, ওদের আনা বার্থডে কেকটার একটুখানি তোর জন্য রেখে দিয়েছি, বড় মিষ্টি কিন্তু, হলেও একটুখানি মুখে দিতে পারবি, একদিন একটু মিষ্টি খেলে কিছু হবে না- মনে কর আজ তোরই জন্মদিন—হ্যাঁ, আমি নিজেও কিছু একটা ভালমন্দ বানিয়েছি, তোদের ভাল লাগা জিনিসটা— ভাবলাম, ওটাই বানিয়ে দেখি, তুইও খুশি হবি, এতদিন পরে পারব কি না - বলতো দেখি কী জিনিস?'

'কী? চমৎকৃত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।'

'জিঞ্জার বিস্কুট- তোদের ফেভারিট।'

চুপ করে গেলাম। মনে হল, আজ হঠাৎ জিঞ্জার বিস্কুটের কথা মাইকণ মাসির মনে পড়ার সম্ভাবনা কতটুকু তারও নিশ্চয় একটা মান আছে, যা শূন্য নয়, মানে আমাদের জীবনে মনে পড়ে যাওয়া কথাগুলিরও একেকটা সম্ভাবনা আছে, এক একটি সংখ্যা আছে, হয়তো দশমিক শূন্য শূন্য শূন্য কিছু, কিন্তু একেবারে শূন্য নয়... মাইকণমাসি প্লেটটা সামনে এগিয়ে দিয়ে প্রত্যাশার স্মিত হাসিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিস্কুটটা মুখে নিলাম নাকে এসে প্রবেশ করল তার বিভিন্ন উপাদানের একটি বিমিশ্রিত তীক্ষ্ণ মৃদু গন্ধ, অনেকদিন আগের স্মৃতির একটি সুবাস, চোখ যেন বুজে আসতে চাইল. মনে হল একটা ঝলক দিয়ে এক নিমেষে পার হয়ে গেলাম কৈশোর এবং ছেলেবেলা ঘটনা আর অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ছবির বিচ্ছিন্ন সারি নয়, কিন্তু কীভাবে যেন সবকিছু নিয়ে একটা মিলিত পাণ একটা স্মৃতি ক্যাপসুল (মনে পড়ল ফরাসী লেখক মার্সেল প্রুস্তের একটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু অনেকটাই এরকম ছিল)—মাইকণ মাসির তখনকার সেই জিঞ্জার বিস্কুটের গন্ধটা এভাবে ফিরে আসারও একটা সম্ভাবনা ছিল; তারও নিশ্চয় একটা দশমিক সংখ্যা আছে যেভাবে ম্যাক্সওয়েল ভেবেছিলেন, যে জীবন আর জগতের প্রপঞ্চ রাশির কার্যকারণ নিহিত রয়েছে সম্ভাবনার গণিতে, যার ফলে প্রবাহিত হয়ে রয়েছে অস্তিত্ব আর অনুভব কল্পনা আর বাস্তব, অতীত আর ভবিষ্যৎ। সম্ভাবনাগুলি আছে বলেই জীবন আছে। মাথা তুলে মাইকণ মাসির দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির একটা মধুর হাসি হাসলাম, বললাম আঃ বেশ ভাল হয়েছে, একেবারে আগের মত,' মনে মনে ভাবতে চাইলাম যে সম্ভাবনা-গণিতে ক্ষুদ্র হলেও একটা সংখ্যা আছে যে মাইকণ মাসির এটাই প্রথম আর শেষ জন্মদিন' নয়।

শুনতে মাঝখানে একবার ভাত হয়েছে কিনা খবর করেছিলেন। ভাত হয়ে যাওয়ায় মিসেস শর্মা তাকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তখন অবশ্য তিনি শরীরটা ভাল লাগছে না বলেছিলেন। মিসেস শর্মা যখন রান্নাঘরের কাজকর্ম শেষ করে শোবার ঘরে এসেছিলেন তখন বুকে হাত দিয়ে মানুষটি বিছানায় পড়ে এপাশ ওপাশ করছিলেন। একটা সময়ে মানুষটা বিছানা থেকে উঠলেন, বোধহয় বাইরে যেতে চেয়েছিলেন, তারপর কি হল মিসেস শর্মা ভাল করে বলতে পারেন না- -লোকটা কী পিছল খেয়ে পড়ে গেল না মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেল। ছেলেটা দৌড়াদৌড়ি করে বরা ডাক্তারের কাছে গেল। লক্ষণ শুনে ডাক্তার তাড়াতাড়ি করে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন। ছেলেটা সাকসেনার গাড়িটা চাইল, কিন্তু ড্রাইভার ছুটিতে থাকায় গাড়িটা পাওয়া গেল না। মুকুন্দ কলিতার বাসায় একটা অটোরিক্সা রাখা থাকে। চালককে ডেকে আনা হল। মেডিকেল কলেজে আর পৌছতে পারল না, পথেই— ।

হৃদয় শর্মা মারা গেলেন।

চাপা উত্তেজনা, ঔৎসুক্যের সঙ্গে কলোনির মানুষ এসে শর্মার বাড়ির সামনে বারান্দায় ভিড় করেছে। আবার একসময় নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে। মাঝখানে কে একজন এসে মুখের কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে গেছে। ঘরের পালঙ্কে ধূপ ধুনোর মধ্যে শর্মা শুয়ে রয়েছে, মরা মাছের মতো ড্যাবড্যাব করছে চোখ, কালচে পড়ে যাওয়া মুখ। পায়ের কাছটিতে মিসেস শর্মা নিশ্চল হয়ে বসে মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ অনুভব করছেন।

আশা অল্প কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। গতকাল চলে বেড়ানো লোকটা এখন একা শুয়ে রয়েছে। একটা সময় তার চোখ নাক অনুশাসনের বাইরে চলে যাবে বলে মনে হওয়ায় কেউ টের পাবে বলে ভেবে সে চুপচাপ বেরিয়ে এল। ঘরে ফিরে এসে সে কয়েক আঁজলা জলের ঝাপটা মারল চোখে-মুখে। নিজেকে তার কেমন যেন অপরাধী অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের খবর তারা ঘরে বসেই পায়, অথচ কলোনিরই একটা ঘরের খবর তারা কেউ পেল না! অনেকক্ষণ সে ভাবতে থাকল। এখন কী হবে ঘরটার ? মানুষটিই বা যাবার আগে কিছু বলে যেতে পেরেছে কি না। ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ, পড়াশোনার পরিকল্পনা, অফিসের হিসেবপত্র, ইনসিওরেন্স—এ সমস্ত বিষয়ে। শ্রীমতি শর্মারই বা কী হবে ? মানুষটা কিভাবে যে ধৈর্য ধরে বসে রয়েছে! সেই যে দুপুরবেলা থেকে নির্জীব দেহটা নিয়ে বসে রয়েছে, কি ভাবছে মিসেস শর্মা ?

ঘরের ভেতরে থাকতে না পেরে আশা পুনরায় বাইরে বেরিয়ে এলো। সভাসমিতির সমাপ্তির দিকের মত শর্মার ঘরের লোকজনের ভিড় কমে আসছে। কার সঙ্গে যেন কথা বলতে বলতে নীরেন এসে ঘরে ঢুকল। সে ব্যস্ত হয়ে উঠল - 'তুমি কিছু একটা খেয়ে নাও, সঙ্গে গেলে তো অনেক দেরী হবে। সারাটা দিনই লেগে যাবে বলে মনে হয়। নীরেন তার কথা কোনরকম সাড়া দিল না। বাইরে বেরিয়ে এসে সে জলের কথা জিজ্ঞেস করল আর বাথরুমে ঢুকল। স্নান করে কাপড় বদলে নিল।

আশা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি শ্মশানে যাবে না নাকি ?'

'প্রত্যেকেরই যখন অফিস-আদালত স্কুল'কলেজ আছে, আমার নিজেরও অফিস আছে। আমি একা একা কী করব ? সে হ্যাঁ না কিছুই বলল না। রান্নাবান্না করার ব্যাপারটা তখনও তার মাথায় আসেনি। দুধ-চিড়া খেয়ে নীরেন অফিসে চলে গেল। সাধারণত সকালের দিকের এই সময়টা আশার খুব ব্যস্ততার সময়। ঘুম থেকে উঠেই স্নান করা, একদিকে চায়ের জল অন্যদিকে ডাল একসঙ্গে বসিয়ে দিয়ে নীরেনকে ডাকা। নীরেন ওঠার পরে চা জল খেয়ে ভাত তরকারী। তাড়াতাড়ি

করে রান্না, তার মধ্যেই সুযোগ বুঝে খাবার জল ভরে রাখা, সাড়ে ন'টার মধ্যে নীরেনকে ভাত দেওয়া। দশটার মধ্যে নীরেন অফিসে যায়। তারপরেই আশা কিছু সময়ের জন্য অবসর পায়। ড্রয়িংরুমের দরজাটা বন্ধ করে সে ঘরের ভেতর একটা নতুন জগত সৃষ্টি করে নেয়। ভেজা চুলের গোছা মেলে দেয়, শাড়িটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে ঠাকুরঘরে ঢোকে। গানের কলি গুনগুন করে, তাতে আধঘন্টা পার হয়ে যায়। তেত্রিশ কোটি দেবতার যার যখন মনে হয়, সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে তখন আশার সামনে হাজির হয়। যাকে যেভাবে সম্ভব কাউকে কোনরকম রুষ্ট না করে আশা তাদের বিদায় দেয়। এগারোটায় সে এক কাপ কড়া করে বানানো চা খেয়ে সেদিনের খবরের কাগজটা নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসে। কেশবিন্যাস, প্রসাধনের বিজ্ঞাপনগুলি তন্ন তন্ন করে পড়ে। কাজ থাকলে কখনও মেসিনে বসে, দু'মাস আগে কেনা ব্লাউজটার ছিঁড়ে যাওয়া সেলাইগুলি খুলে কিছুটা ঢিলে করে সেলাই করে নেয়। বারোটার সময় সে নিজের ভাগের ভাতটা বেড়ে খেয়ে নেয়। তারপর বাসন-পত্র ধুয়ে এসে বিছানায় শোয়। রেডিওটা কানের সামনে রেখে, আকাশপাতাল ভাবতে থাকে। মনে ধরলে কখনও একটা ম্যাগাজিন বের করে নেয়। কখনও বা এরকম অবস্থায় তার দু'চোখে ঘুম নেমে আসে। প্রায়ই আসে না। হাই তোলে। তখন তার বাড়ির কথা মনে পড়ে। নদীর তীরের লাল মাদার, পলাশ, শিমুলের সারিগুলি চোখে সামনে ভেসে ওঠে। দীপালি, কণিকা, নীলিমা, নমিতাদের সঙ্গে নদীর ঘাটে যাবার কথা মনে পড়ে। নদীর বুকে বালিতে নিজের পদচিহ্নের কথা মনে আসে। ওপারের ছেলেগুলি স্নান করতে এলে এখনও তাদের ঝগড়া নদীর তীরকে মুখরিত করে তোলে কিনা কে জানে।—সে সমস্ত কথা মনে হলে তার খুব দুঃখ হয়, মা-বাবার উপরে রাগ হয়।

প্রায়ই এই সময়টিতে কলা-কমলা নিয়ে ফেরিওয়ালাটি আসে। সপ্তাহের শেষে উত্তর পার থেকে কান্দুরী বুড়ি আসে—গ্রামের ডিম, আট দশটা, চালতে, বাতাবি লেবু, মাঝে মাঝে তেঁতুলও নিয়ে আসে। বুড়িকে বসিয়ে রেখে সে বাতাবি লেবুর ছাল ছাড়ায়। নীরেন না থাকলে সে একটা গোটা বাতাবি লেবু লবন লঙ্কা দিয়ে খেয়ে ফেলে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বুড়ি নারী ধর্ম সম্পর্কে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা চালিয়ে যায়। আশার চলা-ফেরা, চেহারার দিকে তাকিয়ে সাবধানে থাকতে বলে। আজকালের ডাক্তার কবিরাজকে বিশ্বাস করতে বারণ করে। ওরা কিছুই জানে না। এটা খাবে না, ওটা করবে না—এসব কি একটা কথা হল? এটা কি আর অসুখ? আশার বিশ্বাস অর্জন করার জন্য সে নিজের উদাহরণ দেয়ঃ 'বড় মেয়ে জন্মের সময় বিকেলের দিকটাতে ধান বানছিলাম। বিছানায় আসতেই পেটটা কেমন যেন করতে লাগল। শাশুড়ি বুড়ি মাটিতে একটা বস্তা পেতে দিলেন। মানুষটা কালিকান্ত কবিরাজের কাছ থেকে একটু মন্ত্রপুত সরষের তেল নিয়ে এল। ভোরের দিকেই সব ল্যাঠা শেষ। আশেপাশে কাকপক্ষীতেও কিছু টের পেল না। শোন্, দরকার পড়লে আগে থেকে জানাবি, আমি চলে আসব।' আশা হ্যাঁ বা না কিছুই বলে না। রূপকথা শোনার মত কথাগুলি শুনে যায়। বিকেল তিনটের সময় টিলিঙার ডাকে সে জেগে ওঠে। রুটি দেবার লোকটি আসে। হাত-মুখ ধুয়ে সে আবার এক কাপ কড়া চা খেয়ে নেয়। তারপর বিকেলের জলপান তৈরী করে। চারটের সময় নীরেন অফিস থেকে আসে। সাহেব, সুপারিনটেণ্ডেন্ট, বড়বাবু, ডিলিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, টাইপিস্ট ইত্যাদি শব্দকে কেন্দ্র করে দিনটার ঘটনার একটা মোটামুটি বর্ণনা দেয়। চা-জলপান শেষে সে বাজারে যায়। মনোহারি জিনিসপত্র কেনার থাকলে মধ্যে মধ্যে সে-ও যায়।

আশা অনেকক্ষণ ড্রয়িং রুমে বসে থাকল। আজ তার কিছুই করতে ইচ্ছে করছিল না, কালসাপের মতো মৃত্যু যে কোথা ' কখন ওৎ ':পেতে থাকে। গতকাল বাজারে যাবার সময় বোধহয়

শর্মা পাঁচিশ পয়সার জন্য রিক্সাওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করছিলেন, দশ পয়সার জন্য সব্জি বেচা লোকটির সঙ্গে মুখ করছিলেন। অফিসের ফাইলে নিবিষ্ট থাকার সময় কিভাবে কোথা থেকে দু'টাকা বের করা যায় সে কথাই ভাবত। টাকা-পয়সা, মাটি-সম্পত্তি নিয়ে অহংকার করে বেড়ানো লোকটি আজ ওই পাশের ঘরটিতে নিশ্চল হয়ে পড়ে রয়েছে। সাপের চামড়ার মত হিমশীতল শরীর, মরা মাছের মত খোলা চোখ, নিস্তেজ নীল মুখ। চারপাশের মানুষের কোন প্রতিক্রিয়া, উদ্বেগ, আশঙ্কা, উত্তেজনা নেই।

অস্থির, অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় শ্রীমতী শর্মার কথা সে ভাবতে লাগল। কী ভাবছে, মহিলাটি গতকাল রাত থেকে? এই যে মানুষটি গতকাল পর্যন্ত তার জীবনের একটা অংশ হয়ে ছিল, বিছানার অর্ধেকেরও বেশি অংশ অধিকার করে রেখেছিল—অফিস, ঘর ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, সেই মানুষটি এখন নির্বিকার পড়ে রয়েছে। বেঁচে থাকতে বীরদর্পে ঘুরে ফেরা মানুষটি নির্জীব শরীরটা শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য পাড়া-পড়শী বন্ধুবান্ধবদের সময় হচ্ছে না। একান্ত আপনজনের মৃতদেহটা নিয়ে মানুষটি এখন কী করছে?

আশা নিজেকে খুব একা অনুভব করে। একটা কাক মারা গেলেও সঙ্গের সমস্ত কাক চারদিক তোলপাড় করে তোলে, বাছুর একটা হারিয়ে গেলে গাভী হাম্বারবে চিৎকার করে বেড়ায়। অথচ এই মানুষগুলি কলোনিতে একটা মৃতদেহ নিয়ে নির্বিবাদে শুতে পারল! একবার মাত্র খবর করে পরমুহূর্তেই মাছমাংস খেয়ে অফিসে আদালত চলে যেতে পারল!

সমস্ত পৃথিবীর নির্জনতা নিয়ে দুপুরটা আশার ঘরের সামনে উপস্থিত হল। পাখি-পাখালির আওয়াজ নেই, গাড়ি মোটরের কোলাহল নেই। কোথাও একটা শিশুর ক্রন্দন নেই। শোবার ঘরের দেওয়াল ঘড়িটার টিকটিক শব্দের বাইরে কোথাও কোন শব্দ নেই। জানালার পর্দা ভেদ করে এক ঝাঁক বাতাস আসছে। ঘন ঘন বয়ে যাওয়া বাতাসকে কোন এক অশরীরি আত্মার ফুঁপিয়ে কান্নার মত শোনাচ্ছে। আশার মনে হল এই মুহূর্তে যদি তার কোন কিছু হয়? কোন কারণে এখানেই যদি সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যায়? তার তাহলে কী হবে? কে তার খবর করবে? হঠাৎ যদি তেমন কিছু একটা হয়, তার অবস্থাও যদি শর্মার মত হয় নীরেনকে যদি এভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়।

উঠে গিয়ে আশা এক গ্লাস জল খেয়ে এল। একটা সময়ে সামনের রাস্তায় আবার দুই একটা গাড়ি চলতে শুরু করল। পর্দার ফাঁক দিয়ে আশা দেখতে পেল শর্মাদের উঠানে দ্বিতীয়বারের জন্য দুই একজন করে মানুষ জমায়েত হচ্ছে। সম্ভবত অফিসের সহকর্মী। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে চেয়ে রইল। একটা সময়ে একটা ট্রাক এল। ট্রাকটাকে শর্মার মৃতদেহটা সবাই মিলে ধরাধরি করে তুলে দিল। শবযাত্রা এগিয়ে চলল। মৃত্যুর সঙ্গে সহবাস করতে যাত্রা করা মানুষটিকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য আশা বাইরে বেরিয়ে এল। অতিক্রম করে যাওয়া শোভাযাত্রা দলটার দিকে তাকিয়ে সে যেন নিজের মনেই বলল, 'হে অসীম আত্মা, কখনও যদি তুমি নতুন দেহে আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহলে তোমার বোধহয় পুনরায় মানুষের দেহে আশ্রয় নেওয়ার আকাঙ্খাটা চিরকালের মত শেষ হয়ে গেছে।

হঠাৎ এবার তার নীরেনের কথা মনে হল। নীরেন আজ ভাত না খেয়েই অফিস গেছে। তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারে। ইতস্তত করে সে কিছুটা চাউল বসিয়ে দিল। ভাত খাওয়াটা বড় কথা না হলেও অভূতপূর্ব ঘটনা একটা অঞ্চলটিতে ঘটে গেছে, সে ঘরে এ:' একা বয়েছে, সে-ও না

খেয়ে রয়েছে, —সে জন্যেই নীরেন এসেই তাকে খাওয়ানোর জন্য ভাত চাইতে পারে।

ভাত খাবার পরে অনেকক্ষণ ধরে আশা বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। একটা সময়ে সে উপলব্ধি করল যে সে এ সমস্ত মিথ্যেই আশা করছে। গত দেড় বছরে সে টের পেয়ে গেছে—নীরেন অত্যন্ত হিসেবি মানুষ। মশারির নিচের প্রেমের বাইরে সে একদিনও অবসরের সময় ভুলেও তাকে বলে দেখেনি—আকাশের তারা, পূর্ণিমা রাতের জ্যোৎস্না, সামনের টিলাতেই ফুটে থাকা সোনালী ফুলের কথা—। এসব সে প্রথম জীবনের নদীর ঘাটে, পুষ্করিনীর পারে, সবুজ ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত স্রোতে, সঙ্গের বান্ধবীদের হাসি-ঠাট্টার মধ্যে ফেলে রেখে এসেছে। নীরেনের কাছে তার কোনো অভিযোগ নেই, সে সম্পূর্ণ ব্যবসায়ী মানুষ, সক্ষম গৃহস্থ। মা-বাপের ইচ্ছে মতই নীরেন তাকে গ্রাম থেকে শহরে এনে রেখেছে। বাজারের ভাল জিনিস, ভাল কাপড়, সিনেমা, সময়ে ডাক্তার—সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক রেখেছে, এমন কি অনেক সময় তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেও। সে নীরেনের কাছ থেকে যা পাচ্ছে তার চেয়ে বেশি আশা করা আজকের দিনে বিলাসিতা হবে।

বেলা পড়ে আসছে। অস্তগামী সূর্যের কিরণে লোকের ঘরের টিভির অ্যান্টেনাগুলি চিকমিক করে উঠছে। সামনের মাঠটিতে কম বয়সের ছেলেগুলি ক্রিকেট খেলছে। হাতে ধরে শ্রীমতী রহমান মেয়েটিকে স্কুল থেকে ফিরিয়ে আনছে। পেছন পেছন কাজের মেয়েটি বই খাতার ব্যাগ আর জলের বোতল নিয়ে আসছে। স্কুটারে উঠে বরা আর শ্রীমতী বেরিয়ে গেছে। নীরেন অন্যান্য দিনের চেয়ে অফিস থেকে দেরি করে ফিরেছে। ফেরার পথে বাজার করে এনেছে। মৃত্যুকে এত কাছ থেকে দেখার সুযোগ আশার হয় নি। তার শৈশবকালে ঠাকুরমার মৃত্যু হয়েছিল। মা-বাবা সারাদিন কেঁদেছিল, ঠাকুমাকে তুলসী তলায় বাঁশের চাঙে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। ঢোল-কাঁসির শব্দের মধ্য দিয়ে ঠাকুরমাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফুট-গোধূলিতে মা তাদের শুইয়ে রেখেছিল। অনেকদিন তারা একা ঘরের বাইরে যায় নি।

সে মৃত্যু আর গতকাল রাতের এই মৃত্যু। এক অজানা ভয়ে আশা বড়ই অসহায় বোধ করে। দৈনন্দিন কর্তব্য বলে ধরে নিয়ে সে রাতের বেলা ভাত-তরকারি তৈরি করে। নীরেনের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর আশা অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিজের থালায় ভাত নাড়া-চাড়া করে জল ঢেলে উঠে আসে। শোবার ঘরে এসে অনেকক্ষণ সে মনমরা হয়ে বসে রইল। নীরেন ব্যস্ত হয়ে উঠল—'কী হল, শরীর সুস্থ নয় নাকি?'

সে কিছুই বলল না। একটা সময়ে বিছানায় এসে সে নীরেনকে বলল,—'একটা কথা বলছি, শুনবে?' নীরেন আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে রইল।

—'তুমি আমাকে গ্রামে রেখে এসো গিয়ে।'

নীরেন ঝাঁপ মেরে উঠল, 'তুমি কি পাগল হয়েছ? এই সময়ে গ্রামে? দরকারের সময় একটা প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায় না। পরামর্শের জন্য ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার একজন পাওয়া যায় না, রাতবিরেতে কোন কিছু হলে একটা গাড়ি পাবার উপায় নেই। এমন একটা জায়গায়?'

—'কিছু হবে না। আমাদের মা-বাবা তো আমাদের এভাবেই জন্ম দিয়েছিল। আমাদের তো কোন ক্ষতি হয় নি।'

—'তখনকার সময় আর এখনের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

—সেজন্যেই তো বলছি। মনে কর তোমার অনুপস্থিতিতে আমার কিছু একটা হল, তখন এখানে থেকে আমি কী করব? মনে কর তোমার-আমার শর্মার মত অবস্থা হল, তখন? আমাদের

সন্তান জন্ম নিয়ে বড় হওয়ার পর একদিন দেখল - তার মা বাবা বাড়ির সীমানার ওপারে একজন মানুষের মৃত্যু হলে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারে। রোজ সকালে দেখা হওয়া একজন মানুষের মৃত্যু হলেও পাশের বাড়ির লোক যেন কিছুই হয়নি এভাবে মাছ-মাংসে পেট ভরে ভাত খেয়ে অফিস-আদালত করতে পারে, মৃতদেহ পেছনে ফেলে রেখে গাড়ি-মোটরে উঠে অন্যান্য দিনের মত নিমন্ত্রণ খেয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে। একদিন সে চাকরি বাকরি করল, তাকে খবর দেওয়া হল - তার মা-বাবার মৃত্যু হয়েছে। সে-ও যদি বলে —আচ্ছা হবে, মা-বাবা এতক্ষণে মরেছে! তখন?

সারাদিন চেপে রাখা কান্না অদ্ভুত ফোঁপানির সুরে আশার গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। আর তার মনের সমস্ত ভয় আর শঙ্কা যেন বুক থেকে আরও গভীরে নেমে গিয়ে তার গর্ভস্থ সন্তানকে ঘিরে ধরে।

অক্টোপাস

হোমেন বরগোহাঞি

ডিব্রুগড়ের লোহাপট্টির অন্ধকার গলির একটা জরাজীর্ণ ঘরে বসে পুলিশের অপেক্ষা করছি। টিকটিক শব্দ করে মিনিটের কাঁটাটা বারোটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েক জোড়া বুটজুতো ঠকঠক শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে আসবে। তার সশব্দ আওয়াজে গুঁড়ো হয়ে যাবে রাতের নিস্তব্ধতা। সমাজের প্রহরী এসে দরজায় করাঘাত করবে, দরজা খোল!

খোলা জানালা দিয়ে বাইরেব অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বব কিছু একটা ভাবছে। মুখের জ্বলন্ত সিগারেটের ধোঁয়া তার অমাবস্যার রাতের মতো কালো মুখমণ্ডলের আশেপাশে একটা রহস্যের মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। জীবনে মাঝে মাঝে এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন মনটা সংসারের সমস্ত পরিচিত বন্ধন থেকে মুক্তি চায়। ববের উদাস দৃষ্টিতে সেই নিঃসঙ্গ সুদূরতার আভাস। অবশ্য এটা আমার নিজের খেয়ালি মনের কল্পনাও হতে পারে। কে বলতে পারে সে ঠিক এই মুহূর্তে আমার বিরুদ্ধেই কোনো ষড়যন্ত্র করছে না ?

ঘরটাতে শুধু আমরা দু'টি প্রাণী। বব ওরফে রবার্ট হিল এবং আমি। আর একটা প্রাণহীন নারী দেহ। হাতুড়ির প্রচন্ড আঘাতে তার মাথাটা দু'ফাঁক হয়ে ফেটে গেছে। সমস্ত শরীর রক্তে মাখামাখি।

হঠাৎ দরজাটা খুলে যাওয়ার মতো শব্দ হল। কিন্তু বব নির্বিকার। আমার উত্তেজনা দেখে সে বিষণ্ন হাসি হাসল। জানোয়ার! আমি মুখ ফিরিয়ে তার দিকে পিঠ দিয়ে বসলাম।

এইবার সে অট্টহাসা করে উঠল। তার সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখে আমার মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। রাগে দিশেহারা হয়ে আমি যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। দুয়ারটা খোলার জন্য হাত বাড়াতেই সে পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল-- -গৌতম! তারপর সে একটা গান আরম্ভ করে দিল --

I go to the judgement in the evening
of the day
When I lay this body down
And my soul and your soul will meet in the day
When I lay this body down

আমার ইচ্ছা থেকেও হাজার গুণ শক্তিশালী একটা অন্ধ অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরছে। তাকে এড়িয়ে যাবার শক্তি আমার নেই। শুধু আজই নয়, কোনোদিনই পারিনি। বন্ধু-বান্ধব দিন রাত আমাকে ববের সংস্রব ত্যাগ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। আমিও জানি। সে একটা ভয়াবহ মানুষ। তিনবার মানুষ খুন করে সে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়েছে। জীবনের একমাত্র ভয়ঙ্কর এবং কদর্য দিকটা নিয়েই তার কাণ্ড-কারখানা। তবুও যে জিনিসটা আমাকে তার প্রতি প্রচন্ডভাবে আকর্ষণ করে তা হল তার অপূর্ব কণ্ঠের গান। সমুদ্র গর্জনের মতো উদাত্ত সেই গান শুনলে আমি নিজের উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। সে যেন আমাকে জীবনের একটা মহত্তর সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতে বাধ্য করে তোলে। জীবন এবং আর্টের মধ্যে সম্বন্ধের কথা ভেবে আমি কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। তবু ববের সংস্পর্শে এসে আমি বার বার নিজেকে প্রশ্ন করেছি - জীবন নিজে যখন এত কদর্য হয়, আর্টের মাধ্যমে তার প্রকাশ এত মহিমামণ্ডিত হতে পারে কিভাবে ? ববকে আমি মানুষ হিসেবে অন্তর থেকেই ঘৃণা করি। কিন্তু তার গানের মধ্যে আমি যখন জীবনের একটা নতুন অর্থ খুঁজে পাই, মনের মধ্যে অনুভব করি নানা বিচিত্র রহস্যময় বাসনা, তখন আর বব আমার কাছে রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে থাকে না। তার গানের মতোই সেও হয়ে ওঠে একটা মাধ্যম মাত্র যার সাহায্যে একটা অদৃশ্য রহস্যময় জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি।

প্রথম যখন মানুষ সেই সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ দৈত্যাকার নিগ্রোর সঙ্গেও পিগমি সাইজের আমাকে রাস্তায় হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল, আমার বন্ধুমহলে বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। শোরগোল পড়ারই কথা। যুদ্ধের সময় হলে কথা ছিল না। কিন্তু এখন ১৯৫০ সনে, তার সঙ্গে গৌতমের---আমাদের এই আধাপাগল গৌতম বরুয়ার দহরম মহরম হল কিভাবে ? ইত্যাদি নানা রকমের প্রশ্ন। সেদিনের সেই বিস্ময় বিস্ফারিত চোখগুলি অভ্যস্থতার ক্লান্তিতে এখন পুনরায় বন্ধ হয়ে আসছে। এখন ডিব্রুগড়ের প্রত্যেকেই জানে যে বব যুদ্ধের সময় অসমে আসা একজন নিগ্রো সৈনিক। মিলিটারি আইনের কোনো এক মার-প্যাঁচে পড়ে তার চাকরি যায়। তারপর আরও কোনো এক গুরুতর অসামরিক অপরাধের জন্য তার সাত বছরের জেল হয়। জেল থেকে বেরিয়ে এসে সে দেখল যুদ্ধ কবেই শেষ হয়ে গেছে। দেশে ফিরে যাবার কোনো উপায় সে খুঁজে পেল না। সে এখানেই থেকে গেল। বন্ধু-বান্ধবের চেষ্টায় সে খুব তাড়াতাড়ি একটা মোটর গাড়ি মেরামতের কারখানায় মেকানিকের কাজও যোগাড় করে নিল। তার সঙ্গে জুটে গেল একদল ভবঘুরে আধাপাগল বন্ধু। রানা, আমজাদ, ইদ্রিস, ভিক্টর এবং আমি। আশ্চর্য আমিও তার বন্ধু। সে এক বিচিত্র জগৎ। আমাদের দলের বেশির ভাগই খুনি, ডাকাত, মদ্যপ। বব আমাদের সকলের নেতা। তার সঙ্গে কোনো কাজ করতে আর বাকি রাখিনি। জীবনের শুকনো অস্থিপুঞ্জ থেকে নিংড়ে আনন্দ বের করাটাই তার একমাত্র কাম্য। কিন্তু যে আনন্দ বব তার আদিম বর্বর প্রাণপিপাসার জোরে সহজেই লাভ করতে পারে, আমরা আমাদের হাজার বছরের সংস্কারের ভারে সঙ্কুচিত হয়ে যাওয়া মন নিয়ে তাকে পেতে গিয়ে বার বার হোঁচট খাই। ববের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়ে চলার জন্য আমার

বাকি বন্ধুদের মধ্যে তাঁর প্রতিযোগিতা হয়। কিন্তু একমাত্র মদ খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আমার সঙ্গে পেরে ওঠে না। এমন কি ভিক্টরও -- যে ভিক্টর জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় জেলের ভেতর কাটিয়েছে। আমার এই অসামান্য কৃতিত্বের বিনিময়ে আমি লাভ করেছি ববের বন্ধুত্ব — প্রায় একাধিপত্যভাবে। অন্যরা তার সঙ্গী মাত্র। বব নিজেই সবাইকে বলে বেড়ায়— জীবনে আমার তিনটে বন্ধু রয়েছে -- বেশ্যা, বন্দুক এবং গৌতম।

সেদিন রবিবার। সকালের চা খেয়ে খবরের কাগজটা পড়ব বলে মেলে ধরেছি। এককোণে চোখে পড়ল একটা হত্যাকাণ্ডের খবর। হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছে ডিব্রুগড়ে, অথচ আমি খবর পাইনি। যাকে হত্যা করা হয়েছে সে হল জালুকপাড়ার একজন মধ্যবয়সী খাসিয়ানি। খবরটা পড়ে মনে মনে খুব কৌতূহল অনুভব করলাম। কাগজটা সামনে নিয়ে নানা কথা ভেবে চিন্তামগ্ন হয়ে থাকতেই হঠাৎ বব এসে উপস্থিত হল। কি গৌতম, কোনো খারাপ খবর পেলি নাকি ? সে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

তাকে সমস্ত কিছু বললাম। সে কিছু না বলে আমার কাছ থেকে দিয়াশলাইয়ের বাক্সটা চেয়ে নিয়ে একটা অর্ধভুক্ত সিগারেট জ্বালাল। সিগারেটের ধোঁয়া সে নাক মুখ দিয়ে বের করে দিয়ে খুব নির্বিকারভাবে বলল, খুনি ধরা পড়েছে কি ?

—না না, ধরা পড়েনি। তুই কিছু জানিস নাকি ?

সে পুনরায় সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান মারল। তারপর খুব আরামে ধোঁয়া বের করে টেবিলের উপর পড়ে থাকা ম্যাগজিনের পাতাগুলি ওল্টাতে ওল্টাতে গভীরভাবে উত্তর দিল— 'খুনি কোনোদিনই ধরা পড়বে না।'

-- কেন ?

-- খুন করেছি আমি। আর আমাকে জীবন্ত ধবার কারও সাধ্য নেই।

তার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিন্তু যে ভঙ্গিতে কথাগুলি বলল, যেন মানুষ নয়, পথের কুকুর একটাকে খুন করে এসেছে— আমি তার সামনে আমার বিস্ময়বোধ প্রকাশ করাটা অর্থহীন বলেই মনে করলাম। যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবেই বললাম, 'ও-কে তুই কেন মারলি ?'

আমার কথায় কান না দিয়ে সে ম্যাগাজিনের পাতাগুলি উল্টে যেতেই থাকল। তার মনটা উধাও হয়ে গেছে কোনো দূর দেশে। সমুদ্র পর্বত অরণ্য পার হয়ে। হয়তো ঠিক এই মুহূর্তে তার মন ঘুরে বেড়াচ্ছে বিদেশের পরিচিত মায়ার্মদির রাতের নির্জন অলিতে গলিতে, হোটেলের সোনালি সন্ধ্যার মদালস তরঙ্গ বিস্তারের মধ্যে। And your soul and my soul will meet in the day when I lay in this body down একটা করুণ নস্টালজিয়াবোধ আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার চিরদুঃখী চিরনিঃসঙ্গ মনটাকে।

- বব। আমি খুব কোমল কণ্ঠে ডাকলাম।

ও চট করে উঠে দাঁড়িয়ে রুমটাতে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে শুরু করল। আমি এবার একটু কঠোর কণ্ঠে বলে উঠলাম — বব, তোর হয়েছে কি ? ভালোভাবে কথা বলছিস্ না কেন ?

হুঁ ?

ও থেমে গেল। তারপর আগের জায়গাটাতে বসে ম্যাগাজিনটার একটা একটা করে পাতা ছিঁড়তে লাগল। মানুষটার ভিতরের একটা অন্ধ দানবীয় আবেগ যেন প্রকাশের পথ না পেয়ে গুমরে মরছে। এরপর সে কি করতে পারে তা ভেবেই আমার ভয় করতে লাগল।

গৌতম, তুই কি কখনও মানুষ খুন করেছিস ?

বব পাগল হয়ে গেল নাকি ? আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সে আপন মনে বলে যেতে লাগল —করিস নি ? তুই মূর্খ। তুই জীবনের কিছুই জানিস না। মৃত্যুকে যে সামনে থেকে দেখেনি সে জীবনকেও দেখেনি। খুন করতে হলে গলা টিপে মারাটাই উৎকর্ষ পন্থা। তোর দেহ যন্ত্রের ভেতরের যে কোনো রহস্যময় স্পন্দন তোকে দিয়ে ছবি আঁকায়, গান গাওয়ায়, মেয়েদের দেহ নিয়ে বিচিত্র খেলা করায়, সেই স্পন্দন যখন তোর সামনে কোথাও উড়ে যাবার জন্য ধড়ফড় শুরু করে, ইশ্, সেই দৃশ্য কী ভীষণ সুন্দর তুই যদি একবার দেখতে পেতিস।

আমি কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সে আমাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে স্বগতোক্তি করার মতো বলে যেতে লাগল - তার রক্তাক্ত উত্তেজনা তোর মনে এনে দেবে একটা অদ্ভুত অভিনব আনন্দ। তোর মনে হবে, তুই যেন কোনো অদৃশ্য যাদুকরের হাতের ভেল্কিবাজি দেখছিস। কিন্তু সাবধান, তুই কিন্তু নিজে উত্তেজিত হলে চলবে না। শান্ত নির্বিকার মন নিয়ে তোকে সম্পূর্ণ দৃশ্যটা দেখতে হবে।

– বব, তুই কি পাগল হয়ে গেলি ?

অবশেষে আমি বলে উঠলাম। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ যে এই সমস্ত কথা এত সাবলীলভাবে বলে যেতে পারে তা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হল। কিন্তু আমার কথা সে কানেই তুলল না।

– ওকে তুই খুন করলি কেন ?

আমি পুনরায় ববকে জিজ্ঞেস করলাম।

ও চেয়ারটাতে বসে পড়ল। ও যেন নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে এভাবে গলার স্বরটা আগের থেকে একটু নিচু করে বলল—বলতে পারি না। এটাই বলতে পারি যে ওকে মেরে ফেলতে আমার ইচ্ছে করছিল। আমার মনের অন্ধকারে সে সময় কি শক্তি কাজ করেছিল তা আমি জানি না। আমি প্রায়ই তার কাছে যাই। ওর যৌবন শেষ হয়ে এসেছে, প্রায় বুড়িই বলতে পারি। যৌবনের প্রান্তসীমায় এই অর্ধবয়সী মহিলার প্রতি আমি একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করি। তার কাছে যাতে অন্য মানুষ আসতে না পারে সে জন্য আমি ওকে প্রচুর টাকা দিয়েছিলাম। তবুও সে লুকিয়ে লুকিয়ে মানুষ আনত। টাকার লোভেই যে সে এটা করে তা আমি বিশ্বাস করি না। রিপুর তাড়নায় ? না, তাও নয়, বেশ্যার দেহের ক্ষুধা বলতে কোনো জিনিস থাকে না। খুব সম্ভব ......

ববের মুখে নারীর মনস্তত্ত্ব শোনার ধৈর্য আমার ছিল না। আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম - তুই তাকে কেন খুন করলি আগে সে কথাটা কেন বলছিস না ?

বব কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সে বাধ্য হয়ে কোনো উপায় না পেয়ে বলে চলল—কারণ আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম। ও বুড়ি হয়ে যাচ্ছিল। বেশ্যার যৌবনের বাইরে আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আমি ওকে মুক্তি দিলাম। রক্ষা করলাম।

মারতে ইচ্ছে করছিল বলেই বব একটা মানুষকে মেরে ফেলল। কিন্তু শুধু তাই নয়, এরপরও সে আরও দুটো খুন করল। অবশ্য সে দুটোই টাকার জন্য। কিন্তু ডাকাতির যে বর্ণনা ও আমাকে শুনিয়েছিল তার থেকে মনে হয় না যে শুধু টাকার জনাই ও খুন করেছিল।

একদিন সন্ধ্যা। বব আমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে এনেছে মিলন রেস্টুরেন্টে। নামে যদিও রেস্টুরেন্ট আসলে শহরের গুণ্ডাবদমাশ আর মদ্যপদের আড্ডাখানা। সন্ধ্যার ঠিক পরেই আমরা সবাই প্রায় প্রতিদিনই এখানে এসে জমায়েত হই আর মধ্যরাত পর্যন্ত হৈ-হল্লা করে জুয়ো খেলি, মদ খাই, আমাদের ভবিষ্যৎহীন জীবনের ভয় এবং দুশ্চিন্তাগুলি ভুলে থাকতে চেষ্টা করি।

একটা ঘূর্ণায়মান টেবিলের চারপাশে আমরা পাঁচজন -- আমি, বব, রানা, ভিক্টর এবং ইদ্রিস মুখোমুখি হয়ে বসলাম। আমরা প্রত্যেকেই ভদ্রলোকের মতো শান্ত এবং নীরব হয়ে ববের কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছি। আজ অন্যান্য দিনের মতো হৈ-হল্লা একেবারেই নেই। প্রত্যেকের মুখেই নীরব কৌতূহল। বব কোনো গোপন কারণে এই বিশেষ খাওয়ার আয়োজন করেছে। কারণটা তার বাইরে আর কেউ জানে না। জিজ্ঞেস করতেও কেউ সাহস করেনি। কারণ সে আগেই বলে দিয়েছে যে খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে কোনো কথাই প্রকাশ করবে না। খেতেই যথেষ্ট সময় লেগে গেল। আজকে অন্যদিনের উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত দেশী মদের পরিবর্তে সোনালি হাওয়ার্ড, অপর্যাপ্ত মাংস আর পোলাও। ধীরে ধীরে সব শেষ হয়ে এল। অবশেষে সেই চরম মুহূর্তটা এল। একটা প্লেয়ারস সিগারেট বব তার মাংসল ঠোঁটে ধরে অনুচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করল -- আজ আমার বিয়ে।

বিয়ে ! ববের বিয়ে, আকাশটা আমাদের মাথায় ভেঙে পড়লেও আমরা এর চেয়ে বেশি আশ্চর্য হতাম না। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। রাণার মুখ থেকে তার অজান্তেই সিগারেটটা খসে পড়ল। ইদ্রিস মদের গেলাসটা মুখের কাছে নিতে গিয়ে অর্ধেক পথ থেকেই ঘুরিয়ে এনে টেবিলে রেখে দিল। প্রত্যেকেরই প্রায় বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থা। বব বোধহয় এ ধরনের প্রতিক্রিয়াই আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেছিল। সেই জন্যই এই ষড়যন্ত্র।

আমাদের এ অবস্থা দেখে সে মুখ টিপে হাসতে লাগল। ধীরে ধীরে আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম। রাণা বলে উঠল - বব, এটা তোর কি ধরনের ব্যবহার, তোর বিয়ে, অথচ আমাদের কোনো কথাই জানালি না ?

বব বলল—তোদেরকে ভয়ে জানাইনি। তোদেরকে আগে জানালে আমার কি জানি বিয়ে করাই হত না, আমাকে কি তোরা আর মানুষ বলে মনে করিস ?

তার কথা মিথ্যে নয়। অন্তত আমি কথাটা আগে জানলে ববকে বিয়ে করতে দিয়ে একটা নিরীহ মেয়ের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনতে দিতাম না। কিন্তু যা হয়ে গেল তাকে তো আর ফেরানো যাবে না।

মেয়ে কোথায় পেলি—আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

বকুলবাগানে—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বব উত্তর দিল—যদিও কুলি মেয়ে, শরীরে বিলেতি রক্ত রয়েছে। ওর বাবা কে জানিস ? বাগানের ম্যানেজার গ্রেগরি সাহেব। ওকে দেখলে তোরা সবাই পাগল হয়ে যাবি। এতটাই সুন্দরী সে। অবশ্য ওর নামটা আমার খুব একটা পছন্দ নয়। আমি ওর নাম রেখেছি জুদি।

—কিন্তু ও তোকে বিয়ে করতে রাজি হল কেন ? আমার কথা শুনে বব হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল।

—ও রাজি হল কেন, তা আমি কি করে জানব ? তুই আমার সঙ্গে এখনই চল। জুদিকে তুই নিজেই জিজ্ঞেস করবি—ও আমার মতো একটা জানোয়ারকে বিয়ে করতে রাজি হল কেন ?

সে রাতেই ববের ঘরে গেলাম। তার নতুন সংসার দেখার জন্য। নারী সৌন্দর্যের বর্ণনায় আমি সিদ্ধহস্ত নই। মেয়েদের চোখে আমার কোনো মূল্য নেই বলে আমিও কোনো মেয়েকে ভালো চোখে দেখি না। কিন্তু জুদিকে দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ হলাম। তার জন্ম হয়েছিল অন্ধ উন্মুক্ত কামনার তরঙ্গ শীর্ষে; তার চোখের চাহনি মুখের গঠন, দেহের ভঙ্গিমা -- সব কিছুর মধ্য দিয়েই ফুটে

উঠেছে দেহসর্বস্ব যৌবনের উদ্ধত মহিমা। ববকে ও বিয়ে করতে রাজি হওয়াটা যে খুব একটা আশ্চর্যের কথা নয় সে কথা ওকে দেখেই আমি বুঝতে পারলাম।

প্রায় মধ্যরাতে ববের ঘর থেকে ফিরলাম। সেই যাওয়াই তার ঘরে আমার শেষ যাওয়া। তারপর কোনোদিন আমি আর সে-মুখো হইনি। তার কারণ ছিল। জুদিকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে কোনোদিন ওর জন্যই ববের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের ইতি হয়ে যেতে পারে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার অনুমানে ভুল ছিল না। অবশ্য দুর্ভাগ্যের শিকার আমি না হলেও আমাদের মধ্যেই একজন হল। ভিক্টর। জুদি ববের গৃহিণী হয়ে আসার পর থেকেই আমি ছাড়া আমার সমস্ত বন্ধুরাই ববের ঘরে নিয়মিতভাবে যাতায়াত শুরু করল। কিন্তু সবার মাঝখান থেকে শুধুমাত্র ভিক্টরই কিভাবে জুদির মনের মতো হল তা ভেবে আশ্চর্য হলাম। মেয়েদের কাম্য হিসেবে সেই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অযোগ্য ছিল বলে আমার ধারণা। ঢলঢলে আকর্ষণহীন ক্ষীণ চেহারার মানুষটা। কথাও বলে কম, অবশ্য নারী চরিত্র দেবা ন জানন্তি। সে যাইহোক না কেন, ববের বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই জুদি ভিক্টরের সঙ্গে আরম্ভ করে দিল এক বিচিত্র প্রেমের খেলা।

ববের কাছে ব্যাপারটা অজানা রইল না। কিন্তু সে সামনাসামনি কিছু না বলে আমার কাছে এসে সমস্ত কথা বলল। তার কথা শুনে আমি একটা গোপন আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। এবার কার ভাগ্যে যে কি আছে কে জানে ? কথাটা হাল্কা করার জন্য আমি বললাম—একটা সাধারণ মেয়ের জন্য তুই এত ভেবে মরছিস কেন ? ও না হয় তোর সঙ্গে নাই থাকল, তার থেকে তোর কি ক্ষতি হল ? দেহের ক্ষুধা মেটানোর জন্য সংসারে আরও অনেক রাস্তা রয়েছে ।

দেহের ক্ষুধা ? আমার মুখে দিকে না তাকিয়ে সে স্বগতোক্তি করার মতো বলল -- আমি কি কেবল দেহ ? খুনী বা গুণ্ডা বলে কি আমার হৃদয় বা মন বলে কোনো জিনিস নেই ?

- থাকলই না হয় তোর হৃদয়। বা মন। তার সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্কটা এল কোথা থেকে ?

ববের সঙ্গে আগে যে ভাষায় কথা বলছিলাম, সেই ভাষাতেই আমি কথাগুলি বললাম।

আমার কথা শুনে বব নীরব হয়ে গেল। কিন্তু আমি ভালোভাবেই বুঝতে পারলাম, তার অন্তরে অনেক কথাই গুমরে মরছে। কেবল সে সাজিয়ে বলতে পারছে না। হয়তো সে বলতে চাইছিল, শুধুমাত্র নারীদেহ সম্ভোগেই তার বাসনার শেষ হয়ে যায়নি। পৃথিবীর প্রতিটি সৌন্দর্যময় দৃশ্য আমাদের হৃদয়ে যে মৃত্যুর আকৃতি জাগিয়ে তোলে, এই খণ্ডিত অসম্পূর্ণ বিশ্বের ওপারে জীবনের পরিপূর্ণ রূপ দেখায়, যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে, নারীর প্রেমের মধ্য দিয়েও আমরা লাভ করি সেই একই আবেগময় অভিজ্ঞতা। শুধু তাই নয়, শিল্প তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আত্মার মুক্তি বা প্রকাশের যে উল্লাস অনুভব করে, সাধারণ মানুষ সেই দুর্লভ তৃপ্তির আস্বাদ পেতে পারে একমাত্র নারীর হৃদয়ের রহস্যের অন্ধকারে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে। কোনো সৃজনশীল কর্মের মধ্য দিয়ে যে হৃদয়ের আবেগ প্রকাশের সুযোগ পায়নি, নারীর প্রেমেও যার জীবন ধন্য হয়নি, সে দুর্ভাগ্যময় জীবনের অনির্বচনীয় রহস্য চেতনা থেকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত। জীবনের কোনো সম্ভাবনাতেই সে বিশ্বাস রাখতে পারে না।

অবশ্য এ সমস্ত কথা বব আমাকে নিজে বলেনি। সে নিজে কোনো কথাই বলতে পারে না। তার সম্পর্কে আমি যে সমস্ত মন্তব্য করেছি তার সবই আমার অনুমান মাত্র। কিন্তু তার সঙ্গে আমার এতই ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তাকে এতটা সহানুভূতির সঙ্গে আমি বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম যে আমার অনুমান খুব একটা অসত্য হবে না বলেই মনে হয়।

বব অনেকক্ষণ নীরব থেকে এবার হঠাৎ বলে উঠল -- আচ্ছা গৌতম, আমি এখন যাই। কিন্তু একটা কথা। আজ রাত দশটার সময় তোকে একবার আমার ঘরে আসতে হবে। খুব দরকারী কথা রয়েছে।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ববের মানসিক অস্থিরতার কথা ভেবেই নির্দিষ্ট সময়ে তার ঘরে উপস্থিত হলাম। দরজাটা খোলা ছিল। ভেতরে ঢুকে দেখলাম, বব একটা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। আমাকে দেখামাত্র তার মুখে একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল। আমি বসেই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, জুদি কোথায় গেল ?

--এসেই দেখি জুদির খবর নিচ্ছিস ? কোনো মতলব রয়েছে নাকি ?

বব আমাকে একটা সিগারেট দিল। তারপর সামনের বিছানা থেকে একটা কম্বল তুলে নিয়ে বলল, এই দেখ জুদি।

আমি ভয় আর আতঙ্কে লাফ মেরে উঠলাম। এত নিষ্ঠুরভাবে জুদিকে হত্যা করা হয়েছে যে সমস্ত দৃশ্যটার ভয়াবহ অমানুষিকতা দেখে আমার শরীরের লোমগুলি শিউরে উঠল। একটা শব্দহীন আর্তনাদ আমার কণ্ঠ পর্যন্ত এসে সেখানেই থমকে গেল।

তোর কাছ থেকে এসেই আমি অনেক কথা চিন্তা করলাম -- বব শান্তভাবে বলতে লাগল। একবার ভাবলাম, ভিক্টরকেই মেরে ফেলি। কিন্তু তাতে আমার কোনো লাভ নেই। জুদিকেও আমি খুব সহজভাবেই মারতে পারতাম। কিন্তু তার দেহ থেকে শেষবারের মতো চরম তৃপ্তিকণা উজাড় করে নেবার জন্যই আমি তাকে তিল তিল করে হত্যা করেছি। মরতে সে তিন ঘণ্টার মতো সময় নিয়েছে। হাতুড়ির প্রথম আঘাতটা পড়তেই তার মাথা থেকে রক্তের স্রোত যখন ফিনকি দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছিল, আমি আনন্দে উত্তেজনায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। ওকে তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে আমার মন চাইছিল না। রক্ত বের না করে মানুষ খুন করাটা মূর্খামি মাত্র। হত্যার আসল সৌন্দর্য নিহিত থাকে রক্তের উত্তেজনায়। মানুষের জন্ম যেমন একটা রক্তাক্ত বীভৎস কাণ্ড, মৃত্যুও হওয়া উচিত তেমনই। কি বলিস ?

আমি কি বলব ? আমি কেবল মনে মনে ভাবতে শুরু করলাম -- জুদিকে হত্যা করে বব তার নিজের জীবন বিপদাপন্ন করেছে, একটা প্রচণ্ড আবেগের বেদিতে সে তার জীবন বলি দিয়েছে। অথচ - আমার অনুভব হল, ঠিক এই মুহূর্তে তার থেকে সুখী মানুষ যেন আর কেউ নেই। কারণ সে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে।

এখন কি করবি ?

- পুলিশ আসার অপেক্ষায় থাকব। তুই চলে যা।

আমি নিজেও ভাবলাম, আমার এখান থেকে চলে যাওয়াতেই মঙ্গল। কিন্তু আমি যেতে পারলাম না। ববের নীরব কিন্তু বাঙময় মুখমণ্ডলে জীবনের যে একটা রহস্যময় নাটকের অভিনয় চলছিল সেদিকে তাকিয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

অদৃষ্টের মালিক

হরেকৃষ্ণ ডেকা

সে দূর থেকেই দেখতে পেল গুপ্তজী তাঁবুটিতে বসে রয়েছে। তার সামনে বিরাট খতিয়ানটা। এই দৃশ্যটি চিরস্থায়ী হয়ে পড়েছে, যেমন করে তাঁবুটা আয়ুর মত অস্থায়ী, কিন্তু এই জায়গাটিতে, নদীর এই পারটিতে গুপ্তজী, তাঁর খতিয়ান এবং তাঁবু চিরপ্রবহমান। নদীর পারের এই জায়গা থেকে ওপারের দিকের রম্যভূমিতে গেলে স্থায়ী, অস্থায়ীর কোন ভেদাভেদ থাকে না, সেখানে শব্দ দুটিই অর্থহীন। কিন্তু এখানে নদীর বিশাল পারে, ওপার থেকে আসা সত্তাগুলির স্মৃতিমণ্ডল সজীব হয়ে থাকার জন্যই, নিষ্কাশনের আকস্মিকতা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে পড়তে পারে। তাই পারঘাট এবং তাঁবুর পারাটও একটা রূপ রাখা হয়েছে। রম্যভূমির শোধন ক্ষেত্রে যাবার পরে স্মৃতিগুলিকে শোধন-বাষ্প [illegible] আনন্দ দান করে। সেখানে অবশ্য নির্বাণ এবং আনন্দ শব্দ দুটিরও কোন অর্থ নেই। কিন্তু এর চেয়ে কোন ভাল মানবীয় শব্দ সেই অবস্থাটিকে বোঝাতে পারবে না। সেই স্তরে যাবার আগে তাঁবু থাকা এই স্তরটি প্রস্তুত ভূমি। গুপ্তজী কেবলমাত্র খতিয়ানটিতে নামই লেখেন না। তিনি সত্তাগুলিকে সহজ উত্তরণের জন্য প্রস্তুত করে তোলেন। নদীতীরের পলি মাটির বালির একধরণের ভুলে যাবার ঔষধ তিনি তৈরি করে রাখেন আর রম্যভূমিতে যাবার আগে ওপার থেকে আসা আগন্তুকের স্মৃতির উপরে একটা প্রলেপ দিয়ে দেয়। রম্যভূমিতে যাবার আগেই আগন্তুকের উপর তার ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। আগন্তুক অবশ্য টের পায় না।

নদীটার এই পারে জলের ঢেউগুলি একটা সুষম ছন্দে প্রবাহিত। সে জানে ও পারটা সম্পূর্ণ বিপরীত। ও পারে নদী বড় উত্তাল। সমস্ত সত্তাই ভীষণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নদীটা পার হয়। সে জানে। কারণ অজস্রবার সে ও-পারে গেছে। আগন্তুক যাত্রীদের নিরাপদে এই পারে আসায় সাহায্য করার দায়িত্ব তার। তার মত এরকম সাহায্যকারী অনেক আছে। ও-পারে গেলে কখনও কখনও

আগন্তুকের আবেগ অনুভূতির রোগে সে-ও আক্রান্ত হয়। অন্যান্য সহকারীদেরও হয়। তাই আগন্তুকদের সাবধান করে নিয়ে আসার পরে সে এবং অন্যান্য সহায়ক প্রত্যেককেই শোধনক্ষেত্রে যেতে হয়। সেখানে এক অসাধারণ রশ্মি আগন্তুকদের সঙ্গে তাদেরকেও শোধণ করে উত্তোলন করে।

এরকম একটা শোধনের পরেই দায়িত্ব নিয়ে ও-পারে যাবার জন্য পুনরায় সে এসেছে। আপেক্ষিকভাবে প্রায় একবছর পার হয়ে গেছে। আপেক্ষিক, কারণ সময়ের এ ধরণের সূচক ও-পারেই প্রযোজ্য। এখানে অর্থহীন।

তাঁবুতে প্রবেশ করার আগে সে একবার আকাশের দিকে তাকাল। আত্ম-উদ্ভাসিত এক নির্মল শূণ্যতা। তাতে কোন রঙ নেই। তবুও যেন কোন এক শুভ্র স্বচ্ছতা মহাব্যোমরূপে গভীর হয়েছে আর অনন্তের দিকে যাত্রা করেছে। এই দৃশ্যপটে তাঁবুটা বিসদৃশ। এটার ও-পারের কোলাহলময় কর্কশতার সঙ্গেই খাপ খায়। আগন্তুকরা আশ্চর্যস্মু আকাশের সম্মুখীন হয়ে বিস্ময় বিহুল হয়। তখন তাঁবুটা দেখে আশ্বস্ত হয়।

সে তাঁবুটিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে খতিয়ান থেকে মুখ তুলে গুপ্তজী তার দিকে তাকালেন। গুপ্তজীর শুভ্র কেশ। কপালে বলিরেখা। মুখমণ্ডলে চিরবার্ধক্যের ছাপ। গুপ্তজীর এই রূপটিও পরিকল্পিত। আগন্তুকদের আস্থা অর্জনের প্রয়োজনে। প্রাচীনতার সঙ্গে প্রজ্ঞাকে সংমিশ্রিত করে দেখতে আগন্তুকরা অভ্যস্থ। তাই গুপ্তজীর অবয়ব চিরবৃদ্ধের।

গুপ্তজী বললেন—'এসেছ? এবারই একই দায়িত্ব পড়েছে। এবার ভুল করবে না।'

সে মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, গতবার তার ভুল হয়েছিল। আবেগ অনুভূতিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল সে। কর্তব্য সমাপ্ত না করেই ফিরে এসেছিল। সুদীর্ঘ শোধনের প্রয়োজন হয়েছিল তার। গুপ্তজীই ভাল। গুপ্তজীর সে ধরণের ভুল করার সম্ভাবনা নেই। আগন্তুকরা এখানে আসার পর তাদের আবেগ অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায় না, কিন্তু অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সংক্রামক নয়। তাকে যেতে হয় আগন্তুকদের মাঝখানে; ও পারে আর সেখানে এগুলি সংক্রামক। করুণা, দয়া, মায়া, মোহ আদি শব্দে তাদের মনে ভেতরের ঢেউগুলিকে বোঝান হয়। সেই ঢেউগুলির স্পর্শকে এড়ানো যায় না।

সে নদীটার দিকে তাকাল। সেখানে জল শান্ত, নির্মল, নিরবচ্ছিন্ন। নদীটার মাঝখানে কুয়াশার মত এক মস্ত আবরণ আকাশ থেকে নেমে এসে নদীটিকে ঠিক মাঝখানে দু'ভাগে ভাগ করেছে। এই আবরণের মধ্য দিয়ে ও-পার দেখা যায় না। কুয়াশার মত হলেও এ কুয়াশা নয়। এক পরিমণ্ডল। এই পরিমণ্ডলের আবরণ ভেদ করে ও-পারের শব্দ, ধ্বনি, দৃশ্য এখানে এসে পৌঁছায় না। ও-পার থেকেও এই অভিপ্রেত উপকূল দেখার উপায় নেই। তাই কত রহস্যময় নাম দিয়ে দিয়েছে ওরা। অভিপ্রেত, কিন্তু আসার সময় না আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, প্রত্যেকেরই কত অজুহাত, কত অসমাপ্ত কর্মের দোহাই। গুপ্তজীর দিকে তাকিয়ে সে বলল,— এবার আর ভুল করব না।' সে কথাটা শেষ করার আগেই নদীর মাঝখানের শক্ত আবরণটা কি একটা আন্দোলনে কেঁপে উঠল। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কোন এক ক্রুদ্ধ, কর্কশ গর্জনের মত ধ্বনি যেন আবরণটাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিছু সময় আন্দোলিত হয়ে আবরণটা পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে এল আর শব্দগুলিও কিছুক্ষণের মধ্যেই নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল। সে অবাক হয়ে আবরণটার দিকে তাকাল। সে বুঝতে পারল এই আশ্চর্য ক্রিয়া ও-পারের ক্রুদ্ধ ধ্বনির বিকৃত প্রতিক্রিয়া। কিন্তু আগে কখনও সে এ ধরণের ক্রিয়া দেখেনি। ও-পারের কোন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া, কোন ধ্বনির প্রতিধ্বনি, কোন দৃশ্যের প্রতিদৃশ্য,

আবরণ ভেদ করতে পার না। আগে কখনও পারে নি। এটা একটা বিরল ঘটনা, আবরণটির আন্দোলন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

সে গুপ্তজীকে জিজ্ঞেস করল 'এটা কী হচ্ছে?'

গুপ্তজী চিন্তিত মনে এই দৃশ্যটা দেখছিলেন। তিনি বললেন—'হ্যাঁ, কিছুদিন থেকেই ও-পার থেকে অদ্ভুত শব্দ, চিৎকার এদিকে আসতে শুরু করেছে। আবরণটা পাতলা হয়ে পড়েছে নাকি?'

মালিককে বলতে হবে। গুপ্তজী মালিক বলেই ডাকেন। অদৃষ্টের মালিক। গুপ্তজীর নিজের দেওয়া নাম নয়। আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করতে একটা সান্ধ্য ভাষা এখানে প্রচলিত হয়ে গেছে। এই ভাষায় যাকে মালিক বলা হয়েছে, তার পক্ষে এ ধরণের ভাষা বলায় কোন বাধা নেই। এটা একটা নিয়মই হয়ে পড়েছে যে আগন্তুকদের এখানে সহজ হওয়ার জন্য তাদের ভাষাকে এখানে ব্যবহার করার প্রয়োজন।

অনেকদিন আগে ওখান থেকে আসা কোন একজন আকুল হয়ে বালিতে গড়িয়ে গড়িয়ে কাতর চিৎকার করছিল, 'হে অদৃষ্টের মালিক, হে অদৃষ্টের মালিক।' আগন্তুকদের এ ধরণের বিহ্বলতা আশ্চর্য নয়। অনেকেরই অবশিষ্ট আবেগ শেষ সময়ে বেগবান হয়ে অদ্ভুত আচরণে পরিণত হয়। সেই আগন্তুক 'অদৃষ্টের মালিক' কে সম্বোধন করছিলেন। অন্যেরা অন্য নামে সম্বোধন করে, স্মরণ করে, বিহ্বল হয়ে, উত্তাল হয়ে চিৎকার হরে। 'অদৃষ্টের মালিক' সম্বোধনটা শোনার পরই গুপ্তজীর পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তখন থেকেই গুপ্তজী মালিক বলে ডাকেন। ভেতরের রম্যভূমিতে গেলে এই শব্দ অর্থহীন হয়ে পড়বে। এখানে 'মালিক' শব্দটা সাময়িক প্রয়োজন মেটায়।

'অদৃষ্টের মালিক'-কে বলার জন্য গুপ্তজীর ভেতরে যাবার প্রয়োজন হয় না। এখান থেকেই বায়বীয় সংকেত পাঠাতে পারেন। অবশ্য গুপ্তজী এখনও সেরকম সঙ্কেত পাঠানোর সময় হয়েছে বলে ভাবেন না। কারণ তিনি কথাটা বলেই খতিয়ানে মনোনিবেশ করলেন। সে যাকে সহজ সঙ্গ দিয়ে এখানে পার করে আনতে হবে সেই আগন্তুকের নাম তাকে দিল। গতবারের নামটাই। সে জানে এবার তার কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করতে না পারলে. দীর্ঘদিনের যন্ত্রণাময় সময় তাকে ও-পারে কাটাতে হবে। সেটাই তার শাস্তি হবে। সে শাস্তির সময়টুকু ও-পারের নদীর দুরন্ত ঢেউগুলি অনায়াসে অতিক্রম করে আসতে পারবে না। আগন্তুকদের ও-পারের জীবনের সঙ্গে তার জীবনের কোন পার্থক্য তখন থাকবে না।

গুপ্তজীর এগিয়ে দেওয়া পারপত্রটা সে হাতে নিল। পারপত্র না। পরিচয়পত্র। গুপ্তজী অন্যদিকের পারটিকে বোঝানোর জন্য পারপত্র শব্দটি ব্যবহার করেন। পারপত্র হাতে নিয়ে নৌকার ঘাটে সে এলো। সেখানে নৌকো সহ পরিচিত মাঝি অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখে একটা মুচকি হাসি হাসল। গতবার এই নৌকোতেই সে পার হয়েছিল। সে ফিরে আসার সময় তার সঙ্গে কাউকে না দেখে মাঝি অবাক হয়েছিল। কারণ ওপারে যাবার অর্থই হলো কোন আগন্তুককে সঙ্গে করে নিয়ে আসা। মাঝির প্রশ্ন করার কোন নিয়ম নেই। কিন্তু বুঝতে পারে কী ঘটেছিল। এবারের মুচকি হাসটার উদ্দেশ্য হল ভরসা দেওয়া, অনিশ্চয়তার বোধ থেকে তাকে মুক্ত করা। সেও একটা মুচকি হাসির সাহায্যে উত্তর দিল। কুশল বিনিময় ছাড়া অন্য কোন কথোপকথন তাদের মধ্যে হয় না। যাত্রী কে, কি ধরণের ইত্যাদি বিষয়ক কথাবার্তা তাদের জন্য নিষেধ।

মাঝি নৌকোটা ছেড়ে দিল। স্বচ্ছন্দ গতিতে নৌকো নির্মল জলের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল। বেশী দুর যায় নি। হঠাৎ শুভ্র আবরণীতে একটা ঢেউ আন্দোলিত হল। আগের ঢেউটির মতই। একটা

কর্কশ দূরাগত শব্দ ঢেউয়ের কম্পনে তরঙ্গায়িত হয়ে মিলেমিশে গেল। তারপরে শক্ত, শুভ্র আবরণটা ক্ষণিকের মধ্যেই স্থির, স্বাভাবিক হয়ে পড়ল। মাঝি বলল—'ওপারের চিৎকার- চেঁচামেচি পর্দাটিকে বারবার আঘাত করছে। কখন যে পর্দাটা ফেটে যাবে। আগে কখনও এরকম হয় নি।'

পর্দা, চিৎকার-চেঁচামেচি আঘাত করা—এ সমস্ত ও-পারের ভাষা। মাঝির মুখে সেই ভাষার বুলি ফুটতে শুরু করেছে।

'ক্র্যাচ'। জোবে ব্রেক কষায় বাসটা শব্দ করে কিছুটা দূর ছেঁচড়ে গেল। অপ্রস্তুত যাত্রীরা একজন আরেকজনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ড্রাইভারের মুখ দিয়ে শব্দ বেরোল—'শালা'। ব্রেক মেরে থামানো ছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। সামনের রাস্তা জুড়ে তিন তিনটে বড় টায়ার দপদপ করে জ্বলছে। রাস্তা বন্ধ। ড্রাইভার পেছন দিকের সহকারীকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল,—'ঐ বে আজ বন্ধ নাকি বে?' সহকারী চিৎকার করে উত্তর দিল—'না তো আজ তো বন্ধ নেই।' ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'ডাকাত নাকি বে?' সহকারী উত্তর না দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে নেমে এলো আর জ্বলন্ত টায়ারগুলির দিকে এগিয়ে যেতে চাইল। সামনের দিকে যেতে দেখে ড্রাইভার নিজের সিট থেকে চিৎকার করতে লাগল, 'ঐ সামনে যাবি না, বিপদ রয়েছে।' সামনে কোন জনপ্রাণী ছিল না। তবুও সে সন্দেহ করে কথাটা বলল।

ড্রাইভারের মুখের কথাটাই যেন ফলে গেল। হঠাৎ বাঁশের ঝোপের পেছন দিক থেকে চারটে যুবক ছেলে দৌড়ে এল। তাদের মুখে কাপড় বাঁধা। হাতে একটা করে লাঠি। তারা প্রত্যেকেই সহকারীকে চারিদিক থেকে ঘিরে দাঁড়াল। কর্কশ স্বরে একটা ধমক মেরে একজন জিজ্ঞেস করল, 'ঐ শালা তুই দেশোয়ালি নাকি?' আর একজন একটা ধাক্কাই মেরে দিল। সহকারী উত্তর দিল, 'না না আমি নীপেন। বরগাঁও-এ আমার ঘর। অন্যজন তখন জিজ্ঞেস করল, ঐ বাসে কয়টা দেশোয়ালি রয়েছে? ড্রাইভারটা দেশোয়ালি নাকি বে? সহকারী জানে ড্রাইভারের বাড়ি ইউ.পি-র বালিয়াতে। কিন্তু দুই পুরুষ ধরে এখানে রয়েছে। গড়গড় করে অসমীয়া বলতে পারে। কখনও বা তার মুখ থেকে মিশ্রিত ভাষা বের হয়। ভয়ে সিঁটিয়ে গেলেও নীপেন বুদ্ধি হারায় নি। সে বুঝতে পারল যে এই দৈত্যগুলিকে সে যদি ড্রাইভারের আসল পরিচয় দেয়, তাহলে তার নির্ঘাৎ মৃত্যু হবে। সে মিথ্যে কথা বলল। ড্রাইভারকে শুনিয়ে সে চিৎকার করে বলল, 'না-না, ও এখানকারই, ধলার দিকে বাড়ি।

ড্রাইভারের গলা শুকিয়ে গেল। সে বুঝতে পারল কি হতে চলেছে। একজন কর্কশ স্বরে তাকে ডাকল, 'শাল নবাবের বাচ্চা। সিংহাসনে বসে রয়েছে। নাম বেটা, এদিকে আয়।' সে ভয়ে ভয়ে গাড়ি থেকে নেমে এল। সে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডা প্রকৃতির দুজন যুবক কয়েকজন সহকারীকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে সবাই ঘিরে দাঁড়াল। কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা থাকার জন্য তাদের কাউকে চেনা যাচ্ছে না। একজন তাকে পরীক্ষা করার জন্য তাকে বলতে দিল, 'বল এক শ্বাসে বল, আমি গড়গড় করে অসমীয়া বলতে পারি।' সে বলল, 'আমি গড়গড় করে অসমীয়া বলতে পারি। তার সঙ্গে যোগ করে দিল, 'আমার নাম সুনীল শইকিয়া। ধলার সুন্দরচুকে আমার ঘর।' একটাও সত্যি নয়। ধলাটা সহকারীর প্রয়োগ। সুনীল শইকিয়া, সুন্দরচুক তার আবিষ্কার। স, শ-র শুদ্ধ উচ্চারণে নিজেকে স্থানীয় বলে প্রমাণিত করার জন্য এভাবে বলল।

তার উত্তরে সবাই সন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হল। তথাপি তাকে একটা লাথি কষিয়ে ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতে গাড়ির দিকে নিয়ে এল। একজন বলল, 'চল শালা তোর গাড়ি খানাতল্লাসি করব।

গাড়িতে যদি দেশোয়ালি [illegible] ওদেরও মারব আর তার সঙ্গে তোদেরও [illegible] দেব। যে যুবকটিকে দলের অধিনায়ক বলে মনে হচ্ছে সে একটা হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল খানাতল্লাশির পরে গাড়ি ঘুরিয়ে নিব। আগে যেতে পারবি না।'

বাসের সামনের দিকের একটা সিটে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে সে বসেছিল। তার ভয় করছিল না। এই মুহূর্তে এই ঘটনা আকস্মিক আর অনভিপ্রেত। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনা ঘটেই থাকে। সে-ও সমস্ত রকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়েই আসে। পরিচয়পত্রের মধ্যেই যে কোন অবস্থা সামলে নেবার উপায় থাকে।

একজন যুবক তার সামনে এগিয়ে এল। তার পরিচয় জিজ্ঞেস করল। সে মুখে কোন শব্দ না করে পরিচয়পত্রটি এগিয়ে দিল। যুবকটি ভাল করে দেখে কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি কি করেন?' এর উত্তর মনে মনে তৈরী করে রাখাই ছিল, বললেন, 'গবেষণা করি, নৃতত্ত্বের গবেষণা।' যুবকটি কিছু বুঝতে পারল কি না বোঝা গেল না। কিন্তু তার উচ্চারণে সন্তুষ্ট হয়ে অন্য যাত্রীদের দিকে এগিয়ে গেল। বাসের ভেতরে কোন দেশোয়ালি নেই বলে নিশ্চিন্ত হয়ে তারা ফিরে গেল। নামার সময় বাসটাকে ঘুরিয়ে নেবার জন্য আবার সতর্ক করে দিয়ে গেল।

বাসটা বিপরীত দিকে চলতে শুরু করল। বাসটা এভাবে বিপরীত দিকে যেতে থাকলে সে তার গন্তব্যস্থলে সময়মত পৌঁছতে পারবে না। অন্য উপায় অবশ্য রয়েছে। কিন্তু এখানে সে এ পারের নিয়মনীতি মেনে চলবে বলে ভেবে রেখেছে। সে ড্রাইভারকে গাড়ি থামানোর জন্য বলার আগেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। একটা লেভেল ক্রসিঙের সামনে বাসটাকে থেমে পড়তে হল। ওদিক থেকে রেল আসছে, তাই লেভেল ক্রসিঙের গেট বন্ধ। সে তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে পড়ল। সে দেখল মাঠের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা রয়েছে। দূরে গ্রামের আভাস দেখা যাচ্ছে। এই মাত্র দেখে আসা দৃশ্যের মত তাতে যদি কোন বিপদ ওৎ পেতে থাকে, তবে তা তার জন্য নয়। সে দ্রুত মেঠো পথের আল ধরে এগিয়ে চলল। গন্তব্যস্থল তার পরিচিত। রাস্তা অপরিচিত হলেও দিক্‌নির্ণয়ে অসুবিধে হবে না।

পাকা রাস্তার যেখানে টায়ার পুড়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, তার পাশ দিয়েই সে পার হল। সেই দুর্বৃত্ত যুবক কয়জন এখনও গাড়িগুলি থামিয়ে দেশোয়ালির খোঁজ করছে। সে কোন দিক দিয়ে পার হয়ে গেল তারা বুঝতেই পারল না।

বাসে আসার আগে সে কিছুটা ট্রেনে করে এসেছিল। সে ট্রেনে ওঠা স্টেশনটিতে মানুষ গিজগিজ করছে। পূবমুখো রেলটিতে ওঠার সময় সে দেখেছিল, অপর একটি প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমমুখো রেলের জন্য শত শত মানুষ অপেক্ষা করছে। সঙ্গে পোঁটলা পুঁটলি। তাদের চোখে সন্দেহ আর আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠেছে। বন্দুক হাতে ইউনিফর্ম পরা কিছু প্যারামিলিটারি ফোর্স প্ল্যাটফর্মটা পাহারা দিচ্ছে। একটা অস্বাভাবিক পরিবেশ।

তার কামরায় তার পাশের সিটটিতেই একজন যুবক সাংবাদিক বসেছিল। তার মুখ থেকেই সে শুনতে পেয়েছিল চারপাশের উত্তেজনার কথা। একটি বিশেষ প্রদেশের লোকের উপর ইতিমধ্যে কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। সেই প্রদেশটিতে এখান থেকে যাওয়া কিছু রেলযাত্রীদের উপর করা অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া এসব। সাংবাদিকটা বলেছে ইতিমধ্যে কয়েকজন মারা গেছে। সৈন্যদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আনা হয়েছে। অশান্তি কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছে। কমে নি। এসব সব ভেতরে ভেতরে দিক থেকে পালি...

আসা গ্রামাঞ্চলের মানুষ। সেজনাই স্টেশনটিতে এত ভিড়।

সাংবাদিকের হাতে একটা ইংরেজী কাগজ 'ইস্টার্ন ক্রণিকল'। সে সেটা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে দেখছিল। ওটার প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড হরফে কয়েকটা নৃশংস ঘটনার বর্ণনা। একটা শিরোনাম 'Situation detoriorates, Army called in'। অন্য একটি ঘটনার বর্ণনায একটি পরিবারের চারজনকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার কাহিনী। আর একটায় পথের পাশে টিভি-তে ক্রিকেট খেলা দেখতে থাকা দর্শকদের উপর দুর্বৃত্তের নির্বিচার গুলি চালনা, ফলে কয়েকজন মানুষের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু। কাগজটার প্রথম পৃষ্ঠাতেই একটা ভয়াবহ অবস্থার রূপ ফুটে উঠেছিল।

টায়ার পুড়ে রাস্তা বন্ধ হওয়ার ঘটনাটা এরকম ঘটনারই জের মাত্র। অশান্তিকর অবস্থার এটা একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ। হয়তো ইতিমধ্যে কোন বাসের যাত্রী ওদের হাতে নিহত হয়েছে।

সে নির্দিষ্ট কর্তব্য নিয়ে এসেছে। নিয়তির ক্রিয়া নিষ্ঠুর খেলা না আনন্দের লীলা, এ সমস্ত ভাবার দায়িত্ব তার নয়। তাকে দেওয়া বিধিতে ভবিষ্যত দর্শনেরও কোন ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয নি। কর্তব্য পালন অবশ্য বিধেয়। তাতেই সে মনোনিবেশ করবে। গতবারের মত কর্তব্যবিচ্যুতির দোষে সে দোষী হতে চায় না। একটা বিশেষ মুহূর্তে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একটা কর্তব্য তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। সে কেবল আগে থেকে জানে না, সেই কর্তব্য পালন করতে যাওয়ার মুহূর্তটি কি পরিস্থিতির রূপ নিয়ে আসবে।

নির্জন পথের মধ্য দিয়ে সে দ্রুতবেগে এগিয়ে গেল।

ছোট নদীটার ঘাটটা সে চিনতে পারল। এদিক দিয়েই সে গতবার পার হয়েছিল। এখন পারটিতে কয়েকজন পুলিশের মানুষ টহল দিচ্ছে। এখানেও কিছু ঘটে গেছে নাকি।

গতবার আসার সময় সে একজন ফকিরের বেশ ধরে এসেছিল। এবারও তার জন্য একটা পরিচয়ের দরকার হবে। বাসে সে গবেষক হয়েছিল। কিন্তু এখানে এই পরিচয় আশ্চর্যকর বলে মনে হবে। তাই রেলে দেখা হওয়া সাংবাদিকের ভূমিকা নেওয়ার কথাটাই সে মনস্থির করল। গুপ্তজীর দেওয়া পারপত্রে পবিচয় পরিবর্তিত করার কায়দা তো রয়েছেই।

গতবারের ঘটনাটা তার মনে পড়ল। সেবার ফকিরের বেশ ধরে এই গ্রামেরই মাঝি একজনের নৌকায় উঠে সে নদীটা পার হয়েছিল। সে কবীরের দোঁহা গাইছিল। একটা সুললিত স্বব বেরোচ্ছিল। সে গাইছিল—

"জাকে প্রেম ন আওত হিয়ে
কাহ ভয়ে নয় কাশী বসে সে,
কা গঙ্গাজল পীয়ে,
কাহ ভঁয়ে নয় জটা বঢ়ায়ে
কা গুদরীকে সিয়ে।"

হিন্দিভাষী মাঝিটি আপ্লুত হয়ে সুললিত ধ্বনির দোঁহা শুনছিল। একটা দোঁহা শেষ হতেই সে ভক্তিতে গদগদ হয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, 'আরে, ক্যা সুন্দর ভজন রে বাবা, ঔর এক গাইয়ে মালিক।' আরও একটা নয়, কয়েকটাই গেয়েছিল সে। একটা পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজন বোধ করেছিল সে। সে জন্যই সে একটা একটা করে দোঁহা গাইছিল। ওপারে নামার সময় মাঝি ফকিরের কাছ থেকে পার করার ভাড়া চায় নি। তার প্রশ্নের উত্তরে মাঝি সানন্দিত মনে তাকে নির্দিষ্ট ঘরটি দেখিয়ে দিয়েছিল। নদীর পারেই ছিল গ্রামটি আর সে খোঁজ না করা ঘরটিতেই তার জন্য নির্দিষ্ট

কর্তব্য অপেক্ষা করছিল। সে জানত কখন মুহূর্তটি আসবে। সে জানত সেই মুহূর্তটির জন্য ঘটনাটা কী রূপ নিয়ে আসবে। অদৃষ্টের মালিক তাকে দীর্ঘ দর্শনের ক্ষমতা দেন নি।

বাশ, খড় দিয়ে তৈরি করা ঝুপড়ি ঘরের গৃহস্থালি। একপাশের দীর্ঘ গোয়ালঘরে কিছু গোরু। মূল ঘরটির বেশির ভাগ বাঁশ খড় দিয়ে তৈরি। কেবল একটা অংশে কয়েকটা টিন দেওয়ার পামঘরের চরিত্র থেকে গৃহস্থালি স্থাবর হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এতগুলি গরু রয়েছে যখন তখন গৃহস্থের দুধের ব্যবসা। গৃহস্থ ছিল না। মহিলাটি গোয়াল পরিষ্কার করছিল। গোবর এবং মাটির মিশ্রণ তৈরির একটা গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছিল। ছয়-সাত বছরের একটি ছোট মেয়ে বাইরে দৌড়াদৌড়ি করছিল। মা মেয়েটিকে চিৎকার করে বলছিল, ' নদীকে কিনার মৎ যানা মেরী বেটি।' এই শিশুটিকে লক্ষ্য করেই সে এখানে এসেছিল। ঘরটিতে যাবার তার প্রয়োজন ছিল না। সে নদীর পারেই বসেছিল। ফকিরকে দেখে ছোট মেয়েটি কৌতুহলের সঙ্গে এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছিল। আর পরিবেশটিকে সহজ করে বাখার জন্য সে দোঁহা গাইছিল—

'চীটা জহা ন চড়ী সকৈ
রাই নহী ঠহরায়,
আওয়াগওকী গম নহী
তঁহ সকলো জগ যায়।'

পিঁপড়ে যেখানে চড়তে পাবে না, সরষে যেখানে দাঁড়াতে পারে না, আসা-যাওয়ার জন্য যে জায়গা সুগম নয়, সে জায়গাতে সবাই যায়। আর—

'কামনা ভোরী লায়
পুঁকারে জীবকো,
হংসা চলে সঁভাল
মিলন নিজ পীবকো।'

কামনা রশির বাঁধন নিয়ে জীবকে ডাকছে, হংস নিজেকে সামলে প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের জন্য যাচ্ছে।

শিশুটি তার সামনে দাঁড়িয়ে একান্তমনে তার গান শুনছিল। সে হয়তো কিছুই বুঝতে পারছিল না। সে জানত, নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকলেও শিশুটিব মা-ও তার সুললিত কণ্ঠের ভক্তিগীত শুনছিল। আসলে আকস্মিক আঘাত থেকে মানুষটি যাতে কিছুটা শান্তি পায়, সে উদ্দেশ্যেই সে কবীরের দোঁহা গীতের সুরে গাইছিল।

কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে অপেক্ষা করছিল মুহূর্তটির জন্য। গোয়ালঘর পরিষ্কার করে মহিলাটি ঘরের ভেতর ঢুকে যাবার সময়ই ছল সেই মুহূর্তটি। সে গান বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি দৌড়ে গিয়েছিল নদীর একেবারে পাশটিতে। আর মেয়েটি পা পিছলে জলে পড়ে গিয়েছিল। সে সময়ে জীবনের প্রতি আসক্তি জীবের প্রবল হওয়াটিই স্বাভাবিক। তাই আতঙ্কে একটা বিকট চীৎকাব করে পড়ে গিয়েছিল। মা হন্তদন্ত হয়ে ভেতর থেকে দৌড়ে এসেছিল। তার দায়িত্ব ছিল, বন্ধনরজ্জু থেকে মুক্ত করে শিশুটির উত্তরণ সহজ করে তোলা। আর সহযাত্রী রূপে তাকে নিয়ে এসে গুপ্তজীব হাতে আগন্তুককে গছিয়ে দেওয়া। গুপ্তজীর কাছে সবাই শুধু আগন্তুক। সেখানে শিশু কিশোব প্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধেব কোন ভেদাভেদ থাকে না।

কিন্তু ভুল না হয়েছিল? উত্তোলন করার মুহূর্তে তার কী হয়েছিল? সকাতর দৃষ্টিতে শিশুটি তাকে আঁকড়ে ধরেছিল। জীবনের অসাভূতে শিশুটি জীবনমুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল। তার চোখে যে ফুটে উঠেছিল করুণ অনুনয় আর তার মন মমতায় সিক্ত হয়ে উঠেছিল। সে মেয়েটির বাঁধন ছাড়ানোর চেষ্টা না করে তাকে নিয়ে পারে উঠে এসেছিল। মা শিশুটির অর্ধচেতন দেহটি জড়িয়ে ধরার সময়ে নির্দিষ্ট মুহূর্তটি পার হয়ে গিয়েছিল আর মেয়েটি চোখ মেলে তাকিয়েছিল! মেয়েটির মা 'বাবা' 'বাবা' বলে কৃতজ্ঞতায় তার পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ায় সে অভিভূত হয়ে তার কর্তব্য থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছিল। সে রণভূমিতে ফিরে গিয়েছিল। এরকম ঘটনা মাঝে মাঝে হয়। কিন্তু সেগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। তার জন্যও বিধি দেওয়া রয়েছে। সেই বিধি অনুসরণ করেই তাকে দীর্ঘকালের জন্য শোধনাগারে পাঠানো হয়েছিল।

এবার সে ধরণের ভুল সে করবে না। সে টহলরত পুলিশ কয়েকজনের দিকে এগিয়ে গেল। সামনে গিয়ে দেখল ওরা তিনজনই আসলে হোমগার্ড। নদীর পারে একটা নৌকাও সে দেখতে পেল। সেখানে মাঝিটি কিন্তু নেই। সে তাদের একজনকে বলল, 'আমি ইস্টার্ন ক্রনিকলের সাংবাদিক। ওপারে যেতে চাই। মাঝি নেই নাকি?' সাংবাদিক বলে পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে হোমগার্ডটি একবার তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বলল, 'ও বাতাসে খবরের গন্ধ পেলেই। তবে ওদিকে গিয়ে লাভ নেই। নৌকোটিই শুধু আছে। মাঝি বা কোথায় পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। যেতে হলে নৌকোটা নিজেই চালিয়ে যান। ওপারে আমাদের সাহেব রয়েছেন।'

হোমগার্ডটি হালকা সুরের কথায় একটা সাংঘাতিক ঘটনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। কিন্তু সে তো আসল সাংবাদিক নয়। তার খবরের প্রয়োজন নেই। কেবল সঠিক মুহূর্তে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সে উপস্থিত হতে চাইছে। নদীটা সে পার হয়ে এলো। এসেই চোখে পড়ল গ্রামের বিধ্বস্ত রূপ। যেন কিছুক্ষণ আগেই এখানে একটা প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেছে। বেশিরভাগই ঝুপড়ি ঘর। ভেঙে ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে। কয়েকটা ঘর আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে। টিনের চালের কয়েকটা ঘরে এখনও আগুন জ্বলছে। এই দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন দারোগা, তার সঙ্গে কয়েকজন সিপাহী এবং সাধারণ পোষাক পরা একজন গ্রামের মানুষ। অন্য জনপ্রাণী নেই।

সে শুনল দারোগা মানুষটিকে জিজ্ঞেস করছে, 'তোরা কি করছিলি? গ্রামরক্ষী বাহিনী কেন পিশাচগুলিকে বাধা দেয় নি?' লোকটি এলোমেলোভাবে তার জবাব দিল, 'স্যার, কি বলবেন, বর্শা, দা, কাটারি নিয়ে একেবারে উন্মত্তের মত এসে হাজির হয়েছিল ওরা। আমাদের এখানের মানুষ নয় হুজুর। ঐ ও-পারের কোথা থেকে এসেছিল। আমরা পাহারা দিচ্ছিলামই। ওরা আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, খবরদার, যদি দেশোয়ালিদের বাঁচানোর চেষ্টা করিস, তোদেরকেও ছেড়ে দেব না। আমরা কীভাবে বেরোব হুজুর? একেবারে নরককুণ্ড করে ভোরের দিকে ফিরে গেছে। কোনদিকে গেল আমরা টেরই পেলাম না।'

দারোগা জিজ্ঞেস করল, 'তবে এই গ্রামের লোকগুলি কোথায় গেল? কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। কেউ মরেছে নাকি?'

গ্রামরক্ষী বাহিনীর লোকটি বলল, 'স্যার, ঘর দরজা জ্বালানোর সময়ই বেশিরভাগ মানুষ পালিয়েছে। রেলস্টেশনের দিকে গেছে বলে শুনেছি। ঘরের ভেতর দুই একটা মরে থাকতে পারে বোধহয়। ওদিকটাতে দেখুন তো হুজুর।'

দারোগার দেখার প্রয়োজন হল না। কয়েকজন সিপাহী ধ্বংসস্তূপ থেকে দুটো মৃতদেহ বের করে আনল। দারোগা তাদেরকে বলল, 'আরও খুঁজে দেখ। আরও হয়ত পাওয়া যাবে।' সিপাহী কয়েকজন আবার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ফিরে গেল। একজন সিপাহী পাশেই থাকা গোয়ালঘরটার দিকে এগিয়ে গেল।

সে গোয়ালঘরটা চিনতে পারল। গতবার ফকিরের বেশ ধারণ করে আসার সময় এই গোয়ালঘরেই মহিলাটি কাজ করছিল। ছোট্ট মেয়েটি দৌড়াদৌড়ি করছিল। কিন্তু মেয়েটি কোথায়? যদি মেয়েটি নেই, কি পরিস্থিতিতে কোথা থেকে সে তাকে নিয়ে যাবে? নির্দিষ্ট মুহূর্তের আর বেশি সময় বাকি নেই। যদি মেয়েটি রেলস্টেশনে পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে সেখানেও যেতে হবে। সেখানে মেয়েটির জন্য কোনও ঘটনা অপেক্ষা করে রয়েছে। তখন সে মেয়েটিকে আলগোছে রঙ্গভূমিতে নিয়ে যাবে। তার উপস্থিতিতে ঘটনাটা ঘটতে হবে, বিধি সেভাবেই ঠিক করা রয়েছে।

গোয়ালঘরের ভেতর থেকে একজন সিপাহীর চিৎকার ভেসে এল, 'স্যার স্যার, দেখে যান পিশাচগুলি কী কাণ্ড করে গেছে! দারোগা এবং তার সঙ্গের সিপাহীরা তাড়াতাড়ি করে সেদিকে এগিয়ে গেল। তাকে উপেক্ষা করলেও সে তাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল। নৃশংস ঘটনাটা তাদের সবার চোখে একসঙ্গে পড়ল। রক্তে মাখামাখি হয়ে সাত-আট বছরের একটি মেয়ে সেখানে পড়ে রয়েছে। উন্মত্ত পিশাচগুলি গলা কুপিয়ে কেটে রেখে গেছে। মেয়েটি নিস্পন্দ দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে। সেখানে একটা আতঙ্কের চাউনি স্থির হয়ে রয়েছে।

সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গ্রামটির উপর দিয়ে তুফানের মত ঘাতকের তাণ্ডব হয়ে গেলেও সে ভাবতে পারে নি যে তাকে এরকম একটা দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে হবে। এই মেয়েটিই সে, যাকে সে নিতে এসেছে। তার জীবনের শেষ মুহূর্তে যা ঘটার ছিল সেই ঘটনাটা ঘটা উচিত ছিল তার উপস্থিতিতে। সেটাই ছিল বিধি। কিন্তু এটা কী হল? রাতে তাণ্ডব করা অসহিষ্ণু ঘাতকদের চিৎকার চেঁচামেচি সে যেন শুনতে পেল। উন্মত্ত মানুষগুলি তাহলে মেয়েটিকে আগেই পাঠিয়ে দিল?

জীবকে নিতে আসার আগেই জীবকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে — এই বিধিও কি নিয়ন্তারই রচনা? ঘাতকদের চিৎকারগুলি ঘূর্ণির মত এসে তাকে বিভ্রান্ত করতে লাগল। 'অদৃষ্টের মালিক' অর্থাৎ নিয়ন্তার কাছে এর উত্তর খোঁজা ছাড়া উপায় নেই। সে ফিরে চলল।

তাঁবুটা দূর থেকেই তার চোখে পড়ল। গুপ্তজী অর্থাৎ চিত্রগুপ্ত খতিয়ানটা নিয়ে আগন্তুকদের অপেক্ষায় সবসময় সেখানে বসে থাকেন। আজ তার ব্যতিক্রম হয়েছে। গুপ্তজী তাঁবুর ভেতরে নেই। বাইরে দাঁড়িয়ে নদীর জলের দিকে তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন। তার দু'চোখে বিস্ময়। কিন্তু সেই অনুভূতিই গুপ্তজীকে ব্যাকুল করে তুলেছে। তাকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই গুপ্তজী চিৎকার করে বললেন, 'দেখদেখ, নদীটার দিকে তাকিয়ে দেখ।'

সে নদীর দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। বৈতরণীর এই পারের জল সবসময় নির্মল শান্ত, স্বচ্ছ -এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। এখন সেখানে প্রবল ঢেউ উঠেছে আর কিছু মানবীয় জীব জলের ঢেউয়ের সঙ্গে ভীষণ সংগ্রাম করে এই পারে নিজে নিজে আসতে শুরু করেছে। নদীর উপরের পারমণ্ডলকে দু'ভাগ করা আবরণটিতে এক ভীষণ আন্দোলন। ওপার থেকে আসা ক্রুদ্ধ কিছু ঢেউ ছিটকে ছিটকে এসে সেখানে ধাক্কা খাচ্ছে।

সে গুপ্তজীর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হচ্ছে এসব? অদৃষ্টের মালিক কেন কিছুই করছেন না? চিন্তিত মুখে গুপ্তজী তাকে তাঁবুর ভেতরে ডেকে নিল। সেখানে বায়বীয় সঙ্কেত গ্রহণ করার জন্য একটা মনিটর রয়েছে। সমস্ত বিধি, সমস্ত ঘটনা সেখানে ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করে রাখা আছে।

গুপ্তজী বললেন, 'আজ মনিটরটা দেখার সময় কিছু ঘটনা চোখে পড়ল। তারই কয়েকটি নমনা তোমাকে দেখাই। তাকিয়ে দেখ।' মনিটরে ফুটে ওঠা ঘটনার শিরোনামগুলি সে পড়ে যেতে লাগল,

'ইরাকে ব্যারাকের বাইরে ট্রাকে বোমা। ৩৩ জনের মৃত্যু।'

'ইস্তাবুলে ইহুদিদের প্রার্থনাসভায় বিস্ফোরণ। ২৯ জনের মৃতদেহ উদ্ধার।'

'আফগানিস্থানে হেলিকপ্টারের আক্রমণ। ৫জন মার্কিন সৈনিকের মৃত্যু।'

'অহায়ার রাজপথে ১২টি নির্বিচার গুলিচালনার ঘটনায় একই মানুষ জড়িত।'

'বিহারে রেলযাত্রীর উপরে দুর্বৃত্তদের অকথ্য অত্যাচার।'

'অসমে প্রতিক্রিয়া। উন্মত্ত আক্রমণে এখন পর্যন্ত ৩৩জনের মৃত্যু।'

গুপ্তজী বললেন, হয়তো আরও আছে। কিন্তু এ সমস্তই একমাসের ঘটনা।' সে জিজ্ঞেস করল, 'গুপ্তজী, এ সমস্ত ঘটনার কোন সংযোগ বা বিশেষত্ব আছে নাকি? সবগুলিই দেখছি দূরে দূরে সংঘটিত ঘটনা। এরকম হত্যার ঘটনা তো আগেও ঘটেছে। মালিকের খাতায় এ ধরণের ঘটনা তো অনেক লিখে রাখা আছে।' 'খাতায়' ওপারের শব্দ। নিজের অজান্তেই তার মুখ দিয়ে শব্দটা বেরিয়ে গেল।

গুপ্তজী চিন্তিত মুখে বললেন, ও হো, পার্থক্য আছে। এই যে ঘটনাগুলির কথা পড়লে, এ সমস্ত মালিকের বিধানে নেই। তুমি যে মেয়েটিকে আনতে পারলে না, সেই ঘটনাটাও তারই একটা। সেজন্যই চিন্তা করছি।'

ওপারের দিকে আঙ্গুল দিয়ে গুপ্তজী আবার বললেন, 'অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। ওরা এখন নিয়ন্তার বিধির জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে না। মৃত্যুর বিধি ওরা এখন নিজেরাই তৈরি করতে শুরু করেছে। ওদের দৃষ্ট জগতে দানবদের যাবার সময় ভাবা হয়েছিল সেই জগতের গভীর ঐতিহ্যের শুভসূচক দানবকে অন্তরীণ করে বাখবে। কিন্তু এই যে সমস্ত দেখছি, এগুলি মানুষেরই আস্ফালন। যে অন্ধকারে তারা দানবকে অন্তরীণ করেছিল, সেই অন্ধকার তাদের অন্তরেই ছিল বলে তারা জানতই না। এখন সংক্রামক ব্যাধির মত দানব ওদের সেই জগৎ অধিকার করে নিতে শুরু করেছে।'

নদীর ওপারে কাঁপতে থাকা আবরণটা দেখিয়ে গুপ্তজী পুনরায় বললেন, 'ওই যে আবরণটা দেখছ, সেটা মানুষের ধারণার ফলে সৃষ্টি। দৃষ্ট থেকে অদৃষ্টকে পৃথক করে ওদের কল্পনা মনোরম এক রম্যভূমি স্থাপন করে নিয়েছিল। এখন সেই আবরণে কিরকম কম্পন উঠেছে দেখ। ওদের ধারণা থেকেই যদি দৃষ্ট অদৃষ্টের পার্থক্য নাই হয়ে যায়, তাহলে এই রম্যভূমির অবস্থা কি হবে? ওরা জানে না, কি এক ভয়াবহ শূন্যতার ধারণায় রম্যভূমি নির্বাপিত হবে। তখন তারা কোথায় আশ্রয় নেবে?'

সে জিজ্ঞেস করল, 'কেন, নিয়ন্তা কি কোন বিধিই তৈরি করতে পারবে না?' গুপ্তজী অর্থাৎ চিত্রগুপ্ত মাথা নাড়লেন, অদৃষ্টের মালিক অর্থাৎ. . .নিয়ন্তাও সেই শূন্যতার ধারণার ভেতরে অন্তর্হিত হবে। এর নিয়ন্তাও পরম কম্পিউটারের সংযোগবর্তী এক পরম ওয়েভ মাত্র। কম্পিউটারে তথ্য না

থাকলে প্রশ্নের উত্তর কম্পিউটার দিতে পারে না। মানুষের জিঘাংসার এই রূপ ওদের শুভ ঐতিহ্য নিয়ন্তার ওয়েভে দেয় নি। আমি মালিককে জিজ্ঞেস করছি, মালিক কী ঘটেছে, বলুন কী বিধিতে আপনি আত্মঘাতী মানুষকে দানবের ভাইরাস থেকে মুক্ত করবেন? মালিকের কম্পিউটারে এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। মালিক .....

গুপ্তজীর কথা শেষ হল না। হঠাৎ আন্দোলিত হতে থাকা আবরণটা ভেদ করে এক বৃহৎ শিলাখণ্ড এসে গুপ্তজীর তাঁবুর উপরে পড়ল। তাবু বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

ওপারের উন্মাদ অট্টহাসি উল্লসিত হয়ে এপারে এসে লুটিয়ে পড়তে লাগল। রম্যভূমির পবিত্র শূন্যতাকে সেই অট্টহাসি গ্রাস করতে লাগল।

পাহাড়ের ছায়া

য়েছে দরজে ঠংছি

দূরের জঙ্গল পাহাড়ের ঘন অরণ্য থেকে আকাশের দিকে কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠতে থাকা ধোঁয়া দেখে কামথোকের মন এক ধরনের বিষাদময়তায় আচ্ছন্ন করে ফেলল। খড়ি কাটার দীর্ঘ নাগা দা টা পাশে রেখে দূরের জঙ্গল আর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে সে মন খারাপ করে একটি পাথরের উপর বসে পড়ল। তার মন চলে গেল পাটকাই পর্বতমালার শেষ প্রান্তে ভারত মায়ান্মার সীমানায়, প্রহরীরূপে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়টার চূড়ার উঠে যেতে ইচ্ছে হলো তার। তার ইচ্ছে হলো সেই ঘন অরণ্যে ঢুকে কে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করছে তা দেখে আসতে। অরণ্যবাসীদের সঙ্গে জঙ্গী হয়ে চলে যাওয়া ভাইয়ের সঙ্গে আরও একজনের চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তার মনের মানুষ তুখুমর চেহারা। ঘন অরণ্যের মধ্যে নিশ্চয় ওরা কিছু রান্না বান্না করছে। ওরা নিশ্চয় কোন পশু মেরেছে আর সেটাকেই পুড়িয়ে খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করছে। তা নাহলে এত গভীর অরণ্য থেকে ধোঁয়া বেরুবে কোথা থেকে? এখনও কখনও কামথোকেরও কাঁধে বন্দুক নিয়ে অরণ্যের মধ্যে চলে যেতে ইচ্ছে করে। চাকরি বাকরি ছাড়া এভাবে বেঁচে থেকেই বা লাভ কী? খুনসার সারদা মিশন থেকে কত ভাল নম্বর নিয়ে সে প্রথম বিভাগে সেকেন্ডারি পাশ করেছিল। কিন্তু পিতার মৃত্যু হওয়ার দুঃখী, বিধবা মা তাকে আর পড়াতে পারল না। চাকরির জন্যে সে খুনছা, ইটানগর ইত্যাদি জায়গায় গিয়ে কয়েকবার ইন্টারভিউ দিয়েছে। কিন্তু তার হয়ে সুপারিশ করার মতো কোন নেতার সঙ্গে জানাশোনা না থাকায় তার চাকরি হয় নি। তার থেকে পড়াশুনায় অনেক খারাপ ছেলেমেয়েরাও চাকরি পেয়েছে। লাজুন মানে একেবারে, অনুন্নত অঞ্চল। এরকম একটি জায়গার লাজু নক্তেদের মধ্যে থেকে ইটানগরে, খুনসায় প্রভাবশালী নেতা না থাকার জন্যে সেই সম্প্রদায় থেকে আসা সে কোথায় চাকরি পাবে? বঞ্চিত জায়গার বঞ্চিত মানুষ সে। বঞ্চিত দাদের লাজু নক্তে মানুষরা।

সেজন্যেই ওর ভায়েরই মতো অনেক লাজু নক্তে যুবক যুবতী বন্দুক হাতে তুলে নেবার জন্যে জঙ্গী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। কামথোকেরও কখনও কখনও ইচ্ছে করে হাতে বন্দুক নিয়ে অরণ্যে চলে যেতে। কিন্তু সে যেতে পারে না। আজকাল তার চালচলনের উপর অনেক মানুষের নজর নিবদ্ধ। পাড়ার চোখ, স্বামী রোনহাঙের চোখ, শ্বশুর শাশুড়ির চোখ, দেওর ননদদের চোখ সঙ্গের বন্ধুর বান্ধবীরা তো রয়েছেই। লাজু স্কুলের শিক্ষক রোনহাঙের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু কামথোককে এখনও মায়ের ঘরেই থাকতে হচ্ছে। রোনহাঙের সঙ্গে সে বিবাহিত জীবন আরম্ভ করতে পারেনি। কামথোকদের লাজ নক্তে জনজাতীয়দের প্রথামতে যতদিন পর্যন্ত সে মা বাবার ঘরে থেকে অন্য কোন পুরুষের ঔরসে সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না, ততদিন পর্যন্ত বিবাহিত স্ত্রী হিসেবে সে স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবে না। তাকে কোন পুরুষের কাছে দেহদান করতে হবে, গর্ভে অবৈধ সন্তানকে লালন পালন করতে হবে, জন্ম দিতে হবে আর জন্মের পর তার গর্ভের, তার রক্ত মাংসের প্রথম সন্তানটিকে বধ করতে হবে। তার পরেই তাকে স্বামীর সঙ্গে ঘর সংসার করার উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হবে এবং শ্বশুর বাড়ির মানুষ এসে মা বাবার ঘর থেকে আদর যত্ন করে তাকে স্বামীর ঘরে নিয়ে যাবে। ইস। কি যে আশ্চর্য নিয়ম! নিজেদের লাজু নক্তে জনজাতির কিছু রীতিনীতির কথা ভাবলেই কামথোকের হৃদয় থেকে কান্নার বেগ বেরিয়ে আসে। নিজেকে নক্তে জনজাতির বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের মতো আদর্শবান সংস্থার দ্বারা পরিচালিত সারদা মিশন স্কুলে পড়া মেয়ে সে। হোস্টেলের বৈরাগিনী মাতাজীদের সংস্পর্শে কেটেছে তার জীবনের বেশ কিছু অংশ। স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, স্বামী বিবেকানন্দ এবং সারদা মাতার আদর্শে প্রভাবিত সে। তাই তার ভাবধারা, আচার আচরণ নিজের ঘরের মানুষের সঙ্গে, নিজের গ্রামের মানুষের সঙ্গে, নিজেদের লাজ নক্তে সমাজের সঙ্গে মেলে না। না মিললেও এই সমাজ থেকে বেরিয়ে যাবার তার কোন উপায় নেই। সমাজের খাঁচায় সে বন্দী। সেজন্যেই তাকে রোহাঙের সঙ্গে বিয়েতে রাজি হতে হয়েছে। রোনহাঙকে তার কাছে খারাপ লাগে না। ভাললাগে বলেই সে বিয়েতে রাজি হয়েছে। তার জন্যে রোনহাঙ উপযুক্ত মানুষ। রোহনাঙের চেয়ে ভাল ছেলে তাদের সমাজে নেই। কিন্তু রোনহাঙও তাদের সমাজের নিয়মকে অস্বীকার করতে পারে না। সমাজের নিয়মকে অস্বীকার করতে পারে না বলেই বিয়ের পরেও তাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবৈধ সন্তানের জননী হবার জন্যে এখানে রেখে গেছে। কামথোক আর দশটা মেয়ের মতো হলে কবেই নিজের মাতৃত্বের ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে এতদিনে রোনহাঙের ঘরসংসার পরিচালনার জন্যে চলে যেত। কিন্তু অন্য মেয়েদের মতো সে যুবতীদের চাংঘর জুনপাঙে ঘুমোতে যায় না. যে কোন যুবকের হাতে সে নিজের যৌবনবতী দেহকে উপঢৌকন হিসেবে তুলে দিতে পারে না। শৈশব থেকেই সে বাড়িতেই রাত কাটিয়ে এসেছে, জুনপাঙে যাবার মতো বয়স হবার আগেই সে খনসার সারদা মিশনে পড়তে চলে গিয়েছিল। বড় হলেও জুনপাঙে না গিয়ে বাড়িতেই শোওয়া অভ্যেস করেছে। জুনপাঙে গিয়ে তার যুবতী দেহকে অপবিত্র করার জন্যে কোন যুবককে সে উৎসাহিত করেনি। রোনহাঙের সঙ্গে বিয়ে হবার আগে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাকে মা বা অন্য কারও কাছ থেকে কোনরকম কটু কথা শুনতে হয়নি। কিন্তু এখন তাকে দিনরাত মা'র কটু কথা শুনতে হচ্ছে। সে মায়ের কাছে চক্ষুশূল হয়ে পড়েছে।

'কামথোক তুমি জুনপাঙে গিয়ে রাত কাটাচ্ছ না কেন? কোন যুবতী মেয়ে জুনপাঙে না গিয়ে রাতে বাড়িতে শোয় নাকি। আজ থেকে জুনপাঙে শোবে। জুনপাঙে শুলে তুমি তাড়াতাড়ি স্বামীর ঘরে যেতে পারবে।'

'কামথোক। তোমার মাসিক স্রাব আবার শুরু হয়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ?'

'হবেই। তোমার কোন কামনা বাসনা নেই নাকি? তোমার সেই মাতাজীদের সঙ্গে থেকে তুমিও মাতাজীদের মতো সন্ন্যাসী হয়ে পড়েছ। তোমার বয়সে আমি তিন তিনটে সন্তানের জননী হয়েছিলাম জান?'

'কামথোক। আমি লজ্জায় লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছি না। তুমি আমার নাক কান কেটে ছাড়বেই দেখতে পাচ্ছি। তাড়াতাড়ি কিছু একটা কর'।

'কামথোক, তোমাকে কোন যুবক কোনদিন স্পর্শ করে নি? স্পর্শ করতে দিয়ে দেখ। তখন তুমি বুঝতে পারবে জীবনের আসল মজা কোথায়। বিধবা হওয়া সত্ত্বেও কোন পুরুষ আমাকে কামনা করলে আমি নিজেকে তার কাছে সঁপে দিই। একবার শুরু করলে তুমিও অভ্যস্থ হয়ে পড়বে।'

এসমস্তই কামথোকের মায়ের কথা। তাকে বোঝাতে গিয়ে কখনও মা নির্লজ্জভাবে কিছু না বলা কথাও বলে ফেলে। তার কাছে নারী পুরুষের দৈহিক সম্পর্কের বিবরণ তুলে ধরে, যাতে সে প্রলুব্ধ হয়ে কোন পুরুষকে দেহদান করে মা হতে পারে। মা'র কথা শুনে প্রথম প্রথম সে বিরক্ত হত। পরবর্তীকালে সে মায়ের কথায় কোন গুরুত্ব দিত না।

পাথরের উপর বসে দূরের জঙ্গলে কুন্ডলি পাকিয়ে আকাশের দিকে ধোঁয়া উঠতে দেখে কামথোক দিন আর বারের হিসেব করতে লাগল, এবার তার মাসিক শুরু হতে দেরি হচ্ছে। আজ থেকে দশবার দিন আগেই তার মাসিক শুরু হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। হলো না। তবে কি সে মা হতে চলেছে। কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মন এক অজানা আশঙ্কায় পূর্ণ হয়ে উঠল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল তুখুম হাভির গম্ভীর চেহারাটা। তুখুম একদিন তাকে ঘরের উঁচু বারান্দাটা থেকে পাহাড়ের দিকে ধোয়া উঠতে থাকা অরণ্যের নিচে পাহাড়ের একটা টিলার উপর খোলা জায়গায় অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিল, — "কামথোক। ঐ খোলা জায়গাটাতেই আমাদের গ্রাম। গ্রামের নাম চাংকুং হাভি। এখান থেকে আমাদের ঘরগুলি দেখা যায় না। আমাদের সংগ্রাম যেদিন শেষ হবে, সেদিন চিরদিনের জন্যে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব। তুমি যাবে তো?"

"তোমাদের সংগ্রাম সফল হবে কি? আমি কিন্তু তোমাদের এই সংগ্রামের শেষ দেখতে পাচ্ছি না। তারচেয়ে তুমি তোমাদের সংগঠন থেকে বেরিয়ে আসছ না কেন? তুমি যদি আমাকে তোমার চিরজীবনের সঙ্গী করে নিতে চাও, তাহলে তুমি সবকারের কাছে আত্মসমর্পণ কর। আমিও আমার এই সমাজ থেকে মুক্তি পেতে চাই। আমার গর্ভের প্রথম সন্তানকে বধ করে আমি নতুন জীবন শুরু করতে চাই না। তোমাদের সমাজের নিয়মমতে আমার সমস্ত সন্তানই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে। কি সুন্দর কথা।"

"আমাদের সংগ্রাম সফল হবেই। খুব তাড়াতাড়িই হবে। সরকারের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমাদের নেতাদের কথা-বার্তা শুরু হয়েছে। তখন আমাদের এখনকার মতো পাহাড়ে-জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াতে হবে না। আমাদের স্বাধীন দেশে আমরাই সরকার গঠন করব। আমবাই দেশ শাসন করব।" তুখুমেব কথায় গভীর প্রত্যয় ফুঠে উঠে।

প্রথমবার তুখুম কামথোকদের ঘরে তাব ভাই নোকলোর সঙ্গে এসেছিল। রাতের বেলা সে ভাইয়ের কথা শুনে দরজা খুলে দিয়েছিল। দুই তিন দিন অনাহারে থেকে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে লাজ্রু গ্রামে এসে পৌঁছেছিল ওরা। ছেলে দুটিব ক্লান্ত শ্রান্ত ক্ষুধার্ত মুখ দেখেই কামথোকের হৃদয় করুণায় পবিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি করে সে ওদের ভাত বেঁধে খাইয়েছিল। ভাত খাবার সময় সে

ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিল, — "সরকার তোমাদের সংগঠনের সঙ্গে সিজ ফায়ার ঘোষণা করেছে শুনেছিলাম। তাহলে তোমাদের এভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে আসতে হয়েছে কেন?"

"সিজ-ফায়ারের শর্তানুসারে আমরা ক্যাম্পের বাইরে যেতে পারি না, কিন্তু আমরা যদি ক্যাম্পের ভেতর বসে থাকি, তাহলে কীভাবে চলবে? অন্য সংগঠন সমস্ত গ্রাম কব্জা করে নেবে। সেজন্যেই আমাদের সংগঠনের কাজের জন্যে গ্রামে যাবার জন্যে ওপরওলা থেকে নির্দেশ এসেছে।" নোকলোর হয়ে তুখুম উত্তর দেয়। "তোমাদের ভারতীয় সিপাহীরা মারবে না?"

" কেন মারবে না? তারা নির্ধারিত করে দেওয়া ক্যাম্পের ভেতর থাকলে মারবে না, কিন্তু এভাবে ঘুরে বেড়ালে নিশ্চয় তাদের সঙ্গে আমাদের গোলাগুলি হবে।"

সেবার চারদিন নোকলো আর তুখুম ঘরের ভেতর লুকিয়েছিল। অনেকদিন পরে বাড়ি ফিরে আসায় মাও ছেলেকে ছাড়তে চাইছিল না। সেই চারদিনে তুখুম কামথোকের কাছাকাছি চলে এলো। কামথোকের মাও চেয়েছিল তুখুম আর কামথোকের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে উঠুক, যাতে কামথোক গর্ববতী হয়ে সন্তানের জন্ম দিয়ে মা হতে পারার ক্ষমতার প্রমাণ দিয়ে স্বামীর ঘর করতে যেতে পারে। সেদিন থেকেই তুখুম কখনও নোকলোর সঙ্গে আবার কখনও একাই কামথোকের ঘরে আসতে শুরু করল। তুখুম এলেই মা কোন না কোন অজুহাতে নিজের মেয়েকে তুখুমের কাছে একা ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ত, যেন তুখুম তাদের জামাই। আর মধ্যে মধ্যেই ব্যগ্র হয়ে সে মেয়েকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, "কামথোক তোমার এবারের ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে কি?"

"মা। কী একটা কথাই সব সময় জিজ্ঞেসা করতে থাক। তোমার বলার মতো অন্য কিছুই নেই নাকি?

"আর কতদিন তোমাকে ঘরে বসিয়ে রাখব? লজ্জায় সমাজে মুখ দেখাতে পারছি না। তুখুম আসা যাওয়া করছে কতদিন হয়ে গেল। তোমারই দোষ না তার মধ্যেই কোন দোষ রয়েছে বলতে পারছি না। এতদিনে তোমার গর্ভবতী হয়ে যাওয়া উচিত ছিল'। "গর্ভবতী হয়ে সন্তানের জন্ম দিলেও আমি আমার সন্তানকে হত্যা করতে দেব না। আমি তুখুমের সঙ্গে জঙ্গলে পালিয়ে যাব।" মেয়ের কথা শুনে কামথোকের মা রাগে জ্বলে পুড়ে উঠলেন। কামথোককে যাচ্ছেতাই ভাবে গালাগালি শুরু করলেন। তারপর থেকেই কামথোকের প্রতি মায়ের নজরদারি বেড়ে গেল তাকে চোখের আড়াল হতেই দেয় না। তুখুমের প্রতি মায়ের সমস্ত আদর মুহূর্তের মধ্যে উড়ে গেল। তুখুমকে মা সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল।

"দূরের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছ? তুমি সেই জঙ্গলী লোকটির কথা ভুলে যাও। নিজের গ্রামের কোন যুবককেই বেছে নাও। কত যুবকই তো তোমার আশেপাশে ঘুরঘুর করে।" মায়ের কথা শুনে কামথাকের ভাবনায় ছেদ পড়ে। মায়ের সঙ্গে সে জঙ্গলে খড়ি কুড়োতে এসেছিল। আজকাল সে যেখানেই যায় মা সঙ্গে থাকে। খেত খামারে গেলেও, জঙ্গলে খড়ি কুড়োতে গেলেও বা ঝরণা থেকে জল আনতে গেলেও মা তাকে একা যেতে দেয় না। মায়ের কেবলই ভয়, তুখুমের সঙ্গে দেখা হলেই মেয়ে হয়তো পালিয়ে যাবে। আজও সে মায়ের সঙ্গে খড়ি কুড়োতে এসেছে। পার থেকে উঠে খড়ি কাটার সময় কামথোক মনে মনে স্থির করে নিল, তার শরীরে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তা সে যতদিন সম্ভব মার কাছে লুকিয়ে রাখবে। সে নিজের জনজাতীয়দের মতো ছোট কাপড় পরে না, কোমরের উপরের অংশ উন্মুক্ত রাখে না, তার শরীরে কোন ধরণের চিত্র বিচিত্র করা নেই। সারদা মিশনে পড়ার সময় থেকেই সে সমস্ত শরীর ঢেকে কাপড় পড়ার অভ্যেস করে নিয়েছে। আধা শরীর

দেখিয়ে সে কাপড় পরতে পারে না। সবসময়েই সে চূড়িদার পরে থাকে। তাই অন্যের চোখ থেকে নিজের শারীরিক অবস্থা সে অনেকদিন পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে পারবে। আর এর মধ্যে তুখুম যদি এসে পড়ে, সে তুখুমের সঙ্গে তাদের বাড়িতে চলে যাবে। মনে মনে কথাটা ভেবে নিয়ে সে মা'র সঙ্গে ঘরে ফিরে এলো। কামথোক সত্যিসত্যিই সে মাসেই টের পেল - সে মা হতে চলেছে। এতে সে আনন্দিত হলো ঠিকই কিন্তু নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে চিন্তিত হয়েও পড়ল। সে যেরকম ভেবেছিল সেভাবে কথাটা মা'র কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারল না। মা'র অভিজ্ঞ এবং অনুসন্ধানী চোখ প্রথম মাসেই ধরে ফেলল, মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। কামথোক যে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে সে কথাটা মা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রামেই প্রচার করে দিল। এতদিন পর্যন্ত সমাজের কাছে নিচু হয়ে থাকা ঘরটার মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে গেল। কামথোকের গর্ভবতী হওয়ার কথা শুনে রোনহাঙ এবং তার বাবা মা সবাই এসে কামথোকের ঘরে উপস্থিত হলো। এসেই কামথোকের শাশুড়ি তার উদ্দেশে নানা ধরনের উপদেশ দিতে শুরু করল, — "তুমি এখন আমাদের ঘরের বৌ। তুমি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে এটাই প্রমাণ করলে আমরা বুড়ো হলে নাতি নাতনীর মুখ দেখতে পাব। আমাদের বংশ তোমার মাধ্যমে এগিয়ে যাবে। তুমি যার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছ তাকে এখন থেকে ভুলে যাও। তোমার গর্ভে আশ্রয় নেওয়া সন্তানের প্রতিও তুমি কোন ধরনের মায়া মমতা পোষন করে রেখ না। সে ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক বেঁচে থাকার জন্যে আসে নি। আমরা তাকে আমাদের ঘরে রাখতে পারি না। তোমার হয়তো কষ্ট হবে, আমারও হয়েছিল। তাই তোমার গর্ভের সন্তানকে এখন থেকেই মৃত বলে ধরে নাও।"

শাশুড়ির কথা শুনে কামথোক ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠল। গর্ভে আশ্রয় নেওয়া সন্তানের জন্যে তার মাতৃহৃদয় হাহাকার করে উঠল। কামথোক গর্ভবতী হওয়ার পর থেকে রাতটা রোনহাঙ তার সঙ্গে কাটাতে শুরু করেছিল। রোনহাঙ যেহেতু তার পতি,তাকে সে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারল না। কেবলমাত্র প্রথম সন্তানটা জন্ম হওয়া পর্যন্ত তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত সে শ্বশুরবাড়ি যেতে পারবে না। একদিন কামথোক আবিষ্কার করল তার গর্ভের সন্তান নড়াচাড়া করতে শুরু করেছে। পেটে হাত রেখে সে সন্তানের নাড়াচাড়া অনুভব করল। তার চোখের সামনে একটা সুন্দর শিশুর হাসিমুখ ভেসে উঠল। শিশুটির ছবি ভেসে উঠার সঙ্গে সঙ্গে মমত্ববোধ তার অন্তর একেবারে গলে গেল। এই নিরপরাধ, ফুলের মতো শিশুটিকে সে মরতে দিতে পারে না। সে তাকে জন্ম দিয়ে পালন পোষন করে বড় করে তুলবে। তুখুম অরণ্য থেকে ফিরে এলেই সে তার সঙ্গে পালিয়ে যাবে। রোনহাঙের সঙ্গে ঘর গৃহস্থী করার তার কোন প্রয়োজন নেই। তুখুমের সঙ্গে পালিয়ে গেলেও তার রোনহাঙের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না। সে নিজেই তার জীবনে তুখুমকে আহ্বান করে এনেছে। কিন্তু কোথায় আছে এখন তুখুম? কয়েকমাস পূর্ণ হয়ে গেল। তুখুম এবং নোকলো আসছে না কেন? ওরা কি ভালই আছে? গোষ্ঠী সংঘর্ষে বা সেনাদলের সঙ্গে গোলাগুলিতে মৃত্যু হয়নি তো তাদের? তুখুম এবং নোকলোর কথা ভাবলেই ভয় এবং শঙ্কায় সে শিউরে ওঠে। দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল, গর্ভে থাকা শিশুটির পৃথিবীতে আসার দিন সংক্ষিপ্ত হয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে কামথোকের মনের উদ্বিগ্নতাও ততই বাড়তে লাগল। নিজ সন্তানের আসন্ন মৃত্যুর কথা চিন্তা করে রাতের পর রাত সে রোনহাঙের অজান্তে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। একদিন রাতে তাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'কেন কাঁদছিস কামথোক'?

কোন উত্তর না দিয়ে কামথোককে অনবরত কেঁদে যেতে দেখে রোনহাঙ নীরব হয়ে গেল। কামথোকের মনের দুঃখ বেদনা রোনহাঙ যেন অনেকটাই অনুভব করতে পারল। সে কামথোককে দুহাত নিজের দিকে টেনে এনে জিজ্ঞেস করে 'কেঁদনা। এ সময়ে আমাদের সমাজের রীতিনীতির

দোষ। তুমি আজ হয়তো তুখুমের জন্যে আর তার সন্তানের জন্যে কাঁদছ, কিন্তু তোমার সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তুমি তার সঙ্গে যাবে কীভাবে? তুমি এখন আমার পত্নী তোমাকে আমার হয়েই থাকতে হবে''। ঠিক এসময়েই কামথোকের গর্ভের সন্তানটা নড়াচড়া করে উঠল। হাতটা কামথোকের তলপেটে রেখে রোনহাঙ মৌন হয়ে পড়ল।

''রোনহাঙ আমার সন্তান গর্ভের ভেতর কীভাবে নড়াচড়া করছে তুমি অনুমান করতে পারছ কি?''

''হ্যাঁ। সত্যিই এটা বড় নড়াচড়া করছে''।

''রোনহাঙ, আমার অনুরোধ, আমার সন্তানকে তোমরা হত্যা করো না। তাকে বেঁচে থাকতে দাও। তাকে মেরে ফেললে আমিও বাঁচব না। আমিও মরে যাব।''

''তুমি এধরনের অনুরোধ করো না। সন্তানটাকে হত্যা না করলে তুমি আমার ঘরে কীভাবে আসবে? তোমার কি এটাই একমাত্র সন্তান হবে? তোমার আরো সন্তান হবে। সন্তানের জন্ম দিতে দিতে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে দেখবে''। সান্ত্বনা দেবার সুরে কথাগুলি বলে রোনহাঙ।

''তুমি পড়াশোনা জানা মানুষ। আমরা পড়াশোনা করা যুবক যুবতীরা আমাদের সমাজের এই খারাপ নিয়মগুলিকে দূর করে সমাজ সংস্কার করতে পারিনা কি রোনহাঙ? যেভাবে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইত্যাদি মহাপুরুষরা করেছিলেন। আমরাও কি সেভাবে করতে পারি না?'' - কামথোক রোনহাঙের দিকে প্রস্তাবটা এগিয়ে দেয়।

''এত বড় বড় কথা বল না। সমাজ নিজে নিজেই বদলাবে''। রোনহাঙের কথা শুনে কামথোক নিরাশ হয়ে পড়ে। রোনহাঙের প্রতি যতটুকু শ্রদ্ধা ভালোবাসা তার মনে ছিল, সেটাও অচিরেই বিলীন হয়ে যায়। সে কি করবে কিছুই ভেবে পেল না। তার মানে তার সন্তানের মৃত্যু অনিবার্য। কামথোক স্থির করল, — দুই একদিনের মধ্যেই সে পালিয়ে যাবে। তুখুম আসুক বা না আসুক, সে বেঁচে থাকুক আর নাই থাকুক, সে চাংকুঙের জঙ্গলে তুখুমের বাড়িতে চলে যাবে। লাজুর কাছ থেকে খুব বেশি হলেও দুদিনের পথ। এই ভারী শরীর নিয়েও সে এটুকু রাস্তা হেঁটে যেতে পারবে। তুখুমের সন্তানকে গর্ভে ধারন করেছে বললে তুখুমের মা-বাবা নিশ্চয় তাকে ঘরে আশ্রয় দেবে। তুখুমের কাছেই সে তার কথা মা বাবার কাছে বলতে শুনেছে। এমনকি নোকলো তাকে এটাও বলেছে যে তারা নাকি তুখুমের জন্যে তাকে নিতে চেয়েছে। তুখুমের কিছু হয়ে থাকলেও বুড়ো বুড়ি নাতি নাতনীকে কাছে পেয়ে সান্ত্বনা লাভ করবে। হ্যাঁ, সে কাল রাতেই পালিয়ে যাবে। কাল সে তার নিজের কাপড় চোপড, জিনিসপত্র সব চুপিচুপি ঠিকঠাক করে নেবে। কথাটা মনে মনে ভেবে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে নিবিড় ঘুম নেমে এলো। কিন্তু বেশিক্ষণ সে এভাবে শুতে পারল না তলপেটের তীব্র ব্যথায় সে জেগে উঠল। তাকে ছটফট করতে দেখে রোনহাঙ শাশুড়িকে জাগাল। কামথোকের মা তাকে সামলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে রোনহাঙ মাকে খবর দেবার জন্যে রওনা হলো। গ্রামের কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে রোনহাঙের মা এসে উপস্থিত হলো আর কামথোকের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতেই কামথোকের মনে হলো যেন মা, শাশুড়ি এবং অন্য সব মহিলারা মিলে তার সন্তানকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত একদল হত্যাকারী মাত্র। প্রসব বেদনার চিৎকারের মধ্যেই সে চিৎকার করে বলতে লাগল, — '' আমার সন্তানকে হত্যা করো না। শাশুড়ি মা আমার সন্তানকে হত্যা করো না। ওকে বেঁচে থাকতে দাও। তোমরা ওকে হত্যা করলে আমিও মরে যাব, আমি মরে

যাব।" সারাটা দিন যমে মানুষে লডাই করার পর বিকেলের দিকে কামথোক একটি পুত্রসন্তানের জন্মদান করল। নবজাতককে সে দেখতেও পেল না। তার চোখের সামনে কাঁদতে থাকা বাচ্চাটিকে শাশুড়ি বাইরে নিয়ে গেল। নিজের কান্নার মধ্যে বাচ্চাটির কান্না কামথোকের কানে বারবার ভেসে আসতে লাগল।

'আমার বাচ্চাটা ছেলে ছিল না মেয়ে ছিল?'

"ছেলে ছিল না মেয়ে ছিল তা জেনে তুমি কী করবে? তার কথা তোমার ভুলে যাওয়াই ভাল। মিছি মিছি দুঃখ করে তো কোন লাভ নেই'। মা তাকে সান্ত্বনা দেবার সুরে বলল।

"ওকে কে নিয়ে গেল? ওকে কি মেরেই ফেলল নাকি?

"কে আর নিয়ে যাবে? তোমার স্বামীই নিয়ে গেছে। সে নিজে মেরে পুঁতে রাখবে বলেছে'। শাশুড়ির কথায় তার কানে শেল বিঁধে গেল। কামথোক ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে সে সারাদিনের মানসিক অবসাদে ঘুমে ঢলে পড়ল। কামথোকের আর মরা হলো না। দু'দিন পরে সে তার স্তন যুগল থেকে টপটপ করে ঝরে পড়া দুধ কোনরকমভাবে সামলে নিয়ে এক শূন্য হৃদয় নিয়ে শ্বশুর শাশুড়ি আর রোনহাঙের ঘরের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। ঘরে রোনহাঙ তাকে সাদরে বরণ করে নিল আর সোজাসুজি তাকে শোবার ঘরেব দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল।

"এই দেখ।" — রোনহাঙ বিছানায় কাপড়ের পুঁটলির মধ্যে শুয়ে থাকা একটি বাচ্চার দিকে দেখিয়ে দিল।

'বাচ্চা দেখছি। কার বাচ্চা?'

"কার আবার হবে। আমাদের বাচ্চা। আমি ওকে মারতে পারলাম না। তুমি যেভাবে চেয়েছিলে সেভাবেই ও এখন বেঁচে থাকবে"। রোনহাঙের কথা শেষ হবার আগেই কামথোক বাচ্চাকে বুকে তুলে জড়িয়ে ধরল। বাচ্চার ঘুম ভেঙে যাওয়ায় কেঁদে উঠল। বাচ্চার কান্না শুনেই কামথোক তার সন্তানের আওয়াজকে চিনতে পারল। এই আওয়াজই তাকে অহরহ আনমনা করে তুলছিল, এই কান্নার আওয়াজ শোনার জন্যেই তার সমস্ত প্রাণমন ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। এখন এই কান্নার আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে বিছানায় বসে তার একটা স্তন বাচ্চার মুখে ঢুকিয়ে দিল আর রোনহাঙের দিকে তাকিয়ে একটা কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল।